নারদীয় ভক্তিসূত্র

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Naradiya Bhaktisutra*
before the students of Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

নারদীয় ভক্তিসূত্রকে আধার করেই স্বামীজী ভক্তিযোগের উপর তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন, পরে সেই ভাষণকে সঙ্কলন করে প্রসিদ্ধ ভক্তিযোগ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তিযোগ ঠিক কি, ভক্তি জিনিসটা কি জানার জন্য সবারই একবার স্বামীজীর ভক্তিযোগ পড়া দরকার। ভক্তি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের দেখা দরকার মানুষ ধর্ম পথে কেন যায়।

ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে, Information আর Knowledge। Information হল কিছু খবরাখবর দিয়ে দেওয়া হল, information যখন তার জীবনচর্চায় প্রবেশ করে জীবনের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন ওটাই Knowledgeএ রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন ওই knowledgeকে কাজে লাগানো হয় তখন সেটাই হয়ে যায় Wisdom। এই জ্ঞান একই স্তরে থাকে না, জ্ঞানেরও অনেক স্তর বিন্যাস হয়। জ্ঞানের প্রথম স্তর information, একটা খবর ভেতরে এল, এসে সেখানেই শেষ। সেই informationকে অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করে, বিচার করে নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে এক করে দেওয়া হয়, তখন ওটাকে বলে knowledge। ঠাকুর বলছেন, কেউ দুধের খবর শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আমাদের সমস্যা হল আমরা সারা জীবন ধরে শুধু information সংগ্রহ করতেই থেকে যাই। ক্লাশ ওয়ান থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশান পর্যন্ত যা কিছু করছে সবটাই শুধু informationকে আধার করে চলে। কবিতা কাকে বলে যদি দু লাইন লিখতে বলা হয়, সবাই তখন নেমে যাবে কে কি কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন, অমুক কবি এই বলেছেন, পঁচিশ জনের নামে লিখে দেবে কে কি বলেছেন। কবিতার ব্যাপারে কোন নিজস্ব বক্তব্য নেই। কারণ সব কিছু information হয়ে তার মধ্যে ঢুকে আছে। ফলে কারুরই জীবনে কোন পরিবর্তন হয় না। গাধা হয়ে জন্মেছে মরার সময় ঐ গাধাই মরবে, তার বেশি কিছু হবে না। জাগতিক ব্যাপার গুলো কোন রকমে information দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায়। যেমন মাথা ব্যাথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাকে বলে দিল প্যারাসিটামল বা ক্রোসিন খেয়ে নাও। এটা একটা information, এটাই কিন্তু knowledge হয়ে যায়। জাগতিক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারে information knowledge হয়ে যায়। যেমনি বলল প্যারাসিটামল খেয়ে নাও, ওটা শোনাও যা জানাও তাই। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ করে উচ্চ চিন্তনের ব্যাপারে information কক্ষণ knowledge হয় না, আর wisdom তো হয়ই না। গীতাতে দুটো শব্দ বলা হচ্ছে, জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে যিনি জিনিসটা শুনে বিচার করে ধারণা করে নিয়েছেন, বিজ্ঞান হল যিনি জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন।

গীতায় ভগবান বলছেন, চার ধরণের মানুষ ধর্মের পথে বা ভগবানের পথে আসে, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। আর্ত, একজন খুব বিপদে পড়ে গেছে, যেমন দ্রৌপদীর চীর হরণ হচ্ছিল, দ্রৌপদী আর্ত হয়ে প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান রক্ষা করুন। ভাগবতে আছে, গজেন্দ্র নামে একটা হাতিকে কুমির ধরে নিয়েছিল। হাতি লড়াই করে কিছুতেই কুমিরের গ্রাহ থেকে ছাড়া পাচ্ছিল না। গজেন্দ্র তখন ভগবান বিষ্ণুর প্রার্থনা করলেন, ভগবান এসে কুমিরের গলাটা কেটে দিলেন। বেশি দুঃখ কষ্টে থাকলে আমাদের ভগবানের কথা একটু বেশি করে মনে পড়ে। জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসু যাঁরা হন তাঁরা একটু উচ্চমানের সাধক। অর্থার্থী, টাকা-পয়সার দরকার কিন্তু হচ্ছে না, ছেলে অশান্তি করছে, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, যেটাই করতে যাচ্ছে সেটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে কোন ফল পাচ্ছে না, তখন ঠাকুরের দরবারে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকে। এই প্রার্থনায় কি তার কিছু সুরাহা হয়? যুক্তিতর্কে কি জিনিসটা দাঁড়ায়? যুক্তিতর্কে জিনিসটা ঠিকই দাঁড়ায়। কারণ যখন কোন কাজ হয় তখন তাতে অনেকগুলো factors থাকে। গীতায় ভগবান বলছেন, *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধাম্। বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবাঞ্চত্র পঞ্চমম্।।* প্রত্যেক কাজের সাফল্যের পেছনে পাঁচটা কারণ থাকে। তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দৈব, দেবতাদের শক্তির প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে। দেবতারা যদি কুপিত হয়ে যান তাহলে কোন কাজ হতে দেবেন না, শরীরে যতই সামর্থ থাকুক, যাই করে নিক না কেন, কাজ কিন্তু

হবে না। হয় পূজাপাঠ করে দেবতাদের তুষ্টি করুন আর তা নাহলে দ্বিতীয় উপায় হল দেবতাদেরও যিনি মালিক তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি দৈব থেকে যে বাধাটা আসছে ওই বাধাটুকু সরিয়ে দেন। কিন্তু বাকি চারটে কারণ আপনার থাকতে হবে, এর একটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু কার্যে সাফল্য আসবে না। শরীর ঠিক থাকা চাই, ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক থাকতে হবে, কাজকর্ম হওয়া চাই, এতগুলো হওয়ার পর শেষে আসছে দৈব, যেখানে দেবতাদের শক্তি লেগে থাকে। দেবতারা অসন্তুষ্ট হলে কাজ আর হবে না। অর্থার্থী টাকা-পয়সা চাইছে, প্রার্থনা করলেই তার টাকা-পয়সা হয়ে যাবে না। পেছনে কর্ম করে থাকা চাই। এরা নিকৃষ্ট, কিন্তু হবে না তা নয়, অবশ্যই হবে। শাস্ত্রেরই কথা, আর যুক্তিতেও দাঁড়ায়। হিন্দুরা জিনিসটাকে যেভাবে দেখে তাতে যুক্তিতেও দাঁড়ায়। কিন্তু ভগবানের পথে যারা আসে তাদের মধ্যে এই দুজনকে, আর্ত আর অর্থার্থীকে খুব ভালো বলা হয় না। একেবারেই ভালো নয় তাও বলা যাবে না। কারণ খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব ধ্রুব তিনি অর্থার্থী ছিলেন। সৎ মায়ের লাঞ্ছনায় ধ্রুবকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হল, তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাধনা করতে শুরু করলেন যাতে রাজ্য ফিরে পায়। এরপর ভগবান বিষ্ণু যখন ধ্রুবকে দেখা দিলেন তখন সেখান থেকে একটা খুব নামকরা কথা বেরিয়ে এল, কাঁচ কুড়াতে এসে আমি যদি হীরা পেয়ে যাই আমি ছেড়ে দেব কেন! সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য সাধনা করছিলেন ঠিকই, কিন্তু পেয়ে গেলেন ভক্তি, সেই অমূল্য জিনিসকে তিনি ছাড়তে চাইবেন কেন! সেইজন্য অর্থার্থীরা যে ঈশ্বরের কৃপা পান না তা নয়, তাঁরাও পান। যিনি আর্ত, আর্ত থেকে ত্রাণ পেয়ে গেল তিনিও ভগবানের দিকে চলে যান। কিন্তু সাধারণ ভাবে এগুলোকে কাঙালী বৃত্তি বলা হয়, তবে দোষের কিছু না। বেশির ভাগ মানুষ এই দুটোকে নিয়েই ভগবানের দরবারে যায়, সেখান থেকেও আবার উপরের দিকে উঠে আসে। আর আমাদের বেদ এই দুটোর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বেদ তো বলছেই, তোমার কি চাই বল, তোমার টাকা চাই, তোমার সন্তান চাই, তোমার রাজ্য চাই, তোমার শত্রুকে মারতে হবে? কি চাই তুমি বল। এই এই মন্ত্র আর যজ্ঞ তোমাকে দিয়ে দিলাম। মানুষের যেটা চাই সেটাই পেয়ে যাবে, শুধু বেদের যজ্ঞ করতে হবে আর মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

জিজ্ঞাসুদের একটু উচ্চমানের মনে করা হয়। জিজ্ঞাসু মানে, যার মধ্যে জিজ্ঞাসা জেগেছে, ঈশ্বর সত্যিই আছেন কি, মৃত্যু কি, জীবন কি, এই এই রকম শুনেছি এগুলো কি সত্যি, পাঁচ রকম প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেখান থেকে জিজ্ঞাসু ভগবানের পথে চলতে শুরু করে। জিজ্ঞাসুর দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই আছেন, ঠাকুর নিজেই জিজ্ঞাসু ছিলেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান শুনেছেন, সেখান থেকে তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে সত্যিই কি মা কালী আছেন, সত্যিই কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়? বেশির ভাগ সাধক এই জিজ্ঞাসু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শেষে আসছেন জ্ঞানী, জ্ঞানী খুব উচ্চমানের। আমরা এখন যে আলোচনা করতে যাচ্ছি এর মধ্যে যখন প্রসঙ্গ আসবে তখন জ্ঞানীর আলোচন চলতে থাকব। জ্ঞানী মানে যিনি ঈশ্বরের তত্ত্বকে বুঝেছেন। যেমন ঠাকুর সিদ্ধির পরে, স্বামীজী সিদ্ধির পরে, এনারাই ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। নারদীয় ভক্তিসূত্র এই ভক্তিকে দিয়েই শুরু হয়। গীতা ধর্মপিপাসুদের এই চার শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছেন।

এই চার শ্রেণীর বাইরে একটা বা দুটো শ্রেণীর কথা বলা যায়। আমরা এখানে কেন শাস্ত্র কথা শুনতে আসছি? উত্তরে বলছি, শান্তি পাই তাই আসি। তার মানে সংসারে আমাদের শান্তি নেই, সংসারের জ্বালায় দগ্ধ। এরা কিন্তু আর্ত নয়, খাওয়া-পড়ার কোন অভাব নেই কিন্তু সংসারকে মনে হচ্ছে যেন দাবানল জ্বলছে, সে চাক আর নাই চাক ওর মধ্যে তাকে পুড়তে হবে। মানুষ তখন ওখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য বা চিরদিনের জন্য বেরিয়ে আসতে চায়। বেদান্তসারে বলছেন, *তপ্তশিরোবৎ*। কারা বেদান্তের পথে আসে? যার মনে হচ্ছে আমার মাথায় আগুন লেগে গেছে, অর্থাৎ সংসারকে একেবারে জ্বলন্ত কুণ্ড বলে মনে করছে। সেখানে তার কিন্তু কোন কষ্ট নেই, কষ্ট থাকলে সে আর্তের শ্রেনীতে চলে যাবে। এদের অবস্থার কথাই ঠাকুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, বাড়িতে সব কিছুই আছে, কোন কিছুরই অভাব নেই কিন্তু সংসারে কোন কিছুই তার ভালো লাগে না। কেন এদের এমন হয় এটা জানা নেই, কিন্তু হয়। ঠিক ঠিক ধর্ম এখান থেকেই শুরু হয়। জ্ঞানী সেই অর্থে কোন শ্রেনীর মধ্যে পড়ে না, জ্ঞানী মানে তার অনেক কিছু হয়ে গেছে। কিন্তু জ্ঞানের অবস্থায় যাওয়ার আগে চারটে শ্রেনী হয়ে যায়, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর চতুর্থ হল যারা সংসার থেকে বিরক্ত হয়ে গেছে। বিরক্ত এখানে বাংলার বিরক্ত নয়, বিরত ঠিক ঠিক শব্দ, সব কিছুই আছে কিন্তু তাও সংসার ভালো লাগছে না। ঠাকুরের কাছে অনেকে আসতেন যাঁদের সব কিছুই ছিল কিন্তু তাও ঠাকুরের কাছে আসছেন, বসছেন। ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন তো ওখানেই মেঝেতে মাদুরে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুমিয়ে পড়লেও থাকছেন কিন্তু ঠাকুরের কাছেই। কারণ ওখানেই শান্তি। সংসার এত আনন্দের জায়গা, কত কিছু করে বাবা-মা একটা ভালো মেয়ের সাথে বিয়ে দিলেন, কত আমোদ-আহ্লাদ, কিন্তু কিছু দিন পর দেখছে আমি যেন পাতকুয়াতে পড়ে গেছি। এই ভাব যখন সব কিছুতেই মনে হতে থাকে তখনই ঠিক ঠিক ধর্ম শুরু হয়। ধর্ম কখন শুরু হয়, এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন religion begins from tremendous dissatisfaction within present state of affairs, জীবনে যা কিছু হচ্ছে, ভালো মন্দ যাই হোক, কোনটাই ভালো লাগছে না, সবটাই বিরক্তিকর মনে হয়। এই নয় যে সে কোন কিছুর জন্য চোখের জল ফেলছে, আর্ত নয়। সংসারের প্রতি অসন্তোষ, বিরক্তির ভাবই ঠিক ঠিক ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসুদেরও কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসু ভাবটা কমে যায়। ঠাকুর বলছেন তপ্ত কড়াইয়ে জলের ছিটে দিলে একটু ছ্যাঁৎ ছোৎ করে আবার যে কে সেই তপ্ত কড়াই। যতক্ষণ পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে না চলতে শুরু হয় ততক্ষণ পশ্চিম দিকে যাওয়া যাবে না। সংসারের মোহ যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ ঈশ্বরের দিকে যাওয়া যায় না। আর্ত, অর্থার্থী আর জিজ্ঞাসু, এই তিনজনই সাময়িক, কিছুক্ষণের জন্য এরা সংসার থেকে বিরত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বৈরাগ্যের কথা বলতে গিয়ে মর্কট বৈরাগ্যের কথা বলছেন, মর্কট বৈরাগ্যকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থার্থী যে, তার যেমনি ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় সে ভগবান থেকে সরে আসে। কবীর দাসের দোঁহাতে বলছেন, দুখমে সুমিরণ সব করে সুখ মে করে না কোঈ, যখন কষ্ট আসে তখন সবাই ভগবানকে স্মরণ করে, দুঃখ চলে গেলে আর কেউ ভগবানের দিকে তাকাবে না।

ঠাকুর অবতার ছিলেন ঠিক আছে, কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে ঠাকুরকে বিচার করলে তিনি প্রথমে একজন জিজ্ঞাসু ছিলেন। সেখান থেকে সাধনা করে একটা স্তরে পৌঁছে গেলেন, ওখান থেকে ধীরে ধীরে তাঁর পুরোপুরি সংসার থেকে বিরক্তি হয়ে গেল। সংসার বিরক্তি থেকে তিনি হয়ে গেলেন জ্ঞানী, ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে গেলেন। ঈশ্বরের স্বরূপ জানার পর ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেলেন। গীতায় ভগবান বলছেন জ্ঞানী আমার আত্মা। তাহলে ঈশ্বরের পথে কারা যান? পাঁচ জনের কথা বলা হল। এর মধ্যে জ্ঞানীকে সরিয়ে দিতে হয়, কারণ ঐ অর্থে তাঁরা আর সাধক নন, একটা সিদ্ধির অবস্থায় চলে গেছেন। গীতা অন্য ভাবে এই শ্রেণী বিভাজন করেছেন। আমরা যেভাবে করতে চাইছে তাতে জ্ঞানীকে ধরা হবে না, যাঁরা বিরক্ত তাঁরা এই শ্রেণীতে আসবেন। এবার এনারা যখন ঈশ্বরের পথে চলতে শুরু করেন তখন আবার দুটি থাক এসে যায়। আরেকটা ষষ্ঠ থাক আসে, যদিও পুরোপুরি এই লাইনে পড়ছে না, তারা হল পরম্পরাতে বড় হয়ে হয়ে ঐ জায়গাতে চলে যান। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানদের গুরুগৃহে বাস করতে হত, তারা গুরুর কাছে পরম্পরায় শিক্ষা পাচ্ছে, বেদের শিক্ষা লাভ করছে, মন্ত্র শিখছে, পূজাপাঠ শিখছে। এই করতে করতে একটা অবস্থায় এসে সংসার থেকে তার মনটা সরে যায়। অনেক আগকের ইতিহাস বলে এর দৃষ্টান্ত আমরা খুব বেশি পাই না। কিন্তু দেখা যায় তাঁরাও সিদ্ধি পেয়েছেন। এরা উপরের পাঁচটার কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আর্ত নয়, অর্থার্থী নয়, জিজ্ঞাসু নয়, জ্ঞানীও না আর বিরক্তও না। শুধু পরম্পরার প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে থাকতে থাকতে একটা সময় তাদেরও সিদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। আমার আপনার ধর্ম জীবনও পরম্পরাগত। বাড়িতে, বন্ধুদের কাছে, আত্মীয়দের কাছে শুনেছে মঠে দীক্ষা নিতে হয়, দীক্ষা নিলে ভালো, ঈশ্বরের পথে চলা যায়। চারজনের কাছে শুনতে শুনতে একটু আগ্রহ জাগল, এমনিতে তার হয়তো ঠাকুর কে, শ্রীমা কে, ধর্ম পথ কি, এসব ব্যাপারে জানার খুব ইচ্ছাও নেই। কিন্তু পরম্পরাতে পাঁচজন করছে সেও করছে। কিন্তু ওই করতে করতে কোন একটা অবস্থায় কখন তাকে সংসার থেকে বিরক্ত করে দেবে সেটা জানা যায় না। এটা একটা ষষ্ঠ থাক। সংসার বিরক্তি তার নাও হতে পারে, জিজ্ঞাসু নাও হতে পারে, কিন্তু ধর্মই সার একে এই পথে যে করেই হোক নিয়ে আসতে হবে, তাই হিন্দুরা তাকে পরম্পরা দিয়ে তৈরী করে নিত। ঠাকুরমা ফুল তুলছে, নাতিও সাথে সাথে ঘুরঘুর করছে, মাঝে মাঝে গিয়ে সাজিটা ধরছে। ঠাকুরমা পূজা করছে, সেও বসে বসে নকল করছে। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে তার ভেতর একটা সংস্কার তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

‘যোগ’ কি

যত প্রকার শ্রেনীর কথা বলা হয়, সব কটাকে একসাথে নিয়ে যখন ঈশ্বরের পথে আসে তখন তাকে বলছেন যোগ। যে কোন পথ, যে পথ ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় সেটাই যোগ। যোগ মানে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ বা ঈশ্বরীয় পথ। তাহলে যোগ কয় প্রকার যদি বলা হয় তখন যোগ চারটে কি দুটোতেই শেষ

হয়ে যায় না। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর অনন্ত তাই অনন্ত পথ অনন্ত মত, মত পথ। অনন্ত পথ মানে অনন্ত যোগ। গীতাতেই ভগবান আঠারোটি যোগের বর্ণনা করছেন, গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি যোগ। প্রথমেই আসছে বিষাদযোগ, বিষাদও একটা যোগ। আর বিভিন্ন যত ধর্ম আছে সেগুলোও যোগ। বিভিন্ন ধর্মের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার প্রত্যেকটাই এক একটা যোগ। স্বামীজী চারটের যোগের কথা বলছেন। আমরাও পড়ে বা শুনে বলছি স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলেছেন, ধরে নিচ্ছি এটাই knowledge। Knowledge কি করে হবে? সবটাকে মিলিয়ে বিচার করে দেখার পর পুরো জিনিসটা পরিষ্কার দাঁড়িয়ে যাবে যে জিনিসটা কি। তখন মনে হবে অনন্ত যোগ যদি হয় তাহলে স্বামীজী চারটে যোগের কথা কেন বলছেন। কারণ যত যোগই হোক, যদি শ্রেনীবিন্যাস করতে যাওয়া হয় তখন মোটামুটি সব যোগ চারটেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যোগের বিভাজনের অনেক রকম মানদণ্ড থাকতে পারে। এরপর যদি আরেকটা মানদণ্ড নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যোগ মাত্র দুই প্রকার হয়ে গেছে – একটা জ্ঞানযোগ আরেকটা ভক্তিযোগ। আর গীতার ভাষ্যে আগাগোড়া আচার্য শঙ্করাচর্য বলে গেছেন সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ। অন্য ভাবে পরিভাষিত করলে যোগ দুটো হয়ে যাবে, জ্ঞানযোগ আর ভক্তি যোগ। জিনিসটাকে কিভাবে পরিভাষিত করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বিভাজনটা একটু একটু পাল্টে যাবে। গীতার বক্তব্য যেটা আচার্য শঙ্কর রেখেছেন সেখানে তিনি দুটো যোগকেই রেখেছেন কর্মযোগ আর সাংখ্যযোগ। আচার্যের মতে ভক্তিযোগটাও কর্মযোগের মধ্যেই চলে আসবে। পূজা, অর্চনাদি করা এটাও কর্ম, ধ্যান করা এটাও কর্ম। কিন্তু একটু অন্য ভাবে যদি পরিভাষিত করে দেওয়া হয় তখন পথ মাত্র দুটি থাকে, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ।

জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগকেই কেন যোগ বলা হবে

অন্যান্য যত পথ বা যোগ আছে সেখানে পথ আর পথের লক্ষ্য দুটো সব সময় আলাদা। যিনি কর্মযোগ করছেন, তিনি সারা জীবন কর্মযোগ করে গেলেন কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর প্রাপ্তি। তার মানে পথ আলাদা সিদ্ধি আলাদা, পথ হল কর্মযোগ আর সিদ্ধি হল ঈশ্বর প্রাপ্তি। কর্মযোগের এটাই বৈশিষ্ট্য, পথ হল তুমি কর্ম করে যাও, প্রথমে সকাম কর্মই কর, তারপর ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্মের দিকে নিজেকে নিয়ে যাও, কিন্তু কর্মযোগের ফল সব সময় হয় জ্ঞান হবে নয়তো ভক্তি হবে। সেইজন্য কর্মযোগে অনেক জটিলতা আছে, সাধনার জন্য ঠিক আছে। কিন্তু উচ্চ অবস্থায় গিয়ে কর্মযোগ বলে কিছু থাকবে না। খুব প্রাচীন পন্থীরাও তাই কর্মযোগকে ঠিক যোগের মধ্যে গণ্য করেন না। কারণ সাধনা আর সিদ্ধি যখন এক হয় তখন সেটাই ঠিক ঠিক যোগ। তবে সব রকম সাধনা কর্ম দিয়েই শুরু হয়। ঠাকুর বলছেন কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড, কর্ম দিয়ে শুরু হয়ে বলে যোগ রূপে রাখা হয়। গীতাতে যেখানে বলছেন *এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু*, ওখানে সাংখ্যযোগ আর বুদ্ধিযোগ বলছেন, বুদ্ধিযোগকে পরে কর্মযোগে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন, কিন্তু মূল শব্দ হল সাংখ্য আর যোগ। সাংখ্যের মূল হল একত্বের বোধ আর যোগের মূল দুই বোধ। সেইজন্য গীতায় কর্মযোগকে মূল একটা পথ হিসাবে নিচ্ছেন না। ঠিক তেমনি রাজযোগের পথ হল ধ্যানের পথ, ধ্যানে মনকে বারবার একাগ্র করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে মনে কোন বৃত্তির উদয় না হয়, প্রথম থেকেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে যাচ্ছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেলে শেষ। যদিও যোগে হয় জ্ঞানের দিক থেকে যায় নয়তো ভক্তির দিক থেকে যায়। তা যদি যোগদর্শন নাও হয় তাও যোগের সাধনা আর যোগের সিদ্ধি এক। পূজা অর্চনা করার সময়ও তাই, পূজা অর্চনা করাটা পথ তার ফল ঈশ্বর দর্শন, দুটো আলাদা। জ্ঞান আর ভক্তিতে তা হয় না। জ্ঞান আর ভক্তিতে সাধনার শুরু হয় ঐ জিনিসটা দিয়ে, সাধনা চলে ঐ জিনিসটা দিয়েই আর সিদ্ধি হয় ঐ জিনিসটাতেই। একজন ঠাকুরের ভক্ত বললেন, আমি ঠাকুরকে ভক্তি করব। এবার সে সাধনা শুরু করলেন। তিনি কি করছেন? ঠাকুরকে ভক্তি করে যাচ্ছেন। যখন সিদ্ধি হয়ে গেল তখন কি হবে? ঠাকুরের ভক্তি লাভ হবে। ভক্তি ছাড়া কোন অবস্থাতেই অন্য কিছু দেখছে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, জ্ঞানমার্গী বলে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। সাধনার সময় জ্ঞানী বিচার করে করে শুদ্ধ আত্মা ছাড়া যা কিছু আছে সব বাদ দিয়ে যাচ্ছে। আর যখন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন সে দেখবে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। জ্ঞান আর ভক্তির এটাই বিশেষত্ব, যেটা দিয়ে শুরু সেটা দিয়েই চলে আর সেটাতে গিয়েই শেষ হয়। সেইজন্য সাধনা আর সিদ্ধি এক, এই দৃষ্টিতে দেখলে পথ মাত্র দুটোতে গিয়ে দাঁড়ায়, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ।

জ্ঞান শব্দ আসে জ্ঞেয় ধাতু থেকে, যার অর্থ জানা। ভক্তি হয় ভজ্ ধাতু থেকে, যার অর্থ ভজনা করা। ভজ্ ধাতু থেকে অনেকগুলো অর্থ আসে, কাউকে সম্মান করা, কাউকে ভালোবাসা, কারুর সাথে যখন নিজেকে এক মনে করা, সবটাই ভজ্ ধাতু থেকে আসছে। এমনকি আগেকার দিনে ভক্ত শব্দ যখন ব্যবহার করা হত তখন তার অনেকগুলো অর্থেই ব্যবহার করা হত। যেমন রাজভক্তি, রাজাকে ভক্তি করা, তেমনি গুরুভক্তি, গুরুকে ভক্তি করা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সবার অর্থ সম্মান করা। কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তি শব্দের অর্থ সব সময় হয় ঈশ্বরের ভজনা করা। ভক্তি মানেই ঈশ্বরের ভজনা করা। সেইজন্য দুটিই পথ, ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ। জ্ঞানপথে তিনি দেখেন আমি সেই আত্মা, আত্মা মানে শুদ্ধ চৈতন্য, সর্বব্যাপী শুদ্ধ চৈতন্য। সর্বব্যাপী শুদ্ধ চৈতন্য ব্যতিরেকে যা কিছু আছে সবটাই বাদ, যে কোন জিনিস, যার সীমা আছে, সীমিত জিনিস মাত্রই বাদ। যেটা অসীম, অনন্ত তাকেই আমি ধরে রাখব, তার বাইরে আর কিছু থাকবে না। ভক্তিতে বলছেন, আমার ইষ্ট ছাড়া আমি কাউকে জানিনা। যদি আমার ইষ্টের বাইরে কিছু থাকে তার অস্তিত্ব আমার জন্য নেই। শেষ অবস্থায় জ্ঞানী দেখেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ভক্ত দেখেন তাঁর ইষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই। দুষ্টের মধ্যেও তাঁর ইষ্টকে দেখছেন, শিষ্টের মধ্যেও তাঁর ইষ্টকে দেখছেন। জ্ঞানী দেখেন আত্মার বাইরে যা কিছু আছে সবটাই নাম আর রূপের খেলা। উপনিষদ মূলতঃ জ্ঞানপথ আর ভক্তিপথের কথা আমরা এক এক করে আলোচনা করতে থাকব। আর যেমন যেমন সূত্রগুলো আসবে সেখানে তেমন তেমন জ্ঞান আর ভক্তির কোথায় কোথায় তফাৎ সেটাও আলোচনা করা হবে। আবার জ্ঞান আর ভক্তির কোথায় মিলন হয়, কোথায় কোথায় মিল সেটাও আলোচনা করা হবে। যাঁরা নিজের চিন্তা ভাবনাকে গভীরে নিয়ে যাননি তাঁরা জ্ঞান ও ভক্তিকে আলাদা দেখেন। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছেন তাঁরা জানেন জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। জ্ঞান আর ভক্তি এক কেন? আসলে তিনটে অস্তিত্ব, আমি, জগৎ আর ঈশ্বর। ঈশ্বরকে আমরা যে শব্দ দিয়েই পরিভাষিত করি না কেন, তাঁকে আত্মাই বলি, ভগবান বলি, ব্রহ্ম বলি, যাই বলি, যিনি এই জগতের পারে, যাঁকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। যখন সাধনা করা হয়, তা জ্ঞান পথেই যাক আর ভক্তি পথেই যাক, সাধনার শেষ উপলব্ধিতে আমিটা থাকে না, জীব থাকে না আর জগৎটাও চলে যায়। ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, জ্ঞানী দেখেন যা কিছু আছে সবটাই মায়া। মায়া মানে নাম আর রূপ, যদি নাম আর রূপকে সরিয়ে দেওয়া হয় তখন সেই বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দই থাকবেন, তিনি ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা

জ্ঞান আর ভক্তি এই দুটো আমাদের মূল গ্রন্থ বেদ থেকেই চলে আসছে। আমরা অনেক সময় ভাবি জ্ঞান ও ভক্তি পরে এসেছে, তা নয়। বেদের যত মন্ত্র আছে তার মধ্যে জ্ঞান আর ভক্তি দুটোই রয়েছে। বেদে যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগ মন্ত্রকেই একজন তাঁর ইচ্ছা মত জ্ঞানের দৃষ্টিতেও দেখতে পারেন, ভক্তির দৃষ্টিতেও দেখতে পারেন। জোর করে না, শাব্দিক অর্থেই দেখতে পারেন। যেমন বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ*, এর অর্থ হল, যিনি এই তিন জগতের স্বামী, সব কিছুর যিনি মালিক, তাঁকে আমরা প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি। এটাই জ্ঞান। এবার শুধু প্রার্থনা করা হচ্ছে, এই যে বলছেন, *ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমাদের প্রচোদিত করুন, এটাই প্রার্থনা হয়ে গেল। অথচ গায়ত্রী মন্ত্র জ্ঞানীদের মূল মন্ত্র। আবার অনেক ব্রাহ্মণরা এখনও স্নানের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে হাতে পৈতে ও জল নেয় গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন। এখানে ব্রাহ্মণরা সূর্য দেবতার প্রার্থনা করছেন, *ভর্গো দেবস্য ধীমহি*, হে সূর্য দেবতা আমি এতদিন যত পাপ করেছি সব পাপ নাশ করে দাও, আমাকে শুদ্ধ করে দাও। এটাই হয়ে গেল ধর্মাচরণ, প্রার্থনা করা। আবার এই একই মন্ত্রকে অন্য ভাবে অনেকে প্রার্থনা করছেন, *ভর্গো দেবস্য*, ভর্গো শব্দের আরেকটা অর্থ অন্ন। হে দেবতা আমাকে আরও অন্ন দাও, মানে টাকা-পয়সা দাও। গায়ত্রী মন্ত্রে কেউ যদি প্রার্থনা করে বলে, হে ঠাকুর আমাকে আরও টাকা-পয়সা দাও, তার আরও টাকা-পয়সা হবে। সূর্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করে যদি বলে আমার পাপ নাশ করুন, তার পাপ নাশ হয়ে যাবে। আর যদি ঠাকুর রূপে বলেন, হে ঠাকুর আমার বুদ্ধিকে তুমি প্রকাশিত করে দাও যাতে আমি তোমার দিকে এগোতে পারি, তখন এটাই জ্ঞানের মন্ত্র হয়ে গেল। এই জিনিস শুধু গায়ত্রী মন্ত্রেই হয় না, বেদে যত মন্ত্র আছে, সব মন্ত্রের কম করে দুটো তিনটে অর্থ করে প্রার্থনা করা যায়। গায়ের জোরে বলা হচ্ছে না, এখানে ভর্গোর অর্থ হয় অন্ন, ভর্গোর অর্থ হয় সূর্যের আলো আবার ভর্গের অর্থ

হয় জ্ঞানের আলো, একই ভর্গো শব্দের তিনটে অর্থ সেইজন্য মন্ত্রের তিনটে আলাদা অর্থ হয়ে যায়। বেদের প্রায় সব মন্ত্রকেই জ্ঞান আর ভক্তি দুটো দিয়েই অনায়াসে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। যেমন আছে *তদবিষ্ণুঃ পরমং পদং*, সেই বিষ্ণুর পরম পদ। সেটাকে কে দেখেন? বলছেন *সুরয়ঃ*, ঋষিরা যাঁরা তাঁরা দেখেন। বিষ্ণুপদ মানে বিষ্ণুলোক। আবার কঠোপনিষদেও বলছেন *পরমং পদম্*, এখানে পরম পদ হল আত্মজ্ঞানের অবস্থা। একই মন্ত্র বিষ্ণুলোকের নামেও হয়ে যেতে পারে, একই মন্ত্র জ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞান রূপেও নেওয়া যেতে পারে। আবার আছে *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে*, ইন্দ্র নিজের মায়া শক্তিতে অনেক রূপ ধারণ করেন। এখানে ইন্দ্রের বর্ণনা করছেন জ্ঞান রূপে, যিনি ইন্দ্র তিনি মায়ার শক্তিতে অনেক রূপ ধারণ করেন, যেমন ঈশ্বর মায়ার শক্তিতে সমস্ত সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। সেই ইন্দ্রকেই আবার ভক্তি করে অন্য এক মন্ত্রে বলছেন, *যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি*, হে ইন্দ্র! আমাদের ভয় থেকে রক্ষা করুন। একদিকে ইন্দ্রকে জ্ঞান রূপে নিচ্ছেন, সেই ইন্দ্রকেই ভক্তি করে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাতে ভয় থেকে মুক্ত হয়।

বেদের দেবতাদের দুটি রূপ, একটা রূপে তিনি আমাদের অভাব পুর্তি করেন বা কিছু জিনিস করে দিচ্ছেন, যেমন আমাদের ভয় দূর করে দিচ্ছেন, দুঃখ নিবারণ করছেন, অর্থের অভাব মিটিয়ে দিচ্ছেন। যখন এই দৃষ্টি নিয়ে পূজা করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি ভক্তি। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও তাঁকে যেন সীমিত করে দেওয়া হয়। আবার যখন সেই দেবতাকেই অনন্তের মুখোশ লাগিয়ে দেখা হয়, তখন এটাই অন্য একটা রূপ নিয়ে নেয়। ভগবানকে দুটো রূপে দেখা এই ভাব সব ধর্মে চিরদিনই ছিল। প্রথম রূপ হল, তাঁকে কামধেনু বা কল্পতরু বৃক্ষ রূপে দেখা যখন তাঁর কাছে আমরা অনেক কিছু চাইছি, তখন একটা সীমিত রূপ এসে যায়। *যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি*, হে ইন্দ্র দেবতা আমাদের মনের ভয়কে দূর করে দাও, ভক্তি রূপ নেওয়া হল। কিন্তু তার একটু আগেই জ্ঞানের রূপে বলছেন, ইন্দ্র নিজের মায়ার শক্তিতে অনেক রূপ ধারণ করেন। মায়া বলতে কোন জাদুকরী শক্তি না, একটা দিব্য শক্তি, ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি। বিখ্যাত মন্ত্র, *ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোরমুক্ষীয় মামৃতাৎ।।* বলছেন, *মৃত্যোরমুক্ষীয় মামৃতাৎ*, আমাকে অমৃতত্ব থেকে সরিয়ে নিও না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর, জগৎ থেকে রক্ষা কর, এটাই জ্ঞান। জ্ঞান কেন? কারণ এখানে আত্মার সাথে এক হতে চাইছেন, অমরত্ব পেতে চাইছেন। কিন্তু এটাই আবার মহামৃত্যুঞ্জয় জপ। বাড়িতে কোন বিপদ বা প্রচুর ঝামেলা যদি চলতে থাকে, তখন বলে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে সব কেটে যাবে। একই মন্ত্রকে জ্ঞান রূপেও নেওয়া যায় আবার ভক্তি রূপেও নিচ্ছে। বেদের বেশির ভাগ মন্ত্র এভাবেই চলে। তবে কিছু কিছু মন্ত্র আছে যেখানে বিশেষ ভাবে জ্ঞানের দিকেই নিয়ে যায়। আবার কিছু কিছু মন্ত্র পুরোটাই ভক্তির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে বেশির ভাগ মন্ত্রকেই জ্ঞান ও ভক্তি দুদিক দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। করা যায় না, বাস্তবিক করে থাকেন। বেদের মন্ত্র যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞ মানেই ফলপ্রাপ্তি। গায়ত্রী মন্ত্রও যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞ মানেই ফল। অথচ গায়ত্রী মন্ত্রে এখন ধ্যান করা হয়।

ভারতে ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাস

উপনিষদেও জ্ঞান আর ভক্তি নিয়ে প্রচুর আলোচনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমের দিকে শুধু প্রতীক উপাসনা কিভাবে হয় তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। উপনিষদ মূলতঃ জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়েছে, জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলে তার মধ্যে ভক্তির কথা নেই তা নয়। উপনিষদে অনেক মন্ত্র আছে যেগুলো মনে হবে এই মন্ত্র ভক্তিতেও কাজে লাগে। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, কথা চলছে আত্মজ্ঞানের উপর অথচ বলছেন আত্মা যাঁকে বরণ করেন, ভক্তির কথা এসে গেল। আবার বলছেন *ভয়াদাস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ*, ঈশ্বরের ভয়ে অগ্নি, সূর্য এরা কাজ করে, এখানেও ভক্তির কথা এসে যাচ্ছে। কিন্তু মূলতঃ উপনিষদ জ্ঞানপথের দিকেই নিয়ে যায়। আগে বলা হল মোটামুটি দুটি পথ জ্ঞান আর ভক্তি। ভক্তির কথা সেখানেই আসবে যেখানে দুটো সত্তাকে নিয়ে আসা হয়, আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা। কিন্তু জ্ঞানের পথে আত্মার সত্তা ছাড়া আর কিছুর সত্তা থাকে না। ভক্তির মূলই হল আমিত্বকে রাখা, আমার যে আমিত্ব এই আমিত্ব থাকাটাই ভক্তি। আমিত্বকে না রাখা হলে জ্ঞানপথ এসে যাবে। ঈশাবাস্যোপনিষদে প্রার্থনা করছেন, *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু*। আমরা এখানে একটা বই পড়ছি, ওখান থেকে চারটে বই দেখছি, এখানে ওখানে কিছু কথা শুনছি, সেখান থেকে আমাদের একটা ধারণা তৈরী হয় যে, জ্ঞান আলাদা জিনিস ভক্তি আলাদা জিনিস, কর্ম আলাদা জিনিস। কিন্তু তা নয়, রুটিন কিন্তু সবারই এক। কি রুটিন? সংসার আমার আর ভালো

লাগে না। আর তা নাহলে ব্রাহ্মণ পরম্পরাতে বা আর্য পরম্পরায় বড় হয়েছে, সেই পরম্পরার প্রভাবে অনেক কিছু করে করে একটা স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষের মনের গঠণ আলাদা আলাদা, কারুর এই পথ ভালো লাগে, কারুর ঐ পথ ভালো লাগে। ঐ ভালো লাগাতে কেউ হরিনাম করে নাচছে, কেউ বসে বসে গভীর চিন্তন করে যাচ্ছে, কেউ জপ করছে, কেউ পূজা করছে, এটাই তাদের সাধনা।

সেইজন্য পরের দিকে এসে বলছেন, মায়েদের যেটা স্বাভাবিক তা হল সংসার সামলান, সেখানেও যদি কোন মা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সংসারের সব কাজ করে, সেখান থেকেই তার জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। মহাভারতে কাহিনী আছে, আদর্শ গৃহিণী সংসারের কাজ করে তার জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে। মূল হল সংসারিপনা, সংসারের ভাবকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া, আমি আর জগৎ এই দুটো এমন ভাবে জুড়ে আছে যে এদের ছাড়াছাড়ি হবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু বলছেন, আমিকেও ফেলে দেওয়া আর জগতকেও ফেলে দেওয়া। কিন্তু মুখে বললেই তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। আমি যদি নিজের স্বরূপ একবার জেনে যাই তখনই এই জগৎ আমার কাছে বিষধর সাপ মনে হবে। জগতে আমরা যেটাকেই প্রিয় বলে মনে করছি, যে যেই হোক, স্ত্রী হোক, স্বামী হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক আসলে সবাই এক একটা বিষধর সাপ। কখন আমাকে ছোবল দেবে টেরও পাওয়া যাবে না।

এটা একটা নেগেটিভ সাইড, সে দেখছে জগতের সবাই এই রকমই। এটাকেই যখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখবে তখনও একই জিনিস হয়। তার যখন স্বরূপ জ্ঞান হয়ে যায় তখন তার দৃষ্টিটাই পাল্টে যাবে। জীব আর জগৎ এই দুটোর পেছনে যে ঈশ্বরীয় সত্তা, এই সত্তার যখন জ্ঞান হয়ে যায়, সেই জ্ঞান ভক্তিমার্গেই হোক আর জ্ঞানমার্গেই হোক, তখন জগৎ আর জীব এই দুটো তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। পজিটিভ সাইড দিয়ে দেখলে তখন দেখবে সব কিছু তো ঈশ্বরই হয়েছেন, তখন সে কার প্রতি লোভ করবে আর কার প্রতি হিংসার ভাব আসবে, সবই যখন ঈশ্বর তখন কাকে ভয় পাবে আর কাকেই বা ঘৃণা করবে। তার এখন জীবের সত্তা ও জগতের সত্তা দুটো সত্তাই খসে গিয়ে হয় শুধু ঈশ্বরের সত্তা থেকে গেল নয়তো আত্মার সত্তা থেকে গেল। উপনিষদ মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই নিয়েছেন, কিন্তু তাতেও ভক্তির ভাব থেকে গেছে। এর বিপরীত ভাগবত আদি গ্রন্থ ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়েই এগিয়ে গেছেন। সমস্যা হল, আমাদের কাছে ভক্তি মানে পূজা, অর্চনা, ভোগাদি, নাচগান ইত্যাদি, আসলে ওগুলো ভক্তি নয়। উচ্চমার্গের ভক্তির ধারণা করার ক্ষমতা এখনও আমাদের হয়নি। ভাগবত আসলে ঐ উচ্চমানের ভক্তিরই বর্ণনা করছেন, সেইজন্য মনে হয় যেন জ্ঞানের কথাই বলছেন। অনেক বলবেন এটা জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি আসলে একটা শব্দ মাত্র। হয় জ্ঞান নয়তো ভক্তি, ভক্তি মানে ঈশ্বরই আছে, সবটাই তাঁর আর জ্ঞান মানে আত্মাই আছেন, যা কিছু দেখছি সব নাম আর রূপের খেলা মাত্র, এর বেশি কিছু না। এই দুটোই ঠিক ঠিক পথ, কিন্তু এরপর দুটোকে মিলিয়ে নয়তো আরও কিছু এনে অনেক রকম পথের কথা বলতে থাকেন। পরে আমরা দেখব ভক্তিমার্গের যাঁরা বড় বড় দিকপাল মহাত্মারা ছিলেন তাঁরা পার্থক্য করার জন্য কিভাবে আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন। কিন্তু ভাগবতই ভক্তির মূল গ্রন্থ। আর ভাগবতের সাথে অন্যান্য যত পুরাণ রয়েছে সেখানে তাঁরা ভক্তির বিভিন্ন দিকগুলিকে নিয়ে বর্ণনা করেছেন। পরের দিকে অবশ্য মীরাবাঈ আদির সময় থেকে ভক্তির আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সেটাকে আরও crystalised করছেন। কিন্তু ভক্তির এই জিনিসগুলো চিরদিনই ছিল, বেদের সময় থেকেই চলে আসছে। গীতা দুটোকেই সমন্বয় করেছে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির কথা বলছেন কিন্তু অধ্যায়ের শেষের দিকে যে গুণগুলোর কথা বলছেন, এই গুণগুলো জ্ঞানীর গুণ। তেমনি অধ্যাত্ম রামায়ণও সমন্বয় করছেন, ঠাকুরও সমন্বয় করেছেন। ভাগবত কিন্তু সমন্বয় করেনি, ওনাদের কাছে ভক্তি মানে জ্ঞান আর ভক্তি একই, ওখানে সমন্বয় করার চেষ্টাটা নেই। ওনাদের কাছে মূল হল ভক্তি কিন্তু ভক্তি জ্ঞান রূপেই সামনে আসে। উপনিষদে শুধু জ্ঞানই আছে কিন্তু ওখানে বোঝা যায় যে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু গীতাতে এসে দুটোকে পরিষ্কার আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে। দেখানোর পর আবার দেখিয়ে দিচ্ছেন দুটো যেন একই। গীতার যুগ চলতে চলতে একটা সময় ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর জৈন এনারা এলেন। তখনকার ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাস খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। সেই সময় মূল গ্রন্থ রূপে আমরা যেটা জানি, সেটা হল মনুস্মৃতি। বাকি সব গ্রন্থ হয় তার আগেকার নয়তো পরের দিকে এসেছে। অনেক পরে এসে ভক্তির আন্দোলন আবার নতুন করে শুরু হয়। ভাগবতেই বলছেন ভক্তি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন, আমরা আজকে ভক্তি বলতে যেটা

বুঝি তার জন্ম যেন দক্ষিণ দেশে। সেইজন্য তাঁরা বেদের আশ্রয় নেন না, উপনিষদের আশ্রয় নেন না এবং গীতারও আশ্রয় নেন না। মূলতঃ ভাগবতের আশ্রয় নিয়ে চলেন। যাদের আমরা ভক্ত বলে জানি, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যারা, তারা বেদ উপনিষদের দিকে বেশি যায় না।

ভক্তি পথকে কেন্দ্র করে ব্যাসদেবের সময়ই চারজন ঋষির নাম আসে, নারদ, শাণ্ডিল্য, গর্গ ও পরাশর। এই চারজনের নাম নারদীয় ভক্তসূত্রেই এসেছে। এই চারজনকে ভক্তিমার্গের নামকরা ঋষি রূপে গণ্য করা হয়। দক্ষিণ ভারতেও কয়েকজন নামকরা ভক্তিমার্গের ঋষি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নামকরা হলেন আলোয়ার, নায়নার। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের যে খুব বেশি লোক ওনাদের কথা জানেন না বা পড়েন না। ভক্তি আন্দোলনের নামকরা ব্যক্তিত্ব হলেন একাদশ শতাব্দীর রামানুজ। এখান থেকেই ঠিক ঠিক ভক্তির আন্দোলন শুরু হয়। রামানুজের পরেই দ্বাদশ শতাব্দীতে আসেন নিম্বার্ক, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসেছিলেন মাধ্বাচার্য আর চতুর্দশ শতাব্দীতে ছিলেন বল্লভাচার্য। এনারাই ভক্তি আন্দোলনের ঠিক ঠিক স্তম্ভ। আর শেষ যিনি স্তম্ভ তিনি হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনে সত্যিকারের জোয়ার এনে দিলেন। এনাদের বাইরেও কয়েকজন আছেন যাঁদের মহাত্মা রূপে দেখা হয় কিন্তু ভক্তির স্তম্ভ রূপে দেখা হয় না, যদিও তাঁদের অনুগামীরা মানতে চাইবেন না। এরমধ্যে নামকরা হলেন কবীর, নানক, তুলসীদাস, জয়দেব, মহারাষ্ট্র থেকে তুকারাম ও জ্ঞানেশ্বর আর রাজস্থানে মীরাবাঈ, ভক্তি আন্দোলনে এনাদেরও প্রচুর অবদান।

ভক্তি মুভমেন্টে মাধ্বাচার্য দিলেন দ্বৈতবাদ দর্শন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছিল অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন, নিম্বার্কের দর্শন হল দ্বৈতাদ্বৈত, বল্লভাচার্যের দর্শনের নাম শুদ্ধাদ্বৈত আর রামানুজের বিখ্যাত দর্শনের নাম বিশিষ্টাদ্বৈত। এই কয়টি ভক্তির খুব নামকরা শাখা। এদের প্রত্যেকটি শাখার মধ্যে চিন্তা ভাবনায় কিছু কিছু তফাৎ আছে।

দেবর্ষি নারদের কথা

দেবর্ষি নারদ এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি হিন্দু ধর্মের সব শাস্ত্রেই ছড়িয়ে আছেন। বিশেষ করে পৌরাণিক সাহিত্যে নারদ এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন যে কোন কাহিনী বা ঘটনা যেন নারদ ব্যতিরেকে হতেই চায় না। যেখানেই সব কিছু শান্ত ভাবে চলছে সেখানেই নারদ গিয়ে কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে দেন। আর যেখানেই কোন গোলমাল লেগে আছে সেখানেই গিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাকে সুষ্ঠু ভাবে মিটিয়ে দিয়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরী করে দেন। এত জায়গায় এত ভাবে নারদের নাম আসে যে সেখান থেকে নারদ নামে কাউকে একটা একক ব্যক্তিত্ব রূপে দাঁড় করানো খুব কঠিন হয়ে যায়। যেমন ঋগ্বেদেই একজন ঋষির নাম আসে যাঁর নাম নারদ, তাঁর মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। বেদেরই একটা অংশ ব্রাহ্মণ, ঐতেরিয় ব্রাহ্মণে নারদের নাম আসে যিনি একজন নামকরা পূজারী। বেদ আর ব্রাহ্মণ দুটো জায়গাতেই নারদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও নারদের নাম এসেছে। সনৎকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র, সনৎকুমারকে নারদ একবার বলছেন, আমি বেদ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ সবই অধ্যয়ন করেছি কিন্তু আমার মনে শান্তি আসেনি। সনৎকুমার তখন নারদকে বলছেন, যতই তুমি বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করে যাও, তোমার আত্মজ্ঞান যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তোমার শান্তি হবে না। তারপর বলছেন আত্মাই উপরে, আত্মাই নীচে, এর উপর ছান্দোগ্য উপনিষদে খুব নামকরা মন্ত্র আছে। বেদে এক ঋষির নাম নারদ, ব্রাহ্মণে এক পুরোহিতের নাম নারদ, আর উপনিষদেও যখন নারদের নাম আসছে তখন তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ কেউ হবেন না, এমনিতে উপনিষদে নাম আসবে না। আরণ্যকে কোথাও নারদের নাম পাওয়া যায় না। পুরাণাদি সাহিত্যে নারদকে নিয়ে এত জায়গায় এই কাহিনী আছে আর এখনও এত কাহিনী তৈরী হয়ে চলেছে যে নারদের আসল পরিচয় বার করা অসম্ভব। পুরাণের কাহিনীকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে নারদের সাতটি আলাদা জন্ম ইতিহাস পাওয়া যাবে। সেইজন্য মনে হয় নারদ নামে আলাদা আলাদা অনেক চরিত্র ছিল, আবার মনে হয় একই লোক যেন বিভিন্ন মন্বন্তরে গিয়ে জন্ম নিচ্ছিলেন।

নারদের প্রথম নামকরা যে জন্মকথা পাওয়া যায় তাতে বলছেন ব্রহ্মার জঙ্ঘা থেকে তাঁর জন্ম। ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য নারদ একজন প্রজাপতি। পুরাণের কাহিনীতে আবার বলছেন ব্রহ্মার প্রথম সন্তান হলেন চারজন কুমার – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মা দীর্ঘ সময় তপস্যা করার পর সৃষ্টি কার্যে হাত দেন, তপস্যার হেতু সেই সময় ব্রহ্মার মন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ ছিল। চার কুমার জন্ম নেওয়ার পরেই সংসার

ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের মনে বৈরাগ্য এত প্রবল ছিল যে তাঁরা আর সংসার কার্যে মন দিতে পারলেন না। চারজন কুমার সংসার কার্য না করে তপস্যায় চলে যাওয়াতে ব্রহ্মার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এত কষ্ট করে এদের সৃষ্টি করলাম কিন্তু এরা কেউই আমার সৃষ্টি কার্যে সহায়তার জন্য এগিয়ে এলো না। এরপর ব্রহ্মা আরও কয়েকজনের জন্ম দিলেন, এনারা সবাই ছিলেন প্রজাপতি। নারদের জন্ম হওয়ার পর তাঁরও এমন বৈরাগ্য যে তিনিও বলে দিলেন আমি সংসার ধর্ম করব না। ব্রহ্মা তাতে খুব রেগে গিয়ে নারদকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যখন ঠিকই করেছ যে সংসার করবে না, তার মানে আমার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে দিলে তাই তুমি গন্ধর্বদের মধ্যে গিয়ে জন্ম নাও। ছিলেন প্রজাপতি হয়ে গেলেন গন্ধর্ব, তার মানে অনেক নীচু যোনিতে নেমে গেলেন। অপ্সররা নৃত্য করে আর গন্ধর্বরা গান-বাজনা করে, গন্ধর্ব বিদ্যা মানে সঙ্গীত বিদ্যা। গন্ধর্বলোকে জন্ম নিয়ে নারদ বীণা বাজানোটা শিখে গেলেন। নারদ যেখানেই যান সব সময় তাঁর হাতে বীণাটা ধরা থাকে আর বাজাতে বাজাতে নারায়ণ নারায়ণ গান করতে থাকেন। পিতার অভিশাপকে নারদ কাজে লাগিয়ে নিলেন। এটাই জীবনের মর্ম, জীবনে যখন বিষম পরিস্থিতি আসে যেটা আমাদের মনের মত নয়, সেটাকেও কিভাবে কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায়। নারদ সেটাকেই কাজে লাগিয়ে নিলেন। গন্ধর্বলোকে জন্ম নিয়ে তিনি সেখানে যে বীণা বাদনটা শিখে নিলেন, সেই বীণা এখনও তিনি বাজিয়ে যাচ্ছেন। এখন আমরা যেভাবে নারদকে দেখি তাতে নারদ অমর। পরম্পরাতে বলা হয় সা রে গা মা সাতটা শুরু প্রথমে শুধু গন্ধর্বদের কাছেই ছিল। নারদ এই সাতটা সুরকে শিখে নিয়ে বীণার উপর বাজাতেন। তিনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান, মানুষদের কাছেও যাতায়াত করতেন, সেই সময় তিনি মানুষদেরও সাতটা সুর শিখিয়ে দিলেন। বেদে তিন রকম উচ্চারণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, উদাত্ত, অনুদাত্ত আর স্বরিত আর সাম গানে তাতে ওটা পাঁচটা হয়ে যায়। কিন্তু নারদ সেখানে সাতটা নিয়ে এলেন। পরম্পরাতে বলা হয় যে আমরা যে সাতটা সুরের ব্যবহার করি এই সাতটা সুর নারদ গন্ধর্বদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। গন্ধর্বলোকে থাকতে থাকতে সঙ্গীত বিদ্যার সাথে তিনি নাট্য বিদ্যাটাও শিখে নিলেন, পরে তিনি এর নাম দিলেন নাট্যযোগ। আধ্যাত্মিক সাধনা রূপে তিনি নাট্যযোগকে মানুষের মধ্যে প্রচার করলেন। ভারতনাট্যমে এটাকেই শিল্পীরা সাধনা রূপে নেন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য। আমাদের যত রকম কলা আছে, গান, বাজনা, ছবি আঁকা, ভাস্কর, নৃত্য সবটাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়। আর্কিটেক্ট বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, যে বিদ্যাই হোক সব বিদ্যাই আমাদের কাছে ঈশ্বরোপসনা। নারদ দুটো জিনিস মানবজাতিকে দিলেন, একটা হল সঙ্গীত বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সপ্তসুর বলতে আমরা এখন যেটা জানি সেই সপ্তসুর নারদ নিয়ে এলেন আর তার সঙ্গে আনলেন নাট্যযোগ। নৃত্যকলাকে তিনি যোগ পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, যেখানে নৃত্যের মাধ্যমে সাধনা করে মানুষ সিদ্ধি পেয়ে যেতে পারে।

নারদকেও মাথা পেতে অনেক অভিশাপ নিতে হয়েছে। ব্রহ্মার সন্তান হওয়ায় নারদ নিজেও একজন প্রজাপতি ছিলেন। তিনি একবার দক্ষ প্রজাপতির ছেলেদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন – জগৎ অসার, জগৎ অনিত্য তোমরা ঈশ্বরের দিকে মন দাও। এতক্ষণ পর্যন্ত তাও ঠিক ছিল, কিন্তু নারদ তাদের শিবের উপাসনা করতে বলে দিলেন। দক্ষ প্রজাপতির আবার শিবের উপর প্রচণ্ড রাগ। দক্ষ প্রজাপতি খবর পেয়ে নারদকে বললেন, তুমি আমার ছেলেগুলোকে ঘরবাড়ি ছেড়ে ঈশ্বরের নাম করতে বলে দিলে? ঠিক আছে আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি তোমারও যেন কোন দিন ঘরবাড়ি না হয়। অভিশাপের কথা শুনে নারদ মহাখুশী। নারদের শেষ পর্যন্ত সত্যিই কোন ঘরবাড়ি হল না, সেই থেকে তিনি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ান। গীতায় ভগবান বলছেন *দেবর্ষীনাঞ্চ নারদঃ*, দেবর্ষি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ঋষিদের মধ্যে আমি হলাম নারদ। ব্রহ্মার অভিশাপে নারদ বীণা বাদন ও নাট্যবিদ্যাটা শিখে গেলেন আর দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে নারদের এই বর হয়ে গেল যে তিনি বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবাধে বিচরণ করে বেড়াতে লাগলেন। নারদের ঘুরে বেড়ানো নিয়ে একটা আলাদা উপনিষদই আছে, নারদ পরিব্রাজকোপনিষদ, যে উপনিষদের মূল বক্তব্য বৈরাগ্য। সব উপনিষদেরই বক্তব্য আত্মজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই উপনিষদে বৈরাগ্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আবার বাল্মীকি রামায়ণ শুরুই হয় এই শ্লোক দিয়ে *তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগবিদাং বরাম্*, বাল্মীকি যখন নারদের কাছে গেলেন তখন নারদ তপস্যা আর স্বাধ্যায়ে একেবারে ডুবে ছিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণ আর পরবর্তি কালে জনপ্রিয় যে রামকথাগুলো আছে সেখান থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে। একটা হল, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিরা একদিন জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে রত্নাকর ডাকাত তাঁদের আটকেছেন ডাকাতি করার জন্য। তখন নারদ মুনি রত্নাকরকে বলছেন, তুমি যে এই ঘৃণ্য পাপ করছ একবার বিচার করে দেখো তো তোমার এই পাপ কে নেবে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এই কাহিনী নেই, এই গল্প পরের দিকে কেউ বানিয়েছেন। ঈশ্বরের কৃপার কী মহিমা যে একজন ডাকাত থেকে ঋষি হয়ে যান, এটাকে দেখানোর জন্য এই কাহিনী বলা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে এই কাহিনী জায়গা করে নেওয়ার কোন সুযোগই নেই। অথচ পরে অধ্যাত্ম রামায়ণ এই কাহিনীকেই বিরাট করে বলা হয়েছে আর জনমানসেও ঢুকে গেছে যে রত্নাকরই ডাকাত থেকে বাল্মীকি হয়েছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ শুরু হয় নারদের এই বর্ণনা দিয়ে, তিনি তপস্যা আর স্বাধ্যায়ে ডুবে ছিলেন। এতে বোঝা যায় নারদ নামে কোন ঋষির দ্বারা বাল্মীকি প্রভাবিত ছিলেন। আর বাল্মীকি যাঁদের যাঁদের নাম তাঁর রামায়ণে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের কোথাও না কোথাও কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে হবে। বাল্মীকির নিজেরই এলাহাবাদের কাছাকাছি শৃঙ্গভেদপুর নামে এক জায়গায় আশ্রম ছিল। আশ্রমের আশেপাশে তখনকার দিনে যত ঋষিরা ছিলেন তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন ভরদ্বাজ মুনি, বিশ্বামিত্র মুনি, পরের দিকে এই নামগুলো গোত্র হয়েও দাঁড়িয়ে গেছে। বাল্মীকি ছিলেন কবি, কবিরা দেশ কালের সীমাকে পেরিয়ে যান। কবি তো আর ইতিহাস লিখতে যাবেন না। কিন্তু বাল্মীকি যত নাম উল্লেখ করেছেন কোথাও না কোথাও তাঁদের কিছু একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি অনেক ঋষিদের ইতিহাস পরম্পরাতে থেকে গেছে।

পৌরাণিক রীতি অনুযায়ী দেখা যায়, ভগবান বিষ্ণু যখনই সৃষ্টি করেন তখন তাঁর যে নিঃশ্বাস আসা শুরু হয় তার সাথে নারদেরও জন্ম হয়ে যায়। নারদের সব কিছুকে মিলিয়ে যদি দেখা হয় তখন একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ গভীরে গেলে নারদের তাৎপর্য কি। এটাকে নিয়ে আমরা পরে দেখব। নারদকে নিয়ে সব থেকে বেশি বর্ণনা ভাগবতে পাওয়া যাবে, ভাগবতে আবার নারদের দুটো আলাদা বৃহৎ বর্ণনা আছে। প্রথমটাতে নারদ নিজেই নিজের কাহিনী বলছেন, যেখানে তিনি দাসীপুত্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তারপর সর্প দংশনে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। নারদ খুব দুঃখে কাতর হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। সেই সময় কয়েকজন ঋষি মুনি তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়ে মন্ত্রজপাদি করতে বলেছিলেন। মন্ত্রজপ করে নারদ ভগবান বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। দর্শন দিয়ে ভগবান বিষ্ণু নারদকে বলে দিলেন, তোমার এখনও মনের সেই রকম শুদ্ধি হয়নি যে তুমি সব সময় আমার দর্শন পাবে। এই যে দর্শন তুমি পেলে এতে তোমার মনে আরও আকাঙ্খা জেগে উঠবে। এখন তুমি আমার এই রূপের ধ্যান করতে থাক, তারপর আবার তোমার দর্শন হবে। এরপর নারদ ঐ রূপের ধ্যান করতে থাকলেন। ধ্যান করতে করতে তাঁর মৃত্যুর সময় হয়ে গেল। এবার তিনি মারা যাওয়ার পর আবার যে জন্ম নিলেন তখন তিনি ঠিক ঠিক ভগবানের ভক্ত হয়েই জন্ম নিলেন। বেদে নারদের নামে এসেছে, ব্রাহ্মণে এসেছে, আরণ্যকে কোন উল্লেখ নেই, উপনিষদে এসেছে আর নারদ পরিব্রাজকোপনিষদ তো ওনার নামেই, ছান্দোগ্য উপনিষদে ওনার নাম আছে। সেখান থেকে বাল্মীকি রামায়ণে রীতিমত তাঁর নাম পাই, মহাভারতেও অনেক জায়গায় আসছেন, যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিচ্ছেন। আর পুরাণে গভীর ভাবে নারদের নাম ছড়িয়ে আছে। কোন কাহিনী নেই যেখানে নারদ না এলে কাহিনী এগোবে এই রকম হবে না।

নারদ শব্দ এসেছে নার ধাতু থেকে। নার শব্দের অর্থ জ্ঞান আর দ মানে যিনি দেন, নারদ শব্দের অর্থ হল যিনি জ্ঞান দেন। এই জ্ঞান হল ঈশ্বর অভিমুখী করার জ্ঞান। যেমন নারদ রত্নাকরকে উপদেশ দিলেন রাম মন্ত্র জপ করতে, এটা অবশ্য কাহিনী। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ যেখানে শুরু হয় সেখানেই নারদ বাল্মীকিকে বললেন, তুমি রামকথা রচনা করা। বাল্মীকি বুঝতে পারছেন তাঁর মধ্যে সৃজনী প্রতিভা জেগে উঠেছে, তখনই নারদ বললেন তুমি রামকথা লেখা শুরু কর। এই যে নারদ রামকথা লেখার উপদেশ দিলেন, এটাই নারদের অর্থকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। নারদ মানেই তাই, যিনি উপদেশ দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে এমন কিছু একটা করে দেন যার উদ্দেশ্য হল তাকে ভগবানের দিকে ঠেলে দেওয়া। মহাভারতে আবার অন্য ভাবে আমরা নারদের ভূমিকা দেখছি, সাবিত্রীকে তিনি সত্যবানকে বিবাহ করতে নিষেধ করছেন, কারণ এক বছরের মধ্যে সত্যবান মারা যাবে। ঐ যে সাবিত্রীকে আগাম জানিয়ে দিলেন, তারপরেই সাবিত্রী একটি বছর ধরে শুধু সাধনা করে

গেলেন। সাবিত্রীর সাধনা হল, একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীর সেবা, শ্বশুড় শাশুরীর সেবা করে করে পতিধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, আর সাবিত্রী এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যবানকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী সবারই জানা।

আরেকটা পৌরাণিক কাহিনীতে আছে নারদকে একবার পোকা হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল। এক রাজা রথে করে যাচ্ছিলেন, রথ থেকে রাজা দেখছেন পোকাটা প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে রাজা খুব জোর হেসে ফেলেছে, এই একটা ছোট্ট পোকা তার আবার এত প্রাণের মায়া। নারদ তখন রাজাকে বলছেন, হে রাজা! আত্মা যখনই কোন শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে সেই শরীরকে আপন মনে করে তার সাথে পুরো একাত্ম হয়ে জড়িয়ে যায়। আত্মার চৈতন্য শরীরের সাথে জড়িয়ে যাওয়াতে সে তখন যে করেই তার শরীরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। যে যত নিম্ন যোনির জীব তার শরীর তত ক্ষুদ্র, ঐ ক্ষুদ্র শরীরের চেতনা খুব কম হওয়ার জন্য শরীরটা তার কাছে অতি প্রিয়। মানুষ যে মাছ মারছে, মুরগী কাটছে আমরা মনে করছি ওরা কোন প্রতিরোধ করে না। কিন্তু সেই সময় তাদের ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওরাও প্রাণ যাওয়ার সময় অনেক বেশি ছটফট করতে থাকে। কারণ ওদের নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটা অনেক বেশি। মানুষও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু আবার মানুষ প্রাণ দিয়ে দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকে। মনুষ্যতের প্রাণীরা কোন পরিস্থিতিতেই প্রাণ দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে রাজার মনে হল এই পোকা তো বিরাট জ্ঞানী। নারদ চিরদিনই জ্ঞানী। ওনারও অনেক রকম জন্ম হয়েছে কিন্তু জ্ঞান তাঁর কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায়নি। নারদকে অভিশাপ দিক আর যাই দিক উনি উপদেশ ও জ্ঞান দিতেই থাকেন।

দুর্বাসা মুনি বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন, তাঁর প্রচুর স্বাধ্যায় তপস্যাদি করা ছিল, তার সাথে তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের একটা বিরাট পুটলি ছিল। একবার দুর্বাসা মুনি শিবলোকে গিয়ে শিবের পাশেই তাঁর আসনে বসে গেছেন। সেই সময় শিবলোকে নারদ এবং আরও অনেক উপস্থিত আছেন। সবাই অবাক। কি ব্যাপার হল! একেবারে শিবের পাশে তাঁরই আসনে গিয়ে বসা! দুর্বাসা মুনি শিবকে বলছেন, আপনি তো আমার দাদা, আমার ভাই। কী করে আমি তোমার দাদা? আপনি বিষ্ণু ভক্ত আমিও বিষ্ণু ভক্ত, আমরা তো গুরুভাই, আপনার আসনে বসতে দোষ কি! নারদ সব কাণ্ড দেখে খুব রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে বলছেন, আপনার অবস্থা একটা গাধার মত যে পিঠে কতকগুলি পুস্তক বয়ে বেড়াচ্ছে। গাধার পিঠে যদি বইয়ের বোঝা থাকে, বইতে কি আছে তাতে গাধার কিছু আসে যায় না, তার কাছে বোঝাটাই আসল। আপনি যত বেদ উপনিষদ পড়েছেন, যত জপধ্যান করেছেন এতে আপনি একটা গাধার মত হয়ে গেছেন, যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কোন প্রভাব তার মধ্যে পড়েনি। দুর্বাসা মুনি স্বভাবেই ক্রোধী, রাগে সবাইকে তিনি ভস্মই করে দেন। নারদের কথা শুনে তিনিও প্রচণ্ড রেগে গেছেন। নারদ তখন বলছেন, বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করে, সাধন-ভজন করে আপনার মধ্যে যদি বিনয় না এসে থাকে, অপরকে সম্মান দেওয়ার শিক্ষা যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেই বিদ্যা কিসের বিদ্যা! তাহলে আপনার আর গাধার মধ্যে তফাতটা কোথায় থাকল? তখন দুর্বাসা মুনির মনে সেই চেতনাটা এসে গেল, যে চেতনাতে তিনি নিজের ভুলটা ধরতে পারলেন।

নারদের খুব নামকরা একটা ভূমিকা নেওয়ার কথা আমরা পাই, তা হল ব্যাসদেবকে ভাগবত রচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। মহাভারত রচনা করার পর ব্যাসদেব খুব বিষন্ন মনে ছিলেন, কোন কিছুতে মন দিতে পারছিলেন না, মূল কথা তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। নারদ ঘুরতে ঘুরতে সেই সময় ব্যাসদেবের কাছে গেছেন। দেখছেন ব্যাসদেবকে কেমন বিষণ্ন লাগছে। ব্যাসদেবকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার। ব্যাসদেব বললেন আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। নারদ তখন ব্যাসদেবকে কয়েকটি সুন্দর কথা বললেন। এখানে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের যত ইতিহাস পুরাণ অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত এবং যত পুরাণ আছে আর এগুলোকে আধার করে যত কাহিনী আমরা শুনে আসছি, এগুলো কখনই কোন ঘটনা নয়। সব কাহিনী হল সেই লেখক বা কবি বা ঋষি তাঁর দৃষ্টিতে জিনিসটা ঠিক যেমন হওয়া উচিত, তার বর্ণনা। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গেলেন যুদ্ধ করার জন্য, যুদ্ধে বিজয় প্রাপ্তির জন্য তিনি শক্তি পূজা করবেন। শক্তি পূজা করার জন্য একজন ব্রাহ্মণ দরকার। লঙ্কায় ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে। তখন রাবণকে অনুরোধ করা হল, রাবণ এসে শক্তি পূজা করে দিল। অন্য কাহিনীতে বলে, শিবলিঙ্গ স্থাপনা করবেন, ওটা করার জন্য একজন ব্রাহ্মণ দরকার। রাবণ ব্রাহ্মণ ছিল, তখন রাবণ এসে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে দিয়ে গেলেন। তিনি যুদ্ধ করবেন, অস্ত্র ধারণ করবেন কিন্তু

ব্রাহ্মণের পূজা করার কর্তব্যটা ছেড়ে দেননি। তবে এই কাহিনী বাল্মীকি বা অধ্যাত্ম রামায়ণে কোথাও নেই। তাহলে এই ঘটনা কি সত্যি না মিথ্যা? সবটাই সত্যি। কেন সত্যি? বাল্মীকি রামায়ণ যেভাবে রামের চরিত্র চাইছিলেন সেইভাবেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর উনি কি দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন কি হচ্ছে? আমরা বলে দিতে পারি তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাহলে উনি যদি দিব্য দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাহলে পরের কবির কেন দিব্য দৃষ্টি হবে না? তাঁরাও দিব্য দৃষ্টিতে পরের ঘটনাগুলো দেখেছেন। মিনিটে মিনিটে কি ঘটেছে পুরোটা বাল্মীকি তো রচনা করেননি, বাকিটা অন্যরা লিখেছেন। আর যদি খুব যৌক্তিকতা নিয়ে দেখা হয়, তাহলে বাল্মীকি দেখছেন জিনিসটা কেমন হওয়া উচিত, সেটাকেই তিনি পরে তাঁর রামায়ণে রচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। পরের দিকে কবিরাও ঠিক তাই করছেন, জিনিসটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত। তিনি দেখছেন, শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, তিনি পূজা না করে যুদ্ধ কার্যে নামবেন না। সেইজন্য তিনি শিবের পূজাই হোক, শক্তির পূজাই হোক করছেন। পরে হিন্দী সাহিত্যের খুব নামকরা কবি নিরালা রামের শক্তিপূজার উপর খুব বিখ্যাত কবিতা রচনা করলেন, রামকি শক্তিপূজা। সেখানেও কবি একটা বিরাট কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। নিরালা কি দেখছেন? জিনিসটা যেমন হওয়া উচিত সেটাই তিনি দেখছেন। তিনি দেখছেন শক্তি পূজা, শক্তি পূজায় দরকার ব্রাহ্মণ। ছিলেন তো রাম আর লক্ষ্মণ আর তাঁদের সাথে হনুমান, বানর, ভল্লুক, পূজাটা করাবেন কাকে দিয়ে? রাবণকে ডেকে আনা হোক। এটা হল একজন কবি দেখছেন, আর how it should be, আমাদের কোন গ্রন্থই বলছেন না how it was। এনারা প্রথমেই বর্ণনা করেন how it should be। সেইজন্য আমরা যতগুলো কাহিনী বলেছি কোনটাই বলেননি, কিন্তু ঋষিরা যে বর্ণনা করছেন এটা হল how it should be। যদি কোন চরিত্র থাকে যিনি সারা জগতে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাহলে তাঁর নাম হবে নারদ। তিনি সর্ব অবস্থায় সব কিছুরই শিক্ষা দেবেন। যখন পোকামাকড় হয়ে জন্মাচ্ছেন তখনও তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন।

নারদকে নিয়ে চারিদিকে কত কাহিনী, ঠাকুরও নারদকে নিয়ে একাধিক কাহিনী বলছেন। যেমন একটা কাহিনীতে বলছেন বিষ্ণু আর নারদ সব সময় একসাথে চলেন, একবার ভগবান বিষ্ণুর খুব তৃষ্ণা পাওয়াতে তিনি নারদকে জল আনতে পাঠালেন, যে কাহিনীতে ভগবান নারদকে মায়ার ব্যাপারটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর গুবড়ে পোকাকে বৈকুণ্ঠ ধামে নিয়ে যাওয়ার কাহিনী। নারদ শুধু শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছেন, এই কাহিনী গুলো আমরা পুরাণেই পাই। কিন্তু নারদের শিক্ষার মূল ভাব ছিল আত্মার অমৃতত্ব ভাব বা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার ভাব। যেখানেই শান্তি সেখানেই তিনি একটা ঝামেলা লাগিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে দিচ্ছেন, যেখানে ঝামেলা সেখানে সব মিটমাট করে শান্তি নিয়ে আসছেন। আবার একটা মজার কাহিনী আছে। একবার নারদ ভগবান বিষ্ণুকে গিয়ে বলছেন, আমি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অহল্যার রূপ লাবণ্যের এমন প্রশংসা করেছি যে, ইন্দ্র অহল্যাকে না নিয়ে আর থাকতে পারল না। গৌতম মুনির স্ত্রী ছিলেন অহল্যা। ভোর রাত্রে গৌতম মুনি নদীতে স্নান করতে গেছেন, সেই সময় ইন্দ্র গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে অহল্যার শয্যায় ঢুকে পড়েছে। অহল্যা বুঝে গেছেন ইনি দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁরও দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আমাকে চাইছেন, আমি তাঁর সঙ্গ পাচ্ছি এই অহঙ্কার হয়ে গেছে। নারদ বলছেন এই গোলমালটা আমিই পাকিয়েছি। আরও আছে, নারদ বলছেন আমি দক্ষের কাছে শিবের এত প্রশংসা করেছি যে দক্ষের মনে জ্বালা উৎপন্ন হয়ে গেছে, যেখান থেকে দক্ষ শিবকে এমন অপমান করল, যার ফলস্বরূপ এই দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আর আমি ভগবান বিষ্ণুর বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর কাছে ভূ দেবীর এত প্রশংসা করেছি যে, ওনাদের দুজনের ঝগড়া আর মিটতেই চাইছে না। আবার কংসের মনে শ্রীকৃষ্ণের এত ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি যে সে সব শিশুকে বধ করতে শুরু করে দিল। রাবণকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম তার মত শক্তিমান ত্রিলোকে নেই, যার জন্য সে সীতাকেই অপহরণ করার দুঃসাহস করে ফেলল। বিষ্ণু সব শুনে বলছেন, নারদ! তুমি এত গোলমাল কেন পাকাও? নারদ উত্তরে বলছেন, গোলমাল পাকানো আমার উদ্দেশ্য নয়, আসলে আমি এদের পরীক্ষা নিই, এই দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছে, দেব জন্ম পেয়েছে, চেতনা পেয়েছে, তাতেও যদি আপনার প্রতি প্রেম, ভক্তি না হয় তাহলে সবটাই বৃথা হয়ে যাবে। আমি তাই টোপ ফেলে ফেলে দেখি এদের মধ্যে একটুও ঈশ্বর প্রীতি আছে কিনা। কারণ ঈশ্বর প্রীতি যদি থাকে, আপনার প্রতি যদি ভক্তি থাকে তাহলে এরা এই ধরণের ভুল কাজ করবে না যে ভুল কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে। এই ইন্দ্রকেই দেখুন, ইন্দ্র এত বড় পদ পেয়ে গেছে কিন্তু তাও আপনার প্রতি তার প্রীতি নেই, প্রীতি যদি থাকত তাহলে কখনই সে কামুক পুরুষের প্রতি মুনির স্ত্রী অহল্যার দিকে কাম ভাব নিয়ে যাবে না। রাবণ বলুন, দক্ষ বলুন

যেখানে যত কাহিনী আছে সব শোনার পর বিষ্ণু খুব হাসছেন। এগুলো কাহিনী ঠিকই, কিন্তু আমরা বারবার বলছি এটা হল how it should be। তুমি এই দুর্লভ জন্ম পেয়েছ, এই জন্মকে যদি ভক্তি লাভের দিকে বা আত্মজ্ঞান লাভের দিকে কাজে না লাগাতে পার, আত্মোন্নতির দিকে না লাগাতে পার তাহলে তোমার এই জন্মটা তো বৃথা চলে গেল। নারদ শুধু এই জিনিসটার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এত সব কাণ্ড করে বেড়াতেন। নারদকে নিয়ে এত যে কাহিনী বলা হল, নারদের ব্যাপারে আরও যা কিছু আমরা শুনি বা জানি, এর সব কিছুকে বিচার করে বলা হয় নারদ ভগবানের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। সেইজন্য এই যে ভক্তিশাস্ত্র, যা নারদীয় ভক্তিসূত্র নামে বিখ্যাত, এই গ্রন্থ রচনা করার অধিকার একমাত্র নারদেরই আছে।

নারদের উপর পরের দিকে আমাদের পরম্পরাতে কয়েকটি নামকরা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল নারদপঞ্চরাত্র, এটি বৈষ্ণবদের বিখ্যাত গ্রন্থ। আরেকটি হল নারদ-সংহিতা, মনুসংহিতার মতই নারদ-সংহিতা। নারদ ভক্তিসূত্র তো আমাদের মূল আলোচ্য গ্রন্থ। আগে নারদ পরিব্রাজকোপনিষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাথে আরেকটা আছে নারদ পুরাণ, আসলে এটা উপপুরাণ। সঙ্গীতমকরন্দ নামে একটি বই আছে, বলা হয় এটিও নারদের রচনা। যখন তিনি গন্ধর্বলোকে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি সঙ্গীত বিদ্যা পেয়েছিলেন সেটাই এই গ্রন্থে রেখেছেন। তবে নারদপঞ্চরাত্র আর নারদীয় ভক্তিসূত্র এই দুটো গ্রন্থ খুব প্রসিদ্ধ। নারদীয় ভক্তিসূত্র নারদের ঠিক ঠিক নিজের রচনা নয়, তৎকালীন ঋষি মুনিদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভক্তি নিয়ে যে ভাবগুলো প্রচলিত ছিল, সেই ভাবগুলোকেই নারদ গুছিয়ে একটা গ্রন্থের মধ্যে সংকলন করেছেন।

সূত্র কি, সূত্রের প্রচলন কিভাবে এসেছে

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ নারদীয় ভক্তিসূত্র। গ্রন্থের নামের সাথে সূত্র শব্দটি জড়িয়ে আছে। সূত্র মানেই এটি original কাজ নয়। যে কোন গ্রন্থের নামের সাথে যদি সূত্র লেখা থাকে তার মানে এটি মৌলিক কাজ নয়। ভারত নিজেকে পুরোপুরি ধর্মে উৎসর্গীকৃত করে দিয়েছিল। ভারতের মূল ধর্ম হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ হল বেদ। বেদে অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো খুব সংক্ষেপে দেওয়া আছে, আর কিছু কিছু জিনিসকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। যেমন এর আগে দেখানো হল গায়ত্রী মন্ত্রকে কিভাবে তিন রকম ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যান্য বড় পণ্ডিতরা আরও অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। মানুষ প্রার্থনা তিনটে কারণে করে। একটা হল আমার ইহকাল যেন ভালো থাকে, টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি সবটাই ইহকালের জন্য। দ্বিতীয় প্রার্থনা করে পরকালের জন্য, মৃত্যুর পর আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি বা আরও ভালো কোন লোকে যেতে পারি। তৃতীয় প্রার্থনা হয় ইহকাল পরকালের পারে অর্থাৎ মুক্তির জন্য। গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে তিনটে প্রার্থনাই করা যায়। একই মন্ত্রকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তন্ত্র আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। তন্ত্র বলে দিল, ব্যাখ্যার কোন দরকার নেই, তোমার সঙ্কল্প যেমনটি হবে ফলটাও তেমনিই হবে। তন্ত্রের যে কোন একটা মন্ত্রকে নিয়ে সে যে কোন সঙ্কল্প করুক, আমাকে অমুক লোক অনেক ক্ষতি করতে চাইছে, এবার আমি যদি সঙ্কল্প করে নিলাম, লোকটি আমাকে খুব জ্বালাতন করছে, ওর ঠ্যাঙ খোড়া হয়ে যাক, এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি যদি ঐ মন্ত্র জপ করতে থাকি, কয়েক দিনের মধ্যে তার এমন কিছু একটা হয়ে যাবে যে তার হাঁটাচলাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর সঙ্কল্প যদি করি, মা! আমি অনেক পাপ করেছি, আমার সব পাপ যেন কেটে যায়। তাতেই সব পাপ কেটে যাবে। আর যদি সঙ্কল্প করে, মা! তোমার পাদপদ্মে আমার যেন ভক্তি হয়, আমার আর কিছু লাগবে না। তাতেই হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়ে যাবে। তন্ত্রে আবার কোন ব্যাখ্যা করাও হচ্ছে না। তাহলে বেদ আর তন্ত্র দুটোর মধ্যে মিল কোথায়? গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা যদি পাল্টে যায় তাহলে তার উদ্দেশ্য বা ফল পাল্টে যায়। তন্ত্রে এসে বলছেন, তোমার ওটা করারও দরকার নেই, তোমার ভেতরে যেমন ভাব, তোমার যেমন সঙ্কল্প সেটাই ফল দেবে। অর্থ হল, ঈশ্বরের যে রূপকে নিয়ে এগোবে ফলটাও তার সেই রূপেই আসবে। গীতায় ভগবান বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*, যে আমাকে যে ভাব নিয়ে, যে রূপে ভজনা করবে তাকে আমি ঐ রূপেই দিই।

বেদে রূপটুপের কোন ব্যাপার নেই। মন্ত্রে এই শব্দ রয়েছে, এই শব্দের এই অর্থ হবে। সেইজন্য বেদ খুব উচ্চ তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক। বেদের মত অন্য কোন শাস্ত্র এই রকম যৌক্তিকতা নিয়ে চলে না। বেদে অমুকে এই বলেছে, তমুকে তাই বলেছে এসব বলার কোন সুযোগ নেই। এই শব্দ আছে, এই শব্দের এই এই অর্থ

হয়, তুমি যে অর্থকে আধার করে এগোবে সেই অনুসারেই তোমার ফল আসবে, তুমি যেমন খুশি কল্পনা করে নেবে, সঙ্কল্প করে নেবে, ওসব বেদে একেবারেই চলবে না। পরের দিকের ঋষিরাও দেখলেন বেদের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগই নেই। তবে উপলব্ধির ব্যাপার যেখানে আসবে সেখানে বেদের বাইরে যাবে, কারণ ওখানে কোন অর্থের বিন্যাস নেই। যিনি অনেকদিন গীতার অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, তিনি গীতার বাইরে যেতে পারবেন না, কিন্তু যিনি গীতার সত্যকে উপলব্ধ করেছেন তিনি তো গীতাকেই ছাড়িয়ে গেলেন। ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বেদ বেদান্তকে কী করে ছাড়িয়ে যাবেন? বেদের পরিভাষায় হল জ্ঞান, তাহলে ঠাকুর যেটাই দেখছেন তার মানে জ্ঞানের পরিভাষাতেই আছেন, তার বাইরে গেলে বেদ আর বেদান্তের পরিভাষাই পাল্টে যাবে। অর্থটা হল, বেদ বেদান্ত যা বলছেন পুরোটাই তাত্ত্বিক, তাত্ত্বিক এই অর্থে যে বাকি লোকের কাছে। দিল্লীর উপর যত বই আছে সব পড়ে নিয়েছে, কিন্তু একবার দিল্লীতে একটা চক্কর দিয়ে দেওয়ার পর তার যে দিল্লীর জ্ঞান হবে সেই জ্ঞান দিল্লীর উপর যত বই আছে সব বইয়ের জ্ঞানকেই ছাড়িয়ে যাবে। আর যে দিল্লীতেই থাকে, তার যে দিল্লীর জ্ঞান, যত ভালো বই হোক ঐ জ্ঞানের থেকে ভালো হবে না। এই অর্থে ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে।

ঋষিরা বেদ বেদান্তে যা কিছু দিয়ে গেছেন এর বাইরে কোন ভাবেই যাওয়া যাবে না। এনারা এক একটা অঙ্গকে নিয়ে চলেন। এর আগে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, জ্ঞানীকে না হয় আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। এর সাথে আছে যাদের সংসার আর ভালো লাগে না। যাঁরাই শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন এনারা সবাই এই শ্রেনীর। সংসার যদি ভালো লাগে তাহল কেন কষ্ট করে, পয়সা খরচ করে এখানে শাস্ত্র কথা শুনতে আসবেন, কোথাও তাঁদের ভেতরে সংসারের প্রতি একটা বিরক্তির ভাব এসেছে। স্বামী মাধবানন্দজী সাধুদের নামে বলতেন, সব বিএ, এমএ পাশ আর বলছে কিনা ভিক্ষা করে খাবে, মাথায় গণ্ডগোল না থাকলে কেউ এই রকম করতে যায়! কারণ সংসারের পাঁকে থাকাটাই মানুষের স্বাভাবিক, পাঁকের বাইরে যারাই বেরিয়ে আসছে তারাই অস্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষে যেটা করা হয়েছিল সেটা কোন দেশে, কোন সমাজে কোন দিন করা হয়নি, তা হল তুমি যে বংশে জন্ম নিয়েছ তোমাকে সেই বংশের কাজই করতে হবে। যেমন, তুমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছ, তুমি সম্পত্তির কথা ভুলে যাও, সুখের কথা ভুলে যাও; তোমাকে এখন শুধু বেদ অধ্যয়ন, বেদ মুখস্ত করা, পূজা করা, যজ্ঞ করা, ধ্যান করা এর মধ্যেই থাকতে হবে, এর বাইরে তোমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু বংশে যদি কেউ খুব প্রতিভাবান এসে গেলেন, প্রতিভাবান তো সব সময় আসবে না, চার প্রজন্মের পর একজন প্রতিভা সম্পন্ন এল, সেই প্রতিভাবান পুরুষ এখন দেখছেন আমি বাড়িতে যা পড়েছি, যা শিখেছি, এর সব কিছুকে আমি পেরিয়ে এসেছি, এসবের থেকে আমি আরও উচ্চাবস্থায় চলে এসেছি। এখন তিনি করবেন? তখন তাঁরা একটা জিনিসকে নিয়ে বেশি চর্চা করতেন, যদিও সবটাই জানতেন। এই ভাবে আবার বেদের বাইরে অনেক সাহিত্য দাঁড়িয়ে গেল। তার মধ্যে ষড়দর্শন খুব নামকরা। যেমন কপিল মুনি বলছেন সাংখ্য তত্ত্বটাই সত্য। ঐ সাংখ্য তত্ত্বকেই যোগীরা আবার অন্য ভাবে modify করছেন। নৈয়ায়িকরা বেদকে আধার করেই ঈশ্বর তত্ত্ব বা সত্যকে আরেক রকম দেখছেন। বৈশাষিকরা আরেক রকম দেখছেন, মীমাংসকরা আরেক রকম দেখছেন আর বেদান্তীরাও আরেক ভাবে দেখছেন। এনারা যে জিনিসগুলি লিখে দিয়ে গেলেন, অনেক সময় লিখতেনও না, শিষ্যদের বলে দিয়ে যেতেন। শিষ্যরা সেগুলোকে আবার মুখস্ত করে রাখতেন। মুখস্ত করে তো রাখতেন, কিন্তু তাঁরা মারা গেলে তখন কি হবে! তাহলে তো বিদ্যাটাই লোপ পেয়ে যাবে। তখন কিছু কিছু খুব প্রতিভাবান ঋষি ঐ জিনিসটাকে গহন অধ্যয়ন করে ওটাতেই জীবনটা দিয়ে দিলেন। এনারাই পুরো জিনিসটাকে একটা ফরমুলা রূপে লিখে দিতেন। এরপর ঐ বিষয়টাকে মনে রাখা অনেক সহজ হয়ে গেল। তখনকার দিনে ছাপার ব্যাপার ছিল না, বড় বড় সব পাণ্ডুলিপি থাকত। এই ফরফুলাতে লেখার জন্য অত পাণ্ডুলিপিও আর পড়তে হত না। ফরমূলাটাই সূত্র, ঐ কটি সূত্রকে যদি মুখস্ত করে রাখা হয় তাহলে তিনি জিনিসটাকে জেনে গেলেন। এইভাবে সূত্র কয়েক প্রজন্ম ধরে চলতে থাকল, কিন্তু ইতিমধ্যে আসল বইটাকে লোকেরা ভুলে গেলেন। ঠাকুরের কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলী পুরোটাকে আগাগোড়া অধ্যয়ন করে একজন কোন প্রতিভাবান মহারাজ দুশো কি তিনশ সূত্রে পুরোটাকে কোডিফাইড করে দিলেন। এবার এই সূত্রগুলোই সবাই মুখস্ত করে চলে গেছেন, মাঝখান থেকে আসল বইগুলো আর থাকল না। এরপর দুশো তিনশো বছর পর যখন কোন কথা উঠবে তখন লোকেরা confused হয়ে যাবে এই সূত্রে ঠিক

কি বলতে চাইছেন। সূত্রের সমস্যা ছিল, যত কম শব্দ হতে পারে তত কম শব্দ ব্যবহার করা হত আর তার যেন অর্থের এদিকে ওদিক না হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্তকরণের জন্য সমস্যা হয়ে গেল, সূত্রের অর্থ জানা না থাকলে তার কোথাও না কোথাও গোলমাল লেগে যাবে। এইভাবে দুশো তিনশো বছর চলল। এরপর সূত্রগুলো থেকে গেল কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা হারিয়ে গেল। আবার কোন প্রতিভাবানকে আসতে হবে, আর তাঁর বেদের সম্পূর্ণ জ্ঞান, বেদের মূল দর্শন তাঁর নখদর্পণে থাকতে হবে, এবার তিনি সূত্রগুলোকে নিয়ে নতুন করে লিখলেন। তার মানে এর জন্য কতগুলো ধাপ এসে যাচ্ছে।

যে ছটি দর্শনের কথা বলা হল, এই ছয়টি দর্শনেরই সূত্র রয়েছে। যেমন বেদান্ত দর্শনের সূত্রের নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্যাসদেব এত কাজ করলেন, বেদের উপর কাজ করলেন, মহাভারতের উপর কাজ করলেন, পুরাণ নিয়ে কাজ করলেন। ওনার এবার চিন্তা হল বেদান্ত দর্শন হারিয়ে না যায়। উনি তখন বেদান্ত দর্শনকে সূত্রাকারে ৫৫৫টি সূত্রের মধ্যে রেখে দিলেন। ব্যাসদেব এসেছিলেন দু হাজার খ্রীষ্টপূর্ব বছর আগে। লোকেরা বংশ পরম্পরায় এটাকে মুখস্ত করে গেছে এবং লিখেও রেখেছে কিন্তু মাঝখানে ব্যাসদেব ঠিক ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন সেই অর্থটা হারিয়ে গেছে। এরপর একজন কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির আগমনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তারপর এলেন শঙ্করাচার্য, তিনি এসে ভাষ্য লিখে বলে দিলেন এর এই এই অর্থ হবে। কিন্তু তাহলে সূত্রের বিশেষত্ব থাকল কোথায়! সূত্র মানেই সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত মানে জিনিসটা confused হতে হবে। আচার্য শঙ্করের পর রামানুজ এসে বললে, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ তো এ রকম হবে না, তিনি আরেকটা ভাষ্য রচনা করে বলে দিলেন এর অর্থ এই রকম হবে। তারও তিনশ বছর এলেন মাধ্বাচার্য, তিনিও আরেকটা নতুন ভাষ্য লিখে বলে দিলেন, শঙ্করাচার্য, রামানুজ কারুর অর্থই ঠিক নয়, এর অর্থ এই রকম হবে। বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য এখনও পণ্ডিতরা লিখেই যাচ্ছেন। একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা কাগজে তাড়াহুড়ো করে শুধু 'যেও' এই একটি শব্দ লিখে রেখে গেছে। এবার বাড়ির লোকেরা কাগজটা পাওয়ার পর সবাই এক এক রকম চিন্তা করতে শুরু করে দিল। 'যেও' বলতে কাকে যেতে বলেছে, কোথায় যেতে বলছে। ছেলে ভাবছে আমার পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিল বাবা তার অনুমতি দিয়ে গেছেন। মা তার অন্য অর্থ করছে। সূত্রে কতকটা এই রকম হয়। সূত্র সাহিত্যের বিশেষত্ব হল তাঁরা ঐ পদ্ধতিটাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কিন্তু সূত্রের সব থেকে বড় সমস্যা হল, সূত্রের অর্থ কারুর কাছে পরিষ্কার ছিল না আর সূত্রে না থাকলে তো জিনিসটা থাকবেই না, অত বিশাল বিশাল শাস্ত্রকে তখনকার দিনে কে মুখস্ত করে রাখতে পারবে! সেইজন্য পরের দিকে সূত্রের অনেকগুলো অর্থ বেরিয়ে আসত।

খুব নামকরা সূত্র হল মীমাংসার জৈমিনি সূত্র, তেমনি গৌতমের ন্যায়সূত্র আছে, পতঞ্জলির যোগসূত্র খুব বিখ্যাত যাকে আমরা রাজযোগ বলছি। সাংখ্যে এবং বৈশাষিকেও সূত্র আছে কিন্তু অত নামকরা নয়। তবে বিশেষ করে এই চারটি মীমাংসার জৈমিনি সূত্র, গৌতমের ন্যায়সূত্র, পতঞ্জলির যোগসূত্র আর বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র খুব নামকরা সূত্র। কিন্তু এদের মধ্যেও সব থেকে বিখ্যাত হল ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রকে বুঝতে হলে জৈমিনি সূত্রকে আগে বোঝার দরকার, জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যাতে অত বেশি জটিলতা নেই। যোগসূত্রের দুটি ব্যাখ্যা হয়, একটাকে বলে ভোজবৃত্তি আরেকটাকে বলে ব্যাসভাষ্য। অন্যান্য সূত্রগুলো কেউ ব্যাখ্যা করতে যান না। এখন সূত্র সাহিত্য এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে যার ফলে যত বিষয় আছে সব কিছুর উপর সূত্র সাহিত্য আছে। যেমন খুব নামকরা হল পাণিনির ব্যাকরণ, সংস্কৃতের ব্যাকরণ পুরোটাই পাণিনি সূত্রাকারে রেখে দিলেন। এমন কঠিন যে বোঝাই যায় না কি বলতে চাইছেন। তাই পতঞ্জলি আবার এর উপর একটা ভাষ্য লিখে দিলেন, ভাষ্য না পড়লে এর অর্থ বোঝা যাবে না। সূত্রটা ঠিক ম্যানুয়ালের মত। সূত্রগুলি মুখস্ত করে নিলে মোটামুটি জেনে যাবে এতে কি বলতে চাইছেন। আর সাধারণ ভাবে যে গুরুর কাছে সূত্রগুলি মুখস্ত করতেন বা কপি করতেন, গুরুরা সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করে দিতেন। কিন্তু যা হয়ে থাকে, আচার্যে আচার্যে মতের পার্থক্য চিরদিনই থাকে, যার ফলে ব্যাখ্যাগুলোও একটু উপর নীচ হয়ে যেত। পরের দিকে এসে ওর উপর আবার ভাষ্য লেখা হল।

তৎকালীন সমাজে ভক্তির উপর ঋষি মুনিদের কাছে যা কিছু ছিল, সব কিছুকে সংগ্রহ করে একটা গ্রন্থে সংকলন করে দিলেন, সেই গ্রন্থের নাম দিলেন নারদীয় ভক্তিসূত্র। এর আগে আমরা নারদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, নারদ নামে কেউ একজন নিশ্চয় ছিলেন অথবা নারদের মত ভক্ত কেউ হয় না সেইজন্য এর নামকরণ নারদের নামে করে দিয়ে হয়ে গেল নারদীয় ভক্তিসূত্র। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে

বলা হয়, মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব তিন শত বছর থেকে শুরু করে তিন শত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়টাতে সূত্র সাহিত্য খুব প্রসার লাভ করেছিল। সব কিছুকে সূত্রাকারে লেখার এটাই তখন একটা ফ্যাশান হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় যত শাস্ত্র ছিল সব শাস্ত্রই ঋষিরা সূত্রাকারে করে দিলেন। পরে যে আর হয়নি তা নয়, এখনও যে কেউ যে কোন কিছুকে সূত্র সাহিত্যে নিয়ে যেতে পারেন। তবে সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী থেকে তিনশ খ্রীষ্টাব্দের এই পাঁচ ছশ বছর সূত্র সাহিত্য খুব প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের ঐতিহাসিকরাও এই সময়ের কথাই বলেন। নারদীয় ভক্তিসূত্রও হয়ত ঐ সময়ে রচিত হয়েছিল। নারদীয় ভক্তিসূত্রে যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো মনে হয় যেন ভাগবত থেকে খুব বেশি প্রভাবিত। পরে রামানুজাদি বড় বড় ঋষিরা এসেছেন তাঁদের কোন কিছুই এখানে কোন উল্লেখ নেই, সেইজন্য আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি নারদীয় ভক্তিসূত্র সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর আগেকার রচনা। তবে এগুলো হল চিন্তা ভাবনা করে কিছু কথা বলে দেওয়া, এর এদিকেও কোন দাম নেই, ওদিকেও কোন দাম নেই। অন্য দিকে ভক্তি ব্যাপারটা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জিনিস। তবে ভক্তিকে ভারতবর্ষে আলাদা দর্শন হিসাবে কোন সময়েই দেখা হত না। ষড়দর্শন সংগ্রহ নামে আমাদের একটা নামকরা বই আছে, তাতে ভারতে যত দর্শন আছে সব কটি দর্শনকে compile করে চৌদ্দশ পনেরশ শতাব্দী নাগাদ লেখা হয়েছিল। তৎকালীন যত দর্শন ছিল সেগুলোকে লেখক শ্লোকাকারে রেখেছেন। পরম্পরায় পাশুপত নামে যে একটা মত ছিল তিনি তারও উল্লেখ করেছেন বা আরও যে বৈষ্ণব মত ও অন্যান্য যত মত ছিল সবই উল্লেখ করেছেন, সেগুলো থেকে ভক্তি মতের অনেক কিছু বার করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের ষড়দর্শনের যে নামকরা ছয়টি দর্শনের কথা পরম্পরাতে চলে আসছে বা অন্যান্য যাঁরাই দর্শন নিয়ে লেখালেখি করেন ওনারা ভক্তিকে আলাদ দর্শন রূপে দেখেন না।

যে কোন দর্শনের কাজ হল তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করা, এই তিনটে হল জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। দর্শনে এই তিনটের বাইরে আর কিছুকে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে ভক্তি যে ভাবে পরিভাষিত করে তাতে দেখা যায় সেটা বেদান্তেরই একটা অঙ্গ হয়ে যায়। সেইজন্য ভক্তিকে বেদান্ত থেকে আলাদা করে দেখা হয় না। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী তপস্যানন্দ মহারাজ, যিনি মঠের ভাইস-প্রেসিডেন্টও ছিলেন, তিনি প্রচুর গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। মহারাজের একটা বই আছে যার নাম হল, ‘Bhakti Schools of Vedanta’, খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ। তিনি ভক্তিকে, বিশেষ করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে খুব জোর দিতেন কিন্তু তাঁর গ্রন্থের নাম দিলেন ‘Bhakti Schools of Vedanta’, তার মানে বেদান্ত ভক্তির কথাই বলছেন। যাঁরা দর্শনের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরাও ভক্তিকে বেদান্তের একটা অঙ্গ রূপে দেখিয়েছেন। বেদান্তকে একভাবে দেখলে তখন সেটা অদ্বৈত হয়ে যায়, অন্য ভাবে দেখলে বিশিষ্টাদ্বৈত হয়ে যায়। ভক্তির জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের ব্যাপারে যে ধারণা ওটাকে যদি খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, সত্যিকারের সাংখ্য বলুন, যোগ বলুন, ন্যায় বলুন আর মীমাংসা এরা সবাই আলাদা। ভক্তির মূল যে ভাবগুলো আছে সেগুলো বেদান্তের মধ্যেই খাপে খাপে বসে যায়। শুধু ঈশ্বরের যে গুণ আর ঈশ্বরের সাথে জীবের যে সম্পর্ক, এই জায়গাতেই এক অপরের থেকে একটু যেন আলাদা হয়ে যায়।

আমাদের কাছে নারদ ভক্তিসূত্র নারদই লিখেছেন। নারদই লিখুন আর যিনিই লিখে থাকুন, তিনি তৎকালীন মহাত্মা, পণ্ডিত বা সাধকদের মধ্যে ভক্তি নিয়ে যা কিছু মত ও ধারণা চলছিল, বিশেষ করে ভাগবতে, সেই জিনিসগুলিকে সংকলন করে একটা জায়গাতে গুছিয়ে আমাদের জন্য রেখে দিলেন। সূত্রাকারে থাকলেও যেহেতু সেই রকম দর্শন কিছু নেই যে কোন সংশয় হবে। একটু যদি অন্যান্য দর্শন ও মতের ব্যাপারে ধারণা থাকে, বেদান্তের দৃষ্টিতে অন্যান্য শাস্ত্রকে কিভাবে দেখা হচ্ছে জানা থাকলে এর সূত্রগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবার আমরা এক এক করে প্রত্যেকটি সূত্রকে ব্যাখ্যা করছি। প্রথম সূত্রে বলছেন –

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।।১।।

ব্যাখ্যাস্যামঃ, এর মানে আমি ব্যাখ্যা করছি বা করতে যাচ্ছি। ব্যাখ্যা করছি মানেই এটা নতুন কাজ নয়। ভক্তি জিনিসটা আগে থেকেই ছিল, সেটাকে তিনি গুছিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছেন। এই সূত্রে তিনটি শব্দ আছে, *অথ, অতঃ* এবং *ব্যাখ্যাস্যামঃ*। *ব্যাখ্যাস্যামঃ* কেন বলছেন মোটামুটি ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল। কারণ ভক্তির পরম্পরা আগে থেকেই ছিল, পরম্পরাতে ভক্তির ব্যাপারে যা কিছু ছিল সব কিছু এক জায়গায় এনে সূত্রাকারে গ্রথিত করে দিয়েছেন। এবার *অথ* আর *অতঃ* শব্দের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমাদের যতগুলো গ্রন্থ সূত্রাকারে আছে তার বেশির ভাগই শুরু হয় *অথ* দিয়ে। ব্রহ্মসূত্র শুরু হয় *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, পতঞ্জলি যোগসূত্র শুরু হয় *অথ যোগানুশাসনম্*। যোগে বলছেন *অথ যোগানুশাসনম্, অনুশাসনম্*, মানে discipline এর কথা বলছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বলছেন *অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, বুদ্ধি দিয়ে অর্থাৎ intelect দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন। *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, ব্রহ্মকে নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করছি। আর ভক্তিসূত্রে বলছেন *অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ*, ভক্তিকে আমরা ব্যাখ্যা করছি। তিনটেতে তিন রকম approach নিয়ে আসছেন কিন্তু *অথ* সব কটিতে থাকছে। *অথ* কেন নিয়ে আসছেন? যাঁরা এইসব সূত্রের উপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত উচ্চমানের পণ্ডিত ছিলেন আর ওনাদের ব্যাখ্যাও খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

অথ শব্দকে সাধারণ ভাবে অর্থ করা হয় অধিকার। বাংলায় অধিকার মানে আমাদের দাবী মানতে হবে, এখানে তা নয়। অধিকার মানে, এই গ্রন্থ কে অধ্যয়ন করতে পারবে। এর ধাতু যদিও একই, কিন্তু অধিকারে যখন আসে তখন বিরাট সমস্যা এসে যায়। যেমন যিনি মীমাংসকে যেতে চাইতেন, কর্মকাণ্ড করতে চাইতেন, তাঁকে প্রথমে বলতে হবে আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স কম, আর সব থেকে যেটা মুশকিল ছিল, আমি কানা কিংবা খোড়া নই। কানা খোড়া হলে আর সে যজ্ঞ করতে পারবে না। যজ্ঞ করার জন্য, বেদের অধিকারী হওয়ার জন্য অনেক রকম শর্ত ছিল। আচার্য শঙ্কর পরে পরে ঠিক ঐ জিনিসটাকেই আক্রমণ করছেন, তোমার বেদেই এত রকম শর্ত করে দেওয়া হয়েছে যার জন্য বেদ জনগণের জন্য হতেই পারে না। যোগেও এই ধরণে অনেক শর্ত আছে, তবে যোগের যাঁরা আচার্য ছিলেন তাঁরা পরে এগুলোকে আলাদা করে পরিভাষিত করে দিয়েছেন। বেদান্তে *অথ* বলতে সাধন চতুষ্টয়কেই বোঝায়। সাধন চতুষ্টয়ে চারটি শর্তের কথা বলা হয়। সাধন চতুষ্টয়ের প্রথম আসে অধিকারী। বেদান্ত অধ্যয়ন করার অধিকারী কে? প্রথমেই বলে দিচ্ছেন ইহকাল আর পরকালের কোন ভোগের ইচ্ছা যার নেই। দ্বিতীয় ষট্‌সম্পৎ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধানের ইচ্ছা যার আছে। তাহলে তো বেদান্ত কেউই অধ্যয়ন করার অধিকারী হতে পারবে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা মানে নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ, কজন করতে পারবে! তার উপর *ইহমুত্রফলভোগবিরাগ*, এই লোকের কোন কিছু চাই না, আর স্বর্গলোকেরও কিছু চাই না। স্বর্গলোক না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ স্বর্গের ব্যাপারে আমাদের কোন বিশ্বাস নেই বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে এই জগতের সুখ কি করে মানুষ ছেড়ে দেবে! ভালো খাওয়া-দাওয়া করব না, ভালো পোশাক পড়ব না, ভালো বাড়িতে থাকব না, রেখে দিন বেদান্ত, আমার দ্বারা বেদান্ত হবে না। বেদান্ত কিন্তু একেবারে পরিষ্কার, তোমার যদি এই জগতের প্রতি ভালোবাসা থাকে, বেদান্ত তোমার জন্য নয়। আর তার সাথে শম, দম অর্থাৎ নিজের বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে, তোমার দ্বারা বেদান্ত হবে না। বেদান্ত তুমি ধারণাই করতে পারবে না। আর ভক্তি বলছে, উঠিল প্রেম পারাবার, ভক্তি সবারই জন্য। কিন্তু ভক্তিসূত্রে আমরা যেমন যেমন এগোব তখন বোঝা যাবে ভক্তিপথ কি প্রচণ্ড কঠিন।

বলে এই রকমই, এগুলো হল ভক্তির Public Relations Departmentএর কথা। একজন মারা গেছে, মৃত্যুর পর তাকে বলা হল তুমি বেছে নিতে পার স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে। প্রথমে স্বর্গটা দেখিয়ে দিল, স্বর্গের সবাই বলছে, বেশ! বেশ! স্বর্গে এসেছ, ঠিক আছে থাক। আনন্দ, আমোদ, আহ্লাদ সবই আছে। এরপর বলল তাহলে নরকটাও একবার ঘুরে দেখা যাক। নরকে যেতেই দেখে সবাই লাফিয়ে উঠে আনন্দে বলছে, আসুন আসুন। তারপর প্রচুর নাচ, গান, ফুর্তি দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হল। ভগবানকে গিয়ে বলে দিল, আমি নরকেই থাকব। ওকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে। নরকে গিয়ে দেখে চারিদিকে আগুন জ্বলছে, দাবানল জ্বলছে, খাওয়া নেই, জল নেই। লোকটি বলছে, এসব কি দেখছি, যখন প্রথমবার এসেছিলাম তখন এত আনন্দ, অপ্সরারা আমাকে এত আদর করে আপ্যায়ন করল। তখন লোকটিকে বলে দেওয়া হল, ওটা

আমাদের Public Relations Department ছিল, আসলটা এটা। ভক্তি সবারই জন্য, এটাও ভক্তির Public Relations Department। গীতায় ভগবান বলছেন *অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজন্তে মামনন্যভাক্*, যে অত্যন্ত দুরাচারী সেও যদি আমার ভজনা করে তাকেও সাধু বলা হয়, তাকেও মহাত্মা বলা হয়। তাই না, আরও বলছেন যারা পাপযোনি, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাদে, পরে অবশ্য শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দেরই রাখা হল আর আর্য, এদের বাইরে যারাই ছিল এরা সবাই পাপযোনি। শূদ্র, চণ্ডাল, নিষাদ এদের সবাইকে পাপযোনি বলা হত। তখনকার দিনে যারা সুসংস্কৃতবান, আর্য তারাই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আর্য বাদে যারা তারা অনার্য। অনার্য মানে এরা ভালো লোক নয়, এদের মধ্যে সংস্কৃতিটা নেই। সংস্কৃতি মানেই হয় নিজেকে সংযত করে রাখার ক্ষমতা। একটা শিশু জন্ম নেওয়ার পর একটু বড় যখন হয় তখন তার মধ্যে সংস্কৃতি থাকে না, যেমন খুশি কথা বলে দেয়, যেমন খুশি আচরণ করে বেড়ায়। বাবা-মা বড়রা ধীরে ধীরে তাকে শিক্ষা দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তার কথাবার্তা, আচরণকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। যত বড় হতে থাকে তার কথাবার্তা, হাটাচলা সব কিছু মার্জিত হয়। আমরা এখনও খারাপ খারাপ কথা শুনলে বলি, বস্তির নোংরা ছেলের মত কথা বলছে। তার মানে ভাষাটা মার্জিত নয়। মার্জিত নয় মানে, কথাবার্তা আচরণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নেই। মার্জিত না হওয়া মানে তার সংস্কার হয়নি। আর্যরা বলতেন, আমাদের বাদে যারা আছে এদের সব কিছু করার অনুমোদন আছে, এরা যা খুশি বলতে পারে, যা খুশি করতে পারে, যা খুশি খেতে পারে, পান করতে পারে, মুরগী খাও গরু খাও, শূয়োর খাও, মদ খাও যা খুশি খেতে পার। আর যত খুশি তুমি বিয়ে করতে পার, যত বার ইচ্ছা নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পার কিন্তু বদলে তোমাকে আমরা অনার্য বলব। অনার্য মানেই পাপযোনি।

স্বামীজীকে আমেরিকায় বলছে, আপনারা স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করেন। তার উত্তরে স্বামীজী একটা বিরাট লেকচার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফে বলছেন, আপনাদের এটা ভুল ধারণা যে আমরা স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিই না। আমাদের নিম্ন জাতিতে যারা আছে তারা যা খুশি খেতে পারে, যা খুশি পান করতে পারে, যত খুশি বিবাহ করতে পারে, যত খুশি ছাড়তে পারে, ঠিক আপনাদের হায়ার ক্লাশের মত। এটাই স্বামীজী শেষ বাক্য। আমেরিকার যে উচ্চবর্ণ ঠিক তাদের মত আমাদের এখানে নিম্নবর্ণ। এদেরকেই ভগবান গীতায় বলছেন পাপযোনি। তবে মনে রেখ, আমার কাছে আত্মা হলেন চিরন্তন। নারদ যেমন একটা পোকার যোনিতে জন্ম নিয়েছেন, সেখানে বলছেন যখন তোমার প্রবৃত্তিগুলো এমন তখন তোমার আত্মা ভোগ করতে চাইছেন। ঐ ভোগ তো ব্রাহ্মণ বংশে হবে না, ব্রাহ্মণ বংশে বুনো রামনাথের স্ত্রীর মত বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল জোগাড় করবে আর তেঁতুল পাতার ঝোল রান্না করে দিনের পর দিন নিজে খাবে নিজের স্বামীকে খাওয়াবে। কিন্তু যেমনি ভাববে এই জন্মে অনেক তেঁতুল পাতার ঝোল খাওয়া হল এবার একটু ভাত মাংস খেলে হয়, যেমনি ভাবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিল শূদ্র যোনিতে। এবার খুব করে ভাত মাংস খেতে থাক। ওনাদের কাছে এটাই ছিল, যে যোনিতে জন্ম নিচ্ছে সেই যোনিটাই পাপযোনি। কারণ সব কিছুতে তার ছাড় দেওয়া আছে, খাওয়ার জন্য, পান করার জন্য, বিয়ে করার জন্য, নৃত্য করার জন্য, তোমার যা খুশি তুমি করতে পার। কিন্তু একটা জিনিস তুমি পাবে না, আর্যদের যে সম্মান দেওয়া হয় সেই সম্মান তুমি পাবে না। ব্রাহ্মণ মানে তোমার কোন কিছুতে ছাড় নেই, ক্ষত্রিয় মানে, সামান্য একটু ছাড় দেওয়া হল, বৈশ্য মানে আরেকটু বেশি ছাড় দেওয়া হল, আর শূদ্র মানে পুরোটাই ছাড় দিয়ে দেওয়া হল। তোমাকে যত এদিকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে তত ওদিকে তোমার সম্মান কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তখন প্রশ্ন উঠবে জন্মগত কেন হতে হবে? এই জিনিসটাকে জন্মগত হবে নাকি কর্মগত হবে, কর্মগত হলে কত বয়সে গিয়ে এটাকে পরিভাষিত করা হবে, কুড়ি বছর পঁচিশ বছর পর্যন্ত তাকে আমরা ছেড়ে দেব তুমি সমাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাও তারপর আমি বিচার করব, এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ওনাদের কাছে খুব সহজ ছিল, আমি এটাকে জন্মগত মানলাম। যে এই রকম যোনিতে জন্ম নিয়েছে তার মানে তার ভেতর এই রকম সংস্কার আছে, বাকিটা আমরা ধরে বেঁধে ট্রেনিং দিয়ে নেব। মিলিটারিতে যেখান থেকেই আসুক না কেন সবাইকে ঘষে মেজে, ট্রেনিং দিয়ে মিলিটারি বানিয়ে দিচ্ছে। ওনাদেরও একই জিনিস ছিল। আর গোলমাল সব প্রথাতেই থাকে। যদি এটাকে একটা বয়সের পর পরিভাষিত করা হয় তখন এক রকমের দোষ দেখা দেবে, জন্মগত নিলে আরেক রকম দোষ হবে। বেদান্ত বলে দিচ্ছে তোমার সম্পূর্ণ নিজের উপর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তোমার দ্বারা বেদান্ত হবে না, মীমাংসকরা বলছে তোমাকে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম না নিলে

তোমার দ্বারা বেদ অধ্যয়ন হবে না। কিন্তু ভক্তি বলে তুমি যেখানেই জন্ম নাও, ভক্তিমার্গ তোমাকে সব সময় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেইজন্য ভক্তিতে নিম্নবর্ণের অনেক বড় বড় মহাত্মার নাম পাওয়া যায়, রবিদাস ছিলেন, কবীর নিজেও নিম্নবর্ণের ছিলেন বা রামায়ণে আমরা শবরীর কথা পাই। অন্য দিকে রাক্ষস বংশে বিভীষণ ছিলেন যিনি মহৎ হয়ে গেছেন, আদিবাসীদের মধ্যে হনুমান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। এনারা বলেন ভক্তির ব্যাপারে কোন রকম শর্ত লাগে না। তবে শর্ত আছে, সেখানে বলে দিচ্ছেন কাদের দ্বারা ভক্তি হবে।

ভক্তির অধিকারী সবাই হতে পারেন। ভাগবত শুরুই হয় অজামিলের গল্প দিয়ে। অজামিলের চরিত্র বলে কিছুই ছিল না, কিন্তু কিভাবে অজামিলের মত লোকও ভক্তি লাভ করে মহৎ হয়ে গেল। ভক্তি সাহিত্যে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সব জায়গায় এটাই দেখান হয়, যে বর্ণেই জন্ম নিয়ে থাকুক, যেখানেই জন্ম নিয়েই থাকুক আর যতই সে নষ্ট হয়ে থাকুক সেখান থেকে সে ঠিক উঠে দাঁড়িয়ে যায়। যাদের মধ্যে ভক্তির ভাব একটু আছে তারা খুব ইমোশানাল হন, ইমোশান লোক কাহিনী খুব ভালো তৈরী করতে পারে, আর কাহিনীকে খুব রসিয়ে বলতে পারে। ভক্তির ভাব থাকলে যে জ্ঞানের পথে যেতে পারবে না তা নয়, যদি কেউ জ্ঞানের পথেও যেতে চায় যেতে পারেন। অধিকারী ও অন্যান্য যা কিছু বলেন এগুলো সাধারণ লোকেদের জন্য বলেন। যার সংসার থেকে বৈরাগ্য হয়ে গেল সে জ্ঞানপথ এভাবেই নিতে পারে যেভাবে ভক্তিপথ নিয়ে থাকে। তবে কর্মকাণ্ডের পথ বা যোগপথ নিতেই পারবে না, কারণ যোগ পথে শরীর ও মন দুজনেই একটা বড় ভূমিকা নেয়। বয়স্ক লোকেরা এসে বলেন, মন এখন নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ঈশ্বরের দিকে কিভাবে মন দেওয়া যায়? এদের জন্য ভক্তিপথ খুব সহজ পথ। ঠাকুর বলছেন, কিছু না করতে পারলে সকাল সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করবে। যে কোন পরিস্থিতির মানুষ, ছোট বাচ্চাই হোক আর বয়স্ক মানুষই হোক, সবটাই তাদের বিভিন্ন আশ্রম, ব্রহ্মচর্য থেকে বৃদ্ধাশ্রম সব আশ্রমেই ভক্তি করতে পারে। আসলে বৃদ্ধাশ্রমও নয়, মৃত্যুর মুখে এসে গেছে তারও কানে আমরা হরিনাম শুনাই। একদিকে উচ্চবর্ণ যে ব্রাহ্মণ সেও ভক্তি করতে পারে আবার নিম্ন আদিবাসী শ্রেণীর মহিলা শবরী সেও ভক্তি করে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে। বর্ণাশ্রমের যে কাঠামো, এই কাঠামোর যে কোন একটাতে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, মোটামুটি চারটি বর্ণ, চারটি আশ্রম বা সন্ন্যাসের যেটা সাধারণ ভাবে হয়ে যায় সেটাকেও নিয়ে ষোলটা না হয়ে বারো চোদ্দটাতে গিয়ে দাঁড়ায়। এই কাঠামোর মধ্যে যাঁরা আছেন, যে কোন জায়গা থেকেই তিনি ভক্তি করতে পারেন। এই কাঠামোর বাইরে যাঁরা আছেন, যাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণের বাইরে আছেন তাঁরাও ভক্তিমার্গে এগোতে পারেন। খ্রীশ্চান, মুসলমানরা তাঁদের পথে তো ভক্তি পেতেই পারেন, এমনকি হিন্দু ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মেরও কেউ যদি হিন্দুদের দেবী-দেবতাদের ভক্তি করেন তাতেও তাঁর ভক্তি লাভ হয়ে যাবে। রস খাঁ একজন নামকরা মুসলমান ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণে খুব ভক্তি করে আরাধনা করতেন। আবার রহিম ছিলেন, তাঁরও খুব কৃষ্ণপ্রীতি ছিল। এনারা হিন্দীর খুব নামকরা কবি। হিন্দুরা এদেরকে বলবে ম্লেচ্ছ, পাপযোনি। কিন্তু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করে মহৎ হয়ে গেলেন। রস খানের শ্রীকৃষ্ণের উপর ভক্তিগীতি খুব উচ্চমানের।

ভক্তির অধিকারী

যে কোন লোকই ভক্তি করতে পারে, কিন্তু ভক্তিমার্গে চলার অধিকারী হওয়ার জন্য কয়েকটা শর্ত আছে। এনারা গীতা থেকে এই শ্লোকটা খুব নেন, *অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি*। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধা এগুলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে নেওয়া হয় কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রেও এই একই শর্তগুলি আসে। অজ্ঞ মানে মুর্খ, কিছুই বুঝতে পারে না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল *অশ্রদ্দধানঃ*, শ্রদ্ধা নেই, মুখে বলছে ঈশ্বরে ভক্তি করি কিন্তু ভেতরে কোন শ্রদ্ধা নেই। আর সব কিছুতে সংশয়, শ্রদ্ধারই অভাব সংশয়ে চলে যায়। এদের ভক্তি হয় না। তবে ভক্তিশাস্ত্রের রচয়িতারা বলছেন, যদিও ভক্তির পথ সবারই জন্য অবারিত কিন্তু তিনটে জিনিস থাকলে ভক্তিতে সুবিধা হয়। প্রথমটাই বলছেন *আর্তিত্ব*, যাঁরা ভক্তিমার্গের অধিকারী হবেন তাঁদের জন্য প্রথম শর্ত হল *আর্তিত্ব* থাকা চাই। *আর্তিত্ব* মানে, তীব্র ইচ্ছা, ভক্তির জন্য খুব উৎকণ্ঠা, ঈশ্বরের জন্য ভেতরে প্রচণ্ড ভালোবাসা, আমার এটাই চাই। ভক্তি সবারই জন্য খোলা ঠিকই কিন্তু আর্তিত্ব চাই। একদিকে বলছেন ভক্তিপথ খুব সহজ পথ; অন্যান্য পথে অনেক রকম শর্ত লাগে, জ্ঞানে সাধন চতুষ্টয় লাগে, ভক্তিতে কিছু লাগবে না। বলেই বলছেন, *আর্তিত্ব* লাগবে, ঈশ্বরের জন্য গভীর আর্তি থাকবে। গভীর আর্তি থাকা আর সাধন চতুষ্টয় দুটো একই জিনিস। কারণ

সাধন চতুষ্টয় জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থার জন্য, যখন শম, দমের কথা বলা হয়, কামনা-বাসনার কথা বলা হয় তখন এগুলোকে জ্ঞানের খুব প্রাথমিক স্তরেই বলা হয়। ঠিক তেমনি intense desire, মানে তীব্র কামনা, কামনা মানেই কোন জিনিসের প্রতি প্রীতি, প্রীতি মানেই ভক্তি। ভক্তিপথে চলা শুরুই হয় ভক্তি দিয়ে। যে জিনিসটাকে মানুষ পেতে চাইছে, আগেই বলে দিচ্ছেন সেই জিনিসটা তোমার ভেতরে থাকা চাই। ভক্তি লাভ করার জন্য ভেতরে ভক্তি থাকতে হবে। বলে ঠিকই যে, ভক্তি পথ সহজ পথ, কিন্তু কিছুই সহজ-টহজ নয়। সহজ বলছেন এই কারণেই, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ইমোশান থাকে, পাগল যে তারও রাগ আছে, মনের মত কিছু না হলে সেও রেগে যায়। জ্ঞান না থাকতে পারে, শরীর তরতাজা নাও থাকতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব নাও থাকতে পারে কিন্তু ইমোশান সবারই ভেতরে থাকে। আর ভক্তি ইমোশানকে নিয়েই চলে, যেমন যেমন আমরা এগোব এই জিনিসটা দেখতে পাব। সেইজন্য বলছেন ভক্তি সহজ পথ, কারণ ভক্তি যে জিনিসটাকে অবলম্বন করে চলে সেই জিনিসটা আগে থেকেই সবার ভেতরে আছে। কিন্তু তাই বলে যে অর্থে আমরা সহজ পথ ভাবছি, খোল করতাল নিয়ে নেমে গেলেই ভক্তি এসে যাবে, সেটা হবে না।

অবতার পুরুষরা, আচার্যরা সবাই আর্তিত্বকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার তীব্রতাকে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, সংসারকে মনে হয় পাতকুয়া আর সম্বন্ধীদের মনে হয় যেন বিষধর সাপ। তার মানে, তার মধ্যে এখন intense desire জেগে গেছে, মনটাও তাই অন্য দিকে চলে গেছে, সংসারে সব কিছুকে মনে হয় আপদ। নিজের কাছের লোকেদের মানুষ কখন আপদ বোধ করে? যখন তার কাছে একটা আদর্শ থাকে আর আদর্শের সামনে এগুলো বিঘ্ন রূপে থাকে। ঠাকুর যখন বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যা শক্তি, বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া এই শব্দগুলো ব্যবহার করছেন তখন একটা আদর্শকে রেখে সামনে ব্যবহার করছেন। যে কোন আদর্শই হোক, সে একজন বৈজ্ঞানিক হতে চাইছে, সাহিত্যিক হতে চাইছে, যেটাই হতে চাইছে, তার আশেপাশে যারা আছে তাদের থেকে যখন কোন বাধা বা বিঘ্ন আসে তখন সবাইকে বিরক্তিকর মনে হয়। এই intense desire যখন আসে, ভাগবতেও আছে আর ঠাকুরও খুব পরিষ্কার করে বলছেন, তখন প্রথম মনে হয় সংসারটা একটা পাতকুয়া আর সম্বন্ধীদের মনে হয় বিষধর সাপ। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য দিকে আর মন যেতে চাইবে না। এই intense desire ভক্তি পথের অধিকারীর জন্য প্রথম শর্ত। অধিকারী কেন বলছেন? *অথ*, এটা কার জন্য, যার intense desire আছে।

কি করে বুঝব তার intense desire, কারণ সবাই বলছে আমার intense desire। Intense desireকেই ঠাকুর বলছেন পাতকুয়া আর বিষধর সাপ। তাহলে বেদান্তের ইহমুত্রফলবিরাগ আর ভক্তিপথের আর্তিত্বের মধ্যে তফাতটা কোথায় থাকল? বেদান্তও একই কথা বলছেন, তোমার যেন ইহকালের কোন ভোগের ইচ্ছা না থাকে, স্বর্গলোকেরও কোন ভোগের ইচ্ছা না থাকে। এনারাও বলছেন আর্তিত্ব, ঈশ্বরকেই আমার চাই, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না। অন্য প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, বাচ্চাকে মা চুসনি ধরিয়ে দেয়। কিন্তু যখন বলে আমার মা কোথায়, আমার মাকে চাই তখন চুসনিটা ছুড়ে ফেলে দেয়। তখন মা দৌড়ে এসে কোলে নেয়। স্বামীজী অন্য জায়গায় বলছেন, আমার এই রকম কুড়িটি মানুষ চাই যারা রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলবে ঈশ্বর বৈ আমি আর কিছু চাই না, এই কুড়ি জনকে নিয়েই আমি পুরো ভারতকে পাল্টে দেব। ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এই কথা বলার মত লোক কোথায়! এই কথা যে বলবে সে হয় একজন terrorist হবে আর তা নাহলে সত্যিকারের সে নিজের সমাজকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। মুখে অনেকেই বলতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু হয় না। ঐ intense desire যখন আসবে তখন বাকি সব কিছুই খসে পড়ে যাবে।

আর্তিত্বের পরে দ্বিতীয় শর্ত বলছেন *শক্তত্ব*। শক্তত্বের অর্থ ক্ষমতা, ভক্তির অনুশীলন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এনারা বলছেন, শরীর যেন ঠিকঠাক থাকে, মাথার গণ্ডগোল অর্থাৎ পাগল যেন না হয়। ভক্তির অনুশীলন করার জন্য শরীর আর মনের একটা শক্তির দরকার পড়ে। শরীরে নানা রকমের ব্যাধি সব সময় লেগে আছে, মনের মধ্যে depression আছে, এগুলোই বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়, ভক্তির অধিকারীর লক্ষণ নয়।

তৃতীয় শর্ত *অপর্যুদস্ত*। অপর্যুদস্ত, এর অর্থ সুযোগ সুবিধা। ভেতরে ভক্তির ভাব থাকলেই সবাই যে সুবিধা সুযোগ পাবে সেটা হয় না। যেমন একজন হিন্দু, তার প্রচুর নিষ্ঠা আছে, ভক্তিও আছে কিন্তু কোন

কারণে তাকে সৌদি আরবে চাকরি করতে হচ্ছে। সেখানে কোথায় মন্দির পাবে, নিজের ভাবের লোক পাবে! কোন সুযোগই নেই। এই ধরণের অনেক talent নষ্ট হয়ে যায় শুধু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে, সুযোগ পায় না বলে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের গুণগত মান অনেক উচ্চমানের, তার একটা কারণ, সন্ন্যাসের ভাব নিয়ে যে নিজেকে বিস্তার করবেন এখানে তার সাংঘাতিক সুযোগ আছে। চারিদিকে বেড়া দেওয়া, ডানদিক বামদিক বেশি করতে পারবেন না। আর সবাই একই ভাবের, একই ভাবের থাকার জন্য উন্নতি করতে সুবিধা হয়। আম গাছকে তুলে নিয়ে মরুভূমিতে লাগিয়ে দিলে সেই আম গাছে আর আম হবে না। ভক্তিরও সুযোগ ও পরিবেশ দরকার। ঠাকুরও কথামৃতে অনেক জায়গায় বলছেন, তোমরা বেশ, সবাই একই ভাবের। একই ভাবের সঙ্গী সাথী পাওয়া খুব মুশকিল। একজনের হয়ত খুব ভক্তি ভাব আছে, কিন্তু এমন জায়গায় বিয়ে হল, এমন এক পার্টনার হল হয়ত স্বামীর সাথে স্ত্রীর মিল নেই নয়তো স্ত্রীর সাথে স্বামীর মিল নেই। ঠাকুর বলছেন, স্ত্রী এসে বলছে, কি সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করছ, ফেলে দাও সব। এভাবেই সুযোগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আবার অন্য সময় ঠাকুর বলছেন, যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছে তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেন। বলছেন কেউ হয়ত বাড়ির দায়ীত্ব নিয়ে নিল। তবে জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে। আমরা প্রায়শই মনে করি, এই ঝামেলাটা মিটে গেলে পুরো মন ঈশ্বরের দিতে পারব। ঐ একটা ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর আরেকটা ঝামেলা এসে যাবে। ঝামেলা কিছু না কিছু থাকবেই। সব ঝামেলা মিটতেই দেখা গেল শরীরটাই বিগড়ে গেছে। কিছু না কিছু গোলমাল করবেই। কারণ দেহ আর জগৎ এই দুটো আমাদের ইচ্ছা মত চলে না, দুটোই নিজের ইচ্ছে মত চলে। ঠাকুর ঠিকই বলছেন, একজন কেউ দায়ীত্ব নিয়ে নিল। ঈশ্বরের কৃপাতে বাড়ির সমস্যার দায়ীত্ব অন্য কেউ নিয়ে নেবে ঠিকই কিন্তু তারপর দেখা গেল তার নিজেরই শরীর খারাপ হয়ে গেল। শরীরট ঠিক হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল তার মনটাই ভেঙে গেছে। সত্যিই খুব মুশকিল। ভক্তিশাস্ত্রের আচার্যরা মোটামুটি এই তিনটে শর্ত দিয়েছেন, এই তিনটে শর্ত ভক্তি সাধনার জন্য দরকার।

রামানুজের মতে ভক্তির শর্ত

ভক্তিমার্গের অনেক নামকরা আচার্য আছেন। যদিও মাধ্বাচার্য, নিম্বার্ক এনাদের নাম আছে কিন্তু ভক্তি পথের খুব নামকরা আচার্য হলেন রামানুজ। রামানুজ ভক্তির জন্য সাতটি শর্ত দেন। স্বামীজীও এই সাতটিকে তাঁর ভক্তিযোগে আলোচনা করেছেন। প্রথম হল বিবেক, ভক্তির জন্য বিবেক দরকার। বিবেক মানে বিচার, ঠাকুর যেমন বলছেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য এই বিচার করা। রিপু জনিত যেসব চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের ভেতরে আসছে, আর সেখান থেকে যত রকম কর্ম হচ্ছে, সেটার ব্যাপারে বিবেক। কিন্তু রামানুজ ভক্তিমার্গের আচার্য, উনি জ্ঞানমার্গি নন। সেইজন্য তিনি শুধু বিচারের ক্ষেত্রেই বিবেকের কথা বলছেন না, সব ব্যাপারেই বিবেক রাখেন। তার মধ্যে আহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। রামানুজ বলছেন, যা কিছু আমাদের ভেতরে আসছে তার তিনটে শুদ্ধির দরকার পড়ে – আশ্রয়, নিমিত্ত আর গুণ। আশ্রয় মানে, জিনিসটা কে নিয়ে এসেছে। যার তার হাতের খাদ্য গ্রহণ করতে নেই, এতে ভক্তির হানি হয়ে যায়। জ্ঞানীদের এসব লাগে না, ঠাকুর বলছেন নরেন হল আগুন, ওর মধ্যে কলাগাছ ফেলে দিলেও দাউ দাউ করে জ্বলে যাবে। স্বামীজী যেভাবে সব কিছু খেয়ে বেড়াতেন, ভক্ত যদি ঐভাবে খেয়ে বেড়ায় তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটা প্রচলিত কথাতে বলে বোষ্টম মরে নেয়ে আর সাধু মরে খেয়ে। সাধুরা বেদান্তী বলে কোন বাছবিচার নেই, যা খেতে দেবেন খেয়ে নেবেন, শুদ্ধি অশুদ্ধির কোন ব্যাপারই তাঁর কাছে নেই। আর বৈষ্ণবরা নিজের শুদ্ধির জন্য সারাটা দিন স্নান করছে, কাপড় ধুয়ে যাচ্ছে আর খাওয়ার ব্যাপারে এটা খাবে না, সেটা ছোবে না। কারণ রামানুজ বলে দিয়েছেন এই তিনটে দোষ যেন না থাকে। বিচার তো এমনিতেই করতে হয়, কিন্তু বেদান্তে যে কোন বিচার হল যেটা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় না সেটাকে ত্যাগ করা। কিন্তু যে কোন জিনিস, পোশাক, উপহার, বিশেষ করে খাওয়া, খাওয়া তো মারাত্মক, যার জন্য হিন্দুরা খাওয়াটা সব সময় আড়ালে করত, সবার সামনে হিন্দুরা কখনই খেত না, যাতে খাদ্যে লোকেদের দৃষ্টি পড়ে না যায়। দৃষ্টি পড়ে গেলে তাতেই খাবার এঁটো হয়ে যাবে। উচ্ছিষ্ট জিনিসকে মানামানিটা হিন্দুরা একেবারে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কারণ খাবার ছুঁয়ে দিলে, দৃষ্টি পড়লে খাদ্যে সব রকমের দোষ এসে যাবে। ভক্তিপথের সাধকদের এঁটো জিনিস কখনই খেতে নেই। শ্রীশ্রীমা যে বলছেন ভক্তের জাত নেই, ঠিকই বলছেন, কিন্তু নিজেদের ভেতরে। নিজের লোকের বাইরে বৈষ্ণবরা মহা গোঁড়া, একটু ছোঁয়াছান্তি হয়ে গেলে সব শেষ। খাবারের উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে পুরো খাবারটাই ফেলে দেবে।

দ্বিতীয় হল নিমিত্ত, বেশির ভাগ মানুষ যখন সাধু সন্ন্যাসীদের কিছু দেয় তার মধ্যে কিছু কামনা-বাসনা থাকে। বিয়ে হয়েছে তার মিষ্টি সাধুদের কাছে পাঠিয়ে দিল, ছেলের অন্নপ্রাশন হয়েছে তার খাবার, কার বিবাহবার্ষিকী হয়েছে তার জিনিসগুলো আশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, এগুলো সব অশুদ্ধ। একবার মঠে একজন নামকরা অভিনেত্রীর দীক্ষা হয়েছে, তিনি বড় বড় মিষ্টি সাধুদের খাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন, সাধুরা খুব খুশি। স্বামী অভয়ানন্দজী বললেন ঐ মিষ্টি ভক্তদের খাইয়ে দাও, সাধুরা খাবে না। কারণ সে একজন অভিনেত্রী, কোথায় কোন কামনা-বাসনা এর মধ্যে জড়িয়ে আছে কেউ জানে না। ঠাকুরও উকিল, ডাক্তারের ছোঁয়া জিনিস খেতে পারতেন না, আশ্রয় দোষ আছে। আর শেষে হল গুণ। গুণ মানে জিনিসটাই দোষের, খাবারে মধ্যে চুল পড়ে গেছে, কিংবা পেঁয়াজ রসুন আছে, মাংস, বাসি খাবার, খাদ্যের মধ্যেই দোষ।

দ্বিতীয় শর্ত হল বিমোক। বিমোক শব্দটা খুব বিচিত্র শব্দ, অন্যান্য জায়গায় এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। রামানুজের মত বড় বড় পণ্ডিতরা সংস্কৃতের এমন এমন শব্দ নিয়ে আসেন যেগুলো খুব প্রচলিত নয়। শব্দগুলিকে আবার নিজের মত ব্যাখ্যাও করে দেন। বিমোক মানে সংযম। এখানে সংযম বলতে কোন কামনা-বাসনা থাকবে না। অথচ বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ। প্রথমে খাওয়া-দাওয়াটাই কঠোর ভাবে বেঁধে দিলেন, তারপরেই বলছেন কোন কামনা-বাসনা থাকবে না। রামানুজ বলে দিলেন সংযম যদি না থাকে ভক্তি পথে চলাই যাবে না। যার জন্য দেখা যায়, যারাই খুব কীর্তন করে বেড়ায় তাদের বেশির ভাগই খুব গোলমেলে, কারণ এদের সংযম নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের নামে অনেক দুর্নাম হয় ঠিকই কিন্তু তার আগে বৈষ্ণবদের বেশি দুর্নাম ছিল। নেচে নেচে কীর্তন করবে, গান করতে করতে খুব উচ্চ অবস্থায় মন চলে যায়, যেমনি সব থেমে যাবে মনটা ওখান থেকে ধপাস করে নেমে আসবে। তখন ওদের কাম-বাসনাকে আর সামলানো যায় না। খুব কম বৈষ্ণব দেখা যাবে যারা কামুক হয় না, কামুক হবেই। স্বামীজীরও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে খুব নিম্ন ধারণা ছিল। শুধু স্বামীজীর নয়, আরও যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন তাঁদেরও বৈষ্ণবদের ব্যাপারে খুব একটা উচ্চ ধারণা কখনই ছিল না। ঠাকুর কিন্তু ধীরে ধীরে স্বামীজী ও অন্যান্যদের মতটা পাল্টে দিলেন। ভক্তি এমনিতে খুব ভালো কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি ঠিক না থাকে, সংযম বা বিমোক যদি না থাকে তখন ভক্তিই degenerate করে যায়। ভক্তি যদি degenerate করে তখন দুটো সমস্যা হয়, একটা হল প্রচণ্ড কামুক হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় মৌলবাদীদের মত খুব গোঁড়া হয়ে যাবে। ভক্তি সহজ পথ ঠিকই কিন্তু যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তখন ভক্তিপথই প্রচণ্ড বিপজ্জনক পথ হয়ে যাবে। এখানে সাধারণ মানুষদের সাবধান করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁর মধ্যে সত্যিকারের ভক্তি আছে, ঠাকুরের মত ব্যক্তিদের জন্য এসব শর্তের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ওনাদের সবার জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে সবার জীবনে এই জিনিসগুলো নিজে থেকেই ছিল। রামানুজ এইজন্য বলে দিচ্ছেন না যে, আমি বলে দিলাম তুমি কর। রামানুজও দেখছেন ভক্তিমার্গের যাঁরা বড় বড় মহাত্মারা ছিলেন তাঁদের জীবনটা কেমন ছিল, তাঁদের জীবন বিশ্লেষণ করে দেখছেন সাধারণ ভাবে কয়েকটা শর্ত আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে যায়। তার মধ্যে বিবেক, বিমোক এই দুটো থাকবে।

তৃতীয় শর্ত হল অভ্যাস। অভ্যাস মানে ভক্তি সাধনায় লেগে থাকা। যারা জপ করছে তারা জপ করবে, যারা নাম-সংকীর্তন করতে চায় তারা তাই করবে। চতুর্থ ক্রিয়া, ক্রিয়া মানে অপরের সেবা বা অপরের ভালো করা। পঞ্চম কল্যাণ, যেটাতে নিজের কল্যাণ হয় সেই জিনিস করা, সত্য কথা বলা, সদ্‌গুণের পালন করা। ষষ্ঠ অনাবসাদ আর সপ্তম অনুদ্ধর্ষ, এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, ভক্তিতে এই দুটোকে খুব বেশি অনুসরণ করা হয়। অনাবসাদ মানে কখন মনের মধ্যে যেন কোন অবসাদ না থাকে, হাঁড়িমুখ নিয়ে কখন থাকবে না। স্বামীজী এর খুব নিন্দা করছেন। হাঁড়িমুখ আর যাই হোক ভক্তি হবে না। সেইজন্য বৈষ্ণবরা সব সময় এটা সেটা নিয়ে খুব আনন্দে থাকে। আর অনুদ্ধর্ষ মানে বেশি আনন্দ যেন না হয়, সারাক্ষণ হাহা হিহি করে যাচ্ছে তা যেন না হয়, এতে ভক্তির হানি হয়। ঠিক তেমনি সব সময় অবসাদগ্রস্ত, চোখের জল ফেলে যাচ্ছে, এটাও যেন না হয়। তাহলে ঠাকুর যে চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুর অবসাদ থেকে চোখের জল ফেলছেন না, ঠাকুরের চোখের জল আসছে ব্যাকুলতা থেকে। ব্যাকুলতা আর অবসাদ দুটো আলাদা জিনিস। অবসাদ আসে জাগতিক কারণে আর ব্যাকুলতা আসে পারমার্থিক কারণে, ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ছটফট করে যাচ্ছে, এটাই ব্যাকুলতা। আর জাগতিক বস্তুর জন্য মনের ছটফটানিকে বলে অবসাদ। অবসাদ যদি আসে তাহলে ভক্তি হবে না। আর অবসাদকে কাটাবার জন্য খুব আমোদ আহ্লাদ করে যাচ্ছে, তাতেও ভক্তি হবে না। ব্যাকুলতার জন্যও

বেদনা হয় আর দুঃখের জন্যও বেদনা হয়, দুটো আলাদা। জাগতিক অভাব দুঃখকে জন্ম দেয় আর পারমার্থিক অভাব ব্যাকুলতাকে জন্ম দেয়। ঠাকুরের কখন দুঃখ ছিল না কিন্তু সব সময় ব্যাকুলতা ছিল। আমরা মনে করি রাধার কত দুঃখ ছিল, কিন্তু রাধারও কখন দুঃখ ছিল না, রাধার শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা ছিল।

অথ অর্থাৎ অধিকারীর কথা বলা হল, *ব্যাখ্যাস্যামঃ* আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। বাকি থাকল *অতঃ* আর *ভক্তিম্*। ভক্তিম্ মানে ভক্তিকে, ভক্তি জিনিসটার ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি। অনেক কিছুকে সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলছেন। প্রথম সূত্র খুব সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে একটা বাক্যেই বলে দেওয়া যাবে, আমরা এবার ভক্তিকে নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু এই অর্থের গভীরে যদি না যাওয়া যায় তাহলে সূত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যটা জানা যাবে না। অনেকেই বলেন তিনশ চারশ বছর খ্রীষ্টপূর্বে রচিত পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রই প্রথম গ্রন্থ যেটাকে সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছিল। তারপর থেকে সবাই পর পর নিজের নিজের বিষয়ের উপর সূত্র লেখা শুরু করলেন। তাতে ওনাদের নিজস্ব দর্শনের ব্যাপারে যাবতীয় যা কিছু বক্তব্য আছে সবটাকে ছোট ছোট সূত্রের মধ্যে বলে দিলেন। যেমন *অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ*, এটা একটা সূত্র, এই কটি শব্দের মাধ্যমে অনেক কিছু বলে দেওয়া হল। এই দর্শনের পরম্পরার পণ্ডিতরা জানেন সূত্রে কি বলতে চাইছেন। *অথ* শব্দ দিয়ে প্রস্তুতিপর্বটা বলে দিলেন। আমরা এখন ভক্তিকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করছি। শুরু করছি কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি কি লাগবে বা এটা কার জন্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এগুলো আমরা আলোচনা করে নিয়েছি।

অথ বলার পর বলছেন *অতঃ*, বাংলায় যেমন বলা হয় অতএব, এখানে কিন্তু ভক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বলছেন। ভক্তিসূত্র আলোচনার শুরুতে একটা কথা আমাদের আলোচনায় এসেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, ভক্তি আর জ্ঞান দুজনের বৈশিষ্ট্য হল যেটা দিয়ে শুরু করা হয় সেটাই চলতে থাকে আর সেখানেই গিয়ে শেষ হয়। যেমন ভক্তি শুরু হয় ভক্তি দিয়ে, ভক্তিতেই চলতে থাকে আর শেষও হয় ভক্তিতে। জ্ঞানমার্গেরও ঠিক তাই, শুরু করেন জ্ঞানে, চলেন জ্ঞানের মাধ্যমে, জ্ঞান হল বিবেক বিচার, আত্মা ছাড়া যা কিছু আছে সেটাকে বিচার করা, জ্ঞানমার্গের সমাপ্তি জ্ঞানেতেই হয়। এখন ভক্তির যে সাধারণ লক্ষণ আর তার যা যা বৈশিষ্ট্য সবটা মিলিয়েই এখানে বলছেন।

আগেই বলা হয়েছে ভক্তি ভজ্ ধাতু থেকে এসেছে, ভজনা করা। সাধারণ মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করতে আর জগতের সুখ পেতেই ভালোবাসে, তাই মানুষ এগুলোর ভজনাই করে। সাধারণ মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু যাঁরা রীতিমত শাস্ত্রের কথা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিষ্ঠা নিয়ে শুনে যাচ্ছেন, তাঁদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার আদর্শ কি? দেখা যাবে কোন আদর্শই নেই। এমন কোন একটা জিনিস আছে, যেটাকে নিয়ে বলতে পারবেন আমি এটার জন্যই বেঁচে আছি? কোন জিনিসই নেই। তাহলে জীবন তৈরী হবে কোথা দিয়ে? আদর্শের সাথে যাঁরা এক হয়ে যান তাঁরাই কিন্তু জীবনে কৃতকার্য হন। আদর্শ যার যত সাধারণ হবে তার জীবনও তত সাধারণ ভাবেই শেষ হয়ে যাবে। আদর্শ যত উচ্চ বা মহৎ হবে তত জীবন মহৎ হবে। সমাজে সব থেকে বেশি সফল হন মায়েরা। মায়েদের জীবন পুরো চব্বিশ ঘন্টা সন্তানকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। কোন মাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি মরবে? মা বলবে, আমি মরতে রাজী আছি কিন্তু আমার সন্তানকে কে দেখবে? মায়েদের জীবন চলেই সন্তানের জন্য। সেইজন্য মাতৃরূপে নারী বিরাট সম্মান, কিন্তু সম্মান সন্তান বা তার পারিপার্শ্বিক যারা আছে তাদের কাছে, তার বাইরে যেতে পারবে না। আদর্শ না থাকলে জীবন চালাতে গিয়ে সমস্যা থাকবে।

ভক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেখান থেকে ভক্তি শুরু হয় সেখানে সে যত সাধারণ মানুষই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, ইমোশান তার থাকতেই হবে। অনেক সময় রেগে গিয়ে বলে, তোমার হৃদয়টা পাথর। হৃদয়টা পাথর হতে পারে, কিন্তু কোন একটা সময় ছিল যখন তারও হৃদয় নরম ছিল। বাচ্চা বয়সে খেলনা নিয়ে খেলেছে, খেলনা কেড়ে নিলে কেঁদেছে, মায়ের জন্যও কেঁদেছে, ইমোশান তার আছেই। ইমোশান অতি সাধারণ সাধারণ ইচ্ছার উপরে চলে। ইচ্ছার পুর্তি হলে মুখে হাসি ফোটে আর ইচ্ছার বিপরীত হলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। মানুষ যে জিনিসকে তীব্র ভাবে ইচ্ছা করে, যে জিনিসের প্রতি সব সময় তীব্র ভাবে মন দিয়ে থাকে, যেখানে তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সবটাই ঢুকে যাচ্ছে, সেই জায়গায় গিয়ে একটা সময় আসে যখন ঐ ইচ্ছাটা ফল রূপে বেরিয়ে চলে আসে। ইচ্ছার পুর্তির জন্য যে যোগান দিতে হয় সেটা থাকার

দরকার। যেমন প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতারই ইচ্ছা থাকে আমি প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী হব, কিন্তু হতে পারে না। কারণ ইচ্ছাকে যে যোগান দিতে হবে সেই ইন্ধনটা নেই। কিন্তু একটা সদিচ্ছা, একটা উচ্চমানের ইচ্ছার জন্য যোগান দিতে পারে, ভক্তিশাস্ত্রে এই যোগানটা দেওয়া সব থেকে সহজ। কারণ ভক্তি হল আমি ঈশ্বরকে চাই, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁকে চাই, এই ইচ্ছাকে যোগান দেওয়ার জন্য একটা জিনিসই লাগে তা হল ইমোশান, ইমোশান ছাড়া আর কিছু লাগে না। এর আগে আলোচনা হয়েছিল, ভক্তি ইমোশানের উপরেই চলে, সেইজন্য সমস্যা হল ইমোশানকে নিয়ে ভক্তি খেলা করে বলে পতনের দিকে যাওয়ার সম্ভবনাটাও খুব বেশি মাত্রায় থেকে যায়। যদি ধরতে না পারে তাহলে দুটো জিনিস হওয়ার সম্ভবনা থাকে, একটা হল দৈহিক কাম-বাসনা গুলো অনেক বেড়ে যায়, কারণ এখানে ইমোশানকে নিয়ে খেলা করছে কিনা। ইমোশান যখন খুব বলশালী হয়ে যায় তখন ঠিক ভাবে সামলে নিয়ে যেতে না পারলে ভয় থাকে। দ্বিতীয় হল, ইমোশান দিয়েই আমাদের জীবন চলে, কিন্তু ইমোশন যদি খুব প্রবল হয়ে যায় আর ঠিক ভাবে যদি ইমোশানের প্রবলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে না লাগানো হয়, এটাই তখন গোঁড়ামির পর্যায়ে চলে যায়। যার জন্য দেখা যায় ভক্তি কেন্দ্রিক যত ধর্ম আছে বা মতবাদ আছে, এরা খুব গোঁড়া হয়ে যায়। গোঁড়ামির সাথে যদি হিংসার ভাব থাকে তখন হিংস্র হয়ে যাওয়ারও সম্ভবনা থাকে। ভক্তি ভাব ভালোবাসা দিয়ে চলে, কিন্তু এই ভালোবাসাকে যখন শ্রেষ্ঠতম ভক্তিতে নিয়ে যেতে পারে না তখন আবার গোঁড়া হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু ভক্তির সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল ইমোশান থাকার জন্য ভক্তি সবারই জন্য খোলা। সে যে জাতিরই হোক, যে ধর্মের হোক, যেখানকার লোক হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক, বাচ্চা হোক, বৃদ্ধ হোক ভক্তি সবারই জন্য অবারিত দ্বার। আর যেটা দিয়ে ভক্তিতে সাফল্য আসবে সেটা সবারই ভেতরে আছে। বেদান্তের জ্ঞানমার্গে অনেক কিছুর দরকার, বেদান্তের অধিকারী হতে গেলে অনেক কিছু লাগে। বেদের কর্মকাণ্ডে যেতে গেলেও অনেক কিছু লাগে। কর্মযোগে যদিও স্বামীজী বলছেন সবাইকেই কাজ করতে হয়, কিন্তু যোগ রূপে কর্মের অনুশীলন করতে গেলে সেখানেও অনেক কিছুর দরকার। কিন্তু ইমোশান এমন এক জিনিস যেটা সবারই আছে, সবাই এটাকে কাজে লাগাতে পারে। ভক্তির এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। *অতঃ* যখন বলছেন তখন এর দ্বারা বলতে চাইছেন ভক্তি কেন? কারণ ভক্তি সবারই জন্য খোলা।

প্রথমের দিকে আলোচনা করা হয়েছিল, বেদের মন্ত্রগুলো কখন দেবতাদের প্রার্থনা রূপে ব্যবহার করা যায় আবার কখন দেবতাদের ধ্যান ধারণা রূপেও করা যায়। উপনিষদ আমাদের মূল গ্রন্থ, উপনিষদ ভারতের দর্শনকে ব্যাখ্যা করছে। উপনিষদ পুরোপুরি জ্ঞানমার্গ। সেইজন্য ভারতের মূল ভাব জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ হয় না। বেদও দুটি মার্গেরই কথা বলে, কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড। বেদের যে অংশ যজ্ঞাদির কথা বলছে সেটাই কর্মকাণ্ড আর যে অংশে ধ্যান ধারণা আছে তাকে বলছেন জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তির ব্যাপার কোথাও নেই। যদিও বলা হয়েছে যে ভক্তি জিনিসটা বেদে আগেই ছিল। কিন্তু ভক্তির প্রভাব বেদে সেভাবে নেই, ভাগবত ও পৌরাণিক সাহিত্যের আবির্ভাব থেকেই ভক্তির প্রভাব ঠিক ঠিক ভাবে আসে। গীতাতেও আমরা ভক্তিযোগ পাই, কিন্তু রামানুজাদিরা আসার পর ভক্তি প্রাধান্য লাভ করে। জ্ঞানযোগে অনেক কিছুই আছে। ভারতের মূল দর্শন হল আত্মাই ব্রহ্ম। জীবের উপর অনেক উপাধি লেগে আছে, সব উপাধিকে সরিয়ে দেওয়ার পর যেটা থাকবে সেটাই ব্রহ্ম। কিন্তু যারা খুব আবেগপ্রবণ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তারা বলবে সব উপাধি সরিয়ে দিলে আমার আমিটা কি হবে? বিদেশে যখনই স্বামীজী আত্মা, ব্রহ্ম, জ্ঞানের কথা বলতেন তখন শ্রোতাদের কাছে একটা সমস্যা হয়ে যেত, আমার আমিটা কোথায় যাবে। স্বামীজী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর আলোচনা করেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল আমরা এতই সাধারণ যে এই জিনিসগুলোকে আমরা ধারণাও করতে পারি না। কিন্তু সাধনা করতে করতে একটা জায়গায় মনে অনেক প্রশ্ন আসতে শুরু হয়।

তার মধ্যে একটা প্রশ্ন আসে যার উত্তর ভক্তিশাস্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়। কথামৃতেও এর অনেকবার উল্লেখ পাওয়া যায়, অনেকে মনে করে এটা ঠাকুরেরই কথা, কিন্তু রামানুজ সম্প্রদায় থেকে এই কথাটি এসেছে এবং ভক্তি পরম্পরায় খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। কথাটি হল, আমি চিনি খেতে চাই চিনি হতে চাই না। এটাই আমাদের দর্শনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেখানে গিয়ে আচার্য শঙ্করের বেদান্ত আর রামানুজের বেদান্ত আলাদা হয়ে যায়। খুবই মজার কথা, একদিকে ভগবানের দিকে যেতে চাইছে, অন্য দিকে আবার আমার আমিত্বটা বজায় রাখতে চাইছে। এই পয়েন্টটা যদি পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে ভক্তি ও জ্ঞানের

পুরো পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অনেকে বলবেন, ভক্তির শেষ কথা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ দিয়ে ভগবানের লীলা আস্বাদ করা। ঠিকই, লীলা আস্বাদ করাটাই ভক্তির একটা প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু লীলা আস্বাদ তো আমরা সবাই সব সময় করে চলেছি, দারুণ গরম এটাও ভগবানের লীলা, গরমে এসি রুমে আরামে থাকাটাও লীলা, বাড়িতে স্ত্রীর গঞ্জনা এটাও ভগবানের লীলা, আবার তার মিষ্টি মিষ্টি কথা তাঁরই লীলা, লীলা সবাই আস্বাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার কি দরকার। ঠাকুর বলছেন, মন শুদ্ধ হয়ে গেলে দেখে জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। বেশির ভাগ ভক্ত বলেন ভক্তিতে আমার আমিত্বটা থেকে যায়। এই বক্তব্যটাও খুব আশ্চর্যের, এই বক্তব্যকে নিয়ে বেশি আলোচনা করলে কোথাও গিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে যায়, কারণ রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনাদের উপর প্রশ্ন চিহ্ন লেগে যাবে। আমিত্বটা যদি বজায় রাখতে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন এর অর্থটা কি দাঁড়াবে? কোথায় দাঁড়াবে ভগবানই জানেন।

আমরা আবার কথামৃতে ফেরত যাচ্ছি। কথামৃতে একটা খুব সূক্ষ্ম আলোচনা আছে যেখানে জ্ঞান ভক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁরে! তুই যদি মাছি হয়ে অমৃত কলসের অমৃত পান করতে চাস কোথায় বসে পান করবি? স্বামীজী বলছেন আমি আড়ায় বসে অমৃত পান করব। কেন আড়ায় বসে পান করবেন? মাঝখানে গিয়ে পান করতে গেলে রসের মধ্যে ডুবে যাব। ঠাকুর তখন বলছেন, না রে! এ হল অমৃত রস, অমৃত রসে ডুবলে মানুষ মরে যায় না, সচ্চিদানন্দ সাগরের অমৃত রসে ডুবলে মানুষ অমর হয়ে যায়। তাহলে জ্ঞানই বলা হোক আর ভক্তিই বলা হোক, সব যাচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে। সচ্চিদানন্দ সাগরে মরে যাওয়ার কথা স্বামীজী বলছেন না, উনি ডুবে যাওয়ার কথা বলছেন, ভাবছেন আমার আমিত্বটা হারিয়ে যাবে। আমিত্বটাই যদি হারিয়ে যায় তাহলে অমৃত রসের আস্বাদ কি করে করব? ঠাকুর বলছেন, অমৃত সাগরে ডুবলে অমর হয়ে যায়। তার মানে কলসির কানায় বসে খাওয়াটা যেন ভক্তি, ডুবে যাওয়াটা যেন জ্ঞান। এখন ডুবে যাওয়ার পর আমিত্বটা থাকছে কি থাকছে না, এর উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল।

ঠাকুর আবার বলছেন, সমাধি থেকে নেমে যখন আমি ওঁ বলি তখন একশ হাত নীচে নেমে এসেছি। ওঁ বলার সময়েই একশ হাত নীচে নেমে এসেছেন, তাহলে আমি জল খাব, আমি গান শুনব, তার মানে আরও অনেক নীচে নেমে এসেছেন, আর কথা যখন বলছেন তখন আরও নেমে এসেছেন। একশ হাতটা একটা কথার কথা, ঠাকুর তো মেপে দেখতে যাচ্ছেন না, বলতে চাইছেন ওঁ বলা মানে সমাধির ঐ অবস্থা থেকে মন অনেক নীচে নেমে এসেছে। আর মুখ যখন খুলছেন তখন আরও অনেক নেমে এসেছেন। এখন ঠাকুর কী বলবেন, ঐ অবস্থায় আমার আমি থাকছে কি থাকছে না, ওখানে তিনি কি দেখছেন, কি আছে কি না আছে আমাদের পক্ষে জানা কোন দিন সম্ভব নয়। সমস্যা হল আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। ঠাকুর বলছেন এক সের ঘটিতে কি তিন সের দুধ ধরে? ভগবান আমাদের এতটুকু সীমিত বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে চাইছি সচ্চিদানন্দ রসের সাগরে যখন ডুবে যাব তখন আমার আমিত্ব থাকবে কি থাকবে না।

ব্রহ্মচারী টেনিং সেন্টারে একজন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। অনেক আগেকার কথা, উনি যখন ব্রহ্মচারী তখন ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ভব মহারাজ, খুব উচ্চমানের সাধু ছিলেন, শুধু উচ্চমানেরই নন, অত্যন্ত উচ্চমানের সাধু। কোন ব্রহ্মচারী যদি কোন গোলমাল করে ফেলত, বয়স কম থাকলে যা হয়, একটু আধটু গোলমাল করতেই পারে। উনি খুব কষ্ট পেতেন, আহা! এই ব্রহ্মচারী আমার কাছে আছে, দুষ্টুমি করে ফেলেছে! ঠিক আছে। উনি রাত্রিতে বাইরে ধুনি জ্বালিয়ে সারা রাত বসে জপ করতেন যাতে তার মঙ্গল হয়। ঐ করে ওনার কয়েকবার শরীরটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষে বড় মহারাজরা এসে খুব করে অনুরোধ করার পর বন্ধ করলেন। এই প্রিন্সিপ্যাল ব্রহ্মচারী অবস্থায় একদিন ভব মহারাজকে বলছেন, আমার মনে হয় রামানুজ সেই জায়গাতে পৌঁছাতে পারলেন না যেখানে শঙ্করাচার্য পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ভব মহারাজ শোনার পর তাঁর উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন, বলছেন, তুমি রামানুজের অবস্থায় পৌঁছে গেছ যে এই রকম কথা বলতে পারছ? ভব মহারাজ এমন রেগে গেলেন যে সাত দিন তিনি ওনার সাথে কোন কথাই বললেন না, অথচ তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তুমি মুর্খের মত এই রকম কথা বললে কী করে? এখানে আমরা যে আলোচনাগুলো করে যাচ্ছি এগুলো হল একটা জিনিসকে বোঝার জন্য। একটা কাঠামো তৈরী করার জন্য এই জিনিসগুলো আলোচনা করা হচ্ছে। রামানুজের দর্শন পড়লে মনে

হবে আচার্য শঙ্করের ভাষ্যে কোথাও যেন গণ্ডগোল আছে। আর এটা খুবই সত্যি যে, ঠাকুর স্বামীজী এসে যদি অদ্বৈত বেদান্তের কথা না বলতেন তাহলে বোঝা খুব মুশকিল হতে যে, আচার্য শঙ্কর যা বলেছেন তিনি কি ঠিক বলেছেন নাকি আদপেই ঠিক বলেননি।

জ্ঞান আর ভক্তির শেষ কথা যদিও এক কিন্তু মাঝখানে সাধনার পথে দুটোর মধ্যে প্রচুর ফারাক। জ্ঞানমার্গে সাধক বলছেন আত্মাই আছেন, আত্মা বাদে যা আছে সবটাই মিথ্যা, সবটাই নাম আর রূপ, সবটাই কল্পনা। আর ভক্তিমার্গের সাধক বলছেন ঈশ্বরই আছেন, আমি যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বরেরই রূপ। উভয় দিকেই, সে জ্ঞানমার্গেই যাক আর ভক্তিমার্গেই যাক দুটোরেই মূলে হল সাধকের আমিত্বের নাশ হওয়া, শেষ অবস্থায় আমি ভাবটা নাশ হয়ে যায়, অহঙ্কার নাশ হয়ে যায়। ভক্ত দেখেন ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে, স্ত্রীর মধ্যে স্বামী স্ত্রীকেই দেখছে, স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বর দেখছে না। কিন্তু যখন দেখবে ঈশ্বরই আছেন, এটাও ঈশ্বর ওটাও ঈশ্বর, তখন তোমাকে বেশি ভালোবাসব আর ওকে কম ভালোবাসব এটা হবে না, অর্থাৎ অহঙ্কারের খেলা, আমিত্বের খেলাটা নাশ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি জ্ঞানী দেখছেন আত্মাই সব, তাঁর কাছে আত্মাই আছেন, তোমার এই নাম রূপটা মিথ্যা, নিজের নাম রূপটাও মিথ্যা। সেইজন্য তোমার প্রতি যে মোহ আসবে ওর প্রতি যে দ্বেষ হবে এর কোনটাই আর হবে না। ভক্তেরও ঠিক একই জিনিস হয়। সোনার অলঙ্কারকে ভক্ত দেখে সোনাই সব গয়না হয়েছে, সোনাই কানের দুল আর নেকলেস হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী দেখে, কানের দুল আর নেকলেস এগুলো কিছু না, এগুলো নাম আর রূপ ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবিকই তাই, দুল একটা নাম, নেকলেস একটা নাম, দুলের একটা আকৃতি আছে নেকলেসেরও একটা আকৃতি আছে। কিন্তু বাস্তব জিনিসটা সোনা। ভক্তিতে মূলতঃ বলবে সোনা এই আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র, এর বেশি কিছু না। ভক্তিতে রূপান্তরটা সত্য, তার মানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রটা থেকে যাচ্ছে। জ্ঞানমার্গে বলবে সোনা বাদে বাকি যা আছে এগুলো কিছু না। সত্যিই তাই হয়, জহুরির কাছে নিয়ে গেলে সে যখন মাপবে তখন সোনাই দেখে, নেকলেস বা কানের দুল দেখে না। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? ভক্তিশাস্ত্র প্রণেতারা ব্যাখ্যা করে বলছেন, ভক্তিতে আমিত্বের বোধটা কোথাও থেকে যায়। রামানুজ জ্ঞানকে নিন্দা করে বলছেন জ্ঞান ভক্তি থেকে নীচু, অন্য দিকে আচার্য শঙ্কর ভক্তির নিন্দা করে বলছেন ভক্তি জ্ঞান থেকে নীচু। এটাই পরে আবার আলোচনায় আসবে যেখানে জ্ঞাত্বা শব্দ আসবে।

জ্ঞান ও ভক্তি সব সময় দুটো স্তরে চলে, কর্মও তাই। একটা স্তর হল যেখানে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আরেকটা স্তর হল যেখানে সিদ্ধি হচ্ছে, সাধনা রূপে চলে আর সিদ্ধি রূপে চলে। সমস্যা হল, সাধনা রূপে যেটা চলে সেটাকেও ভক্তি বলছে আর সিদ্ধি রূপে যেটা চলে সেটাকেও ভক্তি বলছে। জ্ঞান পথেও একই সমস্যা, সাধনাকেও জ্ঞান বলছে আর সিদ্ধিকেও বলছে জ্ঞান। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, যে জ্ঞানমার্গ নিয়ে নিয়েছে সেও জ্ঞানী। জ্ঞানমার্গে যে চলতে শুরু করেছে সেও যদি জ্ঞানী হয় আর যাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেছে সেও যদি জ্ঞানী হন, তাহলে আমরা তফাৎ করব কি করে! ফলে আমাদের মত অজ্ঞদের অনেক সংশয় উৎপন্ন হয়। যিনি সিদ্ধ ভক্ত, যেমন ঠাকুর, তিনিও ভক্ত আর যারা দীক্ষা নিচ্ছে, মন্দিরে যাচ্ছে, শাস্ত্রের কথা শুনছে এরাও ভক্ত। আচার্য শঙ্কর যেখানে বলছেন ভক্তি দিয়ে মানুষ জ্ঞানে পৌঁছাতে পারে না, সেখানে তিনি গৌণা ভক্তির কথা বলছেন, যেখানে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক তেমনি রামানুজ যে জ্ঞানকে নিন্দা করছেন তিনিও জ্ঞানের প্রস্তুতি পর্বের নিন্দা করছেন। এত পরিষ্কার করে এই কথা কেউ বলছেন না। যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, শুধু বিচার করছে, সত্যিই খুব নীচু স্তরের। মীরাবাঈয়ের সঙ্গে একজন লোক সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সে এখনও জ্ঞান বিচার করছে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করছে, নামযশ ত্যাগ করছে, তার কি কখন মীরাবাঈয়ের সাথে তুলনা হয়! আর ঠিক তেমনি, আমাদের মত ভক্তদের সাথে কি কখন শঙ্করাচার্যের সাথে তুলনা করা যায়! তবে রামানুজ বা মাধ্বাচার্য, ভক্তির যাঁরা একেবারে শ্রেষ্ঠ আচার্য, এনাদের রচনা পড়লে দেখা যায় ভক্তিতে কোথাও একটা যেন ছোট্ট করে আমিত্বের বোধ থেকে যায়, যার জন্য ভক্তের নির্বিকল্প সমাধি কখন হবে না। নির্বিকল্প সমাধি না হলে তো ভক্তি নীচু হয়ে গেল। কিন্তু ভক্তিমার্গের আচার্যরা বলেন নির্বিকল্প সমাধিটা মনের একটা অবস্থা, বাস্তবিক কিছু না, নির্বিকল্প সমাধি বলে কিছু হয় না, বাস্তবিকতা হল সবিকল্প সমাধি। ভক্তি পথে সবিকল্প সমাধিই শেষ কথা। যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে ওনারা দেখিয়ে দেবেন নির্বিকল্প সমাধি বলে কিছু হতেই পারে না। এনাদের শেষ যুক্তি হল, নির্বিকল্প অবস্থাই যদি শেষ কথা

হত তাহলে মানুষ ওখানে পৌঁছানর পর আর নামতেন না, পরিবর্তন হত না। কিন্তু দেখা যায় নির্বিকল্প সমাধিতে যাঁরা যান, যেমন ঠাকুর, নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু আবার তাঁকে সবিকল্পতে ফেরত চলে আসতে হল, ফিরে এসে সারা জীবন সেই মা মা করে গেলেন। তার অর্থ দাঁড়াল নির্বিকল্প সমাধি স্থায়ী কিছু নয়, স্থায়ী হল সবিকল্প, আর যেটা স্থায়ী সেটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই তর্কের কি উত্তর দেবেন? বাস্তবিকই এর কোন উত্তর নেই। কারণ নির্বিকল্পতে কি হয় যাঁরা অনুভব করেন তাঁরা মুখ খুলবেন না, যাঁরা মুখে বলেন তাঁদের কোন অনুভব নেই। এরপর কে নির্বিকল্প অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে যাবে!

এনারা তাই মুক্তিকেও চার রকমের করে দিয়েছেন – সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য আর সালোক্য। সালোক্য মুক্তি মানে, ভগবান বিষ্ণু যে লোকে আছেন, ঠাকুর যে লোকে আছেন ভক্ত সেই লোকে গিয়ে বাস করছেন। সারূপ্য মুক্তি মানে, ঈশ্বরের রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে ভক্ত বিষ্ণু রূপে ঘুরে বেড়ান। তাহলে কী করে আসল বিষ্ণু আর এই বিষ্ণুকে আলাদা করবে? সেটা ভগবানই জানেন, আছে হয়ত কোন পথ, তবে আমাদের জানা নেই। সামীপ্য মুক্তি মানে, ভক্ত ঈশ্বরের কাছে কাছেই থাকছেন। আর সাযুজ্য মানে তাঁতে লয় হয়ে যাওয়া। ভক্তিশাস্ত্র সাযুজ্যকে মানবে না, তাঁদের কাছে সাযুজ্য বলে কিছু হতেই পারে না। ঠাকুর জ্ঞান বিচারকে নিয়ে কত নিন্দা করেছেন। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের এগুলোকে যদি বিচার করতে নামা হয় তখন এই বিচার আরও নিরাশাব্যঞ্জক। ইমোশান দিয়ে চলে বলে আরও বেশি হতাশাজনক। আমাদের আলোচনার পয়েন্ট হল ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে ভক্তির বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকল! এই কথা বলবে ভক্তরা। আমিত্ব যদি নাই থাকে, ঈশ্বরের আস্বাদ যদি নাই করতে পারলাম, ঈশ্বরের লীলা যদি নাই দেখতে পারলাম তাহলে ভক্তির কোন অর্থই থাকল না। আমি তাঁতে হারিয়ে গেলাম আর আমি জানলামই না জিনিসটা কি। এই ধরণের তর্ক তাঁরা নিয়ে আসেন। আমিত্বটা থেকে যায় তাই ভক্তি শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা দরকার, এটাই এই সূত্রে *অতঃ ভক্তিম্* কথার তাৎপর্য। ভক্তিকে ব্যাখ্যা এই জন্যই করতে হবে কারণ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? প্রথমটা হল আমিত্বটা থেকে যায় বলে। উপনিষদ বা জ্ঞানমার্গ বলছেন আমিত্ব নাশের কথা, কিন্তু এখানে বলছেন আমিত্ব থাকাটাই শ্রেষ্ঠত্ব।

উপনিষদের লেকচার শুনে বা অধ্যয়ন করে, গীতা অধ্যয়ন করে, বেদান্তের কথা শুনে শুনে আমাদের মনে হতে পারে এসব কি কথা শুনছি। কিন্তু না, এটাই ভক্তিশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিশাস্ত্রের মূলই হল, আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, সাধনা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা আমি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আস্বাদ করতে চাই। আমিই যদি না থাকি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আমি আস্বাদ করব কি করে! তুমি বলছ জ্ঞানমার্গের তোমার আমিত্ব লোপ পেয়ে যায়, আমি তুমি বলে কিছু থাকে না, সেটা দিয়ে আমার কি হবে? তুমি তোমার আমিত্ব লয়কে শ্রেষ্ঠ বলতে পার, নিকৃষ্ট বলতে পার কিন্তু আমার এটা লাগবে না, আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি চাখতে চাই।

ভক্তিশাস্ত্রের দার্শনিকরা আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বরে যাঁরা ভক্তি করেন তিনি চাইলে তাঁকে জ্ঞানও দিয়ে দিতে পারেন। ভক্তিযোগের এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। *অতঃ* যখন বলছেন তখন এটাই বলছেন, আমরা ভক্তিকে এইজন্যই ব্যাখ্যা করছি কারণ ভক্তি শ্রেষ্ঠ। ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন? যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি যদি ঈশ্বরের ভক্তি পেয়ে যান তাহলে ঈশ্বর চাইলে তাঁকে জ্ঞানও দিয়ে দিতে পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। কথামৃতেই ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কাশীতে মরলে মা এসে তার বন্ধনটা খুলে দেন আর শিব এসে বলেন, এই দ্যাখ আমার অখণ্ড রূপ। যদি তুমি বল জ্ঞান একটা ভক্তি আরেকটা, তাতে আপত্তির কিছু নেই। জ্ঞানমার্গে সাধনা করলে তুমি জ্ঞান পাবে, এটা তুমি নিশ্চয় মানছ? হ্যাঁ মানছি। কিন্তু আমি যদি ভক্তিমার্গে যাই ভক্তি আর জ্ঞান দুটোই পেয়ে যাব। তাহলে আমি এমন পথ কেন নেব না যেখানে আমি দুটোই পেয়ে যেতে পারি। ভক্তিমার্গে এই জায়গাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়। আমার জ্ঞান লাগবে না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তিনি ইচ্ছে করলে আমাকে জ্ঞানটাও দিয়ে দিতে পারেন। ভক্তিমার্গে যাঁরা চলেন তাঁরা জ্ঞানও পান ভক্তিও পান, সেইজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ধ্রুব সাম্রাজ্য পাওয়ার জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করছেন। আরাধনা করে তিনি সাম্রাজ্যও পেয়ে গেলেন তার সাথে ভগবানের ভক্তিও পেয়ে গেলেন। ধ্রুব খুব দামী কথা বলছেন, কাঁচ কুড়োতে এসে আমি যদি হীরা পেয়ে যাই আমি হীরাকে ছেড়ে দেব কেন! আমি ভক্তি করতে গিয়ে আমার আমিত্বটা থেকে গেল, আবার ভক্তি করতে গিয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটও পেয়ে গেলাম আর যদি জ্ঞানও পেয়ে যাই, তাহলে তো আমি সবটাই পেয়ে গেলাম। তুমি তো ঈশ্বরের

ভালোবাসাটাই আস্বাদ করতে পারলে না। আমিত্বকে বজায় রেখে ভগবানের আনন্দ কাকে বলে সেটা তুমি জানতেই পারলে না।

এগুলোকে নিয়ে অনেকেই অনেক রকম যুক্তিতর্ক নিয়ে আসেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতদের কাছেও সব কিছু পরিষ্কার নয়। ইদানিং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় জ্ঞান ভক্তিকে যেভাবে পরিভাষিত করা হয় সেটা অনেক বেশি যৌক্তিক। এনারা বলেন কারুর মস্তিষ্ক উন্নত, কারুর আবার হৃদয় উন্নত। সেইজন্য কারুর ইমোশান বেশি শক্তিশালী, কারুর আবার যুক্তি বিচার বেশি বলশালী। যার ফলে যাঁরা বিচার দিয়ে যান তাঁরা জ্ঞান পথ নেন, যাঁদের ইমোশান শক্তিশালী তাঁরা ভক্তি পথ দিয়ে যান, কিন্তু দুজন এক জায়গাতেই যাবে। ভক্তিশাস্ত্র এসব কথা মানবে না। ভক্তিশাস্ত্রে যাঁরা জ্ঞানমার্গ নিয়েছেন তাঁরা একেবারে শূদ্রের মত। হৃদয়ে এত ভালোবাসা অথচ এরা ভগবানের ভালোবাসাটাই জানল না। ঠাকুরও কতবার শুষ্ক জ্ঞানীর কথা বলছেন। জ্ঞানমার্গের এটাই মূল সমস্যা, বিচার করতে করতে একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়। ঠাকুর তাহলে কি শুধু ভক্তিকে জোর দিচ্ছেন? ঠাকুর সেই রঙের গামলার গল্প বলছেন, একজনের একটা রঙের গামলা ছিল, যে যা রঙ চাইবে গামলায় চুবিয়ে দিয়ে সেই রঙে ছুপিয়ে দেবে। একজন তাকেই জিজ্ঞেস করছে, ভাই তুমি কোন রঙে ছুপিয়েছ? ঠাকুর হলেন সর্বধর্মস্বরূপিণে, ভক্তির কথাও বলবেন, জ্ঞানের কথাও বলবেন, ঠাকুর সবটাই নিচ্ছেন। তিনটে 'এইচ', হ্যাণ্ড, হার্ট আর হেড, ঠাকুরের তিনটেই fully developed, হ্যাণ্ড মানেই তিনি কর্মযোগের জন্য প্রস্তুত, হেড মানেই জ্ঞানযোগের জন্য তৈরী আর হার্ট মানেই ভক্তিযোগের জন্য উপযুক্ত। সেইজন্য ঠাকুর তিনটেরই কথা বলছেন। স্বামীজী যোগ অনুশীলন করছেন, কিন্তু যোগের কথা বেশি বলছেন না। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সব পথের যেমন একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে ঠিক তেমনি সব পথেরই কিছু দুর্বলতা আছে। যোগের পথে যাঁরা যান তাঁর সিদ্ধাই আদি পেয়ে যাওয়ার পর ওতেই ফেঁসে থাকেন। কর্মযোগের সাধক কখন নামযশের মধ্যে ফেঁসে যাবে টেরও পাবে না, ওখানেই সব শেষ। জ্ঞানযোগের সাধকের একটা সময় মস্তিষ্ক শুষ্ক হয়ে যায়, সেইজন্য বেশির ভাগেরই মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। আর ভক্তিযোগের পথে তাদের হয় প্রচণ্ড কাম বাসনা এসে যায় আর তা নাহলে মারাত্মক রকম গোঁড়া হয়ে যায়। এই ধরণের দুর্বলতা প্রত্যেকটি পথেই আছে। আমরা এখানে কোন পথের কি কি দুর্বলতা আছে তাই নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি, ভক্তযোগ কি জিনিস সেটাকে জানতে চাইছি।

ভক্তিযোগের এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে আমি যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করি তিনি ইচ্ছে করলে আমাকে জ্ঞানও দিয়ে দিতে পারেন। জ্ঞানযোগে এর কি উত্তর দিচ্ছে? জ্ঞানযোগ বলবে, ঈশ্বর তো আদপেই নেই, ঈশ্বর তো একটা কল্পনা, ঈশ্বর তো মায়া, মায়াকে ভালোবেসে তুমি কী জ্ঞান পাবে! এইসব যুক্তিতর্কের কোন অন্ত নেই। আচার্য শঙ্কর গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগে যেভাবে বর্ণনা করছেন তাতে বোঝাই যায় যে ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগে কোন তফাৎ নেই। তবে ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলতে গিয়ে গীতাতে যে যুক্তি দিচ্ছেন তাতে বলছেন, মানুষ মাত্রই শরীরের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যার জন্য তার পক্ষে অব্যক্তোপসনা, জ্ঞানমার্গের উপাসনা খুব কঠিন। ঠাকুর জ্ঞানীর উপমা দিচ্ছেন, হাত কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে অথচ বলছেন আমার তো কিছু হয়নি, আমি আত্মা, রক্ত দেহের বেরোচ্ছে। এই সাধনা দেহাদ্রিয়তে বদ্ধ হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্*, অব্যাক্তের উপাসনা, জ্ঞানমার্গের সাধনা করতে গেলে এদের ক্লেশের অন্ত থাকবে না। সেইজন্য সবারই জন্য ভক্তি সহজ পথ। ঠাকুর বারবার বলছেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ। অন্নগত প্রাণ মানে দেহবোধ প্রবল, দেহবোধ প্রবল থাকলে জ্ঞানমার্গের অনুশীলন খুব কঠিন।

অতঃ শব্দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল। আমরা যদি মেনেই নিই নারদ এই ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছেন, এই নারদ পৌরাণিক নারদ হতে পারেন, এই নারদ অন্য কোন ঋষি বা অন্য কোন লেখক হতে পারেন যিনি ভক্তির সূত্রগুলিকে সংকলন করেছেন। নারদ ভক্তির ব্যাপারে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যকে সবার সাথে ভাগ করতে চাইছেন, এত দিনে ভক্তির ব্যাপারে আমি যা জেনেছি সেটা আমি তোমাদের সাথে share করতে চাইছি। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, কেন শ্রেষ্ঠ, সবার জন্য খোলা, তোমার আমিত্ব থেকে যায় যাতে তুমি ঈশ্বরের ভক্তিকে আস্বাদ করতে পারবে, আর এতে দেহবোধ থাকলেও কোন সমস্যা হয় না। আরেকটা যেটা দেখা যায়, জ্ঞানীরাও অনেকেই জ্ঞান লাভের পর ভক্তি নিয়েই থাকেন। যেমন আমাদের সামনে ঠাকুর দৃষ্টান্ত, তিনি ভক্তি নিয়েই ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, তিনি জ্ঞানমার্গের প্রচার কার্য করছেন কিন্তু ভক্তি রেখেছিলেন। কিন্তু কোন ভক্ত

ভক্তি লাভের পর জ্ঞান নিয়ে থাকে না। এই ধরণের যুক্তিকে এনারা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ দেখাবার জন্য ব্যবহার করেন, জ্ঞানীরা ভক্তি নিয়ে থাকেন কিন্তু ভক্তরা কখন জ্ঞান নিয়ে থাকে না। *অতঃ*, এত কিছু জটিলতার জন্য আমরা ভক্তির সাবলিল আলোচনা করতে যাচ্ছি।

নবধা ভক্তি

ভক্তির অনেক কিছু জিনিস আমাদের আলোচনার মধ্যে আসবে। তার মধ্যে একটা হল ভক্তি কিভাবে হবে? সরাসরি সেইভাবে কোথাও বলা নেই কিন্তু ভাগবতে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভাগবতে নবধা ভক্তির বর্ণনা করে বলে দিচ্ছেন এই নয় প্রকার বা নয় ভাবে ভক্তির অনুশীলন করা যায়। প্রথমটা *শ্রবণম্*, দ্বিতীয় *কীর্তনম্*, তৃতীয় *স্মরণম্*, চতুর্থ *পাদসেবনম্*, পঞ্চম *অর্চনম্*, ষষ্ঠ *বন্দনম্*, সপ্তম *দাস্য*, অষ্টম *সখ্য* আর শেষ নবম *আত্মনিবেদনম্*। একসাথে বলছেন নবধা ভক্তি, নয় ভাবে ভক্তির অনুশীলন। মজার ব্যাপার হল এই নয়টি সাধনার বিধি আবার এই নয়টি সিদ্ধিরও বিধি। প্রথমের দিকে বলা হল, ভক্তি শুরু হয় ভক্তি দিয়ে, ভক্তি চলে ভক্তি দিয়ে আর শেষ হয় ভক্তিতে। এই নয় প্রকার ভক্তির সাধনা যা সিদ্ধিও তাই।

প্রথম হল *শ্রবণম্*, ঈশ্বরের নাম, গুণগান, লীলাকথা শুনতে থাকা, শোনাটাই একটা সাধনা। এই সাধনাতে কি হয়? সিদ্ধিতেও শ্রবণই করতে থাকে, মন ঈশ্বরে এতই ডুবে যায় যে ওটাই সিদ্ধি। এর বড় দৃষ্টান্ত পরীক্ষিৎ। শুকদেবের মুখ থেকে ভাগবত কথা শুনে যাচ্ছেন, ওটাই তাঁর সাধনা ছিল আর ওটাই তাঁর সিদ্ধি হল। ঠাকুর দুটো ঘটনার কথা বলছেন, একজন পণ্ডিত এক জায়গায় গীতার উপদেশ দিতেন। একটি লোক পেছনের দিকে বসে বসে পাঠ শুনত আর চোখ দিয়ে তার অনর্গল জল বেরিয়ে যেত। পণ্ডিত সংস্কৃতে গীতার ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন পণ্ডিত লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি যা বলছি তুমি কি এগুলো বুঝতে পার? লোকটি বলছে, না, আমি শুধু দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে ঠাকুর অর্জুনকে গীতা বলে যাচ্ছেন। এই গল্পটা এত উচ্চমানের যে কল্পনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন পণ্ডিত গীতার উপর ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন আর একজন অশিক্ষিত মুর্খ যে কিছুই বুঝতে পারছে না পণ্ডিত কি বলছেন, কিন্তু তার চোখ দিয়ে শুধু জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু ভেবে যাচ্ছে, ভাবতে ভাবতে ভাবের ঘোরে হারিয়ে গিয়ে দেখছে শুধু শ্রীকৃষ্ণকে, যিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। যোগের ভাষায় তার সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে একটি বৃত্তিতে স্থির হয়ে গেছে। আরেকটি গল্প বলছেন, এক পণ্ডিত রাজাকে ভাগবত শোনাতে আসতেন। কিছুক্ষণ পরে পরেই পণ্ডিত বলতেন, কি রাজা কিছু বুঝেছ? রাজা পণ্ডিতকে বলতেন, আগে তুমি বোঝ। রোজ বাড়িতে গিয়ে পণ্ডিত ভাবেন, রাজা কেন বলছেন, আগে তুমি বোঝ। কিছু দিন পর থেকে পণ্ডিত আর রাজাকে ভাগবত শোনাতে যাচ্ছেন না। পণ্ডিতকে খবর পাঠানো হয়েছে। রাজার লোক গিয়ে দেখছে পণ্ডিতের সামনে ভাগবত খোলা আর তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। রাজার লোককে পণ্ডিত বলছেন, তুমি রাজাকে গিয়ে বল, এবার আমি বুঝেছি। এই হল শ্রবণের পরিণতি, *শ্রবণমঙ্গলম্* শোনাটাই মঙ্গল, শ্রবণ করাটাই সাধনা। আমরা এখানে ভক্তিশাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছি এটাই সত্যিকারের একটা সাধনা হয়ে যাচ্ছে। ভক্তির কথা শুনতে এসে তুমি ঘুমিয়ে পড়, পঞ্চাশজনের কথা ভাবতে থাক, তাতে কোন দোষ নেই। একজন পণ্ডিত গ্রামে ভাগবত পাঠ করতে যেতেন। এক বুড়ি রোজ সন্ধ্যেবেলায় একটা লণ্ঠন নিয়ে আর লাঠি হাতে ঠক ঠক করে এসে সবার সামনে গিয়ে বসবে। বসার পর লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে আর লাঠিটা পাশে রেখে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। পণ্ডিত একদিন বলেই ফেললেন, বুড়িমা! তুমি ঝড়বৃষ্টিতে এত কষ্ট করে ভাগবত কথা শুনতে আস, কিন্তু এসেই তো ঘুমিয়ে পড়, তাহলে মিছিমিছি কষ্ট করে আস কেন? বুড়ি খুব রেগে গেছে, বলছ কি বাবা! ঘুমোলে কি হবে! কানে ভগবানের দুটি কথা তো যাচ্ছে। হিন্দু ধর্মে এই শ্রবণ জিনিসটাকে কোথায় নিয়ে গেছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, আমি ঘুমোলে কি হবে কিন্তু কথাগুলো বাতাসের মত কানে তো ঢুকছে তাতেই আমার শুদ্ধি হবে। ভক্তিশাস্ত্রের এটা বাস্তবিক সাধনা। জ্ঞানযোগে বেদান্ত শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে দেখুক, মেরে তাকে তাড়িয়ে দেবে। কত বড় বড় বাবাজীদের নামে কত রকম গোলমাল, কেউ জেলে যাচ্ছে, কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। এদের আশেপাশের লোকেরা কি জানে না এরা গোলমেলে, সবই জানে, কিন্তু কোথাও যদি এদের প্রবচন থাকে সব দল বেঁধে শুনতে যাবে। তার কারণ হল শ্রবণ, শুধু শুনে যাও, শুনে যাওয়াটাই একটা সাধনা।

পুরো খ্রীশ্চানিটি শ্রবণের উপর চলছে, রবিবার দিন চার্চে যাবে, সেখানে পাদরি এক ঘন্টার একটা লেকচার দেবে, একটা দুটো গান হবে। একজন লেখক এই লেকচারকে ব্যঙ্গ করে কিছু কিছু মজার কাহিনী বানিয়েছেন। অন্য একজন লেখকের একটা মজার হাসির বই আছে যার নাম, *The Good Soldier Švejk*। তাতে সোয়েক নামে একটা খুব মজার চরিত্র আছে। কোন কারণে রাজা সোয়েকের উপর রেগে গিয়ে তাকে জেলে বন্দী করে রেখেছে। জেল থেকে রবিবার ওকে চার্চে নিয়ে আসা হয়েছে পাদরির লেকচার শোনার জন্য। পাদরি আবার মদ খেয়ে আছে, সে এবার লেকচার দিচ্ছে। খুব মর্মস্পর্শী লেকচার দিচ্ছে, যীশুকে ভালোবাসতে হবে ইত্যাদি। আর সোয়েক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে এমন কান্না যে পুরো চার্চের লোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে পাদরির দিকে আর তাকাচ্ছে না। পাদরি বুঝতে পেরেছে ব্যাটা আমার ঠাট্টা ওড়াচ্ছে। যাই হোক সারমন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সোয়েককে ধরেছে, কেঁদে কেঁদে তুমি আমাকে ঠাট্টা করছিলে? বলছে, এটা ঠিক যে আমি নাটক করছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনি এত খেটেখুটে এই স্পিচটা তৈরী করেছেন, আপনার লেকচার শুনে কেউ যদি একটুও না কাঁদে আপনার পরিশ্রমটা বৃথা হয়ে যাবে, সেইজন্য আমি এই রকম কাঁদার এ্যাক্টিং করছিলাম। পাদরির খুব বিশ্বাস হয়ে গেছে যে লোকটি খুব কাজের। তখন নিজের সেবক করে রেখে দিল, বিরাট লম্বা কাহিনী। খ্রীশ্চান ফাদার খ্রাইস্টের উপর বা বাইবেলের উপর কিছু একটা বলবে সেটাকে পুরো নাটকীয় করে বলছে আর তার একটা জোকার কোথা থেকে জুটে গেল সে সেখানে কান্নার নাটক করছে যাতে শ্রোতাদের বিশ্বাস হয় যে পাদরি খুব ভালো লেকচার দিচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে কি পুরোটাই ধাপ্পা? একেবারেই নয়, *শ্রবণম্*, এটাই আমার সাধনা এটাই আমার সিদ্ধি। বিহার, ইউপির এত বড় একটা অঞ্চলের মানুষকে একা রামচরিতমানস ধরে রেখেছে। সেখানে যত কষ্ট, যত ঝামেলা, যত কান্না যত যা কিছু হচ্ছে সব কিছুকে ভুলিয়ে রেখেছে রামচরিতমানস। গ্রামের এক অশিক্ষিত লোক তারও রামচরিতমানস মুখস্ত, বেশির ভাগ লোকেরই মুখস্ত। বিহারের যে কোন গ্রামে একজন অন্তত রামায়ণী পেয়ে যাবেন, পড়াশোনা জানে না কিন্তু রামায়ণ মুখস্ত। খোল-করতাল নিয়ে রামা হো করে শুরু হবে, আর তার মধ্যেই তুলসীদাসের রামচরিতমানস সে বেচারী নিজের মত ব্যাখ্যা করতে থাকবে। বক্তা যত মুর্খ শ্রোতারা আরও মুর্খ কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ধর্ম তাদের কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে? শুধু শ্রবণের উপর, রামচরিতমানস শুনে যাচ্ছে আর কীর্তন করে যাচ্ছে, শ্রবণ আর কীর্তন এই করে করে একটা জাতি নিজেকে প্রাণ সঞ্চার করে যাচ্ছে। শ্রীরাম জয়রাম জয় জয় রাম কীর্তন করে যাচ্ছে আর রামকথা শ্রবণ করে যাচ্ছে, ঐ রাম, ঐ সীতা, ঐ লক্ষ্মণ হনুমান বছরের পর বছর করে যাচ্ছে। ছোট ছোট বাচ্চারাও রামচরিতের চৌপাঈগুলো শুনিয়ে দেবে। পুরো গল্পটাই তার জানা কিন্তু তাও শুনতে যাবে।

শ্রবণের পরে যে *কীর্তনম্*, এর মুর্ত রূপ হলেন নারদ ঋষি। নারদ ঋষির সাধনাটাও কীর্তন আর সিদ্ধিটাও কীর্তন, এখনও তিনি বীণার উপর নারায়ণ নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ কীর্তন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার যিনি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে কীর্তন করছেন, তাঁর কাছে এটাই সাধনা সিদ্ধিও এটাই। নবধা ভক্তির মধ্যে প্রথম দুটি হল শ্রবণ আর কীর্তন।

তৃতীয় *স্মরণম্*, ভক্তের মধ্যের ঈশ্বরের স্মরণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকবে। অবিচ্ছিন্ন চিন্তন এটাই ভক্তির শেষ, ভক্তের মনে একটিই ভাব, যোগের ভাষায় একটি মাত্র বৃত্তি, ঈশ্বরের চিন্তন চলছে। এটাই স্মরণ। এনারা স্মরণের ভালো উপমা দেন শুকদেবের। শুকদেবের জীবন ঈশ্বরের নাম স্মরণেই ছিল। বেশির ভাগ ভক্ত যাঁরা জপ-ধ্যানাদি করেন তাঁরা মূলতঃ স্মরণই করেন। চতুর্থ *পাদসেবনম্*। পাদসেবনমের ঠিক ঠিক অনুবাদ যদি করা হয় তাহলে হবে চরণসেবা, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক, পাদসেবনম্ মানে ঈশ্বরের সেবা। এনাদের কাছে পাদসেবনমের সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হলেন লক্ষ্মণ। শৈশব থেকেই লক্ষ্মণ শ্রীরামের সেবাতে লেগে আছেন। বনবাসেও তিনি শ্রীরামের এই সেবা, সেই সেবা করে যাচ্ছেন, শ্রীরাম ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর পা টিপছেন, আবার জঙ্গলে সারা রাত পাহাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের সব সময় নজর থাকত শ্রীরামচন্দ্রকে যেন কিছু না করতে হয়। ভক্তিশাস্ত্রে পাদসেবনমকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। পুজোর জন্য যা কিছু কাজ করা হয়, ফুল তোলা, ঠাকুরের বাসন মাজা, চন্দন বাটা, এগুলো যদিও উপাচার কিন্তু এর মূল জুড়ে আছে পাদসেবনমের সাথে। পাদসেবনম্ করে কি কেউ জ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে, শবরী এর সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত। কথামৃতে ঠাকুরের আরও ভালো দৃষ্টান্ত আছে, একজন লোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে

হঠাৎ একটা বাবলা গাছ দেখে তার মনে পড়ে গেল, এই বাবলা গাছের ডাল দিয়ে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে জগন্নাথ প্রভুর বাগান কোপান হবে, বাগানে তরকারীর চাষ হবে, সেই তরকারী দিয়ে প্রভুর সেবা হবে, এই ভাবতে ভাবতে তার ভাব হয়ে গেছে। যে যাকে ভালোবাসে সে যদি তার কাছে না থাকে তখন তার ভালো লাগা জিনিসগুলো যদি কোথাও দেখে তখন তার মনে পড়ে যায়, আহা! ও এই জিনিসটা কত ভালোবাসে। ছেলে হস্টেলে আছে, বাড়িতে এক ধরণের মাছ এসেছে, মাছ দেখে মায়ের মনে পড়ে গেল, ছেলে এই মাছ খেতে কত ভালোবাসে। পাদসেবনমের এই একটা বিরাট সুবিধা, ভালোবাসা দিয়ে সেবা করতে করতে মানুষ তাঁর পছন্দ অপছন্দের জিনিসের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এক হয়ে গেলে কোথাও সেই জিনিসটা দেখলে মনটা তাঁর দিকে চলে যায়। বাড়িতে ছেলে যে জিনিসটা খেতে পছন্দ করে সেই জিনিসটাই রান্না হবে, ছেলে যেটা পছন্দ করে না, বাকিরা পছন্দ করলেও বন্ধ হয়ে যায়। নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে একত্বটা বোধটা প্রবল হয়ে যাওয়াটা পাদসেবনমেরই দৃষ্টান্ত। যদিও পাদসেবনম্ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বলা হয়, কিন্তু এর মধ্যে সেবা ভাবটা আছে বলে সন্তান যেটা পছন্দ করবে সেটাই রান্না হবে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যে পাদসেবনম্ সেখানেও দেখা যায় যে শিবভক্ত, তার বাড়িতে যে ফুল গাছ হবে সেটা শিবের পছন্দসই ফুল গাছ হবে। যারা বিষ্ণু ভক্ত সেখানে বিষ্ণুর মত। তুলসী গাছের সেবা করা, জল ঢালা, মাটি দিয়ে লেপা, এগুলো পাদসেবনেমরই অঙ্গ। ঈশ্বরীয় ভাব নিয়ে সেবা করতে করতে ভক্ত ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যায়। যখন সিদ্ধ হয়ে যায় তখনও সেই পাদসেবনমই করতে থাকে, লক্ষ্মণ অবতারের অংশ, কিন্তু সারাটা জীবন শ্রীরামচন্দ্রের পাদসেবনমই করে গেলেন, সেখান থেকে কিছুই পাল্টায় না। গুরুত্ব হল, যেখান থেকে শুরু করেছেন শেষটাও সেখানেই হয়।

পঞ্চম *অর্চনম্*, অর্চনম্ মানে পূজা অর্চনাদি করা। পাদসেবনমরই সূক্ষ্ম আকার হল অর্চনম্। পাদসেবনমে যে সব সময়ই সে ঈশ্বরের কাছে আছে তা নয়। ভাগবতে এক জায়গায় যশোদার বর্ণনা চলছে, যশোদা মাখন তুলছেন, মাখন তোলার সময় যশোদার মাথায় শুধু ঘুরছে কৃষ্ণ এই মাখন খাবে। যশোদা মাখনের দণ্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছেন, পাদসেবনম্ করা হচ্ছে আর মনে মনে কৃষ্ণের কথা ভেবে যাচ্ছেন আর মুখে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান করে যাচ্ছেন, সেখানেও মন তার ডুবে রয়েছে। যশোদার বাৎসল্য ভাব, কিন্তু সেবা যেটা করেছেন সেটাই পাদসেবনমের একটা অঙ্গ। অর্চনাতে প্রতীক হোক আর প্রতিমাই হোক, সামনে রেখে তাঁর পূজা করে যাচ্ছেন। বৈদিক সময়কার ঋষিরা সবাই অর্চনম্এ ছিলেন, যজ্ঞে আহুতি দেওয়াটাও অর্চনমের অন্তর্গত, যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যেই আহুতি দেওয়া হত। কিন্তু ঐ জিনিসটাই যখন ভগবানের উপর এসে যায় সেটাকেই অর্চনম্ বলছেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা সবটাতেই কিন্তু আমিত্ব থেকে যাচ্ছে, আমি আলাদা তুমি আলাদা থেকে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ *বন্দনম্*, ঈশ্বরের বন্দনা করা। বন্দনমের খুব নামকরা দৃষ্টান্ত হলেন উদ্ধভ, অক্রুর এনারা। উদ্ধভ অক্রুর এনাদের প্রসঙ্গ ভাগবতে এসেছে, কিন্তু মহাভারত আর পুরাণে প্রচুর এই রকম ঋষি আছেন যাঁরা শুধু বন্দনা করে যাচ্ছেন। কীর্তনে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নৃত্য করে গান করছেন, এর টাইপটা আলাদা কিন্তু বন্দনা আরেকটু গভীর থেকে আসে। তবে কীর্তনের সময় নারদের কথা বলা হচ্ছে আর বন্দনমের ক্ষেত্রে উদ্ধবের কথা বলা হচ্ছে, এখন উদ্ধব ভালো নাকি নারদ ভালো, এভাবে বিচার করা আমাদের একেবারেই সাজে না। এই প্রশ্ন মাথায় নিয়ে আসাটাও পাপ। কীর্তনে একটা বাদ্যযন্ত্র লাগে, না থাকলে হাততালি দিয়েও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে করা যায়, বন্দনাতে পুরো জিনিসটা আরও শান্ত হয়ে গেল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে বন্দনা করা হয় তাতে কথাগুলো যেন মনের গভীর থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চারিত হয়। বেদের বেশির ভাগ ঋচাই বন্দনা। ইন্দ্রের নামে, বরুণের নামে, অগ্নি, মিত্রের নামে যা বলা হচ্ছে এগুলো সবই বন্দনা। মহাভারতে প্রচুর বর্ণনা আছে যেখানে কোন ঋষি কাউকে শিখিয়ে দিচ্ছেন কোন আপদ বিপদে পড়লে তুমি এই স্তব নিয়ে বন্দনা কর। চণ্ডী পাঠ, গীতা পাঠ এগুলোও বন্দনা।

সপ্তম হয় *দাস্যম্*। পাদসেবনম্ আর দাস্যে তফাৎ হল, পাদসেবনমে আমিত্বটা থেকে যায়, যেমন লক্ষ্মণের ছিল কিন্তু দাস্যে আমার আমিত্ব বলে কিছু নেই। যেমন হনুমান বা গরুড় এনাদের সেবা হল দাসের মত। লক্ষ্মণ আর হনুমান দুজনেই শ্রীরামের সেবা করছেন, কিন্তু দুজনের টাইপ আলাদা, লক্ষ্মণের সেবাকে পাদসেবনমে আনা হয় আর হনুমানের সেবাকে দাস যেভাবে মালিকের সেবা করে সেই ভাবে আনা হয়। দাস্য ভাবে সাধনা কেমন এটা আমরা হনুমান আর গরুড়ের কাছে থেকে শিক্ষা পাই। ভগবান বিষ্ণু যেখানেই যান

গরুড় তাঁকে পিঠে করে নিয়ে যান। অষ্টম হল *সখ্যম্* ভাবে সাধন, সখ্যকে ভাব রূপে বলা হয় না, এটাও নবধা ভক্তির একটা অন্যতম ভক্তির অঙ্গ। সখ্য এটাও একটা ভক্তির টাইপ। সখ্য হল যেখানে ঈশ্বরের সাথে বন্ধুর মত সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়, আমি তোমার তুমি আমার। বন্ধুর যাবতীয় যা কিছু দরকার সবটাই তিনি সামলে নিচ্ছেন। রামচরিতমানসে তুলসীদাস সখ্যকে ব্যাখ্যা করছেন, যদিও তিনি এটা বেদ থেকেই নিয়েছেন, তাতে তিনি দেখাচ্ছেন, রাম আর সুগ্রীবের যখন দেখা হল তখন হনুমান দুজনের বন্ধুত্ব করিয়ে দিলেন। সেখানে সখ্য ভাব কিভাবে হয় তার খুব বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বিবাহের সময় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনি অগ্নিকে সাক্ষী রেখে রাম আর সুগ্রীবের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। তখন শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে সখা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তুলসীদাস এর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, সখ্য ভাব যখন হয় তখন কি কি হয়। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের কথা বলছেন, নিজের পাহাড়ের মত বিরাট কষ্টকে ছোট্ট করে দেখে আর বন্ধুর ছোট্ট কষ্টকে বিরাট করে দেখে।

নবধা ভক্তির শেষ হল *আত্মনিবেদনম্*। আত্মনিবেদনমের সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত রাজা বলি। রাজা বলি ভগবান বিষ্ণুর সামনে নিজেকেই পুরোপুরি নিবেদন করে দিচ্ছেন। আত্মনিবেদন রাজা বলি করার পর ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বলে দিলেন তোমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই তুমি পাতাল লোকে চলে যাও, সেখানে তুমি যে ঐশ্বর্য পাবে সেটা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য থেকেও বেশি। পাতাল লোক কিন্তু নরক নয়, একটা লোক। এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও রাজা বলি কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভালোবাসাটা ছাড়লেন না। আত্মনিবেদনে, আত্মাহুতিতেই তাঁর শান্তি, সেটাতেই তাঁর পূর্ণতা। এই নয়টিকে বলে নবধা ভক্তি, নয় রকমের ভক্তি। এতে সাধনাও তাই সিদ্ধিও তাই। এই নয় প্রকার ভক্তিতেই মানুষ তার সব ইমোশানকেই খুব সহজে কাজে লাগাতে পারে। আমরা এই জিনিসগুলোই জীবনের কোন না কোন সময় করে থাকি, যাকে খুব ভালোবাসি তার প্রতি আমরা এগুলোই করি। এটাই যখন ভগবানের দিকে যায়, এটা প্রথম, দ্বিতীয় ভগবানের দিকে পূর্ণ রূপে কোথাও কোন ছাড়াছাড়ি নেই, সেখানে একটুও আর অন্য কিছু নেই, এটাই তখন ভক্তি হয়ে যায়। জাগতিক ভালোবাসায় তাও পূর্ণ রূপ থাকে না, নিজের স্বার্থের খাতিরে কিছুতে একটা আটকে যায়। ভগবানের ক্ষেত্রে বেশি আটকে যায় বলে ভক্তি হয় না। কিন্তু নবধা ভক্তির কোন একটাকে যদি নিয়ে এগিয়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতি যদি সেটাই নিয়েই থাকে, তখন তার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা আসবে। ঈশ্বরের কৃপা হলে কি হয় সেটা পর পর যে সূত্রগুলো আসবে তাতে আলোচনা হবে। এই হল প্রথম সূত্র *অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ* এর ব্যাখ্যা। সূত্রে চারটি শব্দ, *অথ, অতঃ, ভক্তি* আর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা মানে পরম্পরাতে ভক্তির ব্যাপারে যা কিছু ছিল সবটাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছেন। অথ, ভক্তির অধিকারী কারা, কাদের জন্য এই কথা বলা হচ্ছে। *অতঃ*, ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন আর ভক্তি, সাধনা আর তার সিদ্ধি। এরপর আমরা পরের সূত্রে যাচ্ছি –

সা ত্বস্মিন্ পরম (পরঃ) প্রেমরূপা।।২।।

সূত্রের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় *সা তু অস্মিন পরম প্রেমরূপা*। অনেক বইতে *পরম* শব্দের বদলে *পরঃ* বলছেন, মূল সূত্রেও *পরঃ* আছে। *পরঃ প্রেমরূপা* হওয়াটাই স্বাভাবিক। *পরঃ* মানে পারে আর *পরম* মানে শ্রেষ্ঠতম। সাধারণ ভাবে জ্ঞান আর ভক্তিতে *পরঃ* বলতে যা বোঝায় *পরম* বলতেও তাই বোঝায়, কিন্তু *পরঃ* বললে তখন বোঝায় যে এতে জাগতিক কোন কিছু নেই। সেইজন্য এখানে *পরঃ* হওয়াটাই স্বাভাবিক। সূত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল, সূত্র থেকে একটা অক্ষর যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তখন সূত্রাকারের সেই আনন্দ হবে আগেকার দিনে সন্তান হলে যে আনন্দ হত। চিন্তা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন রকমে হয়ত একটা অক্ষর কমাতে পেরেছেন আর আনন্দে নিজের স্ত্রীকে বলতে যাচ্ছেন, ওগো আমি একটা অক্ষর কমিয়ে দিয়েছি। অথচ বাড়িতে খাবার অন্ন নেই, এটাই হল হিন্দু জাতি।

নদীয়ায় বুনো রামনাথ বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। খুবই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নদীয়ার রানী নদীতে স্নান করতে এসেছেন, সেই সময় এই ব্রাহ্মণীও স্নান করে ছপাৎ ছপাৎ করে গায়ে জল ছেটাচ্ছে। সেই জলের ছিটা গিয়ে পড়ছে রানীর গায়ে। রানী সেখান থেকে বলছে, হাতে শাঁখা পড়ার পয়সা নেই তাতেই এত অহঙ্কার। এতই গরীব ছিল যে শাঁখা কেনার পয়সা ছিল না, তাই হাতে লাল সুতো পড়তেন, এটাই সধবার চিহ্ন। ব্রাহ্মণীও ছপাৎ ছপাৎ করে বলছে, আমার হাতে লাল সুতো আছে বলে নদীয়ার এত সম্মান। ব্রাহ্মণীর কথায় রানীর

মাথা ঘুরে গেছে, কিসব বলছে! রাজাকে গিয়ে রানী বলেছে। রাজা কার স্ত্রী, কোন ব্রাহ্মণ খোঁজ করতে শুরু করলেন। খবর পেলেন রামনাথ নামে ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু ওনাকে সবাই বুনো রামনাথ বলে ডাকে, কারণ গ্রামের বাইরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে থাকে, তেঁতুল গাছের তলায় থাকতেন বলে ওনার নাম হয়ে গেছে বুনো রামনাথ। বেড়াতে বেড়াতে রাজা বুনো রামনাথের বাসায় এসেছেন। রাজা গিয়ে একটু আলাপ করার পরেই বুঝতে পেরেছেন এই ব্রাহ্মণ বিরাট পণ্ডিত। পণ্ডিত মশাইয়ের বিনয় আর পাণ্ডিত্য দেখে রাজা মুগ্ধ। রাজা বলছেন, পণ্ডিত মশাই আপনার কি কি লাগবে আমায় বলুন আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব, আমি এখানকার রাজা, আপনাকে কিছু যদি সাহায্য করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাব। ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, আমার কিছু লাগবে না, সবই জুটে যায়, আমার ব্রাহ্মণী ভিক্ষা করে গ্রাম থেকে কয়েক মুঠো চাল নিয়ে আসে আর এই তেঁতুল গাছ আছে এর পাতার ঝোল নুন দিয়ে আমার আর ব্রাহ্মণী আর তার সাথে আমার কয়েকটি ন্যায় শাস্ত্রের ছাত্র আছে এদের সবার খাওয়া হয়ে যায়। রাজা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। রাজা বলছে, আমি রাজা, আপনি কিছু যদি আমার কাছ থেকে নেন, একটা কিছু সাহায্য অন্তত করতে দিন। ব্রাহ্মণ তখন অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলছেন, একটা দরকার আমার আছে, আপনার লোকজনরা তো মিথিলার দিকে যাতায়াত করে, আপনি যদি কাউকে দিয়ে ওখানকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে ন্যায়শাস্ত্রের একটা শব্দের অর্থ আনিয়ে দিতে পারেন, কারণ এর অর্থ আমার কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। এই কথা শোনার পর রাজা বুনো রামনাথের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছেন, সত্যি আপনি আছেন বলে নদীয়ার এত সম্মান। এই রকমই ছিলেন তখনকার পণ্ডিতদের অবস্থা, পাণ্ডিত্যে যিনি যেমন শীর্ষে অভাবেও একেবারে তেমনি। যত বড় পণ্ডিত তত অভাব তার বেশি। এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যদি পরম না লিখে পরঃ প্রেমরূপা লিখে দৌড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে বলছেন, ওগো আমি একটা অক্ষর কমাতে পেরেছি, তাতে আশ্চর্যের কী আছে! এই ভাবেই ব্রাহ্মণরা ভারতের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

যাই হোক, পরঃ না বলে পরম বলা হলে সেটাও ঠিক। কোন কোন বইয়ে পরঃ লিখে 'ম'টা বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে দেন, তার মানে একটা সন্দেহ আছে 'ম' ওখানে ছিল কি ছিল না। বলছেন, *সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা*। *সা* মানে ভক্তি। ভক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বলতে হয় ভক্তি কয় প্রকার। প্রথমে আসে অপরা ভক্তি, অপরা ভক্তির আরেকটা নাম গৌণা ভক্তি, এটাকেই ঠাকুর বলতেন বৈধী ভক্তি। অপরা ভক্তিও যা, গৌণা ভক্তিও তাই আর ঠাকুর যে বৈধী ভক্তি বলছেন সেটাও তাই। অপরা মানে নীচু, পর মানে শ্রেষ্ঠ। অপরা ভক্তি মানে তাই নিম্ন প্রকৃতির ভক্তি। নিম্ন প্রকৃতির ভক্তি মানে যে ভক্তিতে নানান রকমের বিধি-নিষেধ পালন করা হয়, আমাকে এত জপ করতে হবে, এতক্ষণ ধ্যান করতে হবে, এত স্বাধ্যায় করতে হবে, এত মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে, এগুলোকে বলছেন অপরা ভক্তি। গৌণা মানে secondary, গৌণা ভক্তি বললে বোঝা যায় না কেন গৌণ বলছেন। কিন্তু নারদীয় ভক্তিসূত্র পড়লে বোঝা যায়, পরম প্রেমস্বরূপা যখন বলছেন তাহলে পরম আর গৌণের মধ্যে নিশ্চয় কোন তফাৎ আছে।

অনেকদিন ধরে নিষ্ঠার সাথে অপরা ভক্তির অনুশীলন করে যাচ্ছে, নিয়মতি জপ করে যাচ্ছে, নিয়মিত মন্দিরে যাচ্ছে, নিষ্ঠা নিয়ে দিনের পর দিন পূজা অর্চনা করে যাচ্ছে, এইভাবে করতে করতে কোন কারণে যদি ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা জন্মে যায়, গভীর ভক্তি জন্মে যায় তখন সেখান থেকে তার মধ্যে যে ভক্তির জাগরণ হয় তাকে বলা হয় মুখ্যা ভক্তি বা একান্তা ভক্তি। ঠাকুর এই ভক্তিকে রাগাভক্তি বা রাগানুরাগা ভক্তি বলছেন। রাগাভক্তি করতে করতে ভক্তি যখন খুব গাঢ় হয়ে যায় তখন সেই ভক্তিকে বলছেন প্রেমাভক্তি। ঠাকুর যখন মা কালীর দর্শন পাওয়ার জন্য ছটফট করে যাচ্ছেন, পাগলের মত কান্নাকাটি করছেন, অনেক কিছুই করছেন তখন ঠাকুরের এটা মুখ্যাভক্তির অবস্থা। কিন্তু তলোয়ার নিয়ে যখন গলা কাটতে যাচ্ছেন, মা দর্শন দিচ্ছেন এবার প্রেমাভক্তির অবস্থায় চলে গেলেন। তবে এগুলোকে কাঁটায় কাঁটায় সব সময় মেলানো যাবে না, একটু একটু তফাৎ থাকবে। কিন্তু সামগ্রিক একটা ছবি নিলে জিনিসটা এভাবেই দাঁড়াবে। অনেক দিন বৈধী ভক্তি করতে করতে এই জায়গাতে এসেই সমস্যা হয়। এখানে ভক্তির ইতিমধ্যে দুটো স্তর হয়ে গেছে, ঠাকুরের ভাষায় বৈধী ভক্তি আর রাগা ভক্তি। একজন সাধক কতদিন বৈধী ভক্তি করে যাবে? কয়েক জন্ম করে গেলেও একজন বৈধী ভক্তিতেই আটকে থেকে যেতে পারে। শুধু ভক্তিতেই নেই, এই সমস্যা সব জায়গাতেই আছে। যাঁরা জ্ঞান বিচার করছেন তাঁদেরও এই সমস্যা আছে। যোগশাস্ত্রে এর উপর খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা

হয়েছে। যখন তার সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, কর্মাশয় যখন পরিষ্কার হতে থাকে তখন চলতেই থাকে, এক জন্ম দুই জন্ম কোন ব্যাপারই নয়। কাগজে, টিভিতে কত মহাত্মা, কত বাবাজীদের কত রকম যে গোলমালের খবর আসছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ঢপবাজ সাধু বলে আদপেই কিছু হয় না। ঢপ সাধু মানে যে সাধুর নাটক করছে, যেমন রাবণ। রাবণ সীতার কাছে ব্রাহ্মণ সাধু সেজে এসেছে সেটা ঢপ সাধু, আসলে সাধু নয় কিন্তু সাধুর বেশ ধারণ করেছে। সাধুর নাটক করে যারা লোকেদের বোকা বানাচ্ছে তারা হল ঢপ সাধু, ঢপ সাধু মানে নকল সাধু। কিন্তু যারা জেলে যাচ্ছে তারা কি করে নকল সাধু হবে! সে তো দু বছর, পাঁচ বছর ঠাকুরের নাম নিয়েছে, তাদের অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এরা সাধু ঠিকই কিন্তু নিষ্ঠাটা কম, কিন্তু নকল সাধু কখনই নয়। নিষ্ঠা নেই কেন? যখন সে সাধনা শুরু করছে তখন কিছু ভালো ফল তার কাছে আসতে শুরু হয়। ভালো ফল আসা শুরু হলে তখন আবার পুরনো সংস্কারগুলো এসে সেগুলোকে টেনে নেয়। ফল সে ঠিকই পাচ্ছে, সম্মান পাচ্ছে, ভালো প্রণামী আসছে কিন্তু এরপরেই নিষ্ঠাটা চলে যেতে শুরু হয়। গুরুও নেই যে তাকে সামলে রাখবে, নিজের বিচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে আর চারজন বদমাইশ ধান্দাবাজ লোক তাকে ঘিরে ফেলে। এটাই সমস্যা, একটু সাফল্যের আলো এলেই তার নিজের জন্ম জন্মের সংস্কারগুলো সব বন্যার জলের মত এসে তাকে শেষ করে দেয়। সেও কিন্তু শুরু করেছিল বৈধী ভক্তি থেকে, কিন্তু মুখ্যা ভক্তিতে ঢোকার একটু আগেই সে লাইনচ্যুত হয়ে গেল। বৈধী ভক্তিতে যারা থেকে যায় তাদের বেশি সমস্যা হয় না, কারণ এতে তার নামযশ হবে না। নামযশ তখনই হবে যখন মুখ্যাভক্তিটা একটু খুলে গেল। ঐ সময় তাকে সামলানোর জন্য যদি কেউ না থাকে ওখানেই তার সব শেষ। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা একটু ডানদিক বামদিক করতে পারবে না, কেন না তাঁকে সংস্থা রক্ষা করে যাচ্ছে। বেশি কিছু গণ্ডগোল করলে কিছু একটা দণ্ড দিয়ে তাঁকে আবার পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। গুরু যদি থাকেন তিনি আটকে দেন, গুরুভাইরা যাদের ভালো তাঁরা আটকে দেন। কিন্তু এরা হল ওস্তাদ, নামযশ কুড়োতে নিজে একাই নেমে পড়েছে। ঠাকুর বলছেন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা সুবিধা, এরা কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে সদোপদেশ দেওয়ার কেউ নেই, নিষ্ঠা নেই। কিন্তু পুরোপুরি কি শেষ হয়ে যাবে? এরা তো নকল সাধু নয়, নিষ্ঠাটা চলে গেছে বলে সাময়িক একটা পতন হয়ে গেছে, কিন্তু আবার উঠবে, একটা দুটো জন্মের পর আবার এগোতে শুরু করবে। গীতায় ভগবানও বলছেন, কখন তার নাশ হয়ে যাবে না, ভগবানের পথে একবার যে এসে গেছে আর কোন দিন তার নাশ হবে না।

যত সাধু মহাত্মাদের নামে যেসব স্ক্যাণ্ডাল বেরোচ্ছে, এরা যতই পতিত হয়ে যাক একজন গৃহস্থ যদি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিতও থাকে তবুও তার থেকে সে অনেক শ্রেষ্ঠ। কারণ তার গুণগত পার্থক্য হয়ে গেছে, সে এখন ত্রিগুণাতীতের পথ নিয়ে নিয়েছে। একটা পশু, হরিণ হোক, চিতা হোক, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যেতে পারে আর একটা ছোট্ট পাখির বাচ্চা সবে তার ডানা গজিয়েছে আর ডানা দুটো নাড়তে পারছে, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? একটা চড়ুই পাখির বাচ্চার সাথে চিতার তুলনা কখনই করা যায় না! কিন্তু ওদের মধ্যে গুণগত মানের একটা তফাৎ এসে গেছে। চিতা যত বেগেই দৌড়াক না কেন, সে মাটিতে সব সময় বাঁধা, কিন্তু ছোট্ট পাখি সে মাটিকে ছেড়ে দিয়েছে। রাইট ব্রাদার্সরা যেদিন প্রথম মাটিকে ছাড়ল, সেটা কিছুই না, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাতাসে ভেসেছে কিন্তু সেই টেকনলজি মানুষকে মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। গৌণা ভক্তি থেকে সে মুখ্যা ভক্তিতে ঢুকেছে বলে পতন হয়েছে, গৌণা ভক্তিতে যদি থেকে যেত তাহলে কোন সমস্যা হত না। সমস্যা হত না ঠিক আছে, তাহলে কি হত? একটা পাথর হয়ে থেকে যেত। একটা পাথর হয়ে থাকা আর আধ্যাত্মিক জীবনের লড়াই শুরু হয়ে যাওয়া, নিষ্ঠার অভাবের জন্য যে মার খেয়ে গেল কিন্তু আগামীকাল নিষ্ঠাবান হয়ে যাবে। আমাদের তো এখনও ট্রেনই ছাড়ল না, হাওড়া স্টেশনের কারশেডে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে, না আছে তার ইঞ্জিন, না আছে তার ড্রাইভার, না আছে গার্ড। কিন্তু আমি কি আনন্দে আছি। কিসে আনন্দে আছ, তোমার গাড়িই তো নড়ছে না। না নড়ুক দাঁড়িয়ে তো আছি। কিন্তু এদের গাড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছে। এই তফাৎ আসে গৌণা ভক্তি আর মুখ্যা ভক্তির জন্য। মুখ্যা ভক্তি যখন পরিপক্কতা পেয়ে যায় তখন তার শেষ যেটাতে গিয়ে দাঁড়ায় তাকে বলছেন পরম ভক্তি, যাকে এখানে বলছেন, পরমপ্রেমস্বরূপা। এটাকেই পরা ভক্তি বলে, ঠাকুর প্রেমাভক্তি বলছেন। বৈধী ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তিতে শেষ হয়, রাগাত্মিকা ভক্তি যখন পেকে যায় তখন ওটা প্রেমাভক্তি হয়ে যায়। নারদ বলছেন, তিনি প্রেমাভক্তির প্রেম

জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন। প্রেমাভক্তিকেই পরা ভক্তি বলে, রাধা বা মীরার যে ভক্তি ছিল। প্রেমাভক্তিরও নানান অবস্থা আছে, কিন্তু তফাৎটা ধরা যায় না। তবুও বোঝা যায় সবারই প্রেমাভক্তি এক রকম হবে না, নারদের যে ভক্তি, শুকদেবের যে ভক্তি বা ঠাকুরের যে ভক্তি তার সাথে যাঁরা সাধনা করে উচ্চমানের ভক্ত তাঁদের এক হবে না। কিন্তু সেই তারতম্যকে বিচার করার পাত্রতা আমাদের নেই, আমরা মেনেই নিচ্ছি ভক্তির এই তিনটে থাক। গৌণা ভক্তি, রাগা ভক্তি বা মুখ্যা ভক্তি আর প্রেমাভক্তি এই তিন রকম যে ভক্তির কথা বলছেন এর সাথে বেদান্তের একটা বিরাট মিল আছে।

জ্ঞান সাধনাও প্রথমে তিনটে ধাপকে নিয়ে চলে। জ্ঞানমার্গে চলার সময় যখন সে আত্ম ও অনাত্মের বিচার করছে তখন সেও কিন্তু জ্ঞানযোগী, অথচ প্রথম শুরু করল। বিচার করতে করতে একটা অবস্থায় যখন যাচ্ছে তখন গীতায় তাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা, জ্ঞানে এখন সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জ্ঞাননিষ্ঠাতে সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, সাধনা করে করে নিজের জোরে পৌঁছেছে। কিন্তু সেখানেও তার এক ধাপ কম থেকে যায় কারণ এখনও তার বিজ্ঞান হয়নি অর্থাৎ বাস্তবিক যে আত্মার দর্শন হওয়ার কথা সেটা এখনও তার হয়নি। কিন্তু এই বিজ্ঞান অবস্থাকে প্রাপ্ত করাটা তার হাতে নেই। তবে জ্ঞাননিষ্ঠা যার হয়ে গেছে আর যিনি আত্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী এই দুজনকে আলাদা করা যায় না। কারণ তাঁর আচার ব্যবহার সবটাই আত্মজ্ঞানীর মত হয়, শুধু একটা জায়গাতেই তফাৎ থেকে যায়, তা হল এখনও তাঁর আত্মার সাক্ষাৎকার হয়নি, সেটা তার হাতেও নেই। উপনিষদই বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনি সাক্ষাৎকার করতে পারেন। এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য অনেক জায়গায় স্ফটিকের উপমা নেওয়া হয়। স্ফটিক তৈরী করার সময় জল ফুটতে থাকে আর তার মধ্যে স্ফটিক ঢেলে যাচ্ছে, তার মানে এখন শুধু জ্ঞান সাধনা চলছে বা গৌণা ভক্তি। স্ফটিক দিতে দিতে জলটা পুরো স্ফটিকে ভরে গেল। আরও তাপ দিতে থাকল, তার সাথে আরও স্ফটিক ঢেলে যাচ্ছে, এরপর আর ও নিতে পারবে না। এটা হল গৌণা ভক্তি থেকে মুখ্যা ভক্তির অবস্থা বা বেদান্তের জ্ঞাননিষ্ঠার অবস্থা। এরপর আর সে নিতে পারবে না, এখন দরকার বাইরে থেকে একটা ক্রিস্টাল আসা। বাইরে থেকে কি ক্রিস্টাল আসবে? ঐ ক্রিস্টালই আসবে যেটা দিয়ে স্ফটিক তৈরী করা হচ্ছে। এখানেও তার আত্মার জ্ঞান বা ভক্তির জ্ঞান আসবে। তখন হুশ করে পুরো জিনিসটা একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের আকার নিয়ে নেবে আর অস্বচ্ছ স্ফটিকগুলো তলায় পড়ে থেকে যাবে।

ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। যারা জ্ঞাননিষ্ঠাতে আছে তাদের এখনও ভয় আছে। যতক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার না হয় ততক্ষণ তার পতনের ভয় থাকবে। বশিষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী তিনিও পুত্রশোকে কাঁদছেন। ঠাকুরের কথাকে আমরা যদি আমাদের মত ব্যাখ্যা করি তাহলের তার অর্থ দাঁড়ায়, বশিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু যে অর্থে বেদান্তের জ্ঞানী বলতে আমরা জানি সেই অর্থে জ্ঞানী ছিলেন না। গৌণা ভক্তি, মুখ্যা ভক্তি, প্রেমাভক্তি পুরোপুরি একই জিনিস। যখন জ্ঞান সাধন করছেন তখন গৌণা ভক্তির মত, একটু তফাৎ থাকবে, জ্ঞানে আত্মাকে আশ্রয় করে এগোচ্ছে, আত্মা ছাড়া যা কিছু আছে সেটাকে ফেলে দিচ্ছে। সাধনা করে করে সেখান থেকে একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেল যেখান থেকে আর তাঁকে আলাদা করে যাবে না যে উনি কি জ্ঞানী নাকি জ্ঞানী নন। তিনি যদি না বলে দেন যে আমার এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি, তা নাহলে আর কোন ভাবে বোঝার উপায় নেই। শেষ ঐ একটু বাকি থেকে যায়। কিন্তু এটা কেন হয়, কখন হয়, কিভাবে হয় জানার কোন উপায় নেই। এটাকেই কেউ বলছেন ঈশ্বরের কৃপা, কেউ বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। এটাই আচার্য শঙ্কর বলছেন, জ্ঞান কখনই কর্ম দ্বারা পাওয়া যায় না। ঈশ্বর কার উপর কৃপা করেন, কেন করেন এই সনাতন রহস্যকে আজ পর্যন্ত কেউ ভেদ করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও কেউ কোন দিন পারবে না। কেন করতে পারবে না? যদি এর রহস্য কেউ পেয়ে যায় তাহলে সে একটা কার্য-কারণ সম্পর্কই পেয়ে যাবে, কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্ক কখনই আত্মাতে বা ঈশ্বরে থাকতে পারে না। তাঁর যে পরিভাষা সেই পরিভাষাতেই এটা থাকতে পারে না। উপনিষদ, বেদান্ত বা ভক্তিশাস্ত্র পড়াটা আলাদা কিছু নয়। তবে পথের অনেক পার্থক্য আছে। ভক্তি এই কয় প্রকার – অপরা ভক্তি আর পরা ভক্তি। অপরার দুটো অবস্থা – গৌণা আর রাগা, ভক্তি তাই তিন প্রকার – গৌণা, রাগা আর প্রেমা।

ভক্তিসূত্রের চুরাশিটি সূত্রকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অধ্যায়, এক থেকে চব্বিশ নম্বর সূত্র পর্যন্ত। প্রথম অধ্যায়ে পরা ভক্তি বা প্রেমাভক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঁচিশ থেকে

তেত্রিশ সূত্র পর্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়, পরাভক্তি যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরাভক্তির এই মাহাত্ম্যকে নিয়ে আলোচনা করছেন। চৌত্রিশ থেকে পঞ্চাশ সূত্র নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়, এই অধ্যায়ে কি কি করলে রাগাভক্তির অবস্থায় পৌঁছান যাবে, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের কখনই প্রেমাভক্তি হবে না, ঠাকুরও বলছেন, একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমাভক্তি হয়েছিল, প্রেমা ভক্তি তাঁরা কৃপা ছাড়া হয় না। রাগা ভক্তি পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে যেতে পারি। বাবা-মা তাদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিল, স্বামীর বাড়িতে গিয়ে এখন সে সব কাজ করবে, সব কাজই নিষ্ঠা নিয়ে করে করে বাড়ির সবার মন জয় করে নেবে। এরপর স্বামী তাকে ভালোবাসবে কি বাসবে না সেটা স্বামীর উপর নির্ভর করে। সে যতই সেবা করুক স্বামী তার উপর খুশি নাও হতে পারে আর খুশি হয়েও যেতে পারে। প্রেমাভক্তিকে এভাবে জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে তুলনা করলে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যায়। মেয়েটি অন্যদের জিজ্ঞেস করতে পারে, স্বামীর ভালোবাসা কি করে পাওয়া যেতে পারে। তখন তাকে বলা হবে খুব ভালো করে রান্নাবান্না করে তাকে খাওয়াও, বাড়ির সবার দিকে নজর দেবে, শ্বশুর-শাশুড়ির খুব সেবা করবে। এরপরেও সে ভালোবাসাটা পাচ্ছে না। মেয়েটাই আবার গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কি করতে হবে? তাকে বলা হয়, ঐটাই করে যেতে হবে। এর উল্টোটাও হতে পারে, স্বামী স্ত্রীর জন্য শাড়ি কিনছে, গয়না কিনে আনছে কিন্তু স্ত্রীর মন কোন ভাবেই পাচ্ছে না।

৫১ থেকে ৬৭ পর্যন্ত সূত্রে বলছেন, যাঁরা রাগা ভক্তি পেয়েছেন তাঁদের স্বভাব কেমন হয়। আর বাকি সূত্রে বলছেন রাগা ভক্তি বা মুখ্যাভক্তির স্বরূপটা কেমন। আমাদের দেখে মনে হবে এর মধ্যে গৌণা ভক্তির কোন আলোচনা করা হচ্ছে না। ঠিকই অপরা ভক্তির কোন আলোচনাই করছেন না। কত জপ করতে হবে, কত পূজা করতে হবে, কতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হবে, চরণামৃত কতটা খেতে হবে ভক্তিশাস্ত্রই এগুলোকে আলোচনা করছেন না, শুরুই করছেন মুখ্যাভক্তি থেকে। আসলে ভক্তিশাস্ত্র একটা দর্শন, দর্শন শুরুই হয় রাগা ভক্তি থেকে। সহজ ভাবে নিলে এভাবে সাজানো যায় – মূখ্যা ভক্তি, তাঁর স্বরূপ কি, যাঁরা মুখ্যাভক্তিতে অবস্থিত তাঁদের কি লক্ষণ, যেমন অর্জুন জিজ্ঞেস করেছেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা*, মুখ্যাভক্তি কিভাবে পাওয়া যায়, এখানে অল্প একটু গৌণা ভক্তিকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে মুখ্যাভক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এই গৌণা ভক্তি আমরা যে স্তরের ভাবছি সেই স্তরের নয়, আর সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছেন প্রেমাভক্তিতে। এখানে ভক্তির দুটো দিক বেরিয়ে আসছে, একটা সাধন রূপে আরেকটা সিদ্ধি রূপে। দুটোই ভক্তি আর দুটোরই আলোচনা এখানে করছেন। কিন্তু খুব সাধারণ স্তরের ভক্তি বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ভক্তিকে নিয়ে এনারা এখানে কোন আলোচনা করবেন না। এনারা ধরেই নিয়েছেন গৌণা ভক্তির অনুশীলন করে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি, আমাদের মন ঈশ্বরীয় ভক্তিতে ডুবে গেছে। এরপর ডুবতে ডুবতে গিয়ে একেবারে গভীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে এবার অন্দরমহলে প্রবেশ করবে। ঠিক তেমনি বেদান্তের আলোচনার করার সময়ও ওনারা ধরেই নেন আমরা অনেকটা উন্নত স্তরে পৌঁছে গেছি। ভক্তি সাধনা রূপে আর সিদ্ধি রূপে এই দুটোকে নারদ ভক্তিসূত্রে আলোচনা করছেন। এখানে যাকে মুখ্যাভক্তি বলছেন এটাকেই ঠাকুর রাগাভক্তি বলছেন, তার স্বরূপ প্রেমাভক্তি রূপা।

রাগাভক্তি আর প্রেমাভক্তি দুটোর ধরণটাই আলাদা। রাগাভক্তিতে এবার সে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করছে, প্রেমাভক্তি মানে ঈশ্বর এবার তাকে ধরে নিয়েছেন। ঠাকুর যেমন বলছেন, কখন ভক্ত লোহা আর ঈশ্বর চুম্বক হন আর কখন ঈশ্বর লোহা আর ভক্ত চুম্বক হয়। প্রেমাভক্তিতে ঈশ্বর ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না। রাধা প্রথমের দিকে যাই করে থাকুন শেষে শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে ধরছেন। এরপর অনেক রকম খেলা চলতে থাকবে। ঈশ্বর যখন হাত ধরে নেন তখনই ওটা প্রেমাভক্তি। ঈশ্বর সবারই হাত সব সময় ধরে আছেন, পোকামাকড় থেকে শুরু করে সবারই হাত ঈশ্বরই ধরে আছেন। কিন্তু বোঝা যায় না, প্রেমাভক্তিতে বোঝা যায় যে ঈশ্বর হাত ধরে আছেন, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু তখন আর থাকে না। এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখার আছে, বিভিন্ন ধর্মে সব জায়গাতেই ভক্তির আলোচনা করা হয়েছে। তবে যাঁরাই ভক্তি সাধনা করেছেন তাঁরা নিজের নিজের মত করেছেন, কিন্তু একটু একটু তফাৎ সব জায়গাতেই পাওয়া যাবে। এমনকি নারদীয় ভক্তিসূত্রেও পরে আমরা দেখব নারদ বলবেন ভক্তির ব্যাপারে শাণ্ডিল্য এই রকম বলছেন, অমুক এভাবে বলছেন, আমি এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করছি, একটু তফাৎ থাকবে।

সূত্রধর্মী সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব হল, এনারা কি বলতে চাইছেন, কি শিক্ষা দিতে চাইছেন প্রথমেই বলে দেবেন। যেমন যোগশাস্ত্রে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন *যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*। বেদান্তেও প্রথমেই বলে দিচ্ছেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ*, ঈশ্বরের স্বরূপ বলে দিলেন। এখানেও প্রথমেই বলে দিচ্ছেন *সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা*। সাধারণ ভাবে সহজ থেকে সরল, সরল থেকে একটু কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর এভাবে জিনিসটাকে উপস্থাপনা করা হয়। কিন্তু সূত্রে এসে ঠিক এর বিপরীত হয়। মূল বক্তব্য প্রথমেই বলে দেবেন, এরপর যার আগ্রহ আছে সে এগোবে তা নাহলে ছেড়ে দেবে। গীতা, উপনিষদ অন্য রকম, সবটাই যেন অমৃত সাগর, যেখান থেকেই ধরা হোক না কেন সবটা একই রকম, তার কোন শুরুও নেই শেষও নেই। এক একটা অধ্যায়ের এক একটা শ্লোক স্বতন্ত্র, একটা শ্লোক আরেকটা শ্লোককে এগিয়ে দেয় না, হয়ত দুটো তিনটে শ্লোক মিলিয়ে একটা বিষয়কে বলা হল। সেখানে একটা শ্লোক আরেকটা শ্লোককে এগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু চারটে শ্লোকের পর পঞ্চম শ্লোক কখনই এক কথা বলবে না। সূত্রধর্মী গ্রন্থে এক অপরকে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু শুরুই করেন শেষ কথা দিয়ে। সেইজন্য এই ধরণের গ্রন্থ প্রথমের দিকে বুঝতে একটু কঠিন মনে হয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম যে চারটি সূত্র আছে ওর উপরই বিশাল বিশাল ভাষ্য দেওয়া হয়েছে। লোকেরা ঐ চারটে শ্লোক আর তার ভাষ্য পড়তে গিয়ে কিছুই বুঝতে পারে না বলে ওখানেই পড়া ছেড়ে দেয়, এতই কঠিন। কারণেই প্রথমেই মূল কথাগুলো বলছেন।

আমরা *সা* শব্দের ব্যাখ্যা করেছি। পরের শব্দ হল তু, তু মানে কিন্তু বা এই রকম অর্থে। প্রথমে বলে দিলেন ভক্তির ব্যাখ্যা করব, কিন্তু 'ভক্তি হল', এই কিন্তু অর্থে বলছেন তু। ভক্তিকে এক কথাতেই বলে দেওয়া যায়, ভক্তি মানে ঈশ্বরের বন্দনা করা। কিন্তু আরও গভীরে গেলে জিনিসটা আরও অনেক ব্যপ্তি এসে যায়। এই ধরণের গ্রন্থ বা শাস্ত্রের রচয়িতারা রচনা করার সময় অনেক কিছুকে মাথায় রেখেই রচনা করেছেন, সাধারণ মানুষের মনে যাতে কোন সংশয় না হয়। তাছাড়া যাঁরা অনেকদিন শাস্ত্রের কথা শুনছেন, অধ্যয়ন করছেন তাঁদের প্রায়ই বাইরের লোকেরা অন্য ধরণের কথা বলে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে, শব্দজাল দিয়ে অনেক রকম সংশয় সৃষ্টি করে দিতে পারে, সেখানে তাদের কথার সঠিক জবাব না দিতে পারলে অনেক রকম সমস্যা হয়ে যাবে। আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল ভক্তি শব্দ এসেছে ভজ্ ধাতু থেকে, ভজ্ মানে ভালোবাসা, একটা জিনিসকে সম্মান দেওয়, আদর করা ইত্যাদি। যেমন আমরা বলি, মাকে আমি ভক্তি করি, মালিককে সেবক ভক্তি করে, আমার কর্মকে আমি ভালোবাসি, সবটাই আসছে ভজ্ ধাতু থেকে। নারদ এবারে এই জায়গা থেকে ভ্রান্ত ধারণা গুলিকে কাটতে শুরু করলেন।

সংস্কৃত ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তিকে কাটাছেঁড়া করলে ভক্তির অর্থ বেরিয়ে আসে ভজনা করা। কোন কিছুর ভজনা করা মানে সেই জিনিসটাকে ভালোবাসে। ভালো মানুষ কাকে বাসে? একটা কিছুকে মানুষ কখন পূজো করে? একটা জিনিসে মানুষ কখন পুরো মন দেয়? যেখানে গিয়ে মানুষ নিজের পরিসমাপ্তিকে দেখতে পায়, যেখানে সে নিজেকে পূর্ণ দেখে। যেমন সেবক দেখছে, আমার মালিকই আমার সব কিছু, এর প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে যদি আমার প্রাণ যায় তো যাবে। মা নিজের সন্তানের মধ্যে নিজের পূর্ণতা দেখে। প্রেমিক দেখে আমার প্রেমেই আমার পূর্ণতা। কামী পুরুষ দেখে আমার কাম, তা সে যে ধরণের কামই হোক, তাতেই আমার পূর্ণতা। ঠাকুর তিন টানের কথা বলছেন, মায়ের সন্তানের প্রতি, সতীর পতির প্রতি আর বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি। সবটাই কিন্তু ভক্তি, ভক্তি মানে ভজ্ ধাতু থেকে আসছে, তার মানে সে ভজনা করছে, কামনা করছে। এবারে এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, আমরা এখন ভক্তির আলোচনা করতে যাচ্ছি। তুমি সাধারণ অর্থে যে ভজনা ভাবছ, ভক্তির কথা ভাবছ যেখানে মা নিজের সন্তানকে ভালোবাসছে, ছেলে মাকে ভক্তি করছে, বিষয়ী বিষয়কে ভালোবাসছে, সতী পতিকে ভালোবাসছে, যত রকমের ভালোবাসা, ভজনার কথা ভাবা যেতে পারে, এগুলোর কথা আমরা বলছি না, আমরা যে ভক্তির কথা বলতে যাচ্ছি সেই ভক্তি এগুলোর পারে। শাব্দিক অর্থে নিয়ে গেলে তোমার মন উপরের দিকে চলে যাবে, তুমি ঐ অর্থে যেও না। এটাকে নারদ এখানেই আটকে দিলেন। ঠাকুর এটাকে পজিটিভ দিক দিয়ে বলছেন, এই তিনটে টানকে এক করে ঈশ্বরের দিকে দিলে তখন এই ভক্তি হয়। কিন্তু এখানে অন্য ভাবে বলছেন, সূত্রাকারে বলছেন বলে কোথাও কোন সংশয় হয়ে যেতে পারে। কারণ ভক্তির বিরুদ্ধে যারা বা যারা নাস্তিক তারা বলবে, ভক্তি মানে তো ভজ্ ধাতু থেকে এসেছে, ভজ্ মানে ভজনা, রাস্থার চ্যাংড়া ছেলেগুলো মেয়েদের দেখেই গান করে, শিস্ দেয়, এরা তো ভজনাই করছে, তুমি

তো এই ভক্তির কথাই বলতে চাইছ। নারদ এটাকে তু শব্দ দিয়ে আটকে দিচ্ছেন, কিন্তু তা নয়। সবটাই যে সহজ করে বলে দিচ্ছেন তা নয়, যেখানে যেখানে সংশয় হতে পারে সেই সেই বিষয় গুলিকে নিয়ে আসছেন।

আমরা মেনে চলছি সূত্রধর্মী সাহিত্য আজ থেকে তেইশশ চব্বিশশ বছর আগের রচনা। তখন যে সাধারণ দেবী দেবতার পূজা করা হত তার সাথে ভূত, প্রেত, যক্ষ এদেরও পূজা করা হত, এই সমস্যাটা ছিল। নারদ বলছেন, ভক্তি মানে এই সাধারণ দেবী দেবতার পূজা বা ভূত প্রেত পূজাও না। আমরা যে ভক্তির কথা বলতে যাচ্ছি এদের পূজা করাটা সেই ভক্তির মধ্যে আসে না। কেন আসে না? এরা সবাই যে পূজা করছে, যে দেবী বা দেবতা বা ভূত, প্রেত, যক্ষের পূজা করছে এনারা সবাই একটা সীমিত জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এটা ঠিকই যে সবাই ভগবানের পূজাই করছে, ভগবানের বাইরে কাউকে পূজা করা হয় না। কিন্তু এগুলো হল ভগবানের খুব সীমিত রূপ। যেমন একজন লোক অফিসে তার বস্‌কে খুব তোয়াজ করে, আগেকার দিনে রাজার দরবারে ভাঁড়, মোসায়েবরা থাকত যারা সব সময় রাজার গুণগান করে যেত। এতে দোষের কি আছে? এটাই দোষের হয়, যখন একজন দেবতা, ইন্দ্র বা কুবেরের ব্যক্তিত্ব বা বিল গেটসের ব্যক্তিকে নেওয়া হবে তখন দেখা যাবে এদের ব্যক্তিত্ব খুব সীমিত। অনন্ত ভগবানের যে গুণ সেখানে এদের গুণগুলো সীমিত। সীমিত কোন জিনিস ভগবানের স্বরূপ হতে পারে না। যে কোন সীমিত জিনিসের পূজা করা কখনই ভক্তি হতে পারে না। ষোল বছরের সুন্দরী যুবতী নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝে না। সারাটা দিন সে শুধু পালিশ করে যাচ্ছে, কখন মুখ পালিশ করছে, কখন পায়ের পাতা পালিশ করছে বা কখন চুল পালিশ করে যাচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার এদিক থেকে দেখছে আরেকবার সেদিক থেকে দেখছে। সেও ভজনা করছে, কিন্তু নিজের ভজনা করছে। কিন্তু সে তার অনন্ত আত্মাকে নিজের শরীরের মধ্যে সীমিত করে দিচ্ছে। সেই শরীরের পূজাকে নারদ আটকে দিচ্ছেন, এটা ভক্তি হবে না। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করা আর আমি জ্ঞান পেতে চাই তাই পড়াশোনা করছি, সীমিত আর অসীমিতের এটাই তফাৎ। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য যে পড়াশোনা করছে সে নম্বরটা পেয়ে যেতে পারবে কিন্তু জ্ঞান নাও পেতে পারে। কিন্তু যে জ্ঞানের জন্য পড়াশোনা করে সে জ্ঞানও পাবে নম্বরও পাবে। দীর্ঘকালীন ক্ষেত্রে দেখা যায় নম্বর কোন কাজে লাগে না, ক্লাশ ফাইভ সিক্সে আমি কি নম্বর পেয়েছিলাম আজ তার কোন দাম নেই। কিন্তু যা শিখেছিলাম সেটাই এখন কাজে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি অনন্ত রূপে যখন আত্মা বা ভগবানের বা ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়, সেই আরাধনাই কাজে দেয়, সেটাই সঠিক। সীমিত রূপটাও ভগবানরই কিন্তু তার ফল সব সময় সীমিত হবে। এখানে আমাদের একটা জিনিসকে ভালো করে বুঝতে হবে, পঁচিশ'শ বছর আগে যে দেবী দেবতার পূজা করা হত তখন সেই দেবী দেবতার রূপেই করা হত। আজকে আমরা যেভাবে দেবী দেবতাদের দেখছি এর কৃতিত্ব পুরো আচার্য শঙ্করের, কারণ তিনি সব দেবী দেবতাদের উপর অনন্তের মুখোশ লাগিয়ে দিলেন। বেদের দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ইন্দ্র, তিনি বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, কিন্তু বেদে ইন্দ্রের উপর মন্ত্রগুলিতে ইন্দ্রকে বলছেন সব জায়গায় তাঁর দৃষ্টি আছে। তাহলে ইন্দ্রের সব জায়গায় দৃষ্টি কি করে হতে পারে? তখনই হতে পারে যখন তাঁর উপর অনন্তের মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হবে। সব জায়গায় তাঁর কান আছে, তার মানে ইন্দ্রের সর্বব্যাপিত্বের কথা বলছেন। সর্বব্যাপিত্ব হতে পারে একমাত্র অনন্তের। ঋষিরা ইন্দ্রের চরিত্র দাঁড় করার সময় তাঁর সীমিত আর অনন্ত দুটো রূপকেই নিয়ে আসছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন অনন্তকে ধারণা করতে পারে না, তাদের কাছে ইন্দ্র হলেন বৃষ্টির দেবতা, ঐরাবত তাঁর বাহন, তিনি আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী। আর আমাদের পুরাণাদির কাহিনীতে ইন্দ্রকে একজন মানুষের মত দেখানো হয়েছে কিন্তু তাঁর মহা ক্ষমতা তার সাথে তাঁর অনেক রকম দোষও আছে কিন্তু তিনি দেবতাদের রাজা। অসুররা ইন্দ্রকে বধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছে, সেখানে অসুরদের পিতা কাশ্যপ, যিনি দেবতাদেরও পিতা, এমন কায়দা করে দিচ্ছেন যাতে অসুররা দেবতাদের উপর জয়ী না হতে পারে। কাশ্যপ তাঁর স্ত্রী, অসুরদের মাকে বলছেন, ইন্দ্রের অনেক দোষ আছে ঠিকই কিন্তু আমাদের এই ছেলেগুলোর থেকে অনেক ভালো। কিন্তু এখন ইন্দ্রের নাম শুনলেই আমাদের মনে পড়ে এই সেই ইন্দ্র যে ঋষি পত্নীর দিকে নজর দিয়েছিল। এই সমস্যা ভারতের পুরো আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মূল্যবোধের মধ্যে ঢুকে গেছে। বরুণের অন্য ধরণের গণ্ডগোল আছে, অগ্নির অন্য ধরণের সমস্যা আছে। সেইজন্য পরের দিকে ঋষিরা এসে সব দেবতাদের ছুড়ে ফেলে দিলেন। ফেলে দিয়ে এমন একজন দেবতার খোঁজ করলেন যাঁর মধ্যে কোন গোলমাল নেই, তখন বিষ্ণু খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলেন। বেদে বিষ্ণু

একজন খুব নগণ্য দেবতা, বেদে কোথাও বিষ্ণুর নামই আসে না। কিন্তু অনন্তের সব গুণ ঋষিরা ঢেলে দিলেন বিষ্ণুর উপর। বিষ্ণুকে সামনে এনে সব দেবতাদের পেছনে ঠেলে দিলেন। পেছনে ঠেলে দিলেই তো হবে না, ওদেরকে এবার ছোট করতে হবে। মহাভারতেই দেবতাদের ছোট করা শুরু হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এসে বেদের দেবতাদের সব জায়গায় ছোট করতে নেমে গেলেন। মহাভারত জনমানস থেকে বেদের দেবতাদের সরিয়ে দিচ্ছে। দেবতারা বৃষ্টি দিচ্ছে, শস্য দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ওদের উপর অনন্তের গুণ চাপাতে যেও না। কিন্তু বেদে দেবতাদের উপর অনন্তের গুণ চাপিয়ে দিচ্ছেন। সব শাস্ত্র পড়লে আমরা এর কিছুই মেলাতে পারব না। ভগবান বিষ্ণুর যে গুণগুলো আজকে আমরা জানি, শিবের যে গুণের বর্ণনা, ঠাকুরের যে গুণের বর্ণনা আমরা জানি, বেদে একই গুণ কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও রয়েছে। বেদ আমাদের মূল গ্রন্থ। এই জিনিসটাই আমাদের বুঝতে হয়, ইন্দ্রাদি দেবতারা বেদের কাছে গুরুত্ব নয়, বেদের কাছে গুরুত্ব হল অনন্তের গুণ, যে গুণগুলোকে বেদে দেবতাদের মাধ্যমে নিয়ে আসছেন। দেবতারা সব অনন্তের মুখোশ, কিন্তু এই মুখোশ যখন কাজ করছে না তখন বলছেন, ভগবান বিষ্ণুকে, ভগবান শিবকে নিয়ে আসা হোক। উপনিষদ সরাসরি বলে দিল আমার কোন মুখোশই লাগবে না, সব মুখোশই ফেলে দাও, তোমরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর। কিন্তু সাধারণ মানুষ গুণ আর তত্ত্বকে ধারণা করতে পারবে না। এই কারণে ঋষিরা গুণ আর তত্ত্বের উপর ব্যক্তিত্ব চাপিয়ে দিলেন। তোমরা এটা পারবে না, তাই এই নাও ব্যক্তিত্ব। সেইজন্য দেখা যায় দেবতাদের হাজার রকমের ব্যক্তিত্ব আছে। দেবতা যদি সম্পত্তি নিয়ে থাকে তখন তাঁকে বানিয়ে দিলেন কুবের। কিন্তু কুবের এত বেশি সীমিত যে, কুবেরের যদি পূজা করা হয় মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সম্পত্তিও ভগবানেরই রূপ, কিন্তু নিকৃষ্ট রূপ। কি করে বোঝান যাবে? তখন নিয়ে এলেন লক্ষ্মীদেবীকে, লক্ষ্মীদেবীকে করে দিলেন বিষ্ণুর ঘরণী। এবার তুমি লক্ষ্মীর পূজো করে, কারণ লক্ষ্মীর পূজা করার সময় মাথায় নারায়ণ থাকবেন। ঋষিদের চিন্তা-ভাবনা যে কত উচ্চমানের ছিলেন এতেই বোঝা যায়। তু বলতে এটাই বোঝাতে চাইছেন, তুমি ঐ সীমিতে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে যেও না। এগুলো একদিনে হয়নি, সম্পত্তিও যে ভগবানেরই রূপ, ওটাকে কুবের থেকে টেনে লক্ষ্মীর উপর নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে ইন্দ্রের এত শক্তি, এত ক্ষমতা, সেটাকেই খর্ব করে দিচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুকে সামনে নিয়ে এসে। কিন্তু বিষ্ণু বেদে দ্বাদশ আদিত্যের একজন ছোট্ট দেবতা। কিন্তু পরের দিকে ঋষিরা এসে নির্গুণ নিরাকারের যত গুণ থাকতে পারে সব বিষ্ণু আর শিবকে দিয়ে দিলেন। কারণ শিব, বিষ্ণু এনারা অপরিচিত দেবতা, অপরিচিত দেবতা হওয়ার জন্য যেমন তাঁর গুণ জানা নেই তেমন তাঁর দুর্গুণটাও জানা নেই। ভারতবর্ষে সব দেবতাদের সরিয়ে দুজন শক্তিশালী দেবতা দাঁড়িয়ে গেলেন, শিব আর বিষ্ণু। অথচ বেদের এক একটা মন্ত্রে ইন্দ্রের নামে সেই একই কথা বলছেন, যে কথা আজকে বিষ্ণুর নামে বলছি। ইন্দ্রের নামে ঐ কথাই বলছেন, যেটা আজকে আমরা ঠাকুরের নামে বলছি। তাহলে এই দুরবস্থা কেন হল ইন্দ্রাদি দেবতাদের? দুরবস্থাটা অন্য জায়গায় হয়ে গেছে। কোথাও আমাদের মনে ইন্দ্র বলতে একটা সীমিত চরিত্র হয়ে গিয়েছিল। সীমিত চরিত্রকে পূজা করা যাবে না। এটাই এখানে নারদ বলছে তু, কিন্তু এই ভক্তি সেই ভক্তি নয় যে ভক্তির কথা আমি বলতে যাচ্ছি।

স্বামীজীর বাণীকে আমরা অনেকে ভুল ধারণা করে নিচ্ছি আবার কেউ ভুলভাল ব্যাখ্যা করে বলছেন মানব সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মানব সেবার থেকে বড় ধর্ম আর হয় না। স্বামীজী মানব সেবার কথা বলছেন অপদার্থ গুলোকে তমোগুণ আর স্বার্থপরতা থেকে বার করে আনার জন্য। স্বামীজী আমেরিকাতে আত্মার মাহাত্ম্যের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন এক মহিলা উঠে বলছেন, স্বামীজী আপনি আত্মার মহিমার কথা বলা বন্ধ করুন, আমি আমার সোনা, বাড়ি, গাড়িতেই আমার আত্মাকে দেখি, এটাই আমার জন্য সত্য। স্বামীজী বলছেন, কোন আপত্তি নেই, হাজার হাজার জন্ম ধরে আপনি আপনার সোনা, গাড়ি, বাড়ি, সম্মানেই আপনার আত্মাকে দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে এগুলো থেকে আপনি যখন বিরক্ত হয়ে যাবেন তখন আত্মার যে বাস্তবিক রূপ সেই রূপের দিকে যাবেন। জগতে যা কিছু আছে সব ভগবানেরই রূপ, যখন সন্তানকে ভালোবাসছে সেটাও ভগবানেরই রূপ, কামী যখন বিষয়কে ভালোবাসছে সেটাও ভগবানেরই রূপ আর যখন ইন্দ্র, মিত্র, কুবেরের কাছে প্রার্থনা করছে সেটাও ভগবানের রূপ। কিন্তু এগুলো সব ভগবানের সীমিত রূপ। সীমিত রূপকে ভালোবাসাটা ভক্তিতে পড়ে না। তু বলতে এটাকেই নারদ বলতে চাইছেন।

কিন্তু তার থাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যেটা পরে বলছেন, এই ভক্তি পরমপ্রেমরূপা, পরম প্রেম। ভগবানের প্রতি ভালোবাসাটাই পরম প্রেম, এটাই ভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমই ভক্তি, বন্ধনীর মধ্যে *সা* তু, কিন্তু থাকছে। কিন্তুটা কেন বলছেন? সেটাই এক এক করে ব্যাখ্যা করছেন। পরম প্রেম জিনিসটা কি সেটাকে পরে ব্যাখ্যা করা হবে কিন্তু তার আগে যে জায়গাটায় সংশয় হতে পারে সেইটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। অন্যান্য যে ইমোশানস্ থাকে সেই ইমোশানস্‌কে ভক্তি বলা যাবে না। ঈশ্বরের প্রতি যদি ক্রোধ থাকে, রাগ থাকে, ঈশ্বরের প্রতি যদি দ্বেষ থাকে তখন কিন্তু এটা ভক্তি হবে না।

শেষ শব্দ হল *পরমপ্রেমরূপা* যেটাকে কোয়ালিফাই করছে তু বলে। এখানেও আমাদের একবার ইতিহাসের দিক দিয়ে যেতে হবে। তার আগে ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বললে জিনিসটা ভালো বোঝা যাবে। বিদেশে এক ঠাকুরের ভক্ত খুব মদ খান। তার এমন বদগুণ যে তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ভদ্রলোক তার পরিচিতদের কাছে বলে, মদ খেয়ে খেয়ে আগে আমাকে গিরিশ ঘোষের মত হতে হবে। গিরিশ ঘোষের মত হয়ে যাওয়ার পর আমি শরণাগতি দিয়ে ঠাকুরের সেবা পূজা করব। এটা ঠিক না ভুল? গিরিশ ঘোষের বকলমা সব জায়গাতেই বলা হয়। এখন যদি বলা হয় বকলমা এভাবে হয় না, আগে তাকে অসহায় হতে হবে। অসহায় হওয়ার জন্য আগে তোমাকে মদ খেয়ে খেয়ে লম্পট হয়ে সব শেষ হয়ে যেতে হবে। আমরা এই আলোচনায় যাচ্ছি না যে এটা ঠিক না ভুল। বিষয় হল, ভক্তি নিয়ে যাঁরা থাকতেন তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখাচ্ছেন ভগবানের বাইরে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে, ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরের বাইরে কিছু হতে পারে না, ঈশ্বরের বাইরে কিছু হওয়াটাই পরস্পর বিরোধী কথা হয়ে যাবে। ইসলাম, জুহুদি, খ্রীশ্চান ধর্মে সহজাত ভাবেই প্রচুর স্ববিরোধী কথা আছে। ঐ সহজাত স্ববিরোধী কথাগুলো শুধু স্ববিরোধী কথাই নয় এটাকে প্রমাণ করতে গিয়ে ওনারা আরও গোলমাল পাকিয়ে দেন। যেমন একটা মিথ্যাকে চাপতে গিয়ে আরও দশটা মিথ্যা কথা এসে যায়, ঠিক তেমনি ওদের একটা গোলমালকে চাপা দিতে গিয়ে আরও অনেক গোলমাল তৈরী করে দেন।

ভগবান সর্বশক্তিমান আর তিনি সর্বজ্ঞ, তাহলে এই গোলমালটা কি করে হচ্ছে? গোলমাল হচ্ছে কারণ ডেভিল আছে। ডেভিল কোথা থেকে এসে গেল? না, শয়তান আছে। খ্রীশ্চানরা শয়তানের ব্যাখ্যা ভালো ভাবে দিতে পারে না। খ্রীশ্চানদের মধ্যে এই ধারণা ঢুকেছে কিছুটা তাদের লেখকদের মাধ্যমে, যারা কেউই ঋষি ছিলেন না, আর কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে আরবী, ফার্সীদের ঐতিহ্য থেকে। এদের মতে, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন তখন এক ফরিস্তা ছিল, তার নাম ইবলিশ। ইবলিশ ভগবানকে খুব ভালোবাসে, এতই ভালোবাসে যে ভগবান ছাড়া সে আর কিছু জানে না। ভক্তির সব থেকে বড় সমস্যা হল, নিম্ন স্তরে ভক্তি খুব গোঁড়া হয়ে যায়। ইবলিশ হয়ে গেল গোঁড়া। ভগবান মানুষের সৃষ্টি করে তার মধ্যে আত্মাকে রেখে দিলেন, ওদের আত্মা হিন্দুরা যে অর্থে আত্মা বলে সেই অর্থে নয়, ওদের আত্মা হল হিন্দুরা যাকে সূক্ষ্ম শরীর বলছে। মানুষ সৃষ্টি করে ভগবান সবাইকে বলে দিলেন তোমরা মানুষের সামনে মাথা নত কর। ভগবানের আদেশে সবাই মানুষের সামনে গিয়ে মাথা নত করল। কিন্তু ইবলিশ বলে দিল, এই মাথা ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর সামনে নত হবে না। ভগবান তখন ইবিলিশের উপর খুব রেগে গেলেন, আমার আদেশ অমান্য করেছ! তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ইবলিশকে ভগবান স্বর্গ থেকে বার করে দিলেন। তার মানে দাঁড়াল, ঈশ্বরকে ভালোবাসার থেকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবার সবাই বিচার করতে থাকুন কোনটা বেশি শ্রেষ্ঠ। পুরো ইসলাম ধর্ম এই ফিলজফির উপর দাঁড়িয়ে আছে – ঈশ্বরকে ভালোবাসাটা গুরুত্ব নয়, ঈশ্বরের আদেশ পালন করাটা বেশি গুরুত্ব। ঈশ্বরের আদেশ মানে কোরাণ, সব কিছুর থেকে কোরাণের কথাকে পালন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুফিরা যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করল, অনেক রকম কথা যে তারা বলছে আমরা মনে করছি তারা মেরিট থেকে বলছে, কিন্তু না, তারাও কোরাণের বাইরে কোন কথা বলছে না। হিন্দু শাস্ত্র জানেই না ঈশ্বরের আদেশ বলে কিছু হয় কিনা।

ইবলিশকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়াতে সে এখন রেগে আছে। রাগের বশবর্তী হয়ে ইবলিশ এখন সব সময় মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু সেও তো দেবদূত। অন্য দিকে জুদাইজিমেও অশুভ শক্তি আছে। পার্সিদের মধ্যে আরও বেশি এর প্রভাব দেখা যায়, তাদের কাছে আছে আহুর মাজদা আর আহুরমন। আহুর মাজদা হল আলোর দেবতা আর আহুরমন অন্ধকারের প্রতিভূ। এই

দুজনের মধ্যে লড়াই সব সময় চলছে। এই জিনিসটাই ইসলামে এসে গেল শয়তান রূপে। কিন্তু শয়তানকে তো আল্লার সমান করা যাবে না, তাই তাকে আল্লার থেকে নীচে রাখা হল। এই ধারণাগুলোই পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতায় তালগোল পাকিয়ে এমন ঘোট পাকিয়ে রেখেছে যে এখনও তারা এই জটিলতা থেকে বেরিয়ে ধর্মের বাস্তব যৌক্তিকতাকে মানতে পারছে না। স্বামীজী আমেরিকাতে লেকচারে এই জিনিসটাকেই সামনে এনে ওদের তুলোধুনো করে রেখেছেন। স্বামীজী বলছেন, শয়তান যেভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে সে ঈশ্বরের থেকে বেশি শক্তিশালী, আমাকে যদি পূজা করতে বলা হয় আমি তো শয়তানকেই পূজা করব, কারণ আমি শক্তিকে মানি। খ্রীশ্চানদের আইডিয়াস গুলো সব বিচিত্র ধরণের, ভালোটা সব ভগবানের উপর আর বাজে যা কিছু হবে সব শয়তানের উপর চাপিয়ে দেবে। আবার বলবে মানুষ হল স্বাধীন, ভালো কাজ করার তোমার স্বাধীনতা রয়েছে, খারাপ কাজ করার তোমার স্বাধীনতা রয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে ভগবান সর্বজ্ঞ হবেন কি করে! আধ্যাত্মিক দর্শনের যেগুলো মূল সেগুলোকে না ছোঁওয়ার জন্য সব কিছু গোলমাল হয়ে আছে। আমাদের কাছেও ঐ সমস্যা আছে। ভালোটা কার মন্দটা কার? হিন্দু ধর্মে বলে ভালোটা ভগবানের। তাহলে মন্দটা কার? সেটাও ভগবানের। কংস, রাবণ এরাও ভগবানের। তাহলে রাবণ ভগবানের সাথে লড়াই করছে আর এত যে অসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ লড়াই করছে? সব মায়ের ইচ্ছাতেই করছে, এরাও মায়ের। এটাই ভক্তিশাস্ত্রে এসে বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। ভগবানের ক্ষমতা দেখানোর জন্য, অসুর, দৈত্য, রাক্ষস সব নিয়ে আসা হল, এবার এনারা একটা নতুর পরিভাষা নিয়ে এলেন, কারণ ভগবানের বাইরে কিছু যাবে না। এনারা তাই নিয়ে এলেন বৈর ভাবের সাধনা। ঠাকুরও বৈর ভাবের সাধনের কথা বলছেন আর রামায়ণাদির মত গ্রন্থে বৈর ভাব সাধনকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জয় বিজয়ের কাহিনী সবারই জানা, দুজন ভগবান বিষ্ণুর দুই দ্বারাপাল। সনকাদি চার কুমার বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন। একবার চার কুমার ভগবান বিষ্ণুর সাথে দেখা করতে বৈকুণ্ঠে এসেছেন। জয় বিজয় চারজনের পথ রোধ করে আটকে দিয়েছে আর বস্ত্রহীন দেখে হেসে ফেলেছে। চারজন কুমার তাতে খুব রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন তোমরা অসুর যোনিতে গিয়ে জন্ম নাও। জয় বিজয় বলছেন আমরা তো অসুর যোনিতে গিয়ে জন্ম নেব কিন্তু এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হব কি করে? তাদের বলা হল, তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা কর, উপাসনা করলে সাত জন্মেই ফেরত চলে আসবে আর বৈর ভাবে সাধন করলে তিন জন্মেই বৈকুণ্ঠে ফেরত চলে আসবে। বৈর ভাবে তাড়াতাড়ি কেন? কারণ বৈর ভাবে মানুষ সব সময় শত্রুর কথা ভাবতে থাকে, সেইজন্য তোমাদের সব সময় ঈশ্বরের চিন্তা হতে থাকবে। এই কাহিনী শোনার পর এখন সবাই যদি বৈর ভাব সাধনে নেমে পড়ে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে? মায়ার জগতে এটা থেকে সেটা হবে, সেটা থেকে এটা হবে এই কথা কখনই বলা যাবে না, ঠাকুর এই কথা বারবার বলছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত সাধারণ মনের অধিকারী, তাই এই বৈর ভাব আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারব না। আমরা সবটাতেই কার্য, কারণ খুঁজতে থাকি। তখন রাবণের ব্যবহার, কংসের ব্যবহার এগুলোকে দাঁড় করাতে পারি না। ঋষিরা বলে দিলেন, ঠিক আছে এটাও একটা সাধনার পথ। আসলে বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে কিছু নেই, বলতে চাইছেন, তুমি যাই কর না কেন জানতায় হোক আর অজানতায় হোক সবাই ঈশ্বরের দিকেই যাচ্ছে। এখন সেখান থেকে যদি কেউ বৈর ভাব নিয়ে আসে, ঈর্ষার ভাব, মাৎসর্যের ভাব নিয়ে আসে তখন কি হবে? নারদ বলে দিচ্ছেন, এটাকে আটকাও, ভক্তি মানে তা নয়। তার মানে বৈর ভাবে সাধনটাও ভক্তি নয়, কারণ ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। বৈর ভাব প্রেমের বিপরীত। সেইজন্য ভাগবতে, অধ্যাত্ম রামায়ণে বা যেখানেই বৈর ভাব সাধনের কথা বলা হয়েছে, ঐ বৈর ভাব সাধনকে এই ভক্তসূত্র অনুযায়ী কখনই অনুমোদন করা যাবে না। যদিও অধ্যাত্ম রামায়ণে বৈর ভাব সাধনকে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সেখানে মহাবীর হনুমানকে দিয়ে রাবণকে বলানো হয়েছে, রাবণ তোমার এই হঠকারিতা ছাড়, তুমি যে মনে করছ বৈর ভাবে সাধন করে শ্রীরামকে খুব সহজে পেয়ে যাবে, কিন্তু তা নয়, এটা ভুল পথ, এই পথ তুমি ছাড়। বৈর ভাব যদি সাধন পথের অঙ্গই হয় তাহলে হনুমান নিষেধ করছেন কেন? কারণ ভক্তি মানে পরমপ্রেম, এই সাধনা ঠিক নয়, কোন অবস্থায়, কোন ভাবেই এই ভাবে সাধন করা যায় না।

গীতায় চার ধরণের লোকের কথা বলছেন, এই চার ধরণের লোক ঈশ্বরের আরাধনা করে, আর্ত, অর্থার্তী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী, বলছেন এগুলো কোনটাই ভক্তি নয়। আর্ত ভাবে যে আরাধনা করছে, এটা ভক্তি

নয়, জিজ্ঞাসু ভাবে করছে এটাও ভক্তি নয় আর কামী, যে কিছু চাইছে সেটাও ভক্তি নয়। ভক্তি কখন হবে? পরমপ্রেম, ভক্তির একমাত্র শর্ত পরমপ্রেম। পরমপ্রেমের সাথে জাগতিক প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই, ছোটখাটো দেবী দেবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আর সব ধরণের ছোটখাটো যত ইমোশান আছে তার সাথেও কোন সম্পর্ক নেই। জাগতিক জিনিসের প্রতি ভালোবাসাটা ভক্তি নয়, দেবী দেবতাদের প্রতি যে ভক্তির কথা আমরা জানি সেটাও ভক্তি নয়, যেখানে যত কাম-বাসনাজনিত যে ভক্তি সেটাও ভক্তি নয় আর যেখানে কোন রকম ইমোশান জড়িয়ে আছে সেটাও ভক্তি নয়। যেমন বৈর ভাব, এটা ভক্তি নয়। তু শব্দ দিয়ে সব কটাকে সরিয়ে দেওয়া হল। নারদ বৈর ভাবকে ভক্তি বলে মানছেন না, কারণ এখানে ইমোশান জড়িয়ে আছে আর ভক্তিকে সব সময় পরমপ্রেম হতে হবে।

এরপর আসছে *অস্মিন্, অস্মিন্* মানে ঈশ্বরকে। *অস্মিন্* শব্দ বলার পর এখান থেকে ভক্তির জটিলতা আরও রূপ নিতে শুরু করল। তু বলে দিয়ে কোয়ালিফাই করে দিল, কাকে? *অস্মিন্,* মানে ঈশ্বরকে। এই ঈশ্বর কে? ঈশ্বর বলতে আমি কাকে বুঝব? ভক্তিশাস্ত্র বেদান্তেরই অন্তর্গত, বলাই হয়ে থাকে Bhakti Schools of Vedanta, ভক্তি বলে আমাদের আলাদা কোন দর্শন নেই। আমাদের ষট্‌দর্শন, দর্শন ছয়টি, সাংখ্য, ন্যায়, যোগ, বৈশাষিক, পূর্বমীমাংসা আর উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত, এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে ভক্তি বলে কোন দর্শন হয় না। বেদান্তের আবার কয়েকটা আলাদা আলাদা ভাগ আছে, ভক্তি বেদান্তেরই ছোট্ট একটি অঙ্গ। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ এগুলো সবই বেদান্তের বিভিন্ন শাখা, ভক্তি ওর মধ্যেই পড়ে। ভক্তি যেহেতু বেদান্তেরই অন্তর্গত সেইহেতু ভক্তিকে উপনিষদ, গীতা আর ব্রহ্মসূত্রের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। ঈশ্বর বা পরম সত্তা কে? ব্রহ্মসূত্র খুব সহজ ভাবে তার দ্বিতীয় সূত্রে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র খুব নামকরা একটি সূত্র। যখনই কেউ বলবে ঈশ্বর কে বা কি? ওনারা সব সময় বলে দেবেন *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। ঠাকুরও ঠিক এই জিনিসটাকেই নিয়ে এসেছেন। লাটু মহারাজকে একজন বলছেন, ঈশ্বর আছেন এর কী প্রমাণ আছে? ঠাকুর লাটু মহারাজকে বলছেন, তুই বলতে পারলি না কেন, যিনি এই সব জীব, জগৎ, গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। আমরা খুব সহজ অর্থে মনে করছি ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বর নিজে সব কিছু করেছেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ অর্থে বলছেন না, ঠাকুর ব্রহ্মসূত্রের অর্থেই বলছেন, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*। যেখান থেকে সৃষ্টি ঈশ্বর সেটাই। আমরা মনে করি যেমন মালী বাগান করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আমরা সবাই এই অর্থেই নিই। এটাকে খুব সহজ ভাবে আক্রমণ করা যায়।

ভাগবতও শুরু হয় *জন্মাদ্যস্য যতঃ* দিয়ে, কারণ যাঁরাই বেদান্তের পথ নেবেন, যে পথই নিন, অচিন্ত্যভেদাভেদই নিন, দ্বৈত নিন, যাই নিন না কেন সবাইকে ব্রহ্মসূত্রকে নিতেই হবে। কারণ বেদান্তের যা কিছু আছে সব সূত্রাকারে ব্রহ্মসূত্রে রাখা আছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ,* এর মূল বক্তব্য হল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি যেখান থেকে। কিন্তু পরে সমস্যা লাগে 'যেখান থেকে'কে নিয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে আর সৃষ্টির পদ্ধতিকে নিয়ে। রামানুজরা, যাঁরা ভক্তশাস্ত্রের গোঁড়া, তাঁরা বলেন সগুণ সাকার ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হয়। কিভাবে হয়? তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আর এই জীব, জগৎ যা কিছু আছে সবটাই বাস্তবিক কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা কখন কাল্পনিক হবে না। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত এই ব্যাপারে খুব কড়া। দ্বৈতবাদীরা যা বলছে এটাকে তাঁরা পুরোপুরি মানছেন, কিন্তু তার সাথে ঐ জায়গায় একটা বাক্য যোগ করেন, এগুলো সবই মায়ার রাজ্যে। আমরা আগেও বলেছি যে, মায়া মানে কল্পনা নয়। আমরা জানি পশুপাখিরা কল্পনা করতে পারে না কিন্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে কিন্তু সেই কল্পনা কল্পনা রূপেই থেকে যায়, কিছু মানুষ তার কল্পনাকে সাকার রূপ দিয়ে দেয়। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা বাড়ি তৈরী করার আগে কল্পনা করে নেয়, বাড়িটা এই রকম হতে পারে, পরে সেটাকেই সে মূর্ত রূপ দিয়ে দেয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দ যখন কিছু ভাবেন তখন তাঁর ভাবাও যা জিনিসটা হওয়াটাও তাই। এই তিনটে স্তরে, পাথর কিছু ভাবতে পারে না, পশুপাখিরা ভাবতে পারে কি পারে না আমরা জানি না, হয়ত পারে না, এর কোন কারণ থাকতে পারে। মানুষ যখন ভাবে সেই ভাবাটা কখন সাকার রূপ পায় কখন পায় না। যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা করে দেয় বাকিরা পারে না। কিন্তু করলেও তার চিন্তা আর তার করাটা দুটো আলাদা জিনিস। ইঞ্জিনিয়ার মাথায় একটা বাড়ির যখন কল্পনা করছে আর যখন বাস্তবে গিয়ে বাড়িটা বানিয়ে দিচ্ছে তখন দুটো আলাদা হয়ে যায়। সচ্চিদানন্দ যা কিছু ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর যেটা ভাবেন সেটাই সাকার, সেটাই মূর্ত রূপ হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা করাটাকেই মায়া বলে। যদি এটাকে মায়া না বলা হয়

তাহলে ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মের দর্শনের মত অনেক সমস্যা এসে যাবে, বেদান্ত দর্শনে অনেক গোলমাল এসে যাবে। এমনিতে খুব সহজ করে বলে দেওয়া যায়, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর সৃষ্টি করেছেন, আমরা ঠাকুরের সেবক ইত্যাদি। এসব কথা আমাদের মত বোকা মুর্খদের কাছে ঠিক আছে, কিন্তু দর্শনের মধ্যে নিয়ে এলে আর দাঁড়াতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, গ্রামে তুমি কুস্তি লড়ছ আর দেখাচ্ছ তুমি কত বড় পালোয়ান, ওটা তোমার গ্রামেই ঠিক আছে, কলকাতায় এসো তবে বোঝা যাবে তুমি কত বড় পালোয়ান। আমি আপনি একটা দর্শন দিয়ে যাচ্ছি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর সব দেখছেন, চরণামৃত খাও আর খিচুড়ি খাও তাতেই হবে। যাঁরা বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে এই ধরণের কথা বললে আমাদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন। আকবর যখন বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিয়ে দিন এলাহি শুরু করল তখন সেটা দুদিনও দাঁড়াল না। আর কেশবচন্দ্র সেন, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ করলেন, আজকে কলকাতায় কয়েকটা বাড়ি তার ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আধ্যাত্মিক শক্তি আর দর্শনের মেলবন্ধন না হলে কোন ধর্মই চলতে পারে না। দুটোর মধ্যে একটা ঘাটতি হলেই ধর্ম দাঁড়াতে পারবে না। নির্গুণ নিরাকারের মায়াশক্তিতেই সৃষ্টি আসুক আর সগুণ সাকারের বাস্তবিক সৃষ্টিই আসুক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আজকের দিনে আমরা যেভাবে দর্শনকে পাই তাতে নির্গুণ নিরাকার যা সগুণ সাকারও তাই। আচার্য শঙ্করও বারংবার জোর দিয়ে বলছেন নির্গুণ নিরাকারাও যা সগুণ সাকারও তাই। নির্গুণ নিরাকার যেমনি চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক তেমনি একজন সৃষ্টিকর্তা হয়ে গেলেন, সেই সৃষ্টিকর্তাই সগুণ সাকার, এটাই নির্গুণ নিরাকারের রূপ, যে রূপকে আমরা চিন্তন করতে পারি, যে রূপকে আমরা ভাবরাজ্যে দেখতে পারি, যিনি আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন, আমাদের উপর কৃপা করেন। তাই *জন্মাদ্যস্য যতঃ* নির্গুণ নিরাকারেও যা, সগুণ সাকারেও তাই, সবটাই এক।

কিন্তু সমস্যা হল নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান করা যায় না। যেমন সত্যই কলির তপস্যা ঠাকুরের এই কথা মুখে বলে দিলেই সত্য সাধনা হয়ে যাবে না, যে কোন তত্ত্ব কথা বলে দিলেই সাধনা হয় না, ওটাকে মূর্ত রূপ দিতে হবে। গীতায় বলছেন, *ক্লেশোঽধিকরস্তেষামাব্যক্তাসক্তচেতসাম্*, অব্যক্তের উপাসনা, নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা খুব কঠিন। কাদের কাছে কঠিন? যাদের দেহবোধ প্রবল, দেহে যাদের আসক্তি আছে। সেইজন্য তাদের জন্য ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ মানেই সগুণ সাকার। কেউ বলতে পারে নির্গুণ নিরাকারে কি ভক্তি হয় না? অবশ্যই হবে, না হওয়ার কিছু নেই। পুরো ইসলাম ধর্মই তো নির্গুণ নিরাকারের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যদিও আল্লার রূপ, তাঁর ঘোড়ার অনেক কিছু বর্ণনা আছে, কিন্তু ওটা যেন নির্গুণ নিরাকারেরই রূপ। জহুদি ধর্মেও তাই, তাদের যে ভগবান তাঁর নাম জেহোবা, জেহোবার শব্দের অর্থই হল যাঁর নাম করা যায় না, এটাই নিরাকার। কিন্তু আবার আছে, ভগবান কখন এই রূপে কখন সেই রূপে আসছেন। তা সত্ত্বেও নির্গুণ নিরাকারে ভক্তি হয়। ব্রাহ্ম সমাজও এটাই করতে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছিল। কারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম উপলব্ধির উপর আধারিত ছিল না, শুধু কথাগুলোকে নিয়েছিল। কেউ যদি কথামৃতের কয়েকটা কথাকে নিয়ে একটা নতুন ধর্মকে দাঁড় করায় তাতে কি হবে? প্রথম প্রথম পাঁচজন লোক আসবে ঠিকই। কিন্তু যেদিন সে চলে যাবে ধর্মটাও সেদিন চলে যাবে। যেখানে আধ্যাত্মিক শক্তির যোগান থাকে সেটাই চলতে পারে বাকিরা চলতে পারে না। হিন্দু ধর্মের দর্শন প্রচণ্ড জমাট, এখানে তাই দুটোকে পুরো আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে, নির্গুণ নিরাকারের সাধককে বলছেন জ্ঞানী আর সগুণ সাকারের সাধককে বলছেন ভক্ত। আলাদা রূপে চিহ্নিত করে দিয়ে আবার বলে দিচ্ছেন, সগুণ সাকারও যা নির্গুণ নিরাকারাও তাই, তোমার মনের গঠণ যেমনটি তেমনটি তোমার পথ ঠিক করে দেওয়া হল, দুটোকে মিশিয়ে দিও না। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ঠাকুর দুটোকেই নিচ্ছেন। তখন *জন্মাদ্যস্য যতঃ* কি হবে? ওটাই হবে, যখন নির্গুণ নিরাকারে আছেন তখন সৃষ্টি করেন না আবার যখন সগুণ সাকারে আছেন তখন সৃষ্টি করেন। কারণ মায়াকে সৃষ্টি রূপে নেওয়া যায় না, কিন্তু যে জায়গাতে মায়াকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেই জায়গাতে সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এসে যাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, জল হেললে দুললেও জল শান্ত থাকলেও জল। হেলাদোলা মানে সৃষ্টি, সৃষ্টি হওয়া মানে *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এসে যাচ্ছে। যে পয়েন্টে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্তা সৃষ্টি করছেন, আমরা তাঁর যে নামই দিই না কেন তাতে বেদান্তের কিছু আসে যায় না।

স্বামীজীও absolute আর relativeএর কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যে জায়গাতে দেশ, কাল ও কার্য-কারণ শুরু হয় ঐ জায়গাটাই মায়ার বিভাজন রেখা। সাংখ্যরা এটাকেই বলছেন প্রকৃতি, অন্যান্য দর্শন

এটাকে অন্য শব্দ দিয়ে সম্বোধিত করেন। বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে চৈতন্যকে জড়ের মত প্রতীত হতে শুরু হয়ে যায়। চৈতন্য জড় তো কখনই হতে পারে না, কিছু একটা বিভাজন রেখা থাকতে হবে। সেই বিভাজন রেখাটাকে বেদান্তীরা বলেন মায়া। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা, রামানুজ, মাধ্বাচার্যরা এটা মানেনই না, তাঁরা বলেন নারায়ণরই আরেকটা রূপ নির্গুণ নিরাকার, নির্গুণ নিরাকার নারায়ণেরই মায়া রূপ, সগুণ সাকারটাই আসল, সৃষ্টি বাস্তবিক। বেদান্তীরাও পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার সবাই নিতে পারবে না, তাই তার সগুণ সাকার লাগবে। সগুণ সাকারে একটা concrete object দরকার, যে objectএর উপর সে তার সব ভাব ভালোবাসা, সব ইমোশানকে ঢালতে পারবে। এই ঢালাঢালিটা কয়েক রকমের হয়। এখানে *অস্মিন্* বলতে গিয়ে কোন নাম বলছেন না, নারায়ণ বা কৃষ্ণ কিছুই বলছেন না, শুধু বলে দিলেন *অস্মিন্*, এর প্রতি। এর প্রতিটা কে হতে পারেন? এর প্রথমটা হয় সগুণ সাকার, সগুণ সাকারের প্রতি ভক্তি করা হয়। দ্বিতীয় অবতার, যে কোন অবতারের যে পূজা করা হয়, আমরা যেভাবে অবতারকে মানি, এটাও *অস্মিন্*। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই দুটো খুব সুন্দর ভাবে আলাদা করে দেখিয়েছেন। তিনি বলছেন সগুণ সাকার যিনি আর ভগবান যিনি তাঁর ষড়ৈশ্বর্য সব সময় থাকে আর তিনি নিজের মায়াকে অবলম্বন করে অবতার রূপে আসেন। তাহলে ভগবানের দুটো রূপ হয়ে গেল, একটা ভগবান নারায়ণের রূপ বা ভগবান বিষ্ণুর রূপ আরেকটা অবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণ রূপ। কেউ যদি ভগবান নারায়ণের পূজা করে তাতেও হবে আর কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে তাতেও হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপেই দেখতে হবে। কারণ এই পূজা পরম প্রেমের দিকে নিয়ে যাবে, সেইজন্য যাঁর পূজা করা হবে তাঁর মধ্যে ভগবানের সব শ্রেষ্ঠ গুণই যেন থাকে।

তৃতীয় হল বিশ্বরূপের যদি ভক্তি করা হয়। বিশ্বরূপ মানে সমস্ত মানব জাতির পূজা করা। এই ধারণা বেদেই এসেছে, যেখানে বলছেন *বিশ্বতো মুখঃ*। স্বামীজী যে দরিদ্র নারায়ণের পূজার কথা বলছেন, সব ভারতবাসীর সেবার কথা বলছেন তখন এটাই বিশ্বরূপ। মানুষকেও যদি ভগবান রূপে পূজা করা হয় তাতেও *অস্মিন্* হবে। ঠাকুর কতবার বলছেন, মানুষের মধ্যে তাঁর বেশি প্রকাশ। চতুর্থ হলেন অন্তর্যামী, আমার হৃদয়ে যিনি আছেন তাঁরই পূজা করা। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের যে সাধনার বর্ণনা আছে সেখানে ঠাকুর সবটাই করেছেন, এর প্রত্যেকটি সাধনা ঠাকুরের করা আছে। অন্তর্যামী মানে, আমাদের ভেতরে ভগবান আছেন, আমরা তাঁকেই পূজা অর্চনা করছি। পঞ্চম, যে কোন প্রতীক বা প্রতিমার পূজা করা। যেমন সূর্য, সূর্যের উপাসনাতে এই ভেবে করা হচ্ছে যে, ভগবানই এই সূর্য রূপে এই জগতকে আলোকিত করছেন বা ওঁ এর উপাসনাও যদি কেউ করেন তাতেও হবে। ওঁ উপাসনার কথা উপনিষদেও আছে, আমাদের কাছেও প্রচলিত। ওঁ উপাসনা করুন, ঠাকুরকে প্রতিমা রূপে বেলুড় মঠে উপাসনা করুন, দরিদ্র নারায়ণ রূপে ঠাকুরের সেবা করুন, ঠাকুরকে অবতার রূপে করুন, সবটাই এক। কিন্তু সেখানে পরমপ্রেম ঢালতে হবে। ষষ্ঠ গুরুর উপাসনা, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় গুরু আর ইষ্ট এক এই ভাবের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। গুরুর মধ্যেই কেউ যদি নারায়ণ দেখে তাতেও হবে, কিন্তু পরমপ্রেম আসতে হবে। সপ্তম হল বিরাটের পূজা। আগে বিশ্বরূপের কথা বলা হল, বিশ্বরূপে মানবজাতিকে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু বিরাটে সৃষ্টির সব কিছুই এসে যায়, চন্দ্র, সূর্য, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র সবটাকে মিলিয়ে বিরাট। দক্ষিণেশ্বরে গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে, ঠাকুর দেখছেন সেই বিরাটের সামনে ফুলের তোড়া নিবেদন করা হয়েছে। অষ্টম হল আত্মা, আত্মারও পূজা হয়, আত্মা বলতে বেদান্ত বা উপনিষদের আত্মা। মোটামুটি এই আট রকম উপাসনা হতে পারে, কিন্তু এর বাইরে আরও অনেক কিছু হতে পারে। এই আটটির মধ্যে যে কোন একটিতে যদি পরম প্রেমকে পুরোপুরি ঢেলে দেওয়া যায় তাতেই হবে, তবে বাকি জিনিসগুলো বাদ চলে যাবে। এই আটটি জিনিসের কোথাও কোন সীমিত ভাব আসে না, কিন্তু যদি বলে বাড়ির লোককে ভালোবাসলে কি হবে না? না, সেটা হবে না, কারণ ওখানে সীমিত রূপ এসে যাচ্ছে। তাহলে ঠাকুর যে বিধবা মহিলাকে বলছেন, তোমার ঐ ভাইপোকেই তোমার ইষ্ট মনে করে ভালোবাস। কী করে বলছেন? এখানে ভাইপো প্রতীক রূপে আসছে, জীবন্ত কিন্তু প্রতীক রূপে ভালোবাসতে বলছেন। *অস্মিন্*, তুমি কাকে পরমপ্রেম দেবে? মোটামুটি এই আটটি জিনিসকে বলা হল। এই আটটির মধ্যে যে কোন একটিতে সেই অনন্তের গুণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এর যে কোন একটার উপর নিজের ভক্তি ঢালা যায়।

দ্বিতীয় সূত্রের শেষ শব্দ *পরমপ্রেমরূপাঃ*। এর আগে *অস্মিন্* শব্দে বলছেন ঈশ্বরের প্রতি। ঈশ্বর কে? ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*, যেখান থেকে সৃষ্টি। এটাই ঈশ্বরের মূল কথা।

সেই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। আমরা যেমন বলি কুকুর প্রভু ভক্ত বা মা বাবার প্রতি যে ভক্তি সেটাও ভক্তি, এই রকম গুরুর প্রতি ভক্তি, সঙ্ঘের প্রতি ভক্তি, এই ধরণের ভক্তি নারদ ভক্তিসূত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। আর ভক্তির যে মূল অর্থ, ভক্তি বলতে যে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বোঝায় সেটাও এর মধ্যে পড়ছে না। এখানে ভক্তিকে বলছেন *পরমপ্রেমরূপা*। ভক্তির দুটো শব্দ এখানে আনছেন, *অস্মিন্* আর *পরমপ্রেমরূপা*। ভক্তিসূত্রে মোটামুটি এই দুটো জিনিসকে নিয়েই পরের দিকে আলোচনা চলতে থাকবে, একটা object কর্মের দ্বিতীয়া, কর্তা মানে subject আর ক্রিয়া। Subject, Object আর Verb এই তিনটে বেদান্তে কিভাবে চলে আর ভক্তিমার্গী বেদান্তে কিভাবে চলে আলোচনা করা হবে। ভক্তিমার্গী বেদান্তে তিনটে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় কিন্তু বেদান্তে তিনটে শেষে গিয়ে এক হয়ে যায়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিনটে এক হয়ে যায়। ভক্তিতে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান এক হয়ে গেলে ভক্তি বলা যাবে না। ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলছেন ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এক, এখানে ভক্তি না বলে ভাগবত বলছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরও যা ঈশ্বরের কথাও তাই আর যিনি ভক্ত তিনিও এক। কিন্তু যে অর্থে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান বেদান্তে এক হয়ে যায় সেই অর্থে ভক্তিতে এক হয় না। এটাকে নিয়েই এখন আলোচনা চলতে থাকবে।

অস্মিন্, তাঁর প্রতি, তাঁকে সগুণ সাকার বলুন, নির্গুণ নিরাকার বলুন সেটা আপনার ব্যাপার, আর সহজ ভাষায় বলছেন যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি স্রষ্টা। তাঁর প্রতি যে পরম প্রেম মানে সর্বোচ্চ প্রেম, সেই পরমপ্রেমরূপার কথাই এখানে বলছেন। সর্বোচ্চ প্রেম আর নিকৃষ্ট প্রেম কি হতে পারে? মানুষের মধ্যে ছোট থেকে বড় সবারই মধ্যে প্রেম আছে, সবাই কিছু না কিছু প্রেম করে। প্রেমের পরিণতি আনন্দ, ভালোবেসে মানুষ আনন্দ পায়। যে ভালোবাসা কষ্ট দেয় সেটা কখন ভালোবাসা হতে পারে না। ভালোবাসার পরিণতি সব সময়ই আনন্দ হতে হবে। ভালো যেখানে বাসা বেঁধেছে সেটাই ভালোবাসা। কে বাসা বেঁধেছে? ভালো, ভালো মানেই আনন্দ। প্রেম ভালোবাসা একই জিনিস। প্রেমের পরিণতি সব সময়ই আনন্দে হবে। যদি প্রেমে কষ্ট হয় তাহলে ওটা কখনই প্রেম ছিল না। এই প্রেমকে আনন্দের দিক থেকে তিন রকম বলছেন, ঠিক ঠিক যে আনন্দ হয় সেটা তিন রকমের হয় – বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। যে আনন্দের পেছনে জাগতিক কিছু জড়িয়ে থাকে সেটা বিষয়ানন্দ। পড়াশোনা করে আনন্দ পাচ্ছে, এটাও কিন্তু বিষয়ানন্দ, মাকে ভালোবেসে যে আনন্দ এটাও বিষয়ানন্দ, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, জগতের যে কোন বস্তুকে ভালোবেসে যে আনন্দ সবটাই বিষয়ানন্দ। শাস্ত্র অধ্যয়ন করাটা বিষয়ানন্দের মধ্যে আসতে পারে আবার ভজনানন্দের মধ্যেও আসতে পারে। ব্রাহ্মণরা যখন বিদ্যার্জনের জন্য টোলে বা গুরুগৃহে শাস্ত্র পড়ছেন সেটা কিন্তু তখন বিষয়ানন্দের মধ্যে চলে যাবে, কারণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমি অর্থোপার্জন করতে পারব। কিন্তু ঐ শাস্ত্রই যখন নিজের মনের আনন্দের জন্য অধ্যয়ন করছে ঐ আনন্দই ধীরে ধীরে ভজনানন্দ হয়ে যায়। কিন্তু ভজনানন্দও একটা সীমারেখা। গীতাতে ভগবান তিন রকম সুখের কথা বলছেন, সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ এবং তামসিক সুখ। সেখানে সাত্ত্বিক সুখের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, যেখানেই জ্ঞানের ব্যাপার, যেখানেই সুখের ব্যাপার আছে সেটাই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ বিষয়ানন্দ আর ভজনানন্দের সীমারেখা। কোন জায়গাতে গিয়ে বিষয়ানন্দ হয়ে যাবে, আর কোন জায়গাতে গিয়ে ভজনানন্দ হবে বলা খুব মুশকিল। ঈশ্বরের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা এই ভাব নিয়ে কেউ যদি শাস্ত্রে তাঁর কথা শুনছে, তাঁর কথা বলছে, তাঁর কথা স্মরণ করছে তখন ওটাই ভজনানন্দ হয়ে যায়। কিন্তু ভজনানন্দ হল মাঝের দরজা, দরজার একদিকে বিষয়ানন্দ উল্টো দিকে ব্রহ্মানন্দ। ভজনানন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দে যাওয়া খুব কঠিন আবার বিষয়ানন্দে চলে যাওয়া খুব সহজ। কারণ ভজনানন্দও সত্ত্বগুণের একটা রূপ, এখনও ত্রিগুণাতীত রূপ নেয়নি। বিষয়ানন্দ আর ভজনানন্দ এই দুটো থেকে একটা তৃতীয় অবস্থায় চলে যায়, যাকে বলছেন ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দে একমাত্র ঈশ্বরকে নিয়েই আছেন, ওখানে আর কিছু নেই। ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ অবস্থার একটা খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। একজন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা, যেমন যেমন তার গর্ভ বৃদ্ধি পায় তেমন তেমন তার শাশুড়ি কাজ কমিয়ে দেয়। বিষয়ানন্দ কমছে, কমতে কমতে আসছে ভজনানন্দ। এরপর যখন সন্তান হয়ে যায় তখন সে শুধু সন্তানকে নিয়েই থাকে, সন্তানের বাইরে আর কিছু নেই। এটাই ব্রহ্মানন্দের অবস্থা যেখানে তার সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। ভজনানন্দে জাগতিক কর্মের বাহুল্য কমে যায়, চার রকম জিনিসের দিকে যে এতদিন মন যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এখানে যে পরমপ্রেমরূপা বলছেন, পরমপ্রেমরূপা দিয়ে ব্রহ্মানন্দের কথাই বলা হচ্ছে। এমনকি

যাঁরা প্রচুর জপ-ধ্যান করছেন, সারাদিন জপ-ধ্যান নিয়েই আছেন, এখনও কিন্তু এটাকে পরমপ্রেমরূপা বলা যাবে না। একমাত্র ঈশ্বরকেই নিয়েই আছেন তখনই শুধু বলবেন পরমপ্রেম, যেটা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি। কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে যাঁরা ভক্তি সাধনা করছেন, যাঁরা ভক্তিতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন, সেখানে দুটো কথাই বলা হয়। সাধনার স্তরের অবস্থা দিক দিয়ে বলা হলে তখন হবে ইষ্টের প্রতি পূর্ণ অনুরাগ, ইষ্টের বাইরে আর কিছু দেখেন না। এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল জ্ঞানেরও কয়েকটা স্তর আছে, তার মধ্যে একটা স্তর আছে যেখানে সে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তব সাক্ষাৎ হয়নি। ভক্তিতেও ঐ স্তরকে নেওয়া যেতে পারে, কারণ এখন তিনি ইষ্টকে ছাড়া আর কিছু দেখছেন না। ভক্তিশাস্ত্রে পরম প্রেমের সংজ্ঞাই হল অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা।

একটা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা, এই ভালোবাসার উপমাকে দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে বোঝান হয়। আজ পর্যন্ত যত প্রেমের কাহিনী লেখা হয়েছে তার মধ্যে লায়লা মজনুর কাহিনীই শ্রেষ্ঠতম, যে কাহিনী দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কেমন হয় দেখানো হয়েছে। লায়লা শব্দ এসেছে আল্লা থেকে আর মজনু মানে ডুবে যাওয়া। সুফিরা এই কাহিনীকে আধার করে দেখান আল্লাতে ডুবে যাওয়াটা কেমন হয়। ইসলামের পরম্পরাতে সুফিদের যদিও মানতে চায় না কিন্তু সুফিদের লায়লা-মজনুর কাহিনীকে পুরোদমে মানে। ফলে লায়লা-মজনুর কাহিনী দুটো স্তরে চলে, একদিকে দেখাচ্ছে একটা ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসাকে নিয়ে জাগতিক কাহিনী, অন্য দিকে এই ভালোবাসাই দেখিয়ে দিচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কেমন হতে পারে। মীরাবাঈয়ের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা কোন কাহিনী নয়, মীরাবাঈয়ের সত্যিকারের ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসা হয়েছিল। ইষ্টের প্রতি যে চূড়ান্ত ভালোবাসা, যেখানে ইষ্টের বাইরে সে কিছু দেখছে না, তখন সেই ভালোবাসাকে বলছেন পরমপ্রেম।

আমরা ভাবি যে ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম একমাত্র গোপীদের হয়েছিল সেটাই পরমপ্রেম, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। অনেক ধর্মেই বিভিন্ন ধরণের উচ্চমানের ভক্তি গ্রন্থ রয়েছে, হিন্দুদের তো রয়েছেই। কিন্তু তার মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ভক্তি গ্রন্থের নাম করা যায় আর যেটাকে ঠিক ঠিক গ্রন্থ বলে মনে করা হয়, তা হল ভাগবতের দশম স্কন্ধ। দশম স্কন্ধে শুধু শ্রীকৃষ্ণেরই কথা, সেখানে ভক্তির কয়েকটা দিককে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে হিন্দী কবি সুরদাস ভাগবতের ভক্তির দুটো ভাবকে নিলেন। এই দুটো ভাব ভাগবতে যেভাবে আছে তিনি ঠিক সেই ভাবেই নিলেন। দুটো ভাবের একটা ভাব হল বাৎসল্য ভাব, যেখানে বালকৃষ্ণ তাঁকে আদর করা হচ্ছে আর দ্বিতীয় কিশোর কৃষ্ণ যাঁকে গোপীরা ভালোবাসছেন। এটাকেই অনেক সময় অপরা ভক্তি আর পরা ভক্তি রূপে ভক্তির দুটো রূপের ব্যাখ্যা করেন। তবে বলা খুব মুশকিল এখানে অপরা হবে কিনা, অপরা মানে নিম্ন আর পরা মানে পরম প্রেম। যশোদার যে বালকৃষ্ণের প্রতি প্রেম এটা পরমপ্রেম। ভাগবতে একটা বর্ণনা আছে, যেটা পরে খুব বিখ্যাত হয়েছে, যশোদা মাখন তৈরী করছেন, যে মাখন কৃষ্ণ খাবেন। যশোদা হাতে দণ্ড নিয়ে মন্থন করছেন, মুখে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গান করছেন আর মনের চিত্রপটে বালকৃষ্ণের ছবি ভাসছে। যশোদার হাত, মুখ আর মন তিনটেই কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। হাত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য মাখন তুলছেন, স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গানগুলো ভেসে উঠে গুণগুণ স্বরে গান হয়ে কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আর মনের মণিকোঠায় শ্রীকৃষ্ণের বাল ছবি গ্রথিত হয়ে আছে। এটাই পরম প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে অন্য কোন কিছুর স্থান নেই। ইদানিং কালে যদিও অনেক কিছু পাল্টে গেছে, কিন্তু কিছু দিন আগেও একজন বিবাহিত নারীর জীবন যদি দেখা হয় সেখানে দেখা যাবে তাকে বাড়ির সবাই অত্যাচার করে, এমনকি স্বামীরও দর্শন পায় না, তাও সে সব কিছু সহ্য করে নেয়। খেতে দিলে তো ভালো, না খেতে দিলে সহ্য করে নেবে। কিন্তু তার সন্তানকে যদি কেউ কিছু বলে দেয় তখন তার সিংহিনীর রূপ বেরিয়ে আসবে। সব কিছু সহ্য করে নেবে কিন্তু ওর সন্তানের অবহেলা কিছুতেই সহ্য করবে না। ঊড়িষ্যার এক দম্পন্তির সাত বছরের শিশুর কিছু দিন আগে ডেঙ্গু হয়েছিল। বাবা-মা তিনটে হাসপাতালে নিয়ে গেল কিন্তু কোন হাসপাতালেই ভর্তি নেয়নি, শিশুটি তাদের কোলেই মারা যায়। সন্তানের শোকে স্ত্রী হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরে গেল। সন্তানের প্রতি এমনই ভালোবাসা সেই সন্তান মারা যেতে শোকে মা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিল, ঐ দেখে তার স্বামীও ঝাঁপ দিয়ে মরে গেল। মরে যাওয়া জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না, আলোচনা করা হচ্ছে পরমপ্রেম, এমন প্রেম যে ওকে ছাড়া আমার জীবনটাই বৃথা। জাগতিক অর্থে কোন ছেলে বা মেয়ে প্রেমে মার খায় তখন বলে ওকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা, আমার জীবন শূন্য হয়ে গেল, তারপর মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিয়ে দেয়। এখানে এই জিনিসটাকে

আটকে দিচ্ছেন। ওটা ভক্তি বা প্রেম রূপ নয়। *অস্মিন্*, ঈশ্বরের প্রতি যদি ঐ প্রেম থাকে তবেই তাকে পরম প্রেম বা ভক্তি বলা হবে।

খ্রীশ্চান পরম্পরা এবং সেখান থেকে ইসলাম পরম্পরাতেও শয়তানকে গালাগাল দেওয়াটা একটা রেওয়াজ। এখনও মক্কাতে হজ করতে গেলে একটা জায়গায় সবাই শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছুড়ে মারে। মুসলমানদের কাছে এটা একটা খুব নামকরা উপাচার। ভালো যা কিছু আছে সব আল্লার, খারাপ যা কিছু আছে সব শয়তানের। রাবেয়া একজন ইসলামের খুব নামকরা সাধিকা ছিলেন। তাঁকে গিয়ে একজন বলছে, আপনি শয়তানকে গালাগাল দেন না কেন? আমরা তো কখন শুনিনি যে আপনি শয়তানকে গালাগাল দিচ্ছেন। রাবেয়া তখন বলছেন, আমারও খুব ইচ্ছে করে শয়তানকে খুব গালাগাল দিই, কিন্তু আমার মন আল্লাকে নিয়ে সব সময় এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে অন্য কারুর দিকে আমার তাকাবার ফুসরৎ নেই। অন্য দিকে মন গেলে তবেই তো আমি গালাগাল দেব। স্বামীজী একবার তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁরে! আমার থেকে যদি ভালো গুরু পাস তখন আমাকে কি ছেড়ে দিবি? একজন বলছেন, স্বামীজী আপনি একি বলছেন! কখনই ছেড়ে যাব না। আরেকজন শিষ্য বলছেন, আপনার থেকে ভালো গুরু পেলে অবশ্যই আপনাকে ছেড়ে দেব। কারণ যেদিন আমি বুঝব ইনি আপনার থেকে বেশি ভালো তার মানে মন থেকে সেদিনই তো আপনাকে ছেড়ে দিলাম, এরপর জাগতিক অর্থে ছেড়া যাওয়ার তো আর কোন মূল্যই থাকে না। তার মানে বলতে চাইছেন, আমার পক্ষে সম্ভবই না, আপনার থেকে বড় কেউ হতে পারে এই প্রশ্নটাই হয় না, ছেড়ে যাওয়া তো অনেক পরের কথা।

বলা হয় পতি পরমেশ্বর, আমার স্বামী আমার কাছে পরমেশ্বর, এখন যদি ভগবানও আসেন তিনি কিন্তু আমার হৃদয়ে স্থান পাবেন না। গৌতম আর অহল্যার যে কাহিনী, অহল্যা সেখানে স্বামীর জন্য সব কিছুই করছেন, যজ্ঞে গৌতম মুনিকে সহয়তা করছেন, সব দিক দিয়ে পতিব্রতা বজায় রেখে চলছেন। কিন্তু ইন্দ্রকে যখন ঐভাবে দেখছেন তখন তাঁর মনে উদয় হল ইনি দেবতাদের রাজা। ইনি দেবতাদের রাজা এই ভাব যেই অহল্যার মনে উদয় হল তখনই স্বামী পরমেশ্বর পদ থেকে চ্যুত হয়ে গেলেন। তারপর ইন্দ্রের সঙ্গে কি করল কি করল না কোন ব্যাপারই নয়। ওখানেই সব শেষ হয়ে গেল। ডিভোর্স এর অনেক পরে হয়। কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স দেওয়ার অনেক আগেই মনে ডিভোর্স হয়ে যায়। কোর্টের ডিভোর্স তো একটা উপাচার মাত্র। যেমনি মনে দেখে নিল আমার স্বামী আমার পরমেশ্বর নয়, শ্রেষ্ঠতম নয়, কাহিনী সেখানেই শেষ। এটাই এখানে বলছেন *পরমপ্রেমরূপা*, অন্য কোন দিকে আর মন যাবে না। পরমপ্রেমে রাবেয়া বলছেন, আল্লাকে ছেড়ে আমি অন্য কারুর দিকে যে তাকাব সেই সময়টাই তো আমার নেই। আমার সময় যদি থাকে, আমার মনে যদি সামান্য কোন একটু স্থান থাকে তবে আমি বিচার করব শয়তান ভালো না খারাপ, কম গালাগাল দেব নাকি বেশি গালাগাল দেব, সেটা তো অনেক পরের কথা। সে যে আমার মধ্যে ঢুকবে তার কোন স্থানই নেই।

জালালুদ্দিন রুমি নামকরা সুফি কবি ছিলেন, তাঁর বিখ্যাত কবিতায় যে ভাবগুলি পাওয়া যায় সেখানেও সেই একই ভাব। স্বামীজীও তাঁর কবিতার উল্লেখ করে বলছেন, প্রেমিক এসে দরজায় করাঘাত করেছে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করছে কে? বাইরে থেকে প্রেমিক উত্তর দিচ্ছে আমি। ভেতর থেকে দরজা খুলল না, তুমি চলে যাও, এখন নয়। আবার এসেছে, আবার দরজায় টোকা দিয়েছে, ভেতর থেকে আবার জিজ্ঞেস করছে কে? প্রেমিক বলছে, আমি। আবার বলছে তুমি চলে যাও। এই ভাবে কয়েকবার ফিরে যাওয়ার পর শেষবার এসে যখন জিজ্ঞেস করেছে কে, তখন প্রেমিক বলছে তুমি। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। তার মানে পরমপ্রেমে আমির কোন স্থান নেই। কবীর দাসেরও খুব সুন্দর একটা দোঁহা আছে যেখানে দেখান হয়েছে পরমপ্রেম কেমন হয়, যেখানে অন্য কারুর স্থান থাকবে না। বলছেন যব ম্যায় থা হরি নহি, অব্ হরি হ্যায় ম্যায় নহি। যখন আমি ছিলাম তখন হরি ছিল না, এখন হরি আছে আমি নেই। প্রেমগলি অতি সঁকরি জাঁহে দো ন সমাহি, প্রেমের গলি অতি সঙ্কীর্ণ যার মধ্যে দুই যেতে পারবে না। আমি আর হরি দুজন থাকবে না, দুজনের একজনই থাকবে। ভক্তির এই অবস্থাকেই বলে পরমপ্রেমরূপা। এখানে আমিত্বের কোন স্থানই নেই। যে কোন মরমীয়া সাধকের মধ্যে এই একই ভাবে পাওয়া যাবে, তিনিই শুধু আছেন, এখানে আর কোন আপোষ নেই।

বাইবেলে যীশুর জীবনেও এই একই ভাব, যীশু বলছেন, I and my Father in heaven one। বাইবেল নিয়ে অনেক রকম কথা বলা হয়, অনেকে বলেন তাঁর শিষ্যরা পরে এগুলো লিখেছিলেন। যাই হয়ে থাকুক, দু হাজার বছর আগেকার কথা, সেটাকে তো কেউ প্রশ্ন করতে পারছে না। আর যীশু যদি নাও বলে থাকেন, তাঁর শিষ্যরাই যদি বলে থাকেন, সবটাই যদি ধাপ্পা হয় তাতেও কিছু আসে যায় না, কারণ ঐ ভাবটা তো ওখানে আছে, আমরা এক, দুইয়ের কোন স্থানই নেই। খ্রীশ্চান মরমিয়া সাধকদের লেখা বা সুফীদের কবিতা পড়লে মনে হবে, যদিও ভাষাটা অন্য রকম কিন্তু মনে হবে মীরাবাঈয়ের কথা বা সুরদাসের কথা পড়ছি। ঈশ্বরের ভালোবাসার বাইরে আর কিছু নেই, শুধু পরমপ্রেম। যত হিন্দু মহাত্মারা ভক্তি ভাব নিয়ে ছিলেন, সবারই মধ্যে এই একই ভাব। জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, তিনি বিবাহ করলেন, বিবাহ করার পর স্বামী স্ত্রী দুজনেই হয়ে গেলেন কৃষ্ণভক্ত। স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রত্যেক দিন কৃষ্ণের সামনে সারাটি রাত গান করে করে নৃত্য করতেন, স্বামী স্ত্রী দুজনে যেন গোপী আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই ব্রজের ময়ূরমুকুটধারী কৃষ্ণ।

ম্যাকলাউড স্বামীজীর থেকে দীক্ষা নেননি। কেউ তাঁকে স্বামীজীর শিষ্যা বললে খুব রেগে যেতেন, তিনি নিজেকে বলতেন I am friend of Swamiji। অবিবাহিতা থেকে গেলেন, গলায় একটা লকেট ছিল যাতে স্বামীজীর ছবি ছিল। বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে এসে থাকতেন। একদিন কোন মহারাজ তাঁকে ডাকতে গেছেন, গিয়ে দেখছেন দরজা বন্ধ। তিনি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন স্বামীজীর ছবির সামনে ম্যাকলাউড একা একা নৃত্য করে যাচ্ছেন। নৃত্য করতে করতে জগৎ ভুলে একেবারে তাতে ডুবে গেছেন, আমি স্বামীজীর জন্য নৃত্য করছি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল জানলার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। ম্যাকলাউড সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন, নিজের ভাব কখন তিনি অপরকে দেখাতেন না। তিনি বলছেন, who cares for niger, নিগার মানে নিগ্রো। আমেরিকাতে নিগার শব্দ গালাগালে ব্যবহার করে। একদিকে স্বামীজীকে নিগার বলছেন, যেন স্বামীজীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই আবার অন্য দিকে তাঁর ছবির সামনে দরজা বন্ধ করে একা একা নৃত্য করে যাচ্ছেন, এটাই পরমপ্রেম। এমনই প্রেম যে অন্য কারুর দিকে আর তাকাবেন না।

জাগতিক অর্থে এই ধরণের প্রেম অনেক সময় দেখা যায় ঠিকই, কাউকে হয়ত ভালোবেসে ছিল সেইজন্য আর বিয়েই করল না। এর বিপরীতও আছে, তাকে পেল না আবার অন্য চারজনের সাথে জড়িয়ে গেল। কিন্তু সবার মধ্যে তারই ছবি দেখছে। ওরহান পামুরের একটা বই আছে My Name is Red, সেখানে ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনার বর্ণনা আছে। ছেলেটি মেয়েটিকে এমনই ভালোবাসে যে, যেখানেই যায় সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে আর ভুলতে পারছে না। ছেলেটির অনেকের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কিন্তু ওকে ছাড়া কাউকে দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ ভালোবাসাটা এখানে *অসিম্* শব্দ দিয়ে ভগবানকে নিয়ে আসা হয়েছে, পরে বলবেন তা নাহলে এটাই জাগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখলে বোঝা যায় ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাটা কেমন হবে। ঠাকুরও বলছেন, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতির উপর টান আর মায়ের সন্তানের প্রতি টান, এই তিন টান একত্র করে ঈশ্বরের দিকে দিলে সেটাই হবে পরমপ্রেম। ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় জার ভাব, পরকীয়া প্রেমের উপমা দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে বোঝাচ্ছেন। ভক্তিশাস্ত্র পড়ার সময় এই আইডিয়া গুলো বোঝা না থাকলে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কেমন হতে পারে ধারণা করা খুব মুশকিল। নিজের স্বামীর প্রতি পবিত্র প্রেমের উপমা দিচ্ছেন না, নিয়ে আসছেন পরকীয়া প্রেমকে, মর্যাদাকে যেখানে উল্লঙ্ঘন করে যাচ্ছে, কুল, মান, সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে, সেখানে একটা যেন জোয়ার এসে যায়, সেই জোয়ারে লোকলজ্জা, মান, মর্যাদা সব ভেসে যায়।

ভাগবতে ব্যাসদেব যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাবের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, গোপীরা কার্ত্তিক মাসে কাত্যায়নীর ব্রত রেখে পূজা করছেন, সেটাও খুব সুন্দর বর্ণনা, কিন্তু সেখানে পরমপ্রেমের যে গভীরতা, তীব্রতা হবে সেটাকে আর আনতে পারছেন না। ভাগবতে যত রকম প্রেমের বর্ণনা ব্যাসদেব আনছেন, যশোদার প্রেমের কথাই বলুন, গোয়ালীনিদের প্রেমই বলুন কিছুতেই তিনি প্রেমের সেই তীব্রতাকে ফোটাতে পারছেন না। কিন্তু পরমপ্রেম কেমন হয় সেটাকে তো ব্যাসদেবকে দেখাতে হবে, তখন তিনি নিয়ে এলেন রাসলীলা। রাসলীলাতে দেখাচ্ছেন ব্রজের সব কুমারী মেয়েরা, স্ত্রীরা, যাদের সন্তান আছে সেই স্ত্রীরা সবাই বাড়ি ভেঙে যেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে পাগলের মত ছুটে যাচ্ছেন। বাড়ির লোকেরা তাদের আটকাচ্ছেন। কিন্তু পাইপারের কাহিনীতে পাইপারের বাঁশীর শব্দে বাচ্চগুলো ছুটে বেরিয়ে আসছে, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণের বংশী

ধ্বণি শুনে গোপীরা কেউ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। আর কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বা মেয়েকে বাড়ির দরজা বন্ধ করে আটকে রাখতে সক্ষম হয়ে গেল, তখন সেখানে আরও মারাত্মক অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল। ওদের শরীরটা ওখানে পড়ে আছে ঠিকই কিন্তু তাদের সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে গেছে। বিদেশীরা এসব পড়ে হিন্দুদের অনেক নিন্দা সূচক মন্তব্য করে, তা করুক, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ভক্তিতে প্রেমের যে এই প্রগাড়তা হয় এই জিনিসটাকে ধারণা করা তাদের ক্ষমতার বাইরে, ক্ষমতাই নেই। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের তীব্রতায় একমাত্র ভারতবর্ষের রাজা বা ধনী মানুষ নিজের সর্বস্ব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। এই জিনিস হিন্দুদেরই হয়, সংস্কারে থেকে গেছে। অল্প বয়সী ছেলে পিএইচডি করার পর অক্সফোর্ড থেকে অধ্যাপনা করার সুযোগ পাওয়ার পর বলছে আমার কিছু লাগবে না আমি সন্ন্যাসী হব ভিক্ষা করে খাব। এই যে ঈশ্বরের প্রতি, অধ্যাত্মের প্রতি টান, বিদেশে এই জিনিস নেই। পরমপ্রেম মানেই তাই, যেখানে জগৎ ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমে কি হয় এটাকে ব্যাসদেব কিছুটা রাসলীলাতে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক খ্রীশ্চান মরমীয়া সাধক এবং সুফী সাধকরাও পরমপ্রেমকে খুব সুন্দর ফুটিয়েছেন।

গীতাতে ভগবান দুটো খুব সহজ কথা দিয়ে পরমপ্রেমকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথমটায় বলছেন *মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ*, *মচ্চিত্তঃ*, যার মন পুরোপুরি আমাতেই ডুবে আছে আর *মৎপরঃ*, আমাকেই শ্রেষ্ঠতম মনে করে। সাধারণ ভাবে দেখা যায় একজন কামী পুরুষ নিজের কামের মধ্যে ডুবে থাকে কিন্তু সেও জানে ভগবান আমার কামের বস্তু থেকে বড়। তার চিত্ত এক জায়গায় আর *পরঃ* আরেক জায়গায় আছে। আবার অন্য রকমও দেখা যায়, যার চিত্ত ভগবানে আছে, পূজা অর্চনা করছে কিন্তু *পরঃ* ভগবানকে মনে করছে না, সেখানে অন্য কাউকে, কোন বড়লোককে বা রাজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করছে। আকবর বাদশার সাথে ফকিরের দেখা হয়েছে, ফকিরকে বাদশা বলছেন, আপনার কিছু যদি প্রয়োজন হয় আমাকে বলবেন। ফকিরের একবার তার মসজিদের জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল। বাদশার কাছে চাইতে এসে দেখছেন আকবর আল্লার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন, আল্লা দৌলত দাও, এই দাও, সেই দাও। ফকির তখন উঠে চলে যাচ্ছিলেন। বাদশা ইশারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হওয়ার পর বাদশা জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কেন এসেছেন আর কেনই বা চলে যাচ্ছিলেন। ফকির তখন বলছেন, আপনার কাছে কটি টাকা চাইতে এসেছিলাম কিন্তু এসে দেখছি আপনিই কাঙালের মত আল্লার কাছে চাইছেন, তা কাঙালীর কাছে না চেয়ে আমিও আল্লার কাছেই চাইব। এটাই শেষ কথা, তিনিই আমাকে দেখবেন। যেমন যেমন আমরা এগোব তেমন তেমন *মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ* এই ভাবগুলো আরও পরিষ্কার হবে।

গীতায় ভগবান দ্বিতীয় যেটা বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তোমার ভালো মন্দ যা কিছু আছে, তুমি যেটাকে তোমার কর্তব্য মনে করছ, যেটাকে তোমার দায়ীত্ব মনে করছ, তোমার কাছে তোমার মা শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তোমার দেশ শ্রেষ্ঠ হতে পারে, সবটাই তুমি ফেলে দাও। তোমার যে ধর্মই হোক, তোমার ব্রাহ্মণ ধর্ম হোক, তোমার পতি ধর্ম, পত্নী ধর্ম হোক যে ধর্মই হোক ফেলে দাও। সব ধর্ম ফেলে *মামেকং শরণং ব্রজ*, ঐ জায়গাতে আর কোন আপোষ করা যাবে না। গীতার এই দুটো, *মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ* আর *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, এই দুটো দিয়ে বোঝা যায় পরমপ্রেম কাকে বলে। এটাই যদি পরমপ্রেমের সংজ্ঞা হয়ে থাকে তাহলে এখানেই এই সংজ্ঞা দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বৈর ভাবের সাধনা বাতিল হয়ে যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণ বা অন্যান্য জায়গায় রাবণের ভক্তিকে বৈর ভাবের ভক্তি সাধন বলা হচ্ছে, কিন্তু এই সূত্রের পরমপ্রেমের সংজ্ঞা অনুসারে এটা ভক্তির মধ্যে আসবে না। কারণ ভক্তির সংজ্ঞাতেই বলছেন পরমপ্রেম, রাবণের মধ্যে পরমপ্রেম নেই, বৈর ভাব রয়েছে। এর আগেও আলোচনা হয়েছে, চার ধরণের মানুষ ঈশ্বরকে ভক্তি করে, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং*, এর মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী আর জিজ্ঞাসু এই তিনজনও ভক্তির সংজ্ঞায় আসবে না। সেখানেও বলছেন চতুর্বিধা ভজন্তে মাং, আমার ভজনা করে, কিন্তু ভক্তি হবে না। তাহলে কোনটা ভক্তি হবে? তারপরেই বলছেন, *তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তা একভক্তির্বিশিষ্যতে*। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা আমার স্বরূপকে জানে, তাঁরাই আমার বিশেষ ভক্ত। ঈশ্বরের স্বরূপকে যিনি জানেন তিনি শ্রেষ্ঠতম। *অহং স চ মম প্রিয়ঃ*, সে আমাকেই ভালোবাসে, আমাকে ছাড়া জগতে আর কিছু দেখে না, আমিও তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। তাই বলে কি ভগবানের মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে? তিনি কাউকে ভালোবাসছেন, কাউকে ভালোবাসছেন না? না, একটুও বৈষম্য দোষ নেই। জ্ঞানী হলেন ভগবানের আত্মা। মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মাকেই ভালোবাসে,

আত্মা ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসে না। যত রকম ভাবের কথা আমরা জানি, যে ভাবই হোক, সেই ভাব যদি পরমপ্রেমে রূপান্তরিত না হয়, সেটাও আবার ভগবানের প্রতি হওয়া চাই, সেই ভাবকে ভক্তি রূপে নেওয়া যায় না। অথবা ঠিক ঠিক ভক্তি বলতে যেটা বোঝায় সেটাকেও সেইজন্য ভক্তি রূপে নেওয়া যায় না। জাগতিক প্রেম, জগতের কোন জিনিসের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে এগোন, এগুলো কখনই ভক্তি হবে না। ঠিক তেমনি ভগবানের প্রতি প্রার্থনা নিয়ে, কোন আশা নিয়ে এগোচ্ছে সেটাও ভক্তি হবে না। এমনকি ভগবানের প্রতি কোন আশা নেই কিন্তু বৈর ভাবে এগোচ্ছে, সেটাও ভক্তি হবে না। আর ভগবানকে বড় করার জন্য অন্য কাউকে ছোট করা হচ্ছে, নিন্দা করা হচ্ছে যেমন ইসলাম বা অন্য ধর্মে করা হয়, সেটাও ভক্তি হবে না। পরমপ্রেমরূপা মানেই তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর অন্য কিছু দেখছেন না। এটাই ভক্তির ঠিক ঠিক পরিভাষা।

তাহলে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে তফাৎ কোথায়? জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে তফাৎ থেকে যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র নিয়ে। যেমন ভক্ত বলে আমি চিনি আস্বাদ করতে চাই চিনি হতে চাই না। এনারা বলেন তিনটে জায়গায় আমিত্বটা থেকে যায়, প্রথম হল, ভক্ত বলে আমি রসে বশে থাকব। ঠাকুর বলছেন, আমি ভক্তের রাজা হব। যাঁরা সাধনাদি করেন তাঁদের কিছু কিছু সাধ থাকে। সমস্যা হল আমাদের কাছে ঈশ্বর object রূপে, এই কলম আছে, এই কলমটা আমাকে পেতে হবে, কলমটা একটা object, কলম পাওয়াটা একটা objective। জীবনটা তখন ঐদিকে এগিয়ে চলতে থাকে। ভগবান তো তা নন, তিনি অনন্ত। অনন্ত ভগবানের অনন্ত ভাব। ঐ অনন্ত ভাবে একটা ভাব আরেকটা ভাবকে আমাদের মনে হয় contradict করছে, কিন্তু contradict করে না। এখন যিনি জ্ঞানের পথে সাধনা করছেন, এখন তাঁর সাধ হল আমি ভক্তের রাজা হব। ভগবান তাঁকে ভক্তের রাজা বানিয়েও দিতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরের ব্যাপারটা খুব জটিল, কখন তিনি জ্ঞানী, কখন ভক্ত, কখন অবতার, সেইজন্য ঠাকুরের সব কিছু বোঝা যায় না। ভাগবতে পরে পরে যখন ব্যাখ্যা করছেন সেখানে ব্যাসদেব দুটো ঘটনা দিয়ে এই ব্যপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। একটাতে বলছেন, বেদের ঋচারা বলছেন, ভগবান আমাদের কোন দিন স্পর্শ করলেন না, কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই বেদ এসে যায়। ঋচারা খুব আক্ষেপ করে বলছেন আমরা ভগবানকে স্পর্শ করতে পারলাম না। ব্রহ্ম হলেন মন বাণীর পারে। ভগবান আর বেদের সম্পর্ক হল, বেদ অনেক নীচের, ভগবান মুখে কখন বেদ উচ্চারণ করেন না। সেইজন্য বলছেন, ভগবানের ওষ্ঠদ্বয়ের রসপান থেকে আমরা চিরদিনই বঞ্চিত থেকে গেলাম। মানুষ যেভাবে বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করে, ভগবান তো সেভাবে উচ্চারণ করেন না, সেইজন্য আমরা বঞ্চিত থেকে গেলাম। এই ঋচারাই পরে গোপী হয়ে জন্ম নিলেন যাতে ভগবান তাঁর ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা তাঁদের স্পর্শ করেন। অন্য দিকে আবার বলা হয়, ঋষিরা যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধনা করেছিলেন তাঁরা জ্ঞানী হয়ে সিদ্ধি লাভ করলেন কিন্তু তাঁদের ভক্তের রাজা হওয়া আর হল না, ঈশ্বরের ভক্তির আস্বাদ তাঁরা করতে পারলেন না। ভক্তিমার্গের সাধকরা, যাঁরা ভক্তি নিয়েই থাকেন তাঁরা জ্ঞানীদের খাটো করার জন্য এইসব কাহিনী তৈরী করেছেন। বানালে কি হবে, বঞ্চিত তো আছেনই, এটাকে মেনে নিয়েই চলতে হয়। যাই হোক, ঋষিদের মনে ইচ্ছে হল ভগবানের প্রতি ভক্তির আনন্দটা কেমন হয় অনুভব করার জন্য তাঁরা সবাই গোপী হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন। এখন তিনি যত বড় জ্ঞানীই হন ভগবানের ভক্তি বা ভালোবাসার আনন্দকে আস্বাদ করার জন্য আমিত্বটা বজায় রাখতে হবে।

আমিত্ব রাখার তিনটে মূল, প্রথমটা লীলা আস্বাদন করার জন্য বা ভগবানের ভালোবাসাকে আস্বাদ করার জন্য। এই জিনিসটাকেই বোঝাবার জন্য বলা হয় আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই। দ্বিতীয় যে জায়গায় আমিত্বকে ধরে রাখা হয় তা হল, এনারা জগতের মঙ্গল করতে চাইছেন, যেমন নারদ, তিনি জগতের সেবা করতে চাইছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ একবার স্বামী অখণ্ডানন্দজীর খুব সেবা করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ খুব খুশী হয়ে বললেন, বলো তুমি কি বর চাও? স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বললেন, আমি যেন বাণী দিয়ে ঠাকুরের সেবা করতে পারি। মহারাজ বলে দিলেন তাই হবে। এরপর স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী দেশে বিদেশে কত ঠাকুরের কথা, স্বামীজীর কথা, বেদান্তের কথা বলতে থাকলেন। অনেকে আছেন তাঁরা চান আমি আমার এই শরীর মন দিয়ে ঈশ্বরের সেবা পূজন করে যাব বা যাঁরা ভক্ত আমি তাঁদের সেবা করতে চাই। এসব ক্ষেত্রে আমিত্ব ভাবটা না থাকলে হবে না। সেইজন্য যাঁরা ধর্ম প্রচার করেন, ঠাকুরের মত বা স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্ব এনাদের জীবনটা খুব unusual জীবন। কারণ এনারা মুক্তির আস্বাদ করে নিয়েছেন, ঈশ্বরকে জেনে গেছেন, এরপর বন্ধনে আসাটা খুব unusual ব্যাপার। স্বামীজীর ক্ষেত্রে আমরা

সবাই জানি যে তিনি থাকতে চাইছেন না, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে জগতের মধ্যে বেঁধে ধরে রাখছেন। ঠাকুর বলছেন, তুই করবি না মানে তোর ঘাড় করবে। জগতের সেবা করার জন্য আমিত্বকে রাখতে হবে, আমিত্ব রাখা মানেই ভক্তি। তৃতীয় যেখানে আমিত্বকে রাখা হয় তা হল, শরণাগতির পরাকাষ্ঠা। সেখানে তখন তিনি বলেন, ঠাকুর যেমন আমাকে রাখবেন, তিনি যদি আমার আমিত্ব রাখতে চান তো রাখবেন, যদি চান আমিত্ব মুছে দিতে তো মুছে দেবেন। ঠাকুর বেড়ালের ছার স্বভাবের কথা বলছেন, বেড়ালের বাচ্চাকে তার মা কখন হেঁসেলে রাখছে, কখন বিছানায় রাখছে, বাচ্চা শুধু মিউ মিউ করে যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি ঈশ্বর একটা আলাদা কিছু, আত্মা আরেকটা আলাদা, ব্রহ্ম আবার একটা আলাদা কিছু, কিন্তু তা নয়, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম সব একই জিনিস। যিনি চৈতন্য তিনিই সর্বশক্তিমান ভগবান, তিনিই একমাত্র ক্ষমতাবান, তাঁরই সব কিছু আছে। তিনিই নরলীলা করছেন, জগতলীলা করছেন, দেবলীলা করছেন, সব কিছু করছেন। তিনি ইচ্ছে করলেন অমুককে আমি আমার ভক্তির আস্বাদ করাব। যাঁকে তিনি আস্বাদ করাচ্ছেন তিনি তো ভগবানের থেকে আলাদা নন, তিনিও তাঁরই রূপ, তিনি এখন ভক্তি আস্বাদ করছেন। ভক্তের শ্রেনী মোটামুটি এই তিন ধরণের হয়। প্রথম শ্রেনী হল, যাঁরা বলছেন আমি ভক্তি আস্বাদ করতে চাই, দ্বিতীয় শ্রেনী হল যাঁরা বলছেন আমি সেবা, পূজা করতে চাই আর তৃতীয় শ্রেনী হল যাঁরা বলছেন আমার আমিত্ব বলে কিছু নেই, তিনি যেমনটি রেখেছেন আমি তেমনটিই থাকব।

এই যে পরমপ্রেমের কথা বলা হল, আলোচনা করে যাকে জ্ঞানের মত দেখাচ্ছে, তাতেও ভক্তি আলাদা। ভক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল আমিত্বটা থেকে যায়। কিন্তু তাই বলে যে উপনিষদের জ্ঞান বা বেদান্তের জ্ঞানের থেকে ভক্তি নীচু তা কিন্তু কখনই নয়। কারণ ভক্তির যে শেষ কথা তা একেবারে জ্ঞানের মত, তফাৎ শুধু আমিত্বে। আর এই আমিত্বকে ধরে রাখার উপরের তিনটেই কারণ। নারদ ভক্তিসূত্রে ভক্তিকে যখন পরমপ্রেমরূপা রূপে বলছেন তখন দেখা যাচ্ছে জগতে ভক্তির যত সংজ্ঞা আছে এর থেকে ভালো সংজ্ঞা আর হতে পারে না। যত রকমের যোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা রাজযোগ সব যোগই ভক্তির এই সংজ্ঞায় ঢুকে যাচ্ছে। কারণ ভাগবতে যে উপমাগুলো নেওয়া হয়েছে তাতে দেখাচ্ছেন জ্ঞানী যাঁরা তাঁরাও ভক্তির আস্বাদ করতে চাইছেন, ঠাকুর নিজেও অদ্বৈত জ্ঞানের পরে ভক্তি রেখেছিলেন। ভক্তি রাখার জন্য ভগবানের লীলার আস্বাদ করতে পারছেন। নারদ এমন একটা শব্দ নিয়েছেন ভক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য, যেখানে সব যোগ, সব পথকে এক জায়গায় টেনে এনে সমন্বয় করে দিয়েছেন। ভক্তি কি? ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এখানে ভক্তির খুব উচ্চস্তরের কথা চলছে। সূত্রধর্মী শাস্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য, প্রথমেই এনারা শ্রেষ্ঠ কথাটা বলে দেন, তারপর আস্তে আস্তে ওখান থেকে নামতে থাকেন। এখানে মীরাবাঈয়ের অবস্থা, রাবেয়ার অবস্থার কথা চলছে বা ঠাকুরকে যদি অবতার রূপে না দেখে ভক্ত রূপে দেখা হয় এখানে তাঁর অবস্থার বর্ণনা চলছে, আমার আপনার কথা চলছে না। ভক্তির এই শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও ক্ষীণ একটা আমির রেখা এনারা রেখে দেন। কথামৃতে ঠাকুর নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কে যেন দপ করে আটকে দিল। ঠাকুর কিন্তু আগাগোড়া আমিত্বটা রেখে দিয়েছিলেন। কথামৃতে ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, এর ভেতর দুই আছেন, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। ঠাকুরের এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। ঠাকুর অদ্বৈত ভাবে থাকতেন না, বেশির ভাগ সময়ই ভক্ত ভাব নিয়েই থাকতেন। আবার বলছেন, কারুর কারুর ক্ষেত্রে তিনি আমিটা একটু রেখে দেন, যেমন শঙ্করের বিদ্যার আমি ছিল। বিদ্যার আমিত্ব আসা মানেই ভক্তি এসে গেল। নির্বিকল্প সমাধিতে একুশ দিন পর শরীর চলে যায়। তাহলে শুকদেব বলুন, শঙ্করাচার্য বলুন, ঠাকুর বলুন এনাদের কি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। কথামৃতে ঠাকুর শ্রেনী বিভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, ঠাকুর যে নিজে শ্রেনী বিভাগ করে দিয়েছেন তা নয়, পরম্পরাতেই এই জিনিসগুলো আছে। তবে আমিত্বটা কার থাকবে, কার থাকবে না আমাদের জানার কথা নয় এবং আমরা জানিও না। তিনিই কোন কারণে আমিত্বের একটা ক্ষীণ আবরণ রেখে দেন, তা না হলে ঈশ্বরের কার্য হবে না। কাশীপুরে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধির পর ঠাকুর বলছেন, এর চাবিকাঠি আমার কাছে রইল, আগে তোকে মায়ের কাজ করতে হবে। তার মানে আমিত্বের একটা ক্ষীণ রেখা রেখে দেওয়া হল, না দিলে মায়ের কাজ হবে না। সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি ইচ্ছাময়, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান, লয় হওয়ার পর ইচ্ছে করলে আবার তিনি তাঁকে বন্ধনে নিয়ে আসতে পারেন। এই কথা শুধু যে ভক্তির দৃষ্টিতেই

বলছে তা নয়, খোদ বেদান্তের দৃষ্টিতেই বলা হয়। কারণ আত্মাই একমাত্র যিনি সর্বশক্তিমান। স্বামীজী এত জোর দিয়ে বলছেন, তোমার ভেতরেই সেই অনন্ত শক্তি। তোমার ভেতরে শক্তি কোথা থেকে আসবে? আমি আপনি তো নিজেকে জানি, আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আত্মার শক্তির যখন জাগরণ হয় তখন সে অশেষ হয়ে যায়। আত্মা চাইলে আবার তাকে আমিত্বের মধ্যে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু বন্ধনে তিনি আর থাকবেন না। একজন কয়েদিকে চারজন পুলিশ ঘিরে রেখেছে আর রাষ্ট্রপতিকেও চল্লিশজন পুলিশ ঘিরে রেখেছে, দুটোতে তফাৎ আছে। রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন পুলিশ সেই দিকে যাবে, এই ধরণের মহাত্মারা যেদিকে যাবেন মায়া তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরবে। জীব কয়েদীর মত, পুলিশ যেদিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে তাকেও সেই দিকে যেতে হবে। আমাদের মায়া নাকে দড়ি দিয়ে যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের সেই দিকে যেতে হবে। আর ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনারা যেদিকে যেতে চাইবেন মায়াকে তাঁদের অনুসরণ করে যেতে হবে। এই তফাৎটা এসে যায়, অবতারের ক্ষেত্রেও আসে আর অবতার শক্তি সম্পন্ন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রেও আসে। তাঁর মধ্যে আমিত্ব একটু থাকছে, যার জন্য তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সংসারে বিচরণ করছেন। আমিত্ব ছাড়া সংসারে থাকা যাবে না, এটা তাত্ত্বিক ভাবেই অসম্ভব। সত্ত্ব, রজো আর তমোর যে খেলা চলছে, এর মধ্যে যতই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণী হোক তাঁর মধ্যে একটু রজো আর তমো থাকতে হবে। ঐ একটু তমো একটু রজো থাকছে এটাই আমিত্ব। এরপর আমরা তৃতীয় সূত্রের আলোচনায় যাচ্ছি

অমৃতস্বরূপা চ।।৩।।

এর আগের সূত্রে বললেন পরমপ্রেমরূপা, তার মানে আপনি জিনিসটাকে কেমন দেখছেন। যদি জীবনের দৃষ্টি নিয়ে তাকানো হয় তাহলে ভক্তি হয় পরমপ্রেম। জীবন কি, প্রেম কি এই নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলছেন, কত গান লিখছেন, কবিতা লিখছেন, যে যাই বলুক সেটা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা। ভক্তিকেও আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে দেখছি। কিন্তু ভক্তিকে যদি ভক্তির দিয়ে দেখা হয় তখন ভক্তি নিজেকে নিয়ে কি বলবে? আমরা অনেক সময় বলি, তুমি আমাকেই দেখলে আমার ভেতরটা দেখলে না। ভক্তিও যদি বলে, তুমি আমার মুখটাই দেখলে আমার হৃদয়টা দেখলে না। ভক্তিকে যদি বাইরে থেকে দেখা হয় তাহলে ভক্তি হল পরমপ্রেমরূপা। তাহলে ভক্তি নিজে কি, তার স্বরূপ কি? ভেতর থেকে দেখলে ভক্তি হল *অমৃতস্বরূপা চ*। ভক্তি পরমপ্রেমরূপা, সেটা ঠিকই কিন্তু তার সাথে আরেকটা বৈশিষ্ট্য লাগিয়ে দিলেন – *অমৃতস্বরূপা চ*। *চ* মানে অমৃতস্বরূপও, পরমপ্রেমরূপা আর তার সাথে অমৃতাস্বরূপাও। দুটোর দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, একটা হল আমরা যখন ভক্তির দিকে তাকাচ্ছি আর আরেকটা হল ভক্তির নিজের যে স্বরূপ।

অমৃত জিনিসটা কি আমাদের জানতে হবে। অমৃতের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে আর প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই এখানে প্রযোজ্য হবে। অমৃতের খুব প্রচলিত একটা ভাব হল যজ্ঞশেষ। যজ্ঞাদি করার পর যেটা অল্প একটু অবশিষ্ট থেকে যায় সেটাকে অমৃত বলা হয়, আমাদের ভাষায় বলা হয় প্রসাদ। পূজার পর যেটা থেকে যায় সেটাই প্রসাদ। একটা নামকরা ছড়াই আছে, প্রসাদ পাইতে যদি চলে যায় বেলা, তাও করো নাক প্রসাদের অবহেলা। এর অর্থ হল, তোমার ভক্তি থাকুক আর নাই থাকুক প্রসাদটা তুমি অবশ্যই গ্রহণ করবে। উৎসবাদিতে বেলুড় মঠে যে খিচুরী খাওয়ানো হয়, এই খিচুরীও প্রসাদ, প্রসাদ মানে যজ্ঞশেষ। বিরাট যজ্ঞ চলছে, যজ্ঞ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অল্প অবশিষ্ট যেটা বেরিয়ে আসে সেটাকেই বৈদিক ভাষায় বলে অমৃত, সেই অমৃত খেলে যেন অমরত্ব পাওয়া যায়, এটা যেন দেবতাদের কৃপা। এই জিনিসটাকেই এনারা কাহিনী রূপে দিয়ে দিলেন, এর খুব নামকরা কাহিনী হল সমুদ্র মন্থন। সমুদ্র মন্থন একটা যজ্ঞ, সমুদ্রের জল এটাই অগ্নি। সেখানে মন্দার পর্বতকে স্থাপন করা হয়েছে, ভগবান কুর্ম হয়ে সেই মন্দার পর্বতকে ধারণ করেছেন, আর মন্দার পর্বতকে মন্থন করা হচ্ছে। মন্থন করতে করতে প্রথমে বেরিয়ে এল হলাহল, এরপর এক এক করে অনেক কিছু বেরিয়ে এল, শেষে বের হল অমৃত। এই অমৃতকে যারাই পান করবে তারা অমর হয়ে যাবে। অমৃত হল যে কোন কঠিন কাজ যখন যজ্ঞ রূপে করা হয় তখন তার যে অবশেষ সেটাই অমৃত।

যখন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক কিছু করে ভক্তি করছে, এই ভক্তির ফল যেটা আসবে সেটা অমৃত। অমৃতের এটা প্রথম অর্থ। ভক্তির জন্য প্রচুর খাটতে হয়। জম্মুতে একজন সুফি সাধক ছিলেন, অমরনাথ যাওয়ার পথে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সাথে সেই সুফির দেখা হয়েছিল। একজন সন্ন্যাসী খুব সরল ভাবে

তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভক্তি কিভাবে অর্জন হয়। উনিও খুব সহজ ভাবে বললেন, যেভাবে মানুষ খেটেখুটে জমিদারী অর্জন করে ভক্তিও ঠিক সেইভাবেই সাধ্যসাধন করে অর্জন করতে হয়। যজ্ঞে যে অত পরিশ্রম করা হচ্ছে তার যে ফল, এটাই অমৃত। সমুদ্র মন্থন করার যে ফল সেটাই অমৃত। ঠিক তেমনি ভক্তি লাভের জন্য যা যা করা হল তার ফলস্বরূপ হয়ে যেটা আসবে সেটাই অমৃতস্বরূপ। ভক্তি সাধনটাও একটা যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের যে শেষ, শেষ মানে অবশিষ্ট, সেটা অমৃতস্বরূপ।

অমৃতের দ্বিতীয় অর্থ, মানুষ যে অমরত্ব লাভ করে অমর হয়ে যায় ঐ অর্থে অমৃত হয়। মহাভারতে এর উপর কচ-দেবযানীর খুব প্রচলিত কাহিনী আছে। একদিকে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি অন্য দিকে অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য অমৃত পেয়ে গিয়েছিলেন, অমরত্বের সাধনটা তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। এগুলো আখ্যায়িকা, খুব আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই, কিন্তু তার পেছনে যে সিদ্ধান্ত আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতি তিনি নিজের সন্তান কচকে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তুমি বিদ্যাটা শিখে এসো। অসুররা বুঝতে পেরেছে কচকে এখানে পাঠানো হয়েছে অমরত্বের সাধনটা শিখে নেওয়ার জন্য। অসুররা ঠিক করে নিল কচকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজী নন, একেই সে বৃহস্পতির সন্তান তার উপর আবার আমার অতিথি হয়ে এসেছে। এদিকে শুক্রাচার্যের একমাত্র আদরিণী মেয়ে দেবযানীকে কচ একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই থেকে দেবযানী কচকে ভালোবেসে ফেলেছে। এরপর অসুররা কায়দা করে যতবার কচকে মেরে ফেলে দিচ্ছে শুক্রাচার্য তাঁকে বাঁচিয়ে তুলছেন, কারণ তাঁর কাছে অমরত্বের বিদ্যাটা আছে। অসুররা একবার কচকে মেরে একটা জায়গায় ফেলে দিয়েছে। দেবযানী কচের প্রেমে এমন মজে আছে যে কচকে দেখতে না পেয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। দেবযানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুক্রাচার্য কচকে যেখানে মেরে ফেলে দিয়েছিল, সেখানে গিয়ে বললেন, কচ তুমি বেরিয়ে এসো। কচ বেরিয়ে এলেন। এইভাবে যত বার অসুররা কচকে মেরে ফেলছে শুক্রাচার্য গিয়ে বলছেন, কচ বেরিয়ে এসো, কচও বেরিয়ে আসছে। অসুররা দেখল, এভাবে ওকে মেরে ফেলে কিছু করা যাবে না।

একদিন কচকে কেটে ছাগলের মাংসের সাথে রান্না করে শুক্রাচার্যকেই খাইয়ে দিয়েছে। শুক্রাচার্যও ছাগলের মাংস মনে করে কচকেই খেয়ে নিয়েছেন। দেবযানী দেখছে কচকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, খুব কান্নাকাটি করছে। শুক্রাচার্য খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। তখন তিনি যোগবলে দেখছেন কচ তো মাংস হয়ে তার পেটে চলে গেছে। এখন যদি শুক্রাচার্য বলেন কচ বেরিয়ে এসো, কচ শুক্রাচার্যের পেট চিড়ে বেরিয়ে আসবে, তার মানে কচ বেঁচে যাবে কিন্তু শুক্রাচার্য মারা যাবেন। এখন আর কিছু করার নেই, আদরের মেয়ে কেঁদেই চলছে। সামনে একটাই পথ খোলা, পেটের ভেতরে কচকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিতে হবে, অমরত্বের এই মন্ত্র। কচকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিলেন, কচ যখন বেরিয়ে আসবে তখন শুক্রাচার্য মারা যাবে তখন কচ ঐ মন্ত্র দিয়ে শুক্রাচার্যকে বাঁচিয়ে দেবেন। এছাড়া আর কোন পথ নেই। কোন উপায় নেই, কচকে মন্ত্রটা বলে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। কচকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দেওয়ার পর শুক্রাচার্য বললেন, কচ বেরিয়ে এসো। কচ শুক্রাচার্যের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। কচ বেরিয়ে এসে আবার কচ বললেন, শুক্রাচার্য আপনি উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কচ এইভাবে অমরত্বের মন্ত্রটা পেয়ে গেলেন। দেবযানী তখন বলল, তুমি আমাকে বিবাহ কর। কচ বলে দিল, বিবাহের কোন প্রশ্নই উঠছে না, আমি তোমার বাবার পেট থেকে বেরিয়েছি, তুমি এখন আমার বোন। দেবযানী খুব রেগে গিয়েছে, রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে দিল, তুমি এই বিদ্যাকে কোন দিন কাজে লাগাতে পারবে না। কচও খুব বুদ্ধিমান, ঠিক আছে, আমি এই বিদ্যা দেবতাদের শিখিয়ে দেব, তারা কাজে লাগাবে। এই বলে কচ সেখান থেকে বেরিয়ে দেবতাদের কাছে চলে গেল। মহাভারতে এখানে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, বিশ্বপর্ব যিনি অসুরদের রাজা, তার কন্যা শর্মিষ্ঠার সাথে দেবযানীর ঝগড়া লেগেছিল। কথায় কথায় শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে শুনিয়ে দিল, তোমার বাবা তো আমার বাবার চাকর, তুমি আবার আমার সাথে কি করে কথা বলতে আস! সেটা শুনে দেবযানী খুব মর্মাহত হয়েছিল। দেবযানী সেই কথা শুক্রাচার্যকে গিয়ে বলার পর শুক্রাচার্য বলছেন, আমার কাছে রাজশক্তি নেই ঠিকই কিন্তু আমার কাছে আত্মজ্ঞানের শক্তি আছে, সেইজন্য আমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানটাই অমরত্ব।

এখানে আমরা প্রসঙ্গে থেকে সরে আসছি, কিন্তু এই জিনিসটাকে জানা খুব দরকার। পার্সিদের ধর্ম বা জুরাথ্রিষ্টদের যিনি ঈশ্বর তাঁর নাম আহুর মাজদা। আমাদের যেটা অসুর পার্সিদের সেটা আহুর। আমরা যাদের

অসুর মনে করি ওদের কাছে তারা হল ইন্দ্রাদি দেবতারা। এখানে পুরো ছবিটা নিলে খুব মজার একটা ছবি দাঁড়িয়ে যাবে। যদিও অনেক পণ্ডিতরা এগুলো মানতে চাইবে না, কিন্তু না মানলে কোন ক্ষতি নেই, জিনিসটা কিন্তু খুব পরিষ্কার বোঝা যায়। আমাদের শাস্ত্রে কাশ্যপ মুনির অনেকগুলো স্ত্রী ছিল, তাদের মধ্যে অদিতির সন্তানরা হল দেবতা, অন্য দিকে দিতির সন্তানরা হল দৈত্য বংশ। দেবতা আর অসুর বা দৈত্যরা একই পিতার সন্তান, তাদের মায়েরা আবার দুই বোন। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই এদের মধ্যে ঝগড়া লেগে আছে। নিজেদের মধ্যে আবার কূটবাজীও চলত। কশ্যপের বাকি যত স্ত্রীরা ছিল, তাদের কিছু সন্তানদের দেবতারা টানছে, কিছুদের অসুররা টানতে শুরু করল। শেষমেশ দুটো বংশ দাঁড়িয়ে গেল, যেটাকে আমরা দেবতাদের বংশ আর অসুরদের বংশ বলে জানছি। দেবতাদের বংশের আচার্য বৃহস্পতি আর অসুর বংশের আচার্য শুক্রাচার্য। আর এদের মধ্যে সব সময় লড়াই লেগে আছে, মাঝে মাঝে এদের কাউকে পালিয়ে যেতে হত। এখান থেকে একটা থিয়োরী দাঁড় করান যেতে পারে, একটা সময় কোথাও এই দুটো বংশ এক সঙ্গেই ছিল। কারণ আমাদের বেদ আর পার্সিদের জেন্দাবেস্তা, এই দুটো ধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র আছে যেগুলোর মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। বেদের ভাষা আর জেন্দাবেস্তার ভাষাও একই রকম। আমরা যেমন অগ্নির উপাসনা করি, তারাও অগ্নির উপাসনা করে, তারাও আমাদের মত উপবীত ধারণ করে, আমাদের ব্রাহ্মণরা যেমন খুব গোঁড়া, ওদের অগ্নি উপাসনার যাঁরা পুরোহিত তাঁরাও প্রচণ্ড গোঁড়া। এগুলো দেখে মনে হয় কোন এক সময় এই দুটো জাতি একজোট হয়ে ছিল। কোন কারণে দুটো জাতি এক অপর থেকে সরে এসেছে। দেবতাদের কাছে অসুর জাতি হল বদমাইশ আর অসুরদের কাছে দেবতারা বদমাইশ। আমি বলতে পারি সেটা আমরা কেন মানতে যাব। এই জন্যই মানতে হবে যে আমরা হলাম দেবতার বংশের, সেইজন আমাদের কাছে ঐ রকম মনে হয়। যেমন দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠির এরা ভাই ভাই। আমরা দুর্যোধনকে খারাপ মনে করি, কিন্তু মহাভারত খুব খুঁটিয়ে পড়লে দুর্যোধনের বিশেষ কোন দোষ পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ কৌরবরা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করছে সবটাই ঠিক। দুর্যোধনরা বলছে, ওরা নিজের বাবার সন্তান নয় আবার একটা মেয়েকে পাঁচজন বিয়ে করে রেখেছে, মানে অধর্মের যত রূপ আছে সবটাই পাণ্ডবদের মধ্যে আছে। ভাগবতে একটা জায়গায় আছে, জনমেজয় দুর্যোধনের নিন্দা করছিলেন, যিনি আচার্য ছিলেন তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিয়ে বলছেন, জনমেজয়! তুমি মনে রাখবে উনি তোমার ঠাকুরদা। যারা জয়ী হয় ইতিহাস সব সময় তাদেরই হয়। আমরা দেবতাদের বংশের আমরা জয়ী হয়েছি তাই জয়ীদের হয়ে কথা বলছি। পার্সিরা আবার নিজেদের মত বলছে। অমরত্ব বা আত্মজ্ঞান নিশ্চয়ই অসুররা আগে পেয়েছিল, যেটা শুক্রাচার্য আর বৃহস্পতির কাহিনীতেই এসেছে। এটাকেই কাহিনী রূপে অন্য ভাবে উপস্থাপনা করছেন, বিদ্যাটা শুক্রাচার্য থেকে যাচ্ছে বৃহস্পতির কাছে, পরে দেবতারা বৃহস্পতির কাছ থেকে অমরত্ব পেয়ে গেলেন, যদিও মহাভারত বলছে অমরত্ব প্রথমে অসুরদের কাছেই ছিল। অমরত্বকে এনারা অমৃত রূপে দেখাচ্ছেন, যেটা সমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে বলা হল। কিন্তু শুক্রাচার্য যেভাবে ওখানে অমরত্বের কথা বলছেন সেটা পুরোপুরি আত্মজ্ঞানের কথাই বলছেন, আত্মজ্ঞানটাই অমৃত, যজ্ঞশেষ যেটা বলা হচ্ছে। যজ্ঞশেষ দুটো অর্থে হবে, যেখানে কর্মকাণ্ড শেষ হয় সেখানেই অমরত্ব। সমুদ্র মন্থন আখ্যায়িকার যে অমৃত আর শুক্রাচার্যের কাহিনীতে যে অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে, দুটো একসাথে কোথাও যেন আত্মজ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করছে, আত্মজ্ঞানই অমৃত। অমৃতস্বরূপ বলা মানে ভক্তি আর আত্মজ্ঞান এক।

একদিকে নিষ্ঠাপূর্বক ভক্তির যে সাধনা করা হচ্ছে এবং তার ফলস্বরূপ যে প্রেম, যে আনন্দ, সেটাই ভক্তির স্বরূপ। অন্য দিকে ভক্তির স্বরূপ হল নিজেকে জানা, মানে আত্মজ্ঞান। সেইজন্য বলছেন *অমৃতস্বরূপা চ*। এখানে যে ভক্তির ফল যে অমৃতস্বরূপা বলছেন, এই একটি কথাতে কয়েকটা জিনিসকে নাকচ করে দেওয়া হচ্ছে। বলছেন, ভক্তির জন্য যে কোন পরিবর্তন হয় তা নয়। পরিবর্তন মানে যেমন দুধ থেকে দই হয়ে যায় বা কোন জেনেটিক যে পরিবর্তন হয়, যিনি ভক্তি পেলেন তাঁর যে এই ধরণের একটা সাধারণ পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেই ধরণের কোন পরিবর্তন হয় না। খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মে যেভাবে বলা হয়, ভক্তি হলে জীবনটা চলতে থাকবে তবে সেটা চলবে স্বর্গে গিয়ে। কোন একটা যে ধারাবাহিকতা থাকবে সেটাকেও এখানে নাকচ করে দিচ্ছেন। গীতাতে যেমন বলছেন *জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, এটা কিন্তু গীতার নিজস্ব মত নয়। পূর্বমীমাংসকদের যে দর্শন, যে দর্শনকে বেদের দর্শন বলা হয়, তাতে বলা হয় যে প্রত্যেক শরীরের পেছনে আত্মা রয়েছেন, এই আত্মা অজর অমর। কিন্তু তাঁদের কাছে আত্মা হল যেন একটা জ্যোতির্ময়

চৈতন্যের বল, যে একা কখন থাকতে পারে না, একটা শরীরকে নিয়ে সব সময় থাকে। যখন এই আত্মা পৃথিবীতে আসে তখন মানব শরীর ধারণ করে, স্বর্গে যখন যায় সেখানে দেবতাদের শরীর ধারণ করে আর নীচের দিকে যখন যায় তখন বিভিন্ন ইতর শ্রেনীর শরীর ধারণ করে, শরীর ছাড়া সে কখন থাকতে পারে না। আত্মা যখন পৃথিবী লোকে আসে তখন শুভ কর্ম করলে স্বর্গলোকে গিয়ে এক রকম শরীর ধারণ করে, ভালোমন্দ মিশ্র কর্ম করলে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মায়, যদি অতি জঘন্য কর্ম করে তখন তির্যকাদি যোনিতে গিয়ে বিভিন্ন প্রানীর শরীর ধারণ করে। তার থেকেও বাজে কাজ করলে নরক বা পাতাল লোকে যায় কিন্তু শরীর সব সময় তার থাকবে। ভক্তির স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে যখন বলছেন ভক্তি হলে পরিবর্তন হবে, তখন কি রকম পরিবর্তন হবে সেটাতো আমাদের জানতে হবে। এত রকম যে পরিবর্তনের কথা বলা হল, ভক্তি হলে এই ধরণের কোন পরিবর্তন হবে না। একটা যে জেনেটিক পরিবর্তন আসবে বা বিবর্তন গত কোন যে পরিবর্তন হবে সেই রকম কোন পরিবর্তন হবে না। তাহলে কি ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্মের মতে যে বলা হয় ভক্তি করলে অনন্ত স্বর্গে যাবে? না সেটাও হবে না। তাহলে কি পূর্বমীমাংসকদের মতানুযায়ী ভক্তি করলে এমন একটা শরীর পাবে যে শরীর তাকে উচ্চতম স্বর্গে নিয়ে চলে যাবে? না তাও হবে না। তাহলে কি হয়? *অমৃতস্বরূপা*, মুক্তি হয়ে যায়, এর আগে অমৃতের অর্থ করতে গিয়ে আত্মজ্ঞানের যে কথা বলা হল, সেই অর্থে সে অমর হয়ে যাবে। এমন একটা অবস্থা পাবে যেখানে উপরের দিকেও আর কোন পরিবর্তন হবে না, নীচের দিকেও আর কোন পরিবর্তন হবে না। উপরের দিকে পরিবর্তন হলে মানুষ তখন স্বর্গে যায়, নীচের দিকে পরিবর্তন হলে আরও জাগতিক হয়, এই দুটো পরিবর্তনকে এখানে নাকচ করে দেওয়া হল। অমরত্বের অর্থই হল আর কোন পরিবর্তন হবে না, উঁচুর দিকেও যাবে না, নীচের দিকেও যাবে না, তার মানে ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া। কঠোপনিষদে বলছেন *অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে*, এই জ্ঞান যখন হয় তখন মর্ত্য অমৃত হয়ে যায়। যার মৃত্যু আছে আমরা তাকে মর্ত্য বলেই জানি, অর্থাৎ যিনি পরিবর্তনশীল, আত্মজ্ঞানের পর তিনি অমৃত হয়ে যান। এখানেও ভক্তি পেলে মানুষ ঠিক এই রকম অমৃত লাভ করে। আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়, ভক্তি লাভে সেই একই অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে। ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়াটাই ভক্তির লক্ষণ, এটাই অমৃতের দ্বিতীয় অর্থ।

অমৃতের আরেকটা অর্থ আনন্দ। ঠাকুর তিন রকম আনন্দের কথা বলছেন, সেখানে বলছেন ব্রহ্মানন্দ মানে অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ। কিন্তু সমস্যা হল আমাদের পক্ষে অনন্ত আনন্দের ধারণা করা খুব মুশকিল। ঠাকুর একজনকে বলছেন, এর থেকে হাজার গুণ বেশি, ওর থেকে সেটার হাজার গুণ বেশি। কিন্তু বলছেন ঈশ্বরের এই আনন্দ সর্বোপরি। কি রকম আনন্দ? শরীরের কোটি কোটি রোমে রমণসুখ অনুভব হয়। যে কোন প্রানী, পশু, পাখি, মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে যদি তার রমণ সুখকে জোর করে আটকে দেওয়া হয়। মানুষ যে চারিদিকে এত দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে, সব ঐ রমণসুখ পাওয়ার জন্য। পুরো সৃষ্টিটাই রমণসুখের উপর চলছে। ঠাকুর ঈশ্বরের আনন্দকে বর্ণনা করতে গিয়ে এই রমণসুখের সাথে তুলনা করে বলছেন, ঈশ্বরের আনন্দ যেন শরীরের প্রতিটি রোমে রোমে রমণসুখের আনন্দ। এসব জিনিস আমাদের পক্ষে ধারণা করা খুব মুশকিল। ভক্তি হল আনন্দের সেই অবস্থা। রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা যাঁরা সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী, ঈশ্বরের রূপের কাছে তাঁরা নাকি চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। ঠাকুরের এই সব কথা আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি, এর বেশি কিছু আর ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের রূপের এমনই সৌন্দর্য আর তাঁর কাছে থাকার আনন্দ এতই উচ্চমানের যে জগতে বা সংসারে যত ভোগের জিনিস হতে পারে সব সেই আনুন্দের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে বোধ হয়। এসব কথা যে কোন কবি বা লেখক কল্পনা থেকে বলছেন তা নয়, এগুলো সব ঠাকুরের বর্ণনা। এটাই অমৃত, অমৃত মানে আনন্দের পরাকাষ্ঠা, পরকাষ্ঠা মানে আনন্দের এটাই শেষ কথা। যে আনন্দে গিয়ে মানুষ বিভোর হয়ে যায়, জগতের আর কোন কিছুতে হুঁশ থাকে না। ঠাকুর এই জিনিসগুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে বোঝাতে চাইছেন। তিনি আবার বলছেন, নারদাদি দূর থেকে শুধু হিল্লোল-কল্লোল শুনেছিলেন, শুকদেব তাঁর কাছ পর্যন্ত গিয়েছিলেন আর শিব তিন গণ্ডুষ পান করে শব হয়ে পড়ে আছেন। এসব কথা নিশ্চয় ঠাকুরের নিজস্ব কথা নয়, দক্ষিণেশ্বরে সাধু সন্ন্যাসী যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছে শুনে থাকবেন। কিন্তু ঠাকুর ঠিক মনে করছেন বলেই অন্যদের বলছেন, আমরা যাতে একটা ধারণা করতে পারি। অমৃতস্বরূপাকে যখন ভক্তি বলছেন, তখন তার মানে ভক্তি হল সচ্চিদানন্দ সাগরের কাছে।

বলছেন শিব সচ্চিদানন্দ সাগরের তিন চুমুক জল পান করে শব হয়ে পড়ে আছেন। শিব যিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিও সচ্চিদানন্দের কাছে কিছুই নন। শুকদেব তো শুধু স্পর্শটুকু করেছেন, কিন্তু তাতেই তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। নারদ যিনি নাকি দেবর্ষি তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরের কাছেও যাননি দূর থেকে শুধু তার হিল্লোল কল্লোল শুনেছেন। এইভাবে একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছেন ভক্তির স্বরূপ কেমন হতে পারে। ঠাকুরের কথা শুনে আমরা ইঙ্গিত আভাস পেতে পারি, ধারণা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

নরেন যখন ঠাকুরকে বলছেন অমৃতকুম্ভের আড়ায় বসে আমি অমৃত পান করব তা নাহলে আমি ওতে ডুবে মরে যাব, তখন ঠাকুর বলছেন অমৃতকুম্ভে ডুবলে কেউ নাশ হয়ে যাবে না, অমর হয়ে যায়। ঠাকুরও সচ্চিদানন্দ সাগরের আনন্দকে অমৃত রসের সাথে তুলনা করছেন। এখানে একই অর্থে ভক্তিকে বলছেন *অমৃতস্বরূপা চ*। একদিকে খাটাখাটনি করে যজ্ঞশেষের অমৃত, অন্য দিকে আত্মজ্ঞানের অমৃত যার কথা কঠোপনিষদ বা অন্যান্য জায়গায় বলছেন, আবার আনন্দের দৃষ্টিতে সেই আনন্দ এমন যাকে তুলনা করছেন চিটেগুড়ের রস আর মিছরির রসের সাথে, সেইজন্য বলা হয় যিনি অমৃতের আস্বাদ করেছে তিনি অন্য কোন কিছু আস্বাদ করতে চাইবেন না। তেমনি যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আস্বাদ পেয়েছেন তিনি আর কোন দিন জগতের সাধারণ কোন কিছুর দিকে মন দেবেন না। কবীর দাশের দোঁহাতেও বলছেন চাহ তো চাখে প্রেমরস, এমন প্রেমরস যে অন্য কারুর সাথে তুলনা করা যাবে না।

একজন মহারাজ ছিলেন তিনি ইয়ং সাধু সন্ন্যাসীদের বলতেন, ভাই! জপ কর, ভোরবেলায় উঠে জপ কর, যখন একবার জপের রস পেয়ে যাবে তখন দেখবে ওই রসে তোমার মন একেবারে ডুবে যাবে। আরেকবার একজন মহারাজ একজন অল্প বয়সী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞেস করছেন, সারাদিন কি করে সময় কাটাও? ব্রহ্মচারী তখন যে সেন্টারে ছিলেন সেখানে আশ্রমের কাজকর্ম কিভাবে করেন, তারপর বই পড়া আর সাধুদের সাথে গল্প করে কিভাবে সময় কাটান সব বললেন। উনি তখন ব্রহ্মচারীকে বলছেন, ও! আড্ডারস তোমার খুব ভালোই লাগে দেখছি, আড্ডারস যতদিন আছে ততদিন জপের রস কোন ভাবেই পাবে না। কথাটা ব্রহ্মচারীর কাছে খুব খারাপ লেগেছিল, মহারাজদের সঙ্গে কথা বলা মানে ভালো কথাই হয়, তার মধ্যে সব রকম কথাই হয় আর সাধুসঙ্গও হচ্ছে। কিন্তু উনি খুব কড়া ভাবে কথাটা বললেন, আড্ডারস থাকলে জপের রস পাবে না। জপ করতে করতে যখন ভক্তি রসের আস্বাদ করে তখন বিষয়রস আলুনি লাগে। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, কুণ্ডলিনী যখন হৃদয়ে চলে আসে, মনের অবস্থা যখন উচ্চ হয়ে যায় তখন বিষয় কথা আর ভালো লাগে না। যত উপরের দিকে মন যেতে থাকে পেছনের জিনিস গুলোকে মানুষ তত ছেড়ে দিতে থাকে। ঠাকুর বলছেন, বাচ্চা বয়সে মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, বিয়ে হয়ে গেলে সব পুতুল বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে তুলে রাখে। অমৃত রস ঠিক তাই, যখন ঐ রসের আস্বাদ পেয়ে গেল তখন জগতের যত পুতুল আছে, সবটাই পুতুল, আমরা জগতে যেটাই করছি, আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি নিয়ে যে কাজ করছি সেটাও পুতুল, গ্রামের মানুষ যখন সন্ধ্যেবেলা শ্রীরাম জয়রাম করছে ওটাও পুতুল, ঠিক ঠিক ভক্তিরসের সামনে সবটাই পুতুল। তবে যে শ্রীরাম জয়রাম করছে বা হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করছে এটা ঠিক বিষয়রসের মধ্যে পড়ছে না কিন্তু ভক্তিরসও নয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন ভজনানন্দ, বাকিগুলো থেকে ভালো। অমৃতরস মানেই হয়, সেই অবস্থা থেকে সে আর নামবে না। অমরত্ব মানেও তাই, যেটা হয়ে যাওয়ার পর ঐ অবস্থা থেকে আর কোন দিন নামবে না, ভক্তি মানে তাই। ভজনে মন ভালো লাগছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেমনি ভজনানন্দ থেকে মন নেমে এল সে আবার বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তাই সেটা আর অমরত্ব হল না, অমৃতত্ব সেটা নয়। সেইজন্য বলছেন অমৃতস্বরূপা, যিনি ভক্তি লাভ করেন ভক্তি তাঁকে অমর করে দেবে। অমর করে দেওয়া মানে, ঐ অবস্থা থেকে তাঁর আর কোন দিন বিচ্যুতি হবে না।

সেইজন্য নারদ যে ভক্তিকে অমৃতস্বরূপা বলছেন তাতে যত রকমের অমরত্ব হতে পারে সবটাকেই নিয়ে আসা হচ্ছে, আর ভক্তিতে যত রকমের অমরত্ব হতে পারে সবটাকেই এর মধ্যে ধরা আছে। যেখানে যেখানে বিভিন্ন ধর্মে বা বিভিন্ন দর্শনে অমৃতকে যে যে অর্থে নেওয়া হয়, ভক্তিকেও প্রত্যেকটি অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। অমৃতকে যেমন পাঁচ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ভক্তিকেও প্রত্যেকটি অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। এর আগের সূত্রে সমস্ত যোগকে নারদ এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন আর এই সূত্রে আধ্যাত্মিক জগতে যত রকমের ভাব, যত রকমের দর্শন, তার যত পথ তার যত রকম পরিণতি, সব কটিকে নারদ এক জায়গায় এনে বলছেন

অমৃতস্বরূপা চ। এখানে নারদ কোন শব্দজাল সৃষ্টি করে বুদ্ধির খেলা দেখাচ্ছেন না, তিনি ভক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে শব্দগুলিকে চয়ন করছেন, খুব ভেবে চিন্তে শব্দগুলোকে এমন ভাবে এনেছেন যাতে আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে যা কিছু আছে সবটাকে এনে একটা শব্দের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন।

কেউ যদি বলে আমার স্ত্রীর প্রতি আমার প্রেমও অমর। তখন তাঁরা দেখাবেন অমর মানে এই এই অর্থে হতে হবে। যজ্ঞশেষ তোমার প্রেমেও হতে পারে, তুমিও অনেক কষ্ট করে, সাধ্য সাধনা করে একজন নারীকে জোগার করে জীবনসঙ্গিনী করেছ। কিন্তু তোমার এই প্রেম জন্মমৃত্যুর চক্রে একদিন থেমে যাবে। অমৃতকে শাস্ত্রে যে কটি অর্থে নেওয়া হয়, প্রত্যেকটি অর্থকে খাপে খাপে বসতে হবে। খুব সুস্বাদু খাবার খেয়ে আমরা বলি আহা যেন অমৃত খেলাম, এই অমৃত মনের একটা অনুভবকে ভাষার মাধ্যে অভিব্যক্ত করছে, বাস্তবিক অমৃত নয়। কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে অমৃতের প্রত্যেকটি অর্থকে খাপে খাপে বসানো যায়, এটাই তফাৎ।

পরের সূত্রে যাবার আগে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পরেও আবার এই একই জিনিস মনে করিয়ে দেওয়া হবে। এগুলোকে বলা হয় সূত্র সাহিত্য। সূত্র সাহিত্যের সমস্যা হল, এর কথাগুলো খুব সংক্ষেপে দেওয়া থাকে। এগুলোকে সংস্কৃতে পড়ার সময় নিজস্ব যে ভাবনা আছে, জিনিসটাকে আগে থেকে একটা যে ধারণা নিয়ে বসে আছে, সেই অনুসারে তখন তার একটা স্বাভাবিক অর্থ বেরিয়ে আসে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেই স্বাভাবিক অর্থটা ঠিক নয়। কারণ সূত্র সাহিত্যের অর্থ হল সেই বিষয়ের যাবতীয় যা কিছু আছে সেটাকেই ওনারা মূল কয়েকটা শব্দ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। একটা সূত্রকে যদি আমাদের বুঝতে হয়, এই সূত্রে ঠিক কি বলতে চাইছে, তাহলে তার আগে আমাদের পুরো বিষয়টাকে জানা চাই। শুধু ভক্তিসূত্রেই নয়, যে কোন সূত্রধর্মী সাহিত্যে, যেমন পাণিনির সূত্র, যদি ব্যাকরণটা পুরো জানা না থাকে তাহলে পাণিনির কোন সূত্রই বোঝা যাবে না। সেইজন্য যাঁরা এর ভাষ্য রচনা করেন, তাঁরা সবাই সেই পরম্পরাতে থেকে অধ্যয়ন করে পুরো বিষয়টাকে আগে নিজের দখলে নিয়ে আসেন। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে সেই রকম ভাষ্য কেউ রচনা করেননি। কারণ ভক্তিশাস্ত্রে, যেমন ভাগবতে সব কিছুকে এত পরিষ্কার করে ভক্তির উপর সব কিছুকে বলে দেওয়া হয়েছে এরপর কে আর নারদ ভক্তিসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করতে চাইবেন। যেমন মীরাবাঈয়ের এত গান, সুরদাসের এত ভজন বা মহাপ্রভুর উপর এত সঙ্গীত, এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এরপর কে আর চাইবেন এসবের উপর ভাষ্য রচনা করতে। যদি কেউ বলে আমি জানতে চাই নারদ ভক্তি বলতে ঠিক কি বলতে চাইছেন, এবার নারদীয় ভক্তিসূত্রের উপর চার পাঁচ খানা গ্রন্থ পড়তে গিয়ে, ভক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বা শোনার পর কোথাও কোথাও তার অনেক রকম সংশয় তৈরী হবে। এছাড়া মূল কথাগুলোও তার ভেতর থেকে ছিটকে যাবে, ওগুলো ধরা যাবে না। ছোটবেলা থেকেই সবাই ভক্তির কথা শুনছে, দেখছে, ধূপ জ্বালানো, পূজা করা এগুলো দেখে আসছে, দু চারটে ভক্তিগীতি সবাই শুনেছে, সেইজন্য সবাই মনে করে যে ভক্তি কি আমার জানা আছে। কিন্তু ভক্তির গভীরে গেলে ভক্তির অর্থ অন্য রকম হতে থাকে।

সূত্র মানেই খুব সংক্ষেপে একটা মূল কথাকে বলে দেওয়া হল। কিন্তু এর অর্থ যদি বুঝতে হয় তাহলে তাকে প্রথমে পুরো ভক্তিশাস্ত্র জানতে হবে। দ্বিতীয়, সূত্রগুলো যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত করে নেওয়া হয় তাহলে বুঝতে পারবে ভক্তি জিনিসটা কি। সাধারণ ভাবে ভক্তি বলতে আমরা যা বুঝে আসছি ভক্তি কিন্তু তা নয়, ভক্তি খুব গভীর জিনিস। দুটো তিনটে সূত্রের আলোচনাতেই ভক্তিকে বোঝাতে গিয়ে আমাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, অথচ আমরা সবাই ধরে নিয়েছি যে ভক্তি হল সহজতম পথ। কিন্তু এখন একটু বোঝা যাচ্ছে ভক্তি সেইভাবে সহজ নয়। সহজ কেন বলছেন, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ইমোশানস আছে, সেই ইমোশানকে এখানে কাজে লাগানো যায়। বাড়িতে চাল, ডাল, নুন, তেল, সবজী সবই থাকে, মেয়েরাও সবাই রান্না করতে জানে, তাও লোকে ফাইভ স্টার হোটেলে খেতে যায় কেন? কিছু তো বৈশিষ্ট্য আছে। চাল-ডাল আর মশলা দিয়ে গ্যাসে নেড়ে দিলেই কেউ রন্ধন বিজ্ঞানকে জেনে যাবে না, সেটা পুরো আলাদা জিনিস। তবে মেয়েরা ছোটবেলা থেকে হাতা খুন্তি নাড়তে নাড়তে রান্না জিনিসটাকে রপ্ত করে নেয়, তাছাড়া আর কিছু না।

আগের সূত্রে ব্যাখ্যা করলেন ভক্তি জিনিসটা কি। পরে আরও নানান ভাবে ব্যাখ্যা করবেন, কারণ একটা বাক্যে তো পুরোটা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আমাদের জায়গা থেকে বলছি ভক্তি মানে ইষ্টকে ভালোবাসা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জিনিসটাকে কিভাবে দেখছি? আমরা ভক্ত কাকে বলছি? যাঁর মন

প্রাণ ইষ্টে লয় হয়ে আছে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু ভক্তি জিনিসটা ঠিক ঠিক কি? ভক্তির নিজস্ব স্বরূপটা কি? আগের সূত্রে সেটাকেই বলছেন অমৃতস্বরূপা। ভক্তির ভেতরটা, যেটা দিয়ে তৈরী সেটা অমৃত। তাহলে অমৃত কি? এর আলোচনা আমরা বিস্তারিত ভাবে করে এসেছি। এরপর চার নম্বর সূত্রে বলছেন –

যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।।৪।।

যৎ আর *লব্ধা* সন্ধি করে বলছেন *যল্লব্ধা*, *যৎ লব্ধা* মানে যেটাকে লাভ করে, *পুমান্* অর্থাৎ মানুষ কি হয়? *সিদ্ধো ভবতি*, সিদ্ধ হয়ে যায়, *অমৃতো ভবতি*, অমর হয়ে যায় আর *তৃপ্তো ভবতি*, পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। যৎ শব্দের অনেকে অর্থ করেন ভক্তি, এখানে যৎ বলতে ভক্তিকে বোঝাতে পারে ঠিকই কিন্তু এর সহজ প্রযোজ্য অর্থ হয় অমৃত। আগের সূত্রে ভক্তিকে বলছেন অমৃতস্বরূপা, এখানে সেই অমৃতস্বরূপার ফলশ্রুতিকে নিয়ে যৎ শব্দের অর্থ হয় অমৃত। ভক্তিই অমৃত, অমৃতই ভক্তি, সেইজন্য যৎ শব্দের ভক্তি অনুবাদ করা যায়, কিন্তু ভাষ্যকাররা সচরাচর অমৃতই অর্থ করেন। কোন অমৃত? ভক্তি রূপী অমৃত। বলছেন, এই অমৃতকে লাভ করলে, লব্ধা বলতে ভাষ্যকাররা বোঝাচ্ছেন ঈশ্বরীয় কৃপা। আমরা নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে এর অর্থ করলে এক রকম হবে, ভাষ্যকাররা যখন এর অর্থ করছেন তখন সেই অর্থটা অন্য রকম হয়ে যায়। বলছেন, বস্তু লাভ, ভক্তি লাভ ঈশ্বরীয় কৃপাতেই হয়। আর বলছেন লাভ করাটা সরাসরি তার পরিণতি। যাঁরা ঈশ্বরে ভক্তি করেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসেন কিন্তু তার ফল রূপে তিনি পেয়ে যান অমৃতত্ব।

ঠাকুরের দুটো উপমা নিলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কয়েক বছর খরা গেছে, চাষবাশ হচ্ছে না, দুজন চাষী ঠিক করল নদী থেকে খাল কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে আসতে হবে। দুজনেই খাল কাটতে শুরু করেছে। একজন চাষীর স্ত্রী বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে চাষীকে এসে বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে, খেয়েদেয়ে না হয় আবার করবে। চাষী রাজী হয়ে গিয়ে ওখানেই কাজ বন্ধ করে স্ত্রীর সাথে বাড়ি চলে এল। অন্য চাষীর স্ত্রীও ঐ কথা বলতেই সেই চাষী তেড়েমেড়ে স্ত্রীকে বলছে, খেপী তোকে আজ কেটেই দেব, তুই জানিস না, কয়েক বছর বৃষ্টি হয়নি, বাচ্চারা খাবে কি! চাষী খাল কেটে নদী থেকে ক্ষেতে জল নিয়ে আসতে চাইছে। উদ্দেশ্য হল নদী থেকে জল আনা। খাল কেটে নদীর সাথে সংযোগ হতেই কুল কুল করে ক্ষেতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। চাষী তখন বলছে, এবার তামাক দে, তেল দে। এটাই বলে দিচ্ছে ভক্তিতে ঠিক কি হয়। গীতা উপনিষদ পড়া না থাকলে কথামৃত বোঝা যাবে না। ঠাকুর এখানে কোন রহস্য দাঁড় করাচ্ছেন না, কিন্তু এই কাহিনীটা না দিলে জিনিসটা স্পষ্টই হবে না। লোকটি খাল কাটছে, কেটে গেল, জলও এসে গেল, কাহিনীতো ওখানেই শেষ। কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তারপরেই ঠাকুর আরেকটা বাক্য নিয়ে আসছেন, কাহিনীর মধ্যে এই বাক্যটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাক্যটাকে সরিয়ে দিলে কাহিনীর আর কোন মূল্য থাকে না। বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসবে, অনেক রকম রান্নার আয়োজন করা হয়েছে, সব রকম রান্না হয়ে যাওয়ার পর মায়েরা বলে, দে এক কাপ চা খাই। এরপর অতিথিরা আসার পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে। শুধু যে একটু এনার্জি আনার জন্য চা খেতে চাইছেন তা নয়, একটা বড় কাজ হয়ে গেল, কাজ শেষ হওয়ার পরিতৃপ্তির জন্য এক কাপ চা খাচ্ছে। চাষীও সারাদিন খাল কেটে কেটে যখন দেখল নদী থেকে জল কুল কুল করে ক্ষেতে ঢুকতে শুরু করেছে, তখন মেয়েকে বলছে, দে এবার তামাক সাজ। উদ্দেশ্য ছিল জল আনা, জল এসে গেছে, এখন এর পরিণতি কি? পরিণতি হল আনন্দ। চাষী তো সেখানে আনন্দ চায়নি, সে চাইছিল জল। জল এসে গেছে, একটা পরিতৃপ্তি সূচক শব্দ বার করে বলছে, আঃ, যা এবার তামাক নিয়ে আয়। তার মানে যে কাজ করার ছিল, সেই কাজের ফলও পেয়ে গেছে, কিন্তু যজ্ঞশেষ, মানে অতিরিক্ত পরিণতি যেটা সেটাই যজ্ঞশেষ। ঈশ্বরকে ভালোবাসছে, ঈশ্বরের ভালোবাসা তো সে পেয়েই গেছে, কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু সে জানে না, কিন্তু মাঝখান থেকে সে পেয়ে গেল ভক্তি। ভক্তি পাওয়াতে পেয়ে গেল অমৃতত্ব। *যৎ লব্ধা*, এটাই লাভ, এই লাভটা ফাউ, যে অর্থে আমরা ফাউ মনে করি সেই অর্থে ফাউ নয়, অর্থাৎ সে সচেতন ভাবে অন্য কিছুর চেষ্টা করছিল কিন্তু তার ফলটা অন্য হয়ে গেল, কিন্তু এর একটা direct consequence আছে। একই ধরণের আরেকটা কাহিনী ঠাকুর বলছেন, নৌকা নদী দিয়ে অনেক আঁকা বাঁকা বাঁকের মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝি খুব শক্ত করে হালটা ধরে রাখে। খুব কষ্ট করে বাঁক গুলোকে কোন রকমে পার করিয়ে দেওয়ার পর সোজা পথে এসে গেলে হালটা আরেকজনকে দিয়ে নিজে ভুরুর ভুরুর করে তামাক টানতে শুরু করে।

খাল কাটা, নদীর বাঁক পেরনো খুব কঠিন কাজ, ভক্তিও অত্যন্ত কঠিন কাজ। চাষীর জল এসে গেছে, মাঝি শক্ত বাঁকগুলো পার করিয়ে দিয়েছে, ঠাকুর দুটো জায়গাতেই আনন্দের বর্ণনা করছেন তামাক খাওয়া দিয়ে। তামাক খাওয়া মানে, বড় কাজটা হয়ে গেছে, এবার আমি হাল্কা হলাম। তামাক খাওয়ার জন্য এই কাজগুলো করা হয়নি, কাজের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। *যল্লব্ধা*, অমৃতত্বের যে লাভ হয়, এই অমৃতত্ব লাভের জন্য তাঁরা চেষ্টা করেননি। কোন ভক্তই ভক্তি করার জন্য আমি আনন্দ পাব এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তি করেন না, ভক্তি এই জন্যই করছেন, আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি। আরেকটা হয় লাভের অর্থে, যেখানে কৃপা করে তিনি ওটা দিয়ে দেন। এরও ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, জমিদারের বাড়িতে একজন অনেক দিন ধরে বাবুর সেবা করে যাচ্ছে। বাবু একদিন নিজের বৈঠকখানায় বসে আছেন, সেখানে সেও গেছে, বাবু খুশী হয়ে তাকে বলছে, আয় তুমি আমার পাশে এসে বোস, তুইও যা আমিও তাই। মালিকের পাশে বসার সৌভাগ্যে সে আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে। এখানে লব্ধা জিনিসটা দিয়ে ঈশ্বরীয় কৃপাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সাধারণ ভাষায় বা জাগতিক ভাবনা দিয়ে লাভ করা যে অর্থে মনে করি এখানে সেই লাভ করার কথা বলছেন না। সূত্রে লব্ধ শব্দের মধ্যে একটা ঈশ্বরীয় ব্যাপার আছে, এর পরের সূত্রে গিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। এতে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার একটা ব্যাপার থাকে, করল একটা জিনিস কিন্তু ফল তার থেকে আরেকটু বেশি পেয়ে গেল। এই হল লব্ধার অর্থ।

এই লাভ কারা পায়? বলছেন *পুমান্*, সূত্রধর্মী সাহিত্যে প্রত্যেকটি শব্দের আড়ালে গভীর অর্থ লুকিয়ে থাকে, সূত্রে এমনি দুমদাম করে কোন শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় না। গীতা উপনিষদে তাও চলতে পারে, গীতার অনেক জায়গায় আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলছেন, ছন্দ মেলানোর জন্য এইভাবে শব্দটাকে এখানে দেওয়া হয়েছে। গীতা আদি গ্রন্থে ছন্দ মেলাবার জন্য একটা অক্ষর বা মাত্রা কম বেশি হতে পারে, কিন্তু সূত্র সাহিত্যে এর উল্টোটাই হয়, পারলে অক্ষর কম করবেন আর ছন্দেরও কোন ব্যাপার নেই। সেইজন্য সূত্রের জন্য যে শব্দগুলোকে তাঁরা চয়ন করেন তার প্রত্যেকটি শব্দের একটা বিশেষ অর্থ থাকে। সেই বিশেষ অর্থ আবার ঠাকুরের সেই জমিদারের কাহিনীতে উয়ার একটা মানে আছে সেই অর্থে নয়। জমিদার ক্ষেতের আল দিয়ে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে গেছে। পেছনে তার মোসায়েবরা সব আসছিল, জমিদার পড়ে গেছে মোসায়েবরা হাসাহাসি করবে এই চিন্তা তার আছে। জমিদার উঠে বলছে, আমি যে পড়লুম উর একটা মানে আছে। যারা নিজেদের খুব চালাক মনে করে তারা সব কিছুতেই একটা বিশেষ অর্থ বার করে দেবে আর যারা মহামুর্খ তারাও একই জিনিস করে। যেখানে কিছু নেই সেখানেও এরা একটা অর্থ বার করে দেবে। এদের মত সূত্র যে আমাদের বোকা বানাচ্ছে তা নয়, সূত্র মানেই হয় যখন এই শব্দকে আনা হয়েছে তখন আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে এই শব্দকে কেন আনছেন। একেবারে যে এমনিই দিয়ে দিয়েছেন তা নয়, একটা মুর্খ বানিয়ে কিছু যে বলে দেবে তাও নয়, এর মধ্যে যে উর একটা মানে আছে তাও নয়, একটা শব্দ রাখতে হবে তাই রাখা হয়েছে তাও নয়। *পুমান্* শব্দ দিয়ে ভক্তিতে যত রকম শর্ত লাগানো যায় সব শর্তকে সরিয়ে দিচ্ছেন।

ভক্তি মানে open to all, *পুমান্* শব্দের এটাই ব্যাখ্যা। যোগের পথে গেলে অনেক শর্ত পূরণ করতে হবে, স্বামীজী রাজযোগ গ্রন্থে যত বার যোগ শব্দ আনছেন সব জায়গাতে তিনি একটা শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন যিনি যোগী এটা তাঁর জন্য, আমার আপনার জন্য নয়। বেদান্তে ঢুকতে গেলে প্রথমেই চারটে শর্তের নোটিশ ঝুলিয়ে দেবে, যম, নিয়ম, শ্রদ্ধাদি এই জিনিসগুলো থাকা চাই, যদি না থাকে বেদান্ত তার জন্য নয়। ঠাকুরও বলছেন, নরেনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, নরেন না আবার ছেড়েছুড়ে চলে যায়। ঠাকুর নরেনকে দেখে গান করছেন, হারাই হারাই। তার মধ্যে আরেকজন আপত্তি করাতে ঠাকুর বলছেন, ওটা আমাদের দুজনের মধ্যে একটা হয়ে গেল। ঠাকুরের সব কথা, ঠাকুর কেন, কোন গুরুরই সব কথা সবার জন্য হয় না। এখানে বলতে চাইছেন, যারাই ভক্তি পথ নিতে চাইছে তাদের ইষ্টের প্রতি ভক্তি হবে পরমপ্রেমরূপা। পরমপ্রেমের ফলে যে অমৃতত্ব হয়, বলছেন এটা তিনি দেন। এখন বলছেন কার জন্য এই ভক্তি? বলে দিলেন *পুমান্*, *পুমান্* বলা মানেই হয়ে গেল ভক্তি সবার জন্য। এখানে কোন শর্ত আরোপ করা হচ্ছে না, ভক্তি সবারই জন্য অবারিত দ্বার। পুরুষ নারী, রাজা ভিখারী, ব্রাহ্মণ শূদ্র, শিশু বৃদ্ধ সবারই ভক্তি হতে পারে। অন্য কোন পথ, জ্ঞানের পথ বলুন, যোগের পথ বলুন, সাংখ্যের পথ বলুন, কোন পথেই এই জিনিস সম্ভব নয়। সেইজন্য বলা হয় ভক্তি পথ সহজ পথ, কারণ সবাই এই পথ নিতে পারে, একটা শিশুও এই পথ নিতে পারে, ধ্রুব নিয়েছেন, প্রহ্লাদ নিয়েছেন। আবার বৃদ্ধ বয়সে যখন নিজের কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকে না, সে কি করে ধ্যান করবে, কি করে

নিত্যানিত্যের বিচার করতে পারবে, কিন্তু ভক্তি করতে পারবে, ঠাকুর বলছেন, সকাল সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হরিনাম করবে, এটাই ভক্তির পথ। সেইজন্য রামায়ণে আমরা দেখছি শ্রীরামচন্দ্রের সব ধরণের ভক্ত ছিল, নিষাদরাজ গুহক ছিল সেও ভক্তি করছে, শবরী এক আদিবাসী মহিলা সেও ভক্তি করছে, হনুমান তিনিও কোন আদিবাসী জাতি ছিলেন, তিনিও ভক্তি করছেন আবার শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ তিনিও ভক্তি করছেন, আবার ভরদ্বাজ মুনি তিনিও ভক্তি করছেন, কোন এমন গ্রুপ নেই যে ভক্তি করছে না। মানুষ মাত্রই ভক্তি পথ নিতে পারে, সেইজন্য *পুমান্* শব্দটা নিচ্ছেন।

এটাকে লাভ করে পুমানের কি হয়? বলছেন *সিদ্ধো ভবতি*, সে সিদ্ধ হয়ে যায়। সিদ্ধ শব্দের আবার অনেকগুলো অর্থ হয়। সিদ্ধ হওয়ার একটা অর্থ হয় অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ হওয়া। অষ্টসিদ্ধি মানে যোগে যেখানে অণিমা, গরিমা, লঘিমাদি সিদ্ধির কথা বলছেন, অষ্টসিদ্ধিতে নানান রকমের শক্তির কথা বলা হয়, সেই অর্থেও সিদ্ধ বলা হয়। এখানে কিন্তু ওই অর্থে সিদ্ধ বলছেন না। সিদ্ধ বলতে গিয়ে স্বামীজী perfection শব্দটা নিয়ে আসছেন। সিদ্ধ এখানে perfectionএর অর্থে, পূর্ণতা। Perfectionকে মুক্তির অর্থেও নেওয়া হয়। স্বামীজী যখন বলছেন, eduction is the manifestion of perfection already in man, তখন perfection মানেই হয় মুক্তি। মুক্তি জিনিসটা মানুষের মধ্যে সব সময়েই বিদ্যমান, মানুষ স্বভাবেই মুক্ত কিন্তু মনে করে আমি বন্ধনে আছি।

আবার সিদ্ধ মানে নরম হয়ে যাওয়া, আমরা যেমন বলি চাল সেদ্ধ হয়ে গেছে, মানে চাল নরম হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বরে ভক্তি এলে ভক্ত নরম হয়ে যায়। ভক্তের চুল দাড়ি পর্যন্ত বাস্তবিক নরম হয়ে যায়, যদিও এখানে অর্থ তা নয়। যার জন্য ঠাকুর ক্ষৌরকর্ম করতে পারতেন না, কারণ তাঁর চামড়া কেটে বেরিয়ে যেত, হাত এত নরম ছিল যে লুচি ছিড়তে গিয়ে ঠাকুরের আঙুল কেটে যেত, অথচ আগে কুস্তি লড়তেন। যাঁরাই ভক্তির চরমে পৌঁছে যান তাঁদের বাস্তবিক সব কিছুই নরম হয়ে যায়, তাঁর শরীর নরম হয়ে যায়, তাঁর কথা নরম হয়ে যায়। স্বামী ভূতেশানন্দজীর শেষের দিকে তাঁর হাত দেখে মনে হত যেন মাখনের মত নরম, অথচ আগে তিনি কত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ওনার সেবকের কাছে শোনা, একদিন তিনি মহারাজের হাতটা দেখে বলছেন, কত নরম মোলায়েম। মহারাজ একটু নীচু স্বরে বলছেন, দেব শরীর কিনা। সেবক যখন জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ কি বললেন? উনি তখন কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলছেন, ও কিছু না। বাংলায় সিদ্ধ বলতে যদি নরম মনে করা হয় তাহলে ভক্তিতে বাস্তবিক এগুলো হয়। প্রত্যেক ভক্তের এই জিনিস হবে, এর কোন ব্যাতিক্রম হবে না, তিনি খ্রীশ্চান হন, মুসলমান হন, হিন্দুই হন যেই হন, ওনার শরীর যদি নরম না হয়ে থাকে, কথা যদি নরম না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। ভেতর বাইরে এই নরম হয়ে যাওয়ার জন্য ভক্ত আর কারুর ক্ষতি করতে পারে না। ঠাকুর সাপের গল্প বলছেন। ব্রহ্মচারী সাপকে মন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন আর কাউকে হিংসা করিস না। সাপ এখন মন্ত্র জপ করে করে এমন হয়ে গেছে যে বাচ্চারা পাথর ছুঁড়ে মারছে সাপ বলছে, এরা অবোধ, এরা জানে না। তারপর আস্তে আস্তে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল যাতে বাচ্চারা আর তাকে দেখতে না পায়। আমরা বলছি তার হিংসা ভাব চলে গেছে, কিন্তু হিংসা না, তার কাম ভাব চলে যায়। কাম ভাব মানে, আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমারই হয়ে থাকবে, অন্য কারুর দিকে আর যাবে না। এই যে আমার হয়ে থাকবে, মানে তার মধ্যে কাঠিন্য ভাব এসে গেল, ভক্তিতে ঐ কাঠিন্যটা চলে যায়। সেইজন্য দেখা যায় ভক্ত নিজের স্ত্রীর সঙ্গ করতে পারে না, হয় নিজের স্ত্রীকে মায়ের মত দেখবে নয়ত ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে। শরীরের জন্য যার কোন আসক্তি নেই তার ক্রোধ থাকবে না, ক্রোধ করার জন্য একটা কাঠিন্য ভাব দরকার, তিনি সিদ্ধ হয়ে গেছেন, কাঠিণ্য ভাবটাই চলে গেছে। লোভের ক্ষেত্রেও তাই হবে, তোমার থাকুক না থাকুক আমি চাইই চাই, লোভ মানেই তাই। কাম মানে আমি চাই আর লোভ মানে তোমার হোক আর না হোক আমার চাই। মদ, মাৎসর্য্য, হিংসাতে কি হয়, আমার নেই তোমার হয়ে গেছে! তোমার পা যেন খোড়া হয়ে যায়, এটাই মাৎসর্য্য। কিন্তু যে নরম হয়ে যায় সে বলে, আমার না হয়েছে তো কি হয়েছে তোমার তো হয়েছে তুমি সুখে থাক। ভক্তিতে বাহ্য শরীর নরম হয়ে যায়, অন্তঃকরণ পুরোপুরি নরম হয়ে যায়, কারুর প্রতি ক্রোধ করা, কাউকে হিংসা করা এই জিনিসগুলো তার আর হতে পারে না, *সিদ্ধো ভবতি*, সবারই ভালো চায়।

দ্বিতীয় বলছেন, *তৃপ্তো ভবতি*। ভোজ বাড়িতে ভালোমন্দ খাওয়ার পর আমরা বলি খেয়ে তৃপ্ত হলাম। তৃপ্ত অবশ্যই হয়, কিন্তু সাময়িক। যত ভালোমন্দই খেয়ে থাকুক, চার পাঁচ ঘন্টা পর আবার খিদে পাবে। বলে যে মিথিলার ব্রাহ্মণরা নাকি প্রচুর খেতে পারতেন। এক জায়গায় প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করেছে, সব খাওয়ার পর রসগোল্লা দেওয়া হয়েছে, সবাই অনেক রসগোল্লাও খেয়েছে। তখন যিনি খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন, সেই রাজা এসে বললেন, এরপর একটা রসগোল্লা খেতে পারলে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হবে। কোন রকমে অনেকেই একটা করে রসগোল্লা খেয়েছে। এক রাউণ্ড হয়ে যাওয়ার পর এবার বললেন, এবার একটা করে রসগোল্লা খেতে পারলে দশ টাকা করে দেওয়া হবে, এবার কিছু লোক কমে গেছে। এই করে করে যখন একশ টাকায় উঠেছে তখন একজন মাত্র থেকে গেলেন। উনিও বলে দিলেন, আর হবে না। রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, চলে যাওয়ার সময় গেটে পান দিয়েছে। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, এই পান নেওয়ার ক্ষমতা যদি থাকত তাহলে কি একশ টাকা ছাড়তাম। মানুষের কখনই তৃপ্তি হয় না। যযাতির কাহিনীতে এটাই বলছেন, আগুনে যতই ইন্ধন দেওয়া হোক, আগুনের কখনই তৃপ্তি আসবে না। ইন্দ্রিয়ের যে কোন জিনিসের ভোগ করা হোক না কেন, হয় কিছুক্ষণ পরে ঐ বিষয়ের তৃষ্ণা জাগবে আর তা নাহলে সব সময় মনে হবে মনটা ভরল না। পুরো খাওয়া হয়ে গেছে, তারপর আরও দিতে চাইছে কিন্তু নিতে পারছে না, কিন্তু দুঃখ একটা থেকে গেল, আমি এগুলো আর নিতে পারলাম না। কম থেকে গেলেও দুঃখ, ভরে গেল তাতেও দুঃখ। কিন্তু ভক্তি যখন হয়, এখানে সাধারণ ভক্তির কথা বলছেন না, ভক্তি লাভের কথা বলছেন, ওর তখন এমন একটা তৃপ্তির বোধ আসে যে মনে করে অমর হয়ে যাই, সেইজন্য বলছেন *অমৃতো ভবতি*, আমার আর কিছু লাগবে না। এই তৃপ্তি একদিন দুদিনের জন্য হচ্ছে না, চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যার ভক্তি লাভ হয়ে গেছে তার আর কোন কিছুকে নিয়ে কোন অভিযোগ থাকে না, কোন চাহিদা থাকে না। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, নারদ ভক্তিসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমার আপনার কথা চলছে না, এখানে নারদের অবস্থা, শুকদেবের অবস্থা, ঠাকুরের অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের কথা পরে আসবে, প্রথমেই শ্রেষ্ঠ জিনিসটাকে সামনে রেখে দিচ্ছেন।

আমাদের জীবন চলে avoid and seek চাওয়া আর ছাড়া এই দুটোকে নিয়ে। যে জিনিসটা পছন্দ করি সেই জিনিসের দিকে আমরা দৌড়ে যাই, যে জিনিসকে পছন্দ করি না সেই জিনিস থেকে আমরা সরে আসি। যে জিনিসকে পেতে চাইছি সেটার পেছনের যে দৌড়াচ্ছি সেখানে একটা কার্য জড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি যে জিনিসকে চাইছি না সেখানেও একটা কর্ম জড়িয়ে আছে। যিনি ভক্ত তিনি দেখেন তিনিই সব কিছুকে চালনা করছেন, সেইজন্য ভক্তের দৌড়াদৌড়িটা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন কালে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু সব থেকে কাছের দৃষ্টান্ত হল, দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালীন একবার মথুর বাবুর ছেলে হৃদয়রামের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাকে চলে যেতে বলেন। হৃদয়রাম তখন ঠাকুরের সেবক, সবাই বলল তাহলে ওনাকেও চলে যেতে হবে। ঠাকুরও কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যেতেই দ্বারিকা বাবুর কাছে খবর গেছে, উনি বললেন এই আদেশ তো ওনার জন্য নয়। ঠাকুরকে গিয়ে বলা হতেই তিনি আবার গামছা কাঁধে যেখানে ভক্তদের সাথে কথা বলছেন সেখানে ফেরত এসে যেখানে কথা ছেড়ে ছিলেন সেখান থেকেই আবার কথা বলতে লাগলেন।

আমরা জাগতিক ভাবে এগুলোর খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে দিই যে একজন সিদ্ধ পুরুষ জগতে কিভাবে থাকেন, প্রাণপন চেষ্টা করলেও আমরা এভাবে থাকতে পারব না। তবে সবাইকে চেষ্টা করে যেতে হয়, চেষ্টা করাটা ছাড়তে নেই। দক্ষিণেশ্বরে বাস করাটাও মা কালীর সাথে থাকা আর গণিকাদের বাড়িতে থাকাটাও মা কালীর সাথে থাকা, দক্ষিণেশ্বরে থাকাটাও মায়ের ইচ্ছাতেই। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাওয়াটাও মায়ের ইচ্ছাতেই, এই ভাব নিয়ে চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু ঠাকুর সেই ভাবেই সব দেখেছেন। ঠাকুর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এসেছিলেন, সেইজন্য তাঁকেও অনেক কিছু বাছবিচার করতে হয়েছিল, পরে আমরা দেখব। ঠাকুরকে তো আমরা ভক্ত হিসাবে বলতে পারি না, ঠাকুর হলেন অবতার, স্বামীজী হলেন অবতার বা আচার্য, এনারা ধর্ম সংস্থাপন করছেন, এনাদের অনেক জিনিস থাকবে যেটা শাস্ত্রের সাথে মিলবে না। এখানে অবতার বা আচার্যের কথা বলছেন না, এগুলো হল সিদ্ধ ভক্তের কথা। অবতার আরও অনেক উপরের থাকের, তাঁদের ব্যবহার অনেক সময় মেলে না। গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলছেন তার সাথে ঠাকুরের অনেক কিছু

মিলবে না, কারণ ঠাকুর স্থিতপ্রজ্ঞ নন, ঠাকুর তারও উপরের, তিনি অবতার। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁকে এটাও করতে হবে ওটাও করতে হবে, বয়স্কের মতও থাকবেন আবার শিশুর মতও থাকবেন, তাঁকে অনেক কিছু নিয়ে চলতে হয়, এই জিনিসগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন আর যাঁরা বোঝেন তাঁদের পক্ষেও অপরকে বোঝান কঠিন। শাস্ত্রে যেখানে জ্ঞানীর কথা বলছেন, ভক্তের কথা বলছেন বা সিদ্ধ জ্ঞানী ও সিদ্ধ জ্ঞানীর কথা বলছেন, সেখানে কখনই স্বামীজীর বা ঠাকুরের অবস্থা বর্ণনা এনারা করতে পারেন না। যেমন ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কোথাও কোন শাস্ত্রের সাথে মিলবে না। শাস্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী বা সিদ্ধ ভক্তের যে যে গুণের কথা বলছেন তার একটাও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পাওয়া যাবে না, কারণ তিনি ত্রিগুণাতীত কিনা। একটি জিনিসের শুধু মিল পাওয়া যাবে, সেটা হল অনাসক্ত। সচ্চিদানন্দ মায়া থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, যেখানে একটু যে জড়িয়ে থাকার ব্যাপার থাকে সেখানেও একটা লোকশিক্ষার ব্যাপার কিছু থাকে।

ঠিক ঠিক সিদ্ধ ভক্ত হলেন তুলসীদাস ও সুরদাস। দুজনকে নিয়ে একটা প্রচলিত কাহিনী আছে। তুলসীদাস আর সুরদাস দুজনেই কাশীতে থাকতেন। সুরদাস তুলসীদাসের সাথে দেখা করতে এসেছেন। সেই সময় হঠাৎ রব উঠেছে যে পাগলা হাতী আসছে। তুলসীদাস বলছেন ভয়ের কিছু নেই শ্রীরাম রক্ষা করবেন। সুরদাস বলছেন, আমার ইষ্ট তো বালগোপাল, উনি আমায় কি রক্ষা করবেন আমাকেই ওনাকে রক্ষা করতে হয়। এই বলে সুরদাস পালিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে গেলেন। আর তুলসীদাস ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, হঠাৎ দেখেন কোথা থেকে একটা তীর এসে হাতির কপালে বিঁধে যেতে হাতিটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। কাহিনী সত্যি মিথ্যা যাই হোক, মূল ধারণাটা থেকে যাচ্ছে, রামের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। রামের ইচ্ছাকে নিয়ে ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প আছে, রামের ইচ্ছায় একজন ভক্ত দাওয়ায় শুয়ে আছে, রামের ইচ্ছায় ডাকাতরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মুটে বওয়াচ্ছে, রামের ইচ্ছায় তাকে পুলিশে ধরেছে, রামের ইচ্ছায় তাকে জেলে নিয়ে গেছে, রামের ইচ্ছায় পরের দিন জজ সাহবের সামনে হাজির করেছে, রামের ইচ্ছায় জজ সাহেব ছেড়ে দিলেন। সবটাই তার রামের ইচ্ছা, কোন জায়গাতে কারুর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। খুব সিদ্ধ ভক্ত না হলে এই ভাব হবে না। আমরা যদি রামের ইচ্ছা অনুশীলন করতে যাই আমরা অনেক বিপদে পরে যাব, ঐ *লব্ধা* যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ রামের ইচ্ছা অনুশীলন করা যাবে না। লব্ধা মানে ইষ্টকে যখন ভালোবাসছে তখন রামের ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। কিন্তু আগে রামের ইচ্ছা অনুশীলন করতে গেলে ইষ্ট কোন দিন আসবেন না। একটার সাথে আরেকটার সরাসরি consequence রয়েছে। রামের ইচ্ছা অনুশীলন করতে গেলে রামকে কোন দিন পাবে না, কিন্তু রামকে যদি পেয়ে যায় তখন রামের ইচ্ছা এমনিতেই এসে যাবে। এটাই বলছেন, *যল্লব্ধা*, যদি ভক্তি লাভ করা হয়, যদি ইষ্টকে লাভ করা হয় তখন *তৃপ্তো ভবতি*, তখন কোন কিছুতেই কোন অভিযোগ থাকবে না, কারণ সবটাই রামের ইচ্ছা।

তার সাথে কি হয়? *অমৃতো ভবতি*। আগেই বলা হয়েছিল অমৃতস্বরূপা, তিনি অমৃত স্বরূপ, যিনি অমৃতের সঙ্গে এক হয়ে যান তিনিও অমৃত হয়ে যান। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*, যিনি ব্রহ্মকে জেনে যান তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। ঠিক তেমনি যিনি ভক্তিতে ইষ্টের সাথে এক হয়ে যান, তিনি তখন আর ভক্ত থাকেন না, ভক্তি হল অমৃতস্বরূপা সেইজন্য তিনিও অমৃত হয়ে যান। অমৃত হয়ে যাওয়া দুটো অর্থে হয়, একটা অর্থে তিনি ধন্য হয়ে গেলেন, যেমন সন্ন্যাসীদের নামে বলা হয় *কুলং পবিত্রং জননীং কৃতার্থা*। যাঁরা ভক্তি করেন তাঁদের কুল পবিত্র হয়ে যায়, মা ধন্য হয়ে যান, আমার এক সন্তানকে দিয়ে দিলাম যে ঈশ্বরের ভক্তিতে এই রকম হয়ে গেল। তাঁর নিজের জীবন ধন্য হয়ে যায়, তাঁর কুল, তাঁর আশেপাশের মানুষরাও নিজেদের ধন্য মনে করে। অন্য দিকে অমৃতের আরেকটা অর্থ হয় বন্দনীয়। বন্দনীয় মানে তিনি পূজার যোগ্য হয়ে যান। যেমন তুলসীদাস একদিক থেকে তিনি নিজে যেমন ধন্য হয়েছেন আবার আমাদের দিক থেকে তিনি বন্দনীয় হয়ে গেছেন। যে কোন ভক্ত ভক্তির পরাকাষ্ঠায় চলে গেলে তিনি বন্দনীয় হয়ে যান, পূজার যোগ্য হয়ে যান। অমৃতত্বের সাথে এক হয়ে যান কিনা। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ*, একটা লক্ষ্যের দিকে যখন তীর ছোঁড়া হয় তখন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে দেওয়ার পর লক্ষ্য আর তীর যেমন এক হয়ে যায়, দুটো আলাদা বলে কিছু থাকে না। সেইজন্য ভক্তি যিনি লাভ করেন, অমৃতত্ব যিনি লাভ করেন তখন ভগবান আলাদা ভক্ত আলাদা বলে কিছু থাকে না, ঐ অমৃতত্বে তখন এক হয়ে যান, এক হয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের যেমন পূজা হয় তখন ভগবানের সাথে তাঁর ভক্তেরও পূজা হয়। সেদিক

থেকে দেখতে গেল যীশু ভক্ত তাই যীশুর পূজা হচ্ছে, ঠাকুর মা কালীর ভক্ত তাই মা কালীরও পূজা হচ্ছে সাথে সাথে ঠাকুরেরও পূজা হচ্ছে বা যত বিভিন্ন ধর্মে ধর্মগুরুরা হয়েছেন তাঁদেরও পূজা করা হয় কারণ ভক্তির শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে অমৃতত্ব লাভ করে ভগবানের সাথে এক হয়ে গেছেন। পরের সূত্রে আবার অন্য ভাবে বলছেন –

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি।।৫।।

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, যেটা পেলে তিনি আর কোন কিছু যাঞ্ছা করেন না, *ন শোচতি*, যেটা পেলে তিনি আর কোন কিছুর জন্য শোক করেন না, *ন দ্বেষ্টি*, কোন কিছুকে দ্বেষ করেন না, *ন রমতে*, কোন কিছুতে রমণ করেন না আর *নোৎসাহী ভবতি*, যেটা পেলে তিনি কোন কিছুতে আর উৎসাহ দেখান না। অর্থ খুবই সহজ, কিন্তু এর ভেতরে ঢুকলে এর গভীরতা টের পাওয়া যায়। আগের সূত্রেও *যৎ* আছে আর এই সূত্রেও *যৎ* বলছেন। আগের সূত্রে ছিল *যল্লব্ধা* আর এই সূত্রে বলছেন *যৎ প্রাপ্য*। লব্ধ মানে লাভ করে, প্রাপ্য মানে কোন কিছু পাওয়া। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের একই কথা মনে হবে, তবে এরমধ্যে তফাৎ নিশ্চয় আছে। বিশেষ করে ভাষ্যকাররা খুবই উচ্চমানের পণ্ডিত, তাঁরা একটা যে ফাঁক থাকে সেখানেও ফাঁকটা কেন রাখা হল, তার ব্যাখ্যা করেন। *প্রাপ্য* শব্দ দিয়ে দেখাচ্ছেন, ভগবানের উপর পুরোটাই নির্ভর করে না, এরমধ্যে নিজের চেষ্টাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তিতে নিজের চেষ্টার যে মাহাত্ম্য আছে প্রাপ্য শব্দ দিয়ে সেটা দেখাচ্ছেন। লব্ধা আর প্রাপ্যের তফাতটা কোথায়? এখানে চুলচেরা বিদ্যা দেখানো হচ্ছে না। অনেকগুলো ভক্তিশাস্ত্রকে নিয়ে ভক্তির ব্যাপারে যদি পড়া হয় তখন সেখানে অনেক ধরণের কথা বেরিয়ে আসবে, যেমন কোথাও বলছেন চেষ্টা করতে হবে, কোথাও বলছেন শরণাগতির ভাব। ঠাকুর নিজেও কোথাও পরিষ্কার করে বলছেন না ঠিক কি ভাব নিয়ে ভক্তিতে চলবে, ঠাকুর বলছেন কোন কোন ভক্তের বানরের ছার স্বভাব, বানরের ছানা মাকে নিজে ধরে রাখে। আবার বলছেন কোন কোন ভক্তের স্বভাব বেড়ালের ছার মত। কোনটা স্বভাবটা ঠিক? দুটোই দরকার।

রামকৃষ্ণ মিশনের একজন আমেরিকান সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ছয়জন ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপর স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। ওখানে তিনি স্বামী মাধবানন্দজী আর স্বামী নিখিলানন্দজীর মধ্যে ভক্তি নিয়ে একটা আলোচনার উপর আলোকপাত করেছেন। ঠাকুর দু রকম ভক্তের কথা বলছেন, বানরের ছা আর বেড়ালের ছা। ওখানে বলছেন, সাধক এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলতে থাকেন। তার মানে, কখন নিজের চেষ্টা চালাচ্ছেন কখন আবার তিনি কৃপা করেন। দুটোই ঠিক। বৃন্দাবনে রাধারমণ মন্দিরের বাইরে একজন সাধুবাবা সারাদিন কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন, আর সব সময় রাধে রাধে করে যাচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাঁর কোন চেষ্টা ছিল না, কে খেতে দিল না দিল কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজেকে সাধক রূপে ছেড়ে দিয়েছেন। সাধক রূপে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াটা খুব কঠিন। বেড়ালের ছা একটা অবস্থায় না গেলে হয় না। স্বামীজী ভাববার কথা বইতে এই জিনিসটাকে খুব ব্যঙ্গ করেছেন। ভোলাচাঁদ কোথা থেকে শুনেছে ভগবান তাঁর শরণাগতির উপর কৃপা করেন, সেও তাই শুনে চিৎকার করে বলছে, আজ থেকে আমি সব কিছু ভগবানের উপর ছেড়ে দিলাম, তিনি যদি আমাকে উদ্ধার না করেন তাহলে তাঁর মত অন্যায় আর কেউ করে না। অন্য দিকে তার নিজের যত রকম দুর্গুণ ছিল তার কোনটাই সে ছাড়ছে না। শরণাগতি মানে ঈশ্বর ছাড়া সে আর কিছু জানে না। আমাদের ক্ষেত্রে শরণাগতি হল, আমরা নিজের যতটুকু আছে সেটুকুকে বাঁচিয়ে রাখছি। ঠাকুরেরই গল্প আছে, পণ্ডিতমশাই গোয়ালিনীকে বলছেন, তাঁর নাম করলে ভবসাগর পার করে যায় আর তুমি নদী পার করতে পারবে না। পরের দিন গোয়ালিনী পণ্ডিতমশাইয়ের কথা স্মরণ করে ভগবানের নাম করতে করতে নদী পার করে চলে এসেছে। পণ্ডিতমশাই শোনার পর তিনিও নদী পার করতে যাচ্ছেন কিন্তু ধুতি যাতে ভিজে না যায় তাই ধুতিটা তুলছেন। এখানে কাহিনী যাই হোক, কিন্তু শরণাগতী ঠিক ঠিক কি রকম হয় সেটাকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। শরণাগতী হলে এই ধুতি তোলার ব্যাপারটা আর থাকে না। মুখে আমরা যত কথাই বলি না কেন, সাধকের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁকে অবশ্যই মর্কট স্বভাব হতে হবে। বানরের বাচ্চা যেমন নিজের মাকে আঁকড়ে ধরে রাখে, ঠিক সেই রকম যিনি ভক্ত তাঁকেও ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরতে হয়।

আঁকড়ে ধরে রাখার ফলে যা হবে সেটা আগে বলা হল, *যল্লব্ধা*, লাভ করে একটা জিনিস সে পাবে। কিন্তু *যৎ প্রাপ্য* যখন বলছেন তখন এখানে ভাষ্যকাররা প্রাপ্য জিনিসটাকে বলছেন জীবনমুক্তির অবস্থা।

জীবনমুক্তির অবস্থা মানে সে সিদ্ধ হয়ে গেছে। আগের সূত্রে অমৃতত্বের অমৃত ছিল যজ্ঞশেষ রূপে, যেটা তিনি পরিণতি রূপে পাচ্ছেন, এখানে প্রাপ্য রূপে মানে জীবনমুক্তির অবস্থা, ঈশ্বর ছাড়া সে আর কিছু জানে না। সেইজন্য প্রাপ্যকে বলছেন জীবনমুক্তির অবস্থা। জীবনমুক্তির অবস্থা মানেই হয় যিনি দেখেন জগৎ ঈশ্বরময়। জগৎ ঈশ্বরময় দেখা মানেই জীবনমুক্ত। তখন তার কাছে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এগুলোর কোন গুরুত্ব থাকে না আর জীবন ও মৃত্যু বলেও কিছু থাকে না। জীবনটাও দেখছেন ঈশ্বরের আর মৃত্যুটাও দেখছেন সেই ঈশ্বরের। এর আগে বললেন *সিদ্ধো ভবতি*, যার ব্যাখ্যাতে বলা হল তাঁর বাহ্য আর অন্তঃকরণ দুটোই সিদ্ধ হয়ে যায়, বেদান্তের ভাষায় তাঁর আমি ভাবটা চলে যায়। তাঁর কাঁচা আমিটা চলে যায়, পাকা আমি যাবে না, আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর সন্তান এই আমিটা থেকে যায়। কাঁচা আমি চলে যাওয়া মানে তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে যান, তার মানে সত্ত্বের আঁট, রজোগুণের আঁট আর তমোগুণের আঁট তিনটে আঁটই তাঁর চলে যায়। তমোগুণে মানুষের নিদ্রা, আলস্য এগুলো হয়, রজোগুণে আমাকে এটা করতে হবে আর সত্ত্বগুণে জ্ঞানের আনন্দে যে সুখ তাতে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে, এই জিনিসগুলোর পারে তিনি চলে যান, ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কিছু দেখেন না। তাঁর কাঁচা আমি চলে গিয়ে থেকে গেল পাকা আমি। ঈশ্বরের যে আমিত্ব, যদি ঈশ্বরের আমিত্ব বলা যায়, সেটার সাথে তিনি এক। ঈশ্বর হলেন ত্রিগুণাতীত, ঐ এক হয়ে যাওয়ার জন্য তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে যান। ত্রিগুণাতীতের আরেকটা অর্থ হয় তিনি ধর্ম আর অধর্মের পারে চলে যান, পাপ পূণ্যের পারে চলে যান।

ধর্ম অধর্মের পারে, পাপ পূণ্যের পারে চলে যাওয়া প্রথম প্রথম শুনলে কিছুই বোঝা যায় না কি বলতে চাইছেন। কিন্তু বেদান্তের শুরু এখান থেকেই। একটা কাহিনী বললে জিনিসটা খুব সহজে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মীরাবাঈকে একজন জিজ্ঞেস করছে, তুমি তো কৃষ্ণের সঙ্গেই রমণ কর? মীরাবাঈ বলছেন, হ্যাঁ তাই। আর সবাইকে কৃষ্ণ দেখ? মীরাবাঈ বলছে, হ্যাঁ, সবাইকে কৃষ্ণ দেখি। তাহলে আমার সাথে রমণ কর। হ্যাঁ, এখনই করছি। সে কি বলছ! এত লোকের সামনে কি কখন রমণ করা যায়? মীরাবাঈও খুব সুন্দর বলছেন, কেন সবাইতো কৃষ্ণ, এখানে কৃষ্ণ ছাড়া তো আর কেউ নেই, আমার তো কোন সমস্যা নেই। লোকটি শুরু করছে কোথা থেকে? তুমি যদি আমার সাথে রমণ কর সেটা অধর্ম আর এত লোকের সামনে রমণ করাটাও অধর্ম। লোকটি একদিকে অধর্ম করতে চাইছে অন্য দিকে ধর্মে অবস্থিত থাকতে চাইছে। অপরের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরাটা অধর্ম আর এত লোকের সামনে জড়িয়ে ধরা আরেকটা অধর্ম। লোকটি একটা জিনিস করতে চাইছে আরেকটা জিনিস করতে চাইছে না। মীরাবাঈয়ের কাছে ধর্মও নেই অধর্মও নেই, সে সবাইকেই কৃষ্ণ দেখছেন। এটাই ধর্ম অধর্মের পারের অর্থ। রাসলীলাতেও গোপীরা সবাইকে কৃষ্ণ দেখছেন। বিদেশীরা রাসলীলাকে নিয়ে, কৃষ্ণকে নিয়ে যে নিন্দা করে কারণ ওদের পক্ষে এই জিনিসটা বোঝা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিকতার শেষ অবস্থায় গোপীরা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু দেখছেন না, ভাগবতে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। অত গোপীদের মাঝখানে কৃষ্ণ একে জড়িয়ে ধরছেন, তাকে এই করছেন, এগুলো তাঁদের কাছে কোন ব্যাপার না, কারণ এখানে এনারা সবাই ধর্ম অধর্মের পারে। অধর্ম হবে অপরের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা আর সবার সামনে জড়িয়ে ধরা আরেকটা অধর্ম। প্রথম অধর্মটা আমি করব, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরব কিন্তু তারপরে আমি ধর্মে থাকব সবার সামনে জড়াব না। গোপীরা দুটোরই পারে। শাস্ত্র যেটা করতে বলছে সেটা হল ধর্ম আর যেটা করতে নিষেধ করছেন অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম করাটা অধর্ম। কিন্তু শাস্ত্র চলে মনের জগতে। আত্মা হলেন মনের এলাকার বাইরে, আত্মা মনের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে, সেখানে মনের আর কিছু থাকে না। মনের কোন এলাকা না থাকাতে সেখানে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমোও থাকে না। সত্ত্ব, রজো আর তমো না থাকার জন্য সেখানে শাস্ত্রও থাকেন না। শাস্ত্র থাকে না বলে ধর্ম অধর্ম থাকে না, পাপ পূণ্যও থাকে না। এই ধরণের কথা প্রথম শুনলে সবারই উদ্ভট মনে হওয়ারই কথা। একটা স্তরের পরে বুঝতে পারেন এটাই সত্য।

হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে এই জায়গাতে এসে একটা বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্ম মূলতঃ ধর্ম ও শাস্ত্রে বাঁধা হয়ে আছে। কোন খ্রীশ্চান বা মুসলমান বলবে না যে আমি বাইবেল বা কোরানকে অতিক্রম করে গেছি। অথচ আধ্যাত্মিক হওয়া মানেই বাইবেল বা কোরানের পারে যাওয়া। এদের যাঁরা মরমীয়া সাধক ছিলেন, এনারাও যে বাইবেলকে ধরে রাখছেন না তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরই বস্তু ঐ অতটুকু ধরে রাখছেন, বাকী পাপ পূণ্য ও ধর্ম অধর্মের দিকে তাকান না। এর আগে রাবেয়ার কথা বলা হয়েছিল, রাবেয়াকে বলছে, তুমি শয়তানের নিন্দা কর না কেন, পাপকে নিন্দা কর না কেন? রাবেয়া বলছেন, আল্লাতে আমার মন এমন ডুবে

আছে যে অন্য দিকে আমার মন যায় না। এটাই ধর্ম অধর্মের পারে চলে যাওয়া। জীবনমুক্ত পুরুষ ভালো কিছু করারও পারে, মন্দ কিছু করারও পারে। আবার কখন দেখা যায় তিনি ভালোটা করছেন মন্দটা করছেন না। দুর্ভাগ্যবশত এর উল্টোটাও হয়, মন্দটা করছেন আর ভালোটা করছেন না সেটাও দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহাভারতের যুদ্ধে কত রকমের চালাকি করছেন, কত রকমের মিথ্যা কথা বলছেন। সাধারণ লোকেরা এই জায়গাতে এসেই ভুল ধারণ করে নানা রকম উদ্ভট মন্তব্য করে, কারণ তাদের পক্ষে এগুলো বোঝা সম্ভব নয়। ধর্মের কথা সেইজন্য এনারা বাইরের সবাইকে বলতেন না, সবার এসব কথা শোনার পাত্রতাই নেই। কিন্তু লেখা হয়ে যাওয়ার পর সেটা সবার জন্যই হয়ে যায়, সেইজন্য প্রত্যেকটা শব্দকে বেছে বেছে লিখতেন যাতে একটা শব্দের কেউ অপব্যাখ্যা না করে দিতে পারে। বলছেন যিনি জীবনমুক্ত তিনি ত্রিগুণাতীত, তাঁর উপর এই জগতের নিয়ম খাটবে না। শ্রীরামচন্দ্র বালীকে আড়াল থেকে বধ করলেন, নিন্দুকরা বলবে, তার মানে তুমি বলতে চাইছ যার হাতে ক্ষমতা সে যা বলবে তাই হবে? সে তার দিক দিয়ে ঠিকই বলছে, সেইজন্য ঐ ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, তখন অন্য ভাবে রাখতে হবে যাতে এর অপব্যাখ্যা না হয়ে যায়। এনারা যে সূত্রগুলো রচনা করছেন তখন একটা সূত্রে এক রকম বলছেন, এরপর যাতে কেউ অপব্যাখ্যা না করে সেইজন্য আরেকটা সূত্রে একটু অন্য রকম বলছেন। এর আগের সূত্রে বলছেন তাঁর কৃপাতেই হয়, এখন এটাকে আটকে দিয়ে বলছেন, *যৎ প্রাপ্য*, পেতে তোমাকে হবে। চেষ্টা যদি ছেড়ে দাও তোমার পাওয়া হবে না। চেষ্টা করে কি হবে? অমরত্ব লাভ হবে। এর আগের সূত্রে অমরত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন এখানেও সেটাকে মেনেই চলছেন। কিন্তু এখানে *অমৃতো ভবতি* এটাকে আরও বিস্তার করে বলছেন, *অমৃতো ভবতি* এর একটা অর্থ ধন্য হয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় বন্দনীয় হয়ে যান। এই দুটোর পারে আরেকটা হয়ে যান তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে যান।

ত্রিগুণাতীত হয়ে ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্যের পারে চলে যাওয়ার জন্য কয়েকটা জিনিস এসে যায়। শুধু যে তিনি ধর্মাধর্মের পারে চলে যান তা না, তিনি জাগতিক ব্যাপারের পারেও চলে যান। আমাদের ভাষায় বললে তখন এভাবে বলা যেতে পারে, যিনি শাস্ত্রেরই পারে চলে যান তিনি জগতকে আর কত গুরুত্ব দেবেন! প্রথমটায় বলছেন, *যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্*, একটুও না, সামান্যতম যে থাকবে তাও না। এর আগে ভক্তির আমিত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল, ভক্তের আমিত্ব যেটুকু থেকে যায় সেটা হল তাঁর লীলা আস্বাদ করার জন্যই। ওটা কাঁচা আমির আমিত্ব নয়। ঠাকুর এই আমির উপমা দিচ্ছেন পোড়া দড়ি, দড়িটা পুড়ে গেছে কিন্তু তার আকারটা থেকে গেছে, ঐ আকার দিয়ে আর দড়ির কাজ হবে না, ঐ দড়ি দিয়ে আর কিছুকে বাঁধা যাবে না। কিন্তু আমি বোধ যেভাবে আমাদের পাপ-পূণ্যের জীবন চালায় পাকা আমি ঐভাবে আর চালায় না।

এত কিছু সত্ত্বেও দেখা যায় ভক্ত তিনটে উদ্দেশ্যে আমিত্বকে রেখে দেন। ভক্ত অনেক সময় মানুষের সেবা করার জন্য আমিত্ব রাখেন, এর খুব বড় দৃষ্টান্ত হলেন প্রহ্লাদ, তিনি বলছেন এই জগৎ মুর্খে ভর্তি, সবাই জাগতিক জিনিস নিয়ে পড়ে আছে, এদের ঈশ্বররাভিমুখী করার জন্য আমি আমার আমিত্ব রেখে দিয়েছি। এই আমিত্ব কিন্তু ভক্তের আমি, এই আমিতে কোন স্বার্থপরতা থাকে না। আমরা এটাকে বলতে পারি মানবজাতির প্রতি করুণার ভাব। বিবাহের আগে মেয়েদের আমি বোধ প্রবল থাকে, বিয়ের পর সেই আমিত্বের মধ্যে তার স্বামীও ঢুকে যায় আর সন্তান হলে সন্তানও তার আমিত্বের মধ্যে ঢুকে যায়, সন্তানকে তার পর বলে কখনই মনে হয় না। ঠাকুরমা হয়ে যাওয়ার পর তার আমিত্বটা আরও বিস্তার পেয়ে যায়। গ্রামের যে ঠাকুরমা সে আবার পুরো গ্রামেরই ঠাকুরমা হয়ে যায়।

জগতে দুটি শক্তি আছে যে শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, একটা হল inclusiveness আর আরেকটি হল exclusiveness। Exclusiveness মানে হল আমি ও আমার, inclusiveness মানুষকে বৃহতের দিকে নিয়ে যায়, সমস্ত জগতকে নিজের ভেতরে নিয়ে নেয়। যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তখন তিনি inclusivenessএর চরম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখছেন ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হচ্ছে না, ভগবান ছাড়া কিছু নেই। যদিও বাইবেলে এভাবে নেই, কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বুঝি। দক্ষিণেশ্বরে একটা বাচ্চা ছেলে ফড়িংএর পেছনে একটা কাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছে, দেখে ঠাকুর বলছেন, দেখ দেখ নারায়ণ নারায়ণের কি দুরবস্থাই না করেছে। এই যে inclusiveness, যার জন্য যীশু সমগ্র মানবজাতিকে নিজের ভেতরে নিয়ে নিয়েছেন, যাঁরা তঁকে ক্রুশিফাই করছে ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন, প্রভু এরা জানে না এরা কি করছে, এদের তুমি ক্ষমা কর। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক না হয়, বা যতক্ষণ না

দেখছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু আছে সব নাম আর রূপের খেলা বা যতক্ষণ না দেখছেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু হচ্ছে তিনিই সব করছেন, মানুষ, গাছপাল, পশুপাখি সব কিছু ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত inclusiveness হবে না, inclusivenessএর মানে হয় universality, সব কিছুর সাথে তিনি এক। আর exclusivenessএ শুধু আমি, যেমন পাথর। একটা মুরগীর ডিম হল exclusiveness existnence, ডিম ছাড়া কিছু নেই। ঐ ডিম ফুটে যখন একটা মুরগীর ছানা বেরিয়ে এল তখন সে নিজেকে আরও চারটে জিনিসের সাথে জড়িয়ে নিচ্ছে, এবার সে exclusiveness থেকে ধীরে ধীরে inclusiveness এর দিকে এগোতে থাকে। আমাদের জীবন হল একটা যেন সেতু, যে সেতু মানুষকে exclusiveness থেকে inclusiveness এর দিকে নিয়ে যায়। ঠাকুরের কথা কাঁচা আমি থেকে পাকা আমির দিকে নিয়ে যায়। ভক্তির যে শেষ কথা তা হল inclusivenessএর শেষ অবস্থা। আমরা যদি কল্পনা করে নিই, একটা মুরগীর ডিম আছে, ডিম থেকে মুরগীর ছানা, সেখান থেকে মুরগী সেখান থেকে বিস্তার হতে হতে যীশু হলেন শেষ পয়েন্ট। ডিম থেকে যীশু পর্যন্ত যদি একটা লম্বা লাইন টানা হয়, তাহলে দেখা যাবে আমরা সবাই এই লাইনের কোন না কোন পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি। বোঝার সুবিধার জন্য এখানে যীশু একটা নাম শুধু নেওয়া হল, কারণ উপনিষদে বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, এটাই extreme of inclusiveness। স্বামীজী বেদান্তের যে ভাব, তার উপর যে লেকচার সবই extreme of inclusiveness। Extreme of exclusiveness হল ডিম বা পাথর, কারণ ঐ ছাড়া বাইরের জগত বলে তার কাছে কিছু নেই, ওর মধ্যেই সে সীমিত হয়ে আছে। জীবনের এটাই শেষ, সীমিত থেকে অসীম হয়ে যাওয়া, ভক্তি হল অসীমের পরাকাষ্ঠা। কঠোপনিষদেও তাই বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*। Inclusiveness এর শেষ অবস্থা হয় ভক্তি, সে দুই বলে আর কিছু দেখছে না। যিনিই inclusiveness তিনিই জীবনমৃত্যুর পারে চলে যান, ভালোমন্দের পারে, ধর্মাধর্মের পারে চলে যান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ক্ষীণ আমির রেখা থেকে যায়, মেঝেতে জলের দাগের মত। জলের দাগের কোন দাম নেই, কিন্তু তা হলেও এপার ওপার আলাদা হয়ে যায়। ভক্তির যে আমি এই আমিটা যেন জলের দাগ, কিন্তু এই দাগের কোন দাম নেই, দাগ থাকাও যা না থাকাও তাই। সেইজন্য রন্তিদেব যখন প্রার্থনা করছেন মানুষের সেবা করব, প্রহ্লাদ বলছেন মুর্খদের জন্য কিছু করব বা নারদ বলছেন ভগবানের নামগান করে বেড়াবেন, ঠাকুরও ভক্তির আমি, বিদ্যার আমির কথা বলছেন, তখন তাঁরা মানব কল্যাণের জন্য এই আমিত্বটুকু রাখেন। একদিকে তিনি inclusive, সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে চাইছেন, অন্য দিকে জানেন এরাও সেই ভগবান। রাজা মহারাজের ঘটনা, এক শিষ্য মহারাজকে বলছেন, আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না। মহারাজ বলছেন, কি করে বলি! যখন উপদেশ দিতে ইচ্ছে করে তখন দেখি তোরা সেই নারায়ণ। এখন নারদ বা শুকদেব যদি দেখেন সবাই নারায়ণ তখন তিনি কাকে উপদেশ দিতে যাবেন! সেইজন্য অবতারের কাজ, আচার্যের কাজ খুব কঠিন। কারণ একদিকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন সবাই নারায়ণ, আর এটাও তিনি জানেন এখনও ওরা যে নারায়ণ সেটা এরা জানতে পারছে না। খুব কঠিন পরিস্থিতি, অবতার বা আচার্যর এই কঠিন পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। মা কালী ঠাকুরকে ভাবমুখে থাকতে বলছেন, এটাই ভাবমুখ। একদিকে জানেন সত্য এটা, আরেক দিকে জানছেন বাস্তবে এই সত্য কাজ করছে না। এই কঠিন পরিস্থিতিকে যিনি বুঝবেন তখন তিনি বুঝতে পারবেন অবতার তত্ত্ব কি। তখন বুঝবেন ভাবমুখ জিনিসটা কি আর তখন বুঝবেন স্বামীজী বা অন্যান্য প্রফেটরা যে লোকশিক্ষার কাজ করেন এই কাজ করাটা কত কঠিন। জমিতে পড়ে থাকাটা কঠিন নয়, জমি থেকে উড়ে যাওয়াটাও কঠিন নয়, কিন্তু জমি থেকে উড়ে একটা জায়গায় স্থির থাকা অসম্ভব। অবতার ঠিক তাই করেন। উড়োজাহাজ সাঁ করে উড়ে যেতে পারবে, পাখিও ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে পারবে কিন্তু এদের উড়ে গিয়ে একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে বলুন, এরা পারবে না। সাঁতার কেউ কাটতে পারে আবার কেউ নাও পারে কিন্তু হাত পা না নেড়ে নদী বা পুকুরের জলে একটা জায়গায় স্থিরে হয়ে ভেসে থাকাটা কেউ পারবে না। অবতাররা ঠিক এটাই খুব সচ্ছন্দে করতে পারেন।

উচ্চমানের ভক্তির, পরা ভক্তি বা শ্রেষ্ঠতম ভক্তির যত প্রকার দিক হতে পারে সব দিক থেকে এখানে সব কিছুর আলোচনা করছেন। একটা ধারাবাহিক ভাবেই বলে যাচ্ছেন কিন্তু তাও কোথাও কোথাও মনে হবে যেন অনেক কিছুই মিলছে না, কিন্তু সবটাই মেলে। বাচ্চারা সাধারণত পড়তে চায় না, এরপর তাকে যদি বলা

হয়, কিছু করার নেই তোমাকে আরও পনের বছর পড়তে হবে, তাহলে তো আরও সে পড়া ছেড়ে দেবে। কিন্তু যদি বলা হয় পড়াশোনা করলে তুমি বড় হয়ে একজন ডাক্তার হবে, তোমার অনেক গাড়ি হবে ইত্যাদি, সবাই হয়ত সেই রকম নাও হতে পারে। কিন্তু জীবনে যারা সাফল্য পায়, তাদের যে পরিণতি হয় সেই শেষ কথাটাই সবাইকে বলা হয়। এখানেও তাই করা হচ্ছে, ভক্তির যে পরম অবস্থা সেটাকে প্রথমে বর্ণনা করে দিচ্ছেন। আমি ঐ উচ্চতম অবস্থায় যেতে পারি। ঐ অবস্থার সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবন মেলে না। আমরা যে জিনিসগুলিতে অভ্যস্ত, যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আনন্দ পাই, যেগুলোকে ধারণা করতে পারি সেগুলোর সাথে মেলে না। সেইজন্য আচার্যরা অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেন, যার ফলে অনেক সময় মনে হয় এই কথার সাথে আগের কথা মিলছে না। কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে কোথাও কোন অমিল নেই।

ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতির পর আসছে *ন শোচতি*, এখানে *শোচতি*র অর্থ শোক করা। ভক্তি যাঁরা লাভ করেন তাঁদের আর কোন ধরণের শোক হয় না। এখানে দুটো কথা বোঝার আছে, প্রথম কথা হল শোক তমোগুণ থেকে হয়, শোক মানেই তমোগুণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ থাকে রজোগুণে নয়তো তমোগুণে। গীতায় বলছেন সুখ হল সত্ত্বগুণের লক্ষণ, আনন্দ ও সুখ সব সময় সত্ত্বগুণের বা ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ। যাঁদের জ্ঞান লাভ হয়েছে, ভক্তি লাভ হয়েছে তাঁরাই আনন্দ পান। কিন্তু সাধারণ চলিত ভাষাতেও বলা হয়, যাঁরা সত্ত্বগুণী তাঁরা সব সময় আনন্দে বা হাসিমুখে থাকেন। আর বাকীরা সবাই রজোগুণের আনন্দ পায়, রজোগুণের আনন্দ মানে ইন্দ্রিয়জনিত আনন্দ, ভালো খাওয়া-দাওয়া হলে আনন্দ, আর যাকে সে পছন্দ করে না তার যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তাতে তার আরও বেশি আনন্দ হয়। নিজের উপলব্ধিতে আনন্দটা কম হয় কিন্তু অপরকে মারতে পারলে আনন্দটা অনেক গুণ বেশি হয় কারণ দুজনকে জড়িয়ে হচ্ছে কিনা। তমোগুণেও আনন্দ হয়, নিদ্রা জিনিসটা তমোগুণের কিন্তু গভীর নিদ্রা বা ভালো ঘুম হওয়াটা আবার সত্ত্বগুণের লক্ষণে চলে যাবে। আসলে তিনটে গুণকে কাঁটায় কাঁটায় ভাগ করা যায় না, যেটা বেশি থাকে সেটারই নাম নেওয়া হয়। যে কোন ইন্দ্রিয়জনিত সুখ মানেই দুঃখ, চোখ কান বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় যে কোন ইন্দ্রিয়ের সুখই দুঃখের জননী, দুঃখ মানেই তমস। টাকা পেলে সবাই সুখী হয়, টাকা আয় করতে গিয়ে দুঃখ, কত কষ্ট করে মানুষ দুটো টাকা আয় করে। টাকা এসে গেলে আবার ভয় হবে, ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে, বাড়ির লোক থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনরা এসে টাকার জন্য হাত পাতবে, তারপর খরচ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। আগেকার দিনে আরও নানা রকমের ভয় ছিল, আগুন লেগে যেতে পারে, চোর-ডাকাতরা নিয়ে যেতে পারে, এখন ব্যাঙ্ক হওয়াতে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। আর যখন টাকা হাত থেকে বেরিয়ে যায় তখনও দুঃখ। বিয়েবাড়িতে ভোজ খেয়ে খুব আনন্দ, খাওয়ার পর এমন পেটের গণ্ডগোল যে ডাক্তার হাসপাতাল করতে হল। সত্যিই কি কোন সুখ নেই যে সুখটা থাকবে? ঠাকুর একবার শ্রীশ্রীমাকে শুনিয়ে বলছেন, বাচ্চা নিয়ে কি হবে, এই হল আর তারপরেই মরে গেল। শ্রীমা শুনে বলছেন, সবই কি মরে যাবে! ঠাকুর বলছেন, দ্যাখ দ্যাখ সাপের লেজে পা পড়েছে। শ্রীমা খুব সরল মনে একটা কথা বলেছেন, তাঁর গর্ভধারিনীকে নিয়ে বলছেন কিনা একটু তো কষ্ট লাগবেই।

সংসারীদের কিছু করার নেই, ঐ ক্ষণিকের একটু যে আনন্দ হয় ওটার জন্যই জীবনকে চালাতে পারছে। মানুষ যে বিয়েথা করে, কিছু দিনের আনন্দ ঠিকই পায়, কিন্তু সারাটা জীবন তার জন্য উভয় পক্ষকেই গোলামী করতে হচ্ছে। প্রথম থেকেই হয়ত অশান্তি লেগে আছে কিন্তু আশা একদিন অশান্তি মিটে গিয়ে আনন্দ হবে, বাপ-মার আশা মেয়ের বিয়ে দিলে আমার দায়ীত্ব নেমে যাবে আর মেয়েটাও শান্তি পাবে। কিন্তু কিছুতেই সংসারীদের শান্তি, সুখ, আনন্দ হয় না। এটাকে বলছেন শোক, শোক খুব কঠিন শব্দ, কিন্তু শোক শব্দের মধ্যে আমাদের দুঃখ জিনিসটাকে ধরে নিতে হবে। যে কোন ধরণের দুঃখ শোকেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু যাঁরা ভক্তি লাভ করেন, যাঁরা ভক্ত তাঁদের শোক হয় না। আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এখানে আমাদের মত সাধারণ ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে পরা ভক্তির কথা বলছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ঠাকুরের অবস্থা, মীরাবাঈর যে অবস্থা, ভক্তির সেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা ভাবি ওনাদের যেহেতু কোন কষ্ট হয় না, সেইহেতু আশা করি আমাদেরও কোন কষ্ট হবে না। ভক্তরা প্রায়ই এসে মহারাজদের বলেন, মহারাজ খুব কষ্টে আছি, মহারাজরা বলে দেন, ঠাকুরকে ধরে রাখুন। সেখান থেকে আমরা ভাবছি *ন শোচতি* আমাদের জন্যই বলছেন। কিন্তু এখানে পরা ভক্তির কথা চলছে। পরা ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া মানে ত্রিগুণাতীত হয়ে যাওয়া। তিনি সত্ত্ব, রজো ও তমোর পারে চলে

যান, তাঁকে তখন সত্ত্বও বাঁধতে পারবে না, রজো আর তমোও বাঁধবে না। অনেক সময় তাঁকেও লোকাচারের জন্য কিছু কিছু জিনিস করতে হয় কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে বাঁধে না। কথামৃতে এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, বাচ্চা ছেলের মধ্যে কোন গুণের আঁট নেই, সত্ত্ব, রজো, তমো কোন গুণের আঁট নেই।

সত্ত্বগুণের আঁটের কথা বলতে গিয়ে আবার বলছেন, বাচ্চাদের বন্ধুদের সাথে কত বন্ধুত্ব কিন্তু যেমনি ঐ জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় চলে গেল সেখানে যেতেই সব খসে পড়ে গেল। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এগুলো সত্ত্বগুণের আঁট, যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নেই তারা ভালোবাসতে পারে না। আগেকার দিনে মেয়েদের বাচ্চা বয়স থেকেই বাড়িতে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে ওদের সত্ত্বগুণটা বাড়ে। ফলে একজন অজানা, অচেনা লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সময় তাকে পছন্দের হোক বা অপছন্দের হোক এই ব্যাপারটা তার মাথাতেও আসে না, কিন্তু তার জীবনের সাথে জুড়ে দেওয়া হল, এরপর এই আমার জীবন। এটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, সাধারণ জীবনেও সত্ত্বগুণ যদি না থাকে সে কখনই কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। তমোগুণ রজোগুণ থেকে যে ভালোবাসা আসে সেই ভালোবাসাতে দৈহিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। ভারতে যে এত রকম সমস্যা, বিয়ের দুদিন পরে ডিভোর্স, চারদিকে মারামারি, শীলহানি, সব কিছুর মূলে একটাই, সত্ত্বগুণের অভাব। সত্ত্বগুণ না হলে ভালোবাসতেই পারবে না, ভালোবাসা মানেই সত্ত্বগুণ। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে গেলেও সত্ত্বগুণ লাগে, মানুষকে ভালোবাসতে গেলেও সত্ত্বগুণ লাগে। বাচ্চাদের বন্ধুদের মধ্যে এক অপরের প্রতি যে ভালোবাসা, এটা সত্ত্বগুণে হয়। ঠাকুরও বলছেন, এই ভালোবাসা সত্ত্বগুণে হয়। কিন্তু সেটাতেও সে বন্ধনে নেই, বেরিয়ে চলে গেল সাথে সাথে সব কিছু খসে পড়ে গেল। বাচ্চাদের যেহেতু আত্মজ্ঞান থাকে না সেইজন্য ওদের আমরা ত্রিগুণাতীত বলতে পারি না। ত্রিগুণাতীত জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য ঠাকুর বাচ্চাদের কথা বলছেন। যার জন্য দেখা যায় বাচ্চারা বেশিক্ষণ শোকে থাকে না। মার খেলে, বকুনি খেলে একটু কান্নাকাটি করে আবার সে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে যাবে, হাসিটা ওদের বন্ধ হয় না। বেদান্তে শোক জিনিসটার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, গীতার ভাষ্যে আচার্য বলছেন শোক আর মোহ এটাই সংসার। বেদান্তে জ্ঞান মানে শোক মোহের পারে চলে যাওয়া। মুণ্ডকোপনিষদে এটাই বলছেন, *তরতি শোকম্*, শোকের পারে চলে যায়।

শোক এত শক্তিশালী ইমোশান যে একজন মুর্খকেও সে শিক্ষা দিয়ে দেয়। খোজা নাসিরুদ্দিনের একটা গল্প আছে, খোজা নাসিরুদ্দিন তার ছেলেকে বলছে, যাও কুয়ো থেকে জল নিয়ে এসো, আর এই ঘটিটা কুয়োতে ডুবিয়ে দিও না। বলেই ছেলেকে এক চড় মেরেছে। নাসিরুদ্দিনের বন্ধু দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখেছে, সে বলছে, ওকে তো জল আনতে পাঠালে, আর সেও জল আনতে যাচ্ছে, ওকে তুমি মারলে কেন? বলছেন, ঘটি যদি কুয়োতে ফেলেই দেয় তাহলে ওকে মেরে আমার লাভটা কি হবে, আগে মেরে দিলে মনে রাখবে। এগুলো হাসির গল্প কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বাচ্চাদের ধমক বা মারার জন্য ইমোশান যেভাবে জড়িয়ে যায় তাতে তার মেমরিটা খুব ভালো কাজ করে। শোকের মত ইমোশান আর কোন ইমোশান হয় না। এখানে ব্যাথা বা কষ্টকে নেওয়া যাবে না, ঠাকুর যেমন মজা করে বলছেন, মেয়েদের প্রসব বেদনা হলে বলে আর স্বামীর কাছে যাব না, ওটা শোক না, ওখানে অন্য একটা জিনিস হচ্ছে। ঠাকুর যখন মাকে নিয়ে মজা করে বলছিলেন তখন উনি শোকের কথাই বলছিলেন। সন্তান মারা যাওয়ার জন্য যে শোক হয়, বারবার যদি মারা যায় আর শোক হতে থাকে তাহলে সন্তান নিয়ে লাভ কি! আবার কিছু জিনিস আছে যেটা মানুষ পেতে চায়, সেটা পেতে গিয়ে মার খায় আবার শোক হয়। সেইজন্য উপনিষদাদিতে জ্ঞানের দিক থেকে শোক জিনিসটার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান হলে মানুষ শোকের পারে চলে যায়। এখানে একই সূত্রে অনেকগুলো কথার মধ্যে শোকের কথাও বলছেন। কারণ ভক্তি মানেই ত্রিগুণাতীত। আমরা যেমন যেমন এগোতে থাকবে তেমন তেমন জ্ঞান আর ভক্তির আলোচনাও পাশাপাশি চলতে থাকবে। যিনি জ্ঞানী তিনি যেমন শোকের পারে চলে যান, ভক্ত, যিনি পরা ভক্তিতে চলে গেছেন তিনিও শোকের পারে চলে যান। স্বামীজীর দুটো কথা আছে, একটা বলছেন, ধর্ম মানুষকে আর যাই করুক তাকে গোমড়া মুখ দেয় না, তোমার মুখ যদি গোমড়া থাকে তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাক, জগতকে তোমার গোমড়া মুখ দেখিও না। আরও মজার বলছেন, একজন স্বামীজীকে বলছেন, আপনি সব সময় এত হাসেন কেন, আপনি কি একটু গম্ভীর হতে পারেনা না? স্বামীজীও বলছেন, হ্যাঁ, পেটে বেদনা হলে গম্ভীর হয়ে যাই। কারণ যিনি জ্ঞানী, যিনি ভক্ত তাঁর কখন শোক হয় না। ব্যাকুলতা হবে, আমার এখনও ঈশ্বর দর্শন হল না, জ্ঞান লাভ হল না ইত্যদির জন্য ব্যাকুলতা হবে, কিন্তু শোক কখনই হবে না,

শোক তমোগুণের লক্ষণ। আর ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হল খুব উচ্চমানের সত্ত্বগুণের লক্ষণ, দুটোর মধ্যে বিরাট তফাৎ। যাঁরা ঈশ্বরের পথে যান তাঁদের টেনশান, স্ট্রেস, উদ্বিগ্নতা এই জিনিসগুলো হয় না। এগুলো সবই তমোগুণের লক্ষণ। যাঁরা জ্ঞান বা ভক্তির দিকে যান তাঁদের মধ্যে কখন হতাশার ভাব, মানসিক উদ্বিগ্নতা, টেনশান, বিমর্ষতা এই জিনিসগুলো হবে না। যদি এগুলো হয় তাহলে বুঝতে হবে এখনও সে জ্ঞান বা ভক্তি পথে পা দেয়নি। সেইজন্য এদের বলা হয়, যাও একটু সাধুসঙ্গ কর, একটু শাস্ত্রকথা শুনে এসো। কারণ সাধুসঙ্গে, শাস্ত্রকথা শুনলে, জপধ্যান করলে সত্ত্বগুণ বাড়তে থাকে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে তমোগুণ চাপা পড়ে যায়।

ন শোচিত, এর একটা দিক হল জ্ঞান ও ভক্তির দিক থেকে আর দ্বিতীয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে যে শব্দটা এসেছিল *ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি*, ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকে না। কোন ইচ্ছাই যদি না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যে শোকের সম্ভবনা সেটাও নাশ হয়ে যায়। তৎকালীন যে শোক চলে গেল সেটাতো চলে গেলই, ভবিষ্যতেও তার শোক হবে না। তার সাথে বলছেন *ন দ্বেষ্টি*, কারুর প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি তাঁর আর দ্বেষ থাকে না। আমরা যখন কোন কিছু চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না, অন্য দিকে অপরে পেয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দ্বেষ হয়, বাংলায় এটাই হিংসা বলে, সংস্কৃতে শব্দগুলো আলাদা। যার প্রতি আমার দ্বেষ সে হয়ত জানেও না যে আমিও ওটা চাইছিলাম কিন্তু পাইনি। তার তো কোন দোষ নেই, কিন্তু মাঝখান থেকে সে আমার দ্বেষের কারণ হয়ে গেল। এখানে অনেকগুলো factors থাকে, যার মধ্যে একটা হল, তার মনে কোন কামনা থাকে না, দ্বিতীয় তিনি সত্যিই দেখেন সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি দেখেন সব ঈশ্বরই দেন, আমার যা দরকার তিনি দিচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন তাঁর হাতের আটকেল আছে, মাপ আছে, যাকে যা দেওয়ার দিয়ে যাচ্ছেন। যিনি ভক্তি লাভ করেছেন তিনি দেখেন সবটাই তিনি করছেন সেইজন্য কি নিয়ে দ্বেষ করবেন! যার প্রতি দ্বেষ করবে সে নিজের শক্তিতে, নিজের ক্ষমতাতে, নিজের চাহিদানুযায়ী যদি ওটা করে থাকে তবেই না তার প্রতি দ্বেষ আসবে, কিন্তু তিনি জানেন ঈশ্বরই দিচ্ছেন।

এর আগে exclusiveness আর inclusiveness এই দুটো আইডিয়াকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। যাঁরা উচ্চমানের জ্ঞানী বা ভক্ত তাঁরা inclusive হয়ে যান, জগতের সবাইকে তিনি নিজের মধ্যেই দেখেন। আপনার বাবাও যা আমার বাবাও তাই, এর বাবাও যা ওর বাবাও তাই। নরেন্দ্রপুরে একজন মহারাজ ছিলেন, প্রায় নব্বুই বছরের হয়ে গিয়েছিলেন। বয়স হয়ে যাওয়ায় বেশি কিছু করতেন না আর কোথাও যেতেন না, বেশির ভাগ সময় ঘরেই থাকতেন, জপধ্যান ছাড়া আর কিছু করতেন না। কারুর সাথে কথাবার্তাও বেশি করতেন না। কিন্তু আগে খুব পরিশ্রমী আর কর্মঠ ছিলেন। মহারাজের মনটাকে একটু অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওনাকে ধরে একটা টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে দেওয়া হত। টেলিভিশনের সামনে বসে উনি দেখছেন, সেদিন আবার মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হচ্ছিল। ওখানকার সব ছেলেরা বলছে, মহারাজ আমরা সবাই কিন্তু মোহনবাগানের সাপোর্টার। খুব ভালো খুব ভালো। ঐদিক থেকে ইস্টবেঙ্গল গোল দিয়ে দিয়েছে, উনি খুব করে হাততালি দিচ্ছেন। ছেলেগুলো বলছে, মহারাজ আপনি হাততালি দিচ্ছেন কেন, এতো আমাদের দিকে গোল হয়ে গেল। উনি খুব অবাক হয়ে বলছেন, তাতে হলটা কি! গোলটা তো হয়েছে। ছেলেরা ছাড়বে না, এই গোলে হাততালি দেবেন না, মোহনবাগান যখন গোল দেবে তখন হাততালি দেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার ইস্টবেঙ্গল আরেকটা গোল দিয়েছে, আবার উনি হাততালি দিয়েছেন। ওনার কাছে টিম জিনিসটাই চলে গেছে, ঠাকুর ছাড়া কিছু দেখছেন না। স্বামীজীকে গুরুভাইরা যখন লিখছেন, আপনি আমেরিকা থেকে চলে আসুন। স্বামীজী তখন খুব বিরক্ত হয়ে লিখছেন, আমি কি শুধু ভারতবর্ষের, আমি সমস্ত বিশ্বের। ঐ অবস্থায় তাঁর আর কোন দ্বেষ হবে না, খুবই উচ্চ অবস্থা কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা পারি না বলে আদর্শকে নীচে করে দেব তা যেন না হয়।

ন দ্বেষ্টি বলার পর বলছেন *ন রমতে*। রমণ শব্দ থেকে *রমতে*, আনন্দ পাওয়া। এর আগে বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের কথা বলা হয়েছিল। যাঁরা পরা ভক্তিতে চলে যান তাঁরা ব্রহ্মানন্দের সাথে এক হয়ে যান। চাইলেও আর কোন জাগতিক জিনিসে নিজেকে তাঁরা নামিয়ে আনতে পারবেন না। এখানে রমতে শব্দটা জাগতিক ব্যাপারে, সাংসারিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঠাকুর মথুরবাবুদের সাথে বারাণসী গেছেন, মথুরবাবুরা সেখানে বিষয়-আশয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। ঠাকুর কাঁদছেন, মা কোথায় নিয়ে এলি, দক্ষিণেশ্বরে বেশ তো ছিলুম। যদি কথা শুনলে তাঁর কষ্ট হয়, অন্য কিছু হলে কী হবে! ভারত পাকিস্থান ক্রিকেট ম্যাচের

কথা শুনলে যদি ঠাকুরের কষ্ট হয় তাহলে ধরে বেঁধে যদি ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন কী অবস্থা হবে ঠাকুরের? এটাই বলছেন, তিনি *ন রমতে*। জিনিসটা কি জানার জন্য একটা কৌতুহল থাকতে পারে, কিন্তু রমণ করা যেটাতে হয়, বিষয়ানন্দে গিয়ে ওর রসকে আস্বাদ করছেন, যে রস তাঁর জীবনকে ধরে রাখছে, ঐ জিনিসটা তাঁর আর হবে না। এখন ওনার যে জীবন ধারা চলবে হয় একেবারে ব্রহ্মানন্দে নয়ত ভজনানন্দে। কিন্তু যেহেতু এটা পরা ভক্তি সেইজন্য পুরোপুরি ব্রহ্মানন্দেই রমণ করবেন। ঈশ্বরের ভাবের বাইরে উনি আর অন্য কোন জায়গাতেই থাকতে পারবেন না। ঠাকুর তাই আমাদের জন্য খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির সরবৎ যে খেয়েছে সে আর চিটেগুড়ের পানা খেতে চাইবে না।

আর বলছেন *নোৎসাহী ভবতী*, ওর হাঁকডাক চলে যায়। উৎসাহী জিনিসটা রজোগুণের লক্ষণ, সব সময় এই ভাব আমাকে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, ওখানে যেতে হবে, ওকে টাইট দিতে হবে ইত্যাদি। যদি এখনও কিছু করার উৎসাহ থাকে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। ভক্তিতে নিজের স্বার্থ চলে যায়, তবে দুটো লোকের ভালো করার জন্য কিছু কাজ করতে পারেন। যেমন ঠাকুর ঠনঠনের কালীবাড়িতে কেশব সেনের জন্য প্রার্থনা করছেন, দক্ষিণেশ্বর মা কালীর কাছে নরেনের জন্য প্রার্থনা করছে, স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনা করার জন্য প্রার্থনা করছেন, এগুলো আছে। কিন্তু নিজের স্বার্থ থাকে না বলে নিজের থেকে যে একটা চেষ্টা চালাবেন এই জিনিসটা পুরোপুরি চলে যায়। সব থেকে বড় কথা হল, দুই বোধ, আমি আলাদা জগৎ আলাদা এই ভাবটা চলে যায়। এই ভাবটা চলে যাওয়ার জন্য ভক্ত আর কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করেন না। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও একটা ভাব প্রচলিত হয়ে আছে, চল্লিশ বছর হয়ে যাওয়ার পরেও যদি সন্ন্যাসীর কাজের স্পৃহা থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। যতটুকু না করলে নয় ততটুকুর বাইরে উৎসাহ দেখানোটাই সন্দেহের কারণ হয়ে যাবে। আবার দেখতে হবে আলস্যে তমোগুণ আশ্রয় না করে নেয়। কারণ সত্ত্ব, রজো আর তমো এক অপরের সাথে ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে, আজকে তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে বলে কাল সেটা রজোগুণে চলে যাবে না তা নয়, আর পরশু ওটা তমোগুণে যে নেমে যেতে পার তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। যাঁরা সব শাস্ত্র জানেন তাঁদেরও কিন্তু ভয় থাকবে। একমাত্র এখানে যে বর্ণনা করছে, *যল্লব্ধা, যৎ প্রাপ্য*, অর্থাৎ যখন বস্তু লাভ হয়ে গেল, জ্ঞানের দিক থেকেই হোক বা ভক্তির দিক থেকেই লাভ হয়ে থাকুক, তখনই ঐ ভয়টা যায়। যতই সত্ত্বগুণ থাকুক ওখান থেকে তমোগুণে চলে আসা কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ঠাকুর এর উপর কত উপমা দিয়েছেন। বলছেন সাবীর দিন ফিরেছে, সাবী ছিল ভালো সৎগুণ সম্পন্না ব্রাহ্মণী বিধবা, এখন উপপতি করেছে।

সত্ত্বগুণের কোন দাম নেই, তমোগুণ রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণ ভালো কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ওখান থেকে রজো বা তমোগুণে নেমে যেতে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। যাঁরা ত্রিগুণাতীত হয়ে যান তাঁদেরও এই জগতে থাকার জন্য একটা গুণকে আশ্রয় করতে হয়। যেমন কুর্মাবতার, উনি তমোগুণকে আশ্রয় করে ছিলেন। তমোগুণকে আশ্রয় না করলে তাঁর উপর পাহাড় রেখে যে সমুদ্র মন্থন করতে হবে ওটা হত না। রাজা রামচন্দ্র রজোগুণ ধরে রেখেছিলেন, রজোগুণ ধারণ না করলে লড়াই করবেন কি করে! আবার কপিল মুনি বা অবধূত, এনারা সত্ত্বগুণকে ধরে আছেন। ঠাকুর সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে আছেন। ভগবান অবতার রূপেও তমোগুণকে কাজ বিশেষে আশ্রয় করতে পারেন। ঠাকুরের কাছে এক ভক্তকে নিয়ে আসা হয়েছে, সে এমন ভক্ত যে সবাইকে বলছে, ওরে তোর পায়ে পড়ি তুই হরিনাম কর। ঠাকুর তাকে দেখে বলছেন, এ আবার আমড়া খাবে। ঠিক তাই হল, কদিন পরে দেখা গেল একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে বিয়ে থা করে সংসার ফেঁদে আমড়া খেতে শুরু করেছে। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তিতে কি গদগদ ভাব, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে কিন্তু তাকে দেখেই ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন, এ আবার আমড়া খাবে। সত্ত্বগুণ থেকে পড়ে যাওয়া কোন ব্যাপারই নয়। শাস্ত্রেও বলা হয় এই তিনটে গুণ এক অপরকে দাবাতে থাকে। তবে সত্ত্বগুণী লোক নীচে নেমে গেলেও তাঁর মনে থাকে আহা রে! আমি আগে কত ভালো লোক ছিলাম। তবে এখানে তাঁদের কথাই বলছেন যাঁরা পরা ভক্তিতে চলে গেছেন। সাধনা মানেই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কাছে যেটা স্বাভাবিক সেটাই বাকিরা পালন করার চেষ্টা করেন, শাস্ত্র মানেই তাই, সাধনা মানেই তাই। শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষের কাছে স্বাভাবিক হল, তাঁর না কোন চাহিদা আছে, না কোন শোক আছে, না কাউকে দ্বেষ করেন, না কোন কিছুতে আনন্দ পান আর কোন কিছুতে তাঁর চেষ্টা থাকে না, মানে নিজের স্বার্থের জন্য কোন ছোটাছুটি লাফালাফি থাকে না। সাধনা হল, আমাদের এই

জিনিসগুলোকে চেষ্টা করে করতে হবে। সংসারীরা জোঁকের মত সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখে। জোঁককে ছাড়াবার জন্য ওর মুখে একটু নুন দিতে হয়, নুন দিলেই জোঁক ছেড়ে যাবে। শাস্ত্র কথা হল জোঁকের মুখে নুন, নুন জোঁকের জন্য বিষ, ঠিক তেমনি বিষয়ীদের বিষয় ভাবের জন্য শাস্ত্র কথা হল তার বিষ, বিষের জন্য বিষ। শাস্ত্র কথা, ঈশ্বরীয় কথা যত ভেতরে যাবে তত ধীরে ধীরে বিষয়ের প্রতি টানটা শিথিল হতে শুরু করবে। পরের সূত্রে বলছেন –

যৎ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।।৬।।

একজন জ্ঞানী বা ভক্তের এর থেকে ভালো বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। একমাত্র ঠাকুরের কথামৃতেই পাওয়া যাবে যেখানে বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ বলছেন। গীতাতে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, ঐ বর্ণনা একাঙ্গী, কারণ পূর্ণ জ্ঞানভাবেরই শুধু বর্ণনা আছে। কিন্তু এখানে আরও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠাকুর আরেকটু সবিস্তারে বলছেন। আগের সূত্রে ত্রিগুণাতীতের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুরের কথার উল্লেখ করা হয়েছিল, বালক তিনটে গুণের আঁটে থাকে না। পরা ভক্তিতে যিনি চলে গেছেন তিনি ত্রিগুণাতীত, ত্রিগুণাতীত হওয়ার জন্য তাঁর ব্যবহার কখনই আন্দাজ করা যায় না। কারণ তমোগুণীকে সবাই আন্দাজ করে নিতে পারবে, রজোগুণীর ব্যবহার কেমন হবে আগে থেকে আন্দাজ করা যায়, সত্ত্বগুণীরও ব্যবহার আন্দাজ করা যায়। আমরা বলি, ও এতো ভালো মানুষ হয়ে এই রকম করল কি করে! তার মানে সে ভালো মানুষ সে এই জিনিস করবে না, আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। জ্ঞানীকে কিন্তু বোঝা যায় না। তাহলে কি জ্ঞানী উন্মত্তবৎ, প্রমত্তবৎ, না না, ঐ দৃষ্টিতে না। সমস্যা হল আমাদের চারিদিকে যে শক্তিগুলি বেষ্টিত হয়ে আছে, যে শক্তিগুলি মানুষকে গুণের মধ্যে বেঁধে একভাবে চালিত করে নিয়ে যায়, সেই জিনিসটা সিদ্ধ পুরুষের থাকে না। তাই যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের ব্যবহারে কোন মাপকাঠি থাকে না। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি কেউ বলে, ঠাকুর এই রকম কথা বলেছেন কিন্তু অমুক সাধুবাবাকে দেখলাম তার সঙ্গে তো মিলছে না। না মেলারই কথা, কারণ ঠাকুর যে বালকবৎ, উন্মত্তবৎ ইত্যাদি বলছেন, তখন এটাতেই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নয়, আরও পাঁচ রকমের হতে পারে। বিচার করার জন্য আমরা যে মাপকাঠিই ঠিক করি না কেন, এই মাপকাঠি দিয়ে কোন সিদ্ধ পুরুষকে বিচার করা যাবে না, তা তিনি জ্ঞানের দিক থেকেই সিদ্ধ হন আর ভক্তির দিক থেকেই সিদ্ধ হন। ভক্তির দিক থেকে যাঁরা সিদ্ধ হন তাঁদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। জ্ঞানীরা তাও একটা ভাব নিয়ে চলেন, যাঁরা বেদান্ত সাধনা করছেন তাঁদের একটা ভাব থাকে। কিন্তু যাঁরা সিদ্ধ ভক্ত, ঠাকুর যেমন বলছেন ঝড়ের এঁটো পাতা, ভক্ত নিজেকে ঠিক সেই ভাবেই দেখেন।

সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে একটা কাগজের টুকরো ফেলে দেওয়া হয়েছে, স্রোতে ভেসে ভেসে একবার এদিকে যাচ্ছে আবার অন্য দিকে যাচ্ছে। আমরা সবাই এভাবেই ভাসছি। কিন্তু আমাদের ভাসা হল একটা নৌকা বা জাহাজের ভাসা, তার ইঞ্জিন আছে, মোটর আছে, হাল আছে, সেটাকে একটু এদিক সেদিক করে চালানো যাচ্ছে, এখানে কোন দিকে যাবে আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সিদ্ধের জাগতিক সব ইঞ্জিন, রাডার এগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। কারণ মন হল জাহাজের ইঞ্জিন, হাল এই সব, মনটাই তাঁদের পুরো ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায়? মন সত্ত্ব, রজো আর তমো দিয়ে চলে। তমোগুণী ইঞ্জিন যখন চালায় তখন নৌকা এক রকম চলে, রজোগুণী হাল চালালে আরেক রকম চলে, সত্ত্বগুণী হাল আরেক রকম চালায়। সিদ্ধ ভক্ত ত্রিগুণাতীত হয়ে যান, তিনটে গুণের বাইরে চলে যান, ফলে জাগতিক মন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এবার সমুদ্রের ঢেউ তাঁকে যেদিকে নিয়ে যাবে তিনি সেই দিকেই যাবেন। তাহলে পাগল আর এনাদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎ আছে, পাগলের নিজস্ব স্বার্থটা থাকে, নিজের শরীর, নিজের খাওয়া-দাওয়াটা থাকে, সিদ্ধ পুরুষের সেগুলোও থাকে না। তবে তাঁরাও কোন একটা ভাবকে আশ্রয় করে থাকেন, কারণ তাঁর জীবনযাত্রা এখনও চলছে। সাধারণ ভাবে দুটো ভাব দেখা যায়, যদিও এর ডান দিক বাম দিক চলে। তার মধ্যে একটা হল ঈশ্বরে ভক্তি, ভক্তি জিনিসটা তাঁরা কখন ছেড়ে দেন না। দ্বিতীয় লোককল্যাণ, লোককল্যাণকে কখন এনারা ছাড়েন না।

ঠাকুর যে ঝড়ের এঁটো পাতা বা বেড়াল ছায়ের উপমা দিচ্ছেন, এই সূত্রে তাঁরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি নিজেকে এবার পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও দুটি ভাব, ভগবান বুদ্ধের যেমন করুণার ভাব ছিল, মানুষের কল্যাণ হোক। যীশুরও ঐ ভাব ছিল, মানুষের ভালো হোক। আর তার সাথে যে পরম ভাব,

ঈশ্বরতত্ত্ব যেটা, ঐ ভাবকেও ছাড়বেন না। এবার সিদ্ধ ভক্তের ব্যাবহারকে যদি গুটিয়ে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয় তাহলে কয়েকটা জিনিস সেখানে ভেসে ওঠে। প্রথম হল, সাধারণ মানুষের মত কর্তব্য পালন করতে দেখা যায়। এর খুব ভালো দৃষ্টান্ত কবীর দাস, কবীর দাসের দোঁহা পড়লে বোঝা যায় যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তাই নিয়ে আবার অনেকে টিপ্পণি করে, কবীর দাসের মধ্যে দেখানোর একটা ছটফটানি ছিল যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমরা মেনে চলছি যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ, উনি কিন্তু সারা জীবন নিজের কর্তব্য পালন করে গেছেন, পরিবারের দেখাশোনা করে গেছেন। আর উনি পেশায় জোলা ছিলেন, সারা জীবন তাঁত বুনেই গেছেন। কিন্তু সাংসারিক অর্থে আমরা যেভাবে ভাবি, কিভাবে আরও বেশি রোজগার করা যাবে, সেসব ছিল না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তিনি সাংসারিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পয়গম্বর মহম্মদও নিজের সংসারের প্রতি, নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করার দায়ীত্ব পালন করে গেছেন কিন্তু এটাও বোঝা যায় মনটা তাঁদের অন্য জায়গায়।

দ্বিতীয় দেখা যায়, এনারা ধর্ম আর অধর্মের পারে। একদিকে যেমন সাংসারিক কর্তব্য পালন করছেন, আবার কিছু আছেন যাঁরা কোন বিধি নিষেধ পালন করেন না, ধর্মাধর্মের পারে চলে যান। বেশির ভাগ সিদ্ধ পুরুষরা কোন বিধি নিষেধ পালন করেন না। কিছু আছেন যাঁরা লোকশিক্ষার জন্য বিধি নিষেধ পালন করছেন বা স্বভাবেই করছেন। ঠাকুর বলছেন, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাণবে। বেশির ভাগ সিদ্ধ পুরুষ বিধি নিষেধের দিকে যাবেনই না। গুরু নানক মক্কায় গেছেন, সেখানে কাবার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছেন। একজন অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, তুমি জান না কাবার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছে? নানক বলছেন, আমি খুব পরিশ্রান্ত আমার পাটা তুমি ঘুরিয়ে দাও যেদিকে কাবা নেই। লোকটি পা ঘুরিয়ে যেদিকেই রাখছে দেখছে সেদিকেই কাবা। এটাই বিধি নিষেধকে ছেড়ে দেওয়া। সবাই বলে কাশীতে মারা গেলে মুক্তি হয়। কবীর দাস জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাশীর ওপারে মরলে নাকি গাধা হয়, কবীর দাস মরার সময় ওপারে চলে গেলেন। সারা জীবন কাশীতে থাকলেন, ঠিক মৃত্যুর সময় ওপারে চলে গেলেন, বিধি নিষেধের পারে চলে গেছেন। কবীর দাস বলছেন, জ্ঞানীর মৃত্যুর কী আছে, যেখানে মরবে সেখানেই মুক্তি। জ্ঞানী পুরুষ সাধারণ ভাবে বিধি নিষেধের পারে চলে যান, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের কাউকে লোকাচার পালন করতে দেখা যায়। ঠাকুর অনেক লোকাচার পালন করছেন আবার বিধি নিষেধের পারেও ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে যাচ্ছেন, মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন জামার বোতাম ঠিক আছে কিনা। সেইজন্য এনাদের আমরা আন্দাজ করতে পারব না। এক ভক্তের বাড়ি গেছেন, খুব সম্মান দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, আগে আমার কী অবস্থাই না ছিল আমার কাপড়ের ঠিক থাকত না, এখন ঐ অবস্থা নেই। শুনে সবাই হাসছেন। এর মধ্যে কখন তিনি ধুতি খুলে বগলে রেখে দিয়েছেন। ওরা দেখে হাসছে, সবাই জানে উনি এই রকমই। ঠাকুর খুব গর্ব করে বলে যাচ্ছেন আগে আমার ও রকম অবস্থা ছিল, এখন আর সেরকম নেই। দক্ষিণেশ্বর নিজের ঘরে শুয়ে আছেন, কে এসে বলল বান এসেছে, শুনেই উনি বিনা কাপড়ে বান দেখতে দৌড়ে গেছেন। বাকিরা কাপড় পড়তে পড়তে বান চলে গেছে। কখন দেখা যাচ্ছে তিনি বিধি নিষেধ পালন করছেন, কখন করছেন না। এনাদের এগুলো ধরতে পারা যাবে না। গুণের আঁটে যারা বাধা আছে তারা ঐ রকম করেন, কিন্তু এনারা করেন না। আর তৃতীয় যেটা হয়, পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। এনারা কোনটাই করবেন না, এদিকেও নেই, সেদিকেও নেই। এর উপর অনেক কাহিনীও আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ব্য মুনি খুব উচ্চমানের মুনি ছিলেন। একটা গরু গাড়িতে হেলান দিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকেন। বেশির ভাগ সিদ্ধ পুরুষরাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। এর আগে *নোৎসাহী ভবতি* নিয়ে বলা হল, এনারা জাগতিক কিছুতে আর মন দেন না। এই তিনটে, সামাজিক কাজকর্ম করছেন, বিধি নিষেধের পারে আর কোন কিছুতেই নেই চুপচাপ বসে আছেন। তার মানে কখন তমোগুণে আছেন, কখন রজোগুণে আছেন আবার কখন সত্ত্বগুণে আছেন। নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে তিনি এই রকমই হবেন।

নারদ এই সূত্রে বলতে চাইছেন, কোন জ্ঞানীকে, সিদ্ধ পুরুষকে তাঁর আচরণ দিয়ে কেউ বিচার করতে পারবেন না। আচরণ দিয়ে তাঁর বিচার করতে গেলে অনেক গোলমাল লেগে যাবে। তবে একটা জিনিস দেখা যায়, তিনি যদি কখনও সাংসারিক কাজে লিপ্ত থাকেন, তাঁর মন কিন্তু তখনও পুরো শান্ত থাকে, এটাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানী বা সিদ্ধ পুরুষ কখন উদ্বিগ্ন হবেন না। গীতায় ভক্তের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন হন না আর কাউকেও উদব্যস্ত করেন না, পূর্ণত্বের এটাই লক্ষণ। এই হল সিদ্ধ পুরুষদের আচরণ কেমন হবে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

যৎ জ্ঞাত্বা, যেটাকে জেনে। *জ্ঞাত্বা* শব্দ জ্ঞান থেকে এসেছে, তবে এখানে জ্ঞান বলতে বস্তু জ্ঞান নয়। বেদান্ত বা উপনিষদে অজ্ঞান জিনিসটাকে সরিয়ে দেওয়া মানেই জ্ঞান, কারণ জ্ঞান আগে থেকে সবার ভেতরেই আছে। আমাদের অনেকের মনে হতে পারে ঈশ্বর দর্শন মানে ঈশ্বরকে দেখা। বেদান্ত সব সময় বলে যাচ্ছে বস্তু জ্ঞান মানে বৃত্তি জ্ঞান, বৃত্তি জ্ঞান মানে একটা বস্তু আছে, যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশ যখন আমার দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে মন বুদ্ধিতে গিয়ে একটা আলোড়ন তৈরী করে তখন বুদ্ধি এই গ্লাশের আকার ধারণ করে, এই আকার ধারণকে ওনারা বলেন বৃত্তি জ্ঞান। ভাবতে অবাক লাগে দু তিনি হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন, তখন তাঁরা বলেন জ্ঞানের যে বাধক গুলো আছে, অর্থাৎ এই সংসার জ্ঞান বা বৃত্তি জ্ঞান, এই বৃত্তি যখন শান্ত হয়ে যায় তখন আত্মজ্ঞান নিজেই ভেসে ওঠে। আত্মজ্ঞান বৃত্তি জ্ঞান নয়। আত্মজ্ঞান কি রকম? ঠাকুর যেমন উপমা দিচ্ছেন, লণ্ঠনের আলো ঢাকা আছে, লণ্ঠনের উপর থেকে আবরণ গুলো সরিয়ে দিলে আলো নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। কথামৃত পড়ে, উপনিষদাদির কথা শুনে শুনে আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, আত্মজ্ঞান যেন লণ্ঠনের মত আমাদের ভেতরে আছে আর তার উপর কম্বল চাপা দেওয়া আছে, জ্ঞান মানে কম্বলকে সরিয়ে দেওয়া হল আর আত্মজ্ঞানের আলো নিজেই ভেসে উঠল। যদিও আমরা ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারি না, তবুও আমাদের মনে একটা ভাব বসে গেছে যে জিনিসটা এই রকম। ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপার যখন আসে, ভক্তির ব্যাপার যখন আসে তখন মনে হয় এটা আমাদের এলাকা, এখানে জ্ঞান চলবে না, এটা হল ঠাকুরকে আমি সাক্ষাৎ দেখছি। আসলে জ্ঞান জিনিসটাকে বোঝা অনেক সহজ, তেমনি অজ্ঞান জিনিসটাকেও বোঝা সহজ কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপারটা বোঝা বা ধারণা করা সব থেকে কঠিন। ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে একদিকে জ্ঞান নিজে থেকে যেটা হয় সেটা রয়েছে অন্য দিকে তার মধ্যে বুদ্ধির ঘট রয়েছে, ফলে সাধারণ ভাবে মনে হয় বৃত্তি জ্ঞান যেভাবে হয় ঠিক সেইভাবেই যেন ঈশ্বরকে দেখে। কিন্তু জিনিসটা তা নয়। যতই আমরা শাস্ত্রের কথা শুনি না কেন, আমাদের কাছে ঈশ্বর দর্শন মানে আলোময় ঠাকুরকে সাক্ষাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা। এর থেকে ভুল ধারণা ঈশ্বর দর্শনে হতে পারে না।

ঈশ্বর দর্শন মানে জ্ঞান। জ্ঞান কে করেন? বেদান্তের দৃষ্টিতে জ্ঞান সব সময় আত্মারই হয়, আত্মা ছাড়া আর কারুরই জ্ঞান হতে পারে না। আত্মার উপর অনেক আবরণ দেওয়া আছে বলে তিনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগৎ থেকে জ্ঞান নেন। রাজ কর্মচারীরা যেমন রাজাকে এসে এসে খবর দিতে থাকে, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো এসে এসে আত্মাকে খবর দেয়। এই জিনিসটা যে শুধু বেদান্তে বা উপনিষদেই হবে ভক্তিতে হবে না তা নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই জিনিস হয়। সত্য সত্যই, সত্য কখন পাল্টাবে না। আত্মজ্ঞান যেভাবে হয় ঈশ্বর দর্শনও সেইভাবে হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান হয় এই জ্ঞানকে বলছেন জগৎ জ্ঞান বা সংসার জ্ঞান। মন যখন সরাসরি মনকে জেনে যায় তখন এটাকে বলে অতিন্দ্রীয়, অতিন্দ্রীয় মানে ইন্দ্রিয়ের পারে চলে যাওয়া, এখন ইন্দ্রিয়কে আর মাধ্যম করতে হয় না। মন দিয়ে যখন চৈতন্যের দর্শন করে তখন তাকে বলে ঈশ্বর দর্শন। আর চৈতন্য দিয়ে যখন চৈতন্যকে জানে তখন সেটাই হয়ে যায় আত্মজ্ঞান। জানার ব্যাপারটা সব সময় চৈতন্যের, আত্মাই জানেন। আত্মা যখন মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে জানছেন, এই আত্মা তখন কিভাবে জানছেন? আমরা পরস্পর পরস্পরকে যখন জানছি বা দেখছি তখন আমার আত্মা অন্যদের দুটো তিনটে ধাপ পেরিয়ে দেখছেন। দুটো তিনটে ধাপে যখন জ্ঞান আসে তখন এই জ্ঞানকেই সংসার জ্ঞান বলা হয়। যখন আত্মা মন দিয়ে সরাসরি অন্য মনকে জানছেন তখন বলা হয় intuition বা অতিন্দ্রীয়। আত্মাই মন দিয়ে চৈতন্যকে যখন দেখে তখন বলে ঈশ্বর দর্শন। আর মনকেও সরিয়ে দিয়ে এবার আত্মা নিজেকেই জানছেন, এটাই আত্মজ্ঞান, জিনিসটা একই থাকে।

আত্মাকে না এনে যোগ দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তখন কি হয়? একটা আলো, আলোর যখন কোন ব্যবধান নেই তখন এটাই আত্মজ্ঞানের মত হয়ে যায়। কিন্তু আলোর উপর যদি খুব পাতলা স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া থাকে, আবরণ আছে কি নেই বোঝাও যায় না, এটাকেই বলে সগুণ। মন যখন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, যেখানে আর কোন কিছু থাকে না, এটাই ঈশ্বর দর্শন। তার মানে জ্ঞান সব জায়গাতেই আসছে। ঈশ্বর দর্শন বলতে সাধারণ মানুষের যে ধারণা তাতে কখনই কোন দর্শন হয় না। হয় বৃত্তি জ্ঞান বা বস্তু জ্ঞান আর না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এর মাঝখানে একটা আছে যাকে বলে অখণ্ডাকারাবৃত্তি। অখণ্ডাকারাবৃত্তিতে মন

তখনও আছে কিন্তু অখণ্ডের সাথে যেন এক হয়ে গেছে। মন তো কখন অখণ্ড হয় না, কিন্তু মনে হয় অখণ্ডের সাথে যেন এক হয়ে গেছে, ছুঁই ছুঁই ভাব। ঐ জায়গায় আমিত্বের বোধ থেকে যায়, কিন্তু এটাও জ্ঞান। আমরা যেভাবে এই মাইক্রোফোন, গ্লাশকে বস্তু রূপে দেখছি, ঈশ্বরকে এভাবে বস্তু রূপে দেখেন না। ঈশ্বর দর্শন কোন বস্তু জ্ঞান নয়, ঈশ্বর দর্শন যা ঈশ্বরের জ্ঞানও তাই, কোন তফাৎ নেই। সেইজন্য সূত্রে জ্ঞাত্বা শব্দটা নিয়ে এসেছেন। জ্ঞাত্বা শব্দটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, আমরা দিনরাত ঈশ্বর দর্শনের কথা বলছি, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন হয় না, ঈশ্বর জ্ঞান হয়। তা নাহলে ঈশ্বর বাইরের কোন বস্তু হয়ে যাবেন। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী, সেই অন্তর্যামীকে যখন জানা হয় সেটাই ঈশ্বর জ্ঞান। সেইজন্য ঈশ্বর বাইরের কোন বস্তু নন।

এগুলোকে বিচার করলে দেখা যাবে, ঈশ্বরকে জানা মানে সমস্ত বৃত্তিকে সরিয়ে দেওয়া, কারণ ঈশ্বর জ্ঞানে বৃত্তিই বাধা, আমাদের ভাষায় অজ্ঞানই তার বাধক। তফাৎ হল, আত্মজ্ঞানে মনের কোন ভূমিকা থাকে না, কিন্তু ঈশ্বর দর্শনে শুদ্ধ মন একটা ক্ষীণ আবরণ হয়ে থাকে, সেইজন্য ঐ আমিত্ব বোধটা থাকে। তা নাহলে ওটা তখন আর ভক্তি না হয়ে জ্ঞান হয়ে যাবে। ভক্তি আর জ্ঞানে তফাৎ কিছু নেই, দুটোতেই জ্ঞান হচ্ছে, শুধু মনের একটা হাল্কা আবরণ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আবরণটা এতই ক্ষীণ যে ওটা থাকাও যা না থাকাও তাই। আমাদের সব শাস্ত্র বলছে, ঠাকুরও বারবার বলছেন যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই সগুণ সাকার, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। আত্মজ্ঞানের যে বাধক সেই বাধককে সরিয়ে দিলে আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানের বাধককে সরিয়ে দিলে ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে যাবে। তবে পদ্ধতিগত তফাৎ আছে। ঠাকুরের কাছে কয়েকজন থিয়েটারওয়ালারা এসেছেন। থিয়েটারওয়ালারা এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে ঈশ্বর দর্শন কেমন? ঠাকুর খুব সহজে তাদের বলছেন, তোমরা তো থিয়েটারে অভিনয় কর, হল ভর্তি লোকেরা নাটক দেখার জন্য বসে আছে। পর্দা যতক্ষণ না সরছে ততক্ষণ সবাই এর ওর সাথে গল্পগুজব করতে থাকে, কিন্তু যেই পর্দা উঠে গিয়ে মঞ্চে নারদ বীণা নিয়ে হাজির হলেন তখন এককালে সবার নজর মঞ্চে নারদের উপর গিয়ে পড়ে, সব কথাবার্তা বন্ধ। এমনকি দেখা যায় সাধনা যদি কোন কারণে না করা থাকে তাহলেও কিন্তু ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। ঠাকুরও বলছেন, ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে এক জায়গায় চলে এল, এটাকে ঠাকুর বলছেন হঠাৎ সিদ্ধ, আবার কৃপা সিদ্ধের কথা বলছেন, ঈশ্বরের কৃপা হয়ে গিয়ে সিদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আত্মজ্ঞান কখনই এভাবে হবে না। সেইজন্য ঈশ্বর দর্শন ব্যাপারটা খুব জটিল, এটাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যুক্তি দিয়ে ঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা যায় না। এই কথাগুলো আমাদের কথাও নয়, শাস্ত্রের কথাও নয়, এগুলো সহজ যুক্তি। ঈশ্বর দর্শন হয় তখনও মনের এলাকাটা থাকে, মন হাজারটা জিনিসে না গিয়ে একটা জিনিসে চলে এল, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল। আত্মজ্ঞানে মনের এলাকাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মন সহজে তার এলাকা থেকে আমাদের কিছুতেই বেরিয়ে যেতে দেবে না, সাধনা ছাড়া কোন ভাবেই হবে না। এর খুব ভালো উপমা হল, হাওয়াই বাজি আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারবে, গ্যাস বেলুনও অনেক উঁচুতে চলে যেতে পারবে, হেলিকপ্টার, এ্যারোপ্লেনও আকাশের আরও অনেক উঁচুতে চলে যেতে পারবে কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য দরকার রকেট টেকনোলজি। আত্মজ্ঞান হল মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে যাওয়ার টেকনোলজি।

পরম ভক্তিতেও জ্ঞানের যে বাকি বাধক গুলো আছে সেগুলো সরে যায়, এই সরে যাওয়াটা তাঁর কৃপাতেই সরুক, হঠাৎ সরে যাক বা সাধনাতেই সরে যাক কিন্তু সরে যায়। সেইজন্য বলছেন *জ্ঞাত্বা*। জ্ঞাত্বা বলতে আমরা ঈশ্বর দর্শন বলতে যা ভাবি, আমি ঘরে ধ্যান করছি হঠাৎ ঠাকুর সামনে হাজির হয়ে বললেন, বল তুমি কি চাও; সিনেমাতেও যেমন দেখায় হঠাৎ কৃষ্ণ এসে বলছেন বল তুমি কি চাও, ওরকম কিছু হয় না। কাহিনীতে দেখায়, শিব কৈলাসে বসে আছেন, হঠাৎ ওনার আসন নড়তে শুরু করল। শিব দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন আমার এক ভক্ত আমাকে পাওয়ার জন্য খুব তপস্যা করছে। উনি তাড়াতাড়ি করে ষাঁড়ে বসলেন, ষাঁড়টা সোজা ভক্তের সামনে উড়ে এসে হাজির হয়ে গেল, শিব বললেন, বল তুমি কি বর চাও। এসব কাহিনীর জন্য ঠিক আছে কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে এগুলো দাঁড়াবে না। তিনি সবই দেবেন, বরও দেবেন কিন্তু ঐ অর্থে নয়, যে অর্থে আমরা ভাবি। সেখানে সব সময় জ্ঞানের ব্যাপারটা থাকে। স্থূল চোখ দিয়ে দেখার ব্যাপারটা থাকে না। এটাতেই বোঝা যায় জ্ঞান আর ভক্তি সমান।

জ্ঞান আর ভক্তিকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলতে থাকে, ঠাকুরও বলছেন জ্ঞান আর ভক্তি এক। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় আছে। রামানুজ হলেন ভক্তির আচার্য, তিনি এই ভক্তির, যে ভক্তির আমরা আলোচনা করছি, এর খুব প্রশংসা করছেন। আর সাধারণ যে জ্ঞান, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিচার করা এগুলোর নিন্দা করছেন। আচার্য শঙ্কর আবার আত্মজ্ঞানের স্তুতি করছেন আর এই যে সাধারণ ভক্তি, মন্দিরে যাওয়া, পূজা করা এগুলোর নিন্দা করছেন। আচার্য যখন ভক্তির কথা বলছেন তখন অপরা ভক্তিকে নিয়ে বলতে চাইছেন। পরা ভক্তির উনি কখনই নিন্দা করবেন না। আর রামানুজ যখন জ্ঞানকে নিন্দা করছেন তখন উনি নিন্দা করছেন বিচার জিনিসটার বা অপরা বিদ্যার নিন্দা করছেন। এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে জ্ঞান আর ভক্তির তফাৎ কোথায়?

মধুসূদন সরস্বতী এর উপর প্রচুর আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, জ্ঞান আর ভক্তির যে তফাৎ নেই তা নয়, তফাৎ আছে। প্রথম তফাৎ স্বরূপে, জ্ঞান আর ভক্তির যে স্বরূপ এই দুটোতে তফাৎ আছে। দ্বিতীয় সাধনাতে তফাৎ আছে। তৃতীয় ফলে তফাৎ আছে আর চতুর্থ অধিকারীতে তফাৎ আছে। যদিও সবাই বলছেন, ঠাকুরও বলছেন জ্ঞান আর ভক্তি এক কিন্তু এই চারটে জায়গায় তফাৎ এসে যায়। যদি একই হয় তাহলে রামানুজ ভক্তির কথা আর আচার্য শঙ্কর জ্ঞানের কথা কেন বলছেন? এই চারটে জায়গায় তাদের তফাৎ এসে যায়। স্বরূপে কি রকম তফাৎ হয়, ভক্তিতে মন ইষ্টে গিয়ে গলে যায়। আমরা এক্ষুণি আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ সিদ্ধ হোক, কৃপা সিদ্ধ হোক বা সাধনা সিদ্ধ হোক, যেভাবেই সিদ্ধ হোক, তাতে ঈশ্বরে গিয়ে মনটা এক হয়ে যায়, মন গলে যাচ্ছে। জ্ঞানে তা হয় না, জ্ঞানে পুরো জিনিসটা সরে গেল। জ্ঞানে ওর মধ্যে মজে যাওয়া, গলে যাওয়া এই অর্থ হয় না। সেইজন্য ভক্তি সব সময় সবিকল্প হয় আর জ্ঞানে সব সময় নির্বিকল্প হয়। সবিকল্প মানে আমি বোধটা থেকে যায়, কারণ সেখানে মিলন হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর যে সত্যিকারের ভালোবাসা, দুজনে সেই ভালোবাসাতে পুরো ডুবে যায়, তাতে আমি বোধটা থাকে। ভক্তিতেও ঠিক তাই, তবে ভক্তিতে এই ধরণের প্রেমে তফাৎ আছে। ভক্তিতে সব সময় ভগবানের গুণগানের উপর জোর দেয় আর জ্ঞানে সব সময় আত্মজ্ঞানের উপর জোর দেয়। সেইজন্য ভক্তির সাধনা আর জ্ঞানের সাধনাতে তফাৎ এসে যায়। ভক্তিতে যে সাধনা তাতে সব সময় ভগবানের কৃপা, ভগবানের গুণ, ভগবানের লীলা এই জিনিস গুলোর উপর বেশি আলোকপাত করে। আত্মজ্ঞানের পথিক সব সময় আত্মাকে নিয়ে চিন্তন করেন আর তাঁর বাধক গুলোকে অপসারণ করার চেষ্টা করে যান। ফলের তফাতে কি হয়, ভগবানের প্রতি যে ভক্তি এটা হল ফল আর জ্ঞানের ফল হয় অজ্ঞান নিবারণ। চার নম্বর সূত্রে *যল্লব্ধ্বা* বললেন, কি লাভ করছে, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে লাভ করছে, কিন্তু জ্ঞানে অজ্ঞান নিবারণটাই লাভ। এইভাবে ভক্তির ফল আর জ্ঞানের ফলে তফাৎ হয়ে যায়, টাইপটা পুরো আলাদা। কিন্তু দুটোর আনন্দ এক। অথচ আমরা যখন আমাদের দৃষ্টিতে দেখছি তখন দুটো পুরো আলাদা হয়ে যায়। ভক্ত সেইজন্য জ্ঞান চায় না, জ্ঞানীরও সেইজন্য ভক্তিতে কোন আগ্রহ নেই। কারণ দুজনেই আনন্দের সেই সীমাতে পৌঁছে যান, যখন এক অপরের ব্যাপারে কোন আগ্রহ থাকে না।

অধিকারীতে তফাৎ হল, ভক্তির অধিকারী সবাই হতে পারে কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী সবাই হতে পারবে না। সেইজন্য নারদ যে *জ্ঞাত্বা* শব্দটা বলছেন, তাতে ভক্তি জ্ঞানের মতই মনে হয়। আগে আগে আমরা আলোচনা করলাম জ্ঞান আর ভক্তি এক। তাহলে এত তফাৎ কি করে হল? শঙ্করাচার্য যখন ভক্তিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি অপরা ভক্তিকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। যার জন্য গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির কথা যখন চলে তখন তিনি সেটাকে গ্রহণ করছেন। কিন্তু ওনার কাজ হল জ্ঞানকে সামনে নিয়ে আসা, সেইজন্য তিনি সব সময় জ্ঞানের উপর জোর দিচ্ছেন, পুরো গীতাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সব কিছুকে মানছেন, আর কোথাও শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রহ্মকে তিনি আলাদা করে দেখছেন না। তবে ভক্তিতে সমস্যা হল, ভক্তি জিনিসটা খুব সহজেই degenerate করে যায় বলে তিনি অপরা ভক্তির থেকে জ্ঞানের উপর বেশি আলোকপাত করছেন, আর ওনার পক্ষে যুক্তিতেও সোজা ছিল। রামানুজ যে নিন্দা করছেন তারও অনেকগুলো কারণ ছিল, তিনি শাস্ত্রাদির বিচার জিনিসগুলোর উপর বেশি আক্রমণ করছেন। ঠিক তেমনি স্বামীজীও আবার বলছেন, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এগুলো সব এক। আমরাও বলতে পারি সবই এক, কিন্তু নীচের দিকে নেমে সবাই সবাইকে আক্রমণ করতে পারে।

একবার এক ইয়ুথ কনফারেন্সে একজন মহারাজ ভাষণ দিচ্ছিলেন, খুব সুন্দর ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণের শেষে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করছে, আমরা সাধু সন্ন্যাসীর ব্যাপারে অতটা বুঝি না, কিন্তু আপনার কথা

শুনে মনে হয় সাধু মানে একজন ভদ্রলোক। তাহলে সাধু আর ভদ্রলোকের মধ্যে তফাৎ কোথায়? মহারাজ ছেলেটিকে বলছেন, তুমি কেন ধরে নিচ্ছ যে সাধুরা ভদ্রলোক হয় না, সাধু মানেই ভদ্রলোক, কিন্তু ভদ্রলোকের পরে তিনি আরও কিছু। সাধু মানে প্রথমে ভদ্রলোক, কিন্তু তারপরে আরও কিছু। তাহলে তফাতটা কোথায়? তোমার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য হল ভদ্রলোক হওয়া, আর সাধুদের জীবন ভদ্রলোক থেকে শুরু হয়। সাধুর যখন পতন শুরু হয়, পতন হয়ে হয়ে যখন একেবারে গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন সাধু শুধু একজন ভদ্রলোক থেকে যান। ভদ্রলোকের নীচে যদি চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে সাধুত্বের কোন গুণই তার মধ্যে ছিল না। ভদ্রলোক মানেই সত্ত্বগুণের আধিক্য তার মধ্যে অনেক বেশি। সাধুর চেষ্টা হয় সত্ত্বগুণের পারে যাওয়া। ফলে সত্ত্ব থেকে নীচে রজো বা তমোগুণে কখনই যাবে না। কিন্তু যিনি ত্রিগুণাতীত, এখানে ভক্ত যাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি কোন গুণের আঁটে নেই। সাধু এখনও ত্রিগুণাতীত হয়ে যাননি, ঈশ্বর দর্শন হয়নি, চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই সাধু সত্ত্বগুণকে ছাড়বেন না। ত্রিগুণাতীত সব গুণের পারে, সেইজন্য দেখা যায় কখন তিনি ভদ্রলোকের মত আচরণ করছেন, আবার অনেক সময় দেখা যায় ধর্ম ও অধর্মের পারে, আবার কখন দেখা যায় কিছুই করছেন না, স্তব্দ, চুপ করে বসে আছেন। তিনি যেটাই করেন তাতে একটা জিনিস বোঝা যায়, সব কিছু থেকে তিনি অনাসক্ত। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনটে অবস্থায় থাকতেন, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা আর অন্তর্দশা। বাহ্যদশায় তিনি কথা বলতেন, উপদেশাদি দিতেন, অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্যাকীর্তনাদি করতেন আর অন্তর্দশাতে সমাধিস্থ। ঠাকুরেরও তিনটে অবস্থা থাকত।

বলছেন *মত্ত ভবতি*, মত্ত শব্দটা খুব জটিল শব্দ। মত্ত শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়াবে যিনি নেশায় চূড় হয়ে আছেন বা বিভোর হয়ে আছেন। বিভোরের ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, মৌমাছি যখন ফুলে মধু পান করে, মধু পান করে যখন প্রাণ ভরে গেল তখন নিজের আনন্দ গুন্ গুন্ করে, এটাই মত্ত অবস্থা। চার পাঁচ মাসের শিশু দুধ খাওয়ার পর পেট ভরে গেল, ঘুমও পুরে গেছে। এবার সে নিজের মনের আনন্দে হাসছে, হাত পা ছুঁড়ছে, সিদ্ধ পুরুষদের ঠিক এই অবস্থা হয়। ওনাদের নিজের কোন ইচ্ছা বা কামনা-বাসনা থাকে না, সবটাই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে রেখেছেন, সেইজন্য আরও বেশি নিজের আনন্দে মত্ত হয়ে থাকেন। গীতায় ভগবান যেমন বলছেন, *অহং স চ মম প্রিয়ঃ*, ভক্ত জানে আমি তাঁর একমাত্র প্রিয় আর ঈশ্বরেরও একমাত্র প্রিয় এই ধরণের ভক্ত। সেইজন্য এনাদের আর জগতের কোন বোধ থাকে না। মজার ব্যাপার হল মত্ত ব্যাপারটার সাথে মধুপানের একটা যোগ আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আসে যেখানে মা বলছেন *গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্*, মা মহিষাসুরকে বলছেন, এখন তুই খুব করে গর্জন করে যা যতক্ষণ আমি মধুপান করছি। মধু মানে মিষ্ট পানীয় যেটা আগে সোমরস ছিল। শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকে ছান্দোগ্য উপনিষদে কয়েক জায়গায় মধু বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। উপনিষদেই মধু শব্দটা আসছে, উচ্চতম যে অনুভূতি সেই আত্মজ্ঞানকে মধু বলা হয়। যিনি আত্মজ্ঞানের মধু পান করেছেন তিনি মত্ত। জাগতিক জীবনে মানুষ যদি মদ খেয়ে নেয় তখন তার ভেতরের ভাবটা বেরিয়ে আসে। এটা হল একটা দিক, কিন্তু অন্য দিকটা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মদ খেলে ভেতরে যে প্রতিভা আছে সেটা তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি যিনি ভক্ত তিনি মত্ত হয়ে যান বলে তাঁদেরও যা কিছু প্রতিভা আছে সব তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই প্রতিভা সব সময় দুটোই থাকে, একটা আধ্যাত্মিকতার পরিপক্কতা আর নৈতিক শুদ্ধতা। উনি কোন অবস্থাতেই একের বদলে দুই দেখতে পান না, দ্বিতীয়তঃ কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা নৈতিকতার সাথে আর কোন আপস করতে পারবেন না।

নৈতিকতার মাপকাঠি আমরা সব সময় মনে করি চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, কিন্তু তা নয়, উচ্চতম নৈতিকতার স্তর যেখানে কারুর প্রতি কোন রাগ রাখা, কারুকে দ্বেষ করা, এনারা কোন পরিস্থিতিতেই এগুলো রাখবেন না। এটা একটা ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা এই জন্যই যে, আমরা একদিকে দেখছি একত্বের জ্ঞানের জন্য হয়, অন্য দিকে ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় এর আরও অনেক রকম মানে বেরিয়ে আসে। সূত্র কিনা, পরম্পরায় এর উপর যা যা বলা হয়েছ, সবটাই আসবে। ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি উপপতি করে আর তারপরেও যদি দেখে সে আমায় দেখছে না, তখন রাস্তায় বেরিয়ে উপপতির জামা ধরে টেনে বলে, তবে রে তোর জন্য আমি সব ছাড়লাম এখন আমায় দেখবি না। এর অর্থ হল, যে জিনিসগুলো তাকে সমাজে, সংসারে বেঁধে রেখেছে, সেই বাঁধনগুলো সব খসে পড়ে যায়, কিন্তু মূল জিনিসটা থেকে যায়। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে একেবারে মত্ত হয়ে গেছেন। তার আগে শ্রীকৃষ্ণ একটু একটু টোপ দিয়ে গোপীদের ছেড়ে দিচ্ছেন,

তাতে গোপীরা আরও উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছেন। আর মহারাসের যখন সময় এসে গেল তখন গোপীরা আর কোন কিছুকেই ধরে রাখতে পারছেন না। ঐ ভালোবাসার টানে গোপীদের এখন লোকলজ্জা, কুল, মান সব খসে পড়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসায় এমন মত্ত হয়ে গেছেন যে অন্য কোন কিছু আর তাঁরা নিতে পারছেন না। এটাই মত্ত হওয়ার লক্ষণ। ঠিক তেমনি সমাজে থাকার সময় এটাই দুটো দিকে বেরিয়ে চলে যায়। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসার টানে লোকলজ্জা, মান, কুল সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন আর সাধারণ অবস্থায় যে ভয় শঙ্কা থাকে সেগুলো খসে পড়ে যায়, ঠিক মাতালের মত। মদে চুর হয়ে যাওয়ার পর মাতালের খুড়ো, জ্যাঠার কোন বোধ থাকে না, সবাইকে সমান মনে করছে। ঈশ্বরের প্রেমে যাঁরা মত্ত হয়ে যান তাঁদের ঠিক এই অবস্থাটাই হয়। একদিকে ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সাংসারিকতার কিছু থাকে না, ঠিক তেমনি যখন সংসারের দিকে যান তখন এ ছোট এ বড় ঐ অর্থে আর সংসার করতে পারেন না। ঠাকুর বলছেন, আমি তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারব না। অন্য দিকে আবার অনৈতিক কিছুও করবেন না। কারণ অনৈতিকতার মানেই স্বার্থবোধ। তাঁর আর ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না, ঠাকুরের কথায় কাঁচা আমিটা থাকে না। এটাই মত্তের অর্থ।

এরপরে বলছেন *স্তব্ধো ভবতি*, স্তব্ধো মানে ঈশ্বর প্রেমের এমন চরম অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে সব বিচার করা বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্ম অধর্মের পারের এটাই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা। সাধারণ ভাবে স্তব্দ মানে থেমে যাওয়া, কিন্তু থেমে যাওয়া এই জন্যই নয়, তারপরের শব্দেতেই থেমে যাওয়াটা আছে, যখন বলছেন আত্মারাম। স্তব্দ মানে হয় থেমে যাওয়া আবার আত্মারাম মানেও থেমে যাওয়া। সূত্রকার কখনই একই জিনিসকে বলার জন্য দুটো আলাদা শব্দ আনবেন না। সেইজন্য এখানে স্তব্দ শব্দের অর্থ হবে ধর্ম অধর্মের পারে, যেটা এর আগে আমরা অনেক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। সিদ্ধ ভক্ত কখনই কোন বাঁধনে থাকেন না। আমাদের যত বড় বড় মহাত্মারা আছেন, বিশেষ করে ভক্তিমার্গের কবিরা, ঋষিরা, গোপীরা এনারা সবাই ধর্ম আর অধর্ম দুটোরেই পারে চলে যান। গোপীরা রাসের সময় যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাচ্ছেন তখন তাঁরা সবাই ধর্মাধর্মের পারে চলে গিয়েছিলেন। বলছেন স্তব্দ হয়ে যায়, স্তব্দ হয়ে যান মানে মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বুদ্ধি যখন সক্রিয় থাকে তখন বুদ্ধি কাজ করে। বুদ্ধি যখন কাজ করে তখন বুদ্ধি ধর্ম পথে রাখতে চায়। বুদ্ধি শাস্ত্রের কথা গুরুমুখে শুনেছে, গুরু মানে পিতা মাতাও হতে পারেন, বুদ্ধিও সেই মত আচরণ করে। যাদের মাথা খারাপ তারা অনেক উল্টোপাল্টা আচরণ করে, যাদের বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, যাদের আমরা চরিত্রহীন বলি, তারাও গোলমাল করে। কিন্তু এনারা ঈশ্বর প্রেমে এমন মগ্ন হয়ে গেছেন, সেখানে তাঁর ধর্ম ও অধর্ম অনেক নীচে পড়ে থেকে যায়। সতী স্ত্রীরা একটা দুটো পয়সা বাঁচিয়ে রাখে ভবিষ্যতের আপদ বিপদের থেকে বাঁচার জন্য। এভাবে তার কাছে কত টাকা জমেছে এর খবর কেউ কোন দিন জানতে পারে না। টাকা-পয়সা সবার জীবনেই খুব মূল্যবান, সতী স্ত্রীর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে যদি দেখে তার স্বামী কোন বিপদে পড়ে গেছে তখন সে আর কিছু তোয়াক্কা করে না, তার টাকা-পয়সা, গয়না যা কিছু আছে সবই বার করে স্বামীকে আগে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে তখন তার কোন এই ধরণের মূল্যবোধ গুলো আর থাকে না। আর সতী স্ত্রী যদি না হয়? ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, স্বামী মারা গেছে স্ত্রী নাকের নথ খুব কায়দা করে খুলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে সামলে রেখে তারপর আছাড় দিয়ে কাঁদবে।

শেষে বলছেন *আত্মারাম*, ভক্তির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আত্মারাম হয়ে যাওয়া। আত্মারামে তিনি বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছেন, বাইরের জগতের ব্যাপারে তাঁর আর কোন হুঁশই থাকে না। যারা মদ খেয় নেশা করে তাদেরও একই জিনিস হয় বা যাদের মন কারুর উপর খুব আসক্ত হয়ে আছে, কোন ছেলে কোন মেয়ের প্রতি পুরো obsessed হয়ে গেছে, তাদেরও হয়, এদেরও তখন কথাবার্তা আচরণ অসঙ্গত হয়ে যায়। আত্মারাম আর এরা এক নয়। আমরা যতগুলো শব্দকে নিয়ে আলোচনা করলাম তার মধ্যে আত্মারাম হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যেটা একজন ভক্তকে চিহ্নিত করে দেয়। জ্ঞানীকেও চিনিয়ে দেয় কিন্তু ভক্তকে আরও বেশি ভালো করে চিনিয়ে দেয়। আত্মারামের দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে সব থেকে ভালো পাই আর প্রতি মুহূর্তেই পাই। ঠাকুর সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার কামারপুকুর গেছেন। সেখানে তিনি একদিন চুপচাপ বসে আছেন, গ্রামের মহিলারা এসে তাঁদের গদাইয়ের সাথে কিছু কথা বলতে চাইছেন। তখন তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা সবাইকে বলছেন, ওকে এখন বিরক্ত করিস না, ও এখন সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন হয়ে ভাসছে। আমাদের খুব অবাক লাগে, গ্রামের একজন অশিক্ষিত মহিলা এই জিনিসটা কি করে বুঝতে

পারলেন, লীলাপ্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোন বৈষ্ণব সাধুর কাছে শুনে থাকবেন। ঠাকুরের অবস্থা দেখে তাঁরও মনে হল গদাই এখন সচ্চিদানন্দ সগরে মীনের মত ভাসছে। এই উপমাটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শেষ অবস্থায় শরীর অস্তিচর্মসার হয়ে পড়ে আছেন। সেই সময় স্বামী তুরিয়ানন্দজী এসেছেন, তিনি ঠাকুরকে দেখে বলছেন, আমি দেখছি আপনি তো আনন্দে ভাসছেন। উনিও ঐ একই কথা বলছেন, সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে আছেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, ওরে ধরে ফেলেছে রে। হরি মহারাজ সেখানে আনন্দের কথা বলছেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ সাগরে মীনের মত আনন্দে ভাসা, এখনও পর্যন্ত এর যত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হল, মাস্টারমশাই প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। সন্ধ্যাবেলা, ধূপধুনা দেওয়া হয়েছে, দরজা ঠেলে মাস্টারমশাই উঁকি মেরে দেখছেন ঠাকুর খাটে বসে আছেন। ঠাকুর দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করছেন, মাস্টারমশাইও উত্তর দিচ্ছেন। মাস্টারমশাই লক্ষ্য করছেন, ঠাকুর কেমন যেন অন্যমনস্ক। যেমন কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে, ফাতনাতে দৃষ্টি কখন নড়ে উঠবে, মন ঐদিকেই পড়ে আছে, কারুর সাথে কথা বলে না, ঠাকুরের ঠিক ঐ অবস্থা। ঠাকুরকে মাস্টারমশাই একটা দুটো প্রশ্ন করছেন, আপনার এখন বুঝি সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময়, ঠাকুরও বলছেন, না তেমন কিছু না। কথাগুলো ঠিক পরিষ্কার আসছে না। মাস্টারমশাই আবার বিদায় নিতে গিয়ে বলছেন, তাহলে এখন আসি। ঠাকুরও বলছেন, হ্যাঁ এসো। আত্মারামের অবস্থা কেমন হয় যদি বুঝতে হয়ে এটা হল আত্মারামের সব থেকে সুন্দর বর্ণনা। কথামৃতে মাস্টারমশাই ঠাকুরের সমাধি অবস্থার খুবই প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, আর সব আত্মারামেরই অবস্থা, কিন্তু ঠিক ঠিক আত্মারাম বলতে যে অবস্থা বোঝায়, সেই অবস্থার এই রকম বর্ণনা আর কোথাও নেই। আত্মারামে আমি ভাবটা, আমিত্বটা একটা বড় মাছ হয়ে যায়, আর তুমি মানে ঈশ্বর তিনি এক মহাসমুদ্র, ঐ সচ্চিদানন্দ মহাসমুদ্রে ঐ আমি আনন্দে নিজের মত ভেসে বেড়াচ্ছে, তার মনে ভয়ের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। তার সাথে বাহ্য জগৎ থেকে তিনি পুরোপুরি মৃত। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাইয়ের প্রথম দিন, তিনি তখনও জানেন না সমাধির অবস্থা কি, ভাবের অবস্থা কি। কিন্তু পরে জানলেন এটাকে ভাব বলে, সন্ধ্যার পর ঠাকুরের এই রকম ভাবান্তর হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গের সিদ্ধ পুরুষদের ঠিক এই অবস্থা হয়, কিন্তু সব সময় যে এই অবস্থায় থাকবেন তা না, অন্য কিছু করলেও ভেতরে আনন্দটা সব সময় থাকবে। আত্মারামও যখন এই রকম চুপ হয়ে নেই তখনও তিনি দেখেন জগতের সব কিছু, সব প্রানী ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি, সেইজন্য তিনি সবারই সেবা করেন। মায়ের যত রোগ থাকুক, শোক থাকুক সে তার ছোট্ট শিশুকে ভালো রাখার জন্য, সুখী রাখার জন্য সব কিছুই করবেন, সিদ্ধপুরুষ, যিনি আত্মারাম তিনিও এটাই করেন।

কথামৃতে একটা বর্ণনা আছে, একদিন মাস্টারমশাই একাকী এসে ঠাকুরের ঘরে ঢুকেছেন, ঠাকুর খাটে বসে আছেন আর চিন্তা করছেন। মাস্টারমশাই লিখছেন, ভক্তদের কিসে মঙ্গল হয় ঠাকুর সেই নিয়ে ভাবছেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আছেন, খেতে পারছেন না, পাশ ফিরে শুতে পারছেন না, সেই শশী মহারাজ ঠাকুরের সব কিছুর দেখাশোনা করতেন, দিনরাত ঠাকুরের সেবা করে যাচ্ছেন। একদিন শশী মহারাজ ঘুরে ঢুকে দেখছেন ঠাকুর কখন ঐ ছোট নীচু খাট থেকে নেমে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে দিতে কিছু নেওয়ার জন্য দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। শশী মহারাজ খুব আশ্চর্য হয়ে দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরকে বলছেন, আপনি এ কি করছেন? ঠাকুর তখন বলছেন, তোর গায়ে গরম কিছু পোশাক নেই, তোর শীত করে তাই এই গরম জামাটা তোকে দেওয়ার জন্য বার করতে যাচ্ছিলাম। এই ভালোবাসা, করুণা আত্মারামের লক্ষণ। এই ভালোবাসায় কোন জাগতিক সম্পর্ক নেই, কোন স্বার্থ নেই। মায়ের সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় তাও জাগতিক সম্পর্ক থাকে। কিন্তু আত্মারাম যিনি তাঁর নিজের জন্য আর কিছু লাগবে না। আশেপাশে যারা আছে, তাদের সেবা, তাদের কিসে মঙ্গল হয়, ভালো হয় এটাতেই ডুবে থাকেন। এই হল মত্ত, স্তব্দ আর আত্মারামের ব্যাখ্যা।

এখানে আমাদের কয়েকটি জিনিসের ব্যাপারে সংশয় হতে পারে। যেমন প্রথম সংশয় হতে পারে, এই যে বলছেন *মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি*, এতে কি তিনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাচ্ছেন? এখানে মনে রাখতে হবে ভক্ত কখন ঈশ্বর হন না, যদি এক হয়ে যান তাহলে সেটা আর ভক্তি হবে না। ভক্তি মানেই ঈশ্বর এক আমি আরেক। আমিত্ব থাকলেই ঈশ্বর থাকবেন আর যতক্ষণ আমিত্ব থাকবে ততক্ষণ ভক্ত আর ঈশ্বর কখন এক হবেন না অর্থাৎ আমি ঈশ্বর এই ভাবে হবে না। গীতায় ভগবান যেখানে বলছেন আমি তার প্রিয় সে আমার প্রিয়, সেখানে স্বরূপ জ্ঞানটা হয়। যেমন ছেলে জানে মা আমার, মা জানে ছেলে

আমার। ছেলে আলাদা হয়ে যাক, দূরে চলে যাক, যাই হয়ে যাক ছেলে জানে মা আমার জন্যই আছে। কিন্তু এটা আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখছি। জাগতিক দৃষ্টিতেও যদি দেখা হয় তাতে মা আর সন্তানের যে ভালোবাসা সেখানে সন্তান কখনই মা না কিন্তু সন্তানের অস্তিত্ব আর মায়ের অস্তিত্ব অভিন্ন। সেইজন্য এর আগেও বলা হয়েছিল, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এই তিনটে ভক্তি মানে কিন্তু সাযুজ্যকে মানবে না, আমিই রামকৃষ্ণ, ভক্তিতে এই জিনিস হবে না। তবে ভাগবতে রাসলীলার এক জায়গায় গোপীরা কৃষ্ণ প্রেমের বিরহে এমন বিভোর হয়ে আছেন তখন একজন গোপী সখীদের বলছেন, আমি কৃষ্ণ হয়েছি। কিন্তু সেখানেও আমিটা আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বিভোর হয়ে গোপীরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্ধকার রাতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণও খুব করে গোপীদের আপ্যায়ন করেছেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি ঐ অন্ধকারে গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। শুধু তাই না, পরে গোপীরা আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণ একজন বিশেষ গোপীকে নিয়ে তাঁদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। গোপীরা এখন কী করবেন! সবাই যমুনা পুলিনে এসে শ্রীকৃষ্ণ যা যা লীলা করেছেন, সেগুলোকে নিয়ে গান করছেন, অভিনয় করছেন। সেই সময় একজন গোপী বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি। আমি কৃষ্ণ হয়েছি যখন বলছেন তখন সেখানেও *অহং ব্রহ্মাস্মি* ভাবটা আসে। *অহং ব্রহ্মাস্মি* আর আমি কৃষ্ণ হয়েছি একই ভাব মনে হয়। কিন্তু তা নয়। বেদান্ত খুব ভালো করে অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, অহম্ বলা মানে তোমার অহং এই উপাধিটা সরাও আর ব্রহ্ম এর যা উপাধি আছে সেটাও সরাও, এরপর যা থাকবে। ঠাকুর বারবার বলছেন তখন যা হয় তা মুখে বলা যায় না। গোপীরা মুখে বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি, তার মানে আমিটা থেকে যাচ্ছে। আমি কৃষ্ণ হয়েছি বলাটা একটা বাচ্চা যেমন বলে আমি বাবা হয়েছি, পাঁচ বছরের ছেলে বাবার জামা জুতো কোন রকমে গলিয়ে দিয়ে বলে আমি বাবা হয়েছি। তাই বলে কি সে বাবা হয়ে যাবে? বাবার ভাবটা ভেতরে নিয়েছে। গোপীরা যে বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি আর বেদান্ত *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা।

সত্যি কথা বলতে এই দুটো কথাকে যখন আনা হয় তখনই জ্ঞান আর ভক্তির তফাৎটা বোঝা যায়। *অহং ব্রহ্মাস্মি*তে বলছেন এই অহম্ কে, ভালো করে বিচার করে দেখ আমিটা কে। দুটো পেঁয়াজ নিজেদের বলছে আমিও যা তুইও তাই। কি করে এক হবে! দুটো পেঁয়াজ কখনই এক হবে না। হবে, দুটো পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে যেতে যেতে শেষে দেখা যাবে দুটোরই ভেতরে কিছু নেই, যা আছে দুটোরই একই জিনিস আছে, শুধু আকাশ। তাই বলে ভগবান তো আকাশ নন, একটা ভাবকে বোঝানর জন্য বলা হল। অহং বলতে যা বোধ হয় এর উপাধিকে সরিয়ে দাও, ব্রহ্ম বলতে যা বোধ হয় তার উপাধিকেও সরিয়ে দাও, তারপর যা থাকবে সেটা আর মুখে বলা যাবে না। এটাকে onenessও বলা যাবে না, সেইজন্য বলা হয় অদ্বৈতম্, যেখানে দুই নেই। দুই নেই তাহলে কি এক আছে? একও নেই, এক থাকলে তো বলতেন এক আছে, কিন্তু এক তো বলছেন না, বলছেন দুই নেই। তাহলে কি আছে এবার সাধনা করে করে বুঝতে থাক। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে বলে শেষে সেই এক ঈশ্বর আছেন, বৌদ্ধরা বলেন শূন্য, হিন্দুরা বলেন অদ্বৈত, যার কোন দুই নেই, যা আছে মুখে বলা যাবে না।

আমি কৃষ্ণ হয়েছি, গোপী এখানে আবদার করে বলছেন, কৃষ্ণের পূর্ণ ভাব আমার মধ্যে, তাই বলে আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি সেই অর্থে হবে না। ভক্ত কখনই বলবে না যে আমি ঈশ্বর। ভক্ত বলে আর ঠাকুরও বলছেন চিনি আস্বাদ করতে চাই চিনি হতে চাই না। আর সাধনার পথে যদি নিয়েও যাওয়া হয় তাও ঐ ভাব কখনই হবে না। কারণ ঈশ্বর হলেন সর্বনিয়ন্তা, তিনি ঈশ যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যা কিনা জীব কোন দিন হতে পারবে না। ঈশ্বর সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, স্রষ্টা আর তার সৃষ্টি কখন এক হয় না, দুটো সব সময় আলাদা থাকবে। ঈশ্বর সব সময় মালিক, জীব সময় তাঁর অধীনে, তাই দুজন কোন দিন এক হবে না। কিন্তু তিনি কখন সখন কারুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে কৃপা করে বলেন, আয় তুই আমার পাশে এসে বোস, আমিও যা তুইও তা। জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে উপাধি চলে যায়। উপাধি যখন চলে যায় তখন কি হয় এটা কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব কথা একদিন শুনলে কিছুই ধারণা হবে না, শুনতে শুনতে আর এর মধ্যে পড়ে থাকলে একদিন হঠাৎ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরের সূত্রে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা করছেন –

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ।।৭।।

ভক্তিকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে দেখছি। জ্ঞাত্বা, লব্ধা, মত্ত এই ধরণের অনেক শব্দ আনা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এত আলোচনা শুনে আমাদের মনে হয় এখানে চাওয়ার কিছু নেই। এই সূত্রে এটাই বলছেন, *সা ন কাময়মানা*, ভক্তি পুরো ত্যাগের ব্যাপার, ভক্তি মানেই ত্যাগ। লব্ধা মানে তো লাভ করা, লাভ করা মানেই চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করা মানেই কোন কামনা ছিল। কিন্তু বলছেন *সা ন কাময়মানা*, ভক্তির কোন কামনা নেই। তাহলে ওখানে লব্ধা কেন বললেন? লব্ধা বলা মানে, ভাই তোমাকে চেষ্টাটা করতে হবে। ভক্তি কখন তাঁর কৃপায় হয় না, নিজের চেষ্টা না থাকলে ভক্তি সুদূর পরাহত হয়ে থেকে যাবে। চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে, চেষ্টা থাকলে তারপর তিনি কৃপাও করেন। চেষ্টা জিনিসটা করতে হবে, সেইজন্য লব্ধা বলছেন। ভক্তি মানেই আমি কিছু একটা চাইব, এই ভুল যাতে না হয়ে যায় সেইজন্য সাত নম্বর সূত্রে এসে খুব নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন *সা ন কাময়মানা*, কোন ধরণের কামনা থাকবে না, কোন ধরণের ইচ্ছা থাকবে না। তাহলে আর্ত, অর্থার্থী এদের কি হবে? এরা আর যাই হোক ভক্ত বলে গণ্য হবে না। ভগবান বলছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং*, এরা আমার ভজনা করে। ভজনা করা মানেই যে ভক্ত হয়ে যাবে তা না। সেইজন্য বলছেন *তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত*, জ্ঞানীদের ভগবান শ্রেষ্ঠ বলছেন। এরা ভজনা করে ঠিকই কিন্তু ভক্ত নয়। কেন ভক্ত নয়? কারণ *সা ন কাময়মানা*, আত্মারাম যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, তারপরেই *সা ন কাময়মানা* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরোধরূপত্বাৎ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে কি ঠাকুর শোনেন? কথামৃতে ঠাকুর নিজেই বলছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। কিন্তু বাচ্চারা কত আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করে, আমার অঙ্কের মাস্টার যেন আজ অসুস্থ হয়ে যায়, অমুক মাস্টারের যেন অমুক হয়ে যায়। বাচ্চাদের মত শুদ্ধ নির্মল আর কে আছে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে বাচ্চাদের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হয় না। এই সূত্রে এর ব্যাখ্যা আছে। এখানে সরাসরি বলে দিচ্ছেন *সা ন কাময়মানা*। ভক্তিতে যত যা কিছু বলা হয় সব অর্থবাদ। বেদের কাজ ছিল মানুষকে দিয়ে কোন রকমে ধর্মের বা আধ্যাত্মিক কিছু কর্ম করিয়ে নেওয়া। তার জন্য প্রচুর টোপ দেখান হত, এই যজ্ঞ করলে তুমি স্বর্গে যাবে, অমুক যজ্ঞ করলে তোমার শত্রু নিধন হবে, অমুক যজ্ঞ করলে তোমার পুত্র হবে ইত্যাদি, মানুষ করে করে করাটা ছেড়ে দেয় আর পাওয়াটাই মনে রাখে। বাচ্চাকে যেমন টোপ খাইয়ে দুধ খাওয়ানো হয়, দুধ খেয়ে নাও তাহলে ফর্সা হয়ে যাবে, তোমার চুল লম্বা হয়ে যাবে। বাচ্চাও ফর্সা হওয়ার লোভে দুধটা খেয়ে নেয় কিন্তু ফর্সা-টর্সা কিছুই হয় না, তবে দুধটা খাওয়ানো হয়ে যায়। ভক্তিতেও সেই উদ্দেশ্য ছিল, তোমার কি হয়েছে? আমার এই এই ঝামেলা হয়ে গেছে। জপ-ধ্যান কর সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই কি সব ঠিক হয়ে যাবে? এই জায়গাতে এসে সত্যিকারের একটা বিভাজন রেখা এসে যায়। এর উত্তরটা আছে সাত নম্বর সূত্রে, *সা ন কাময়মানা*। এখানে শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলছেন, পরা ভক্তির কথা বলছেন। আরেকটা জিনিস জানার আছে সিদ্ধ পুরুষের যা হয় সাধনা রূপে ঠিক তাই হয়।

গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, ঈশ্বরের পথে যাঁরা চলে যান তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন আমি নিজেই তা বয়ে নিয়ে আসি। ঠাকুরের জীবনে এই ধরণের কিছু কিছু বর্ণনা আছে, তবে ঠাকুর খুব কষ্ট করে পেয়েছেন, শ্রীমাও খুব কষ্ট করে পেয়েছেন। দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কেউ ভালো কিছু পেয়ে গেলে ঈশ্বরের প্রতি এমন কৃতজ্ঞতা দেখান যাতে মনে হয় ঈশ্বর নিজেই তাঁকে দিয়ে গেছেন। খুব ভালো করে যাঁরা বিচার করেন, অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরা দেখেন ঈশ্বর কোন প্রার্থনাই শোনেন না, কিন্তু একটা প্রার্থনা শোনেন। যদি ভাবেন ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন না তখন আমাদের মনে হবে হয় তিনি কঠোর আর তা না হলে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, সেইজন্য শোনার কোন প্রশ্নও নেই। কিন্তু তা নয়, কেউ যদি ত্যাগের জন্য প্রার্থনা করেন তখন প্রত্যেকটাই সত্য হবে। কারুর হয়ত টাকার দরকার, টাকার দিকে তার মন আছে। এখন সে দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু করে কালীঘাটের কালীর কাছে একশটা করে পাঠাবলি দিক, খুব করে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা করে বলতে থাকুক লটারীতে এক কোটি টাকার ফার্স্ট প্রাইজটা যেন আমি পেয়ে যাই। লটারী পাবে কি পাবে না? লক্ষ লক্ষ লোক লটারী কাটছে, ভগবান চাইলেও লক্ষ লোককে ফার্স্ট প্রাইজ দিতে পারবেন না, দিতে হলে একজনকেই দিতে পারবেন। সেই একজন কি আপনি হবেন নাকি বাকিরা হবে কেউ বলতে পারবে না, ভগবান এখানে কিছু করতে পারেন না। কদাচিৎ যদি কাকতালীয় ভাবে লেগে যায় তখন বলবে, দেখ দেখ ঠাকুরের কী কৃপা। কিন্তু এবার যদি কেউ মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর! টাকার প্রতি আমার এত

আসক্তি যে আমি অন্য কোন দিকে মন দিতে পারছি না, তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও যাতে আমি তোমার দিকে মন দিতে পারি। এর পরে কি হবে বলা খুব মুশকিল। তিনি তাকে সত্যিই কিছু টাকা দিয়ে দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা যাবে তার মন থেকে টাকার চাহিদাটা চলে গেছে। যে কোন লোক যদি সাত দিন ধরে লাগাতার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যে প্রার্থনায় ত্যাগ রূপ আছে, দেখা যাবে হুট করে সেটা হয়ে যাবে। কিন্তু কাম রূপে না, নিরোধ রূপে প্রার্থনা করতে হবে।

ভক্তের সমস্যা কোথায়? জীবনে সে কি চাইছে? জ্ঞান ভক্তি ছাড়া তো তার চাওয়ার কিছু নেই। জীবনের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য লাভ করা। জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য লাভের ব্যাপার যেখানে থাকে সেখানে কোন জাগতিক কামনা-বাসনা থাকতে পারে না। সবারই জীবনে মনে পাঁচ রকম সমস্যা আছে, পাঁচ রকম চাহিদা আছে, আমরা টাকা-পয়সা চাইছি, সংসারে ভোগের প্রতি বিরাট টান আছে, আর নামযশের চাহিদা, এই তিনটের বাইরে চাওয়ার আর কিছু নেই। এই তিনটেই নানান রূপে আসে। ধরুন আমার মনে একটা দুঃখ আছে, সবার নিজের বাড়ি আছে আমার নিজস্ব কোন বাড়ি নেই যদি একটা বাড়ি হত আমি শান্তি পেতাম। এও কাঞ্চনেরই একটা রূপ। আমি যদি ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে প্রার্থনা করি, ঠাকুর তুমি যদি আমাকে একটা বাড়ি করে দাও আমার মনটা শান্ত হয়ে যাবে, ঠাকুর কোন দিন এই প্রার্থনা পূরণ করবেন না। কিন্তু যদি প্রার্থনা করা হয়, হে ঠাকুর! একটা বাড়ির জন্য আমার মন কি রকম আসক্ত হয়ে আছে, তুমি এমন কিছু করে দাও যাতে আমার মনটা সরে আসে। এবার বলা খুব মুশকিল কি হবে, হয়ত একটা বাড়ি হয়ে যেতে পারে অথবা বাড়ি না হয়ে এমন একটা কিছু হয়ে যাবে যার ফলস্বরূপ যে মন বাড়ির জন্য আসক্ত হয়ে আছে, সেখান থেকে মনটা সরে আসবে। কারণ ভগবান সব সময় নিরোধ রূপে কাজ করেন। কেন নিরোধ রূপে কাজ করেন? কারণ আত্মার স্বভাবই হল আত্মা কক্ষণ কোন কিছুর সাথে জড়ায় না। বেদান্তের দৃষ্টিতে প্রার্থনা যখন করা হয় তখন আত্মা বা পুরুষকে বলা হচ্ছে তুমি প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়। পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যের স্বভাবই হল সে জড়কে ছেড়ে দেয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা মানেই এটা তিনি করবেনই করবেন, আন্তরিক প্রার্থনা যদি হয় এটা হবেই হবে। জড়ের কোন ক্ষমতাই নেই যে চৈতন্যকে বেঁধে নেবে। কাঠ আগুনকে কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

প্রার্থনা তাই সব সময় একটা ক্ষেত্রেই কাজ করে, *সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*। ঠাকুরের কাছে যখনই আন্তরিক প্রার্থনা করা হয়, ঠাকুর আমার মনে এই ধরণের একটা দুর্বলতা আছে, এই ধরণের একটা তীব্র আসক্তি আছে, মন সব সময় ঐদিকে চলে যাচ্ছে, তুমি কৃপা কর ঠাকুর। এবার তার ঐ দুর্বলতা যাবেই যাবে। আজ পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি যে এই প্রার্থনা কাজ করছে না। আর যুক্তিতেও জিনিসটা ঐ জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ায়, তার সাথে শাস্ত্রও তাই বলছে, *সা ন কাময়মানা*। এটা একেবারে extreme থেকে বলছেন আর আমরা যেটা বললাম সেটা আমাদের standard থেকে বলা হল। কেন এই রকম হয়? *সা ন কাময়মানা* মানে তাঁর মধ্যে কোন বাসনাই নেই, কাম আসবে কোথা থেকে! কিসের কামনা হবে, তিনি তো সব ছেড়ে তাঁর মধ্যে মত্ত হয়ে ডুবে গেছেন। সেইজন্য কক্ষণ তাঁর কোন ধরণের কামনা থাকে না।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ভক্তিকে নিয়ে অনেক রকমের থিয়োরী এনেছেন, পিতৃপুরুষদের উপাসনা থেকে হয়েছে, কামনা চাহিদা থেকে হয়েছে, একটা অতিন্দ্রীয় শক্তি দিয়ে কিছু পেতে চাওয়া থেকে হয়েছে। এই থিয়োরী গুলো চলতে চলতে ফ্রয়েড এলেন, ফ্রয়েড মানসিক ভাবে খুব দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। ফ্রয়েড সব জায়গায় লিবিডো আর মর্টিডো দেখতেন। লিবিডো মানে কামের ইচ্ছা আর মর্টিডো হল মেরে দেওয়ার ইচ্ছা। বর্তমান যুগে যেমন সিনেমায় সেক্স আর ভায়োলেন্স দেখান হয়, ফ্রয়েডও সেক্স আর ভায়োলেন্স ছাড়া কিছু জানতেন না। জগতের সব কিছুকে তিনি এই দুটো দিয়ে ব্যাখ্যার করে দেবেন। বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, ওনার আগেও এই বিজ্ঞান ছিল কিন্তু উনি হলে প্রধান স্তম্ভ। আপনি আমি যেটাই বলি না কেন সেখানেই তিনি দেখবেন লিবিডো, লিবিডোকে তিনি নানান রকম নাম দিয়েছেন। যদি কেউ বলে, দেখ ওনার জামাটা কি সুন্দর, আমি হয়তো বললাম হ্যাঁ সুন্দর। তখন তিনি বলবেন, তোমার মনে sex desires আছে সেইজন্য ওর সৌন্দর্য দেখছ। আমি যদি বলতাম, সেই রকম তো সুন্দর নয়। তখন বলবেন, তোমার মনে যে sex deisre রয়েছে, সেটা আমি যাতে না জানতে পারি, সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য জামার সৌন্দর্যকে তুমি অস্বীকার করছ। জগতে যা কিছু আছে, সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ছবি, ভাস্কর্য সব কিছু ফ্রয়েড এইভাবে লিবিডো

আর মর্টিডো দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। তিনিই হলেন আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জনক, যদিও আগেই ছিল, কিন্তু তিনি পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে নিয়ে এলেন। লিবিডো কি রকম বলতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করছেন, একটা বাচ্চা ছেলে যখন মাকে ভালোবাসছে তখন এটাও লিবিডো। বাচ্চা ছেলে মাকে ভালোবাসছে কেন? ওখানেও সেই ফিমেল ভালোবাসা। আর বাবার প্রতি ছেলের সব সময় থাকে মর্টিডো, বাবার সব সময় ক্ষতি করতে চায়। কী সব থিয়োরী কল্পনাই করা যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের যে সমাজ, তার ফাউণ্ডার হলেন ফ্রয়েড। উনি ধর্মকেও লিবিডো মর্টিডোতে ব্যাখ্যা করে দিলেন। বলি প্রথা শুধু ভারতেই নয় সব ধর্মেই মোটামুটি আছে, ফ্রয়েড বলছেন, ভেতরে যে হিংসার ভাব আছে সেটা ধর্মে গিয়ে বেরোয়, সেইজন্য বলি দেওয়া হয়। আর পূজোর প্রথা এসেছে লিবিডো থেকে। আবার ঐতিহাসিকরা ধর্মের এই জিনিসগুলোকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন, পিতৃপুরুষদের পূজার প্রথা ছিল, তাদের অনেক রকম চাহিদা ছিল ইত্যাদি। পাশ্চাত্যের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা সব সময় কামের চারিদিকেই ঘুরঘুর করে। ভারতবর্ষের যে মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ সেখানে রয়েছে চাহিদা, শত্রুকে মারতে হবে যজ্ঞ কর, রাজা হতে চাইছ যজ্ঞ কর, সন্তান চাই যজ্ঞ কর। মহাভারতে এসে আবার বলছেন, মন্ত্রশক্তি দিয়ে দেবতাদের পর্যন্ত বেঁধে নীচে নামিয়ে আনা হবে। এখানেও সেই একই অর্থ, তোমার যা যা কামনা আছে সব পূরণ হয়ে যাবে। কতটা পূরণ হত আমাদের জানা নেই, কারণ এই কাহিনী কতটা সত্য কতটা অর্থবাদ আমাদের জানা নেই। মেনে নিতে হয়, আর ধর্মের একটা সংস্কৃতি যখন চলে তখন ওটাকে মেনেই চলতে হয়, কখন তাকে নাকচ করা যায় না।

যতই কামের কাহিনী বলা হোক, ভক্তিশাস্ত্রে ঠিক ঠিক যখন কেউ ঢুকছে তখন তার জন্য হয়ে যাচ্ছে *সা ন কাময়মানা*। আর যত কামের থিয়োরী, ফ্রয়েড থিয়োরী দিচ্ছেন, বেদে এই রকম বলছেন, মহাভারতে এই রকম বলছেন আর সারা ভারতবর্ষের লোক, সারা পৃথিবীর লোক দেবী দেবতা, ঠাকুরের কাছে এসে মাথা ঠুকছে, ঠাকুর আমার সন্তানকে ভালো করে দাও, ঠাকুর আমার যেন এটা হয়, সেটা হয়, এই কামনা জিনিসটা আমরা যেভাবে সহজ করে বুঝি সেটাকে কখনই ভক্তির সঙ্গে সমান করা যায় না। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তিই আসল ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তিতে কখনই কোন রকমের চাহিদার ব্যাপার থাকতে পারে না। তাহলে ভালোবাসা, চাওয়া, পাওয়া এগুলো কেন বলছেন? এগুলোকে বলে প্রতীক। রাসলীলায় পরা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। পরা ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেমকে আমাদের ভাষা, ভাব, ধারণা দিয়ে বর্ণনা করা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় প্রেমকে খুব কাছাকাছি বোঝাবার জন্য ঠাকুর সতীর পতির প্রতি টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান ইত্যাদির কথা বলছেন। আবার ঠাকুর পরকীয়া প্রেমেরও তুলনা নিয়ে আসছেন। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন নিজের স্বামী যেমন তেমন অপরের স্বামীকে রসরাজ বলে মনে হয়। ঠিক তেমনি কোন পুরুষ যদি অপরের স্ত্রীকে ভালোবাসে ওই ভালোবাসার গভীরতা প্রচণ্ড। জার্মানের খুব নামকরা দার্শনিক ছিলেন কান্ট, তিনি নিজের ভাবগুলো বোঝানর জন্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করলেন। একটা শব্দকে তিনি কয়েক পাতা ধরে ব্যাখ্যা করতেন, ব্যাখ্যা করার পর ঐ শব্দের উপর নিজের দর্শনটা লিখতেন। সেইজন্য কান্টকে বোঝা অসম্ভব। অনেক সময় তিনি আগে প্রচলিত শব্দগুলোকে ব্যাখ্যা করতেন। কারণ এই জিনিসগুলো এতই কঠিন যে প্রতীক ছাড়া বোঝান সম্ভব নয়। কিন্তু সবাই আর ইম্যানুয়াল কান্ট নয় আর সবাই ইম্যানুয়াল কান্টের পাঠকও নয়। ঋষিরা যাঁরা লিখছেন তাঁদেরকেও এই ভাবটা অন্যদের বোঝাতে হবে। ঋষিরা তখন সাধারণ জীবনে যে ভাবগুলো সচরাচর চলে আসছে সেখান থেকে সেই ভাব ও তার প্রচলিত শব্দগুলোকে এনে বুঝিয়ে দিলেন। এমনিতে ভালোবাসা বলতে আমরা সব সময় বুঝি একটা চাহিদা বা অপূর্ণতার কিছু আছে। আমাদের একটা ধারণা হয়ে আছে যে, যারা বাড়িতে ভালোবাসা পায় না তারাই ভগবানের দিকে যায়। কিন্তু তা কেন হবে, অপূর্ণ ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তারা ভগবানের দিকে যায় না।

সেইজন্য হিন্দু শাস্ত্রে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শান্ত এই চারটে খুব প্রচলিত ভাবকে অবলম্বন করে ভক্তি সাধনার কথা বলা হয়। শুধু ভক্তি শাস্ত্রেই নয়, এমনকি বেদেও ভগবানকে সব ভাব নিয়ে পূজা করা হয়েছে, এমন কোন মানবিক সম্পর্ক নেই যেটা দিয়ে ভগবানকে পূজা করা যায় না। বিদেশীদের ধর্মে এই সমস্যা আছে। জুদাইজিমের ধর্মে ভগবান একজন খুব কঠোর মালিক আর খ্রীশ্চান ধর্মে ভগবান শুধু বাবার মত। কিন্তু ভগবানকে মায়ের মত ভাবা, যদিও খ্রীশ্চান ধর্মের মেরীকে আধার করে একটু মায়ের মত ভাবা এসেছিল কিন্তু বন্ধু ভাবে ভগবানকে ভালোবাসার কথা শুনলে ওদের মাথা ঘুরে যাবে। কোন ধর্মেই ঈশ্বরকে

বন্ধু ভাবে দেখা ভাবতেই পারে না। ভারতের তিনটে ধর্ম, জৈন, শিখ আর বৌদ্ধ আর বিদেশীদের চারটে ধর্ম তাছাড়া সিন্টো, তাও যেখানে যত ধর্ম আছে, ওরা বলবে ভগবান বন্ধু হতে পারে, তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! অথচ আমরা বলছি *ত্বমেব বন্ধুশ্চসখা ত্বমেব*। গোপাল বালকরা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধু সখা ভাবে ভালোবেসে ছিল, অর্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণ, সুদামা বন্ধু ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। সুদামার সাথে একবারই শ্রীকৃষ্ণের দেখা হয়েছে, যদিও সন্দিপনী মুনির আশ্রমে একসাথে ছিলেন, কিন্তু অর্জুনের সাথে ভগবানের গভীর সখ্য ভাব আগাগোড়া ছিল। যুধিষ্ঠির আবার ভগবানকে ছোটভাই রূপে দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠির সব সময় সচেতন ছিলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করছেন। ভীম আবার তাঁকে অন্য ভাবে দেখছেন। ঠাকুর আবার বর্ণনা দিচ্ছেন, যদিও এই বর্ণনা মহাভারতে নেই, শরশয্যায় ভীষ্ম কাঁদছেন, ভগবান যাদের সাথে সব সময় আছেন তাদেরই এই অবস্থা। ভীষ্মও সব সময় সচেতন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, সেইজন্য ভগবানের সাথে সম্পর্কের ইতি করা যায় না। সেইজন্য যদি কোথাও কোন ভাবে শুধু ভালোবাসা, কাম আর গোপীদের নিয়ে আসা হয় তাহলে খুবই দুর্ভাগ্যের হয়ে যাবে। কারণ হিন্দু ধর্মে এই অনুমতি দেওয়া হয় না। সুফীদের মধ্যে এই ভাবটা আছে, খ্রীশ্চানদের মধ্যেও কিছু কিছু আছে যেখানে বলছেন, Jessus has bright broom, কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীনিরা যীশুকে পতি ভাবে দেখেন। কিন্তু এত ধরণের বিচিত্র ভাবের কথা হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই। এতেই বোঝা যায় এখানে কাম ভাবের কোন লেশ থাকতে পারে না। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ভগবানকে শিশু রূপে পূজা করা। মেরীর কোলে যীশুর ছবি বা মুর্তি আছে, কিন্তু আমরা যে অর্থে বালগোপালের পূজা করি সেইভাবে মেরীর কোলে যীশুর পূজা হয় না। বালগোপালের যেখানে পূজা করা হচ্ছে সেখানে কোথায় কিসের কামনা থাকবে।

কেন কোন কামনা-বাসনা হয় না বলতে গিয়ে বলছেন *নিরোধরূপত্বাৎ*। এর আগে জ্ঞাত্বা শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল আত্মজ্ঞান যেভাবে হয় ঠিক তেমনি ভক্তিতেও হয়। অন্য কত রকমের ভালোবাসা আছে, ভালোবাসায় কত রকমের চাহিদা আছে, কিন্তু যে ভালোবাসায় চাহিদা থাকে না তখন সেই ভালোবাসাই ভগবানের দিকে চলে যায়। নিরোধ মানেই তাই জিনিসটাকে আটকে দেওয়া। কি আটকে দেওয়া? কোন কামনা-বাসনা থাকবে না, কোন ইচ্ছা থাকবে না। এটাকে পরের সূত্রে ব্যাখ্যা করছেন –

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ।।৮।।

যারা তর্কাতর্কি করতে চাইবে তারা আপত্তি তুলে প্রশ্ন করবে কিসের নিরোধ? তার উত্তরে বলছেন *লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*। এখন একটু একটু করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করছেন, *লোকবেদব্যাপার* মানে জাগতিক বা লৌকিক যত রকম কর্ম আছে আর বৈদিক যত কর্ম আছে তার *ন্যাসঃ*। *ন্যাসঃ* মানে ফেলে দেওয়া, কিন্তু এর দুটো অর্থ হয়, ত্যাগের অর্থেও হয় আবার পুরো জিনিসটাকে পবিত্র করে দেওয়াও হয়। পূজার সময় পূজক যেমন অঙ্গন্যাস, করন্যাস করছেন তখন এর দ্বারা পুরো জিনিসটাকে দিব্য ভাবে রূপান্তরিত করে দেওয়া হল। কারণ লোকবেদ, সাংসারিক কাজকর্ম তো পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যায় না, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া যাবে না, জামা-কাপড় পড়া ছাড়া যাবে না, সেইজন্য *লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*, যে জিনিসগুলোকে ছাড়া যেতে পারে সেই জিনিসগুলোকে ছেড়ে দেওয়া আর যে জিনিসগুলোকে ঈশ্বরে সমর্পিত করা যেতে পারে বা ভক্তি ভাবে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখা যেতে পারে, সেই রূপে সেগুলোকে নেওয়া। যেমন ঠাকুর বলছেন টাকা মাটি মাটি টাকা, বলে দুটোকেই ছুড়ে ফেলে দিলেন, ঠাকুর ন্যাস করলেন। শ্রীশ্রীমা সেই টাকাকে কপালে ঠেকিয় গুছিয়ে সুন্দর করে রাখছেন, এটাও ন্যাস। কারণ ঠাকুর টাকাকে বস্তু রূপে ত্যাগ করেছেন, মা সেই টাকাকে লক্ষ্মী রূপে গ্রহণ করে নিলেন। দুটো ক্ষেত্রেই টাকা রূপে জিনিসটা থাকল না, মায়ের কাছে লক্ষ্মী রূপে আর ঠাকুরের কাছে ত্যাগ রূপে, দুটোই ন্যাস। এখানে *লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ* দুই অর্থেই বলছেন, বেশির ভাগ জিনিসকে তিনি ফেলে দেন, আর যে জিনিসগুলো থেকে যায় সেগুলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত করে রেখে দেন। এখন বলছেন, লোকবেদব্যাপারে কিন্তু ধর্মকার্যও যুক্ত, যত রকমের ধর্মকার্য, কর্তব্য কর্ম সবটাই তার ন্যাস হয়ে যায়। তার মানে ধর্মীয় যে কর্তব্যগুলো থাকে, যেমন তীর্থে যাওয়া, জপধ্যান করা, ধর্মীয় কর্ম বলতে আমরা যেগুলোকে বুঝি, সবটারই তিনি ন্যাস করে দেন। ঠাকুরও করেছিলেন, সব রকম সাধনাদি করার পর ফলহারিণী কালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমায়ের পূজো করে সব কিছু মায়ের চরণে সমর্পণ করে দিলেন। এই জায়গাতে এসে তাঁর যত রকমের বাসনা, যত রকমের সামাজিক, লৌকিক কর্তব্য, মা-বাবার প্রতি কর্তব্য

সবটাই ওখানে ন্যাস করে দিচ্ছেন, যত রকমের ধর্ম অধর্ম আছে সব ওখানে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, এখন তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কোন কিছুতেই নেই। বেশির ভাগ জিনিস তিনি ছেড়ে দেন, তিনি আর পারেনও না করতে, তার মধ্যে ধর্মের যে কর্তব্য গুলো আছে, এত জপ করতে হবে, এত ফুল দিতে হবে, এগুলোও আর করেন না। মাস্টারমশাই প্রথম দিন ঠাকুরের ঘরে সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পর গেছেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি বুঝি এখন সন্ধ্যাদি করবেন। ঠাকুর বলছেন, তেমন কিছু না। ঠাকুরের কাছে সন্ধ্যা-আহ্নিক করা তেমন কিছু না, কিন্তু আমরা এখনও ঐ অবস্থায় যাইনি, তাই আমাদের কাছে ধর্ম, অধর্ম, জাগতিক, আধ্যাত্মিক এই জিনিসগুলো যাবে না। আমাদের প্রথমে কামনা-বাসনা গুলোকে একটা একটা করে ফেলতে হবে। কামনা-বাসনা গুলো ফেলে দিলে সামাজিক দায়ীত্ব বোধটাও স্বাভাবিক ভাবে চলে যায়। সামাজিক দায়ীত্ব বোধ চলে যাওয়ার পর শেষে ধর্ম অধর্মের পারে চলে যায়।

কেউ বলতে পারেন এগুলো জেনে আমি কি করব? বড়রা যেটা করেন আমাদের জন্য সেটাই অনুকরণীয়। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে সংসারীরা এক আনা ত্যাগ করে। যখন দেখবে এই ধরণের সিদ্ধ পুরুষরা সব কিছু ছেড়ে দেন তখন সাধারণ মানুষও একটু একটু করে ত্যাগ করবে। পরা ভক্তিতে যেতে হলে ধর্ম, অধর্ম, কর্তব্য বোধ এগুলোর পারে যেতেই হবে, *লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*, এর কোন রকম আপোষ হবে না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, কিছু না পারলে কর্মফল ত্যাগ কর। আচার্য শঙ্কর সেখানে ভাষ্যে বলছেন, কর্মফলত্যাগের কথা স্তুতির জন্য বলা হচ্ছে, যেমন অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করে নিয়েছিলেন বলে সব ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হয়, সমানধিকরণ করা হচ্ছে। উচ্চতম অবস্থায়, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁদের কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। মানুষ কর্ম ত্যাগ করতে পারবে না, তাই বলছেন তোমরা কর্মফল ত্যাগ কর। দ্বাদশ অধ্যায়ের এগারো আর বারো নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা তা নাহলে করা যাবে না, আচার্য যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনি জিনিসটাকে একটা যুক্তিতে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। গীতায় ভগবান বলছেন, তুমি যদি কর্ম ত্যাগ না করতে পার তাহলে কর্মের ফল ত্যাগ কর। আচার্য ভাষ্যে প্রথমেই দুটো পথ নিয়ে এসেছেন, হয় তুমি নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর আর তা নাহলে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা নিয়ে কর্ম কর, দুটোই ন্যাস। যদি কিছু না পার তাহলে কর্মফল ত্যাগ কর। আমাদের সেটাও বলা হচ্ছে না, কর্মফল থাক আগে তোমার কামনা-বাসনা গুলো ত্যাগ কর। প্রথমে কামনা-বাসনা ত্যাগ হবে, তারপরে কর্মফল ত্যাগ হবে, তারপর কর্ম ত্যাগ হবে, কর্ম ত্যাগে সামাজিক কর্তব্যগুলো চলে যাবে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে সবটাই ত্যাগ হয়ে যায়।

মূল হল সব কিছুতে আমি বোধটা চলে যাওয়া। ঠাকুর বার বার বলছেন কাঁচা আমি চলে গিয়ে পাকা আমি থেকে যায়। কাঁচা আমিই মানুষকে বাঁধে। সিদ্ধ ভক্তদের এই কাঁচা আমি চলে যায়। কাঁচা আমিকে পাকা আমিতে নিয়ে যাওয়া, এটাকেই আমাদের সাধনা রূপে শুরু করতে হয়। আমিত্বটা ত্যাগ হওয়া চাই, আমি কর্ম করছি কি করছি না, ধর্মকার্য করছি কি করছি না, মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন করছি কি করছি না, এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই; গুরুত্ব হল আমার আমিত্বটা ঈশ্বরের আমিত্বে গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে কিনা। ঈশ্বরের আমিত্বে যদি মিশে না থাকে তাহলে এখনও কোথাও ফাঁক থেকে গেছে। আচার্য শঙ্কর গীতার কর্মযোগের ভাষ্যে বলছেন, অহং কর্তা, আমি কর্তা এই ভাবটা থাকবে, এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু *ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, আমি ঈশ্বরের দাস, সব কাজ আমি আমার প্রভুর জন্যই করছি, এটাই পাকা আমি। এখানে এই আমিত্ব চলে যাওয়া নিয়েই বলছেন, *লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*, তাঁর আর কোন কিছু থাকবে না। বাড়িতে আমি কাজ করছি। কেন কাজ করছি? এটা ঠাকুরের কাজ, আমি তার ভৃত্য, তাই করছি। এটাই সাধনার একটা অঙ্গ। যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঐটাই দেখেন, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁরই কাজ। আর তা না হলে মত্তো, স্তব্ধো, চুপ মেরে বসে যাবেন। তিনি আর কোন কাজ করতেই পারবেন না, যদি করেন তখন ঐ ভাব নিয়ে করবেন। গীতায় ভগবান বলছেন *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। লোকবেদব্যাপারন্যাসাঃ*, এর মানেও তাই, একই কথা। তবে গীতার এই শ্লোকে ঈশ্বরকে অর্পণ করে করার কথা বলছেন। ভক্ত ঈশ্বরকে ছাড়া থাকতে পারেন না, যা কিছু করেন ঈশ্বরকে অর্পণ করেই করেন। সন্তান মারা গেল, বলছেন, ঠাকুর তোমার ছিল তুমিই নিয়ে নিলে। মানুষ কি কখন এই ভাব আনতে পারে! সম্ভবই না, আমরা মুখে যতই বলি, ধর্মে টিকে থাকা খুব কঠিন। অবসাদগ্রস্ত হওয়া তো অনেক দূরের কথা, মন খারাপ হওয়া, কথায় কথায় চোখের জল ফেলা, তার মানেই হয় ঈশ্বরের ভক্তি লাভ হতে তার

অনেক দেরী আছে। মন খারাপ হওয়া মানে তার আদর্শ বলে কিছু নেই, দ্বিতীয় যদি আদর্শ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে।

এখানে নিরোধ করে দেওয়ার কথা বলছেন। কিসের নিরোধ? আমিত্বের নিরোধ। তাঁর আর কিসের কামনা থাকবে! যিনি রান্না করছেন, তিনি কিসের জন্য রান্না করছেন? আমি ঠাকুরকে খাওয়াব। সেখানে কিসের কামনা আসবে! কেউ যদি ঠাকুরের তিথি পূজায় বা শ্রীমার তিথি পূজায় পাঁচ রকম, দশ রকম রান্না করতে চায় করুক না, এরপর নিজের জন্য শুধু একটু ঝোল ভাত আলাদ করে রান্না করে রেখে দিক, বাকি স্পেশাল আইটেম গুলো ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অপরকে খাইয়ে দিক, পরিচিত যারা আছে তাদেরকেও না, অপরিচিতদের, যাদের মধ্যে কাঙালী, ভিখারীরাও আছে, দেখা যাবে কদিনের মধ্যেই তার মধ্যে ভক্তি এসে যাবে। শ্রীমা বলছেন, ঠাকুর যখন ছিলেন তখন কেউ তাঁকে দেখল না, এখন আবার নিজেরা খাবে বলে কত রকম ব্যঞ্জন করে ঠাকুরকে অর্পণ করে। অর্পণ করছে ঠিকই কিন্তু নিজেরা খাবে বলে। ঠাকুর গল্প বলছেন, আর দূর্গা পূজা করে না কেন? দাঁত পড়ে গেছে, পাঁঠার মাংস আর চিবোতে পারে না।

লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ, এই জিনিসটাকে সব থেকে বেশি করে দেখালেন একমাত্র গুরু নানক, যিনি এটাকে একেবারে systemized করে দিলেন। শিখ ধর্ম শুরু করার পর গুরু নানক এর নামই দিয়েছিলেন বন্দচখনা, সবাই মিলে একই জিনিস খাবে। সেইজন্য গুরুদ্বারে শিখদের অনুষ্ঠানে ওরা রুটি করবে, একটা তড়কা ডাল করবে, তার সাথে একটা সব্জি আর হালুয়া প্রসাদ, সবাই ওটাই খাচ্ছে। ওখানে কেউ বড় কেউ ছোট নয়। ঈদ বা অন্য পরবে প্রার্থনার সময় মুসলমানদের সবাই সমান। আমাদের এখানে সমস্যা হল, এক একজন গুরু যাঁরা এই ভাবে ছিলেন তিনি এইভাবেই সবাইকে এক করে দেখেছেন কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অন্যান্য যে সম্প্রদায়ের ভাব আছে সেগুলো এসে এই ভাবকে নষ্ট করে দেয়। ঠাকুরকে একজন বলছেন, এই নরেন এসে গেছে এখন উনি শুধু নরেন এটা নে, নরেন এখানে বোস শুধু শুধু নরেন নরেন করে যাবেন, আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। কিন্তু ঠাকুরের ভাবটা আলাদা, ঠাকুরও বলছেন শুদ্ধ আধারে যদি মনকে নামিয়ে না রাখি তাহলে জগতে আমার মন থাকবে না। কিন্তু *লোকবেদব্যাপারে* সব রকম পক্ষপাতিত্বের সমাপ্তি। ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কিছু দেখেনই না। আর যদি কোন বিশেষ কারণ থাকে, মায়ের একটা বিশেষ কাজ করে দেবেন বলে কিছু করে দিলেন। কিন্তু সেখানে কোন আমিত্বের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য, কাউকে সম্মান দেওয়ার জন্য কোন কিছু করেন না।

এই হল *নিরোধরূপত্বাৎ*, এর আগের সূত্রে যে বললেন *সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*, ভক্তি কি রকম? নিরোধ রূপে। নিরোধ কিসে? লোকবেদব্যাপারে। তাই বলে এটা মনে করা যাবে না যে ঈশ্বরের ভক্তির প্রতি নিরোধ হয়ে যাবে। নিরোধ কিসে? ভক্তিতে? না, লোকবেদব্যাপারে। ভক্তিতে কেন নয়? সেইজন্য নয় নম্বর সূত্রে বলছেন –

তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ।।৯।।

তাই বলে তুমি মনে কর না যে ঈশ্বরপ্রেমের প্রতি নিরোধ হয়ে যাবে। *তস্মিন্নন্যতা*, ঈশ্বরে অনন্যতা আর *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা*, ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু সব কিছুর প্রতি উদাসীনতা। ভক্তিসূত্রের প্রথম চব্বিশটি সূত্রে খুব উচ্চমানের ভক্তের বর্ণনা করা হচ্ছে। আমাদের মত লোকের পক্ষে এগুলো শোনার পর যতটুকু পালন করা যাবে ততটুকুই আমাদের লাভ। এই ভাব যে শুধু নারদ ভক্তিসূত্রেই বলছেন তা নয়, সব জায়গায় একই কথা বলা হয়েছে। ঈশাবাস্যোপনিষদে শুরুই হয় এই ভাব দিয়ে, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, এই জগতে যা কিছু সব কিছুতে দৃষ্টি দিতে হয়, কারণ সবটাই ভগবানেরই রূপ। ওখান থেকে নেমে যখন *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি* এই অবস্থায় আসে তখন ওটাই ত্যাগের দ্বারা করতে হয়। ত্যাগ আবার দুই রকমের, অনাসক্ত আর নিঃস্বার্থ। আমাকে করতে হবে, করা দরকার তাই করছি, নিজের কোন স্বার্থ নেই, এটাই আমার ধর্ম। মানুষের জীবনে যত দুঃখ কষ্ট আসে সব অধর্ম পালনের জন্যই আসে। ধর্ম আচরণে মানুষের কখনই দুঃখ কষ্ট হয় না। ধর্ম মানে কি? গীতাতেও বলছেন, ঠাকুরও বলছেন, এটা আমার কর্তব্য কর্ম, আমাকে এটা করতে হবে। এটাই ধর্ম, এর বাইরে যা কিছু আছে সবটাই অধর্ম। মানুষ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যা করছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু অধর্মই করে যাচ্ছে। শুনতে খুবই খারাপ লাগবে।

ধর্ম কি রকম হবে? জাতক কথার একটা কাহিনীতে ধর্ম কি রকম, তার খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। জাতক কথা মানেই তাই, যেখানে দেখান হচ্ছে কিভাবে ধীরে ধীরে তিনি বোধিসত্ত্বের দিকে এগোচ্ছেন। এক জন্মে তিনি বৈশ্য পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। বৈশ্য পরিবারে জন্ম নিয়েছেন বলে তিনি ঠিক করে নিলেন, কোন ব্রাহ্মণ বা অতিথি এসে গেলে আমি আগে তাঁর সেবা করব। ইন্দ্র ঠিক করল এই বৈশ্যের পরীক্ষা নিতে হবে। বৌদ্ধ ধর্মে বেদের দেবতাদের খুব তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। একজন দেবতা একদিন ব্রাহ্মণ বেশে সেই বৈশ্য পরিবারে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতিথি এসেছে দেখে তথাগত, তখন তাঁর অন্য নাম ছিল, তাঁর স্ত্রী আর তিনি আনন্দে এগিয়ে গেছেন অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য। তখন ইন্দ্র এসে বলছেন, আর যদি এক পা এগিয়ে যাও তাহলে এই যে আগুন দেখছ এই আগুন নরকের আগুন, তুমি নরকের আগুনে গিয়ে পড়বে, তুমি ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ কর। তখন তথাগত বলছেন, আমি অতিথি সেবা ধর্মের জন্যও করি না, অধর্ম হওয়ার ভয়েও করি না। অর্থাৎ বলতে চাইছেন আমি কোন কাজ পূণ্যের জন্যও করি না, পাপের ভয়েও করি না। এটাই আমার স্বভাব, আমি এটাই করব। বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যেতেই দেখেন সেই আগুন আর নেই। ধর্ম মানেই এটা, আমি এটাই করব, এতে আমার দুর্নাম হোক, সুনাম হোক, দুর্ভোগ হোক, সুখ ভোগ যাই হয়ে যাক আমি এটাই করব, এটাই আমার ধর্ম। লোকবেদ যেখানে বলছে, এই অবস্থাতেই ধর্ম এসে যায়, আমাদের মনে হয় এখানে লোকবেদও উড়ে যায়। এই অবস্থায় যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁদের লোকবেদও উড়ে যায়, এটাতেও তাঁরা বাঁধা থাকেন না। লোকবেদ মানে সাধারণ ভাবে আমরা যাকে জাগতিক ব্যবহার বলি, তাঁদের এটাও থাকে না আর উচ্চ অবস্থার যে ধার্মিকতা সেটাও থাকে না। স্বামীজী বার বার বলছেন, যে কোন একটা আদর্শকে গ্রহণ কর, সেই আদর্শকে নিয়েই জীবন চালাও, আমি এটাই করব। কিন্তু সেটা হবে self improvement এর জন্য। তাহলে তো বলতে পারে, আমি তো রোজ দাঁত ব্রাশ করি, শরীরের জন্য রোজ স্নান করছি, খাওয়া-দাওয়া করছি, self improvement কোথায় হচ্ছে? যে আচরণের দ্বারা মনের self improvement হয় তার কথা বলতে চাইছেন। যেমন আগেকার দিনে সবাই মাঠে ঘাটেই শৌচাদি করত, কিন্তু ব্রাহ্মণরা কানে পৈতেটা না জড়ানো পর্যন্ত করবেন না। এটা হচ্ছে self improvement। প্রস্রাব সবাইকেই করতে হবে, না করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু পৈতেটাকে নিষ্ঠার সঙ্গে কানে জড়াতে হবে, এটা হল ধর্মের অঙ্গ, তবে অত্যন্ত সাধারণ অঙ্গ, কিন্তু ধর্মের আচরণ। এগুলোকে বলছেন লোকবেদব্যাপার। এর উপর আমরা আগে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়েছি।

পরা ভক্তির পথে যিনি চলে যান, তাঁর জাগতিক জিনিস বলে তখন কিছুই থাকে না, তার সাথে ধর্মের যে ব্যাপারটা থাকে সেটাও খসে পড়ে যায়। ভক্তিশাস্ত্রে অতটা বলেন না, কারণ ভক্তিতে ভগবানের অস্তিত্বটা থেকে যায় বলে পূজা, অর্চনা এগুলোও থেকে যায়। জ্ঞানমার্গের যাঁরা তাঁরা তো বেদকেই ছেড়ে দেন, বলছেন, *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*। ওনারা বেদেরও পারে চলে যান, বেদের কোন সংস্কার মানেন না। সেইজন্য আগের সূত্রে বললেন *নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*, কিন্তু মুশকিল হয় এনারা তো পরমহংস জ্ঞানী নন, ভক্তরা সাধারণ ভাবে সমাজেই থেকে যান, সন্ন্যাসীরা যাঁরা জ্ঞানমার্গের তাঁরা বেরিয়ে যান। সেইজন্য ভক্তকে কিছু কিছু জিনিসকে সামলে রাখতে হয়। এবারে বলছেন, এই যে নিরোধাদি বলা হয় এর ভেতরে একটা ব্যাপার আছে। সরাসরি যদি কেউ নিরোধ করতে যায় সে পাগল হয়ে যাবে, জীবনে একটা শূন্যতা নেমে আসবে। কারণ মানুষ একটা অবলম্বন ছাড়া থাকতে পারে না, তিনি যেই হয়ে থাকুন, যীশু, ঠাকুর থেকে শুরু করে যেই হোন, এই জগতে যে আছে একটা অবলম্বন তাঁর চাই। হয় সন্তান, নয় বন্ধু, নয় স্ত্রী বা স্বামী আর তা নাহলে চার পাঁচটা শিষ্য। মনকে নামিয়ে নীচে রাখার জন্য একটা অবলম্বন তাঁদেরও দরকার, মন অবলম্বন ছাড়া নীচে থাকতে পারে না। শুকদেবাদির কথা বলা হয় ঠিকই, কদাচিৎ কেউ কেউ থাকেন যাঁরা শুধু ব্রহ্ম চিন্তন নিয়ে থাকেন। তাঁদেরকে সমাজে থাকতে হয় না, কিন্তু যাঁরা সমাজে আছেন তাঁদের মনকে একটা জায়গায় রাখতে হয়। ভক্তিমার্গে আরও বেশি রাখতে হয়।

এই সূত্রে এসে নিরোধাদি জিনিসটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। *তস্মিন্নন্যতা*, *তস্মিন্*, সেই ভগবানে অনন্য ভাব, ভগবান ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, ভগবান ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। ঐ একটাতে এসে তিনি হারিয়ে বিভোর হয়ে আছেন। ছোটখাটো অনেকগুলো অভ্যাস সবারই থাকে। ব্রাহ্মণরা

যেমন শৌচের সময় কানে পৈতাটা জড়িয়ে নেন। মনুস্মৃতিতে মনু অনেকগুলো বিধান দিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের কি কি জিনিস পালন করার অভ্যাস করতে হয়। সেই অভ্যাসের থেকে আরেকটু উপরে যায় অনুশীলন, কিছু কিছু অনুশীলন আছে যে অনুশীলন শরীর মনকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। সেখান থেকে কিছু কিছু আদর্শ এসে যায়। মূল্যবোধের অনুশীলন অনেকেই করে থাকেন, যেমন অনেকে সময়ানুবর্তিতাকে ছাড়তে পারেন না, এটা একটা impersonal মূল্যবোধ, তেমনি truthfulness এগুলো হল individual values। কিন্তু individual valuesএ তার নিজে ভালো হয়, পাঁচজনের সুবিধা হয়। কিন্তু আদর্শ বলতে আমরা যেটাকে বলি, সময়ানুবর্তিতা কখন জীবনের একটা আদর্শ হতে পারে না। সময়ানুবর্তিতা একটা মূল্যবোধ, মূল্যবোধ আর আদর্শে তফাৎ আছে। আদর্শ হল যে জিনিস মানুষকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যায় আর মূল্যবোধ মানুষকে নীচের দিকে পড়তে দেয় না।

ভারতবর্ষে চারটে বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র, এদের যে আদর্শ মনু দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটাকে আধার করে আমরা চারটে আদর্শে দাঁড় করিয়েছি, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। আদর্শ এই চারটের বাইরে কক্ষণ যেতে পারবে না। বিদ্যা মানে যে কোন একটা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই হোক বা ভৌতিক জগতের যে কোন বিদ্যাকে নিয়ে নিজের জীবনকে কাটিয়ে দেওয়া। কোন চোর যদি ঠিক করে নেয় আমি চৌর্য বিদ্যাকে নিয়েই সাধনা করব, তাতেই সে মহৎ হয়ে যাবে। শুধু যে ধরা পড়বে না তা নয়, তার নিজের লোক স্ত্রী পুত্র বা পরিবারের লোকজনরাও কোন দিন জানতে পারবে না যে সে চোর, এমন ওস্তাদ হয়ে যাবে। এটা একটা কথা বলা হল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে। আর সম্পদ, সমাজের জন্য, দেশের জন্য আমি সম্পদ সৃজন করে যাব। তৃতীয় সেবা, সবারই সেবা করে যাচ্ছে, যিনি ডাক্তার তিনি সেবা করে যাবেন। রোগী এসে বলছে আমার কিন্তু পয়সা নেই, ঠিক আছে তোমাকে ভিজিট দিতে হবে না। এখনকার ডাক্তার প্রথমেই তাকে বার করে দেবে, আগে টাকা নিয়ে এস। ইঞ্জিনিয়াররা এমন বাড়ি বানায়, ব্রীজ বানায়, শেষ হবার আগেই ভেঙে পড়ছে। শেষ আদর্শ হল ত্যাগ, ত্যাগ মানেই হয় জ্ঞান আর ভক্তি এর কোন একটার মধ্যে পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেওয়া। যাঁরা একটা আদর্শকে নিয়ে চারটের মধ্যে বিচরণ করেন তাঁরা হলেন মহাপুরুষ। যাঁরা দুটো আদর্শকে নিয়ে চলেন তাঁরা সাধারণ। কিন্তু মানুষ মাত্রই এই চারটে আদর্শের মধ্যে বাঁধা। সারাটা দিন মানুষ যা কিছু করছে, এই চারটে আদর্শের মধ্যেই সে ঘুর ঘুর করে। যে পকেটমার সেও সম্পদ তৈরী করছে কিন্তু বিকৃত, আদর্শ রূপে না। একজন গৃহবধু সারাদিন বসে বসে টিভির সিরিয়াল দেখছে, সে কোথাও বিদ্যার একটা বিকৃত রূপের মধ্যে নিজেকে দিয়ে রেখেছে। মানুষ যখনই কোন না কোন আমোদ প্রমোদ করছে তখন সেটা কোন না কোন বিদ্যারই একটা বিকৃত রূপ। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা যে কাজ করছে, এটা সেবার বিকৃত রূপ। কারণ ওখানে সেবার থেকে বেশি নজর থাকে পয়সা কি করে বেশি উপার্জন করা যায়, তার উপর আবার চেষ্টা করে ঘুষ কিভাবে নেওয়া যেতে পারে। আর তা নাহলে ক্ষমতা কত কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, গিন্নী খুব ভালো করে স্বামীকে খাওয়াচ্ছে আর বলছে, ওগো, পাশের বাড়ির মহিলাকে তার স্বামী কি সুন্দর একটা গয়না বানিয়ে দিয়েছে। স্বামী বেচারার একদিন ভালো খাওয়া জুটলো, কিন্তু তার বিনিময়ে গিন্নী তার কাছ থেকে কটা গয়না আদায় করতে চাইছে। সেবাই করছে, কিন্তু সেবার বিকৃত রূপ। মানুষ সারাদিন যা করছে তাতে এই চারটে আদর্শেরই বিকৃত রূপ থাকে। তারই শুদ্ধ রূপের দিকে যদি চলে যায় তখন তার জীবন একটা আদর্শকে নিয়ে চলতে শুরু করে দিল।

বলছেন *তস্মিন্নন্যতা*, ত্যাগ আদর্শের যে কথা বলা হল, ত্যাগরই জ্ঞান আর ভক্তির যে আদর্শ, সেই ভক্তিরই অনন্য ভাব। ঈশ্বরের ভক্তিতে সে মজে গেছে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু সে জানে না। আর তার সাথে বলছেন *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ*, ঐ মজে যাওয়ার বাইরে যা কিছু আছে তার বিরোধিতা, বিরোধিতা মানে ঐদিকে তার মন যায় না। আমি একটা কাজে যাচ্ছি, সেই সময় একজন আমাকে দাঁড় করিয়ে কিছু বলতে চাইছেন। আমি তাঁকে বললাম, দাদা আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, জীবনে কখন ব্যস্ত থাকেব না, সব সময় সমস্ত থাকবে। ব্যস্ত মানে হয় চারটে জিনিসে জড়িয়ে আছে, ব্যস্ত কখনই থাকতে নেই। যেটাই করা হোক, ওটাতেই পুরো ব্যক্তিত্বটা লেগে থাকবে, অনন্যতা মানে এটাই। যিনি ভগবানকে ভালোবাসছেন, যে ভক্তের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাঁর *তস্মিন্নন্যতা* হয়ে যায়, ঈশ্বরে অনন্যতা, পূর্ণ একত্বের ভাবে চলে গেছেন। কে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, কে তাকাচ্ছে না, কে ভালো, কে মন্দ কোন ব্যাপারেই হুঁশ নেই।

ঐ আদর্শের বাইরে যা কিছু আছে, সবটাতে *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা*। উদাসীন মানে অবজ্ঞার ভাব নয়, কোন কিছু তাঁর চোখেও পড়বে না। রাবায়ার কাহিনী অনেকবার বলা হল, তিনি সুফী সাধিকা ছিলেন। মুসলমানদের নিয়ম আছে শয়তানকে নিন্দা করতে হবে। রাবায়াকে এসে বলছে, তুমি তো কখন শয়তানের নিন্দা কর না। রাবায়া বলছেন, অবশ্যই নিন্দা করতে চাই, কিন্তু আল্লাতে আমার মন এত বেশি মজে আছে যে আমার মনে শয়তান ঢোকার জায়গাই পায় না। অনন্যতা মানে এটাই, যে জিনিসটাকে নিয়ে আছে ওটাতেই মজে আছে, ওর বাইরে কোথায় কি হচ্ছে, কি হচ্ছে না কোন দৃষ্টি নেই। একজন খুব সিনিয়র মহারাজ হরিদ্বারে থাকতেন। বাইরের সম্প্রদায়ের একজন বড় স্বামীজী তাঁকে পড়ার জন্য একটা দামী বই দিলেন, আপনি এই বইটা পড়ে দেখবেন। মহারাজ তাঁকে বললেন, আমার এখন বই পড়ার সময় হবে না। কেন? আমি এখন এই বইটা পড়ছি, এখন এতেই আছি। তিনি একটাই বই পড়ছেন, দ্বিতীয় বই পড়ার আর ফুসরৎ নেই, ওর মধ্যেই তিনি ডুবে আছেন, এটাই অনন্যতা।

কানপুরের খবরের কাগজে প্রায়ই একটা শব্দ থাকত, অনেকে সেই শব্দটা বুঝতেও পারত না, শব্দটা হল ডাগ্‌গামার বাহন, কানপুর শহরেরই শব্দ। ডাগ্‌গামার বাহন মানে, যেমন অটো, টোটো, বাস এদের সবার একটা নির্দিষ্ট রুট থাকে, রুটের বাইরে কোন গাড়ি চলবে না। ডাগ্‌গামার গাড়ির রুট বলে কিছু নেই। গাড়িটা হয়ত এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর রুটের পারমিট হয়ত আছে বেলুড় স্টেশন পর্যন্ত, কিন্তু সেই রকম সওয়ারী পেয়ে গেলে সে হয়ত লিলুয়া চলে গেল, ওখান থেকে আরেকজন সওয়ারীকে নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল। এগুলো লাইসেন্স বিহীন গাড়ি আর এদের কেউ কন্ট্রোল করতে পারে না। ডাগ্‌গামার গাড়িগুলো অনেক গোলমাল করে বেড়াত। সেখান থেকে নাম হয়ে গেল ডাগ্‌গামার ডাক্তার। কানপুরে অনেক ডাক্তার হয়ে গিয়েছিল, ওরা ডাগ্‌গামার ডাক্তার। ডাগ্‌গামার ডাক্তার মানে, আজকে এই হাসপাতালে কাজ করছে, কাল ঐ নার্সিং হোমে কাজ করছে আর অর্থোপেডিকের কাছে সাধারণ রোগী যদি এসে যায় তাকেও দেখে দিচ্ছে। একজন ডাক্তার খুব মজা করে বলতেন, কানপুরে বেশির ভাগ ডাক্তার হল ডাগ্‌গামার ডাক্তার।

আমাদের জীবনটাও ডাগ্‌গামার জীবন। হৃষিকেশে সাধুদের জন্য লঙ্গরখানা আছে। লঙ্গরখানাতে ডাল, সবজি, ভাত বা রুটি দেওয়া হয়। ওখানে সব বাঁধা নিয়ম পাঁচখানা রুটি দেবে, একটু ডাল দেবে। আবার কোথাও রুটি দেবে তার সাথে একটু সব্জি দেব। হৃষিকেশে অনেক সাধু আছেন যাঁরা মোটর সাইকেলে ভিক্ষা করতে আসেন। আখড়া গুলিতেও ভিক্ষা পাওয়া যায়। লাইনে দাঁড়িয়ে রুটি ডাল নিচ্ছে। একজন সাধু মোটর সাইকেলে এসে খবর দিল, আরে ওঁহা পুরী দে রহা হ্যায়। সাথে সাথে সব লাইন উধাও। পৌঁছে গেল সব পুরীর লাইনে। পুরীর লাইনে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ততক্ষণে আরেকজন এসে বলল, ওঁহা লাড্ডুভি দে রহা হ্যায়। তখন এই লাইন ছেড়ে দৌড়ে গেল লাড্ডুর লাইনে। এই সমস্যা হৃষিকেশে নিয়মিত লেগেই আছে। যাঁরা পায়ে হেঁটে যান সেই বেচারী দৌড়ে দৌড়ে কত লাইনে যাবে। কিন্তু অনেক সাধুরই মপেড, মোটর সাইকেল আছে, সব ডাগ্‌গামার সাধু। যেখানেই পেয়ে গেল ওখানেই দৌড়ে চলে গেল। আমাদের যত রকম জীবন আছে সব জীবনই ডাগ্‌গামার। ছেলেগুলো যখন প্রেম করতে মেয়েদের পেছনে দৌড়ে যায়, সব হল ডাগ্‌গামার প্রেমিক। এই মেয়েটা খুব সুন্দর, হঠাৎ শুনল ঐ মেয়েটা আরও ভালো, তাকে ছেড়ে ওর পেছনে দৌড়াতে থাকবে। আর মেয়েগুলো আরও বেশি, একটা ছেলেকে ভালোবাসছে, যখন শুনল ঐ ছেলেটার একটা চার চাকা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছনে দৌড়াতে শুরু করে দিল। আবার দেখছে এই ছেলেটা স্পোর্টসেও ভালো, তখন আগেরটা ছেড়ে ওর পেছনে দৌড় লাগাল। সবটাই ডাগ্‌গামার জীবন।

এখানে বলছেন, ভক্তের জীবনে এই জিনিস চলে না। ভক্ত যিনি তিনি ঈশ্বরে অনন্য হয়ে আছেন। শুধু যে অনন্যতায় ডুবে আছেন তা নয়, ঈশ্বর বিরোধী জগতে যা কিছু আছে সব ব্যাপারে তাঁরা অন্ধ, চাইলেও তাঁরা করতে পারবেন না। এর উপর প্রেমের অনেক কাহিনী উপন্যাস ছড়িয়ে আছে। প্রেমের কাহিনীতে দেখা যায়, ওকে কেটে ফেললেও তার প্রেমিককে ছাড়তে পারবে না। কিন্তু এটা জাগতিক প্রেম, এই প্রেম মানুষের ইমোশান দিয়ে চলে, তার বাইরে সে যেতে পারে না। আদর্শের ক্ষেত্রেও প্রেমের মত অন্ধ হয়ে যায়, যাই হয়ে যাক আদর্শকে ছাড়া সে আর জীবন চালাতে পারে না, ঐ আদর্শে একেবারে ডুবে আছে। কিন্তু এখানে ভক্তির কথা বলছেন, এই ভক্তিই শেষ কথা। ভক্তির বাইরে যা কিছু আছে তিনি চাইলেও ওতে আর মন দিতে

পারবেন না, মন ভক্তির বাইরে অন্য কোন কিছুতে যাবেই না। এটাই ঠাকুর সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির পানা যে খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগবে না। এগুলো হল শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা, তবে এগুলো শুনতে হয়, শুনলে বোঝা যায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, এরপর আমরা কি করে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করতে পারি! আমাদের কিছু হয় না কেন? অনন্যতা নেই, সাংসারিক ব্যাপারেই আমাদের অনন্যতা নেই, সেখানে ঈশ্বরের ব্যাপারে কোথা থেকে অনন্যতা আসবে! ঐ একই মন দিয়ে সব করা হচ্ছে, যে মন দিয়ে সংসারের কাজ হয় সেই মন দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়। ঠাকুর বলছেন, যে লবণের হিসেব জানে সে চিনির হিসেবও জানে। যিনি জগতের ব্যাপারে পুরো মনকে লাগাতে পারেন তিনি চাইলে সেই মনকে ঈশ্বরের দিকেও লাগাতে পারেন। সাংসারিক ক্ষেত্রেই কিছু নেই, কিছু নেই ঠিক আছে, কিছু করার চেষ্টা তো থাকা চাই। একটা মাত্র জিনিসকে নিয়ে পুরো ওতেই ডুবে থাকাটা ঠিক ঠিক ভক্তের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অনন্যতা, যাকে unification of purpose বলা হয়েছে, সেটাকে পরের সূত্রে বলছেন –

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা।।১০।।

অনন্য কাকে বলে, এটাকেই আবার ব্যাখ্যা করছেন। *অন্যাশ্রয়াণাং*, ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্যান্য যত আশ্রয় আছে সেটার ত্যাগ, এটাকেই অনন্যতা বলে। এটাই যখন আমাদের জীবনে আসে, জীবনে যেখানে যে কোন অনন্য বলা হয়, অনন্য প্রেম, অনন্য ভক্তি, তার মানেই হল অন্য অন্য যে আশ্রয় রয়েছে সেটার ত্যাগ। ভক্তিতে ভালোবাসাটা জড়িয়ে আছে বলে স্বামী স্ত্রীর, প্রেমিক প্রেমিকার উপমা গুলো নিলে সহজে বোঝা যায় ভক্তি জিনিসটা কি। আগেকার দিনে অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হত বিয়ের পর স্বামীকে ভক্তি করবে। স্বামীকে ভক্তি করা মানে, স্বামী ছাড়া তোমার যেন অন্য কোন আশ্রয় না থাকে। সেই কারণে আগেকার দিনে পতি-পত্নীর মধ্যে অনন্য ভালোবাসা হত, মেয়েরাও তাই খুব সফল মা হতে পারতেন, খুব ভালো ঠাকুরমা হতেন। আর আমাদের সংস্কৃতিতে মায়েদের যে সম্মান, অন্য কোন সংস্কৃতিতে কোথাও মায়েদের এত সম্মান করা হয় না। মায়ের সম্মান সব জায়গাতেই আছে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেভাবে মায়েদের সম্মান দেওয়া হয়, এই সম্মান আর কোন সংস্কৃতিতে করা হয় না। বন্দে মাতরম্ গান নিয়ে কিছু দিন আগে খুব বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানরা বলছে আমরা একমাত্র আল্লার বন্দনা করি, মাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি কিন্তু বন্দনা একমাত্র আল্লাকেই করব। কিন্তু মাকে পূজা করা একমাত্র হিন্দু সংস্কৃতিতেই আছে, এটা কেউ এখানে জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। এটাই মায়েদের জীবনধারা, এটাই তাদের ধর্ম, তুমি অন্য কোন আশ্রয় নেবে না। এখন সব আশ্রয় খুলে দেওয়া হয়েছে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুড় বাড়িতে পাঠাচ্ছে তখন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়, কোন ঝামেলা হলে বাড়িতে জানাবি, এই নম্বরটা সেভ করে রাখবি, এটা পুলিশের নম্বর, কিছু হলে ফোন করে দিবি, তাতে যদি কোন কাজ না হয় তাহলে একটা উকিলকে হাতে রাখবি তাকে দিয়ে যাতে ফোর নাইনটি এইটে একটা মামলা ঠুকে দিতে পারিস, তোম এটিএম কার্ডটা নিজের কাছে রাখবি, পিন নাম্বারটা কেউ যেন না জানতে পারে। এখন কত রকম আশ্রয় দিয়ে মেয়েকে বিয়ের পর শ্বশুড় বাড়ি পাঠাচ্ছে ভাবাই যায় না। আগেকার দিনে বিয়ের পর মেয়ে যাওয়ার সময় বলে দেওয়া হত, স্বামীর বাড়িই এখন তোমার একমাত্র নিজের বাড়ি, এখানে আর তোমার রিএন্ট্রি নেই। আর এখন যত রকমের আশ্রয় হতে পারে সব আশ্রয় দিয়ে স্বামীর কাছে পাঠাচ্ছে, স্বামীর প্রতি অনন্য ভাব আসবে কোথা থেকে! ইদানিং সংসারে জীবন চালাতে গিয়ে চাকরি স্থলে, সমাজে আমাদের কত রকমের আশ্রয় আছে, নেতাদের সাথে যোগাযোগ আছে, ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় আছে, বড় পুলিশ অফিসারের সাথে জানাশোনা আছে, ইউনিয়ন আছে, পার্টি আছে, তাছাড় মিডিয়া আছে, কত রকমের আশ্রয় আছে, তার উপর অমুক বাবাজী, অমুক জ্যোতিষি তো আছেই, আশ্রয়ের আর শেষ নেই। জগতেই আমাদের একটা জিনিসের প্রতি অনন্যতা নেই, পড়াশোনা থেকে শুরু করে চাকরি করা, কোন কিছুতেই অনন্যতা নেই, এরপর ঈশ্বরে কি করে অনন্যতা হবে! সেইজন্য বলছেন *অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা*, সব রকম আশ্রয়ের ত্যাগই অনন্যতা।

যে কোন একটা ভাব যদি নিয়ে নেওয়া হয় আর ঐ ভাবের সাথে সে যখন অনন্য হয়ে যাবে, ঐ ভাবই তখন তাকে রক্ষা করতে শুরু করে। যাঁরা ঈশ্বরের শরণাগতির ভাব নিয়ে নেন, আমি ঈশ্বরের শরণাগত হলাম, ঐ ভাবই তখন তাঁকে রক্ষা করতে শুরু করবে। আবার একজন ভাব নিল, আমি ঈশ্বর মানি না, আমরা

কিভাবে কিভাবে জন্মেছি একদিন মরে যাব তাই এগুলোকে নিয়ে বেশি ভাবাভাবি করতে নেই। এবার সে যদি ঠিক ঠিক এই ভাবকে নিয়েই চলতে পারে তখন এই ভাবই তাকে রক্ষা করবে। যদি তার কোন দুঃখ কষ্ট আসতে শুরু করে তখনও তার এই ভাব, আমার জন্মেরও কোন কারণ নেই আর আমার এই দুঃখ কষ্ট আসারও কোন কারণ নেই। আর তার ঘনিষ্ঠের মৃত্যু যদি হয়ে যায় তখন বেশি ঢাকঢোল পেটাতে যাবে না, বলবে যে এমনি পঞ্চভূতের যোগ হয়ে একটা শরীর হয়েছিল, পঞ্চভূতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাই শরীরটাও চলে গেল। জীবনের প্রতিও তার বিরাট কিছু আকর্ষণ থাকবে না আবার মৃত্যুতেও তার কোন কিছু বিকার থাকবে না। এই ধরণের লোকও থাকে, যারা সাফল্য ব্যর্থতা কোনটাকেই গুরুত্ব দেয় না, সবটাই নিজের মত আসছে, নিজের মত চলে যাচ্ছে। আমাদের মুশকিল হল, বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের মন অত্যন্ত দুর্বল, ঠাকুরের ভাষায় চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। আর তা নাহলে বানরের মত চঞ্চল মন, একটা জিনিসকে ধরে রাখতে পারে না, ফলে কোন ভাব আসে না। ভাব না আসার জন্য সেই শক্তিরও উন্মেষ হয় না।

একটা হল জীবন অতিবাহিত করা আরেকটা হল জীবনে বড় হওয়া, দুটো আলাদা জিনিস। জীবন অতিবাহিত করার জন্য যেমন যেমন করে যাচ্ছেন ঠিক আছে। কিন্তু জীবনে যদি উঠতে হয় তখন কিন্তু একটা জিনিসকে ধরতে হবে। কথামৃতে ঠাকুরের খুব সুন্দর গল্প আছে, বৈকুণ্ঠে নারায়ণ বসে আছেন, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। হঠাৎ ভগবান দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে ফেরতও চলে এলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করছেন, কি হল! ভগবান বলছেন, তেমন কিছু না, আমার এক মহা ভক্ত আমার চিন্তা করতে করতে ভাবে বিভোর হয়ে চলে যাওয়ার সময় ধোপার কাপড়গুলো মাড়িয়ে দিয়েছে। ধোপা ভক্তকে মারতে গেছে, আমি ভক্তকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী আবার জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে আপনি ফিরে এলেন কেন? ভগবান তখন বলছেন, গিয়ে দেখছি ভক্তও একটা আধলা ইট তুলে নিয়েছে। ভগবান কি কোন ম্যাজিসিয়ান যে ওখানে দুম করে হাজির হয়ে মারামারি করতে নেমে যাবেন? কিংবা একটা বজ্রপাত করে ধোপাকে শেষ করে দিতেন? ধোপা কি দোষ করেছে? তার কাপড় মারিয়ে দিয়ে চলে যাবে সে মারতে যাবে না! এটা একটা কাহিনী, কাহিনী দিয়ে একটা তত্ত্বকে বোঝান হচ্ছে। যিনি ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত তার রক্ষা ঈশ্বরই করেন, কিন্তু তারপরেই বলছেন *অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোহনন্যতা,* যেমনি অন্য আশ্রয় নিয়ে নিল আর সে অনন্য থাকল না। অনন্য না থাকাতে ঈশ্বর এতক্ষণ যে তার রক্ষা করে আসছিলেন সেটা আর করবেন না। রক্ষা করাটা বাদ দিন, অনন্যতা আর থাকল না। ভক্তিই প্রধান, এরপর সে বাঁচল কি মরল তাতে কিছু যায় আসে না। গান্ধীজীকে অনেকেই নিন্দা করেন, নিন্দা করেন ঠিক আছে। কিন্তু রামনামে গান্ধীজীর কেমন অনন্যতা ছিল ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। গান্ধীজী বলতেন, আমি দেখছি রাজনীতি দিয়ে রামকে পাওয়া যায় কিনা। ওনার কাছে রাম প্রধান, রাজনীতি কখনই প্রধান ছিল না। গান্ধীজীর অনন্যতা শ্রীরামে ছিল, রাজনীতিতে ছিল না, রাজনীতি তাঁর বাই প্রোডাক্ট। নাথুরাম গডসে আচমকা গান্ধীজীকে গুলি মারলেন আর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'হে রাম', এটাকে বলে অনন্যতা। সেইজন্য বলছেন যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরেই অনন্য, অন্য কোন আশ্রয় নেবেন না। গ্রন্থের যদি আশ্রয় নেন, সেই গ্রন্থেরই আশ্রয় নেবেন যেখানে তাঁর ইষ্টের কথা আছে, তবে এটাকে আশ্রয় নেওয়া বলা যায় না, এটাও অনন্যতার একটা রূপ। ভক্তরা কত তিলক ধারণ করছেন, মালা ধারণ করছেন, উচ্চমানের ভক্ত, যিনি ঈশ্বরে অনন্য হয়ে গেছে, তিনি সেটাও করেন না। পরের সূত্রে বলছেন –

লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা।।১১।।

লোকে বেদেষু, এই শব্দগুলো আট নম্বর সূত্র থেকে আসা শুরু হয়েছে। নারদ এখানে এটাকে আরও fine tuning করে দিচ্ছেন। ভক্ত যিনি সমাজে থাকেন, তিনি ভেতর থেকে এগুলোর বাইরে চলে যান, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু কিছু জিনিস ধরে রাখতে হয়। ঠাকুর বলছেন, তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের মনে ত্যাগ, সন্ন্যাসীর দুটোই ত্যাগ, মনেও ত্যাগ বাইরেও ত্যাগ। যাঁরা উচ্চমানের ভক্ত তাঁদের ত্যাগ মূলতঃ মনের ত্যাগ, এখানে কিন্তু সাধারণ ভক্তের কথা বলা হচ্ছে না, শুকদেবাদি ভক্তদের স্তরের কথা বলা হচ্ছে, ওনারা কিছু কিছু জিনিসকে ধরে রাখেন। কি ধরে রাখেন? *লোকে বেদেষু,* লোক অর্থাৎ জাগতিক ব্যবহার আর বেদ অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যবহার। এতে কি হয়? বলছেন *তদনুকুলাচরণং,* সাধারণ ভাবে দেখা যায় এনারা যে লৌকিক আচরণগুলো করেন আর তার সাথে ধর্মীয় যে আচরণগুলো করেন, সেই আচরণ গুলিই করেন যেটা শাস্ত্রে বলছে, উদ্ভট কোন কিছু করেন না। আর তার সাথে *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা,* যেগুলো খুব প্রচলিত আচরণ, সচারচর যে রকম

ব্যবহার করা হয় তার বাইরে তাঁরা যান না। তার বাইরে যে আচরণ গুলো আছে চাইলে তাঁরা তার অতিক্রম করতে পারেন, কারণ তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে গেছেন, তিনি তিনটে গুণের পারে চলে গেছেন। তাঁদের উপর আর কোন বাঁধন থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও লৌকিক ব্যবহার, ধর্মীয় আচরণ সমাজে যেমন ভাবে চলে তাঁরা সেই রকমটাই করেন, উদ্ভট কোন ধরণের আচরণ তাঁরা কখনই করতে যান না। সাধারণ ভক্তরা অনেক সময় অপরকে নিজের ভক্তি দেখাবার জন্য বাড়াবাড়ি কিছু করতে শুরু করে দেয়, এনারা কখনই তা করেন না।

যে কাজ ঈশ্বরের ভক্তির দিকে নিয়ে যায়, সেই কাজেই মনোনিবেশ রাখেন, ওটাই পালন করেন, তার বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো করতে যান না। এরপরে একটা সূত্রে বলবেন, আচরণ সেই রকমই করেন সমাজে সবাই যেমনটি করছেন। এখানে মূল কথা হল, যে জিনিসগুলো ভক্তির দিকে নিয়ে যায় তার বাইরে তাঁরা কোন কাজ করেন না। ঠাকুর মথুরবাবুর সাথে কাশীতে গিয়েছিলেন। কাশীতেও মথুরবাবুরা বিষয়চর্চা করছিলেন, ঠাকুর কাঁদছেন, মা এখানে কেন নিয়ে এলি, এর থেকে দক্ষিণেশ্বর ভালো ছিলাম। যে কাজগুলো তাঁরা করেন বা যে কাজের মধ্যে তাঁরা থাকেন, তাঁর চান সেই কাজ যেন সব সময় ভক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, ভক্তির বাইরে যেন কিছু না থাকে।

এখানে কয়েকটা জিনিসকে বলছেন। প্রথম হল, আমাদের একটা ধারণা যে যাঁরা ঈশ্বরের ভক্তি নিয়ে থাকেন তাঁরা কোন কাজকর্ম করেন না, কিন্তু তা নয়, তাঁরাও কাজ করেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির অনেক রকম লক্ষণের কথা বলছেন, সেখানে আচার্য যে চরিত্রের কথা বলছেন সেগুলো জ্ঞানীদের চরিত্রের কথা বলছেন কিন্তু ভক্তদেরও একই চরিত্র। ভক্তদের নামে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়, ভক্ত কুশল হন। কুশলের মানেই হয় কাজের অগ্রাধিকারকে জানা, অনেক কাজ আছে তার মধ্যে কোন কাজটা করব, কোন কাজটা করব না, এই জিনিসটাকে ভালোভাবে জানাকে কুশল বলছেন। সিদ্ধ ভক্ত বা সিদ্ধ পুরুষরা কখনই কাজ থেকে সরে থাকেন না। কিন্তু যে কাজই করেন সেটা হবে *তদনুকুলাচরণং*, যে কাজ বা আচরণ তাঁকে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে ধরে রাখবে ওনারা ঐ ধরণের কাজ বা আচরণ গুলোই করেন। কিন্তু জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে অন্য ধরণের হয়, তাঁদের আচরণ অন্য রকম আর তাঁদের ভাবও আলাদা হয়। একদিন হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে এসে দেখছনে ঠাকুর সব্জী কাটছেন। হৃদয়রাম সঙ্গে সঙ্গে বলছে, মামা! তুমি একি করছ? ঠাকুরের এখানে খুব সুন্দর কথা আছে, যারা রান্না করে তারা জানে না আমি কতটা খাই, অনেক পয়সা অপচয় হয়ে যায়। আর এই পয়সার জন্যই তো নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছিস। ঠাকুরও কাজ করছেন, কিন্তু ঠাকুরের যে কিছু টাকা আয় করার ইচ্ছা আছে, নামযশ পাওয়ার ইচ্ছা আছে, সেসব কিছু নেই। তিনি ঐ জিনিসটাই করছেন যেটা ভক্তি সম্পর্কিত, যে কাজ তাঁকে ওই পথেই রাখবে। *লোকে বেদেষু*, লোক আচরণ সেটাই হবে যে আচরণে তিনি ভক্তি থেকে যেন ছিটকে না যান, ধর্মের আচরণ সেটাই হবে যেটাতে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে ছিটকে না যান।

অবতার হন আর যেই হন, পয়সা না থাকলে কেউ খেতে দেবে না। কাশীপুরে থাকতে ঠাকুরেরও এই সমস্যা হয়েছিল। সেইজন্য এমন কোন কাজ করবেন না বা করতে দেবেন না যেখানে অপচয় হবে। উদ্বোধনে শ্রীমা থাকার সময় ফলের টুকরি এসেছে। সাধুরা ফল নিয়ে টুকরিটা বাইরে ফেলে দিয়েছেন। শ্রীমা বলছেন, টুকরিগুলো তুলে রাখ, ওরা সন্ন্যাসী ওরা ঐ রকমই করবে। কিন্তু আমাদের সংসার চালাতে হয়, সব কিছুকে আমাদের সামলে রাখতে হয়। বাড়ির গিন্নীরাও সংসারের কিছু জিনিস ফেলতে দেন না, তাদের স্বভাবেই নেই। সংসার চালাতে হয় কিনা। তবে সংসার তারা চালায় দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্য। ঠাকুর যখন দুটো পয়সা বাঁচাতে চাইছেন, শ্রীমা যখন দুটো পয়সা বাঁচাতে চাইছেন তার পেছনে কারণটা পুরো আলাদা। গৃহস্থরা পয়সা বাঁচায় যাতে সেটা দিয়ে ভবিষ্যতে আরও সুখ ভোগ করতে পারে। ঠাকুর বলছেন অপচয় হলে মনে চাঞ্চল্য আসবে যে চাঞ্চল্য ভক্তি পথ থেকে সরিয়ে দেবে। *লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং* বলার এটাই উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলছেন টাকা দিয়ে কি হয়, নিজের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা হয়, সাধুসেবা হয়। এখানে উচ্চমানের ভক্তের কথা বলা হচ্ছে, এটাকে সাধারণ ভক্তদের সাথে মেলাতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে। সিদ্ধ পুরুষরাও কাজ করেন, তাঁদেরও লোকাচরণ আছে, তাঁদেরও ধর্মাচরণ আছে, কিন্তু সব আচরণের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য, তা হল ভক্তি। *তস্মিন্নন্যতা* থেকে শুরু হয়ে এখান পর্যন্ত বলা হচ্ছে, আদর্শ যখন থাকে তখন বাকি যে কাজগুলো হয়, সেই কাজ ঐ আদর্শকে কেন্দ্র করেই ঘুরঘুর করে। এখানে *লোকবেদে* তাঁর আচরণগুলো ঈশ্বরের প্রতি অনন্য

ভক্তিকে কেন্দ্র করেই চলে। কাজ সবাইকেই করতে হবে, কিন্তু যে কাজই হোক, লৌকিক কাজই হোক, ধর্মাচরণের কাজই হোক সব কাজই হবে ভক্তিকে কেন্দ্র করে। সেখানে আবার আরেকটা জিনিসের দিকে নজর দিচ্ছেন, *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা*, বলছেন, যে কাজ করলে ভক্তি বাধিত হয় সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকেন। কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ এই ধরণের যত কাজ বা ফালতু কাজ করা থেকে বিরত থাকেন, এই সব কাজের ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন থাকেন।

স্বামী স্বরূপানন্দজী প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, উনি গীতার একটা ইংরাজী অনুবাদ করছিলেন। সেই সময় গীতার একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে স্বামীজীকে লিখছেন, *যাবানার্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে*, বন্যা হয়ে গেলে কুয়োর জল, পুকুরের জল, ডোবার জলের আর কোন তফাৎ থাকে না, জ্ঞানের বন্যা যখন এসে যায় তখন আর জল নিয়ে ভাবতে হয় না, এটা কুয়োর জল, এটা পুকুরের জল এত আলাদা করে দেখতে হয় না, সবটাই এক হয়ে যায়। যাঁরা ভক্তিমার্গের তাঁরা আবার এটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন, বন্যা যদি এসে যায় তাহলেও মানুষ পানীয় জলটা একটু আলাদা করে রাখে। তার মানে, ভক্তির প্লাবন যদি হয়েও যায় তাহলেও শাস্ত্র মানবে, এই একটু জল আলাদা করে রাখতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, এক ঘটি জল আলাদা করে রেখে দে ওটা মাথায় ঢালব। বাকি জল দিয়ে স্নান করছেন। এখন কোনটা ঠিক? স্বামীজী বলছেন, আমরা হলাম আচার্য শঙ্করের মতাবলম্বী, আচার্য শঙ্কর যা বলেছেন আমরা ওটাই পালন করব। তার মানে একটু জল আলাদা করে রাখার অর্থটা নেওয়া হবে না। আমরা ঐ অর্থটাই নেব, যখন প্লাবন হয়ে যায় তখন নদীর জল, কুয়োর জল, পুকুরের জল সব এক হয়ে যায়, কোন তফাৎ থাকে না। তার মানে যত রকম বিদ্যা, যত রকম আচার বিধি সব জ্ঞানে চাপা পড়ে যায়। আত্মজ্ঞান ছাড়া তখন আর কিছু থাকে না, ঐ আত্মজ্ঞান দিয়েই সব কিছু চলে। ভক্তিমার্গে আমিত্বটা থেকে যায়। ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ তুমি বোধও থাকবে। আমি বোধ যদি অল্প একটুও থাকে তাহলে কিন্তু লোকাচার, শাস্ত্রাদিকে ধরে রাখতে হবে, এর অন্য কোন পথ নেই। এখন কেউ পরা ভক্তি বলুক, জ্ঞান বলুক যাই বলুক আগে দেখতে হবে আমিত্বটা থাকছে কি থাকছে না। যেমনি দেখবে ভক্তি আর জ্ঞান এক তখনই আসবে *নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*। কারণ পরা ভক্তি আর জ্ঞান দুটো সমান, আর কোন ভেদ বোধ থাকে না।

ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর তিন রকম অবস্থার কথা উল্লেখ করছেন, অন্তর্দশায় তাঁর কোন হুঁশ নেই, বাহ্যদশায় তিনি নৃত্য করছেন। বাহ্যদশায় যখন লোকের সাথে আচরণ করছেন তখন অল্প একটু শাস্ত্র থাকবে। ঐ অল্প একটু আমি যেটা থাকছে সেই আমি কি নিয়ে থাকে? যে জিনিসগুলো ভক্তির দিকে নিয়ে যায় ততটুকু থাকে, বাকি সব কিছু বাদ। তাহলে কেউ বলতে পারে আট নম্বর সূত্রের কি দরকার ছিল, সরাসরি এগারো নম্বর সূত্রটাই রেখে দিতে পারতেন? এই জন্যই রাখা হয়েছে, অন্তর্দশাতে জ্ঞানীর যেমন আপ্লাবন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি পরা ভক্তিতেও যে আপ্লাবন হয়ে যায় এই ভাবটা আসবে না। শুধু যদি এগারো নম্বর সূত্র রাখা হয় তাহলে ভক্তি চিরদিনের মত জ্ঞান থেকে নীচু হয়ে যাবে। অন্তর্দশায় ভগবানের ভাবে এমন বিভোর হয়ে আছেন তাঁর জগতের দিকে আর কোন দৃষ্টি নেই, তখন পুরো জগতটাই ভুল হয়ে যায়। ঠাকুর যখন সাধনার একেবারে শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় আছেন, তখন সব কিছুকে এক দেখছেন। সেই অবস্থায় তিনি নিজের মল জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করছেন। তখন ঠাকুরকে বলা হল, এটা তো নিজের বিষ্ঠা, অপরের বিষ্ঠাকে স্পর্শ করে দেখতে হয়। সেটাও ঠাকুর করে দেখলেন। এটাই *নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ*। যখন নরেনাদিদের শিক্ষা দিচ্ছেন তখন এই জিনিস করে বেড়াবেন নাকি! তখন একটু গোলমেলে লোকের স্পর্শ করা জল থু থু করে ফেলে দিচ্ছেন, এখানে এগারো নম্বর সূত্র আসছে। এটা ভক্তিরই দুটি অবস্থা, আমিটা যেন মুছে গেছে, আরেকটাতে আমির একটা ক্ষীণ রেখা রয়েছে।

যে জিনিসগুলো ভক্তির কাজে লাগবে না, সেই জিনিসগুলোকে যখন বন্ধ করে দেওয়া হল তাতে যে শক্তি ও সময়ের সাশ্রয় হয়, সেই শক্তি ও সময়কে ভক্তি সাধনায় পুরোদমে লাগিয়ে দেন। এই যে নানা রকমের ব্রত পালন, উপবাসাদি করা হয়, বিভিন্ন উৎসবাদি করা হয়, এগুলো কিসের জন্য করা হয়? *তদ্বিরোধিষূদাসীনতা*, আজ একাদশী আমি খাবো না, রান্নাবান্না কম হবে, আর যারা খুব ভক্ত পরিবার তাদের বাড়িতে সবাই ফলাহারাদি করছেন, পাঁচ রকমের ব্যঞ্জন করা হবে না। এর থেকে এবার যে সময়টা বাঁচল, ঐ সময়টাকে কাজে লাগাবে ভক্তির অনুশীলন করার জন্য। এর মধ্যে কিছু সিদ্ধ পুরুষের কথা আছে আর যাঁরা

উচ্চমানের ভক্ত তাঁদেরও কথা আছে। আমাদের স্তরে যদি বিচার করা হয়, ফালতু জিনিসে, বেকার কাজে আমাদের কত সময় আর শক্তি অপচয় হয় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কেউ যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সারাদিনে কি কি কাজ করেছে তার মিনিট টু মিনিট লিখে রাখে, এতক্ষণ টিভি দেখলাম, খবরের কাগজ পড়লাম, চুপচাপ বসে ছিলাম, এই সময় পরনিন্দা পরচর্চা করলাম, আড্ডা মারলাম, ঝগড়া করলাম, তার সাথে লৌকিক কাজ কি করেছি, ধর্মের কাজ কি কি করেছি, কখন কার কার সাথে ফোনে কথা বলেছি, কত মেল করেছি, কতক্ষণ নেটে ডুবে ছিলাম, যারা অফিসে যায় সেটাও লিখুক, অফিসে এতক্ষণ এই এই কাজ করলাম, কতবার চা খেয়েছি, অন্য টেবিলে গিয়ে কতক্ষণ গল্প করেছি, personal analysis মনে করে লিখুক। মাত্র তিনটে দিন লিখে রাখুক তাতে নিজেই দেখে হতবাক হয়ে যাবে, কোথায় সময় যাচ্ছে। সাধক যাঁরা, সিদ্ধ পুরুষ যাঁরা ওগুলোকে তাঁরা পুরোপুরি ব্লক করে দেন। ঐ ব্লক করে দেওয়াতে এত সময় বেরিয়ে আসে, আমার আপনার লোক অত সময় পেয়ে গেলে abnormal হয়ে যাব।

আগাথা ক্রিস্টির খুব নামকরা কথা আছে, মানুষকে কাজ আবিষ্কার করতে হয়, নাহলে পাগল হয়ে যাবে। মানুষ তাই সব সময় নতুন নতুন কাজ বার করতে থাকে, তা নাহলে সময় কাটবে কি করে। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে সময় কাটায়, না করলে abnormal হয়ে যাবে। ঐ abnormal থেকে বাঁচার জন্য কত রকমের খেলনা, কত রকম জিনিস জুটিয়ে নিচ্ছে। সময়কে যে আমি কাজ লাগাবো তার ট্রেনিংটাই নেই, বাচ্চা বয়স থেকে এর ট্রেনিং শুরু হয়। ভক্তরা কি করেন, *লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং*, তৎ মানে এখানে ভক্তি, ভগবানের প্রতি যে ভক্তি সেই ভক্তির অনুকুল আচরণ করনে। *তদ্বিরোধিষু*, যে জিনিস ভক্তির দিকে নিয়ে যাবে না, সেটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। এবার সেটা থেকে যে শক্তিটা বেরিয়ে আসে ঐ শক্তিকে তাঁরা ভক্তির কাজে লাগান আর তা নাহলে ভক্তিরই শাখা প্রশাখার কোন কাজে লাগান। বিয়েথা করে নিলে ভক্তির সাথে আর কোন সম্পর্কই থাকে না, সন্ন্যাসীরা সেইজন্য বিয়েথা করেন না, তাতে অনেক সময় বেরিয়ে এল, খাওয়া-দাওয়া সাধারণ, অনেক সময় বেরিয়ে এল। ফলে টাকা-পয়সাও তাঁর লাগে না, টাকা-পয়সা লাগে না বলে কাজ করতে হয় না, ফলে প্রচুর সময় এসে যায়, ঐ সময়টাকে তাঁরা সাধনাতে লাগান, তা নাহলে লোককল্যাণে লাগান। লোককল্যাণ যে কোন ধরণের হতে পারে। লেখালেখিতে লোককল্যাণ হতে পারে, যেমন বাল্মীকি, ব্যাসদেব, মধুসূদন সরস্বতী এনারা লিখতেন, লেখার কোন দরকার ছিল না, তাও লিখতেন। বিশেষ করে শঙ্করাচার্য, রামানুজ আর মাধ্বাচার্য এই তিনজনকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, সংস্কৃতে পুরো বেদান্তের যে এত গ্রন্থ আছে এইসব গ্রন্থ সব সাধুরাই লিখতেন সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য। আবার অনেক লোককল্যাণের জন্য প্রচার কার্যে নেমে যান বা শঙ্করাচার্যের মত মহাত্মারা ধর্ম সংস্থাপনের কাজে লেগে যান। এই জিনিসগুলো তাঁরা এই জন্যই করতে পারেন, কারণ তাঁরা সেই কাজগুলোই করবেন যে কাজগুলো ভক্তির অনুকূল, *তদনুকুলাচরণং*। রাজা মহারাজ বলছেন, চৌদ্দ আনা মন যদি ঈশ্বরে দেয় আর দু আনা মন যদি সংসারে দেয় তাতে যা কাজ হবে বন্যা হয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ এগুলোর জন্য তো কাজ করেন না, সেবাকার্যের জন্য করেন। সেবাকার্যের জন্য যে শক্তি আসে সেটাও খুব জোরালো শক্তি, তাতে কোন identification থাকে না, কোন স্বার্থ থাকে না। মূল কথা যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ বা খুব উচ্চমানের ভক্ত তাঁরা কোন পরিস্থিতিতে এমন কোন কাজ করবেন না যে কাজ ভক্তি কেন্দ্রিত নয়। সিদ্ধ পুরুষরা যে কাজগুলো করেন সেই কাজ সব সময় অমর হয়। তাঁদের কাজ অমর এই কারণেই হয়, ওই কাজে তিনি তাঁর সব শক্তি ও ইমোশানকে ঢেলে দেন, আগে পিছে তাঁর অন্য কোন পিছুটান থাকে না। এর সাথে আরও কি কি হয় পরের সূত্রে বলছেন –

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্।।১২।।

আর্ঢাৎ ঊর্ধ্বং, আর্ঢ্য অর্থাৎ ভক্তির অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, সেই অবস্থায় জমে গেছেন। এই অবস্থার *পূর্বম্* নয়, তার *ঊর্ধ্বম্* অর্থাৎ তারপরে। এর মানে যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁরা কি করেন, *শাস্ত্ররক্ষণম্*, শাস্ত্র রক্ষণ্ মানে শাস্ত্রের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা থাকে। কিন্তু *শাস্ত্ররক্ষণম্* শব্দ বেশ কয়েকটা অর্থে আসতে পারে। শাস্ত্র মানে যিনি শাসন করেন, যিনি আমাদের বলে দেন আমাদের জীবন কিভাবে চালাতে হবে। হিন্দুদের দিক থেকে শাস্ত্রের একটাই অর্থ খুব সহজ ভাবে পরিভাষিত করা হয়, শাস্ত্রে মানেই যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেন। পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র সেটাকেই বলা যাবে যে শাস্ত্র চারটেরই শিক্ষা দেয়, যদি চারটের মধ্যে একটারও শিক্ষা দেয় তাকেও শাস্ত্র বলা হয়। ইংরাজীতে পর্ণোগ্রাফি খুব নোংরা শব্দ, কিন্তু আমরা তাকে বলছি কামশাস্ত্র।

কারণ কাম আমাদের কাছে একটা পুরুষার্থ। পুরুষার্থ কিভাবে পূর্ণ হতে পারে এই নিয়ে যে গ্রন্থ আলোচনা করে তাকেই শাস্ত্র বলে। কিন্তু ওই কামই যখন নীচের দিকে পড়ে যায়, যখন আর পুরুষার্থ না থেকে ইন্দ্রিয় সুখের ব্যাপার হয়ে যায় তখন তা আর শাস্ত্র থাকবে না, ঐ গ্রন্থকে এনারা কোন দাম দেন না। ঠিক এই কারণে আমাদের এখানে ম্যানেজমেন্ট আদিকে খুব ভালো চোখে দেখা হয় না। কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সামাজিক নীতিগুলো কিভাবে উচ্চমানের হতে পারে, কিভাবে যাতে সবার জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে, কিভাবে জাগতিক অভ্যুদয় হতে পারে, এই নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, যেমন অর্থশাস্ত্র। সিদ্ধ পুরুষরা সিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর শাস্ত্র রক্ষণে নামেন। হিন্দু সমাজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থকে নিয়েই চলে।

হিন্দু সমাজ মূলতঃ বেদে আধারিত। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ অধ্যয়ন করতে পারতেন না, সেইজন্য সাধারণদের জন্য নতুন নতুন ধর্মগ্রন্থ আসতে শুরু হল, ধর্মগ্রন্থ আসার পর শাস্ত্রের কথা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। এখন যিনি সিদ্ধ পুরুষ তাঁর অর্থ চাই না, কাম চাই না, ধর্ম সাধন হবে না কারণ তাঁরা ধর্ম-অধর্মের পারে চলে গেছেন, মোক্ষ সাধন হয়ে গেছে, তাহলে শাস্ত্রের তাঁর আর কোন প্রয়োজন নেই। গীতায় বলছেন *যাবানার্থ উদপানে সর্বত্রঃ সংপ্লুতোদকে*, আপ্লাবন হয়ে গেলে শাস্ত্রের আর কোন দরকার থাকে না। কিন্তু ভক্তিমার্গের যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাস্ত্র রক্ষণ। শঙ্করাচার্যও একটা আলোচনায় এই জিনিসটাকে তুলছেন যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে, যে জ্ঞানের কথা আপনি আলোচনা করছেন, সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি জগতকে দেখা হয় সেখানে তাঁর বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই, এই সংসারই নেই, তাহলে শাস্ত্রের আর কিসের দরকার হবে। আচার্য তার উত্তরে বলছেন, আত্মজ্ঞানীর জন্য দরকার নেই ঠিকই, কিন্তু যারা সংসারে আছে, যাদের কাছে সংসারটা পুরোপুরি সত্য, তাদের জন্য শাস্ত্র দরকার। সিদ্ধ পুরুষরা এই জিনিসটা ভালো করে জানেন, সাধারণ মানুষ শাস্ত্র ছাড়া থাকতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, স্বাধীন ইচ্ছার বোধটুকু তিনিই ভেতরে রেখে দিয়েছেন, না হলে অনাচার বেড়ে যাবে। সিদ্ধ পুরুষ দেখছেন ঈশ্বরই আছেন, তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব করছেন, তাঁর বাইরে কিছু নেই। আরও হল তিনি এটাও জানেন যে বাকিরা কিন্তু এটা জানে না। যেমন ঠাকুর দেখছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তিনি দেখছেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, ঈশ্বরই সব কিছু করছেন। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে তিনি এটাও দেখছেন কিন্তু অন্যরা দেখছে না। ঠাকুর এক জায়গায় একজনকে বলছেন, তুমি মান আর নাই মান তুমি সেই রাম। আবার তিনি বলছেন, লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি সেই সচ্চিদানন্দ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। ঠাকুর দুটোই দেখছেন, সচ্চিদানন্দকেও দেখছেন আর লাটু গালে হাত দিয়ে বসে আছে সেটাও দেখছেন। জগৎ থেকে বিরত হয়ে গেলেও ওনারা জানেন এমন কিছু করতে নেই যাতে শাস্ত্রের অসম্মান হয়। ঠাকুর জানেন তিনি অবতার, সর্বধর্ম সমন্বয় করছেন, কিন্তু তখনও তিনি ঘরে কয়েকটা গ্রন্থ রেখেছেন, নরেনাদি কেউ এলে তাদেরকে দিয়ে গ্রন্থ পাঠ করাচ্ছেন। নরেন পড়বে না বলাতে ঠাকুর বলছেন, তুই আমাকে পড়ে শোনা। শাস্ত্র রক্ষণ সিদ্ধ পুরুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য খ্রীশ্চান বা ইসলাম পরম্পরায় যত বড় সিদ্ধ পুরুষই হন না কেন ওনারা কেউই বাইবেল বা কোরানের বাইরে যান না। ঠাকুর আবার বলছেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর কিছু না থাকুক একটা গীতা সঙ্গে থাকবে, এটাই *শাস্ত্ররক্ষণম্*, শাস্ত্রকে সম্মান দেওয়া।

সমাজে শাস্ত্রের প্রতি সম্মান না থাকলে সমাজের পতন হয়ে যাবে। যদি দেখা যায় কোন জাতি বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ভালো করে দেখলে দেখা যাবে হয় তাদের কোন শাস্ত্র নেই বা শাস্ত্র যদি থাকে তাহলে শাস্ত্র থেকে তাদের নিষ্ঠাটা চলে গেছে, এই দুটোর মধ্যে একটা কারণ হতে হবে। উই পোকা কাঠকে যেমন ঝাঁঝড়া করে দেয়, ঠিক তেমনি কোন জাতির শাস্ত্র থেকে নিষ্ঠা চলে গেলে সেই জাতির সমাজের ভেতরটা ফোঁপড়া হয়ে যায়। সেইজন্য দেখা যায় কমিউনিস্টরা যেখানেই শাসন করেছে সেই সমাজের ভেতরটা পুরো ফাঁপা হয়ে গেছে, এর মধ্যে কোন ব্যাতিক্রম নেই। ফাঁপা হয়ে যাওয়ার ফলে একটা কোন ধাক্কা আসতেই পুরো দেশটাই পুরো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। কমিউনিজম্ মতাদর্শ একটা বিফল মতাদর্শে পরিণত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, তারা শাস্ত্রকেই সরিয়ে দিয়েছে। চীনের বর্তমান ব্যবস্থাকে কখনই কমিউনিজম মতাদর্শে বলা যায় না, কয়েকজন ক্ষমতার জোরে সেখানে তাদের নিজেদের খুশি মত শাসন কায়েম রেখেছে। তবে চীনের সভ্যতা অনেক প্রাচীন বলে একদিনে বিনাশ হয়ে যাবে না। শাস্ত্র থেকে যখনই

নিষ্ঠা চলে যাবে এবার বুঝতে হবে সমাজের ভেতরটা ধীরে ধীরে ফাঁপা হতে শুরু হল। এরপর কোন বর্বর জাতি এসে একটা ধাক্কা মারবে, সবটাই ছাড়খাড় হয়ে যাবে। ইতিহাসে এই জিনিসটাই দেখা যায়, রোমানদের সাথে তাই হয়েছে, পুরো গ্রীক সভ্যতায়ও তাই হয়েছে। আদিম কালের ইতিহাস, আজকের ইতিহাস, যে কালেই যাওয়া হোক না কেন, সব কালে এটাই হয়েছে। কারণ শাস্ত্র মানুষকে শক্তি দেয়, সে জানে আমার এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। খ্রীশ্চানদের যে হাজার বছরের Dark Agesএর কথা বলা হয়, সেই সময় তারা সব কিছুই চালিয়ে গেছে, কিন্তু বাইবেলের মূল ভাব থেকে চার্চ এত দূরে সরে এসেছিল যে লোকেরা চার্চে আসা বন্ধই করে দিয়েছিল। কিন্তু অন্য দিকে বাইবেল খুব উচ্চমানের ধর্মগ্রন্থ, কিছু লোক ছিলেন যাঁরা ঐ সময়েও বাইবেলকে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে বিজ্ঞান এসে এমন এক ধাক্কা মারল পুরো খ্রীশ্চান ধর্মটাই বিরাট সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিল। এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল, সিদ্ধ পুরুষ ভালো করেই জানেন তিনি যদি শাস্ত্রের আচরণ ছেড়ে দেন অন্যরাও শাস্ত্রের আচরণ ছেড়ে দেবে। গীতায় ভগবান বলছেন, *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*, শ্রেষ্ঠ পুরুষ যা যা আচরণ করেন সাধারণ মানুষ সেটাকেই অনুসরণ করে। সেইজন্য সিদ্ধ পুরুষরা শাস্ত্র সঙ্গে রাখেন। ঠাকুর সব শাস্ত্র শুনতেন, ভাগবতে, অধ্যাত্ম রামায়ণে কি আছে তিনি শুনতেন, পরে পরে শাস্ত্রের কথাগুলোই ভক্তদের কাছে বলতেন, যাতে সাধারণ মানুষ শাস্ত্রকে না ছেড়ে দেয়। ঠাকুরের নিজের জন্য কোন শাস্ত্রের দরকার নেই, কিন্তু তিনিও ধরে রাখছেন অপরের মঙ্গলের জন্য।

শাস্ত্ররক্ষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে যাঁরা আরেকটু উচ্চমানের তাঁরা নতুন শাস্ত্র রচনা করেন যাতে সমাজে নতুন করে প্রাণের জোয়ার আসে। এই ব্যাপারটা সব ধর্মেই আছে। যেমন খ্রীশ্চানদের বাইবেল হল সর্বোপরি, বাইবেলের সাথে কারুর তুলনা হয় না; কিন্তু খ্রীশ্চান পরম্পরায় যাঁরা সাধনা করেছেন এবং সিদ্ধির একটা অবস্থায় চলে গেছেন, তাঁরাও প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই ধরণের গ্রন্থকে বাইবেলের সাথে কখনই তুলনা করা হয় না, খ্রীশ্চান ধর্ম খুব কড়া ধর্ম, তাদের মূল শাস্ত্র বাইবেলের সাথে কোন আপোষ করতে দেবে না। কিন্তু এগুলো সবই শাস্ত্র আর খ্রীশ্চানরা নিয়মিত অধ্যয়ন করেন, বাইবেলের উপর যত ভাষ্য আছে সেগুলোও তাঁরা নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদেরও ঠিক তাই, আর হিন্দুদের তো শাস্ত্রের শেষ করা যাবে না। ভারতে প্রত্যেক একশ দুশো বছর পর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। ভারতে প্রথমে ছিল বেদ উপনিষদ, পরে এসে গেল বাল্মীকি রামায়ণ, তখনকার ইতিহাস আমাদের সঠিক জানা নেই। কিন্তু মোটামুটি মনুস্মৃতি আদি শাস্ত্র আসার পর অর্থাৎ গত দুই আড়াই হাজার বছরে যদি গড় হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে পর পর শাস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। যেমন তুলসীদাসের রামচরিতমানস, এটাও নতুন শাস্ত্র, একই কথা বলছেন, কিন্তু পুরো জিনিসটাকে নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে দিলেন। এইভাবে মীরাবাঈয়ের ভজন এসেছে, কবীর দাসের কবিতা এসেছে। কবীর দাসের যারা অনুগামী তাদের কাছেই কবীর দাসের রচনাটাই শাস্ত্র, ঐ শাস্ত্রের বাইরে তারা যায় না। ঠাকুর আসার পর কথামৃত এল, এটাই এই যুগের নতুন শাস্ত্র। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটা শাস্ত্র থাকবে, সেই সম্প্রদায়ের যিনি সিদ্ধ পুরুষ তিনি যে মহান কথাগুলো বলেছেন, সেই কথা বেদে আধারিত হতে পারে, বাইবেল বা কোরানে আধারিত হতে পারে, কিন্তু একজন সিদ্ধ পুরুষের মুখ থেকে আসছে বলে তার একটা আলাদা তাৎপর্য হয়ে যায়, তাদের কাছে এর একটা সম্মান থাকে, তার অনুগামীরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই শাস্ত্রকে পালন করে। যারা তাদের সম্প্রদায়ের নন, বাইরের সম্প্রদায়ের লোকেরাও ওই সব শাস্তকে সম্মানের সাথে অধ্যয়ন করেন। কবীর দাসের দোহা হোক, সুরদাসের ভজন হোক, কৃত্তিবাসেরই হোক, যারই হোক না কেন, সবাই পড়ে। সেইজন্য সিদ্ধ পুরুষরা যদি নিয়মতি আবির্ভূত হতে থাকেন তাঁদের হয়ে শাস্ত্রও প্রচুর আসতে থাকে। যে কোন ধর্মের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ঐ ধর্মে কত নতুন শাস্ত্র রচিত হয়েছে। কারণ সিদ্ধ পুরুষের কাজ শাস্ত্ররক্ষণ, তলোয়ার নিয়ে না, নতুন নতুন শাস্ত্র সৃষ্টি করে শাস্ত্ররক্ষণ করছেন। আর যিনি এসেছেন তিনি ঐ শাস্ত্রের মধ্যে নিজের আচরণকে বেঁধে রাখেন, কারণ ওখানেই তাঁর ভিত রয়েছে। এই ভাবে সিদ্ধ পুরুষরা শাস্ত্র রক্ষা করেন যাতে সমাজের রক্ষা হয়। শাস্ত্ররক্ষণ মানে শুধু শাস্ত্র অধ্যয়নের অর্থে নয়। শাস্ত্ররক্ষণ মানে, নিজের আচরণ দিয়ে লোকেদের মনে শাস্ত্রের ভাব ঢুকিয়ে দেন, তুমিও শাস্ত্র পালন কর। দ্বিতীয়, তাঁর কথাবার্তাই পরে নতুন একটা শাস্ত্র হয়ে যায়, যেটা দিয়ে সনাতন ধর্ম সজীবতা পেয়ে যায়। সেই প্রাণবন্ত সতেজতার জন্য মানুষ নতুন করে ধর্মের পথ ধরে। পরে দেখে সবই তো ওখানকারই কথা। যারা বেদ উপনিষদ, গীতা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা

কথামৃত পড়তে গিয়ে দেখেন, আরে ঠাকুর তো বেদ উপনিষদের কথাই বলছেন, কিন্তু যুগোপযোগী হয়ে এসেছে। শাস্ত্র রক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এই সূত্রের যেভাবে অর্থ করেছেন সেটা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকাররা এই সূত্রের অন্য রকম অর্থ করছেন। তাতে মনে হবে আট নম্বর সূত্র থেকে বারো নম্বর সূত্রে যেন ভূতেশানন্দজী মহারাজ সাধকদের কথা বলছেন, কিন্তু এখানে যে অর্থ করা হল সেটা সিদ্ধদের কথা বলা হল। এখানে কেউ ভুল বলছেন না, যিনি যে ভাষ্যকে অনুসরণ করবেন তাঁর কাছে ওটাই ঠিক। এই ধরণের সূত্রে এগুলো কোন সমস্যা নয়, যে কেউ এটাকে অন্য রকম ব্যাখ্যা করতেই পারেন।

গীতা উপনিষদের ভাষ্য রচনার করার পর আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য লেখা শুরু করলেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য খুব কঠিন, কঠোর ট্রেনিং না থাকলে বোঝবার উপায় নেই ওখানে কি বলতে চাইছেন। কিন্তু একবার যদি কেউ খেটেখুটে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বুঝে নিতে পারেন এরপর তিনি বেদান্ত ছাড়া অন্য কিছু পড়তেই চাইবেন না। আচার্য বদ্রিকাশ্রমে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের আরেকটা নাম বাদ্রায়ণ সূত্র, বাদ্রায়ণ ব্যাসদেবের নাম। বদ্রি মানে কুল, বলা হয় ব্যাসদেবের জন্ম কুলের জঙ্গলের মধ্যে হয়েছিল অথবা ব্যাসদেব যেখানে থাকতেন সেখানে প্রচুর কুলের জঙ্গল ছিল সেইজন্য তাঁর বাদ্রায়ণ আরেকটা নাম হয়ে গেল। ভগবান বিষ্ণুর আরেকটা নাম বদ্রী। জানা নেই ব্যাসদেবের নাম কেন বাদ্রায়ণ হয়েছিল। অনেকের বিশ্বাস যে ব্যাসদেব এখনও বেঁচে আছেন আর উনি বদ্রীকাশ্রমের কোন গুহার ভেতরে গভীর ধ্যান করে যাচ্ছেন, কেউ দেখতে পায় না। যে সময় আচার্য শঙ্কর বদ্রীকাশ্রমে ব্রহ্মসূত্র রচনা করছিলেন সেই সময় একদিন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে আচার্যের কাছে এসে ব্রহ্মসূত্র নিয়ে তর্ক করতে বসে গেলেন। উনি গিয়ে আচার্যকে বলছেন, শুনলাম আপনি ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য লিখছেন, আমাকে বলুন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাপারে আপনার কি মত। যাই হোক কিছু কথার পর ব্যাসদেব আচার্যের একটা সূত্র পড়ার পর বলছেন, এই সূত্রের এই অর্থ হবে না। আচার্য শঙ্কর তখন বলছেন, না, এই সূত্রের অর্থ এই রকমই হবে। এবার দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগে গেছে। শাস্ত্রের উপর এই তর্কাতর্কি অনেক পুরনো। আধ্যাত্মিক ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে, পরের দিকে শঙ্করাচার্য যত ভাষ্য দিলেন তার উপর রামানুজের তর্ক, এই দুজন যা লিখেছেন তার উপর মাধ্বাচার্যের তর্ক। এনাদের তিনজনের উপর পরে পরে অন্যান্য আচার্যরাও অনেক তর্ক নিয়ে এসেছেন। তবে এই তিনজনকে মূল বলা হয়। আচার্য শঙ্কর আর ব্যাসদেবের মধ্যে এমন তুমুল তর্ক লেগেছে যে কেউ থামতেই চাইছেন না। ব্রহ্মসূত্র স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখা, তাঁর বক্তব্যের উপর আচার্য তর্ক করে যাচ্ছেন। শেষে ব্যাসদেব খুব চটে গেছেন, এমন চটে গেছেন যে রেগে গিয়ে এক চড় মেরেছেন শঙ্করাচার্যকে। শঙ্করাচার্য খুব নরম করে বললেন, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? তর্কের নিয়মই ছিল, যে রেগে গেল সে হেরে গেল। মণ্ডন মিশ্রেরও তাই হয়েছিল। শেষে ব্যাসদেব মেনে নিয়েছেন। এগুলো আখ্যায়িকা, আচার্যের শিষ্যরা পরে তাঁদের গুরুর জীবনী লিখেছেন, সেটাও আবার লিখেছেন তিনশ চারশ বছর পর, এগুলোকে পরীক্ষা করার কোন পথও নেই। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হল শঙ্করাচার্যের যে মত এটাই ঠিক মত। তার সাথে কাহিনীর বাইরের খোলসটাও ঠিক, এই সূত্রগুলোকে যেভাবে কেউ ব্যাখ্যা করে চায় করতে পারে। ব্যাখ্যা যেমন খুশী করে দিতে পারে কিন্তু এর একেবারে মূলে একটা নিয়ম আছে, বক্তব্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে, যেন এক রূপ থাকে। সেইজন্য ভক্তসূত্রে বা যে কোন এই ধরণের সূত্রের ব্যাখ্যা কোথাও এই ভাবে করা হয়েছে, আবার কোথাও একটু অন্য ভাবে করা হয়েছে। আর এগুলোকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক অশান্তি লেগে যায়। নারদ ভক্তিসূত্রের যে প্রথম অধ্যায় এর নামই পরা ভক্তির লক্ষণ, সেটা আবার মূল সূত্রে নেই, পরে পরে এনারা যোগ করেছেন। পরা ভক্তির লক্ষণ মানেই হয় সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। কিন্তু নিজে থেকে এই সূত্র পড়তে গেলে মনে হবে যাঁরা পরা ভক্তির সাধক তাঁদের কি কর্তব্য সেটাও যেন বলতে চাইছেন। সেইজন্য ঐ ভাবেও বলা যায় যে ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবাক্য মেনে চলা প্রয়োজন। যেহেতু প্রথম থেকে আমরা সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণকে নিয়ে চলছি বলে ওটাকে মাঝ পথে আর পাল্টানো যাবে না। শাস্ত্ররক্ষণম্ এর অর্থ হল সিদ্ধ পুরুষরা শাস্ত্রের রক্ষণ করেন। সাধকের দৃষ্টিতে দেখলে এর অর্থ হবে, শাস্ত্রের কথাকে এনারা কোন ভাবেই অতিক্রম করেন না। আমাদের যত শাস্ত্র আছে সেখানে যখন সিদ্ধ পুরুষ, পরমহংস, ত্রিগুণাতীতের কথা আসে তাঁরা দেখান এনারাও কিভাবে শাস্ত্রের কথা মেনে চলেন। একশ ভাগই মানেন না, এর পরেই আসবে কেন মানেন না, কিন্তু মানেন।

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া।।১৩।।

এখানে সাধকদের দৃষ্টিতে বলছেন, যদি শাস্ত্রকে অনুসরণ না করা হয় তাহলে পতিত হয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে। সিদ্ধ পুরুষদের দৃষ্টিতে দেখলে তখন এর অর্থ হবে, ভক্তির পরম অবস্থাতে যদি কেউ অবস্থিত না থাকে, অর্থাৎ *সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা*, ঐ পরম প্রেমরূপে যদি না প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে কিন্তু পতিত হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। কারণ সে পরম প্রেমরূপে অবস্থিত নেই। সুতোর একটু আঁশ যদি বেরিয়ে থাকে আর ছুঁচে ঢুকবে না। সেই রকম একটু আমি যদি থাকে তাহলে পতনের ভয় সব সময় থাকবে। *অন্যথা* মানে যদি পরমপ্রেম রূপে না থাকে। কিন্তু একবার যদি কেউ ঈশ্বরের পরমপ্রেম রূপের ভাবটা নিয়ে নেন, যিনি পরা ভক্তিতে সিদ্ধ হয়ে যান সেখান থেকে তাঁর আর পতনের ভয় থাকে না। একবার যার আগুনে হাত পুড়ে গেছে সে আর জীবনে কোন দিন আগুনে হাত দিতে যাবে না। এই ধরণের সিদ্ধ পুরুষদের নিজেদের কোন পতনের ভয় থাকে না ঠিকই কিন্তু এনারা খুব সাবধান হয়ে যান যাতে তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের যেন পতন না হয়ে যায়। সেইজন্য তাঁরা একদিকে যেমন নিজের ব্যবহার, আচরণ শাস্ত্র সম্মত রাখেন আর লোকবেদের ব্যাপারেও ভক্তি জিনিসটাকেই রাখেন, যার সম্বন্ধে এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো না করলে অনেক রকম গুরুতর সমস্যা হয়ে যেতে পারে। ঠাকুর যেমন বলছেন, আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি তোরা ঘুরে ঘুরে প্রস্বাব করবি।

রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। সীতা শ্রীরামকে বলছেন, সুগ্রীব আর তার বানর সেনারা আমাদের জন্য কত কিছু করল ওদের একদিন খুব ভালো করে খাওয়াতে হবে। সীতার কথা মত সব বানর ভাল্লুকদের জন্য ফলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে হনুমানের খুব দুশ্চিন্তা হয়ে গেছে, সব বানরের স্বভাব, ওখানে গিয়ে সবাই মিলে কি করবে কোন ঠিক নেই। হনুমান সেইজন্য সব বানরদের বলে দিলেন, তোমরা সব সময় আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে আর আমি যেমন যেমন ব্যবহার করব তার একটুও যেন এদিক সেদিক না হয়। *অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া*। একটু যদি এদিক সেদিক হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের পতন হয়ে যাবে। বানরগুলো ফল খেতে শুরু করেছে আর চুপি চুপি হনুমানের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে হনুমান কি করছেন। হনুমান কলা ছাড়াচ্ছে এরাও কলা ছাড়াচ্ছে, কলা মুখে দিচ্ছে ওরাও মুখে দিচ্ছে। এই রকম করতে করতে একটা সবেদা ফল নিয়ে ওর বীজটা বার করার জন্য টিপেছেন, বীজটা না বেরোনয় হনুমান একটু জোরে টিপতে বীজটা লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বানর গুলো সবেদা নিয়ে জোরে টিপেছে বীজটাও লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে, পাশের বানরের বীজটা আরও জোরে লাফিয়েছে। পাশের বানরটা বলছে, তোর বীজটা ঠিক ভাবে বেরল না, এই দেখ। বলে আরও জোরে টিপেছে। হনুমান ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়েছেন। কটমট করে তাকাতে ওরা ভেবেছে বীজটা ঠিক মত বেরোচ্ছে না, সেইজন্য আরও জোরে টিপেছে, বীজটাও জোর লাফিয়েছে। ইতিমধ্যে বানরগুলো সব ভুলে গেছে। হনুমানও গটমট করে তাকাচ্ছেন, হনুমান যত রাগছে এরা তত ভাবছে বীজটাকে আরও জোরে বার করতে হবে। এবার সবাই মিলে সবেদা নিচ্ছে আর খুব জোরে টিপছে যাতে বীজটা লাফায়। শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা অবাক হয়ে বানরদের কাণ্ড দেখছেন, বলছেন, ঐ দেখ ওদের ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। এ বলছে আমার বীজ বেশি দূরে গেছে, ও বলছে তোরটা আর কত দূর গেছে আমার বীজটা তোর থেকেও বেশি দূরে গেছে, শেষে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। কার বীজ কত উপরে গেছে। ওরা ভাবছে হনুমান এটাই তাদের করার জন্য বলেছেন।

সিদ্ধ পুরুষ তাঁর অনুভূতির রাজ্যে এমন ডুবে থাকেন যেখান থেকে তাঁর আর কোন ভয় থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শাস্ত্রের অনুকূল আচরণ করেন। আর লোক ব্যবহার, ধর্মের আচরণের ব্যাপারে ঠিক ততটুকুই করেন যেটা তাঁকে ভক্তির দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আচার যদি ভক্তির দিকে না নিয়ে যায়, যদি আচার সর্বস্ব হয়, সেই সব আচারের দিকে তিনি যাবেন না। রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে বসেছেন, বসে বসে তিনি বিষয় চিন্তা করছিলেন, ঠাকুর তাকে এক চাপড় দিলেন। কারণ ঠাকুরের কাছে পূজা হল ভক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভক্তির উন্মেষ যদি না হয় শুধু আচার করে কোন লাভ নেই। সাধকের দিক থেকে বলা হচ্ছে, যতক্ষণ তোমার সিদ্ধি না হয়ে যায় ততক্ষণ শাস্ত্রকে তোমার ধরে রাখতে হবে, শাস্ত্র থেকে সরে থাকলে তোমার পতন হয়ে যাবে।

জীবনে দুটো জিনিস থাকে, একটা লক্ষ্য আরেকটা পথ। জীবনের লক্ষ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হিন্দু মতে পথটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মানুষ চাইছে আমার দুটো টাকা হোক, লক্ষ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, টাকা না থাকলে জীবন চলবে না। যখন পরিষ্কার হয়ে গেল আমার টাকা চাই, এবার আমি যেভাবেই টাকা আয় করি না কেন তাতে কি আস যায়! পরিশ্রম করেই টাকা আয় করি, চুরি ডাকাতি করেই টাকা আয় করি, তাতে কি আসে যায়। হিন্দু ধর্ম এর অনুমতি দেয় না। হিন্দু মতে আরও সমস্যা হল, ওরা লক্ষ্যকে কোন দামই দেয় না। হিন্দু ধর্মের কাছে হল ধর্ম, তুমি তোমার ধর্ম পালন কর। বিশাল সমুদ্রে তোমার নৌকা ভাসছে, নৌকাকে তুমি চালিয়ে যাও, দিশাটাকে ঠিক করে নাও, নৌকা চলতে থাকুক। ভারতবর্ষ গত পাঁচ হাজার সাত হাজার বছর যাবৎ এই ভাব নিয়ে ছিল। তুমি ছুতোর মিস্ত্রি, ঐ কাজই তুমি নিষ্ঠার সাথে করে যাও, দেখবে তুমি নিজেই যেখানে পৌঁছাবার কথা সেখানে পৌঁছে গেছ। তুমি ব্রাহ্মণ, কাউকে ঠকিও না, নিজের মত সব কিছু নিষ্ঠার সাথে করে যাও। একবিংশ শতাব্দীতে এসে সব অন্য রকম হয়ে গেছে, আমাদের কাছে এখন জীবনের গুরুত্ব বেশি, জীবনে সুখের গুরুত্ব শতগুণ বেড়ে গেছে। সংরক্ষণ চাই, সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চাই, কাউকে যদি মারতে হয় মেরে দাও, কাউকে যদি ঠকাতে হয় ঠকিয়ে দাও, গুরুত্ব হয়ে গেছে পথের। এখন যদি ভগবত ভক্তি উদ্দেশ্য হয় তাহলে যেটা করলে ভক্তিতে বুঁদ হয়ে থাকা যায় সেটাই করা যাবে। গাঁজা খেলে মনে হবে আমার জীবনে কোন দুঃখ নেই, মনটা যেন বাতাসের মত ভাসছে। বোম্ ভোলা বলে গাঁজাতে টান দিলেই হয়ে গেল। ভাঙ, মদ খেলে ভক্তির আমেজটা জোর আসে। শাস্ত্র এগুলোকে নিষেধ করছেন, বাইরে কোন উত্তেজক বস্তু নেওয়া যাবে না। শাস্ত্রের বাইরে যাওয়া চলবে না। মহাপুরুষরা যদি শাস্ত্রের বাইরে যান বাকিরা আরও বেশি শাস্ত্রের বাইরে যাবে। তন্ত্র মতকে যে ভারত গ্রহণ করল না, তার কারণটাই ছিল, আমাদের পরম্পরার যে শাস্ত্র ছিল সেই শাস্ত্র মতে তন্ত্র চলেনি। তন্ত্র এমন এমন কিছু পথ অবলম্বন করেছে যা আমাদের ঐতিহ্যে যেসব পথের কথা বলা হয়েছে তার সাথে খাপ খায় না। ফলে সাধারণ লোকের এতে পতন হবেই। খুব উচ্চমানের সাধক না হলে তন্ত্রে পতন হবেই হবে, কারণ ঐ ঐতিহ্যের শাস্ত্রের সাথে তন্ত্রের আচারের মিল নেই। ইদানিং কালে এত যে বাবাজীদের আবির্ভাব হয়েছে, যদি খুব কাছ থেকে এনাদের জীবন, এনাদের আচরণকে খতিয়ে দেখা হয়, দেখা যাবে এদের কোনটাই শাস্ত্রের সঙ্গে মিলছে না। সেইজন্য বলছেন যদি শাস্ত্রের আচরণ না করা হয় তাহলে *অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া*, আশেপাশে যারা আছে সবাই গোল্লায় যাবে।

লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্তাশরীরধারণাবধি।।১৪।।

সিদ্ধ পুরুষকে নিয়েই বলছেন। তাঁর সব রকম লোক ব্যবহার, তাঁর সাংসারিক কর্ম, সাংসারিক ধর্ম, সাংসারিক হাবভাব, তাঁর হাটাচলা, সবটাই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোথায় হয়ে যায়? বলছেন *ভোজনাদিব্যাপারস্তু*। সিদ্ধ পুরুষরা পাঁচটা জিনিসে নিজেকে জড়ান না। লোকব্যবহার ততটুকুই করবেন যতটুকুতে তাঁর শরীর ধারণের কাজ চলে যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ শরীর ধারণ করে আছেন ততক্ষণ ভোজনাদি ব্যাপারে অতটুকু নিয়ম মানেন। এর বাইরে যা কিছু আছে সব এমনি খসে পড়ে যায়, ওদিকে ওনারা তাকাবেনও না। সিদ্ধ পুরুষ, যিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে যান, তাঁদের আর কোন কিছুতে বন্ধন থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রের কথা তাঁরাও পালন করেন যাতে বাকিদের বুদ্ধি ভ্রমিত না হয়ে যায়। আর যে শাস্ত্রকে আধার করে তিনি বড় হয়েছেন সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁর সম্মান থাকে। শাস্ত্র তো সব কথা বলেন না, যেমন উপনিষদ সব কথা বলছে না, তার কিছু বাকি কথা গীতা বলছে, গীতাতেও সব কথা বলছেন না, আরও কিছু কথা মনুস্মৃতিতে বলছেন। মনুস্মৃতিতে ছোটখাটো সব কথাই বলছেন, তার মধ্যেও অনেক কথা অনুপস্থিত থেকে যায়। যেমন রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, রাজার কাছে যাব, রাজার কাছে যাওয়ার সময় আমি কি রকম পোশাক পড়ে যাব সেটা মনু বলে দেননি। তখন স্থানীয় যে প্রথা আছে, লোকেরা যেভাবে চলেন, ঐ জিনিসটুকুকে নিয়েই সিদ্ধ পুরুষরা চলেন যাতে অপরের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়। শরীর ধরে রাখার জন্য যতটুকু কাজ করার দরকার সেটুকুই করবেন, ততটুকুর বাইরে তাঁরা দৃষ্টি দেন না। যেমন অনেক জাঁকজমক করে খাওয়া-দাওয়া করা, বড় বাড়ি বানাতে হবে, ঐদিকে তাঁরা দৃষ্টিই দেবেন না।

শাস্ত্রে যেমন সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলা নেই, তেমনি সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু পাল্টেও গেছে। যেমন মনুর সময় টুথপেস্টের ব্যবহার ছিল না, উনি দাঁত কাঠির ব্যবহারের কথা বলছেন। বর্তমান কালে দাঁতকাঠি উঠে গেছে, তাহলে পেস্ট ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না? বলছেন, ওনারা ওটাই পালন

করেন যেটা সমাজে চলছে। ঐ পালন করার জন্য কি হয়, এনারা যে জিনিসগুলো করেন সেগুলোই ধীরে ধীরে নতুন প্রথা ও নিয়ম হয়ে যায়। এই নতুন নিয়ম দিয়েই নতুন স্মৃতি তৈরী হয়। আগে হিন্দুদের কিছু কিছু জিনিস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, সেই খাওয়াটাও এখন ধীরে ধীরে হিন্দুদের মধ্যে ঢুকে গেছে। যেমন পেঁয়াজ, হিন্দুরা কখন পেঁয়াজ খেত না, পেঁয়াজ ছিল মুসলমানী খাওয়া। ডিম, মুরগীর মাংস হিন্দুরা কিছুতেই খেত না। কিন্তু এগুলোও এখন ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে। মুরগীর মাংস খাওয়ার ব্যাপারে মনুস্মৃতিতে কড়া ভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু খুব অর্থোডক্স কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া সব হিন্দুরাই এখন মুরগীর মাংস খাচ্ছে। স্বামীজী দেশে বিদেশে ঘুরছেন, ওনাকে যেখানে যে যা দিত উনি খেয়ে নিতেন। যখন এই নিয়ে একটু হৈ চৈ হতে শুরু করল তখন স্বামীজী বলছেন, আমার গুরু আমাকে বলে দিয়েছেন, তোকে যেখানে যা দেবে খাবি। তা নাহলে সমস্যা হয়ে যাবে, আমেরিকায় যখন আছেন তখন ওখানকার মতই থাকতে হবে। মহাপুরুষরা যাই করেন সেটা তিনি একটা যুগকে কেন্দ্র করে করেন, তখন ঐ জিনিসগুলোই আবার একটা নতুন স্মৃতি হয়ে যায়। মুসলমানদের ব্যাপারটা আলাদা, মহম্মদ যা করেছেন তার বাইরে ওরা কিছু করবে না। আরবের মরুভূমিতে আজ থেকে পনেরশ বছর আগে মহম্মদ যা করেছিলেন, আজকে ভারতের জল হাওয়াতে, ভারতের ধর্ম ভূমিতে মুসলমানরা ওটাই করতে চায়। আমাদের এখানে বলছেন, সিদ্ধ পুরুষদের লোক ব্যবহার যেটা হবে, তঁদের পুরো আচরণ এর মধ্যেই বাঁধা থাকবে। আর ওনারা যা যা আচরণ করবেন সেই আচরণই তাঁর অনুগামীরা পালন করতে থাকেন, সেটাই আবার নতুন স্মৃতি রূপে সমাজকে একটু একটু করে পরিবর্তিত করতে থাকে। তার ফলে, সিদ্ধ পুরুষদের জন্য মূল ধর্মের অনেক কিছু জিনিস পাল্টে যায়। এভাবে পরিবর্তিত না হলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন জহুদি ধর্মের, জহুদি ধর্মে একটা সাবাথ ডে পালন করা হত। জহুদিদের মতে ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি ছয়দিন ধরে সৃষ্টি করলেন, সপ্তম দিনে উনি বিশ্রাম নিলেন, সপ্তম দিনে জহুদিরা তাই কোন কাজ করত না। যীশু সপ্তম দিনেও লেকচার দিয়ে বেড়াতেন। যীশুকে এই নিয়ে বলাতে তিনি বলছেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যার বাছুর যদি সাবাথ ডেতে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় সে তাকে বার করে আনবে না? অবশ্যই আনবে। মানুষ গর্তে পড়ে আছে, গর্ত থেকে বার করে আনার জন্য আমি ধর্মশিক্ষার কাজ করে যাবে, তাতে কি আছে! এখানে একটা ব্যাতিক্রম হয়ে গেল, সাবাথ ডে এত নিয়ন্ত্রিত দিন, সেটাকে যীশু সরিয়ে দিলেন। ঠাকুর বলছেন একাদশীর দিন ফলমূল খেয়ে একাদশী করবে। আগেকার দিনে যারা একাদশী ব্রত পালন করতেন তাঁরা পুরো উপোস করেই করতেন, ঠাকুর একাদশী ব্রতে ফলমূল খাওয়ার অনুমোদন করে দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকজন মহিলা উপোস করে এসেছেন, ঠাকুর তাদের নিষেধ করে দিচ্ছেন তোমরা উপোস করবে না। মহাপুরুষরা এভাবে অনেক নিয়মকে পাল্টে দেন। যত দিন শরীর ধারণ করে থাকবেন তত দিন শরীরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে আর রাখা যাবে। বলছেন *লোকোহপি তাবদেব*, সমাজের মত কতটুকু করবেন?

প্রথমে বলছেন, ঠিক ততটুকু আচরণ করেন যাতে সমাজ গোল্লায় না চলে যায়। তিনি যে কিছু করতে বাধ্য তা নয়, কিন্তু মানুষ তাঁকে দেখুক, তাঁর দিকে সবার দৃষ্টি পড়ুক এই জিনিস তাঁরা কখনই চান না। ঠাকুর একবার গাড়ি থেকে নেমে রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি ভাবের অবস্থায়, সেই সময় একজন তাঁকে ধরতে গেছে। ঠাকুর তাকে ধমক দিয়েছেন, আমাকে এখানে ধরবে না, লোকে মনে করবে মাতাল। অল্প বয়সী ছেলেরা দেখলে বলবে, দেখো ইনি মদ খেয়ে টলতে টলতে যাচ্ছেন। ওটাই পরে এরা নকল করবে বা চারজন মিলে মজা করবে। এই জিনিস তাঁরা কখনই করবে না। জামা-কাপড় এমন ভাবে পরিধান করবেন যাতে দৃষ্টিকটু না লাগে। মহারাজরা যখন বিদেশে যান সেখানে তাঁরা প্যান্ট-শার্ট পড়েন, কারণ ওখানে সন্ন্যাসীর পোশাক দৃষ্টিকটু লাগবে, সবারই চোখে পড়বে। অকারণে ওনারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যান না। তাছাড়া সমাজে লোকেদের মনের ভাবে যাতে কোন আঘাত না লাগে সেই দিকেও তাঁদের দৃষ্টি থাকে। নাগা সাধুরা পোশাক ব্যবহার করে না, সেইজন্য তাঁদের নিষেধ আছে, সমাজে তাঁরা চলাফেরা করবেন না। কুম্ভ বা সাধুদের কোন মেলা ছাড়া নাগা সন্ন্যাসীদের কোথাও দেখা যায় না। আপনি হয়ত ত্রিগুণাতীত হতে পারেন, কিন্তু সমাজের প্রচলিত আচার নীতি অনুযায়ীই আপনাকে চলতে হবে, অন্য রকম আচরণ করা চলবে না। ত্রৈলঙ্গ স্বামী সিদ্ধ পুরুষ, তিনি পোষাকাদি ব্যবহার করতেন না। বৃটিশ আমলে এই নিয়ে অনেক অশান্তি

লেগেছিল। পরে যখন দেখল ইনি একজন সিদ্ধ পুরুষ তখন এই নিয়ে বেশি আর হৈ চৈ করল না। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষরা এমন কিছু করেন না যাতে দৃষ্টিকটু লাগ।

এখানে ভোজনাদির কথা বলা মানে শুধু ভোজনকে নিয়েই বলা হচ্ছে না, ভোজনের সাথে প্রত্যেকটি কাজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধ পুরুষের ছোট থেকে বড় যত রকমের কাজ হয় সব কাজই এমন ভাবে করেন যাতে এই তিনটে জিনিস না হয়, অপরে যাতে তাঁকে অনুসরণ করে গোল্লায় না যায়, দ্বিতীয় অপরের দৃষ্টি যাতে তাঁর দিকে বেশি আকর্ষিত না হয় আর তৃতীয় সমাজে কারুর মনে যাতে কোন ক্ষোভ না হয়। শেষে বলছেন *শরীরধারণাবধি*, নিজের শরীর স্বাস্থ্যটাও যেন ঠিক থাকে। নিজের শরীর ধারণের জন্য আর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়ের ব্যবহার এমন ভাবে করবেন যাতে শরীরটা সুস্থ থাকে, অপরের যেন পতন না হয়ে যায়, বেশি দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় ইত্যাদি। বলরাম বসু ছিলেন বৈষ্ণব, জীবহত্যা করবেন না, দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখছেন ঠাকুর ছারপোকা মারছেন। চোদ্দ নম্বর সূত্রে মশা মারা, ছারপোকা, আরশোলা মারা অনুমোদন করছেন, যাতে তোমার শরীর ঠিক থাকে, তুমি যেন সুস্থ থাক। তা নাহলে মূল জিনিসটাই গোলমাল হয়ে যাবে, আর তোমাকে নকল করে বাকিদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। এতক্ষণ সিদ্ধ পুরুষদের লক্ষণের কথা বলা হল, এবার ধীরে ধীরে সাধকদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করছেন, পরের সূত্রে সাধকের কথা বলছেন –

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ।।১৫।।

অমৃতস্বরূপা, মত্ত ভবতি, স্তব্ধো ভবতি আলোচনা করার পর বলে দিলেন শাস্ত্ররক্ষণে মন দেওয়া, খাওয়া-দাওয়াও যতটুকু দরকার তার বাইরে যান না ইত্যাদি। ভক্তির কথা নারদ যদিও বলেছেন কিন্তু এগুলোকে সাধনায় নামাতে গেলে সাধারণ স্তরের সাধকদের ক্ষেত্রে তখন কিভাবে হবে, *তল্লক্ষণানি*, তার লক্ষণ কি হবে? ভক্তির অনুশীলন যাঁরা করবেন তাঁদের ভক্তির কি লক্ষণ হবে? ভক্তির লক্ষণ বলতে বোঝায় ভালো ভক্তের কি লক্ষণ, সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণের কথা বলছেন না। ভক্তি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে বা আমরা কিভাবে বুঝবো ইনি একজন ভালো ভক্ত। নারদ এর উত্তরে বলছেন *বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ*, এই ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। একটা বিষয়কে নিয়ে আমরা এর আগে অনেকবার আলোচনা করেছি, এটাকে আমাদের মনের মধ্যে বসিয়ে নিতে হবে। আমাদের কাছে ভগবান হলেন অনন্ত, ঠাকুর বলছেন তাঁর ইতি করা যায় না। আমাদের মন সীমিত, কারণ মন জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী। সান্ত কখন অনন্তকে চিন্তা করতে পারে না, এক সের ঘটিতে দু সের দুধ ধরবে না। আমরা যখনই অনন্তকে ভাবি বা অনন্ত বলছি তখন জাগতিক অর্থে আমরা সমুদ্রের কল্পনা করি বা আকাশের কল্পনা করি, কিন্তু এটাও সীমিত, সমুদ্র বা আকাশের ইতি আছে। পদার্থ বিজ্ঞানে কখন অনন্তের কথা বলা হয় না। মজা করে বলা হয় যে পদার্থ বিজ্ঞানীরা যখন কাজ করেন তখন ইক্যুয়েশানে যদি ইনফিনিটি এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই তাঁরা থেমে যান, এবং বলেন ইনফিনিটি এসে গেছে আর এগোনো যাবে না। গণিতে গণিতজ্ঞরা ইনফিনিটিকে নিয়ে প্রচুর খেলা করেন, গণিতে ইনফিনিটি একটা abstract term। কিন্তু অনন্ত মানেই ঈশ্বর, অনন্ত একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর বাদে যা কিছু আছে সবই সীমিত। আমরা এই জিনিসটা বুঝি না তাই মানতেও চাই না। থিয়োরিটিক্যালি যেখানে বুদ্ধির খেলা চলে যেমন আমরা বলি ওয়ান বাই জিরো মানে ইনফাইনাইট, এগুলো হল বুদ্ধির খেলা।

ইনফাইনাইটের উপর একটা বই আছে তাতে অনন্তকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে অনেক মজার মজার ব্যাপার বেরিয়ে আসে। এর উপর পরে একটা সিনেমাও হয়েছিল। ইনফাইনাইটকে নিয়ে একটু যদি ধারণা করতে যাই, জিনিসটা ঠিক কি দাঁড়াবে? বলছেন একটা হোটেল আছে, হোটেলটা ইনফাইনাইট। ঐ ইনফিনিটি হোটেলে অনন্ত ঘর, অনন্ত ঘরে অনন্ত লোক থাকে। হোটেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে খরচ হয় তার সংখ্যাও অনন্ত, আর হোটেলের ট্যাক্স ভরতে হয় অনন্ত। হোটেলের অনন্ত খরচ, অনন্ত ট্যাক্স। তাহলে হোটেলের কত প্রফিট থাকল? বলছেন মুনাফাও অনন্ত। আর কপাল এমন তার লোকসানও হয়ে গেছে অনন্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুনাফাও অনন্ত। এখন হোটেলের অনন্ত সংখ্যার ঘরের প্রত্যেকটি ঘরে খদ্দের আছে। এবার একজন নতুন খদ্দের এসে গেল, তার ঘর চাই। এবার কি হবে, তাকে কি ঘর দেওয়া সম্ভব হবে? বলছেন, অনন্ত ঘরের সব ঘরে লোক বসে আছে, সেখানেও আরকেজন কেউ এসে গেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। কি করে দেওয়া যাবে?

এক নম্বর ঘরে যে আছে তাকে বলা হবে দু নম্বর ঘরে চলে যেতে, দু নম্বরের লোককে তিন নম্বর ঘরে চলে যাবে এইভাবে ইনফাইনাইট সিরিজটা চলতে থাকবে। এদিকে এক নম্বর ঘরে নতুন লোকটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এভাবে কেন সম্ভব হবে? কারণ অনন্ত যোগ অনন্ত সমান অনন্ত। তাহলে অনন্ত বিয়োগ অনন্ত কত হবে? অনন্ত, *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।* পূর্ণ থেকে পূর্ণকে নিলে পূর্ণই থাকে। এটাকে ধারণা করা অসম্ভব। ইনফিনিটিকে নিয়ে যে পদার্থ বিজ্ঞানীরা এত কিছু করছেন, তার কারণ এর পুরোটাই একটা বিজ্ঞান। ভগবানই একমাত্র অনন্ত, পদার্থ বিজ্ঞানীরা বা গণিতজ্ঞরা যে ইনফিনিটি নিয়ে কথা বলেন সেই ইনফাইনাইট ধর্মে আসে না, এখানে ভগবানই অনন্ত। ভগবান যদি অনন্ত হন, সেই ভগবানকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি নিজের মন দিয়ে। মন সব সময় সীমিত। ব্যাসদেবই হন আর শ্রীরামকৃষ্ণই হন অনন্তের শেষ কথা কেউ বলতে পারবেন না। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন, চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এক দানা চিনি মুখে করে নিয়ে যাওয়ার সময় বলছে, পরের বার এসে পুরো পাহাড়টাই নিয়ে যাব। শুকদেব আদি এনার হলে ডেঁও পিঁপড়ে, হদ্দ দুটো কি তিনটে চিনির দানা মুখে করে নিয়ে আসতে পারেন। তাতেই বলছেন পুরো পাহাড়টা নিয়ে যাবেন। এগুলো ধারণা করা সহজ নয়। ঠাকুর বলে গেছেন, আমরা বলছি শুনছি এই পর্যন্ত ঠিক আছে। ঈশ্বর যে অনন্ত এটাকে বোঝানো অসম্ভব। তার কারণ, অনন্তের যে খুব ছোট অংশ সেটাও অনন্ত। সেই রকম অনন্তের খুব ছোট্ট একটা অংশ হলেন আত্মা, কিন্তু আত্মাও অনন্ত। কারণ অনন্তের যে অংশ সেটা কখনই সীমিত হয় না। সেই আত্মজ্ঞানকে আমরা জানতে চাইছি নিজের নিজের মন বুদ্ধি দিয়ে বা ঈশ্বরকে জানতে চাইছি বুদ্ধি দিয়ে যে মন বুদ্ধি সীমিত। তাহলে কি জানা যাবে না? অবশ্যই জানা যাবে, কিন্তু জানবে কয়েকজন অন্ধ যেভাবে একটা হাতিকে জানছে।

অনন্ত বা অদ্বৈতকে বোধে বোধ করা যায় কিন্তু মুখে অবতাররাও বলতে পারেন না। অবতার বা আত্মজ্ঞানীর শিষ্যরা যদি বোধে বোধ করে থাকেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু বোধে বোধ যদি না হয়ে থাকে তখন বলবেন, আমার অদ্বৈত তোর অদ্বৈত থেকে বড়। যখন বলছে আল্লাই শ্রেষ্ঠ তখন এটাই বলতে চাইছে আমার অনন্ত তোমার অনন্ত থেকে বড়। বৈষ্ণবরা বলে কৃষ্ণ কালী থেকে বড়, শাক্তরা বলে আমার মা কালীর ধারে কাছে কেউ আসবে না। ঠাকুর আসার পর এগুলোকে কেউ আর বেশি গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু ঠাকুর আসার আগে এগুলো খুব ছিল। এখনও যে একেবারে চলে গেছে তা নয়। মুখে আমরা বলতে পারি ঈশ্বর এক কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে বেলুড় মঠের যে ভক্ত প্রতি বছর তিরুপতি যাচ্ছে তার কাছে তিরুপতিতে যিনি অনন্ত তিনি বেলুড় মঠের যিনি অনন্ত তাঁর থেকে বেশি অনন্ত, আমার কৃষ্ণ কালী থেকে থেকে বেশি অনন্ত, আমার কালী কৃষ্ণ থেকে বেশি অদ্বৈত। খুব বিচিত্র জিনিস। কারণ আমরা যা কিছু বুঝছি, ধারণা করছি, সব এই সীমিত মন দিয়েই করছি। যাদের বোধে বোধ হয়নি একমাত্র তারাই এই ভাষায় কথা বলেন।

একজন খুব খেটেখুটে বোধে বোধ হয়ে গেল। বোধে বোধ হয়ে গেলে দুটি জিনিস হবে। এক, যেখানে গিয়ে যাঁর বোধে বোধ হয়ে গেল ওখানেই তিনি শেষ, সচ্চিদানন্দকে জানার যে আনন্দ সেই আনন্দে তাঁরা জীবনে আর মুখ খোলেন না। দুই, কেউ কেউ মুখ খোলেন। কেন মুখ খোলেন এটাও একটা রহস্য, আমরা জানি না। ঠাকুর বলছেন তিনি কাউকে কাউকে আদেশ করেন। আবার যাদের সেই বোধ হয়নি, যাঁদের মধ্যে আমি ভাব থেকে গেছে তাঁরা আবার শিক্ষা দিতে পারেন। শিক্ষা দুজন দিতে পারেন, এক, যাঁদের আমি ভাব থেকে গেছে আর দুই যাদের মধ্যে তিনি আমি ভাবটা রেখে দিয়েছেন। আমি ভাবটা থাকতে হবে, আমি ভাবটা হয় কারুর থেকে গেছে আর নয়ত যেমন ঠাকুর বলছেন নির্বিকল্প সমাধির একুশ দিন পর শরীরটা ছেড়ে দেন। তা নাহলে বুঝতে হবে নির্বিকল্প সমাধি হয়নি। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ সবিকল্প সমাধির জ্ঞানও ঈশ্বরেরই জ্ঞান। আবার যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে তিনি আর ওখান থেকে ফিরতে চান না, কিন্তু সচ্চিদানন্দ কাউকে কাউকে আমি ভাবটা দিয়ে ওখান থেকে নামিয়ে আনেন। কেন করেন, কিভাবে করেন এ এক চিরন্তন রহস্য, এই রহস্যকে কেউ ভেদ করতে পারবে না। ঠাকুর নিজের ব্যাপারে বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্রে মাপতে গেল, নামতেই ওখানে গলে গিয়ে মিশে গেল; কিন্তু যাঁকে অহং বোধটা দিয়ে দেন তিনি একটা পাথর হয়ে যান, তাঁর মিশে যাওয়াটা হয় না। তাঁর অনন্তের বোধ হয়ে গেল, অদ্বৈতের বোধ হয়ে গেল, কিন্তু জগতে যখন ফেরত আসবেন তখন কি হবে? অদ্বৈতের কথা কিন্তু বলতে পারবেন না। কারণ বলতে গেলেই বুদ্ধিকে ধরতে হবে। জিনিস গুলো ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন, কিন্তু একটু বিচার করলে বোঝা যাবে।

তাঁর বোধ যখন হয় তখন এই বুদ্ধিকে ছেড়ে দেন। যিনি বোধ করেন তিনি সেটাই যাঁকে বোধ করা হয়েছে। কিন্তু যেমনি বুদ্ধির অবলম্বনকে ধরে নিলেন তখন আর কিছু বলতে পারেন না, কারণ বুদ্ধি তো কিছুই দেখেনি কি হয়েছে। একজন বোবাকে নিয়ে আমি চললাম একটা জিনিস দেখাতে। জিনিসটা রয়েছে পাঁচিলের ওপারে। আমি বোবাক বললাম আপনি আমার কাঁধে উঠে দেখুন পাঁচিলের ওপারে কি আছে। সে দেখে নিল। কাঁধ থেকে নামার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কি দেখলেন? সে আর কিছুই বলতে পারছে না। বোবা শুধু আকার ইঙ্গিতে, অ অ করে বলতে চাইবে। আমি দেখে আন্দাজ করলাম, এই রকম হবে। তিনিও যখন ওখান থেকে নেমে আসছেন এইবার যখন বুদ্ধি বলতে চাইবে তখন বোবার মত অ অ করবে। এরপর তাঁর শিষ্যরা আন্দাজ করে কিছু একটা বুঝে নিয়ে বলবে, উনি এইটা বলতে চাইছেন। এরপর দুর্ভাগ্যবশতঃ আরেকটা যে মারাত্মক সমস্যা হয় তা হল, ঐ বুদ্ধিই তাঁকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য শিক্ষা দেওয়ার, উপদেশ দেওয়ার প্রথম অধিকার বুদ্ধির। যেমন ছেলের উপর মায়ের অধিকার, ছেলে কাকে বিয়ে করবে, কাকে করবে না, মা নির্দেশ দিতে থাকে, অথচ মায়ের আসলে কিছু নেই। বুদ্ধি হল মায়ের মত, আমি তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আমি তোমাকে অনন্তের প্রাচীরের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে ছিলাম। এরপর যে উপদেশগুলো আসে সেটা আত্মা বা আত্মজ্ঞান থেকে আসছে না, ঐ যে বুদ্ধি গাইড করে নিয়ে গিয়েছিল সেই বুদ্ধি থেকে। আরব দেশের মহম্মদের বুদ্ধি এক রকম, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি অন্য রকম আর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বুদ্ধি আরেক রকম। কারণ সবাই আলাদা সময়, আলাদা জায়গায় এসেছেন। একই সময় একই জায়গায় থাকলেও বুদ্ধি আলাদা হবে, যেমন দুই ভাইয়ের বুদ্ধি আলাদা। এবারে যদি দুই ভাই একই সঙ্গে, একই গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়ে, একই সাধনা করে থাকে আর সিদ্ধিও একই সাথে একই সময় পেয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ভাব আলাদা হবে। পুরাণে এই ধরণের কাহিনী আছে, দাদা ভাই সাধনা করেছে, সিদ্ধিও হয়েছে কিন্তু জগতের প্রতি তাদের ভাব আলাদা। কারণ বুদ্ধি সব সময় সমাজ, পরিস্থিতি এগুলোকে নিয়ে চলে, আর আত্মাকে সাক্ষাৎ করানোর জন্য সেই নিয়ে যায়, সেইজন্য প্রথম অধিকার তার। বুদ্ধি জানে আমি যাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম উনি আত্মাকে জেনে গেছেন। আর এটাও ঠিক যে বুদ্ধিও তখন অন্য রকম হয়ে যায়, পাকা বুদ্ধি হয়ে যায়। একজন পাকা মানুষের বুদ্ধি কাঁচা মানুষের বুদ্ধি থেকে পুরো আলাদা, কিন্তু তার সাথে অন্য যাদের পাকা বুদ্ধি রয়েছে, তাদের বুদ্ধি থেকেও একটু তফাৎ থাকবে। বুদ্ধির গঠন সব সময় হয় যে পরিবারে বড় হয়েছেন, যে সমাজে বড় হয়েছেন, লেখাপড়া যেমন হয়েছে, যেমন যেমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, কালচার যেমন আছে, এগুলোর উপর। ফলে সিদ্ধির পরে জগতের প্রতি যে তাঁর দৃষ্টি সেটা ঠিক হবে এই পারিবারিক আর সামাজিক অবস্থা দিয়ে। যার জন্য মহম্মদ যখন তত্ত্ব কথাগুলো বলছেন তাতে বোঝা যায় যে, উনি একই কথা বলছেন যে কথা উপনিষদে বলা হয়েছে। কিন্তু যেমনি ব্যবহারে নামছেন তখন পুরো পাল্টা যাচ্ছে।

যাঁরা যোগ সাধনা করে সিদ্ধি পেয়েছেন তিনি যোগের কথাই বলবেন, যাঁরা ভক্তির সাধনা করেছেন তাঁরা ভক্তির কথাই বলবেন। তার কারণ, বুদ্ধি আত্মাকে যেদিকটায় নিজেকে শুদ্ধ করে করে নিয়ে গিয়েছিল, বুদ্ধি ঐ রাস্তার খবরটুকুই জানে, তার বাইরে আর কিছু জানবে না। অন্য রাস্তাও যে আছে সেটার খবর তার কাছে নেই। রাইট ভাইরা যখন বাচ্চা ছিল তখন এক ভাই বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মানুষ কি কখন উড়তে পারে? বাবা বলছেন, ভগবান যদি চাইতেন মানুষ উড়তে পারবে তাহলে আগেই তাদের দুটো করে পাখিদের মত ডানা দিয়ে দিতেন। বাবা ছিলেন খ্রীশ্চান ফাদার। তাঁরই ছেলেরা এ্যারোপ্লেন বানিয়ে দেখিয়ে দিলেন মানুষের বুদ্ধির কত ক্ষমতা। বুদ্ধির কাঠামোটা যেমন থাকে মানুষ ঐ কাঠামোর বাইরে যেতে পারে না। তাহলে পরম বস্তুটা কেমন? বলছেন আনন্দের বস্তু, এটাকে কেউ কখন না করছেন না। ভগবানকে কখনই কেউ বলবে না যে তিনি নিরানন্দ। আর ভগবান কেমন? সর্বশক্তিমান। বুদ্ধি সীমিত কিনা, সেইজন্য প্রশ্নও নিজের মত কয়েকটাই করতে পারবে। দেখতে কেমন? বলা যাবে না। অসীমের যে ঐ আনন্দ, ঐ আনন্দের জন্য বলতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি চালাক তাই বুঝে নেয় কি বলতে চাইছে, কিন্তু বোঝে নিজের মত।

সেইজন্য যখন তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করেন তখন কি হয়? *তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ*, যত ঋষি, যত সিদ্ধ পুরুষ, যত আচার্য আছেন সবাই এই অনন্তের যখন বর্ণনা করবেন, অনন্তকে পাওয়ার যে বর্ণনা করবেন, জ্ঞান ও ভক্তির যখন বর্ণনা করবেন তখন মতের ভেদ হবে। কেন মতের ভেদ হয়? এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, এই কারণে মতভেদ হয়। এদের যে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে তা নয়, কিন্তু ঐ পরম

বস্তুর যিনি বোধ করেন তিনি বলতে পারেন না, যে বলছে সে কোন দিন বোধ করে না। কিন্তু ওদের যোগাযোগ আছে, আর যে সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন বলে এই দুটোতে তফাৎ হয়ে যায়। ভক্তিকে নানা মুনি নানা ভাবে বর্ণনা করেন, এই একটি কথা খুব সহজ ভাবে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু কেন নানান ভাবে বর্ণনা করেন বোঝাবারর জন্য আগে এতগুলো কথা বলা হল।

তৎ শব্দে সব সময় ভগবানকেই বলা হয়, তৎ মানে তিনি। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলা হয়, যখন খুব গভীরে যায় তখন ভগবানকে নাম দিয়ে আর সম্বোধন করা যায় না, রাম, কৃষ্ণ, শিব এই সব নামে আর ডাকা যায় না। নামকরণের পেছনে মূল ভাব হল, বস্তুর এমন কিছু গুণ থাকে যে গুণ দিয়ে তাকে জানা যায়। সেইজন্য সংস্কৃতে প্রত্যেকটি জিনিসের নামকরণ তার গুণ অনুযায়ী করা হয়। আমরাও কত সময় প্রশংসা করে বলি তুমি তোমার নাম সার্থক করলে বা অন্যথা বলা হয় তুমি তোমার নামের কলঙ্ক। নাম মানেই একজন লোকের যে নিজস্ব গুণ সেই গুণকে আধার করে বলা যায় এই লোকটি অন্য লোক থেকে আলাদা। এই ভেদ অনেক রকমের হয়, যেমন জাতিগত ভেদ হয়, স্বগত অর্থাৎ নিজের নিজের থেকে ভেদ হয়। যত রকমের আমরা কল্পনা করতে পারি তত রকমের ভেদ হয়। যেখানে যুক্তিতর্ক দিয়ে বলা হয় তখন কয়েকটার মধ্যে বেঁধে দেন। তবুও মানুষ মানুষে তফাৎ আছে, মানুষ আর পশুতে তফাৎ আছে আবার বিভিন্ন পশুতে তফাৎ আছে, এক রকমের পশুর মধ্যেও তফাৎ আছে, তাদের আলাদা আলাদা লক্ষণ আছে। সেইজন্য যখনই কোন কিছুর নাম বলা হয় তখনই তার গুণটা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যেমন অমুক লোকের নাম বললেই তার রূপ, তার গুণ সবটাই ভেসে ওঠে। যখন শ্রীরাম বলছি তখন শ্রীরামের যত গুণ আছে সেই গুণগুলো মাথার মধ্যে চলে আসে, রাবণকে বধ করেছিলেন, সীতা যাঁর স্ত্রী, অযোধ্যাপতি এই জিনিসগুলো চলে আসে। কিন্তু শ্রীরাম বলাতে তাঁকে আমরা সীমিত করে দিচ্ছি, অযোধ্যায় ছিলেন, এক সময় তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাই এটা ঠিক ঠিক ভগবানকে প্রতীত করতে পারে না। সেইজন্য ভগবান যখন বলা হয় তখন পুরো জিনিসটাকে মিলিয়ে বলা হয় ভগবান। ভগবান বলতে শ্রীরাম বলুন, শ্রীকৃষ্ণ বলুন, যাই বলুন একটা নাম নিয়ে আসা হয়। ভগ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য, ভগবান মানে যাঁর ঐশ্বর্য আছে। ভগবান বললে সেখানেও একটা গুণ এসে যাচ্ছে, ভগবান বলে তাঁকে পরিভাষিত করে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর এই জ্ঞানটা আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের স্তুতি করার সময় সব রকমের স্তুতি করছেন, মা এটাও করেন ওটাও করেন, এর তাৎপর্য হল মা সবটাই তুমি আর তা নাহলে মা তুমি সব কিছুর পারে। হয় আমাদের দুটোই নিতে হবে আর তা নাহলে দুটোরই পারে। ভক্তরা নিজের ভগবানকে যেভাবে নেন, যেমন নারায়ণ, তাঁর মধ্যে সব গুণই আছে, আর সেই ভাবেই ভক্ত নিতে চান। এখন সৎ গুণ, অসৎ গুণ, গুণাতীত সব জিনিস মিলিয়ে এমন গোলমেলে হয়ে যায় যে, ঋষিরা তাই বলেন, ভগবানকে কখন নাম দিয়ে সম্বোধন করা যায় না। কারণ নাম মানেই গুণ, গুণ মানেই সীমিত হয়ে গেলেন, নাম নেওয়া মানেই তাঁকে সীমিত করে দেওয়া হল, তার মানে তার বাইরে তিনি নন। ভগবান যদি ভালো হন তাহলে মন্দটা কে? যদি বলে মন্দটা আরেকজন কেউ, তাহলে সেটা আর হিন্দু ধর্ম থাকবে না। হিন্দু ধর্ম মানেই সবটা। তাহলে ভালোটাও তিনি মন্দটাও তিনি, সৎও তিনি অসৎও তিনি, আবার সৎ অসতের পারে যা সেটাও তিনি।

কথামৃতে খুব সুন্দর একটা প্রসঙ্গ আছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা থেকে এসেছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলছেন, সব জায়গায় ঘুরে দেখলাম কোথাও এক আনা, কোথাও দু আনা, এখানে পুরো ষোল আনা। মানে ঠাকুরই শেষ কথা। এসব কথা বলার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অভিভূত হয়ে একটা ভাবের অবস্থায় চলে গেছেন। হঠাৎ তিনি ঠাকুরের চরণ টেনে নিজের বুকের উপরে এনে রেখেছেন। সেখানে আরও অনেক ভক্তরা উপস্থিত আছেন, নরেনেও আছেন। ঠাকুর তখন বলছেন, যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাই। ওই মুহূর্তে সেখানে একটা অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে, যেখানে ঠাকুর বলতে চাইছেন তিনি অবতার। ভক্তরাও সবাই অভিভূত, কেউ নৃত্য করছেন, কেউ কাঁদছেন। সঙ্গীত শুরু হয়ে গেল, ঠাকুর সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পর একটু হুঁশ আসার পর ঠাকুর বলছেন, এই অবস্থায় আমার কি একটা হয়ে যায় কোন বশ থাকে না, তখন গণনা করতে পারি না, এক, সাত, নয় এই ভাবে গুণতে থাকি। নরেন তখন গণনা ভুল হয়ে যাওয়া নিয়ে বলছেন, সবই এক কিনা। বলতে চাইছেন, সবই যদি এক হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কিসের গণনা আর কিসেরই বা আলাদা। ঠাকুর বলছেন তা নয়, এক নয় এক দুইয়ের পার। এই জায়গাটা

খুবই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ঠাকুর বলছেন, ঐ অবস্থায় হুঁশ থাকছে না, সংখ্যা গুণতে পারি না। গুণতে না পারাটা একটা expression মাত্র, তার মানে কোন কিছুই থাকছে না। সেই সময় নরেন ওই কথা বলছেন। নরেনের সম্বন্ধে অনেক কিছু ঠাকুর ঘোষণা করতে শুরু করে দিয়েছেন, কেশবের থেকে উপরে, নরেন শিক্ষা দেবে ইত্যাদি। সেই নরেন বলছেন, সবই এক কিনা। অদ্বৈত বলতে সবাই তাই বোঝে, অদ্বৈত মানে এক। অদ্বৈত কখনই এক নয়, ঠাকুর যেটা বলছেন সেটাই অদ্বৈত, এক দুয়ের পার। এক দুইয়ের পারের ব্যাপারটা যেদিন কারুর ধারণা হতে শুরু হবে তখন বুঝতে হবে এবার সে ধর্ম জিনিসটা কি বুঝতে শুরু করেছে। এখানে লক্ষণীয় যেটা, নরেনের মত লোক যাঁর এত তুখোড় বুদ্ধি তিনিও ঠাকুরের কথা ধরতে পারছেন না, নরেনও বলছেন, সবই এক কিনা। ঠাকুর বলছেন, এক নয়, এক দুইয়ের পার।

যখন এক বলা হয় তখন যৎ কিঞ্চিত গুণ তার নামে বলা যাবে, যেটা দিয়ে তাঁকে পরিভাষিত করা যাবে, কিছু না হলেও সচ্চিদানন্দ বলতে পারবে। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের মত অতটা নয় কিন্তু একটা কিছু থাকছে। Divine onenessটাও কিন্তু অদ্বৈত নয়, ঠাকুরও না করে দিচ্ছেন, বলছেন, এক দুইয়ের পারে। এখন যদি এক দুইয়ের পার হয়ে থাকেন তাহলে আমরা তাঁকে জানব কি করে? আমি আপনি যখন বলব তখন একটা কিছুতো তাঁকে বলতে হবে, তখন কি বলব আমরা? তাই এখানে বলছেন তৎ, তাঁকেই ইঙ্গিত ইশারা করে বলছেন তৎ। ঐটা যখন বলা হচ্ছে তখন কত দূর থেকে ইশারা করছে। এই দূর থেকে ইশারা করার জন্য বলছেন সেটা এক দুইয়ের পারে, এর নীচে আরও নিয়ে গেলে তখন বৌদ্ধদের শূন্য হয়ে যাবে। ঐ শূন্য যাতে না হয়ে যায় সেইজন্য শব্দ যেটা ব্যবহার করেন সেটা হল তৎ। এরপর যত গুণ নিয়ে আসা হবে তত ভগবানকে সীমিত করা হয়ে যাবে। ভক্তের ভগবান তাই, মন দিয়ে দেখছেন বলে তিনি সীমিত। মন দিয়ে দেখার জন্য ভগবান সীমিত হয়ে যান, কিন্তু ভগবানের বাস্তবিক রূপ তো তা নয়। বাস্তবিক রূপ না হওয়ার জন্য পরোক্ষ ভাবে বলা হয়।

এই জিনিসটাকে জহুদি ধর্মে খুব সুন্দর এবং সব থেকে ভালো বলা হয়। জহুদি ধর্মে ভগবানকে বলা হয় জেহোবা। জেহোবা আমরা বলি বটে কিন্তু জহুদিদের জেহোবা শব্দের উচ্চারণ হয় না, এর ইংরাজী বানান হয় YWH। YWH যদি লিখে দেওয়া হয় এটার উচ্চারণ করা যাবে না, উচ্চারণ করার জন্য মাঝখানে কিছু বর্ণ লাগাতে হয়, কিন্তু ওরা বর্ণ রাখে না। বক্তব্যটা হল ভগবানের নাম হয় না, নাম হয় না বলে তাঁর উচ্চারণ করা যাবে না। উচ্চারণ করা যাবে না বলে তাঁর নাম YWH। পরের দিকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো আর অতটা গভীরে যাননি, তাঁরা YWHকে জেহোবা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জেহোবা হল আমরা যে রকম আকার ইঙ্গিতে তৎ বলছি, জুহুদিরা অন্য ভাবে বলছে, যাঁর নাম উচ্চারণ করা যায় না।

এখানে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা চলছে, ভক্তিশাস্ত্র মানে ভক্ত আর ভগবানের একটা সম্পর্ক থাকবে, সেই সম্পর্ককে বলছেন ভক্তি। এই সূত্রে যে বিষয়ানুসারে ভগবানের সাথে ভক্ত সম্পর্ক স্থাপন করছে তা হল ভক্তি। ভক্তিতে যখন তৎ বলছেন তখন ভক্তির লক্ষণ অনেক পাল্টে যায়। তার কারণ, যাঁকে আমি তৎ বলছি এইজন্যই বলছি যে তাঁকে পরিভাষিত করা যাবে না। নাম বললেই পরিভাষিত হয়ে যাবে। নাম মানেই হয় তাঁর একটা বিশেষ গুণকে বলছে। ভগবান অনন্ত, সেই ভগবানের দিকে যে ভাব নিয়ে এগোবে, সেই ভাবগুলো অনন্ত হয়ে যায়। সেইজন্য ভক্তিও অনন্ত। যেমন দূর থেকেই তৎ শব্দ দিয়ে ভগবানকে বলা যায়, ঠিক তেমনি ভগবানের প্রতি ভক্তিকেও এখানে তৎ দিয়ে বলা যায়, কারণ ভক্তিও অনন্ত। সব অনন্ত তো বলা যাবে না, কয়েকটা জিনিস বলা যাবে। ভগবানের যে অনন্ত ভাব সব ভাব তো বলা যাবে না, তাই কয়েকটা বলে দেওয়া হয়। যিনি অনন্ত তাঁর বর্ণনা করতে গেলেই ওজনে কম পড়ে যাবে। চিনির পাহাড় থেকে পিপঁড়ে একটা দুটো দানা নিয়ে আসার সময় ভাবছে পরের বার এসে পুরোটাই নিয়ে যাব। আমরাও যখন ভগবানকে বুঝতে চাইছি, যতই শুদ্ধ মন হোক মন মনই, বোধে বোধ করা ছাড়া সক্রিয় মন দিয়ে কখনই জানা যায় না, সম্ভবই নয়। কিন্তু বোধে বোধ তো করছেন, সেইজন্য জানছেনও। কিন্তু বোধে বোধ করার পর সেখান থেকে নেমে এসে যখন আমাদের জন্য বলেন তখন তিনি যেই পথ বা মত দিয়ে সাধনা করে সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছেছেন, সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সেই মতটাকেই সামনে রাখেন। দক্ষিণেশ্বরে সব রকমই আছে, কালী আছেন, কৃষ্ণও আছেন, শিবও আছেন, ঠাকুর যখন কামারপুকুরে ছিলেন সেখানে সব ভাবেরই মানুষ ছিল, ঠাকুরের সাধনাও ঐ ভাব নিয়েই এগোল। ঠাকুর যতবারই মত পথ বলছেন তিনি বলতে চাইছেন যিনি অনন্ত তাঁকে সীমিত করা

যায় না। ঠাকুরের এই দুটো জিনিস, যেখানে তিনি সাধনা করেছেন সেখানকার সব জিনিসকে তিনি নিচ্ছেন আর দ্বিতীয় অনন্তকে সীমিত করা যায় না সেইজন্য তিনি মত পথের কথা বলছেন। যীশু খ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধের জীবন, মহাত্মাদের ইতিহাস যদি মন দিয়ে পড়া হয় তাহলে দেখা যাবে এনারা যেমনটি সাধনা করে সিদ্ধির অবস্থায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে ঠিক সেই ভাবে জিনিসটাকে সামনে রাখছেন। ফলে ভক্তির পথ অনেক রকম হয়ে যাবে তার সাথে ভগবানের মতও পাল্টে যাবে। একজনের সাথে আরেকজনের কখনই মিলবে না। সেইজন্য ভক্তিও পুরো পাল্টে যায়। পাল্টানোর পেছনে মূল কারণ হল, সেই অবস্থায় যে অনুভূতি গুলো হয়েছে সেগুলোকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না।

কোন জিনিসের বর্ণনা করতে গেলে কয়েকটা জিনিস লাগে। প্রথম লাগে observation বস্তুকে জানা, জানা মানে ইন্দ্রিয়ে দিয়ে ঐ বস্তুকে গ্রহণ করা। দ্বিতীয় লাগে analysis, বিচার করা আর তৃতীয় লাগে expression, অভিব্যক্তি। বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ের যে ব্যাখ্যাগুলো আমরা আজকে পাচ্ছি, একটা জিনিসকে তাঁরা দেখলেন, দিন হচ্ছে রাত হচ্ছে, চন্দ্র তারা ঘুরছে, ওনারা জিনিসগুলোকে observe করলেন, observe করার পর ওটাকে analyse করতে শুরু করেন। Analyse করার পরে ভেতরে যে existing wisdom রয়েছে সেই wisdomeএর মাধ্যমে জিনিসটাকে সামনে place করেন। যদি সেটা না থাকে তাহলে তাঁরা নতুন একটা বিধি বার করেন যেটা দিয়ে ঐ জিনিসটাকে বর্ণনা করা হবে।

Analysis মানেই হয় comparison, উপমা দিয়ে জিনিসটাকে জানা। আমরা যে জিনিসগুলো জানি সেই জিনিসের সাথে তুলনা করে বাকি জিনিসের মিল করে দেখলেন জিনিসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, analysis মানেই তাই, বিচার করে দেখা। আগে থেকে আমাদের ডাটা নলেজ ব্যাঙ্কে যা কিছু আছে তার সাথে এর তুলনা করা। ভগবানের ক্ষেত্রে observation এখানেই ব্যর্থ হয়ে যায়। Observation মানে হয় ইন্দ্রিয়ে দিয়ে হোক, বুদ্ধি দিয়ে হোক, মন দিয়ে হোক জিনিসটাকে গপ করে ধরে নেওয়া। ইন্দ্রিয় সীমতি, মন সীমিত সেইজন্য ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে অনন্তকে observe করা যায় না, একটা দিক হয়ত observe করা যেতে পারে পুরোটা করা যাবে না। একটা বিরাট হল ঘর, তার দেওয়ালে একটা ছোট্ট ফুটো আছে, সেই ফুটোর মধ্যে একটা ছোট ছিদ্রের পাইপ ঢোকান আছে। এবার হলের বাইরে থেকে পাইপের ঐ ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে পুরো হলঘরকে দেখা যাবে না। ফুটোর রেঞ্জে যতটুকু আসবে ততটুকুই দেখা যাবে। অনন্তের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়, আমাদের মন যেন একটা ফুটো, ঐ ফুটো দিয়ে অনন্তকে জানার চেষ্টা করছি। Analysisএ সমস্যা হল যখন তুলনা করতে যাবে ভগবানের এই জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই সেইজন্য জগতের কোন কিছুর সাথে ভগবানের তুলনা করা যায় না। সেইজন্য observation আর analysis দুটোই ব্যর্থ হয়ে যায়। যেখানে observation আর analysis নিষ্ফল হয়ে গেল এরপর যে expression গুলো রয়েছে, যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হবে সেই শব্দগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়, যেমন জহুদিরা বলে YWH। শব্দের ভাণ্ডারে আমাদের যত শব্দ আছে সব শব্দই আগে থেকে কোন না কোন জিনিসের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্য যখনই ভগবানের জন্য কোন শব্দকে নেওয়া হবে তখনই দেখা যাবে আগে থেকেই সেই শব্দ কোন না কোন বস্তুর সাথে জড়িয়ে রয়েছে, সেই শব্দকে ভগবানের জন্য লাগাতে গেলেই ভগবান সীমিত হয়ে যাবেন, তাই কোন শব্দই ভগবানের জন্য লাগানো যাবে না।

ভগবানের ক্ষেত্রে শুধু এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে ঝামেলা হয় না, এরপর চতুর্থ আরেকটা জিনিস আসে। যে সমাজ ও ধর্ম থেকে মানুষ আসে তার ভেতরে সেই সমাজ ও ধর্মেরও ছাপ থাকে। আরব দেশের কোন মুসলমান যখন সাধনা করে সিদ্ধির অবস্থায় যাবে তখন কোন দিনই ওর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাব আসবে না। অন্যান্য দেশের সাধকরা কোন দিনই হিন্দুদের মত করতে পারবে না, ঠিক তেমনি আমাদের যে সামাজিক পরিবেশ, আমাদের যে ধার্মিক ভাব, বিচার তাদের থেকে পুরো আলাদা, তাই আমাদের মনে কখনই আল্লার ভাব বা যীশুর ভাব আসবে না। পঞ্চম হয় মনের গঠন, একই জায়গার একই ইষ্টের দুজন সাধক সাধনা করছেন, তাঁদের সব কিছু এক হলেও মনের ভাব সব সময় আলাদা হবে। মনের ভাব আলাদা হওয়ার জন্য সিদ্ধির পর বর্ণনাও আলাদা হয়ে যাবে।

আমরা এখানে আলোচনা করছি *তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ* এই সূত্রের, এটাই বলা হচ্ছে ঈশ্বরের বর্ণনা আলাদা হবে, আর ঈশ্বরের ভক্তির বর্ণনাও আলাদা হবে। এই সব কারণে ভক্তের কি কি দরকার সেগুলোও একই রকম হবে না। স্বামীজী বিদেশে যাওয়ার আগে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করছিলেন, বম্বেতে হরি মহারাজের সাথে দেখ হল। দুজনকে এক জায়গায় কিছু কথা বলার জন্য বলা হয়েছে। স্বামীজী হরি মহারাজকে বললেন, তুই কিছু বল। হরি মহারাজ খুব করে শুধু ত্যাগের কথা বলে গেলেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না। ঠিকই ত্যাগ ছাড়া কিছু হয়ও না। কিন্তু হরি মহারাজ ওখান থেকে বেরিয়ে আসতেই স্বামীজী বলছেন, তুই ওদের কাছে এত ত্যাগের কথা কেন বলছিলি? স্বামীজী আপত্তি করছেন কারণ, এরা সংসারী মানুষ, সংসার চালাতে হবে, ঘটিবাটি সামলাতে হবে, স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে হবে, এই কথা তাদের জন্য নয়। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, বাড়িতে মা পাঁচ রকম মাছের ব্যঞ্জন করেন, যার যেটা পেটে সয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষরাও যখন বলেন তখন লোকদের মন বুঝে বলেন। হরিদ্বার, হৃষিকেশের দিকে যে প্রবচন গুলো হয় সেখানে দুই ধরণের প্রবচন হয়, একদল মহাত্মারা যখন উপনিষদের উপর প্রবচন দেন তখন তাঁরা শঙ্করের ভাষ্যে যেমন ভাবে বলা হয়েছে তার বাইরে যাবেন না, যার ফলে বেশির ভাগ লোক বুঝতেই পারে না কি বলতে চাইছেন। দ্বিতীয় প্রবচনে কিছু কিছু মহাত্মারা এমন লঘু করে, মজা করে প্রবচন দেন যেটা শুনে শ্রোতাদের কোন কাজেই লাগবে না। স্বামীজী দেশে বিদেশে যে ভাষণ দিয়েছেন আজও তার পুরোমাত্রা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ স্বামীজী সব ভাষণ যুগপোযোগী করে দিয়েছেন। ধর্মের মূল জিনিসটা না পাল্টে যদি ধর্মের কথা যুগপোযোগী করে না বলা হয়, তাহলে সেই জিনিস মানুষ বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে না। যুগপোযোগী করে না হয় বলবেন ধরে নিলাম, তাই বলে কি এর জন্য একই রকমের লোক আছে? কখনই না, আমি এক রকমের কথা শুনতে চাই, আপনি আরেক রকম কথা শুনতে চাইবেন। ধর্ম মানেই দুটোকেই সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। ধর্মকথা যখন বলা হয় তখন মন বুঝে বলা হয়। এদের কতটা দরকার আছে, তার থেকেও বড় হল এদের নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু আছে। ব্যক্তি মানুষের মানসিকতাকে বাদ দেওয়া যায় না। ঠাকুর বলছেন, আমি ছোকড়াদের একটু আঁশজল দিই। সন্ন্যাসীরা যদি সব গৃহী ভক্তদের বলতে শুরু করেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা, আগে সব কিছু ত্যাগ করুন, ত্যাগ না করলে ঠাকুরের কাছে প্রবেশ পাবেন না। গৃহী ভক্ত বলবে তার থেকে বরঞ্চ অমুক বাবাজীর কাছে যাই। অমুক বাবাজী বলছেন, আমার বিভূতি লাগাও তাতেই তুমি যা চাইছ সব পেয়ে যাবে। তাই এদের ভক্তের সংখ্যাও ঠাকুরের থেকে অনেক বেশি।

সবার শেষে আরেকটা হয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল দেশ কালের রীতি। মানুষকে যে কোন শিক্ষা, বিশেষ করে ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার সময় দেশ কালের পরিস্থিতি অনুযায়ী দিতে হয়। ইসলামের নামে যে এত সমালোচনা হচ্ছে সেখানে এটাই বলা হয়ে থাকে, চৌদ্দশ পনেরশ বছর আগে যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলোকে আজকেও তারা চালাতে চাইছে। মোটামুটি এই আট খানা ব্যাপারে বলা হল, ধর্মের কথা যখন বলা হয় তখন এই আট রকমের তফাৎ আসে। সেই এক তত্ত্ব, কিন্তু সেই এক তত্ত্বকে বলার সময় এই আট রকমের তফাৎ এসে যায় বলে যে কোন দুজন লোক যখন ভক্তির কথা বলবেন, ভগবানের কথা বলবেন তাদের কথার মধ্যে কোন মিল থাকবে না, সম্পূর্ণ আলাদা কথা বলবেন। সেইজন্য ভক্তির ব্যাপারে, ভগবানের ব্যাপারে, ধর্মের ব্যাপারে এক রকমের কথা শুনতে পাই না। একই কারণে স্মৃতিশাস্ত্র গুলো, যাঁরা বিধান দেন, সব আলাদা হয়ে যায়। তাই বলে মূল তত্ত্বে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ আসে বর্ণনায়।

তবে কিছু জিনিসে আবার মিলও পাওয়া যায়। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঁচিশ অধ্যায়ে ৩২ নং শ্লোকে বলছেন, *সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা*, ভক্তি হল স্বাভাবিক আর *এবৈকমনসো বৃত্তিঃ*, মন এক ভাব নিয়ে উচ্চতম বিষয়ে গিয়ে বসে থাকে। ভক্তিসূত্রে প্রথমের দিকে বলা হয়েছিল *সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা*, পরম প্রেমের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলছেন *সত্ত্ব এবৈকমনসো*, যে মনের এক ভাব, যে মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই, অন্য কোন বৃত্তি নেই, ঐ মন স্বাভাবিক ভাবে বসে থাকে। জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বসাতে হয় না। এটাকেই ঊনত্রিশ অধ্যায়ের এগারো নং শ্লোকে বলছেন *মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ*, ভক্তিকে বলছেন অবিচ্ছিন্ন গতি, কোথাও কোন বিরাম নেই। কি রকম? *যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ*, গঙ্গার জল যেমন এক ভাবে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভক্তিতে মন এক ভাবে এক গতিতে ভগবানের দিকে চলে যায়। সেইজন্য অনেক জায়গায় ভক্তিকে এভাবেও বলা হয়, *অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ*।

ঠাকুর নৃত্য করছেন, কীর্তন করছেন, কথা বলছেন সবই করছেন কিন্তু ঈশ্বর থেকে মন কখন সরছে না। কথামৃতেই বর্ণনা আছে, নরেনাদি ছোকরা ভক্তদের সাথে মাস্টারমশাই তৎকালীন যুবকদের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, আজকালকার ছেলেদের চরিত্র ভালো নয় ইত্যাদি। ঠাকুর শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ করতে নেই। এখানে দুটো জিনিস, ঐ উচ্চ অবস্থায় মন স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থান করে আর দ্বিতীয়, ওঠা নামাটা বন্ধ হয়ে যায়, আজকে ঠাকুরের নাম নিতে ইচ্ছে করছে না, এখান তা হচ্ছে না, গঙ্গা নদী যেমন এক ভাবে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অন্য জায়গায় বলছেন *অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ*, একটা টিন থেকে আরেকটা টিনে যখন তেল ঢালা হয় তখন মনে হয় যেন একটা রড দাঁড়িয়ে আছে, একটুও ছিটকায় না, একেবারে অবিচ্ছিন্ন। জল ঢালার সময় জল তাও একটু এদিক ওদিক ছিটকাবে, কিন্তু তেলকে মনে হবে যেন একটা সলিড কিছু। ঐ আটটি কারণে ভক্তিতে যদিও তফাৎ দেখা যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তির একটা সমান অনুভব আছে যেখানে বোঝা যায় ভক্তিতে কোন ধরণের বিচ্ছিন্নতা আসে না।

ঠাকুরও ভাবের তফাতের কথা বলছেন। ঠাকুরকে একজন বলছেন, ঐ ভাবেই তো থাকলে হয়। ঠাকুর বলছেন, তা কেন! আমি সবটাতেই থাকি। ডাঃ মহেন্দ্র সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল। ডাঃ সরকার ঠাকুরকে বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছেন, তা নাহলে রোগ আরও বেড়ে যাবে। কথা বলতে নিষেধ করার পর ডাঃ সরকার আবার বলে দিচ্ছেন, ধ্যান করলেই হল। সেখানেও ঠাকুর বলছেন, তা কেন! আমি সবটাতেই থাকি। ঠাকুর বিভিন্ন ভাব, এক এক সময় এক এক ভাবে থাকতেন।

ভক্তির যে নানা মত বলা হচ্ছে, এখানে তিন ভাবে ভক্তির শ্রেনীবিন্যাস করছেন – ক্রিয়া, শব্দ আর ভাব বা মনের অবস্থা। কায়, মন আর বাক্ এই তিনটের তফাতে তিনটে সংজ্ঞা আসে – ব্যাস, গর্গ আর শাণ্ডিল্য। তাতেই কিন্তু শেষ হয়ে যায় না। এখানে ভক্তিকে এই তিন জন ঋষি তিন ভাবে পর পর তিনটে সূত্রে ব্যাখ্যা করছেন – কায়, মন ও বাক এই তিনটে দিয়ে। ভক্তিকে যদি শরীরের দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয় তখন ভক্তি কি রকম হবে, বচনের দিক দিয়ে যদি ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখন ভক্তি কি রকম হবে আর মনের দিকে থেকে ভক্তি কি রকম হবে। যাঁরা বলছেন আমি ভক্তি করব কিন্তু ভক্তিতে আমার শরীরকেও কাজে লাগাব, সেখানে শরীরেরই প্রাধান্য থাকবে, তখন ভক্তি এক রকম হবে। আরেকজন বলছেন, আমি ভক্তি করব কিন্তু আমি আমার বচন দিয়ে ভক্তি করব, অন্য একজন বলছেন আমি শুধু আমার মন দিয়েই ভক্তি করব, এর মধ্যে বচন আর শরীরকে আমি জড়াব না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের জীবনের একটা কাহিনী আছে। উনি একবার স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের খুব সেবা করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ মজা করে বললেন, বলো তুমি কি বর চাও। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বললেন, আমার বাণী দিয়ে আমি যেন ঠাকুরের সেবা পূজা করতে পারি। অখণ্ডানন্দজী বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। পরবর্তি কালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী একজন বক্তা রূপে নিজেকে যে কোথায় নিয়ে গিলেন ভাবাই যায় না। স্বামীজীর পর ঐ রকম বক্তা আর কেউ দেখেননি। এই হল বাণী দিয়ে ঈশ্বরের পূজা। কিন্তু মন যতক্ষণ না তৈরী হয় বাণী ততক্ষণ থোরাই বেরোবে। তাই বলে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী হাতের কাজ করছেন না, চিন্তন করছেন না, তাতো না। কিন্তু মূল হল, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা তাঁর ভাষণের কথাই বলি। নারদ প্রথমে ব্যাসদেব ভক্তিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন বলছেন –

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ।।১৬।।

পারাশার্যঃ মানে পরাশর মুনির সন্তান। পরাশর মুনির সন্তান মানে ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের জন্ম কাহিনী হল, পরাশর মুনি একবার নৌকা করে নদী পার হওয়ার সময় এক ধীবর কন্যাকে দেখে আকর্ষিত হয়ে গেলেন। ঋষি মুনিদের ব্যপার, মন কিছুক্ষণের জন্য চঞ্চল হয়ে গেছে। ধীবর কন্যাকে পরাশর মুনি নিজের মনের ভাব জানালেন। ধীবর কন্যা বলছে, নদীর ঘাটে সব লোকজন আমাদের দেখছে। পরাশর মুনি বিরাট যোগী, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার সৃষ্টি করে দিলেন, আর কেউ দেখতে পারবে না। পরাশর মুনি যাওয়ার সময় বলছেন, এখান থেকে তোমার যে সন্তান হবে সে একজন মহাপুরুষ হবে, আর তুমি যেমন কুমারী আছ তেমন কুমারীই থাকবে। এই ধীবর কন্যাই পরে কুরু বংশের মহারানী হলেন আর এনার সন্তান হলেন ব্যাসদেব। ব্যাসদেব পরাশর মুনির সন্তান, তাই বলছেন *পারাশার্যঃ*। ব্যাসদেবের ব্যাপারে এর থেকে বেশি কিছু আর জানা

যায় না, পরাশর মুনির সন্তান, এখানেই শেষ। এরপর যখন তাঁর নাম আমরা পাই ততদিনে তিনি একজন নামকরা ঋষি হয়ে গেছেন। তিনি কোথায় শিক্ষা পেলেন, কার কাছে পড়াশোনা করলেন এগুলো আর জানা যায় না। তবে তিনি যে পরাশর মুনির সন্তান এটা সর্বজনবিদিত। পরবর্তি কালে ব্যাসদেবকে নিয়ে অনেক কাহিনী তৈরী করা হয়েছে কিন্তু আমাদের মূল গ্রন্থগুলিতে এসবের কোন বর্ণনা নেই। পুরাণাদিতে যেমন করা হয়, জন্মের সাথে সাথেই তিনি বিরাট বড় হয়ে গেছেন আর বেদের সব জ্ঞান আগে থেকেই তাঁর হয়ে আছে। এসব কথা আজকের দিনে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু আমরা জানি, ঋষি রূপে ব্যাসদেবের বিরাট সম্মান। তখনকার দিনে বেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, বিভিন্ন পরিবারে যত বেদ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিল ব্যাসদেব সেগুলোকে সব সংগ্রহ করলেন, সংগ্রহ করার পর বেদের সব কিছুকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সাজিয়ে দিলেন। যেমন, যজ্ঞে যে মন্ত্রের ব্যবহার হবে সেই মন্ত্রগুলিকে একত্র করে একটা জায়গায় সংরক্ষণ করে তার নাম দিলেন ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদেরই যে মন্ত্রগুলো বীণার উপর গান করা যাবে, সেটাকে একটা জায়গায় সাজিয়ে দিয়ে তার নাম দিলেন সামবেদ। আর যজ্ঞে যে মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হবে সেই মন্ত্রগুলোকে যেখানে রাখলেন তার নাম হয়ে গেল যজুর্বেদ। এর বাইরে বাকি যত মন্ত্র থেকে গেল তার সব মন্ত্রকে একত্র করে নাম দিলেন অথর্ব বেদ। এই ভাবে বেদকে বিভাজন করে তিনি তাঁর চারজন শিষ্যকে চারটে বেদের দায়ীত্ব দিয়ে দিলেন। যে বেদ এত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যেখানে কেউ হাত দিতে পারবে না, কিন্তু ব্যাসদেবের এমনই অথরিটি যে তিনি সব বেদ সংগ্রহ করে নিজের মত সাজিয়ে চারজন শিষ্যকে এক একটা বেদের দায়ীত্ব দিয়ে দিলেন। উনি যেভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন আজ পর্যন্ত ওখানে কেউ হাত দিতে পারেননি। ব্যাসদেবের কথা ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, একদিকে তিনি আমাদের দৃষ্টিতে একজন অবৈধ সন্তান অন্য দিকে ঋষি রূপে তাঁর কী তেজ!

ব্যাসদেবই পরে রচনা করলেন মহাভারত, মহাভারত তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। যাদের নিয়ে মহাভারতের কাহিনী রচিত হয়েছে মূলতঃ সবাই ব্যাসদেবরই সন্তান, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী ব্যাসদেবের সন্তান বলা যাবে না। মহাভারতেই প্রথম আমরা কিছু পূজাদির কথা পাই। তবে মহাভারতে কিছু কিছু জিনিস প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো সরাসরি ব্যাসদেবের লেখা নয়। বেদের সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান কর্ম। কিছু ছিলেন যাঁরা উপাসনা করতেন, যাঁদের উপনিষদের ঋষি বলা হয়। ব্যাসদেব এসে এর সব কিছুকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন। পাল্টে দিয়ে বলে দিলেন, সাধনা একটাই, স্বধর্ম পালন করা। স্বধর্ম পালন করার উপর জোর দেওয়ার জন্য মহাভারতে প্রচুর কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যাধগীতার যে কাহিনী তাতেও স্বধর্মের কথা বলছেন। একজন যোগী সিদ্ধ হয়ে গেছেন, একদিন গাছের তলায় বসে আছেন হঠাৎ উপর থেকে একটা বক বিষ্ঠা ত্যাগ করে দিয়েছে। যোগী রেগেমেগে বকের দিকে তাকাতেই বকটা ভস্ম হয়ে গেল। যোগী তো মহাখুশী। সেখান থেকে গেছে এক বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে। বাড়ির গৃহিণী বললেন, আসছি বাবা। ইতিমধ্যে তার স্বামী এসে গেছেন, ভদ্রমহিলা স্বামীর সেবায় লেগে গেছে। এদিকে যোগী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ সে রেগে বলছে, ভিক্ষা চাইলাম মনে নেই। ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে বলছেন, আমি বক নই যে আমাকে ভস্ম করে দেবেন। যোগী তো অবাক, বাড়ির এক গৃহবধূ কি করে এই খবরটা জানল। যাই হোক, শেষে গৃহবধূ এসে বলল, আমার ধর্ম হল স্বামীর সেবা, স্বামীর সেবার বাইরে আমি আর কিছু জানি না। আর এর থেকে বেশি কিছু যদি জানতে চাও তাহলে মিথিলাতে এক ব্যাধ আছেন তুমি তাঁর কাছে যাও। মিথিলাতে গিয়ে দেখে ব্যাধ মাংস কাটছে আর বিক্রি করছে। ওখান থেকেই ব্যাধ পরমহংস অবস্থায় চলে গেছেন। এটাই ব্যাসদেবের অবদান, হিন্দু ধর্মকে তিনি নতুন করে ব্যাখ্যা করে দিলেন। হিন্দু ধর্ম তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা যজ্ঞ করেন, তাঁদের নিয়েই ছিল। যাঁরা উপনিষদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকেন তাঁদের সাথে ব্রাহ্মণদের সব সময় বিবাদ লেগে থাকত। বৈদিক সময়কার কয়েকজন ঋষিকার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা ঋষিদের আশ্রমেই থাকতেন, কিন্তু তা হলেও এনাদের স্থান ঋষিদের থেকে নীচেই ছিল। ঋষিকারও বেদের অনেক মন্ত্র দিয়েছেন, কিন্তু ঐভাবে তাঁদের নাম খুব একটা প্রচলিত হয়নি। এই কজন ঋষিকাদের বাদ দিলে মহিলা মানে ঋষির আশ্রমে তিনি গুরু মা, সেইজন্য সম্মান আছে। কিন্তু অন্য দিকে আর কিছু নেই। ব্যাসদেব এসে রাতারাতি এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলেন। তুমি যাই হও, তুমি ব্যাধ মাংস কাটছ, তুমি গৃহবধূ রূপে শুধু স্বামীর সেবা করছ, কিন্তু তুমিও ঐ একই অবস্থায় যাবে যেখানে পরমহংসরা যান। এই ধরণের বর্ণনা আরও অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে। যেমন আচার্য শঙ্করের অন্যতম প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ছিলেন মহামূর্খ, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর

কাছে বসে থাকতেন। লাটু মহারাজের জীবন এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত। লাটু মহারাজকে নিয়ে স্বামীজী পরে বলছেন, ঠাকুরের কী চমৎকার দেখ, ঠাকুরের আশীর্বাদে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি, অশিক্ষিত লাটু সেখানেই পৌঁছেছে। লাটু মহারাজ জপধ্যান করতেন ঠিকই কিন্তু মূলতঃ তিনি করেছেন সেবা। এই সেবা হৃদয়রামও করেছেন, কিন্তু হৃদয়রামের সেবাটা ছিল অধিকার, আমি তোমার সেবা করছি ঠিকই কিন্তু করতে হবে তোমাকে আমার মত। সেবা মানে মায়ের মত হয়, ছোট্ট শিশুকে যেভাবে সেবা করে। কিন্তু মায়ের মনেও সেই অধিকার বোধ এসে যায়, কদিন পরেই বলে কোন মেয়ের সাথে মিশবে, কাকে বিয়ে করবে সব আমিই ঠিক করে দেব। ব্যাসদেব কি করলেন? যে কোন কাজ, ছোট হোক বড় হোক সব কাজই পূজা রূপে দিয়ে দিলেন। এই পূজাই ভগবান লাভের পথ। সেইজন্য নারদ বলছেন, *পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশার্যঃ*।

কিন্তু ভাগবত পুরাণকে নিয়ে যদি দেখা হয়, তাহলে আজকের দিনে পূজা বলতে আমরা যেটা বুঝি, ব্যাসদেব কিন্তু এই পূজার কথা বলেননি। ভাগবতে ব্যাসদেব যেখানে ভক্তির লক্ষণের বর্ণনা করছেন বা আরও যেখানে যেখানে পূজাদির কথা এসেছে সেখানে তিনি পূজাকে খুব উচ্চস্থান দিয়েছেন। কিন্তু আজকে পূজা বলতে আমরা যেটা বুঝি, প্রতিমা আছে, পঞ্চোপাচার, দশোপাচার, ষোড়শোপাচার করা হচ্ছে, ব্যাসদেব পূজা বলতে এতটা বলেননি, সেইজন্য নারদ কেন এভাবে বলছেন এটা ঠিক পরিষ্কার নয়। কিন্তু যদি স্বধর্মকে নেওয়া হয় তাহলে পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে যায়, কারণ স্বধর্মটাই পূজা। গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ, গীতার অনুবন্ধন ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, গীতার উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করে কাজ করা। গীতাতে ভগবান দুটো উপায়ের কথা বলছেন, একটা হল আত্মভাবে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে একটাই উপায় ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করা। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যদি কর্ম করা হয় তাহলে এটা কিন্তু পূজা হয়ে যাবে। আর তখন সব কাজই পূজা হয়ে যায়, কীর্ত্তন করাটাও পূজা, নৃত্য করছে সেটাও পূজা আবার আসনে বসে ষোড়শোপাচারে পূজা করাটাও পূজা, ঠাকুরকে কথামৃত পাঠ করে শোনানোটাও পূজা আবার শাস্ত্র রচনা করাটাও পূজা। নারদ বলছেন *অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামাঃ*, *সা ত্বস্মিন পরমপ্রেমরূপা*, ভক্তি পরমপ্রেম। ভক্তি কিভাবে পেতে হবে? *তল্লক্ষণানি নানামতভেদাৎ*, ভক্তি লাভ করার নানান মত ও পথ আছে। কি পথ আছে? ব্যাসদেব যিনি হিন্দু ধর্মকে নতুন ভাবে পরিভাষিত করে দিলেন, তিনি বলছেন *পূজাদিষু অনুরাগ*। পূজা কি? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যা কিছু করা হয়, *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।* খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত যে কোন কাজ যেমনি ঈশ্বরে অর্পণ হয়ে গেল তখনই সেটা পূজা হয়ে গেল। ব্যাসদেব বলছেন এটাই ভক্তি। নারদ বলছেন ব্যাসদেব ভক্তিকে এভাবে পরিভাষিত করেছেন। মহাভারতে ব্যাসদেব কথায় কথায় স্বধর্মকে নিয়ে এসেছেন। স্বধর্মের উদ্দেশ্য হল যা কিছু কর্ম করা হবে তার ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া। ঈশ্বরকে কোন কিছু অর্পণ করা মানেই ভক্তি, তারপর ঈশ্বরই দেখবেন, আমার যা হবার হবে, সব তিনিই দেখবেন। ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসুন আর নাই বাসুন আমি তো পরমপ্রেমে অবস্থিত হয়ে গেলাম, আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

একজন লেখক বলছেন, লেখাটাই আমার জীবনধারা, লেখা ছাড়া আমি থাকতে পারব না। দেখা গেল সেই লেখকের বই ছাপা হচ্ছে না, যদিও বই ছাপা হল কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না। এবার যদি তিনি খুব হা হুতাশ করে বলতে থাকেন, এরা ইচ্ছে করে ছাপতে দিতে চাইছে না, প্রচার যাতে না হয় তার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। সেই লেখককে গিয়ে বলতে হয়, আপনার লেখাগুলো তিনটে ছদ্মনামে তিন জায়গায় ছাপতে দিয়ে দিন, এতে আপনি রাজী? না রাজী নই। ভাই আপনি লেখাটেখা ছেড়ে দিন, কারণ লেখাটা আপনার জন্য নয়, লেখাটাই আপনার জীবনধারা হতে পারে না। সবাই কামিনী-কাঞ্চন, নামযশের মধ্যে ঘুরপাক করছে। কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ কখনই কারুর জীবনের আদর্শ হতে পারে না। জীবনের আদর্শ থেকে যেটা প্রাপ্তি সেটা এখানে ব্যয় হয়। সেইজন্য জীবনে যদি কেউ ভালো কিছু হতে চায় তাহলে আদর্শের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আর ব্যয়টা আগে বন্ধ করতে হবে। আমাদের এখানে সবারই উল্টো, আয় নেই শুধু ব্যয়, ব্যাঙ্ক লোন, ক্রেডিট কার্ডের উপর সারা জীবন চলছে। ফুটো বালতি নিয়ে ট্যাপের তলায় রেখে দিয়েছি, ট্যাপের জল বালতিতে জমার আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্ম যেমন সৃষ্টি করছি, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, কোন কিছু আসার আগেই নামযশ, কামিনী আর কাঞ্চনে ঠাক্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যাসদেবই প্রথম যিনি এই জিনিসটাকে এভাবে

বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তিনি নিয়ে এলেন স্বধর্ম, যে কর্মই করছ সেই কর্মের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ কর, এটাই পূজা, অর্পণ করাটাই ভক্তি।

এই জিনিসটাকে আবার যদি অন্য দিক থেকে দেখা হয় তখন দেখা যাবে, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাঁদের অনেকেই পূজাদি নিয়ে ছিলেন। যেমন আচার্য শঙ্কর যদিও তিনি অদ্বৈতী কিন্তু ভারতের চার জায়গায় তিনি মঠ স্থাপন করলেন, সেখানে পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করে দিলেন, স্বামীজীও পূজা করতেন। তার থেকেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল রামানুজ, চৈতন্য মহাপ্রভু এনারা এত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়েও পূজা, অর্চনা, নামকীর্ত্তনাদির উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। এখানে বক্তব্য হল শরীর দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে কোন কাজই পূজা। এই দৃষ্টিতে যদি নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্ত্তনাদি, রামানুজের যে প্রচুর আচার যেগুলো তিনি নিজেও করতেন আর তাঁর শিষ্যদের দিয়েও করাতেন, এগুলোকেও পূজা বলা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দৃষ্টিতেও পূজাকে ভক্তি বলা হয় আর ব্যাসদেবের দৃষ্টিতে দেখলে, স্বধর্মকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হল, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যে কোন কর্ম করাটাই পূজা। কিন্তু আমরা এখনও ভক্তিকে উপরের দৃষ্টিতে দেখছি, আমরা দেখছি যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের কাছে সব কর্মই পূজা ছিল। স্বামীজী যখন ভাষণ দিচ্ছেন তখন এটাও তাঁর কাছে পূজা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ যখন সেবাব্রত নিয়েছেন তখন সেটাই তাঁর কাছে পূজা। স্বামীজী ভারতবাসীকে যখন দেশের মানুষকে সেবা করার কথা বলছেন তখন তিনি পূজা ভাবে সেবা করার কথা বলছেন। প্রথম সূত্রে ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নারদ এটাই বলছেন, ব্যাসদেবের মতে ঈশ্বরের পূজা ভাবে যে কোন কর্ম করাকে ভক্তি বলা যায়। ভক্তির দ্বিতীয় সংজ্ঞা দিচ্ছেন –

কথাদিষু ইতি গর্গঃ।।১৭।।

গর্গ ঋষির মতে ভগবানের কথা আলোচনা করা, ভগবানের নামগুণ নিয়ে থাকা এটাই ভক্তির লক্ষণ। নারদ এখানে হঠাৎ গর্গের নাম কেন এনেছেন ঠিক পরিষ্কার নয়। আমাদের শাস্ত্রে কয়েক জায়গায় গর্গ মুনির নাম আসে, বেদের সময় তিনি এক ঋষি ছিলেন, ওনার নামে একটা উপনিষদ গর্গোপনিষদও আছে। কিন্তু গর্গ মুনি বিখ্যাত হয়েছেন জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্য, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর নামেই কিছু শাস্ত্র আছে যেগুলোকে বলা হয় গর্গসংহিতা। তবে গর্গ মুনির নাম বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায় ভাগবতে। বৃন্দাবনে যদুকুলে নন্দবাবার বংশের তিনি কুলোপুরোহিত ছিলেন। যেহেতু একই নামে অনেকে থাকতে পারেন আবার একই লোকও হতে পারেন, সেইজন্য বেদের গর্গ আর ভাগবতের গর্গ এক ব্যক্তি কিনা পরিষ্কার নয়। তবে ভাগবতে যে গর্গ মুনির নাম পাওয়া যায় আর বেদের গর্গ দুজন এক নন, কারণ বেদের অনেক পরে ভাগবত রচিত হয়েছে, বেদের কাল আর ভাগবতের কালের মধ্যে কয়েক হাজার বছরের তফাৎ। তাই নারদ এখানে কোন গর্গকে নিয়ে বলছেন এখন আর জানার কোন উপায় নেই। ভাগবতের যিনি গর্গ তিনি বড় ঋষি ছিলেন, পুরোহিত ছিলেন আর তিনি কৃষ্ণ আর বলরামের নামকরণ করে নামের ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সময় গর্গ মুনিকে খুব সম্মানের সাথে দেখা হত। গর্গ বড় জ্যোতিষিও ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা তিনিই বিচার করে দিয়েছিলেন। নারদ ভক্তিশাস্ত্র লিখতে গিয়ে গর্গের কথা উল্লেখ করে বলছেন, ভক্তির ব্যাপারে গর্গ এই বলছেন।

কথাদিষু ইতি গর্গঃ, গর্গ মুনির মতে ভক্তি কি সেটাই এই সূত্রে নারদ বলছেন। ভক্তির লক্ষণ কি, আমরা কি করে জানব যে ইনি ঈশ্বরের ভক্ত? ইনি পরম প্রেমে পৌঁছে গেছেন? এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধন আর সিদ্ধি সমান, সিদ্ধ পুরুষরা যেটা করেন, সাধনাতে সেটাই করা হয়। তার মানে যদি সিদ্ধ পুরুষ এই রকম করে থাকেন তাহলে আমিও যদি এই রকম করি তাহলে আমিও সিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারি।

ঠাকুর বলছেন, যত যাই বল কুণ্ডলিনীর জাগরণ না হলে কিছুই হবে না। তারপরে বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ কুণ্ডলিনী জাগরণ। কুণ্ডলিনীর এখন অনুবাদ করে বলা হয় Centere of Consciousness, তার মনের স্তরটা কোথায় অবস্থিত। কুণ্ডলিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে ঠাকুর আবার বলছেন, হৃদয়ে যখন আলো রূপে বা নাদ রূপে ঈশ্বর বা চৈতন্যের বোধ হয়, সেখান থেকে কুণ্ডলিনী কণ্ঠে উঠে যায়। বলছেন, সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানী পুরুষদের কুণ্ডলিনী তারও উপরে ভ্রুর মধ্যে পৌঁছে সেখান থেকে সহস্রার পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু জগতে যখন কাজ করেন তখন খুব হলে তাঁর কুণ্ডলিনী কণ্ঠ দেশ পর্যন্ত নামবে, ওর নীচে যাবে না। যাঁদের কুণ্ডলিনী

কণ্ঠ দেশে চলে যায় তাঁরা ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। বিষয় কথা হলে তাঁদের খুব কষ্ট হয়, সেখান থেকে তাঁরা উঠে চলে যান। ঠাকুর এই কথা বলছেন। এখানে এটাই বলছেন, ভক্তির লক্ষণ কি, ঈশ্বরীয় কথা বলা। যেমন তুলসীদাস তিনি ঈশ্বরীয় কথা নিয়ে আছেন। মীরাবাঈ যে ভজন করছেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যে গান করছেন, নৃত্য করছেন এটা কায়িক ভক্তিতে চলে যাবে, পূজা আদিতে চলে যাবে। কিন্তু তুলসীদাস রামকথার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সুরদাস বালগোপালের বর্ণনা করছেন, এগুলোই *কথাদিষু ইতি গর্গঃ*। এমন কি বাল্মীকি, ব্যাসদেব এনারাও ঈশ্বরীয় কথা নিয়েই আছেন। ভাগবতে বর্ণনা আছে, মহাভারত রচনা করার পর ব্যাসদেব খুব মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বসে আছেন, মনে শান্তি নেই। সেই সময় তাঁর নারদ মুনির সঙ্গে দেখা। দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে দেখে বলছেন 'আপনাকে এত অবসাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন'? 'কি জানি আমার কিছুই ভালো লাগছে না'। নারদ মুনি তখন বলছেন 'আপনি অনেক বড় বড় কাজ করেছেন ঠিকই, বেদের বিভাজন করেছেন, মহাভারত রচনা করলেন। কিন্তু আপনি মহাভারতে কি লিখলেন, আপনি সেটাই মহাভারতে লিখেছেন যেটা মানুষ মাত্রই করে। আপনি স্বধর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু মনে রাখবেন স্বধর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করলেই সেটা ভক্তি হয় আর ঈশ্বরকে অর্পণ করে না করলে ঐ স্বধর্ম পুরোপুরি নিজের স্বার্থ পুর্তিতে চলে যায়। মানুষের যেটা স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে আপনি সেটাকেই আরও উৎসাহিত করে দিয়েছেন। মহাভারতে সেই ভাবে আপনি ঈশ্বরীয় কথা বলেননি, যেটুকু বলেছেন সেটাও খুবই নগণ্য'।

মহাভারতের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে স্বধর্মকে কেন্দ্র করে। স্বধর্মে এই সমস্যা হয়, শুধু স্বধর্মেই নয়, যে কোন পথ সাংসারিক লোকেদের হাতে পড়লে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়ে যাবে, কিছু করার থাকে না। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, প্রত্যেকটি নতুন সংস্থা সমাজকে এক নতুন সমস্যা উপহার দেয়, নতুন ধরণের পাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু আমার কোন উপায় নেই আমাকে এটাই করতে হবে। আমরা যে ওষুধ খাচ্ছি, যে কোন ওষুধই আমাদের অনেক ক্ষতি করে। কিন্তু ওষুধ যদি না খাওয়া হয় তাহলে ভেতরে যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা আরও বেশি ক্ষতি করবে। মানুষকে তাই ওষুধ খেতে হয়, খুব দরকার না হলে ওষুধ খেতে নেই, শরীর নিজেই ধীরে ধীরে ওটাকে সারিয়ে নেয়। ঠিক তেমনি আমরা যে পথই নিই না কেন, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, সব পথেই গোলমাল হবে যদি এটা সাংসারিক লোকেদের পাল্লায় পড়ে। নারদ বলছেন, আপনি তো শেকলটাই কেটে দিয়েছেন, সবাইকে বলে দিলেন কর্ম করতে। ব্যাসদেবের কিন্তু এই উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের মধ্যে কর্ম করার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে সেই কর্মটা তারা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করুক, তাতেই তাদের কল্যাণ হবে। কিন্তু সাংসারিক লোকেরা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিটা উড়িয়ে দিয়ে কর্মকেই আঁকড়ে রেখেছে। নারদ তখন বললেন, আপনাকে ভগবানের কথা লিখতে হবে, ব্যাসদেব পরে তাই ভাগবত রচনা করলেন। ভাগবত মানেই ঈশ্বরীয় কথা। ব্যাসদেব গীতাতে একই কথা লিখেছেন, কিন্তু মহাভারতে যে overall presentation রয়েছে সেখানে আবার অনেক কিছুই এসে গেছে, ফলে তাঁকে পরে ভাগবতাদি পুরণের মত গ্রন্থের রচনা করতে হল।

গীতায় ভগবান বলছেন, *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, আমার ভক্ত শুধু আমারই কথা বলে, আমার কথার বাইরে অন্য কোন কথা বলবে না। খুব সিনিয়র মহারাজদের সঙ্গে কেউ যদি ঈশ্বরীয় কথার বাইরে কোন কথা বলতে যায় ওনারা এক সেকেণ্ডে সেই কথা ঘুরিয়ে ঈশ্বরীয় কথায় নিয়ে যাবেন। কারণ তাঁরা সব সময় ঠিক ঠিক ঐ ভাবে নিয়েই থাকেন। আর ঈশ্বরীয় কথার কেমন দাম তার একটা বর্ণনা কথামৃতে আছে। ডাঃ সরকার ঠাকুরের কাছে একদিন এসেছেন, ঠাকুরের তখন গলায় ক্যান্সার। ঠাকুরকে ডাঃ সরকার বলছেন, তুমি কথা বেশি বলবে না। আমি যখন আসব তখন আমার সাথেই শুধু কথা বলবে। ঠাকুর বলছেন, একটু ব্যাথাটা সারিয়ে দাও, ঈশ্বরের নামগুণগান করতে পারছি না। ডাক্তার তখন বলছেন, তাঁর ধ্যান করলেই তো হল। শুনে ঠাকুর বলছেন, না গো আমি সবটা নিয়েই থাকি, একটা নিয়ে থাকতে যাব কেন। এটাই ঠাকুর বৈশিষ্ট্য, তিনি সব ভাবেই নিচ্ছেন। ধ্যান করাটা যেমন ঠাকুরের ভাব, নামগুণগান করাটাও ঠাকুরর ভাব।

চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যদশা আর অর্দ্ধবাহ্যদশা হত, বাহ্যদশাতে তিনি ভক্তদের সাথে কথা বলছেন আর অর্দ্ধবাহ্যদশাতে নৃত্য করছেন। এটাকেই এখানে অন্য ভাবে বলছেন, কায়িক আর বাচিক। একজন সিদ্ধ পুরুষ সিদ্ধ কিনা আমরা কি করে জানতে পারব? তখন এই দুটো লক্ষণের কথা বলছেন। তিনি ঈশ্বরের কাজেই লেগে থাকবেন, দ্বিতীয় কথা যখন বলবেন তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলবেন না। সিদ্ধ পুরুষরা

একটা ভাবকে নিয়ে থাকেন, কারণ যে ভাবে তিনি ঐ অবস্থায় গেছেন সেই ভাবেই তিনি বলেন। তখন সিদ্ধ পুরুষকে চিনতে হলে দেখতে হবে তাঁরা এই কথাগুলোই বলছেন কিনা। কিন্তু সব সময় যে ঐ রকমই হবে তা নয়, কারণ আমরা স্বামীজীর জীবনে দেখছি, সঙ্ঘের জন্য বা দেশের জন্য কথা বলছেন তখন অন্য ধরণের কথাও বলছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায় ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু বলেন না। এটাই *কথদিষু ইতি গর্গঃ*। যাঁরা সাধক, সাধনা করছেন তাঁদেরও যদি কথা বলতে হয় ঈশ্বরীয় কথার বাইরে অন্য কোন কথা বলতে নেই। তৃতীয় ভক্তির সংজ্ঞায় বলছেন –

আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাণ্ডিল্যঃ।।১৮।।

কায়িক, বাচিকের পর এবার বলছেন মানসিক। যাঁরা মনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে থাকেন তাঁরা ভক্তির সংজ্ঞা কিভাবে দেন বলছেন, বলার পর শাণ্ডিল্যকে নিয়ে আসছেন। শাণ্ডিল্যের আবার নিজস্ব ভক্তিসূত্র রয়েছে, সেটাও খুব নামকরা ভক্তিসূত্র। শাণ্ডিল্য মুনিও গর্গ মুনির মত, উপনিষদে তাঁর নাম আছে। আর বলা হয় যে, কাশ্যপ মুনির প্রপৌত্র ছিলেন শাণ্ডিল্য মুনি। শাণ্ডিল্য গোত্রও খুব নামকরা গোত্র। বেদের নামকরা ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণের সাথে শাণ্ডিল্য মুনি জড়িয়ে আছেন। আরও যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ছান্দোগ্য উপনিষদের সাথে শাণ্ডিল্য মুনির পরিবারের কোথাও যোগ ছিল, যার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আলাদা একটা অংশই আছ যার নাম শাণ্ডিল্য বিদ্যা। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও শাণ্ডিল্যের নাম আসে।

আমাদের পরম্পরায় শৌনক মুনি খুব নামকরা একজন মুনি ছিলেন। বলা হয় শৌনক মুনি নাকি শাণ্ডিল্য মুনিকে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিয়েছিলেন। শাণ্ডিল্য মুনি আর যাই যাই করে থাকুন ওনার এই ব্রহ্মবিদ্যা, যাকে আমরা আত্মবিদ্যা বলছি, এই বিদ্যার সাথে শাণ্ডিল্য মুনি পুরোপুরি জড়িয়ে ছিলেন। শাণ্ডিল্য বিদ্যা, যে বিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, এর শুরুই হয় *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* মহাবাক্য দিয়ে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ের চোদ্দ নম্বর মন্ত্র থেকে শুরু হয় শাণ্ডিল্য বিদ্যা। একটা বিদ্যাকে তাঁর নামেই উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে, যার শুরু হয় *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো* দিয়ে। বলছেন এই যে ব্রহ্ম, এখান থেকেই জগৎ বেরিয়ে এসেছে, এই ব্রহ্মতেই আবার জগৎ লয় হয়ে যায়, ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই। সেইজন্য উপনিষদের খুব নামকরা কথা বলছেন *যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত*। জগতের সৃষ্টি ব্রহ্ম থেকে জগতের লয় ব্রহ্মে সেইজন্য মানুষ মাত্রেরই একমাত্র ধর্ম শান্ত মনে এই ব্রহ্মের চিন্তন করা। আমরা যাতে অবস্থিত, সেই পুরো জিনিসই ব্রহ্মতে অবস্থতি রয়েছে। শুধু যে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে তা নয়, এর লয়ও হয় সেখানে গিয়ে। যেমন আমরা বেরিয়ে এসেছি মায়ের গর্ভ থেকে কিন্তু আমাদের লয় কখনই মায়ের গর্ভে গিয়ে হয় না, মায়ের গুরুত্ব একটা জায়গাতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, তিনি হলেন গর্ভধারিণী, জন্মদায়িনী। কিন্তু যিনি জগজ্জননী, তিনি আমাদের জন্মই দিয়েছেন, জগতপ্রসবিনী আর তিনি বিধ্বংসিনী, এটাই পরে আমাদের তন্ত্র সাধনায় এসেছে। কিন্তু শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে বা ছান্দোগ্য উপনিষদে বার বার বলছেন এই জগতের সৃষ্টি ব্রহ্ম থেকে আর এর লয় সেই ব্রহ্মে। যেখান থেকে সৃষ্টি আর যেখানে লয়, তার মানে ওটাই মূল। জগতেরই যখন এই রকম হয়, ঐটাই যদি মূল হয় তাহলে মানুষ মাত্রেরই ধর্ম হল শান্ত মনে সর্বদা, সর্বাবস্থায় সেই ব্রহ্মের উপাসনা করা। এটাই শাণ্ডিল্য বিদ্যা, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে সব ব্রহ্ম, ব্রহ্মেরই নানান রূপ। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, বাকি যা কিছু আছে সব নাম আর রূপের খেলা, জগতটাও নাম রূপের খেলা। সেইজন্য জীবনের উদ্দেশ্য হল নাম রূপের খেলায় মুগ্ধ না হয়ে, সেই ব্রহ্ম, যেখান থেকে নাম রূপের খেলার জন্ম, যেমন সমুদ্র আর ঢেউ, ঢেউ নাম রূপের খেলা, সমুদ্রই বাস্তবিক, ঢেউয়ের নৃত্যে মুগ্ধ না হয়ে অনন্ত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি দাও। এই বিদ্যা অনেকেই দিয়েছেন কিন্তু এই যে মহাবাক্য *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, শাণ্ডিল্য মুনির অবদান। বলছেন এটাই মানুষের জীবনধারা। আত্মাকে, ব্রহ্মকে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদ অনেক ভাবে উপস্থাপিত করছেন, তৈত্তেরীয় উপনিষদ, মাণ্ডুক্য উপনিষদেও করছেন, কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যায় একেবারে নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, জগতে যা কিছু আছে ব্রহ্মই আছে, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। *অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো*, যারা এই জগতে উপলব্ধি করতে চায় তাদের উচিত শান্ত মনে ব্রহ্মের উপাসনা করা।

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র যিনিই লিখে থাকুন, এই ভক্তিসূত্র খুবই উচ্চমানের। কেন উচ্চমানের এটাকেই এখন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যদি শুধু কায়িক আর বাচিককেই ভক্তির লক্ষণের জন্য রাখা হয় তাতে অসুবিধার কি আছে? কায়িক লক্ষণ মানে ব্যাসদেবের মতে সব কাজ পূজা অর্চনা রূপে করা আর তার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করা, বাচিক হল ঈশ্বরের নামগুণগান, যার কথা গর্গ বলছেন। সাধনার দিক থেকে বলা হয়, ব্যাসদেব যা বলেছেন, গর্গ মুনি যা বলেছেন, এই দুটোই আমি সব সময় করতে থাকলাম। বলছেন এতে একটা বিপদের সম্ভবনা আছে। বিপদটা হল একটা জায়গায় গিয়ে এই দুটো আটকে যেতে পারে। সিদ্ধ পুরুষদের ক্ষেত্রে আলাদা কথা, কিন্তু সাধকদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী করে, কোন একটা জায়গায় গিয়ে সাধকের সাধনা আটকে যায়। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা বাকিদের তাচ্ছিল্য করত, ইদানিং কালে অবশ্য তা করতে দেয় না। ব্রাহ্মণরা সকালে মন্দিরে পূজা করছে, একটু গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ করছে আর সেইজন্য মনে করছে বাকিরা কিছুই না। অথচ সে নিজেও সমান ভাবে সেই অবস্থায় পড়ে আছে যেখানে বাকীরা আছে। আগেকার দিনে জমিদার বা রাজাদের যে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা থাকত তারা সকালে উঠে গঙ্গা স্নান করল, পূজা পাঠ করল, তিলক লাগাল তারপর জমিদারের সেরেস্তায় গিয়ে বসল আর ওখান থেকেই শুরু হয়ে গেল, একে খুন কর, ওখানে লেঠেল পাঠাও, জালি মকদ্দমা কর। তাহলে কায়িক বাচিক করে ভক্তি হল কোথায়! অথচ শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে সেটাই করছে। এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে, বাহ্যিক কায়িক ও বাচিকে গিয়ে যদি ফেঁসে যায় সেখানে এই আশঙ্কাটা থাকে। এটা একটা সাবধান করে দেওয়ার জন্য বলা।

কিন্তু মনের যখন পরিবর্তন আসে তখন কি বলছেন? *আত্মরতি অবিরোধী*, আত্মার যে আনন্দ, ঈশ্বরের যে আনন্দ, সেই আনন্দে ডুবে থাকবে, এর বিরোধী যা কিছু আছে সেটাকে ত্যাগ করে দেওয়া। এই ব্যাপারে শাণ্ডিল্য খুব দৃঢ়। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্, আত্মরতি* মানে আত্মার আনন্দে ভাসছে। ঠাকুরের জীবনে এটাই ভক্তি, সচ্চিদানন্দ সাগরে তিনি যেন মীন হয়ে ভাসছেন। ভক্তির যে শেষ অবস্থা সেটাও এই আত্মরতি। আত্মরতি মানে নিজের ভেতরেই তিনি সেই আনন্দ সাগরে ভাসছেন, বাইরের কিছুই অবলম্বন করতে হয় না। ভগবানকে তিনি যেভাবেই দেখুন আনন্দ, যা কিছু করছেন তাঁকে নিয়েই করছেন অর্থাৎ এই বোধকে রেখে নিজের সব রকম ক্রিয়া কর্ম করছেন। ঠাকুর যেমন উপমা দিচ্ছেন, বাড়ির বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি কাজ কমিয়ে দেয়। আর সন্তান হয়ে গেলে শুধু সন্তানকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এটাই আত্মরতি, আত্মা বা ভগবানকে নিয়েই থাকছেন।

এবার তিনটে সূত্রকে মেলালে কি হবে? যিনি ভালো সাধক তিনি মনের দিক থেকে দেখছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, দুই বলে কিছু নেই। এই ভাব নিয়ে যখন থাকছেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম যেটা করা হবে তখন সেটা ঈশ্বরের জন্যই করা হবে, সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করেই করা হবে আর কথাদি যা কিছু বলবেন সবই ঈশ্বরীয় কথা। এই তিনটে সূত্রকে মেলানোর পর জিনিসটা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তিনটেকে মেলানো যাবে না, কারণ এটা ভক্তিসূত্র, ভক্তিসূত্রের কাজই হল ভক্তির এক একটা দিককে সামনে নিয়ে আসা। বড় বড় ঋষিরা ভক্তির এক একটা দিককে রেখেছেন। আর এই ভক্তিসূত্র নারদের, এমনও হতে পারে যে তিনি জেনে শুনে এমন একটা কথা বলবেন যাতে একটা ফাঁক থেকে যাবে, ঐ ফাঁক থাকাতে ওনার যে মত সেই মতকে এবার ঠিক ভাবে রাখবেন। পরের সূত্রেই আমরা জিনিসটা দেখতে পাব। মূল হল আমরা যদি সিদ্ধ পুরুষকে দেখতে চাই তিনি কেমন, তখন তিন ভাবে দেখা যায়। তাঁর ক্রিয়া কর্মাদি দিয়ে, সেখানে ঈশ্বরের ভাব, তিনি যে কথা বলেন তার মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব। আর মনের ভাব যেটা বাইরের কেউ কখন জানতে পারবে না, সেখানে বলছেন *আত্মরতি অবিরোধী*, আত্মার জ্ঞানের বাইরে, ঈশ্বরই আছেন এই ভাবের বাইরে তিনি কখনই যাবেন না। তাঁর মন সব সময় ঐ জায়গাতে বসে থাকবে। এই জিনিসটাকেই পরের সূত্রে সবটাকে মিলিয়ে নারদ এক জায়গায় নিয়ে আসছেন –

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।।১৯।।

সিদ্ধ পুরুষের ভক্তির তিনটে বর্ণনা আমরা আলোচনা করলাম। সেখান থেকে নারদ এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, নারদের মতে ভক্তি কি, যেটাকে পরমপ্রেম বলছেন? নারদ তাঁর নিজের মত দিতে গিয়ে বলছেন, *নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা*, যত রকমের ক্রিয়াকর্ম, ভালো মন্দ যাই হোক, সব কিছু ভগবানের চরণে সমর্পণ

করা। আর *তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি*, একটু ক্ষণের জন্যও যদি ঈশ্বরকে ভুলে যায়, স্মরণে যদি না উদিত হন তাঁর জন্য তীব্র ব্যাকুলতাই ভক্তি। এখানে বলে দেওয়া ভালো, যদিও ভক্তি সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ কিন্তু এতে সাধকের লক্ষণ এসে যাচ্ছে। সাধকের লক্ষণ এই জন্যই হয়, যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কখনই বিস্মরণটা হয় না। তবে যীশুর জীবনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে, যখন তাঁকে ক্রুশিফাই করা হচ্ছে তখন এক সেকেণ্ডের জন্য বলছেন, God, my God, why have you forsaken me, বলতে না বলতেই তিনি চুপ করে গেছেন। ঠাকুরেরও প্রথমের দিকে আমরা পাই, যখনই তাঁর মনে কোন সংশয় বা সন্দেহ হত দৌড়ে দৌড়ে তিনি মা কালীর কাছে ছুটে যেতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের বিস্মরণ, ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া ঠাকুর বা কোন সিদ্ধ পুরুষদের কখনই হবে না। কিন্তু মূল বক্তব্য হল, *তদর্পিতাখিলাচারতা*, ঈশ্বরের চরণে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম অর্পণ করে দেওয়া আর এক মুহূর্তের জন্য যদি তাঁকে ভুলে যায় তাতে পরম ব্যাকুলতা।

ব্যাসদেব যমুনা পার করবেন, গোপীরাও পার হবেন কিন্তু কোন নৌকা নেই। ব্যাসদেব তখন গোপীদের বলছেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে তোমাদের কাছে যদি কিছু থাকে আমাকে খেতে দাও। গোপীদের কাছে ননী, মাখন যা কিছু ছিল ব্যাসদেবকে দিয়েছেন। উনি সব খেয়ে যমুনাকে বলছেন, হে যমুনে আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে পথ দাও। তাহলে উনি যা কিছু খেয়েছেন কি করেছেন? উনি কিছুই খাননি ভগবানকে অর্পণ করে দিয়েছেন। আমি করছি, এই আমিত্ব ভাবটা *তদর্পিতাখিলাচারতাতে* নেই। খাওয়াটাও ভগবানকে অর্পণ করে দিলেন। সেইজন্য ব্যাসদেব বলতে পারছেন আমি যদি এটা না খেয়ে থাকি। কঠিন ঠিকই, খুব উচ্চমানের সিদ্ধ পুরুষরাই এটা পারেন। এটাই তাঁদের স্বাভাবিক। গীতাতেও ভগবান এই একই ভাবের কথা বলছেন, *যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ*। সুতরাং তাঁরা কি করে এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে ভুলে থাকবেন? ঠাকুর বলছেন বুকের মধ্যে বিল্লি আঁচড়ালে যেমন লাগবে সেই রকম যন্ত্রণা হবে।

নারদের এই মতকে নেওয়া হলে দেখা যাবে, বাকি যে তিনটে মত বলা হল, ঐ তিনটে মত একটা জায়গায় এসে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। *নারদস্তু*, তু যখন বলছেন তখন দেখাচ্ছেন যে আগে যাঁরা বলেছেন তাঁরা ঠিকই বলছেন কিন্তু আমার মত একটু অন্য রকম। *তদর্পিতাখিলাচারতা* হল পূর্ণ শরণাগতির ভাব, শুধু যে পূজা, কথা বলা তা নয়, ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুই ভগবানের চরণে নিবেদন করা। গীতাতে ভগবান বলছেন, যা কিছু করছে সব ইন্দ্রিয় করছে, আমি কিছু করছি না। এখানে কিন্তু বলছেন যা কিছু হচ্ছে *পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি*, এগুলো সব শরীরের ক্রিয়া, ভগবান বলছেন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করছে, আমি আত্মা রূপে কিছুই করি না। এটাই কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে বিপরীত হয়ে যায়, সবটাই তিনি করাচ্ছেন বা সব কিছু তাঁর চরণে অর্পণ করলাম। চোখ পিট পিট করছি, বেদান্ত মতে বলবে, চোখ পিট পিট করছে তাতে আমার কি আসে যায়, আমি আত্মা দেহের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ভক্ত বলবে ঈশ্বরই করাচ্ছেন। একটা বাজে কাজ করল, বেদান্তী বলে, এই কাজ তো আমি করিনি, আমার কর্ম আমার হাতকে দিয়ে আমার মনকে দিয়ে করিয়েছে। ভক্ত বলবে ঈশ্বর আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। বাজে কর্মের জন্য এবার মার খেতে হবে, বেদান্তী বলবে, অবশ্যই মার খেতে হবে, কর্মের ফল তো ছাড়বে না। ভক্ত বলবে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে করিয়েছেন, ঈশ্বরই আমাকে এখন দণ্ড দিচ্ছেন। সংসারীরা নানা রকমের আইনের ফাঁক খুঁজবে কি করে বাজে কর্মের ফল থেকে বাঁচতে পারে। ভক্তিতে এখানে পূর্ণ শরণাগতীর ভাব নিয়ে আসা হয়েছে।

কিন্তু *তদর্পিতাখিলাচারতা* দিয়ে শুধু পূর্ণ শরণাগতির ভাবকে বলা হলে আমাদের কাছে ভক্তির সম্পূর্ণ ছবিটা পরিষ্কার হবে না, সেইজন্য আরেকটা যোগ করে দিয়ে বলছেন তাঁর বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা হয়। যে কোন উচ্চ জিনিসে যে কোন extreme গুলো গিয়ে মিশে যায়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, কোন জিনিস যদি প্রচণ্ড বেগে চলে তখন তাকে স্থির বলে বোধ হয়। স্থির হল static এর চরম, তীব্র বেগ হল গতির চরম, দুটোকে মনে হয় যেন এক। ভক্তিতে যেমন চরম আনন্দ, চরম জিনিসটা রয়েছে, ঠিক তেমনি এক মুহূর্তের যে বিস্মরণ হবে তাতেই চরম ব্যাথা অনুভব হবে। তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে, নারদ এই সূত্রে সরাসরি যে পরা ভক্তির সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা না, তার সাথে যে ভক্তি সাধনা করবে তার আচরণ কেমন হবে সেটাকেও বলছেন। সেইজন্য বেদান্তের সূত্রের যে সম্মান ভক্তিসূত্রে ঐ সম্মান থাকে না, তার কারণ কোথাও কোথাও একটু যেন ফাঁক থেকে যায়। পরা ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যাঁরা ভক্তির আচরণ করছেন তাঁদের কথাও

বলছেন। শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, তা তিনি যীশুই হন বা মহম্মদই বলুন বা ঠাকুরই বলুন বা মহাপ্রভুই বলুন, এনাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। এই যে বলছেন *তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি*, এর মধ্যে *তদ্ স্মরণে পরমানন্দ* এই রকম বলছেন না। শুধু তাঁকেই দেখছেন, ভগবানকেই শ্রেষ্ঠতম দেখছেন, ভগবানকেই প্রিয়তম দেখছেন, সেইজন্য তাঁর যত রকমের কাজ, যত রকমের গতিবিধি সব ভগবানের জন্যই করছেন।

এখানে দুটো জিনিসকে নিয়ে বলছেন, একটা করাকে নিয়ে আর বিস্মরণ হলে কি হয়। এই সূত্রে নারদ যেন অনেক বেশি ভাবকে নিয়ে আসছেন। কারণ এটা যে একটা one line truth তা তো নয় কিন্তু খুব বিস্তির্ণ, হাত, হৃদয় আর মাথা তিনটেকে যেন একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। *তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি* তার মানে স্মরণেই তাঁর আনন্দ হয়, যেটা শাণ্ডিল্য বলছেন। নারদ এই সূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যাকে যেন অনেক বেশি বিস্তারিত করে দিয়ে পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। সাধারণ জগৎ সব সময় দ্বৈতের জগৎ, দ্বৈত জগতে যে জিনিসটা আছে তার উল্টোটাও আছে, যেমন সুখ আছে তার সাথে দুঃখও আছে, শীত আছে উষ্ণতাও আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎ পুরোপুরি অদ্বৈতের জগৎ, অদ্বৈতের জগৎ না বলে একের জগতও বলা যায়, ঐ একের জগতে গিয়ে যত রকম পরস্পর বিরোধী জিনিস আছে, পরস্পর বিরোধী যত ভাব আছে সব মিলে যায়। ঈশ্বর ধর্ম ও অধর্মের পারে, আলো আঁধারের পারে এই ভাবগুলো যখন বলা হয় তখন একদিকে আমরা বলতে পারি তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভক্তিতে ত্রিগুণাতীত তো সেই অর্থে হয় না, যেখানে সব বিরোধ গুলো গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে। এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে। সব রকমের বিরোধ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে, একদিকে তিনি শান্তিবার্তা নিয়ে কৌরব পাণ্ডবদের যুদ্ধ থামাতে চাইছেন, অন্য দিকে তিনি অত বড় যুদ্ধ রচনা করছেন। রাধা একদিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে সম্পূর্ণ ডুবে আছেন অথচ সতীত্বের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে একমাত্র রাধাই সতী। বিরোধ এসে গেল, সতী আর অসতী পরস্পর বিরোধী, কিন্তু দুটো বিরোধ রাধাতে গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের জগতে আমরা সাধারণ ভাবে জানি হয় সতী তা নাহলে অসতী। রাধার আচরণ অসতীর আচরণ, অথচ পরীক্ষা দিতে দেখা যাচ্ছে রাধা সব থেকে বড় সতী। যাঁরাই আধ্যাত্মিক পুরুষ হন তাঁদের কাছে সব বিরোধ এক হয়ে যায়, ফলে ওনাদের মধ্যে বিরোধের আভাস দেখা যায়। আমরা যেমন বলি দুমুখো, দু রকমের কথা বলে। অবতারদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন ভগবান যীশু পবিত্রতার কথা বলছেন আবার অন্য দিকে যে নষ্টা মেয়েকে সবাই পাথর মারতে যাচ্ছে তাকে তিনি ক্ষমা করে আশ্রয় দিচ্ছেন। ভগবান বুদ্ধ, তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, অন্য দিকে নগরবধূ, নর্তকী আম্রপলীর বাড়িতে গিয়ে খাচ্ছেন। এই পরস্পর বিরোধ আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল, কিন্তু হয় এই রকমই। এখানে যেমন পরমব্যাকুলতার কথা বলছেন, এর উল্টোটা আবার পরা ভক্তিতে হয়।

এর আগে যেমন বলা হল *মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি*, ঈশ্বর জ্ঞানে পরা ভক্তিতে মত্ত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরের আনন্দের ঠাকুর কত উপমা দিচ্ছেন, জাগতিক আনন্দের থেকে কত কোটি গুণ আনন্দ ঈশ্বর জ্ঞানে হয় তার বর্ণনা করছেন। আর তাঁর যদি বিস্মরণ হয় তাতে ব্যাকুলতাও তেমনটাই তীব্র হবে। আবার অনেক সময় কোন ভালো খবর এল বা ভালো কিছু দেখলেন আনন্দ হয়ে গেল, যদি না হয় তাতেও এমন কিছু আসে যায় না, থাকলে খুব আনন্দ। কিন্তু এখানে তা হয় না, থাকলে পরম আনন্দ আর না থাকলে পরম ব্যাকুলতা। জগন্মাতার অদর্শনে ঠাকুরের যে তীব্র ব্যাকুলতা, বলছেন বিল্লি যেন বুকে আঁচড়াচ্ছে বা ভিজে গামছা নিংড়োনর মত বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে। বিরহের যে তীব্র জ্বলন তাতে শরীরে যে তাপ উদ্গীরন হচ্ছে, গায়ে গঙ্গার কাদা মাটি লাগালে মাটি শুকিয়ে শরীর থেকে আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের জীবনের এই ধরণের কত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলায় সেখানেও গোপীদের বিরহের তীব্রতার বর্ণনা এসেছে। রাসলীলায় গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে আছেন তখন কি পরম আনন্দ, পরে এখানে সূত্রেও উল্লেখ করবেন, কিন্তু সূত্রে ওই পরম আনন্দের বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুর ঈশ্বরের আনন্দের যে বর্ণনা দিচ্ছেন সেই একই বর্ণনা ব্যাসদেব রাসলীলায় গোপীদের আনন্দের বর্ণনা করেছেন। সব কিছু ছেড়ে গোপীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কারুর কোন হুঁশ নেই, কে খেয়েছে, কার খাওয়া হয়নি, কে কাঁদছে, কে কি বলছে কোন দিকে তাঁদের হুঁশ নেই। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সবাই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে আছেন। গোপীদের

সাথে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা খুব জোর চলছে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে উধাও। অন্ধকারের মধ্যে কখন গোপীদের কাছ থেকে সরে পড়েছেন গোপীরা কোন টেরই পেলেন না। এরপর গোপীদের যে বিরহ, তাঁদের যে দুঃখ, বেদনা, ব্যাকুলতার যে বর্ণনা করছেন, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে তা এক কথায় অনবদ্য।

ঠাকুর কখন সখন গোপীদের এই টানের কথা বলছেন। আমাদের পক্ষে ঠাকুরের কথা ধারণা করা সম্ভব নয়। রোমা রোঁলা খুব সুন্দর বলছেন, ভারতের পাঁচ হাজার বছরের যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য শ্রীরামকৃষ্ণে যেন পুঞ্জিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঈশ্বরের অদর্শনে, ঈশ্বরের বিস্মরণে যে বিরহের তীব্রতা আমাদের পক্ষে ধারণা করা তা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু সেই বিরহের বর্ণনা নিয়ে যে গানগুলো রচিত হয়েছে, সেই গানের কীর্ত্তন যখন দক্ষিণেশ্বরে হচ্ছে, ঠাকুর শুনছেন, নিজেও গান করছেন আর তার সাথে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা নেমে আসছে, সেই বিরহের সাথে তিনি এমন একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন যে তিনি মুহুর্মুহু সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। ঠাকুরের জীবনে আমরা পরম ব্যাকুলতার কিছু কিছু নিদর্শন পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু ঐ পরম ব্যাকুলতা কি স্তরে হয়, সেই পরা ভক্তিতে কি কি হতে পারে তার বর্ণনা রাসলীলাতে যেভাবে ব্যাসদেব করেছেন এছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। রাসলীলাতে কোথাও জাগতিক কাম গন্ধ নেই। কারণ কাম গন্ধ, মানুষের গন্ধ যে জায়গাতে ঠিক ঠিক থাকে সেখানে একটা অধিকার বোধ থাকে, পরের সূত্রগুলোতে আমরা দেখব। ঐ অধিকার বোধের জন্য শুধু নিজেই পেতে চায় আর অপরকে পেতে দেবে না। রাসলীলাতে তা হচ্ছে না, যত গোপীরা আছেন সবাই সেই একজন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই আছেন। এটা কখনই জাগতিক ভালোবাসাতে হয় না, এটাই ভক্তি। ভক্তি যেখানে হয় সেখানেই এটা সম্ভব, একই ঠাকুরকে একশ জন ভালোবাসছে।

জাগতিক ভালোবাসাতে বস্তু কাছ থেকে সরে গেলে মানুষের stress হয়, tension হয়, দুঃখ হয়, শোক হয়। মানসিক ব্যাধি, মানসিক অবসাদের মূলে এটাই কাজ করে, তার কাছে জাগতিক যে বস্তু ছিল তার অভাব হয়ে গেছে বা কোন জাগতিক বস্তু পেতে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, সেটাই শোকে পরিণত হয়। এটাই যখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হয় তখন ওটাকে শোক বলে না, বলে ব্যাকুলতা। ঈশ্বরে আমার মন প্রাণ পড়ে রয়েছে কিন্তু ঈশ্বরকে আমি পাচ্ছি না, তখন আসে ব্যাকুলতা। আবার পেয়ে সরে গেল, নারদকে যেমন ভগবান বিষ্ণু দর্শন দিয়ে বলছেন, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা জাগাবার জন্য এই দর্শন দিলাম, এবার এর জন্য যে ব্যাকুলতা, যে তীব্রতা হবে, এই তীব্র ব্যাকুলতা দিয়েই তুমি আমার দিকে পুরোপুরি চলে আসবে। এখানে ব্যাকুলতা এসে যাচ্ছে। ধ্রুবের মধ্যেও ভগবান ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। ঠাকুরের ভেতরটা জগন্মাতার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। আবার পাওয়ার পর একটু যদি অদর্শন হয়, নারদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে বা গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েও আবার পাচ্ছেন না, তখন আসে ব্যাকুলতা। কি রকম ব্যাকুলতা? পরম ব্যাকুলতা। তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, যাঁরা অবতার পুরুষ বা যাঁরা ঠিক ঠিক জ্ঞান ভক্তি লাভ করেছেন তাঁদের কিন্তু কখন বিস্মরণ হয় না, স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় না। আগুনে হাত পুড়ে যাবে এই জ্ঞান হয়ে গেল তখন যতই সাবধান বা অসাবধান থাকুক, আগুনে হাত পুড়ে যাবে এই জ্ঞানটা কখন যাবে না। কিন্তু ভক্তিতে ঠাকুর যেমন চুম্বক আর লোহার উপমা দিয়ে বলছেন, কখন ভক্ত লোহা ভগবান চুম্বক হন, আবার কখন ভগবান লোহা ভক্ত চুম্বক হন, কখন তিনি ভক্তের সাথে মজা করার জন্য আড়ালে চলে যান। ঠাকুর বলছেন, মা ছেলের ব্যাকুলতা দেখার জন্য দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, মাকে দেখতে না পেয়ে ছেলে চিৎকার করছে তাতেও মায়ের একটা আনন্দ হয়। এখানে ঐ রকম একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য বলছেন *তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা*। *পরমব্যাকুলতাকে* যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে তার উল্টোটা যেটা হবে ভক্তি জিনিসটা কি, ভক্তি যখন থাকে তখন পরম আনন্দ। শোক আমরা বুঝি, শোকের জন্য আমরা ব্যাকুলতা বুঝি, ঠিক তেমনি ঐ জিনিসটাকে পেয়ে গেলে যে আনন্দ সেটাকে বুঝি। এখানে সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে নারদ বলছেন, ভক্তিতে পরম আনন্দ। কি রকম পরম আনন্দ? বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। কিছু জিনিস সরাসরি বলা যায় না, তখন ওটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়।

অদ্বৈত বেদান্তের সাধনা নেতি নেতি। ব্রহ্মকে সরাসরি বলা যায় না, নেতি নেতি করে বলতে হয়। ঠিক তেমনি ভক্তিকে যেন এখানে নেতি নেতি করে বলছেন, তাঁর বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। এখানে পরম ব্যাকুলতার বর্ণনা করছেন। বোবাকে রসগোল্লা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করা হয় রসগোল্লা কেমন, বোবা কী বলবে? বোবা বলতে পারবে না। কিন্তু অন্য একটা পথ আছে, তাকে নাকচ করিয়ে করিয়ে জিজ্ঞেস করা যেতে

পারে। একটা রুটি দেখিয়ে বলা হবে রসগোল্লা কি এর মত, বোবা ঘাড় নেড়ে বলবে না, ছাতুর মত? না। এই করে করে এরপর কি হবে আমরা বুঝতে পারছি। পরা ভক্তির যে আনন্দ সেই আনন্দের বর্ণনা করা যাবে না। সেইজন্য উল্টো দিক থেকে বোঝাচ্ছেন। মিল্টন ছিলেন খুব নামকরা কবি, প্যারাডাইস লস্ট তাঁর বিখ্যাত কবিতা। কবিতায় তিনি স্বর্গ আর নরকের বর্ণনা করছেন। নরকের যে বর্ণনা করছেন এক কথায় তা অনবদ্য। বর্তমান কালে খ্রীশ্চানিটিতে যে নরকের কথা বলা হয় তাতে মিল্টনের যে বর্ণনা, যদিও চারশ বছরের পুরনো, কিন্তু সেটাই ধরে রেখেছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন জগতে সুখের গন্ধটুকুও নেই। মজা করে বলা হয় জগতে সুখ নেই সেইজন্য স্বর্গের যে কল্পনা করবেন মিল্টন পারেননি। কিন্তু যে কোন পুরুষকে নরকের বর্ণনা করতে বললে তার কোন অসুবিধা হবে না, শুধু নিজের পরিবার, বাড়ির অবস্থার বর্ণনা করে দেবে তাতেই নরকের বর্ণনা হয়ে যাবে। মানুষের মনে অশান্তির ধারণাটা সাংঘাতিক, সেখানে কাউকে সুখের বর্ণনা করতে দিলে সে সুখের বর্ণনা করতে পারবে না। শোক যখনই বলে তার সাথে সাগর জুড়ে দেবে, শোক সাগরে মানুষ নিমগ্ন হয়ে আছে। নারদ এটাই করছেন, জগতে শোক লেগেই আছে, এই শোক থেকে যে একটা ব্যাকুলতার ধারণা মানুষ করতে পারে, ঐ ব্যাকুলতাকে চরমে নিয়ে যাচ্ছেন পরম শব্দ দিয়ে। সেখানে আবার বিস্মরণ শব্দ আনছেন স্মরণ রাখছেন না। স্মরণকে নিয়ে এলে বিরোধটা মিটে যায়। বিস্মরণে যদি পরমব্যাকুলতা হয় তাহলে স্মরণে কি হবে? পরম আনন্দ।

পরা ভক্তিতে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ঈশ্বরের জন্য বা ভক্তির জন্য যে আনন্দ, এবার আমাদের তার উল্টোটা কল্পনা করতে হবে। আমি এখন এর উল্টোটা কতটা কল্পনা করব সেটা আমার উপর নির্ভর করে। কোন কবিকে যদি বর্ণনা করতে বলা হয় কোন দিন তা পারবে না। স্বাভাবিক ভাবে আনন্দের বর্ণনা করা যায় না, দুঃখের বর্ণনা করা যায়, ব্যাকুলতার বর্ণনা করা যায়। ব্যাকুলতায় কি রকম ছটফট করে? একজনের চাকরি চলে গেছে, এবার সে একটা চাকরির খোঁজ করছে। একটা অফিসে গিয়ে চাকরি চাইছে, চাকরি পেল না। আগামী দিন আবার গিয়ে চাকরি চাইছে, আজকে কি কোন চাকরি খালি আছে? ব্যাকুলতা, ছটফট করছে। চোর জানে পাশের ঘরে সোনা রাখা আছে, চোরের আর রাতে ঘুম আসছে না, ছটফট করছে। ব্যাকুলতার একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে। বলছেন, ঈশ্বরের জন্য যে ব্যাকুলতা তা হল পরম আর যাঁরা ঐ পরা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কি হবে? সেটাও পরম, কিন্তু সেটা আনন্দ। ঐ আনন্দটা কেমন নারদ সরাসরি বলছেন না। কারণ যেটাই বলা হবে তাতে কম পড়বে। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের রূপ দর্শন করার পর রম্ভা, মেনকাকে চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। রম্ভা, মেনকাকে আমরা দেখিইনি, তাদের রূপের আমরা কী ধারণা করব! ঠাকুর বলেছেন আমরাও পড়ে যাচ্ছি। সেইজন্য পজিটিভ কোন কিছু দিয়ে বর্ণনা করলে ঈশ্বরের বর্ণনা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। ঋষিরা তাই সব সময় চেষ্টা করেন নেতি নেতি দিয়ে নিয়ে যেতে। এখানে নারদ ঐ নেতি নেতিকেই ব্যবহার করেছেন। এইভাবে বলার পর বলছেন –

অস্ত্যেবমেবম্।।২০।।

নারদ বলছেন এর অনেক উদাহরণ আছে। এই যে আগের সূত্রে বলা হল *তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি*, একটাতে উনি ইতি করে বলছেন আরেকটাতে নেতি করে বলছেন, সেখান থেকে একটা আইডিয়া তৈরী করে নিতে বলছেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য নারদ এখন বলছেন *অস্তি এবম্ এবম্*, এই ধরণের অনেক উদাহরণ ভক্তের জীবনে আছে। আমাদের সামনে ঋষিদের দৃষ্টান্ত আছে, ঠাকুরে জীবনের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা এর আগে দেখালাম। ঠাকুরও কত উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চা ছেলে মায়ের জন্য কাঁদছে, এখন যে বলবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব, তারই কোলে চলে যাবে, সে অপরিচিতই হোক আর যাই হোক। যীশু তাঁর পিতাকে এমন ভালোবাসছেন যে, সেই ভালোবাসার কাছে অন্য কোন কিছুরই আর গুরুত্ব নেই। যীশু এক জায়গায় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছিলেন, একজন এসে বললেন, আপনার মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। যীশু বলছেন, কে মা, কে বোন, ঈশ্বরীয় কথায় যে আমার সাথে আছে সেই আমার মা সেই আমার বোন। ঈশ্বর ছাড়া যীশু আর কিছু দেখছেন না। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নাটমন্দিরে একটা স্তম্ভ আছে, চৈতন্য মহাপ্রভু ঐ স্তম্ভে হাত রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যে দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করে যেতেন। ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নাকি পাথরে চৈতন্য মহাপ্রভুর হাতের দাগ হয়ে গেছে। নারদ এখানে কোন দৃষ্টান্ত না দিয়ে বলছেন *অস্ত্যেবমেবম্*, কিন্তু তার সাথে শুধু বলছেন –

যথা ব্রজগোপিকানাম্।।২১।।

আজকের দিনে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতে পারি, মীরাবাঈয়ের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতে পারি। নারদ কোন কিছুতে না গিয়ে ভাগবতে চলে গেলেন, সেখান থেকে নিয়ে এলেন *যথা ব্রজগোপিকানাম্*, যেমন আমরা ব্রজের গোপীদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, নারদ ব্রজগোপীদের দৃষ্টান্ত নিয়ে এলেন।

শুরুতে আমরা বৈধী ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। রাগাত্মিকা ভক্তিকে সাধারণত পরা ভক্তি বলেন। যেমন ব্রহ্মকে মুখে বলা যায় না, ঠিক তেমনি পরা ভক্তিরও বর্ণনা করা যায় না। পরা ভক্তিতে ভালোবাসার যে গভীরতা, ভালোবাসার ওই গভীরতাকে কোন সাহিত্যিকই তাঁর সাহিত্যে কোন অবস্থাতেই নামাতে পারবেন না, সম্ভবই নয়। এই ভালোবাসাকে নামানোর একমাত্র চেষ্টা করেছেন ব্যাসদেব ভাগবতের রাসলীলাতে। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে নৃত্য করেছেন, গান করেছেন, লীলা করেছেন ইত্যাদি, এই শোনার কোন দাম নেই। রাসলীলাতে দাম একটারই, তা হল পরা ভক্তি। পরা ভক্তিতে ভালোবাসাটা এত উচ্চমানের আর এত গভীর যে ঐ গভীরতাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না, কোন কাহিনীতে বর্ণনা করা অসম্ভব। ভালোবাসার ঐ গভীরতাকে একটু যাতে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে ব্যাসদেব সেইজন্য রাসলীলার বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। রাসলীলায় গোপীদের ভালোবাসাকে আমাদের সাধারণ জাগতিক ভালোবাসার দৃষ্টিতে নিতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। গোপীদের ভালোবাসা পূর্ণতার ভালোবাসা কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পূর্ণতার ভালোবাসাতে যেটা মূল তা হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম। কৃষ্ণের প্রতি প্রেম যখন বলছি তখন সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হল, কৃষ্ণের আনন্দ, কৃষ্ণের সুখ। পরের দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে যেসব কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে আমাদের অনেক সময় মনে হয় যেন নোংরা কোন কিছু। যাদের পরা ভক্তির সামান্যতম ধারণা নেই তারা কোন দিন বুঝতেও পারবে না পরা ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কত গভীর। চৈতন্য মহাপ্রভু কিছুটা আইডিয়া দিলেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে পরা ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালোবাসায় যে বলছেন, তাঁর সুখে আমার সুখ, তাঁর আনন্দে আমার আনন্দ, এগুলো ধারণা করা অসম্ভব। ঠাকুর আরও পরিষ্কার করে আমাদের সামনে চোখের সামনে গুছিয়ে রাখছেন। এক জায়গায় বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ একজন গোপীর কাছে গেছেন, শ্রীরাধা মন খারাপ করে বসে আছেন। এসব কাহিনী পরে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা বর্ণনা দিচ্ছেন, ভাগবতাদি গ্রন্থে নেই। তখন সখী শ্রীমতিকে বলছেন, তুমি এই রকম হিংসা করছ কেন? শ্রীরাধা বলছেন, ওসব কিছু নয়, সে কৃষ্ণের সেবা জানে না, সেই ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কাছে ভালোবাসা কত রকম হয় পরিভাষিত করছেন। সাধারণ ভাবে আমরা মায়ের ভালোবাসা খুব সহজে বুঝতে পারি, কিন্তু সেখানেও কোথাও একটা দায়ীত্ব বোধ থাকছে। আবার ছেলেমেয়েদের প্রেমের ভালোবাসায় বলে আমাকে ভালোবাসলে আমিও তোমাকে ভালোবাসব। কিন্তু গোপীদের প্রেম অহৈতুকী প্রেম। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই বাসো।

তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি, বিস্মরণ হলে যে পরম ব্যাকুলতা হয় আর তার উল্টো তাঁর ভক্তিতে যে পরম আনন্দ হয়, এর উপমা বিশ্বের প্রায় সব ধর্মেই আছে, কিন্তু ব্রজগোপীদের যে উপমা এর মত উপমা আর হয় না। যখনই পরা ভক্তির প্রসঙ্গ আসে লেখকরা সব সময় হয় গোপী নয় রাধার উপমা নিয়ে আসেন। কারণ এর থেকে ভালো উপমা আমাদের কাছে আর নেই। মীরাবাঈয়ের কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু মীরাবাঈয়ের যে গভীরতা, ঐ গভীরতা শ্রীরাধার গভীরতার সাথে তুলনা হয় না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ, গোপী, শ্রীরাধার আলোচনা সাধারণ মানুষের সামনে করতে নেই। কারণ মানুষ মাত্রই রতিপ্রিয়, কাম গন্ধে ভর্তি। যারা ভক্ত, ভক্তি নিয়ে আছে, তারাও বুঝতে পারবে না। ভক্তিতে যাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন, ভক্তির গভীরতা আসতে শুরু হয়েছে, তাঁরাই একমাত্র বুঝতে পারবেন এর শেষ অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কোথায় দাঁড়াবে? *যথা ব্রজগোপিকানাম্*, ব্রজগোপীরা যেমন ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেম সাধারণ মানুষের যাতে এই প্রেমকে জাগতিক প্রেম বলে মনে না হয়, সেইজন্য আমাদের ঋষিরা দুটো কাহিনী নিয়ে এলেন। একটাতে বলছেন, বেদের সব ঋচা ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়েছে, মুখ থেকে বেরোয়নি। বেদের ঋচাদের মনে একটা দুঃখ থেকে গেল, আমরা ভগবানের ওষ্ঠের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বেদের ঋচারাই পরে গোপী হয়ে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেছেন যাতে ভগবান

তাঁদের স্পর্শ করেন। আরেকটায় বলছেন, উপনিষদের সময় যে সমস্ত ঋষিরা ছিলেন তাঁরা আত্মার চিন্তন করে করে জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বরের ভালোবাসা কাকে বলে, ঈশ্বরের প্রেম কাকে বলে এনারা কোন দিন অনুভব করতে পারেননি। তাঁদের একবার খুব ইচ্ছে হল ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদ করার, ভগবানের প্রেম কাকে বলে দেখতে হবে। ঐ গভীর ভালোবাসা কাকে বলে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। লায়লা-মজনুর কাহিনীতে ঐ গভীর ভালোবাসাটা আনা হয়েছে, আরও কয়েকটা কাহিনীতেও আনার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু লায়লা-মজনুকে নিয়েই বেশি বলা হয়। রোমিও জুলিয়েট কাহিনীতে জাগতিক প্রেমের ভাবটা বেশি এসে গেছে। লায়লা-মজনুর ভালোবাসায় কোথাও যেন একটু ঈশ্বরীয় স্পর্শ পাওয়া যায়। কিন্তু যতই হোক পরা ভক্তি জিনিসটাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ব্যাসদেব একটা অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করলেন, যা কিনা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে, তা ধর্মীয় সাহিত্যই হোক, আধ্যাত্মিক সাহিত্যই হোক, জাগতিক সাহিত্যই হোক কোথাও এর প্যারালাল নেই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কোথাও পরা ভক্তিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়নি যেটাতে মানুষ একটা আইডিয়া পেতে পারে পরা ভক্তি জিনিসটা কি। মা কালী বা ঈশ্বরের প্রতি ঠাকুরের যে ভালোবাসা ছিল, ঐ ভালোবাসায় কী প্রচণ্ড গভীরতা ছিল কোন লেখা পড়ে কি বোঝা যায়? ঠাকুরের ক্ষেত্রে এগুলো বর্তমান কালে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি। আজকে ঠাকুরকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন খুব জোর আমরা বলতে পারব চৈতন্য মহাপ্রভু হাত রেখেছিলেন সেই হাতের স্পর্শে পাথরে দাগ পড়ে গেছে, এখানেও কিছুটা একটা আইডিয়া পাওয়া যায়। এবার চৈতন্য মহাপ্রভুকেও সরিয়ে দিলাম, এরপর ভারতের ইতিহাসে একটা কোন রচনার খবর আছে কি, যেখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পরা ভক্তি কেমন হয়? ব্যাসদেব কবে লিখছেন? মহাপ্রভু আসার দু তিন হাজার বছর আগে। সেই সময় ব্যাসদেব পুরো জিনিসটাকে নিজের উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে এসে যে জিনিসটাকে মানুষের ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব সেটাকে তিনি সম্ভব করে দেখিয়ে দিলেন। ব্যাসদেবের এই রচনাকেই পরের পরের সাধকরা কপি করেছেন, যেমন জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করলেন। তিনি আর তাঁর স্ত্রী এমন কৃষ্ণ ভক্ত যে সারা রাত তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সামনে গীতগোবিন্দের গান করতে করতে নৃত্য করতেন। আমরা কি কোন দিন বুঝতে পারব, কোন উচ্চ মাত্রার স্তরে গিয়ে তাঁরা এইসব করছেন? এটাকেই যখন কবিরা তাঁদের কবিতায় নামিয়ে আনবে তখনই সর্বনাশটা হয়ে যাবে।

আমরা জানি বেদ অব্রাহ্মণদের দেওয়া হত না। মনুকে সবাই গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, কারণ মনু বলে দিলেন শূদ্র যদি বেদ শোনে তাহলে ওর কানে গরম তেল ঢেলে দাও। যদিও মনুতে নেই কিন্তু অন্য কোন স্মৃতিতে থাকতে পারে। তাই বলে সব ব্রাহ্মণকে কি বেদের শিক্ষা দেওয়া হত? কখনই না, বেদের শিক্ষা নিতে হলে তোমাকে পাঁচ ছয় বছর বয়সে ব্রহ্মচারী হয়ে বছরের পর বছর গুরুগৃহে থাকতে হবে। সেখানে গুরুর গরু চড়াও, ঘাস কাট, জল আন, কাঠ নিয়ে আস, বছরের পর বছর করতে থাক এরপর একটা একটা করে গুরু বেদমন্ত্রের শিক্ষা দেবেন। ছোটবেলা থেকে এই জবরদস্ত ট্রেনিং চলত। আর উপনিষদের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই উঠবে না, গুরুমুখ ছাড়া উপনিষদ দেওয়াই হবে না। তার আগে তাকে অধিকারী হতে হবে। ব্যাসদেব কি করলেন? সাধারণ মানুষকে জানাবার জন্য বললেন, এই দেখো পরা ভক্তির অমৃতরস কেমন। সেখানে তিনি রাধার নামই নেননি, উনি বলছেন গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের এই রকম আনন্দ হয়েছিল। পরের দিকের কবিরা নিয়ে এলেন রাধার নাম, এনারা শুধু রাধার শরীর কেমন, তাঁর চুল কেমন, তাঁর নখ কেমন তার বর্ণনা দিতেই ভাষা আর অলঙ্কারে ভরিয়ে দিলেন আর দুনিয়ার নোংরামি গুলোকে নিয়ে এসে রাধা আর কৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিলেন। অথচ ব্যাসদেবের মাথায় একবারের জন্যেও আসেনি রাধা জিনিসটা কি।

গোপীদের রাসলীলা হল পরা ভক্তির শেষ কথা, গোপীদের পরম ব্যাকুলতা, কিন্তু সেই ব্যাকুলতাতে কোন চাহিদা নেই। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বাইশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ নম্বর মন্ত্রে খুব সুন্দর কথা বলছেন *ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে।।* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যাঁর মন আমাতে এসেছে তার মনে জাগতিক ব্যাপারে আর কোন দিন কোন কাম ভাবে আসবে না। দগ্ধ বীজের উপমা দিয়ে বলছেন ধানের বীজ যদি সিদ্ধ করে দেওয়া হয় সেই ধান থেকে আর অঙ্কুরোদ্‌গম হবে না। ঠিক তেমনি যার মন পুরো আমাতে ডুবে গেছে এরপর সাংসারিক ব্যাপারে তার কোন কাম ভাব আসবে না। এটাই পরা ভক্তির লক্ষণ। পরা ভক্তির আগুনে ভুট্টার বীজকে দগ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই জিনিস ভক্তিতে হবে না। যোগদর্শনেও বলছেন *দগ্ধবীজবৎ*, সংস্কার গুলোকে সব পুড়িয়ে দেয়। পরা ভক্তিতে একই জিনিস হয়।

জ্ঞানমার্গেও বলছেন *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ*, জ্ঞান হয়ে গেলে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে, একটা স্ফুলিঙ্গ যেভাবে বিশাল স্তুপিকৃত কাঠকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। একই কথা যোগে বলছেন, ভক্তিতে বলছেন, জ্ঞানে বলছেন আর ভাগবতেও বলছেন, যত কাম বাসনা সব পুড়িয়ে দেয়। সেখানে কবিরা নিজের স্ত্রীর প্রতি যে প্রেম সেই প্রেমকে রাধার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, এর থেকে বোকার মত কথা হয় না। ঠাকুর এদেরকেই বলছেন, আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। যাদের গোয়ালে ঘোড়া থাকে তারা এই রকম কথা বলে। ঠিক ঠিক জ্ঞান যদি না থাকি তখন মুখ দিয়ে এই ধরণের উল্টোপাল্টা কথা বেরোয়।

এবার বলছেন পরা ভক্তিতে কি হয়। পণ্ডিতরা নানান রকম প্রশ্ন তোলেন, যেমন রাসলীলা আদৌ ব্যাসদেব লিখেছিলেন কিনা, আমাদেরও জানা নেই রাসলীলা ব্যাসদেব লিখেছিলেন কিনা, কিন্তু ভাগবত যে ওনার রচনা এটা কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু যিনি রাসলীলার ঐ পাঁচটি অধ্যায় লিখেছেন, ব্যাসদেবই লিখে থাকুন আর যিনিই লিখে থাকুন, ব্যাসদেবই হবেন কারণ এত impersonal জিনিস ব্যাসদেব ছাড়া কেউ রচনা করতে পারেবেন না, তিনি যে কত মহৎ পুরুষ আমরা কল্পনাই করতে পারব না, অসম্ভব জিনিসকে তিনি সম্ভব করছেন। পরা ভক্তির কথা নারদও বলতে পারছেন না, শুধু বলছেন *তদ্ বিস্মরণে*, সেটাকে ব্যাসদেব রাসলীলায় বর্ণনা করছেন।

তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি, এর ফল কি হবে? ভাগবতের দশম স্কন্ধে বত্রিশ অধ্যায়ে বাইশ নম্বর শ্লোকে বলছেন *ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিয়াতু সাধুনা।।* রাসলীলা সাঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য জগতের সব বাঁধন ছিঁড়ে চলে এসেছ, ঘরবাড়ি, লোকমর্যাদা, বেদমর্যাদা, যত রকমের মর্যাদা হতে পারে সব মর্যাদা ভেঙে দিয়েছ শুধু আমাকে পাওয়ার আশায়। তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ এই ভালোবাসা কেউ পায় না। আমার তরফ থেকে এই ভালোবাসার ঋণ ব্রহ্মার যে পুরো জীবন ঐ জীবনেও আমি কোন দিন মেটাতে পারব না'। ঋণ শোধ করতে সময় লাগে, আমরা বলি আজীবন তোমার কাছে ঋণী থাকব। শ্রীকৃষ্ণ আজীবন বলছেন না, বলছেন ব্রহ্মার যে জীবন, অর্থাৎ পুরো একটা কল্প, কোটি কোটি বছরে একটা কল্প হয়। বেদে বলছে মানুষের একশ বছর আয়ু। মানুষের একশ বছর সমান দেবতাদের একটা দিন, ঐ হিসাবে একটা দিন আর একটা রাত নিয়ে দেবতাদেরও একশ বছরের জীবন। দেবতাদের একশ বছর ব্রহ্মার একটা দিন, সেই হিসাবে ব্রহ্মার একটা দিন একটা রাত নিয়ে ব্রহ্মার একশ বছর আয়ু। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তাতেও আমি তোমাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে পারব না।

তাহলে গোপীরা যে শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালোবাসল তার ফল কি হল? বলছেন, আমার প্রতি তোমাদের যে এই ভালোবাসা, তোমাদের এই যে চরম নিষ্ঠা, যেখানে তোমরা পুরোটাই নিজেদের দিয়ে দিচ্ছ, এই পরম সমর্পণ, তার যে ক্রিয়া এই ক্রিয়াটাই তোমাদের ফল। এই জিনিসটাকে আমাদের বুঝতে অনেক সময় লাগবে। কর্মযোগে বলা হয় কর্মটাই প্রধান ফলের কোন গুরুত্ব নেই। এখানে তার থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন তোমাদের এই যে ক্রিয়া এটাই ফল, এর থেকে বড় ফল আর কিছু হতে পারে না। মনে করুন আমি একটা বিরাট যজ্ঞ করলাম। এই যজ্ঞের ফলটা কি? বলছেন এই যজ্ঞের ফল হতে পারে না। কারণ ওর ফল এত বড় যে এই পৃথিবী তা ধারণ করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যে ক্রিয়া করলে, এর যে মাহাত্ম্য, এটাই ফল। এর বাইরে আর কোন ফল হয় না। এর অন্য একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার খোঁজ করে ফিরে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলছেন, ভাই তুমি যা করেছ এর প্রতিদান কোন দিন হবে না, কারণ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। এর প্রতিদান দেওয়ার জন্য আগে তোমার প্রাণের সংশয় হওয়া দরকার, যেটা আমি কখনই চাইতে পারব না। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার এই সেবা এত বড় যে কোন জিনিস দিয়ে এর সমান করা যাবে না। সেইজন্য আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলাম। এই বলে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। যখন কাউকে আলিঙ্গন করা হয় তখন এর তাৎপর্য হল, এর বেশি আমার দেওয়ার কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ এর থেকেও এগিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন, তোমাদের যে এই উচ্চ সমর্পণ, এই সাংঘাতিক ক্রিয়া, এটাই তোমাদের ফল। পরা ভক্তিকে ঋষিরা কিভাবে দেখছেন এর একটা আইডিয়া দেওয়া হল। পরা ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি?

ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ।।২২।।

পরা ভক্তির ঐ অবস্থায় জগৎ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায়। গোপীদের নিজেদের আর আত্মস্মৃতি নেই, কারণ বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এসেছেন, ওখানেই তখন সব কিছু স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু *ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ*, শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য সেটা কিন্তু গোপীদের মন থেকে কখন বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে না। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ সূত্র, একদিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে ভুলে যাচ্ছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, এই স্মৃতি কখনই বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, প্রথমে নিজেদের মধ্যে খুব কান্নাকাটি হল, কিন্তু তারপরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল থেকে যত লীলা হয়েছে সেই লীলার অভিনয় আর গান করতে শুরু করেছেন। এসব করছেন মনটা যখন একটু নীচে নেমে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে যখন একেবারে বিভোর হয়ে আছেন, তখন সব কিছুই ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে, তাঁরা মাহাত্ম্য কি কখনই ভুলছেন না। এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার হয়, বলা হয় যে যেখানে সাধারণ ভালোবাসা হয়, যাকে ভালোবাসছে তার উপলব্ধি, তার বিরাট কীর্তি বা সাফল্য যদি সামনে থাকে তাহলে আর সেখানে প্রেম হয় না। যদি কথার কথা বলি, যিনি প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সাথে যদি কেউ প্রেম করে তখন তার এটা খেয়াল থাকে না যে উনি প্রধানমন্ত্রী। পুলিশের এসপি বা কনস্টেবল বাড়িতে যখন আসে তখন তার স্ত্রীর এই খেয়াল থাকে না যে আমার উনি এসপি বা চিফ মিনিস্টার। কীর্তি প্রেমকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই ভালোবাসায় গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, তাঁর মাহাত্ম্যকে কখনই ভুলছেন না। আমরা যে অর্থে মনে করি তাঁর যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো অনেক সময় হারিয়ে যায়, যেমন ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের যত কাছে এগোবে তাঁর ঐশ্বর্য তত কমে যাবে। গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য কমে গেছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য থেকে যাচ্ছে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন সমুদ্র দূর থেকে নীল দেখায় কাছে গেলে দেখে জলের কোন রঙ নেই। আবার উপমা দিচ্ছেন, প্রথমে দশ হাত, তারপর চার হাত, সেখান থেকে যত এগোয় তত কমে গিয়ে দুই হাতে এসে দাঁড়ায়, তারপর সব মিলে যায়। ভগবানের ঐশ্বর্যকে ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু ভগবানের মাহাত্ম্যকে কখনই ভুলছেন না। তাঁদের এই বোধটা সব সময় থাকছে, শ্রীকৃষ্ণ কে। কারণ এই বোধ যদি না থাকে তাহলে কি হবে?

তদ্বিহীনং জারাণামিব।।২৩।।

জারাণাম মানে একজন প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা বা পরকীয়া প্রেমে যেটা থাকে। জার মানে হয় সাংসারিক অর্থে। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে যদি গোপীরা ভুলে যায় তাহলে ঐ প্রেম *জারাণামিব* হয়ে যাবে, নারী পুরুষের প্রেম হয়ে যাবে। জাগতিক অর্থে নারী পুরুষের যে প্রেম সেই প্রেমকে বলে জার প্রেম, গোপীদের সেই প্রেম ছিল না। কারণ গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের বোধ ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের বোধটা সব সময় ছিল। কারণ –

নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্।।২৪।।

জাগতিক প্রেমে তোমার সুখেই আমার সুখ এই জিনিসটা হবে না। কোন নারী যখন কোন পুরুষকে ভালোবাসে, তখন সেই নারীও চাইছে সেও যেন আমাকে ভালোবাসে। আমার যাই হোক তুমি সুখী হও, সংসারে কোন নারী বা পুরুষ বলবে না। কিন্তু এখানে যে প্রেমের বর্ণনা চলছে, এখানে বলছেন এই প্রেম জার প্রেম বা জাগতিক প্রেম নয়। জাগতিক প্রেমে তোমার আনন্দে আমার আনন্দ হয় না। মুখে আমরা বলতে পারি, কিন্তু মুখের কথা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তুমি আমার সাথে জুড়ে আছ। মা বলছে ছেলের আনন্দেই আমার আনন্দ, ছেলে বড় হয়ে যেমনি একটা মেয়েকে বিয়ে করে আনছে বাড়িতে আগুন লেগে যাচ্ছে। একমাত্র পরা ভক্তিতেই হবে, যেখানে মাহাত্ম্য বিস্মৃতি হয় না সেখানেই এই জিনিসটা হবে। গোপীদের প্রেম পরা ভক্তি কেন? কারণ তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের বোধটা বিস্মৃতিতে চলে যায়নি। যদি এই বোধটা বিস্মৃত হয়ে যেত তাহলে ধীরে ধীরে পতন হয়ে যেত। যার জন্য ঠাকুর কখনই এগুলোকে জাগতিক স্তরে আনতে দিতেন না, বাৎসল্য ভাব থেকেই তাচ্ছল্য ভাব এসে যাবে, এই কথাগুলো বলছেন। মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন ব্যক্তিকে ভালোবাসাটা খুব দেখা যায়। মানুষ ব্যক্তিকে ভালোবাসে না, যে কোন ভালোবাসা যখন হয়, ছেলেমেয়ের ভালোবাসা বা যে ভালোবাসাই হোক, ভালোবাসা শুরু হয় ব্যক্তিত্ব থেকে। একটি রূপসী মেয়ে, চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণ রয়েছে, তাকে দেখে ছেলেরা আকর্ষিত হচ্ছে। সেখানেও ওরা ব্যক্তিত্বকেই

ভালোবাসছে। কারণ চেহারার সৌন্দর্য ব্যক্তিত্বেরই একটা অঙ্গ। ভালোবাসা শুরুই হয় ব্যক্তিত্ব থেকে, সেখান থেকে ভালোবাসা ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিতে নামতে দুদিন লাগে। ভগবান বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ ভিক্ষায় গেছেন। জলতেষ্টা পাওয়াতে এক জায়গায় জল খেতে গেছেন, সেখানে এক সাধারণ যুবতী আদিবাসী মেয়েকে খুব মিষ্টি করে আনন্দ বলছেন, একটু জল পাওয়া যাবে। আনন্দের ঐ মিষ্ট ব্যবহারে মেয়েটির মাথা ঘুরে গেছে। জীবনে তার সাথে কেউ এত মিষ্টি করে কথা বলেনি। সেখানেই সব ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি আনন্দের পেছন পেছন হাটতে শুরু করল। মহা সমস্যার উদ্ভব হয়ে গেছে, ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের পেছনে হাটতে হাটতে একটা মেয়ে চলে এসেছে। ভগবান বুদ্ধ মেয়েটিকে ডাকলেন, ডেকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি আনন্দকে ভালোবাস'? 'হ্যাঁ! আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি'। 'আনন্দের কোন জিনিসটাকে তুমি ভালোবাস'? 'আনন্দের মধ্যে কি ভালোবাসা, কী মিষ্টি ব্যবহার, কত নরম মিষ্টি করে কথা বলেন, কী করুণা'। ভগবান বুদ্ধ বলছেন 'আনন্দের যে গুণগুলোকে তুমি ভালোবেসেছ সেই গুণগুলোকে তোমার ভেতরে আনার চেষ্টা কর, যাতে তুমিও আনন্দের মত হয়ে যেতে পার'। মেয়েটি সেখানেই ভিক্ষুণী হয়ে আশ্রমবাসী হয়ে গেল। তারপর কি হল আমাদের জানা নেই। এখানেই দেখার, ব্যক্তিত্ব থেকে মেয়েটি কিভাবে ব্যক্তিতে নেমে আসছে। কিন্তু তখনও ব্যক্তিতে নেমে যায়নি। যেমনি একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিতে নেমে যাবে। তারপর ব্যক্তিত্বের সব কিছু উড়ে যাবে। স্ত্রীর কাছে স্বামীর মান সম্মান তত দিনই থাকে যত দিন স্বামীর ব্যক্তিত্বটা বজায় থাকছে, ব্যক্তিতে যেমনি নামল সব শেষ। ব্যক্তিত্বে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সম্মান, তা সে সৌন্দর্যের জন্যই হোক, পাণ্ডিত্যেই হোক, লাবণ্যই হোক, করুণাই হোক, যেভাবেই হোক, ব্যক্তিত্ব থেকে যেমনি নেমে গেল ভালোবাসায় পচন ধরা শুরু হয়ে গেল। ব্যক্তিতে নেমে যাওয়া মানেই ঐ প্রেম জার প্রেম হয়ে গেল। বলছেন গোপীদের তা নয়, কারণ মাহাত্ম্যের জ্ঞান, ইনি যে ভগবান, এই বোধটা কখনই তাঁদের যায়নি, তাই এটা পরা ভক্তি। সেইজন্য রাধা বা গোপীকে নিয়ে সাধারণ স্তরে সচারচর যে কথাগুলো বলা হয়, এই কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল। কেন ভুল, কারণ এই যে লক্ষণগুলো দেখালেন, এইজন্যই ভুল। ছেলে যত বড় স্পোর্টসম্যান হোক, যত বড় ওরেটর হোক, আর যাই হোক, বিয়ে হয়ে গেল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। বলবেন, ভালোবাসাটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, ভালো তো বাসত ব্যক্তিত্বকে, ভালোবাসা এখন নেমে গেছে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিকে কি কখন ভালোবাসা যায়! শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গোপীদের এই জিনিস কখনই হবে না। এটা খুব মজার, রুক্মিণীর একবার অধিকার বোধ হয়ে গিয়েছিল। যেমনি অধিকার বোধ এসে গেছে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন, তোমার তো শিশুপালের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, শিশুপালও তোমাকে চায়, তুমি ওখানে চলে যাও। সেইজন্য পূজা শুধু রাধাকেই করা হয়, রুক্মিণীরও পূজা আছে, গুজরাটের দিকে করা হয়, কিন্তু পূজা করা হয় রাধাকৃষ্ণের, রুক্মিণীকৃষ্ণের পূজা কোথাও হয় না। তার কারণ রুক্মিণীর ঐ ভাব ছিল না, কিন্তু রাধার ঐ ভাব সব সময় ছিল। ভক্তি, প্রেম, পরা ভক্তি এগুলো তখনই থাকে যখন মাহাত্ম্য জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না। এই ভাবে প্রথম অধ্যায়ে পরা ভক্তির একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া হল। পঁচিশ নম্বর সূত্র থেকে বলবেন পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ কেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে বলা হয় পরা ভক্তি মাহাত্ম্যম্। ভারতে একটা প্রথা ছিল বাদবিবাদ, বাদবিবাদে আপনার যা বলার আপনি বলুন, এরপর আপনার বিপক্ষের যাঁরা আছেন তাঁকে কেটে উড়িয়ে দিন। যে কোন দর্শনকে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই দর্শনের প্রবক্তারা সব সময় এটাই করেন। প্রথমে নিজের বক্তব্যকে বলে নেবেন, আমার এই এই বক্তব্য। বক্তা জানেন বাকিরা তাঁর বক্তব্যকে মানবেন না, সেইজন্য তাঁর বিপক্ষবাদীরা কোন কোন পয়েন্টে আক্রমণ করবেন বা অপরকে তিনি কোন কোন পয়েন্টে আক্রমণ করতে চাইছেন, ঐ জিনিসটার আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার মধ্য থেকে আরও কিছু কিছু জিনিস বেরিয়ে আসে। পরে সেগুলোরও একটা সমাধান দেওয়া হয়। দেওয়ার পর, আবার নিজের জায়গায় ফেরত গিয়ে সেটাকে পুরোদমে এগিয়ে নিয়ে চলে যান, এটাই প্রথা। জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে নিজের কথা বলবেন, আমার এই বক্তব্য। এরপর যাঁরা তাঁর বিরোধী তাঁরা কি বলতে চাইছে বা কি বলতে পারে, তাদের মতকে খণ্ডন করবেন। খণ্ডন করার সময় আরও নতুন কিছু কথা বেরিয়ে আসবে, পরে সেগুলোরও সমাধান দিয়ে দেবেন। এরপর নিজে যেটা প্রথমে বলেছিলেন সেটাকেই আবার ব্যাখ্যা করে চলে যাবেন। সেইজন্য দর্শন গ্রন্থের চারটে অঙ্গ হয়ে যায়। এটা যে সব সময় একেবারে নির্দিষ্ট ভাবে থাকবে তা নয়। আচার্য শঙ্করও তাই

করছেন। ব্রহ্মসূত্র লেখার সময় উনি প্রথমে নিজের মতটা বলে দিচ্ছেন, বলার পরর বিপক্ষবাদীদের মতকে খণ্ডন করে দিচ্ছেন। খণ্ডন করতে গিয়ে অনেক রকম আলোচনা আসছে, সেখান থেকে আবার আরও কিছু কিছু সংশোধন দিয়ে দিচ্ছেন। সংশোধন দেওয়ার পর ওনার যেটা মূল বক্তব্য সেটাকে ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করে এগিয়ে চলে গেছেন।

নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে এই প্রথাকে অনুসরণ করছেন। এক নম্বর সূত্র থেকে চব্বিশ নম্বর সূত্র পর্যন্ত উনি বলে যাচ্ছেন পরা ভক্তি জিনিসটা কি। এরপর তিনি আনছেন খণ্ডন-মণ্ডন। খণ্ডন-মণ্ডন মানে অন্য যত মত আছে সেগুলোকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া। কারণ অপরকে খণ্ডন করে বসিয়ে না দিলে মনে অনেক সন্দেহ থেকে যাবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি কোন বিতর্ক শুরু হয় কিছুক্ষণের মধ্যে বিতর্ক বিতণ্ডাতে নেমে যায়। কারণ যখনই তর্কাতর্কি হবে যেমনি একজন দেখবে আর পারছে না, তখন হঠাৎ পাঁচ বছর আগে স্বামী বা স্ত্রী তাকে কি বলেছিল সেখান থেকে শুরু হয়ে যাবে, বেচারীর হয়ত মনেও নেই তখন সে কি বলেছিল। এমন তর্ক শুরু হয়ে যাবে যে তখন বোঝাই যাবে না কোন বিষয়ের উপর তাদের তর্ক শুরু হয়েছিল। এগুলোকে বলে বিতণ্ডা, ন্যায়শাস্ত্র পুরো বিতণ্ডার উপর চলে। সেইজন্য যারা ধর্মকে জানতে চাইছে, বুঝতে চাইছে তাদের ন্যায়শাস্ত্র পড়তে নিষেধ করা হয়। কারণ মানুষ ন্যায়শাস্ত্র পড়তে গিয়ে বিতণ্ডা শিখে নেয়। কোন কথাই অযৌক্তি নয়, কিন্তু উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কিছুর সাথে কোন মিল নেই। আগের বক্তব্যের সাথে পরের বক্তব্যের মিল পাওয়া যাবে না। শাস্ত্র এভাবে চলে না। খণ্ডন-মণ্ডনের খুব দরকার, খণ্ডন-মণ্ডন যদি না থাকে অনেক কিছুতেই সংশয় থেকে যাবে। ঠাকুরও বলছেন তোমাদের যদি খ্যাঁচমোচ থাকে তাহলে মিটিয়ে নাও, মানে প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে সংশয়টা মিটিয়ে নাও।

একবার এক ব্রহ্মচারী মঠে জয়েন করেছিল, খুবই ভালো ছেলে। কিন্তু তার মনে এক সময় কিভাবে ঢুকে গেল যে, ঠাকুরের যে এত রকম দর্শন হত এগুলো সব ঠাকুরের মনের কল্পনা, তাহলে তো ঠাকুরের সব দিব্য দর্শন মনেরই জিনিস হয়ে গেল। মনের জিনিস মানেই কল্পনার জিনিস। ঠাকুর মা কালীকে দেখছেন, কথা বলছেন, সবই মনের রাজ্যের ব্যাপার। যার কল্পনা যত গভীর সে কল্পনার রাজ্যে জিনিসটাকে তত ভালো দেখবে। এই নিয়েই সে চিন্তা করতে থাকল, চিন্তা করতে করতে একটা অবস্থায় আরও গভীরে চলে গেল। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েই নিল তাহলে এখানে পড়ে থেকে কি হবে। কিছু দিনের মধ্যে মঠ ছেড়ে দিল। পরে একজনের সাথে দেখা হয়েছিল, তার সাথে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাতে বোঝা গেল যে তখনও ওইটাকেই ধরে আছে। মনের কল্পনা আর অনুভূতি এই দুটোতে কোথায় তফাৎ, এই জিনিসটাকে ব্রহ্মচারী ধরতে পারেনি। এটাকেই ঠাকুরের ভাষায় বলে খ্যাঁচমোচ। আমাদের পক্ষেও কোনটা অনুভূতি আর কোনটা কল্পনা তফাৎ করা খুব কঠিন। ঠাকুর যখন ছিলেন তখন তাঁর কাছে কজন লোকই বা আসতেন। ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর ষোল সতের জন দাহ করতে গেলেন। আজ মঠের অধ্যক্ষের শরীর গেলে পনের থেকে কুড়ি হাজার লোক দাহ সংস্কারে আসছে। কে বড়, কে ছোট কি করে আমরা বুঝব? বোঝার কোন সহজ উপায় নেই। যদি সংখ্যাই প্রধান হয় তাহলে ঠাকুরের সময় মুষ্টিমেয় কয়েকজন আসতেন কিন্তু এখন অনবরত লোক আসছে তো আসছেই। এনারা কি তাহলে ঠাকুরের থেকে বড়? অবশ্যই নন। একজন যদি বলে আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি আর তার উপর সে যদি বই ছাপায়, তাহলে সে কি ভুল? কি করে ভুল হবে? ঠাকুর তো কুঠি বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস। তাহলে আমরা কি করে ধরব? কে অবতার, কে মহাত্মা জানার কোন পথ নেই। পরম্পরা ছাড়া কোন উপায় নেই। পরম্পরায়, আমি আমার গুরুকে বিশ্বাস করছি, আমার গুরু তাঁর গুরুজনদের বিশ্বাস করতেন, সেই গুরুজনরা স্বামীজীকে বিশ্বাস করেছেন, স্বামীজী ঠাকুরকে বিশ্বাস করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পরম্পরায় একজন যদি গোলমাল করে তাহলে পুরো পরম্পরাতেই গোলমাল হয়ে যাবে। তাহলে ইদানিং বাবাজীরাও তো একটা পরম্পরা দাঁড় করিয়ে দেবেন। তখন ওদের শিষ্যদের ব্যবহার দেখতে হয়, শেষে *ফলেন পরিচিয়তে*। কারণ গুরুর ব্যাপারে আমরা জানতে পারব না, বাবাজীদের চেলারা এমন ভাবে ঘিরে থাকে আমরা জানতে পারব না। কিন্তু ওদের শিষ্যরা যারা বলছে অমুক বাবাজী জিন্দাবাদ, ওদের চরিত্র দিয়ে বোঝা যায়।

সমস্যা হল, কেমেস্ট্রি ফিজিক্সের মত এটাকে জানার কোন মেথডলজি নেই। আমরা চলছি পরম্পরাতে, ফলে খ্যাঁচমোচের শেষ নেই। তার উপর পাঁচ রকম লোকের সঙ্গ করতে হয়, তার মধ্যে আবার যুক্তিবাদীরাও

আছে আবার ভোগীরাও আছে, পাঁচ রকম অন্য কথা শুনছি। ঠাকুরের প্রতি আমার নিষ্ঠা, ভক্তি হয়ত আছে ঠিকই, কিন্তু অপরের প্রতি একটু ভালোবাসাও তো আছে। অপরের প্রতি যে ভালোবাসা ওখান থেকে ঐ খ্যাঁচমোচগুলো ঢোকে। শাস্ত্র ওই খ্যাঁচমোচ গুলোকে আটকে দেয়। সেইজন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন যদি না করা হয়, যতই জপধ্যান করুক, যত যা করুক, একটা ধাক্কা এলে ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, খ্যাঁচমোচ, দুর্বলতাগুলো থেকে গেছে কিনা। শাস্ত্র যখন অধ্যয়ন করা হয়, শাস্ত্রের মতগুলো এনে যখন সেগুলোকে খণ্ডন করছে, ওগুলো জানা থাকলে কেউ আর তাকে নাড়াতে পারবে না। এই অধ্যায়ে ভক্তির বিরুদ্ধে বড় বড় যেসব জোড়ালো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন। সব আপত্তিকে খণ্ডন করে বলছেন ভক্তি কেন শ্রেষ্ঠ। যদি ভক্তি বলে আমি শ্রেষ্ঠ তখন আরও যারা আছে তারাও বলতে পারে আমি শ্রেষ্ঠ আর তাদেরও যুক্তি রয়েছে। এই যুক্তি গুলোকে নিয়ে পঁচিশ থেকে তেত্রিশ সূত্র পর্যন্ত নারদ দেখাচ্ছেন অন্যান্য যে মত বা দর্শনের তুলনায় ভক্তি কেন শ্রেষ্ঠ, তাই এই অধ্যায়ের নাম পরা ভক্তির মাহাত্ম্য।

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।।২৫।।

নারদ বলছেন, কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ আর যোগমার্গ এই তিনটে থেকেও ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ। সূত্রটা একটু জটিল, এতে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। টেকনিক্যাল এইজন্যই বলা হল, এগুলো না জানলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এই জায়গাতে কিছু ব্যাপার আছে। কর্ম বলতে এখানে একটা ইচ্ছাশক্তি লাগান হয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে লাগাতে হয়, তার মানে যেখানেই বুদ্ধি লাগছে সেটাই জ্ঞান আর যোগ বলতে ইমোশানসকে বলছেন। ভক্তিমার্গের কিছু কিছু পণ্ডিত কর্ম বলতে এখানে কর্মযোগ, জ্ঞান বলতে জ্ঞানযোগ আর যোগ বলতে ভক্তিযোগকে নিয়ে বলছেন। আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে, ভক্তিযোগ কেন বলা হবে, আমরা তো এখানে ভক্তিকে নিয়েই আলোচনা করছি, যোগ বলতে তাই রাজযোগই হবে। সমস্যা হল, আগেকার দিনে এনারা রাজযোগকে যোগ বলে গণ্য করতেন না। ওনাদের কাছে রাজযোগ সবার জন্যই সমান। আমরা যে পথেই যাই না কেন, আসন সবাইকেই করতে হবে, যে পথেই যাবে সেই পথে সবাইকেই প্রাণায়াম করতে হবে, যে পথেই যাক না কেন ধ্যান সবাইকেই করতে হবে। সেইজন্য রাজযোগকে অনেকেই আলাদা পথ বলে মানতেন না। এমনকি আচার্য শঙ্করও রাজযোগ যে আলাদা কোন একটা পথ, মানতেন না। পথ তাই তিনটে, ঠাকুরও কয়েক জায়গায় বলেছেন, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটে পথ। যেখানে ইমোশানকে নিয়ে চলা হয় সেটাই হয়ে গেল ভক্তি, মানে হৃদয়। আর বুদ্ধিকে নিয়ে চলছে তখন এটাই জ্ঞান আর যখন হাত চলছে তখন কর্ম। মানুষের এই যে তিনটি অঙ্গ, হেড, হার্ট আর হ্যাণ্ড, এই তিনটে অঙ্গকে নিয়ে যখন মানুষ চলে তখন হেড দিয়ে চললে জ্ঞানযোগ, হার্ট দিয়ে চললে ভক্তিযোগ আর হ্যাণ্ড দিয়ে চললে কর্মযোগ। সেইজন্য এখানে যে *কর্মজ্ঞানযোগেভ্যঃ* বলছেন এই শব্দগুলোকে যে কেউ যেমন খুশী ভাঙতে পারে। এর মধ্যে সন্ধি সমাস দুটোই লেগে আছে তাই শুধু কর্ম, জ্ঞান যোগ বলা যায় আবার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর রাজযোগের কথাও বলা যাবে। যাঁরা ভক্তিশাস্ত্রের উপর ভাষ্যাদি রচনা করেছেন তাঁরা এখানে বলছেন, পরা ভক্তি কর্ম, জ্ঞান এবং অন্যান্য পথ এমনকি ভক্তিযোগ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় আরেকটা সমস্যা ছিল, রাজযোগ মানেই তখন ছিল সিদ্ধাই, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। মূলতঃ হঠযোগ বলতে আমার যেটা জানি, সেটাকে এনারা একেবারেই কোন গুরুত্ব দিতেন না। সেইজন্য রাজযোগ প্রথমেই বেরিয়ে গেল। পরের সূত্রে ব্যাখ্যা করবেন কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ থেকে কেন পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগ আর পরা ভক্তিতে তফাৎ হল, ভক্তিযোগের সাথে কোথাও যেন বৈধী ভক্তি জড়িয়ে আছে, পরা ভক্তি সব রকম বিধি, উপাচারের পারে। আমাদের ভেতরে আগে থেকেই কিছু সংস্কার আছে, পরিবারের সংস্কার আছে, যে সম্প্রদায়ে আছি সেখানকার কিছু সংস্কার আছে, যেখানে এই সংস্কারগুলোর মাধ্যমে আমরা বড় হচ্ছি, সেখানে বৈধী ভক্তি পরা ভক্তিকে সব সময় দমিয়ে রাখে। বৈধী ভক্তিতে নেমে গিয়ে কোথাও গিয়ে এটাই স্থির ধারণা হয়ে যায় যে, এই যে বিধিগুলো আছে এত জপ করা, এতক্ষণ বসে ধ্যান করা, এগুলোই যেন প্রধান আর এগুলোর উপরেই বেশি জোর দেওয়ার প্রবণতা এসে যায়। এখানে তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, কর্মযোগে যে কর্ম করা হয় বা জ্ঞানযোগে যে বিচার করা হয় বা ভক্তিযোগে যে নানান রকমের উপাচারাদির কর্ম করছে, তার থেকে পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। পুরোপুরি কেন শ্রেষ্ঠ পরের দিকের সূত্র গুলিতে আরও বলবেন।

পরা ভক্তিতে গোপীদের উপমা আনা হল, আসলে যখনই পরা ভক্তির কথা আসে তখনই গোপীদের কথা আসে। ভক্তি মানে কি, গোপীদের ভক্তি। কারণ গোপীদের ভক্তিতে কোন চাওয়া-পাওয়া ছিল না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ওখানেই শেষ। যেখানেই চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার থাকে সেখানেই জার প্রেম হয়ে যায়। জার প্রেম মানে, স্বামী-স্ত্রীর যে প্রেম, প্রেমিক-প্রেমিকার যে প্রেম, ওটাতে নেমে যায়। পরা ভক্তিতে যেখানে ঠিক ঠিক ভালোবাসা সেখানে এই জিনিসগুলো থাকে না। এনারা এবার ব্রজগোপীদের উপমাকে নিয়ে এগোচ্ছেন। ব্রজগোপীদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ঈশ্বরের সত্তাকে গ্রহণ করেছিল। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, এই ভাবকে গোপীরা কখনই ছেড়ে দেননি। শ্রীকৃষ্ণ যশোদার দুলাল এই ভাবকে তাঁদের বুদ্ধি কখনই ধরেনি। সেইজন্য যশোদার ভক্তিকে পরা ভক্তিতে নেওয়া হয় না। পরা ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনটেকেই টেনে নেবে, Head, Heart and Hands তিনটেকেই টেনে নিচ্ছে। যশোদারও একটা বর্ণনা আছে, একদিন তিনি মাখন তুলছিলেন, কৃষ্ণরূপ চিন্তা করছেন, কৃষ্ণকে নিয়ে গান করছেন। কিন্তু গোপীরা যেভাবে একেবারে পরিষ্কার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, এই ভাব যশোদার কোন দিনই আসেনি। বুদ্ধিতে এই ভাব, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, যশোদার ছিল না। ব্রজগোপীদের ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু রাধাকেই নেওয়া হয় তাতেও হবে, সেখানেও রাধা কখনই বলছেন না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, আমি ভগবানকেই ভালোবাসি। তার সাথে দ্বিতীয় হল, হৃদয়ে এক দৈবী আনন্দ সব সময় অনুভব করছেন। সাধারণ ভক্তিতেও এই জায়গায় এসে যে কোন লোকই পেয়ে যায়। অনেক দিন আমি মঠে আসতে পারছি না, হঠাৎ একদিন আসার সুযোগ হয়ে গেল। এসে দেখছি মন্দির ফাঁকা, ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসলাম, হৃদয়ে একটা আনন্দের অনুভব হয়ে গেল। এই যে আনন্দের অনুভব পেলাম, আমি ভালোবাসা পেলাম, এটাই ভক্তি, কিন্তু পরা ভক্তি নয়। পরা ভক্তি হলে তিনটে জিনিসই আসবে। ভক্তি হলে একটা জিনিসকে নিয়েই থেকে যাবে, শুধু হৃদয়ে একটা শান্তির ছোঁয়া, একটা ভালোবাসা, নিজেকে কেমন শুদ্ধ পবিত্র বলে বোধ হচ্ছে। তৃতীয় হল কর্ম, গোপীরা যত কর্ম করতেন, তাঁদের যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, পুরোপুরি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত ছিল। যা কিছু করছেন বলছেন, এটা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। এর বাইরে সাংসারিক যে কর্তব্য কর্ম আছে সেই কর্ম এইজন্যই করছেন কারণ এগুলো না করলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারব না। গোপীদের ক্ষেত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ এই তিনটে ভাবই পরিস্ফুটিতে হয়ে যাচ্ছে। তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরা ভক্তিতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনটে একসাথে এসে যাচ্ছে। বাকিরা একটাতেই থেকে যাচ্ছে কিন্তু পরা ভক্তিতে তিনটি এক সঙ্গে চলছে, সেইজন্য পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

আত্মজ্ঞানের বা জ্ঞান পথের বিরুদ্ধে ভক্তিশাস্ত্র ঠিক এই যুক্তিকেই ব্যবহার করে। জ্ঞান পথে তুমি ঠিকই বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ে অবলোকন করতে পারছ কিন্তু ভগবান যে বাকি জিনিসগুলো দিয়েছেন, হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য যে উত্তাল ভালোবাসা সেটা তো তোমার হচ্ছে না। তোমার দেহের বিভিন্ন যে ক্রিয়াদি রয়েছে, সেই ক্রিয়া দিয়েও যে ঈশ্বরের আনন্দ নেবে, সেটাও তুমি নিতে পারছ না। তার মানে তুমি পূর্ণ রূপে কিছু পাচ্ছ না, ঈশ্বরের একটা ক্ষুদ্র অংশকে পাচ্ছ। তাহলে কি বলা যাবে, যার মধ্যে পরা ভক্তির উদয় হয় তার এই তিনটে জিনিস, বুদ্ধি, কর্ম আর হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়? তার উত্তরে বলছেন, তা হবে না, কারণ পরা ভক্তির এটা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরা ভক্তি হলে বাই প্রোডাক্ট রূপে হৃদয়, মন আর ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়ে যায়।

ভক্তির আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরা ভক্তি জাগতিক কোন কাজের ফল রূপে আসে না আর পরা ভক্তি জাগতিক কোন ফলও দেয় না। তার মানে, হৃদয় শুদ্ধ হওয়া, মন শুদ্ধ হওয়া এগুলো পরা ভক্তির কাজ নয় আর এগুলো শুদ্ধ হলেই যে পরা ভক্তি এসে যাবে তাও নয়। একজন লোক সাত্ত্বিক গুণে সমৃদ্ধ হতে পারেন, তিনি দশজন লোকের ভালো করতে পারেন, নিজের সব কিছু তিনি গরীবদের দান করে দিতে পারেন, তাই বলে যে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবেন, পরা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তা কখনই নয়। কারণ এই যে গুণের কথা বলা হল এই গুণের ফলস্বরূপ কখনই পরা ভক্তি আসে না। অন্য ভাবে, পরা ভক্তির ফল রূপে এগুলো আসতে পারে, কিন্তু পরা ভক্তির উদ্দেশ্য তা নয়। একবার এক স্টেশনে রামকৃষ্ণ মিশনের দুজন সন্ন্যাসী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাশে আরেকজন ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস করছেন, আপনারা কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী? বললেন হ্যাঁ। এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন, স্বামী বিবেকানন্দ কি করেছেন বলুন তো, গরীবের জন্য কিছু করেছেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গরীবদের জন্য কত কি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তো অপরের কাছ থেকে টাকা এনে এদিক সেদিক শুধু খরচ করেছেন

আর বিদ্যাসাগর নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের কত ভাবে সাহায্য করেছেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ভদ্রলোককে কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সাথের সন্ন্যাসী ওনাকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন, এদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। ভদ্রলোক ভুল কিছু বলছেন না এই জন্যই যে, তিনি যেটা বুঝছেন এটাই সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে সাধারণ ধারণা।

ঠাকুরের ব্যাপারে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ঠাকুর অবতার ছিলেন, খুব ভালো কথা। আচ্ছা গরীবের জন্য তিনি কি কিছু করেছিলেন? গরীবদের কম্বল বিতরণ করেছিলেন? গরীবদের খিচুরী খাইয়েছিলেন? না, তা করেননি। তাহলে কিসের অবতার! কাউকে কিছু খাওয়ালেন না, কম্বল দিলেন না, দুটো ধুতি দিলেন না, দুটো ঘর বানিয়ে দিলেন না, এই রকম অবতারকে নিয়ে আমি কি করব। লোকটি ভুল তো কিছুই বলছে না, কারণ সত্ত্বগুণের ব্যাপারে তার যে ধারণা তাতে এটাই সব কিছু। সত্ত্বগুণ আর পরা ভক্তি দুটো আলাদা জিনিস। এ কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, নিজে থেকে যত দিন পরিষ্কার না হবে যে দুটো এক জিনিস নয়, তত দিন তাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। ধর্ম মানুষকে সাত্ত্বিক তৈরী করে, আধ্যাত্মিকতা মানুষের মধ্যে পরা ভক্তি নিয়ে আসে। এখানে বলছেন কেন কর্ম, জ্ঞান আর যোগ থেকে পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্ম, জ্ঞান ও যোগ এই তিনটে হল ধর্ম সাধনের পথ, এই তিনটে ধর্মের মধ্যেই ঘুরঘুর করতে থাকে। বেদের ভাষায় বললে বলা হবে, এগুলো আমাদের ভালো স্বর্গে নিয়ে যাবে, ভালো জায়গায় জন্ম দেবে কিন্তু ভক্তি দিতে পারবে না।

রাস্থা ঘাটে অনেকে সন্ন্যাসীদের প্রশ্ন করে বসে, আপনারা কি রামকৃষ্ণ মিশনের? আপনারা তো অনেক কাজ করছেন, কিন্তু সমাজের কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন, কিছু ভালো হচ্ছে কি? এদের কি উত্তর দেবেন। সমাজ সন্তানের জন্ম দেবে আর তাকে মানুষ করার সময় সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীদের কি ফোকটে পেয়ে গেছে যে সে বসে বসে সবার বাড়ির কাজ করে দেবে। সমাজ যত রকম নোংরামি করার করবে, ঘুষ নেবে, বেইমানী করবে, সব করবে আর এরপর চাইছে তার ছেলেকে সন্ন্যাসীরা মানুষ করে দেবে। পুরো সমাজেই এই সমস্যা। এখানেই শেষ না, আধ্যাত্মিক পুরুষকে যখন বিচার করতে যাবে সেখানেও এই এই মাপকাঠি নিয়ে আসবে। রামকৃষ্ণ মিশনের কেন নাম? দুটো গরীবের সেবা করছে। রামকৃষ্ণ মিশনের এটা কাজই নয়, incidentally রামকৃষ্ণ মিশন করে দিচ্ছে। বিধবার চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া, অনাথ শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া সন্ন্যাসীর কাজ নয়, এই কাজ সমাজের, সরকারের কাজ, স্বয়ংস্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ। সন্ন্যাসীর একমাত্র কাজ নিজেকে পরা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখা আর যারা তাঁর কাছে আসবে তাদের পরা ভক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিক ভাবে সবাই বলবে, তাহলে স্বামীজী কেন সমাজসেবা, দেশসেবার কথা বলছেন? পরা ভক্তির সাথে স্বামীজী কোথাও কোন আপোষ করছেন না। স্বামীজী এই জন্যই বলছেন, তোমরা হলে অপদার্থ, তোমরা হলে অত্যন্ত স্বার্থপর, যদি গরীবের সেবা কর, দেশের সেবা কর তবে গিয়ে তোমার এই স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতার ভাব দূর হবে। নিজেকে তৈরী করার জন্য স্বামীজী এই কথা বলছেন, এটাই উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। বার্মাতে যত রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টার ছিল বার্মার সরকার সেগুলোকে নিয়ে নিল কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠকে নিল না, অনেক পরে তারা নিয়েছে। আগামীকাল যদি সরকার বলে দেয় সব স্কুল আমরাই চালাব, রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু করার থাকবে না, কারণ এটা সমাজের কাজ, সরকারের কাজ। কাল যদি বলে দেয় সরকার সব হাসপাতাল চালাবে, সব রিলিফের কাজ সরকার চালাবে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু করার নেই। কারণ এটাই সমাজের কাজ, সরকারের কাজ, কিন্তু কোন সরকারই বলবে না, আজ থেকে মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, পরা ভক্তি সরকার থেকে দেওয়া হবে। এই কাজ চিরদিনই সন্ন্যাসীদের জন্য থাকবে। ঠিক এই কারণেই পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। পরা ভক্তির প্রকৃতিটাই আলাদা, স্বভাবটাই আলাদা।

পরা ভক্তির একটু আস্বাদ যতক্ষণ পর্যন্ত যদি কেউ না পেয়ে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোন মানুষের মধ্যে সব সময় পরা ভক্তির সাথে সত্ত্বগুণের সংশয় থাকবে। আমরা সবাই আধ্যাত্মিকতা, পরা ভক্তিকে সব সময় সত্ত্বগুণের সাথে জুড়ে রাখি। আধ্যাত্মিকতায় কখনই ভালো মানুষ হওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, ওর উদ্দেশ্যই হল ভালো মন্দের পারে চলে যাওয়া। যিনি সব জায়গায়, সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, তিনি ভালো মন্দের পারে চলে যান। একদিক থেকে দেখতে গেলে সত্ত্বগুণ খুবই বিপজ্জনক, কারণ সত্ত্বগুণ মানে সিল্কের দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধা থাকলে মানুষ বুঝতে পারে আমাকে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, লৌহ শৃঙ্খল থেকে মানুষ মুক্ত হতে চায়। দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে তাও মানুষ

ছটফট করে। কিন্তু হাল্কা সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা হলে মনে করে সিল্কটা কত নরম মোলায়েম, লোহার মত কর্কশ নয়। কিন্তু ওটাও বন্ধন, আর এত সুন্দর বাঁধন যে ওর বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে হয় না। সত্ত্বগুণের এটাই সব থেকে বড় সমস্যা। যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য এসে গেছে, এটা জানবেন তাদের পক্ষে ধর্ম পথ থেকে বেরিয়ে আধ্যাত্মিকতায় পা রাখা খুব কঠিন হয়ে গেল, এর কোথাও কোন ব্যাতিক্রম নেই। গীতায় ভগবান বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সত্ত্বগুণ সুখ আর জ্ঞানের এমন বাঁধনে বেঁধে রাখে যে মনে করে এর থেকে আর কী ভালো হতে পারে! ভগবান বুদ্ধ যখন জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছাতে যাচ্ছেন তখন মাড় এসে ভগবান বুদ্ধকে নানান ভাবে ফাঁসাতে চাইছে। যীশুর সাথেও একই জিনিস হয়েছিল।

মোদ্দা কথা, প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান কখনই কারুর হতে দেবে না। কারণ শেষ বন্ধনই হল সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থেকে যাওয়া। প্রকৃতির শেষ বন্ধন সত্ত্বগুণ। এখানেও একই কথা বলছেন, কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তিযোগ এই তিনটে সত্ত্বগুণে বেঁধে রাখে। ভক্তিযোগ মানে আচারী ব্রাহ্মণ। আচারী ব্রাহ্মণকে দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধা জাগবে। চার পাঁচ ঘন্টা ধরে স্তোত্র পাঠ করে যাচ্ছেন, পূজা করে যাচ্ছেন। আর সত্যিকারের নিষ্ঠা নিয়ে করছেন। পাঠ করছেন চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, কোন বাড়াবাড়ি কিছু নেই, সত্যিকারের জল পড়ছে। যেমন ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম আচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আচারী ব্রাহ্মণের এমন একটা প্রভাব যে সবারই উপরে পড়ে, সবার মনকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করে নেন।

এই সূত্রে এটাই বলছেন *অপি অধিকতর*, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এগুলোকে পথ হিসাবে নিচ্ছেন, আর প্রথম পয়েন্ট হল পরা ভক্তি কোন পথ নয়, পরের সূত্রে এটাকে আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করবেন। দ্বিতীয় পয়েন্ট, পরা ভক্তি বিভিন্ন কারণে বাকি তিনটে থেকে শ্রেষ্ঠ, ভক্তি নিজেই ফল, বাকিরা ফল তৈরী করে। পরা ভক্তি এই তিনটে থেকে পথ হিসাবে শ্রেষ্ঠ নয়, কারণ পরা ভক্তি কোন পথই নয়, ফল রূপে শ্রেষ্ঠ। সেটাই পরের সূত্রে বলছেন –

ফলরূপত্বাৎ।।২৬।।

যোগ মানেই পথ। বলছেন যেখানেই যোগ শব্দ লেগে যায়, কর্মযোগ হোক, জ্ঞানযোগ হোক, ভক্তিযোগই হোক আর রাজযোগই হোক, যেটাই হোক এদের থেকে পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। শেষ ফল কিন্তু সব সময় দুটো হয়, হয় জ্ঞান আর না হলে ভক্তি। জ্ঞানে দেখেন আত্মাই আছেন বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। ভক্তিতে দেখেন তিনিই আছেন আর তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কর্ম কখনই ফল হয় না, যোগ কখনই ফল হয় না, ভক্তিও কখন ফল হয় না, পরা ভক্তি ফল হয়। স্বামীজী যে যোগ সমন্বয়ের কথা বলছেন, তিনি সেখানে সব কটাকে পথ হিসাবে নিচ্ছেন আর ফল হিসাবে বলছেন and be free। স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি, Each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity within, do this either by work, worship, psychic control or knowledge, চারটে পথের কথা বলছেন। শুধু চারটে কেন ওখানে যত খুশী পথ নিয়ে আসা যেতে পারে। কিন্তু তারপরে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলছেন তা হল, and be free। আচার্য শঙ্কর বলছেন জ্ঞান আর কর্মসমুচ্চয় কখনই হয় না। আচার্য শঙ্কর যখন বলছেন তখন তিনি জ্ঞানের কথা বলছেন আর স্বামীজী জ্ঞানযোগের কথা বলছেন। স্বামীজী পথের কথা বলছেন, আচার্য সেখানে ফলের কথা বলছেন। এখানেও ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলছেন না, ফল রূপে পরা ভক্তি যে কোন পথ থেকে শ্রেষ্ঠ। এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ পথ আর পথের লক্ষ্যপ্রাপ্তি দুটো কখন এক হতে পারে না। কিন্তু পরা ভক্তি কিভাবে আসবে যখন বলা হবে তখন ঐ জিনিসটাই হয়ে যাবে ভক্তিযোগ। নারদ ভক্তিসূত্রে বলছেন ঠিকই কিন্তু মূল হল পরা ভক্তির কথা। ভক্তি বলতে আমরা যা বুঝি, গৌণা ভক্তি, বৈধী ভক্তি এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন না। সমস্ত দৃষ্টিকে নিয়ে ফেলা হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসায়। ঠাকুরও কথায় কথায়, কথামৃতের পাতায় পাতায় ঈশ্বরকে ভালোবাসতে বলছেন। সাধারণ ভাবে ভক্তি বলতে আমরা যেটাকে বুঝি, যেমন বলি, গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শেখ, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তখন বৈধী ভক্তির কথাই বলছে। এখানে এই জিনিসটাকেই পৃথক করে দিয়ে বলছেন, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, পথ হিসাবে নয়। তবে কি রূপে শ্রেষ্ঠ? *ফলরূপত্বাৎ*, পথ রূপে নয়, ফল রূপে শ্রেষ্ঠ।

পরা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এই সূত্রেই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। যেদিন থেকে আমরা রামকৃষ্ণ সাহিত্য পড়ে আসছি, গীতা শুনে আসছি, সবাই ভক্তির কথা শুনে আসছি। আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ এখানে পরা ভক্তি নিয়ে এত কেন আলোচনা চলছে? নারদ ভক্তিসূত্রে দুটো ভক্তিকে আলাদা করে দিচ্ছেন, ভক্তিযোগ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা আলাদা আর পরা ভক্তি আলাদা। যেমন আচার্য শঙ্কর উপনিষদের ভাষ্য লেখার সময় বা গীতাতেও যেখানে যেখানে জ্ঞানের কথা বলছেন, সেখানে তিনি জ্ঞান জিনিসটাকে নিয়েই চলছেন আর জ্ঞানযোগ, যেখানে বিচার আসছে, ওটাকে পুরো আলাদা করে দিচ্ছেন। নারদ ভক্তিসূত্রেও ভক্তিযোগের মহিমা বলছেন না। বরঞ্চ ভক্তিযোগকে আলাদা করে দেখাচ্ছেন, তিনি পরা ভক্তিকে একটা লক্ষ্য রূপে সামনে রাখছেন। লক্ষ্য একটা পথ আরেকটা। সাধারণ মানুষ সব সময় পথকেই লক্ষ্য মনে করে। বাচ্চাকে আঙুল দিয়ে চাঁদ দেখাবার সময় বাচ্চা চাঁদ না দেখে আঙুল দেখতে থাকে। আঙুল হল সেই পথ, যেটাকে দিয়ে চাঁদকে দেখানো হয়। নারদ এখানে বলছেন, পরা ভক্তি পথ নয়, পরা ভক্তি ফল। সেইজন্য অন্য কারুর সাথে পরা ভক্তির তুলনা চলবে না। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এখানেও তাই হচ্ছে, বাকি সব জিনিসকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ঈশ্বরকে ভালোবাস। ভক্তিশাস্ত্রে বিশ্বের সেরা সেরা সাধক বা মহাত্মা যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সবাই ভক্তিকে সব সময় ফল রূপেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। তাঁদের থেকে যাঁরা একটু নীচে, তাঁরা সব সময় ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন।

সুফি সাধিকা রাবেয়ার কথা এর আগেও আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি। ইসলাম এবং খ্রীশ্চানিটিতে শয়তানের খুব নিন্দা করা হয়, এটাই তাদের একটা ধর্মীয় রীতি। মক্কায় হজ করতে গেলে একটা জায়গায় সবাই শয়তানের নামে পাথর মারে। রাবেয়াকে একজন জিজ্ঞেস করছে, তুমি শয়তানের কেন নিন্দা কর না? রাবেয়া তাকে বলছেন, আমিও শয়তানের নিন্দা করতে চাই, কিন্তু আমার মন আল্লার ভালোবাসায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে, মনে যে শয়তানকে নিয়ে আসব সেটা আর হয়ে ওঠে না। কাউকে গালাগাল দেওয়ার আগে তাকে তো মনে একটা জায়গা দিতে হবে, মনে জায়গা দেওয়ার পরেই তাকে গালাগাল দেওয়া যাবে। সেইজন্য বলে, তুমি যদি আমাকে ভালোই না বাস তাহলে অন্তত আমাকে গালাগাল টুকু দাও। একজন রাজনৈতিক নেতার একটা খুব নামকরা কথা আছে, আপনি আমাকে শত্রু ভাবে দেখেন তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ তাতে বুঝতে পারি আমি আপনার মনে আছি, কিন্তু আমার ব্যাপারে যদি উদাসীন হয়ে যান, অস্তিত্ব বিহীন যদি করে দেন এর থেকে লজ্জা আর কি হতে পারে! বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভল্টায়ারসের খুব নামকরা কথা আছে। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। ফরাসীতে তখন একটা রেওয়াজ ছিল, প্রত্যেক পুরুষ কোন একজন বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে রাখত। ভল্টায়ারও একজন বিবাহিতা মহিলার সাথে জড়িয়ে ছিলেন। সেই মহিলাও খুব বিদুষী ছিলেন, কাইনেটিক এনার্জির যে হাফ এমবি স্কয়ার তাতে ঐ মহিলার অবদান আছে। একটা সময় থেকে দুজনের মধ্যে বনাবনি হচ্ছিল না। ফিলজফিতে ভল্টায়ার খুব সুন্দর লিখছেন, there was no love between them, now even they did not quarrel এদের দুজনের ভালোবাসাও শেষ, ঝগড়াও শেষ। ঝগড়া যতক্ষণ চলে ততক্ষণ ভালোবাসাটা আছে বোঝা যায়, মনে স্থান আছে তার। কিন্তু যখন ঝগড়াও করছে না, তার মানে মন থেকেও শেষ। রাবায়া এটাই বলছেন, শয়তানকে আমি গালাগাল দিতে চাই কিন্তু আল্লার প্রতি আমার এমন ভালোবাসা যে শয়তান আমার মনের ভেতরে ঢুকতেই পারছে না। ইসলামের ভক্তিযোগে শয়তানকে গালাগাল দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পরা ভক্তিতে শয়তানের কোন স্থান নেই। ভক্তিযোগে শুদ্ধ পবিত্র থাকা, মন্দিরে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া, এগুলোর খুবই গুরুত্ব আছে।

রাবায়ার দৃষ্টান্ত খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত, এই দৃষ্টান্তে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কোরানেরই নির্দেশ, একে পাথর মারতে হবে, তাকে নিন্দা করতে হবে। রাবায়া বলছেন, আল্লার ভালোবাসায় আমি এতই মত্ত হয়ে আছি যে আমার আর কোন কিছু করতে মন যায় না। এখানে এটাই বলছেন, *ফলরূপত্বাৎ*। ভক্তিযোগের তুলনায় পরা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। তোমার উদ্দেশ্য যেন কখনই ভক্তযোগ না হয়, তোমার উদ্দেশ্য যেন সব সময় পরা ভক্তি হয়। ঠাকুর একজনকে বলছেন, উপর উপর ভাসলে কি হবে, ডুব দাও। ডুব দেওয়া মানে পরা ভক্তিতে, ঈশ্বর প্রেমে ডুব দেওয়া। উপর উপর ভাসা মানে ভক্তিযোগ। বিশ্বে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা সব সময় ভক্তিকে ফল রূপে জোর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের শিষ্যরা সব সময় ভক্তিযোগের উপর বেশি জোর দেয়। এই দুটো সূত্র একত্রে একটাই কথা বলছেন নারদ ভক্তিসূত্র পরা ভক্তির কথাই বলছেন। পরা এইজন্যই বার

বার বলতে হচ্ছে যেহেতু ভক্তি বলতে দুটোই বোঝায় সেইজন্য তফাৎ করার জন্য পরা শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভক্তি, তা যেভাবেই হোক। এই যে ঈশ্বরকে সত্যিকারের ভালোবাসা, স্তব্ধো ভবতি, মত্তো ভবতি হয়ে যাওয়া, ঈশ্বরে একেবারে ডুবে যাওয়া, মজে যাওয়া, এই জিনিসটা বাকি সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ বাকি সব কিছুই হল পথ, যেটা একটা জায়গায় নিয়ে যায়। আর ঈশ্বরকে ভালোবাসাটা নিজেই ফল, ভালোবাসাটাই পথ ভালোবাসাটাই ফল, তাই এর সাথে কারুর তুলনা হয় না। কেন তুলনা হয় না? *ফলরূপত্বাৎ*, এটাই মূল বক্তব্য। এর আগেও কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধন আর সিদ্ধি দুটো আলাদা জিনিস। একটা সাধন যখন আরেকটা সিদ্ধিতে নিয়ে যায় তখন সেটা সব সময় নিকৃষ্ট হবে, কিন্তু সাধন আর সিদ্ধি দুটো যখন এক তখন সেটাই শ্রেষ্ঠ। যেটাই সাধন সেটাই সিদ্ধি, এর মত শ্রেষ্ঠ জিনিস আর কিছুই হয় না। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসছি বা ভালোবাসব, এটাই সাধনা আর তার ফল ঈশ্বরকে ভালোবাসছি এটাই ফল। অন্যান পথে সাধন একটা সিদ্ধি আরেকটা। কর্মযোগে সাধন কর্ম করা, কিন্তু তার সিদ্ধি কর্ম কখনই হয় না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর যদি এসে তোমাকে বলে তুমি কি চাও, তাহলে তুমি কি ঈশ্বরকে কটা হাসপাতাল আর ডিসপেন্সারি করার কথা বলবে? তার মানে কর্ম কখন সিদ্ধি হবে না, কর্মটা সাধন। রাজযোগে যে আসন, প্রাণায়ামাদি করা হচ্ছে সেখানে এগুলো কখনই সিদ্ধি নয়। সেইজন্য বলছেন পরা ভক্তিটাই সাধন পরা ভক্তিটাই সিদ্ধি। অবশ্য জ্ঞান পথেও তাই হয়, জ্ঞান বিচারে আত্মা ছাড়া বাকি সব কিছুকে মিথ্যা বলে দিচ্ছে, আর পরম জ্ঞানের উপলব্ধি যখন হয় তখনও দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেটা সাধন সেটাই যদি সিদ্ধি হয় তখন সেটাকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলছেন, সূত্রে এর উপরই জোর দিচ্ছেন।

ঈশ্বরস্যাপি অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ।।২৭।।

ঈশ্বর অভিমানী, অহঙ্কারী ব্যক্তির প্রতি বিরূপ আর দীনভাব যুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীতিযুক্ত। পরা ভক্তি মানেই পূর্ণ শরণাগতি। এখানে যে দৈন্য বলছেন, এই দৈন্য আমার যে দীনহীন কাঙালী বলতে বুঝি, তার কথা বলছেন না, দৈন্য বলতে শরণাগতিকেই বলছেন। অভিমান জিনিসটা ঈশ্বরেরও পছন্দের জিনিস নয়, দীন ভাব তাঁর পছন্দের। সূত্রের শুধু শাব্দিক অর্থ নিয়ে চললে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। অভিমানী বলতে কাঁচা আমি। প্রথমে ঈশ্বর শব্দ নিয়ে আসছেন। উপনিষদে আত্মা, ব্রহ্ম এই শব্দগুলোকে নিয়ে বলছেন, সেখান থেকে সরে এখানে ঈশ্বর শব্দ নিয়ে আসছেন। ঈশ্বর যিনি তিনি মায়াধীশ, যিনি এই জগতের স্বামী, যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, যিনি বিধাতা রূপে সবার কর্মের ফল প্রদান করেন। বলছেন এই ঈশ্বরেরও দেখা যায়, আমি ভাবটা তাঁর প্রিয় নয়, আমি বলতে ঠাকুর যেটাকে কাঁচা আমি আর পাকা আমি বলছেন। কাঁচা আমি হল অন্য, অর্থাৎ যে আমিত্ব ঈশ্বর থেকে আলাদা, পাকা আমি হল, যে আমিত্ব সব সময় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে থাকে। ভক্তিতে আমিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু ঐ আমিত্ব সব সময় ঈশ্বরের সাথে যুক্ত। আগেকার দিনে মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর তার শ্বশুড় বাড়িতে কিছু দিন পর যে পরিচয় হবে সব সময় তার বাপের বাড়িকে দিয়েই পরিচয় হয়। প্রথমের দিকে বলে শ্বশুড় বাড়ি। কোথায় বিয়ে হয়েছে? শ্বশুড় বাড়ি অমুক জায়গায় ইত্যাদি। কিছু দিন পর থেকে বলবে বাপের বাড়ি অমুক জায়গায়, ধীরে ধীরে এটা আলাদা হতে থাকে। বিয়ের তিরিশ বছর পরেও মেয়েরা বলবে, আমার বাড়ি অমুক গ্রামে, শ্বশুড় বাড়ি অমুক জায়গায়। বিবাহিতা মেয়েকে দিয়ে যদি বুঝতে হয় তাহলে বাপের বাড়িটা হল কাঁচা আমি আর শ্বশুড় বাড়িটা হবে পাকা আমি। শ্বশুড় বাড়ির সবাইকে ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে বেঁধে যখন আমার বাড়ি বোধ হয়ে যায়, এটাই আমার বাড়ি, তখন এটা পাকা আমি হয়ে গেল। কিন্তু যত দিন বাপের বাড়িটাই নিজের বাড়ি হয়ে থাকে তখন ওটাই কাঁচা আমি। যতক্ষণ সংসারের দৃষ্টিতে আমরা নিজেদের দেখছি, আমি অমুক, আমি এই, আমি সেই, ততক্ষণ আমরা কাঁচা আমিকে ধরে রাখছি। যখন ভাবছে আমার বাবার বাড়িতে কত চাকর-বাকর, দুটো গাড়ি আছে, কত বড় বাগান আছে, তখন সে কাঁচা আমিতে নেমে আছে। কিন্তু সত্যকারের সতী মেয়ে যত তাড়াতাড়ি বাবার বাড়ি ভুলে গিয়ে এদিকে মন নিয়ে এল, ওর মধ্যে শর্ত আছে, স্বামী যেন তাকে ভালোবাসে, শ্বশুড় শাশুড়ি যেন ভালোবাসে, ঈশ্বরকে ভালোবাসেনি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর যত অহঙ্কার, যত আমি ভাব এটা পুরোপুরি ঈশ্বরের সঙ্গে, ঈশ্বরের আমি দাস, ঈশ্বরের আমি সেবক, এই ভাবটা হয়। এই ভাবে তখনও আমি ভাব আছে, কিন্তু এই আমি সংসারের আমি না, ঈশ্বর কেন্দ্রিত আমি। এখানে যে অভিমান শব্দ বলছেন, এই অভিমান হল সংসার কেন্দ্রিত অভিমান। শ্রীমতি রাধাকে সখী বলছেন, তোর কত অহঙ্কার। রাধা বলছেন, এই অহঙ্কার কৃষ্ণকে নিয়ে।

আর দৈন্য, দৈন্য মানে ঈশ্বরে পুরোপুরি শরণাগতি। ভগবানে শরণাগতি মানে তোমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। গীতায় ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সর্বব্যাপী আত্মার মহিমা দিয়ে শুরু করে কত কি বলছেন, *অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোস্য এব চ*, এই সব বলে বলে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ের পর অধ্যায় করে করে অষ্টাদশ অধ্যায় যখন শেষ করতে যাচ্ছেন তখন অর্জুনকে বলছেন, তোমাকে আরও সহজ পথ বলে দিচ্ছি, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সব কিছু ছেড়ে আমার শরণ নাও। আমার শরণ নেওয়া মানে, আর ধর্ম ও অধর্মের দিকে তুমি তাকিও না। সূত্রে অভিমান, দৈন্য এই শব্দগুলোই যখন আমাদের কাছে আসছে তখন বলছি, টাকার অভিমান, বিদ্যার অহঙ্কার, নামযশের অভিমান, কিন্তু না। সংসার ধর্মে ভালো মন্দ যাবতীয় যা কিছু আছে তার প্রতি যে ভাব, যেমন আমি শুদ্ধ আচরণ করি, এটাও অহঙ্কার, আমি ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি, এটাও অহঙ্কার, আমি সবার থেকে বেশি বিনয়ী, এটাও অহঙ্কার হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, ছোট শিশু সে জানে আমার মা আছে, মা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। সেই মায়ের কোলে যখন থাকে তখন তার শক্তিকে আর সামলানো যায় না, মায়ের কোলে মনে করে যে কোন জিনিস করে দিতে পারে। যে মা নিজের সন্তানকে সত্যিকারের ভালোবাসে, সেই সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। আর কোন সন্তানের যদি সত্যিকারের এই ভাব থাকে, আমার মা আছে, এই ভাবটাই তাকে যে কোন উপায়েই হোক সব কিছু থেকে রক্ষা করে যাবে। মাতৃশক্তির উপরে একমাত্র ঈশ্বরীয় শক্তিই যায়। যেমনি বোধ হয়ে গেল, আমার ঠাকুর আছেন, আমি ঠাকুরের সাথে যুক্ত, ঐ শক্তিই তাকে রক্ষা করে। এখানে *অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ* বলতে পূর্ণ শরণাগতির কথাই বলছেন। আমিত্ব সব সময় থাকবে ঈশ্বরকে নিয়ে, ওখানে কোন চালবাজি থাকবে না। বৈষ্ণবদের মধ্যে বিনয়ের ভাব রাখাটা একটা প্রতিযোগিতায় চলে গেছে, কে কত বড় বিনয়ী। এক বৈষ্ণবের সাথে সকালে আরেক বৈষ্ণবের দেখা হয়েছে। একজন আরেকজনকে বলছেন এই অধমের প্রণাম নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বৈষ্ণব বলছেন অধমাধমের প্রণাম নেবেন, তার মানে আপনি কি অধম, আমি তার থেকেও বেশি অধম। আগের বৈষ্ণবও ছাড়বে না, সেও বলছেন এই অধমাধমাধমের প্রণাম নেবেন। কেউ কাউকে ছাড়ছে না, অধমা অধমা বেড়েই চলেছে, শেষ দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, আপনি কি মনে করেছেন, আপনি আমার থেকে বেশি বিনয়ী! নারদ ভক্তিসূত্রে বলেছেন দীন হীন হতে হয়। ব্যস্ সেই থেকে সব ভক্তদের মধ্যে দীন হওয়ার কম্পিটিশান শুরু হয়ে গেল। এই দীন হীন ভাব কাউকে কোথাও নিয়ে যাবে না, ভেতরটা তমোগুণে ভর্তি, আগে তাকে রজোগুণ জাগিয়ে তমোগুণকে কাটাতে হবে। সূত্রের শব্দের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে না পারলে এই দুরবস্থা হয়। জিনিসটা একেবারেই ঠিক বলছেন। ঠাকুরের জীবনে একটা কোথাও দৃষ্টান্ত নেই যে ঠাকুর দীন হীন কাঙালীর মত কথা বলছেন। স্বামীজীকে কি কেউ দেখেছে দীন হীন কাঙালীর মত কথা বলতে? শৌর্যকে সব সময় ধরে রাখতে হয়, সেই শৌর্যের মধ্যে আমিত্বের কোন অহঙ্কার নেই, ওটা একটা বিরাটের অহঙ্কার। এখানে বলছেন ঈশ্বর অভিমানকে পছন্দ করেন না। অভিমানকে পছন্দ না করা মানে, বিষ্ণু আর ধোপার যে কাহিনী আছে তাতে ভক্ত ধোপাকে মারার জন্য ইট তুলেছে। বক্তব্য হল, যে জায়গাতে সাংসারিক আমিত্বটা থাকে ঐ জায়গাতে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব হয়ে যায়। যিনি ঈশ্বর তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকে যখন মনের মাধ্যমে দেখছি তখন তাঁকে ঈশ্বর বলছি, যখন মনের দেওয়াল থাকছে না তখন তাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলছি। সেই শক্তি তখনই আসে যখন আমাদের মন সেখানে বাধক রূপে থাকে না, আমাদের আমিত্ব, আমাদের মনই সেটার বাধক।

হল্যাণ্ডের সমুদ্রটাই উঁচু, মাটিটা নীচু, সেইজন্য বাঁধ দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে সমুদ্রের জল না ঢুকে যায়। আত্মার যে জল, আত্মার যে আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরের যে শক্তি হল্যাণ্ডের সমুদ্রের মত, মাটি থেকে উঁচুতে। ওখানে আমাদের অহঙ্কারের বাঁধ খুব ভালো করে দেওয়া আছে, আত্মার জল ঢুকবে কোথা থেকে! বাঁধ একটু ভেঙে দিল হুড়মুড় করে জল ঢুকতে থাকবে, হুড়মুড় করে জল ঢোকা মানে জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্যের প্লাবন। জ্ঞান ভক্তি যাঁর ভেতরে এসে গেল তাঁকে পাঁচজন লোক মানবে, জানবে। পাঁচজন লোক তাঁর কাছে এসে শান্তি পাবে, সুখ পাবে। কিন্তু বাঁধকে আমরা মজবুত করে ধরে রেখেছি। হল্যাণ্ডে যারা বাঁধ দিয়ে রেখেছে তারা কি জল পায় না, টিউবওয়েল বানিয়ে দিলে জল পাবে। আর বাঁধটা যদি ভেঙে দেওয়া হয়, বন্যায় সব ভেসে যাবে। আধ্যাত্মিকতা হল ঐ বাঁধকে ভেঙে দেওয়া, যাতে সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঢুকতে পারে। যতক্ষণ বাঁধ না ভাঙছি ততক্ষণ মাটি খুড়ে ভেতর থেকে জল বার করতে হচ্ছে। ততক্ষণ বুদ্ধি রূপে আমাদের শক্তি বেরিয়ে

আসে। অথচ পাশেই অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি সঞ্চিত হয়ে আছে। এখানে এটাই বলছেন, শরণাগতি নিলে, আমিত্বকে ছেড়ে দিলে বন্যায় সব ভেসে যাবে। ঈশ্বরের সেটাই প্রিয়, ঈশ্বর শব্দ এখানে সেইজন্যই আনছেন কারণ এখানে কৃষ্ণ রূপে দেখছেন, রাম রূপে দেখছেন, জগতকে যখন সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তখন সেই ব্রহ্মই ঈশ্বর রূপে সামনে আসেন।

যে কোন ধর্ম কথা, অবতারের বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্রের কথা, কোন মহাত্মার বৈশিষ্ট্য এগুলো সব সময় পরম্পরা থেকেই জানা যায়। বেদান্তে এটাকে বলছেন সম্প্রদায় বিদ্যা। পরে কয়েকটা সূত্র আসবে যেখানে এই যুক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা পরম্পরা ছাড়া জানার কোন পথ নেই। প্রমাণ মানে যেভাবে আমরা একটা জিনিসকে জানছি। বেদান্তে ছয় রকম প্রমাণের কথা বলা হয়। কিন্তু সংক্ষেপে তিন রকমের প্রমাণের কথা বলা হয়। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা। প্রত্যক্ষ প্রমাণে দু চারটে ভুলভাল হয়ে যেতে পারে, কখন সখন আমরা মরীচিকা দেখে নিলাম বা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কখনই প্রশ্ন করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যদি প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে জগতে দাঁড়াবার মত কিছু থাকবে না। ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা আমরা জানছি তাকে কখনই প্রশ্ন করা হয় না। বেদান্ত বুঝতে গিয়ে অনেক সময় বড় বড় পণ্ডিতদেরও ভুল ধারণা এসে যায়। বেদান্ত কিন্তু কক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে প্রশ্ন করে না। আচার্য শঙ্করও বার বার বলছেন, একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি জিনিসটাকে এক রকম বলে থাকে আর তার বিরুদ্ধে শত বেদবাক্য যদি থাকে সেখানে বেদবাক্যকে নেওয়া যাবে না, প্রত্যক্ষকেই নেওয়া হবে। সেইজন্য পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞান আর ধর্মের যে সংঘাত সেই সংঘাত ভারতবর্ষে কোন দিন ছিল না। কারণ খ্রীশ্চানিটি আর ইসলাম বাইবেল বা কোরানে যে রকম বলছে তার বাইরে কোন কথা তারা কোন পরিস্থিতিতে মানবে না। গ্যালিলিও যখন দেখলেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সবাই ঘুরছে না, বরঞ্চ পৃথিবীই ঘুরছে। বাইবেলে সেই রকম কোন কথা নেই, কিন্তু খ্রীশ্চানদের যে সিদ্ধান্ত তাতে এই কথাই দাঁড়ায়। ফলে গ্যালিলিওকে মেরে ফেলার আদেশ দেওয়া হল। কারণ গ্যালিলিও ধর্ম বিরোধী কথা বলছে। ইসলামেও ঠিক একই সমস্যা। আমাদের এখানে কখনই এই সমস্যা হয় না। আমাদের এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব সময়ই শ্রেষ্ঠ। ভুলভ্রান্তি যেটা হয় সেখানে বলা হয় একটু দেখে নিতে। যেমন এনারা উপমা দেন, ট্রেনে যাচ্ছেন স্টেশনটা পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে, এগুলো ভুলভ্রান্তি, কয়েকজনের সাথে কথাবার্তা করলেই জানা যায় কোনটা ঠিক। দ্বিতীয় প্রমাণ হল অনুমান প্রমাণ, এটা আরও সূক্ষ্ম। বিজ্ঞান পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে অনুমান প্রমাণের উপর। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর যে জগতটা দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নিয়ে কিছু কিছু জিনিসকে বাদ দেওয়া হচ্ছে আর কিছু জিনিসকে যোগ করা হচ্ছে। গণিত বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞানের যে থিয়োরী এগুলো পুরোপুরি অনুমান প্রমাণের উপর চলে। যুক্তি দিয়ে দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এমনকি বিজ্ঞানও এই দুটো প্রমাণের বাইরে যেতে পারে না।

কিন্তু ধর্ম কথা যখন আসছে তখন সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাজ করবে না। কারণ ধর্মের যা কিছু আছে, ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ-নরক, পুনর্জন্ম কোনটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা সম্ভব নয়। প্রথমেই বলছেন এটা ইন্দ্রিয় গোচর নয়, ইন্দ্রিয় গোচর না হওয়াতে আমরা জানতে পারব না। তাহলে যুক্তি দিয়ে এগুলোকে প্রমাণিত করে দিন। যুক্তিতে সমস্যা হল, আমি একটা যুক্তি দিলাম, আমার থেকে উন্নত মস্তিষ্কের আরেকজন এসে সেই যুক্তিকে খণ্ডন করে দেবেন। তখন বলবে এই যুক্তিটাই খুব ভালো। তাহলে জগতে যত শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের ব্যক্তিত্ব আছেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে এসে ফয়সালা হয়ে যাক। ফয়সালা হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু দশ বছর পর আরেকজন শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের কেউ এসে ওটাকে যুক্তি দিয়ে অন্য রকম প্রমাণিত করে দেবেন। যে জিনিসটাকে জানা যায় না, অনুভব করা যায় না, সেই জিনিসকে যদি যুক্তি দিয়ে কেউ প্রমাণিত করে দেন, যেটাকে verify করা যাবে না, সেটাকে কি করে যুক্তি দিয়ে স্থাপনা করবেন! সেইজন্য একমাত্র যেটা থেকে যায় সেটাকে বলে শ্রুতি প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণ। যে জিনিসটাকে শ্রুতি দিয়ে জানা যায় তাকে বলা হয় শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি প্রমাণেরই একটা অঙ্গ, যাকে বলা হয় ঐতিহ্য, ঐতিহ্যও একটা প্রমাণ। ঐতিহ্য মানে পরম্পরায় চলে আসছে। যেমন কেউ বলল, পুরনো পোড়ো বাড়িটাতে ভূত আছে। পরম্পরায় লোকেরা এটা শুনে আসছে, আমিও জানি, সেটা সত্যিও হতে পারে নাও হতে পারে। কিন্তু ঐতিহ্যে কথাটা চলে আসছে, তাই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু শ্রুতি প্রমাণ, যে প্রমাণ দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে জানা যায়, এটাই ধর্মের ব্যাপারে শেষ কথা। ঋষিরা

যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথা গুলোই শ্রুতি প্রমাণ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এবার যুক্তি দিয়ে বলতে পারে, ঋষিদের কথা কেন প্রমাণ হবে, ঋষিদের চালবাজিও হতে পারে। ওনারা বলেন, তা হবে না, চালবাজি বিভিন্ন কারণে হবে না। প্রথম কারণ ঋষিরা সচ্চরিত্রের ছিলেন, সাধারণ জীবনে ঋষিরা কখন মিথ্যে কথা বলতেন না। দ্বিতীয় কারণ, এনাদের কোথাও নিজস্ব কোন স্বার্থ বা লোভ ছিল না। তৃতীয় দেখার হল, ঋষিদের আশেপাশে যাঁরা সমবেত হচ্ছেন তাঁদেরও চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব শ্রেষ্ঠ। এই জিনিসগুলোকে মিলিয়ে দেখলে কোথাও কোন চালবাজির চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাবে না। এরপরেও কেউ তার মনের অবস্থা অনুযায়ী প্রশ্ন করতেই পারে। কিন্তু যাদের মানার তারা মানবে। ঠিক এই লাইনে আরেকটা এসে যায়। ঐতিহ্য প্রমাণ বা শ্রুতি প্রমাণের একটু নীচে দুটোর মাঝখানে আরেকটা জিনিস আসে তা হল, সম্প্রদায় বিদ্যা। এক একটা সম্প্রদায়ে এক একটা কথা চলে। ভক্তির সম্প্রদায়ে ভক্তির যাঁরা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ভক্তিমার্গের যাঁরা সাধু মহাত্মা ছিলেন, তাঁরা যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হয়। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও কাজ করবে না, অনুমান প্রমাণও কাজ করবে না। যেমন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবধারায় যাঁরা আছেন তাঁরা বলেন ঠাকুর এই রকম বলেছেন, ঠাকুরের কথাই শেষ কথা, এরপর আর কোন কথা চলবে না। স্বামীজী এই রকম বলেছেন বা শ্রীমা বলেছেন, এরপর আর কোন কথা চলবে না, ওখানেই শেষ, ওর পর আর তর্ক চলে না। ঠিক তেমনি ভক্তি সম্প্রদায়ে কয়েকজন আছেন যাঁদের কথা শেষ কথা। এনারাও অনেক যুক্তি নিয়ে আসছেন কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ওটাকেই মেনে নিতে হয়। আচার্য শঙ্কর গীতা উপনিষদকে শুধু যুক্তিতর্ক দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু গীতা উপনিষদ মূল গ্রন্থ, তাই যে পরম্পরার যে আচার্য যেমন যেমন বলেছেন সেই পরম্পরাতে সেটাকেই মেনে নেওয়া হয়। আমাদের আলোচনা চলছিল ভক্তি শ্রেষ্ঠ পথ। তারপর বলছেন, শুধু পথ হিসেবে শ্রেষ্ঠ তা নয়, এর শ্রেষ্ঠত্ব হল *ফলরূপত্বাৎ*, যেটাই পথ সেটাই ফল। সেইজন্য ভক্তি শ্রেষ্ঠ। এখন বলছেন –

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে।।২৮।।

নারদ এবার কিছু এমন যুক্তি নিয়ে আসছেন যে যুক্তির কথা বাকিরা বলেন। কি বলে থাকেন? অনেকে বলেন যে শুদ্ধ প্রেমের জন্য জ্ঞান দরকার। অন্যান্য জায়গায় একটা কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, জানা মানেই ভালোবাসা, ভালোবাসা মানেই জানা। নারদ এখানে যে জ্ঞান শব্দটা আনছেন, এই জ্ঞান বলতে তিনি জ্ঞানযোগকে নিচ্ছেন, এমনকি আমরা জ্ঞানকে যে অর্থে অর্থাৎ ফলরূপে নিয়ে থাকি তিনি সেই রূপেই নিচ্ছেন কিন্তু সাধারণ ভাবে নিচ্ছেন। নারদ শুধু বলে দিচ্ছেন *তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে*, ঐ যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, শুদ্ধা ভক্তি পাওয়ার জন্য জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পথ, এই রকম কেউ কেউ বলে থাকেন। এই মতটাকে স্থাপিত করার জন্য নারদ এখানে নিয়ে আসেননি, এর বিরোধিতা করার জন্যই আনা হয়েছে। যাঁরা অনেক দিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, উপনিষদের উপর আলোচনাদি শুনছেন তাঁদের সবারই ধারণা হয়ে গেছে যে জ্ঞান মানেই মুক্তি। জ্ঞান মানে নিজেকে জানা, নিজেকে জানা মানেই মুক্তি। পুরো বেদান্ত সাহিত্য এই সিদ্ধান্তের উপরই চলছে, স্বয়ংকে জানাই মুক্তি। জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি উদ্দেশ্য কেন? এনারা বলছেন, তুমি ভালো করে বিচার করে দেখ তোমার জীবন শোক-মোহ আছে কিনা, দুঃখ-কষ্ট আছে কিনা, জগতে বা সংসারে এই যে নানান রকমের জিনিস চলছে, এর থেকে তুমি বেরোতে চাইছ কিনা? যদি তুমি এসব থেকে বেরিয়ে আসতে চাও, তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে যদি নিজেকে তুমি জানতে পার। যেদিন তুমি জেনে যাবে এগুলো তুমি নও, এর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তখন তুমি নিজে থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভগবান বুদ্ধও যখন নিজের ধর্মদর্শনকে মানুষের সামনে রাখলেন, তিনিও এই একই পথ অনুসরণ করলেন। তিনিও বলছেন, জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসার পথ আছে ইত্যাদি। আচার্য শঙ্করও গীতার ভাষ্য শুরু করতে গিয়ে শোক মোহের কথা বলছেন। ভক্তিশাস্ত্র এই জায়গাতে এসে অনেক সময় আপত্তি করে। তাঁরা বলেন, শোক মোহ থাকলেই কি আমাকে এই পথে আসতে হবে, শোক মোহ না থাকলে কি আসা যাবে না? ঠাকুরও এক জায়গায় বলছেন, অনেক সময় দেখা যায় সব কিছুই আছে, সব ভালো চলছে কিন্তু মনটা কেমন ঈশ্বরের জন্য ছটফট করে। যাঁরা যুক্তিতর্ক করেন তাঁরা ঠিক এই জিনিসটাকেই নিয়ে আসেন। যিনি ভগবান বুদ্ধের নির্বাণের দিকে যেতে চাইছেন তাঁকে আগে মানতে হবে জগতে দুঃখ আছে, আর যদি উপনিষদে যে জ্ঞানের কথা আচার্য শঙ্কর বলছেন, সেই জ্ঞান

প্রাপ্তির ইচ্ছা যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে আগে ভাবতে হবে আমি এই জন্যই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাইছি যাতে আমি শোক মোহের পারে যেতে পারি। কিন্তু ভক্তি যে কেউ করতে পারে। যুক্তিতর্ক এভাবেই চলে। উত্তরাখণ্ডের সাধুরা এগুলোকে খুব জমিয়ে খুব রসিয়ে রসিয়ে বলেন। এই যুক্তির মধ্যে একটা ফাঁক রয়েছে। ঠাকুর মাছের একটা খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, পুকুরে জাল ফেলা হলে কিছু মাছ জাল মুখে করে টেনে নিয়ে যায়, কিছু মাছ পালাবার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে কিছু মাছ ঝপাং করে লাফিয়ে পালিয়ে যায় আর কিছু আছে জালের ধারে কাছেই যায় না। ঠিক তেমনি বেদান্তীরা বলেন, সব সময় যে ঠেকেই শিখবে তা কেন দেখেও শিখতে হয়। তার কারণ হল, যে কোন সুখ আজ হোক কাল হোক দুঃখ দেবেই দেবে। কিছু লোক ধাক্কা খেয়ে শিখেছে কিন্তু তুমি যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাক তাহলে অপরকে দেখে শিক্ষা নাও। কিন্তু এটা সত্যি যে জগৎ দুঃখময়, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভক্তিমার্গীরা ঠিক এই জায়গাতে এসে ধরে, আমার দেখে শেখার কোন দরকার নেই, আমার সুখের সংসার তাও আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি। যদি আমার জীবনে শুধু সুখই সুখ থাকে তাহলে কি আমার জন্য কোন ধর্ম পথ নেই? ভক্তিমার্গী বলছে, তোমার জন্য ভক্তি পথ আছে।

বিচার করে দেখলে এই সব যুক্তির কোন দাম নেই। কিছু মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভক্তি প্রবণতা থাকে, কিছু মানুষ আছে যারা স্বাভাবিক ভাবে বিচার মার্গের দিকেই যাবে। আর আজকে সে যে পথে চলছে আগামীকাল সে তার পথ পাল্টে নেবে না এরও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমেরিকার একজন সন্ন্যাসী সেখানকার বড় বড় বেদান্তীদের সঙ্গ করেছেন। ফলে তাঁর মধ্যে বেদান্তের একটা ভাব আছে। পরে তিনি ভারতবর্ষেই ছিলেন। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর আগে তিনি গোপেশ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। গোপেশ মহারাজের তখন বয়স হয়ে গেছে, ভালো করে কথাও বলতে পারেন না। উনি গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করেছেন। গোপেশ মহারাজকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। মহারাজ কিছু বলছিলেন, উনি ওনার মুখের কাছে কান নিয়ে বহু কষ্টে শোনার চেষ্টা করেন। এর কিছু দিন পরে গোপেশ মহারাজের শরীর চলে যায়। গোপেশ মহারাজ বলছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বেরিয়েছে। এছাড়া মহারাজ আর কিছু বললেন না। গোপেশ মহারাজ খুব উচ্চমানের সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তদের কাছে তাঁর বিরাট সম্মান। পরে ঐ সন্ন্যাসীর মনে কেমন একটা অন্য রকম ভাব আসে। ঠাকুরকে তিনি চিরদিনই মানতেন, কিন্তু আগে ঠাকুরকে যে ভাব নিয়ে দেখতেন সেই ভাবটা অন্য রকম ভাবে দৃঢ় হয়ে গেল। জ্ঞানমার্গীরা জগতকে একটা নাম রূপের খেলা রূপে দেখেন আর সব কিছুকে ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখেন। এগুলো মনের ভাব, কিছু লোকের মন এই রকম, কিছু লোকের মন অন্য রকম, এখানে কিছু করার নেই। যাদের মন ঐ রকম তারা জ্ঞানমার্গে যায় আর যাদের মন এই রকম তারা ভক্তিমার্গে যায়। আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, কর্ম বলে কোন পথ হয় না, কারণ কর্ম সবাইকেই করতে হয়। তেমনি যোগ বলেও কোন পথ হয় না, কারণ যোগ সবাইকেই করতে হয়।

শুরুতে বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, পথ দুটো। গঙ্গা নদী দিয়ে কেউ যদি সমুদ্রে যেতে চায় তাকে হয় এই কূল দিয়ে যেতে হবে তা নাহলে ঐ কূল দিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন কূল নেই, কূল দুটোই আছে, যে কোন একটা কূল ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যান। নৌকা নিয়ে যেতে গেলে নৌকার মোটর সবাইকেই চালাতে হবে, স্টিয়ারিং সবাইকেই ধরতে হবে, এবার আপনি গঙ্গার ডান দিক দিয়ে যাচ্ছেন, না বাম দিক দিয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনার ব্যাপার। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব এই রকম। মোটর সবাইকেই চালাতে হবে আর স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, কর্ম আর যোগ সবাইকেই করতে হয়। বাকিরা হয় জ্ঞানের পথ নেন বা ভক্তির পথ নেন। যাঁরা এই শাস্ত্র রচনা করেছেন তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের জন্য জিনিসটাকে আরও ভালো করে গুছিয়ে সুন্দর করে রেখেছেন, তা নাহলে খ্যাঁচমোচ থেকে গেলে তাদের শ্রদ্ধা উড়ে যাবে। জ্ঞানমার্গে যাঁরা যান তাঁরা বলেন আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই মুক্তি, সমগ্র উপনিষদ এই লাইন দিয়ে যাচ্ছে। গীতাতেও আচার্য শঙ্কর পরে দেখাচ্ছেন এটাই গীতার লাইন। শুধু তাই না, আমাদের ভারতীয় যত দর্শন আছে, শেষ পর্যন্ত সবাই জ্ঞানকেই মাহাত্ম্য দেয়। যেমন সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য দর্শন বলছে পুরুষ প্রকৃতি বিবেক, নানা রকম সাধনা করে, তত্ত্ব বিচার করে যখন জেনে গেল পুরুষ কোনটা প্রকৃতি কোনটা, তখন তার মুক্তি হয়ে গেল, পুরুষের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যোগেও ঠিক তাই, ধ্যান করে করে প্রকৃতি জিনিসটাকেই ফেলে দেয়, প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ভগবান বুদ্ধ অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলছেন, যার নাম অষ্টাঙ্গমার্গ। অষ্টাঙ্গমার্গের প্রথমটাই হয় সম্যক্ত জ্ঞান, তোমার জ্ঞানটা

যেন পরিষ্কার থাকে। যদি ঠিক ঠিক দেখা হয় তাহলে একমাত্র পূর্বমীমাংসা কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাছাড়া সবাই জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর ভক্তি জিনিসটা ঐ দর্শনেই কোথাও আসে না, সেইজন্য ভক্তিকে বেদান্তেরই একটা অঙ্গ রূপে নেওয়া হয়, এই জিনিসটাকেও আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করেছি। মজার ব্যাপার হল যীশুও বাইবেলে এই জ্ঞান জিনিসটাকে জোর দিয়েছিলেন। বাইবেলে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, যীশু যেখানে যেতেন সেখানে লোকেদের উপদেশ দিতেন। তিনি রাস্থায় দাঁড়িয়ে নিজের লোকেদের বলছেন, If you continue in my words then you are truly my disciples and you will know the truth, যদি তুমি আমাকে অনুসরণ কর you will know the truth এখানে knowটা হল গুরুত্বপূর্ণ, and truth will make you free, বাইবেলের খুব নামকরা কথা। মুশকিল হল ওদের ধর্মের পরম্পরা অতটা শক্তিশালী নয় বলে ওরা সেইভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি, যেভাবে হিন্দুরা এগিয়ে গেছে। খ্রীশ্চানদের হল ভগবান যীশুকে ভালোবাসলেই হবে। If you continue my words then you are truly my disciples এই জায়গাতে এসে ওদের গোঁড়ামিটা এসে যায়। আমাদের কাছে হল তুমি যে কোন অবতারকে যদি অনুসরণ কর তাতেই হবে। ভগবান যীশু বলছেন, তাহলে তুমি সত্যকে জানতে পারবে, সত্য তোমাকে মুক্ত করে দেবে। জিউসরা তখন আপত্তি করে বলছে, আমরা হলাম এ্যব্রাহামের সন্তান, আমরা কখন গোলাম ছিলাম না। জুহুদিদের ইতিহাসে আছে, ভগবান এ্যব্রাহামকে বললেন, তুমি যদি আমার কথা মান তাহলে তোমাদের আমি বিশেষ জাতি বানিয়ে দেব। তারপর ভগবান তাদের গাইড করতে লাগলেন। তার মধ্যে দেখা গেছে মোজেসের সময় তারা গোলাম ছিল, গোলাম যে ছিল তা নয়, সাধারণ ভাবে দেখা যায় এরা স্বাধীন ভাবেই ঘুরে বেরিয়েছে, গোলাম বলতে যেভাবে বোঝায় সেইভাবে গোলাম ছিল না। আর যীশুর সময় তো অবশ্যই ছিল না, যদিও তারা তখন রোমানদের ট্যাক্স দিত। কিন্তু ওটাকে সেই অর্থে গোলাম থাকা বলা যায় না, ইংরেজদের সময় ভারতবর্ষের লোকেরাও ঠিক সেই অর্থে কখনই গোলাম ছিল না, যদিও গোলাম শব্দটা ব্যবহার করা হয়। আসলে কিন্তু তা নয়, ইংরজে ভারতবর্ষ থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করত তার বদলে দেশের কিছু আইনকানুন রক্ষা করত, ভারতবর্ষ দেশ ভারতবর্ষ রূপেই ছিল। যার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যখন ভারতকেও বৃটিশদের হয়ে যুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন, গান্ধীজী তখন আপত্তি করে বললেন, আপনি আমাদের সাথে কথা না বলে, ভারতবাসীর সাথে কথা না বলে কি করে ভারতকে যুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন। ভারত যদি গোলাম হত তখন এই কথা বলা যেত না। রোম আর প্যালেস্তাইন, যেখানে যীশু ছিলেন, এদের মধ্যেও এই সম্পর্ক ছিল। রোম ট্যাক্স নিত বদলে কিছু সুবিধা দিত। জিউসরা এটাই আপত্তি করে বলছে, আমরা তো গোলাম জাতি নই, মুক্তির কথা কেন বলছেন আপনি? আমরা তো বন্ধনে নেই, যারা বন্ধনে নেই তাদের মুক্ত করার কথা আসে কোথা থেকে! এই কথা বলছে জিউসরা, কারণ তাদের মধ্যে বেদান্তের ভাব একেবারেই ছিল না। জহুদিদের ধর্মই হল ভগবানের সাথে চুক্তিবদ্ধ, covenant বলে, বলা হয় যে ওদের ৬৫৩ খানা নাকি Treaty আছে। প্রত্যেকটাতে বলা হয়, এই রকমটি যদি কর তাহলে ভগবান তোমার উপর খুশী হবেন। আমাদের এখানে আমাদের তরফ থেকে করা হয়, ওদের ভগবানের তরফ থেকে করা হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে কি রকম হয়, ভগবানকে বলি, আমি তোমাকে আগে থাকতে এই এই অর্পণ করলাম, বদলে আমার যেন এই রকমটি হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানত করা হয়, যদি আমার এই রকম হয়ে যায়, তাহলে আমি এসে দরগায় এই চাদর চড়াব বা মা কালীর মন্দিরে একটা বলি দেব। এগুলো সবই জিউস ট্রাডিশানের প্রভাব। কারণ হিন্দু ধর্মের এই ভাব নয়, ভগবানের সাথে এই ধরণের সম্পর্ক নেই, কিন্তু এসে গেছে।

বেদান্তের ভাব একেবারেই না থাকাতে ওরা truth, freedom এগুলো ওরা একেবারেই নিতে পারল না। ভগবান যীশু তখন বলছেন, কোন মানুষ যখন পাপ করে, দুষ্কর্ম করে সে তাঁর গোলাম। আর বলছেন, গোলাম কখন বাড়িতে থাকতে পারে না, কিন্তু যে রাজার ব্যাটা সে থাকে। তার মানে, তোমরা সবাই অনেক রকমের পাপ করছ। বেদান্ত মতে অবিদ্যাই পাপ, তুমি যে নিজেকে জান না, এটাই অবিদ্যা, এটাই পাপ। অবিদ্যার দরুণ তোমার মনে নানা রকমের কামনা-বাসনা আসছে। কামনা-বাসনাকে পূরণ করতে গিয়ে তোমাকে অনেক রকম কর্ম করতে হচ্ছে। ঐ কর্মের মধ্যে কখন শুভ কর্ম আসছে কখন দুষ্কর্ম আসছে। ভগবান যীশু এটাক সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভাষায় বলছেন, যারাই পাপকর্ম করে তারাই গোলাম। আর ভগবানের যে রাজমহল, তাতে কেউ যদি থাকতে চায়, সেখানে যদি অন্য কারুর দাস থাকে সে থাকতে পারবে না।

সেইজন্য আগে তোমার পাপ থেকে মুক্তি দরকার, কারণ তুমি গোলাম। এর থেকে কিভাবে তুমি মুক্তি পাবে? বলছেন, truth shall make you free, এই truth তুমি কোথা থাকে পাবে? আমাকে অনুসরণ কর, আমি যে কথাগুলো বলছি শোন, পালন কর। সাধারণ ভাবে বন্ধন বলতে আমরা যা মনে করি, এখানে বন্ধন বলতে তা নয়। বন্ধন মানে পাপ, অবিদ্যা, লোভ। এগুলোকে যারা অনুসরণ করে, এই রকম যারা করে তারা তাঁর দাস। মানুষ কাজ কখন করে? যখন কারুর দাস থাকে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যের এক জায়গায় বলছেন, যে জেনে গেল সে রাজা সে অপরের জন্য কেন কাজ করতে যাবে! যেখানে সমান সমান ভাব সেখানে কেউ কারুর কাজ করতে যাবে না। ঈশ্বরের জন্য কেউ কেন কাজ করতে যাবে যদি সে জানে তত্ত্বতঃ সে ঈশ্বরের সাথে এক! কাজ তখনই করে যখন সে জানে আমি তাঁর গোলাম, আমি তাঁর উপর নির্ভর। আগেকার দিনের মায়েরা জানত আমার খাওয়া পড়া, শোওয়া সব স্বামীর উপর নির্ভর, সেইজন্য স্বামীর সংসারের সব কাজ করত, শাশুড়ির লাথা-ঝাঁটা খেয়েও সংসারের সব কাজ করে যেত। বর্তমানের কালের মেয়েরা বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে আসছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছেলের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এখন মেয়েরা তাই বলছে আমি কেন তোমার কাজ করতে যাব, আমি কি তোমার গোলাম? ঠিকই তো বলছে সে তো গোলাম নয়। তাহলে পাপকর্ম কেন করছে? ভগবান যীশু বলছেন, পাপকর্ম তুমি এইজন্যই করছ কারণ পাপের জন্য কর্ম করছ, পাপকর্ম না, পাপের জন্য কর্ম। লোকেরা যেমন স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য কর্ম করে, এখানেও ঠিক সেই রকম মানুষ পাপের জন্য কর্ম করে। এটাই যীশু বলছেন, আমাকে অনুসরণ করলে তুমি সত্য জেনে যাবে, সত্য জেনে গেলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ এটা কোন জাগতিক বন্ধন নয়, এটা পাপের বন্ধন।

উপর থেকে নীচে এই জিনিসটাকে পুরো দেখলে, ভগবান যীশুও এই রকম কথা বলছেন, ভগবান বুদ্ধও এই রকম কথা বলছেন, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে সবাই এই একই কথা বলছেন আর মূল বেদান্তও জ্ঞানের কথাই বলছেন। ভক্তিশাস্ত্র কিন্তু এই কথা মানবেন না, তাঁরা বলছেন, কেউ কেউ জ্ঞানের কথা বলেন। কয়েকটা সূত্র পরে বলবেন কেন জ্ঞান শেষ কথা হতে পারে না। মূল কথা হল, নারদ যখন ভক্তিসূত্রে বলছেন *তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেক*, জ্ঞানই তাঁকে পাওয়ার একমাত্র পথ, তখন তিনি এই কারণেই বলছেন। কারণ সত্যিকারের দেখ যায় যে পুরো জগতে সব জায়গায় বলা হয় জ্ঞানই মুক্তি, জ্ঞানই ভালোবাসা। সেইজন্য অনেকেই বলেন যে, জ্ঞানই ঈশ্বরের ভালোবাসা বা ভক্তি বা মুক্তি পাওয়ার একটা পথ। এই কথা বলার পর আবার বলছেন –

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে।।২৯।।

আবার অনেকে মনে করেন জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞানের উপর ভক্তি আর ভক্তির উপর জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তির কথা বলছেন। ভাগবতকেও অনেক জায়গায় জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তির কথা বলা হয়েছে। ভক্তিমার্গের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানের কথা বলেন তাঁরা যে সব সময় জ্ঞানকে উড়িয়ে দেন তা নয়, তাঁরা বলেন ধর্ম বা অধ্যাত্মের কিছু মূল কথা জানা থাকলে তাতেই কাজ হয়ে যাবে। কোন এক জায়গায় একটা বড় ধর্মসভা হচ্ছিল, সেখানে সব বড় বড় বক্তারা এসেছেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁর ভাষণে বলতে শুরু করলেন ঈশ্বরকে তোমরা ভালোবাসতে শেখ, ঈশ্বরকে প্রেম করতে শেখ, তিনিই সবাইকে দেখবেন। বলতে বলতে ভাবে একেবারে গদগদ হয়ে গেছেন। সেখানে তখন এক যুবক উঠে জেনুইন প্রশ্ন করছে, যাকে আমি কোন দিন দেখিনি, যাকে আমি জানি না, চিনি না, বুঝি না, যার ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই, তাকে আমি কি করে ভালোবাসব আর কি করেই বা প্রেম করব বলুন তো? সেই সভারই আরেকজন শ্রোতা এই ঘটনাটা আরেকজন মহারাজকে এসে বলছেন, বলার পর বলছেন, আমিও আপনাকে এই প্রশ্ন করতে এসেছি। সন্ন্যাসী বক্তা যুবকের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটা কারুর কাছেই পরিষ্কার মনে হয়নি। শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলছেন, ঠাকুর কৃপা করে যদি এদের একটু অনুভূতি না দেন এরা কি করে ঈশ্বরকে ধরে থাকবে! একটা কোথাও তো মানুষের আস্থা থাকা চাই। ভক্তিশাস্ত্রে সেইজন্য বলে ঈশ্বরের ব্যাপারে অল্প একটু জ্ঞান থাকা দরকার। একেবারে কিছু না জেনেই যদি কেউ ভক্তি সাধনের পথে নেমে যায় একটু সমস্যা হবে। ঠাকুরও কোথাও বলে বেড়াচ্ছেন না যে তোমরা সবাই ঈশ্বরকে ভালোবাস, তিনিই সব দেখবেন। ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা ঠাকুর তাঁর কয়েকজন মুষ্টিমেয় খুব

উচ্চমানের ভক্তদের কাছেই বলছেন। এসব কথা খ্রীশ্চান পাদরীরা বলে বেড়ায়। আমাদের এই ধরণের কোন পরম্পরাই নেই।

আমাদের এখানে মাত্র দুটি পরম্পরা চলছে। প্রথম পরম্পরাতে বলছেন, তুমি কি খুব দুঃখ কষ্টে আছ? হ্যাঁ, খুব দুঃখে আছি, আমার একমাত্র সন্তান এমন অসুস্থ যে কিছুতেই সুস্থ করে তুলতে পারছি না, আমার স্ত্রী কাঁদছে। ডাক্তার দেখিয়েছ? হ্যাঁ দেখিয়েছি। সব থেকে ভালো ডাক্তারকে দেখিয়েছ? হ্যাঁ দেখিয়েছি। সব রকম কবচ, মাদুলি, ঝারফুক, জ্যোতিষির গণনা করা হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। তাহলে আর কি করবে, ভগবানের কাছে গিয়ে খুব করে কাঁদ, এছাড়া তো আর কিছু করার নেই। আমি এটা নিয়েই শান্তিতে আছি, তুমিও এটা নিয়েই শান্তিতে থাক। ঠিক তেমনি আরেকজন এসে বলছে, আমার টাকা-পয়সা নেই। তুমি কাজকর্ম কর। চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই কিছু আসছে না। ব্যবসা কর। তাও করেছি, যা ব্যবসা করি সবটাই ভেসে যায়। এরপর সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তোমার তো আর কিছু করার নেই? না কিছুই তো করার নেই। যাও, ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে পড়ে থাক, হওয়ার থাকলে হবে, না হওয়ার থাকলে হবে না। নরেনকেও ঠাকুর তাই বলছেন, চাকরি নেই, বাড়িতে রান্না হচ্ছে না, খাওয়া-দাওয়া নেই। ঠাকুর বলছেন, আজ শনিবার আছে যা মা কালীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা কর। আমাদের পরম্পরাতে এই একটা পথ, তোমার তো আর কোন উপায় নেই, এখন তুমি কি আর করবে, তাঁর কাছে যাও।

দ্বিতীয় পথ, পরম্পরা, আমার বংশের এই পরম্পরা। যেমন ব্রাহ্মণ পরিবার, সেখানে একজন জন্ম নিল, এরপর সে ডান দিক যাক বাম দিকেই যাক, তুমি এই বংশে জন্ম নিয়েছ তোমাকে পৈতে নিতেই হবে, কিছু করার নেই, পৈতের সময় তোমার মস্তক মুণ্ডন করতেই হবে, পৈতে হয়ে যাওয়ার পর থেকে রোজ গায়ত্রী মন্ত্র দিনে তিনবার জপ তোমাকে করতে হবে। তুমি হিন্দু বংশে জন্ম নিয়েছ তোমার বাবা মারা গেলে তাকে অগ্নি দ্বারা দাহ সংস্কার করাতে হবে, কয়েকটা দিন তোমাকে অশৌচ পালন করতে হবে, ব্রাহ্মণ এনে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করতে হবে। সমাজ থেকে যে সুবিধা সুযোগ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে তার বিনিময়ে তোমাকে এগুলো করতে হবে, এখানে কোন ছাড়াছাড়ি নেই। আমাদের ধর্ম এই দুই ভাবে চলে। কিছু কিছু জিনিস তোমাকে কর্তব্য রূপে করতে হবে, কিছু জিনিস আছে যেগুলো তুমি যখন অসহায় হয়ে যাবে তখন করতে হবে। এই দুটো করতে করতে, যেমন কথামৃতকার, মাস্টারমশাই সারা জীবন ধর্মকে কর্তব্য রূপে করে এসেছেন। আর ঐ বয়সে তিনি সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়েছেন, ঠাকুরকে দেখলেন, তাঁর কথাগুলো শুনে ভালো লাগল। যার আর কিছু নেই, সব কিছু শেষ, অসহায় হয়ে তখন ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। তাহলে ঠাকুরের কাছে কে কে আসবে? দুজন আসবে, একজন হল, যে ধর্মকে কর্তব্য বোধে করে এসেছে আর অন্যজন হল, সংসার থেকে এমন মার খেয়েছে যে তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ আর সমাধির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তৃতীয় আর কেউ আসবে না।

এই দুজন যখন কোন মহাত্মার কাছে যায় বা কারুর কাছে ঈশ্বরের কথা শুনে ভালো লাগে তখন তাদের মধ্যে আসে অনুসন্ধিৎসা। কোন আচার্য যদি ভালো আধার দেখেন তখন তিনি বলেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখ। তখনই ঐ কথা কাজে দেয়, ঈশ্বরীয় কথা যার তার জন্য নয়। সেইজন্য আগেকার দিনে উপনিষদ, বেদ যাকে তাকে বলা হত না। ঠিক এই কারণেই হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তকরণ হয় না। এনারা জানেন এরা অযোগ্য, এরা ধর্মের কথা নিতে পারবে না, শুনতে চাইবে না, বুঝবেও না। এদের যদি বলেন, যীশু তোমাকে ভালোবাসেন, ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন, এরা বলবে, নিকুচি করেছে ভালোবাসার, জীবনে আমার সমস্যার অন্ত নেই আবার এই ভগবানকে আমায় ভালোবাসতে হবে! যেখানেই ধর্মান্তকরণ করা হয় সেখানেই সমস্যা। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তকরণের কোন স্থানই নেই, কারণ ধর্ম হল হয় কর্তব্য রূপে তোমাকে করতে হবে, তুমি এই বংশে আছ এই ধর্ম তোমাকে পালন করতে হবে আর তা নাহলে অসহায় হয়ে ধর্মের দিকে আসছে। অসহায় হয়ে যারা আসে তাদের বলা হয়, তোমার তো আর কোন পথ নেই, এবার তুমি তাই ভগবানের কাছে যাও। আর যারা বাধ্যতামুলক রূপে ধর্মে আসছে তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসু হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয়, তাঁকে ভালোবাস তিনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। তাঁকে ভালোবাসতে হবে, এটা শেষ কথা। প্রথমেই কাউকে শেষ কথা দেওয়া হয় না। হিন্দু ধর্মে তাই কোন দিন প্রবচন দেওয়ার প্রথা ছিল না, এখানে ছিল কথা গান। সন্ত তুলসীদাস রামচরিতমানস লিখে দিলেন, ওটা নিয়েই বছরের পর বছর বংশ পরম্পরায় পাঠ করে যাও, ব্যাখ্যা

করে যাও, গান কর, নৃত্য কর কোন অসুবিধা নেই। শুধু নিজের কোন কথা বলতে যেও না, কারণ তুমি মুখ খুললেই আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে বেরিয়ে আসবে।

প্রথমেই বলে দিচ্ছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসত শেখ, কিন্তু বাচ্চা ছেলেটা শুনে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করছে, যাকে আমি কোন দিন দেখিনি, যাকে আমি জানি না, তাকে আমি ভালোবাসব কি করে? সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রও বলে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটু জানতে হয়। ভাগবত আদি গ্রন্থেও তাই করা হয়েছে, প্রথমে একটা পরিস্থিতি রচনা করে দিলেন, তার কি কি কষ্ট হয়েছিল, সেখান থেকে সে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল, এরপর ঐ অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার হয়েছিল, এই করে করে মনে একটা ধারণা তৈরী করে দিচ্ছেন। তার সাথে একটু মনোরঞ্জন মিশিয়ে দিচ্ছেন, ওটাই মানুষ শুনতে শুনতে এবার ঈশ্বরীয় কথায় এল। উপনিষদ এসব কিছুই করছেন না, প্রথমেই তাঁরা সরাসরি সত্যকে সামনে নিয়ে আসছেন, শুরুতেই বলে দিলেন *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, সব কিছুতে তুমি ঈশ্বরকে দেখ। ঈশ্বর কে আমি তাই জানি না, তাকে আমি দেখতে যাব কেন? সেইজন্যই তো বলা হচ্ছে এটা তোমার জন্য নয়। ঠাকুর আর নরেনের মধ্যে সমর্পণের ভাব নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই সময় একজন বলে উঠলেন, সব ত্যাগ করলে চলবে কি করে! ঠাকুর তাকে একটা কথাতেই চুপ করিয়ে দিলেন, এটা তোমার জন্য নয়। ধর্মে একটা কোন কথা নেই যেটা সবারই জন্য।

স্বামীজী প্রথমের দিকে আচার্য শঙ্করের পাত্রতা নিয়ে খুব সমালোচনা করছিলেন, পরের দিকে তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। কিছু দিন পরে দেখছেন পাত্রতা হল আধ্যাত্মিকতার প্রথম শর্ত। আমেরিকাতে স্বামীজী খুব উচ্চমানের বক্তৃতা দিচ্ছেন, মাঝখানে হঠাৎ একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলছেন, স্বামীজী! আপনি আত্মা নিয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, শুনতে খুব ভালোই লাগছে কিন্তু আমার আত্মা আমার গয়নাতেই আছে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে আছে, আমার নামযশে আছে। স্বামীজী তাকে বলছেন, অবশ্যই আপনার আত্মার ছবি ঐ গয়না, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে, নামযশে দেখতে থাকুন, হাজার হাজার জন্ম দেখার পর মন যখন ওগুলো থেকে তিতিবিরক্ত হয়ে যাবে তখন জানবেন আত্মার ঠিক পথ কোন দিকে। স্বামীজী আমেরিকাতে মাত্র চার মাস লেকচার দিলেন, সেপ্টম্বরে ধর্মসভার পর অক্টোবর থেকে লেকচার দিতে শুরু করলেন আর ফেব্রুয়ারিতে এসে লেকচার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, বললেন লেকচার দিয়ে কিছু হয় না। কারণ হিন্দু ধর্মে কখন ধর্মান্তকরণ হয় না, ধর্মের কথা কখনই পাব্লিককে বলা হয় না। ধর্মের ব্যাপার পুরোপুরি privately affair, হয় বাড়িতে খুব privately করা হয় আর তা নাহলে গুরুর কাছে privately করা হয় it is not a public affair। তখনকার দিনে গুরুর কাছে উপনিষদের শিক্ষা নিতে গেলে গুরু প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন, সব বেদ পড়া হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়েছে। যজ্ঞাদি সব করা হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। ওগুলো থেকে মন বিরক্ত হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়েছে। তাহলে এবার তুমি উপনিষদ বুঝতে পারবে। পরের দিকে এই কড়াকড়িটা একটু শিথিল করে বলে দিলেন, উপনিষদ তোমাকে বুঝতে হবে না, এখন তুমি শুধু মুখস্ত করে যাও, যখন হওয়ার তখন হবে। ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভালো। তেমনি ভক্তিশাস্ত্রেও বলে আগে একটু কিছু জানতে হয়, শুনতে হয়।

কিন্তু ওখানে গিয়েই ওনাদের জ্ঞানের পরিধিটা শেষ হয়ে যায়। এখন সেইজন্য অনেকেই জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তির কথা বলেন। কথামৃতে এক জায়গায় আছে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এসে বলছেন, জ্ঞানেরও দরকার আছে, চড়ুই পাখিগুলোকে আটার গুলি দিলাম ওরা ভয়ে পালিয়ে গেল, তারা যদি জানত এগুলো খাবার জিনিস তাহলে পালিয়ে যেত না। উপমা দিয়ে কখন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না, সিদ্ধান্তকে বোঝানর জন্য উপমাকে নিয়ে আসা হয়। অনেকের মত যে শুধু জ্ঞান দিয়েই হবে আর নাহলে ভক্তি সাধনায় একটু জ্ঞান মিশিয়ে দেওয়া দরকার। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, আমরা জানি আমাদের শরীর একটা ছন্দে কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের মন, হৃদয়, শরীরের অঙ্গ সব একসাথে একটা ছন্দে কাজ করে। কেউ যদি বলে আমি হৃদয়ে ভক্তি করব এখানে আমার বুদ্ধির কোন ভূমিকা নেই। তারপর মনে হচ্ছে, কোথায় যেন গোলমাল হচ্ছে, কেন বুদ্ধির ভূমিকা থাকবে না? আর বুদ্ধির কাজই হল জ্ঞান, তাহলে তো জ্ঞানেরও দরকার আছে। কারুর কারুর এই রকম চিন্তা ভাবনা থাকে, তাই অনেকে বলছেন, জ্ঞানেরও দরকার, ভক্তিরও দরকার।

ভক্তিশাস্ত্রের যে মত, তাতে বলেন, প্রথমের দিকে যখন ভক্তির দিকে এগোয় তখন তার ঈশ্বরের ব্যাপারে অল্প একটু জানার দরকার থাকতে পারে। কিন্তু পরে উপনিষদাদিতে যে অর্থে জ্ঞান চলে, সেই ভাবে জ্ঞানের আর কোন দরকার থাকে না। ভাগবতে নারায়ণের কথা বলতে গিয়ে বলছেন নারায়ণের ধ্যান এভাবে করবে, সেখানে তখন নারায়ণের সেই অনন্ত ভাবের বর্ণনা করে বলছেন, তিনি অনন্তের উপর শয়ন করে আছেন, একটা কাল্পনিক ভাব চোখের সামনে রচনা করে দিচ্ছেন, যেটাকে প্রতীক রূপে মানুষ ধ্যান করতে পারে। বলছেন, এরপর আর বেশি কিছু জ্ঞানের দরকার হয় না, ভেতরের ইমোশানস্ গুলোকে এবার ভক্তি সাধনায় নামিয়ে দিতে হবে। তবে শেষমেশ দেখা যায় আচার্য শঙ্করের যে ভাব সেই ভাবই দাঁড়িয়ে আছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ভাব সেই ভাবই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখন যারা মহাপ্রভুর ভাব নিয়ে চলছে তারা বলবে, এটা জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, এটা অমুক ভক্তি, এই সব বলে বলে জিনিসটাকে জটিল করে তোলেন। খুব সহজ ব্যাপার, হয় দেখবে নাম-রূপের খেলা রূপে আর তা নাহলে ঈশ্বরের রূপ, এর মধ্যে জ্ঞান কোথায় আসবে, ভক্তি কোথায় আসবে, এই দুটো ছাড়া তো কিছু নেই। কিন্তু ভক্তিসূত্রে নারদ বলছেন, এই রকম কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে জ্ঞান দ্বারাই মানুষ ভক্তি লাভ করে আবার কেউ কেউ মনে করেন জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি দিয়ে মানুষ ভক্তি লাভ করে। পরে নারদ এটাকেই খণ্ডন করবেন।

স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ।।৩০।।

এই সূত্রই ভক্তিসূত্রের প্রাণ। ভক্তির দর্শন যদি বুঝতে হয় তখন এই সূত্রকে ভালো করে বুঝে নিলেই হবে। আগের দুটো সূত্রে নারদ দেখালেন ভক্তির ব্যাপারে অন্যান্য আচার্যরা কি বলেন, কেউ বলেন জ্ঞান দ্বারাই ভক্তি লাভ হবে, কেউ বলেন জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি দিয়ে ভক্তি লাভ হয়। নারদ এখন বলছেন, ভক্তি তা নয়। বলছেন *স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ*। এই সূত্রের ব্যাখ্যাকে যিনি ভালো ভাবে বুঝে যাবেন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে ভক্তি জিনিসটা দর্শন রূপে কোথায় দাঁড়ায়, কেন দাঁড়ায় আর কিভাবে দাঁড়ায়। *ব্রহ্মকুমারঃ* মানে ব্রহ্মার সন্তান যিনি। অনেকে এখানে সনক সনকাদির নাম নিয়ে আসেন। কিন্তু নারদই ব্রহ্মকুমার। সৃষ্টির বর্ণনায় দুটো পুরাণের বর্ণনা কখন মিলবে না। কিন্তু হিন্দু বাদে যে কোন এ্যব্রাহামিক ধর্মে সৃষ্টির বর্ণনা সব সময় একই রকম করে গেছে, যেন কপি পেস্ট করা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে সৃষ্টির বর্ণনা কারুর সাথে কারুর মিলবে না। তার কারণ সৃষ্টি জিনিসটাকে কখন ব্যাখ্যা করা যায় না। নাসদীয় সূক্তে বলছেন, সৃষ্টির কথা কি করে বলবে, কারণ সেই সময় সেখানে তো কেউ ছিল না। তাঁরা সেইজন্য সৃষ্টির একটা মডেল বানিয়ে সামনে রেখে দেন। যার ফলে সৃষ্টির ব্যাখ্যা বা বর্ণনা কোনটার সাথে কোনটা মিলবে না। যে কোন পুরাণ পড়ে কেউ যদি দাঁড় করাতে যায় ব্রহ্মার পর কি হল, তার পর কি হল, কত দিন পর হল, একটু পরেই দেখবে হিসাবে মেলাতে পারছে না। যেমনি মনে হবে হিসাবটা প্রায় মিলিয়ে ফেলেছি তখন আরেকটা পুরাণ পড়লেই দেখবে সব হিসাব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। হিসাব না মেলাটাই ঠিক, তার কারণ এই জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, কি করে করেছেন, কার মাধ্যমে করেছেন, এগুলোকে কে জানবে? আমাদের বুদ্ধিতে মনে হয়, আমরা মানুষ, আমাদের নিশ্চয়ই পূর্বজরা কেউ ছিলেন, কোথাও থেকে আমাদের শুরু হয়েছে। তার আগে আমরা বানর ছিলাম নাকি অন্য কোন পশু ছিলাম এখানে নামবে না, শুরুটা ঐ জায়গাতে দাঁড়িয়ে যাবে। আর তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, সৃষ্টি ভগবান থেকে।

বিজ্ঞান আর ধর্মের লড়াই এই জায়গাতে, সৃষ্টি কোথা থেকে এসেছে, ঈশ্বর থেকে নাকি পদার্থ থেকে? যদি বিজ্ঞান মতে বলা হয় পদার্থ থেকে সব সৃষ্টি, তাহলে ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকেই সব সৃষ্টি হয়েছে। ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকেই যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে প্রথম আসবে ইউনিসেলুলার জাতীয় কিছু একটা, যেটাতে ঠিক বোঝা যায় না প্রাণ আছে কি নেই, ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাস লেভেলেই কিছু আসবে। ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়াই বিবর্তিত হয়ে হয়ে মানুষ পর্যন্ত এসেছে, তখন মনে হবে মানুষই শ্রেষ্ঠ, কোন সন্দেহ নেই। আর ধর্মের মত অনুযায়ী ঈশ্বর থেকে যদি সৃষ্টি হয় তাহলে খেলাটা পুরো ঘুরে যাবে। কারণ ভগবান যদি সৃষ্টি করতে যান তিনি ঐ ভাইরাস দিয়ে সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন না। সৃষ্টি যেখান থেকে শুরু হয়ে গেল এবার সেখান থেকে ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামতে থাকবে। প্রথম যিনি সৃষ্টিতে আসবেন তিনি একেবারে শ্রেষ্ঠ, তারপর যে আসছে সে একটু কম শ্রেষ্ঠ, সেখান থেকে যার সৃষ্টি সেটা আরেকটু কম শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল আর ওরা সবাই কিন্তু উৎসে ফেরত যেতে চাইবে। যারা বলছে বিবর্তন দিয়ে অর্থাৎ পদার্থ থেকে আসছে তারাও যেতে চাইবে উৎসে।

কোন উৎসে? তুমি মাটি থেকে এসেছ মাটিতে মিশে যাবে, মৃত্যুর পর কিছু নেই, পুড়িয়ে দিলেই ছাই হয়ে গেলে, সব খেলা শেষ। তাই তারা মাটিতে মিশে যেতে চাইবে। আর যারা বলছে আমরা ঈশ্বর থেকে এসেছি, তারা ঈশ্বরে মিলে যেতে চাইবে। কেউ মৃত্যুর পর ঈশ্বরে মিলতে চাইবে কেউ মৃত্যুর আগেই মিলতে চাইবে। যাঁরা মৃত্যুর আগে মিলতে চাইছেন তাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা মৃত্যুর পর মিলতে চাইছেন তাঁরা হয়ে গেলেন ধার্মিক পুরুষ। বিবর্তনের থিয়োরী মানেই পদার্থ থেকে ধীরে ধীরে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। যাঁরা ঈশ্বর থেকে সৃষ্টিকে নেন তাঁরা বলেন দেবতা থেকে ধীরে ধীরে প্রাণী এসেছে। এই দুটো মডেলে যে সব পৌরাণিক কাহিনী এসেছে এগুলোকে বেশি আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যায় না। যাতে মানুষ এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে না নেয় সেইজন্য ওনারা পুরাণের এক একটা সব আলাদা আলাদা নাম ঢুকিয়ে দিয়ে আরও সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। প্রথমের দিকে আমাদের অযৌক্তিকই মনে হত, কিন্তু এখন দেখছি এর মধ্যে সব সাংঘাতিক যুক্তি লেগে আছে, এগুলোই ঠিক ঠিক যুক্তি। ঈশ্বরের কাজ কি কখন বোঝা যাবে, ঈশ্বর কি একটা মানুষ যে তাঁর একজন স্ত্রী থাকবে, তাঁর সন্তান হবে? এই ধরণের প্রশ্ন বাচ্চারা করে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে শিবের বাবা কে? এর কি উত্তর দেবে, যারা এই ধরণের প্রশ্ন করে তাদের কাছে আধ্যাত্মিকতার কোন ধারণাই নেই। তারা মনে করছে শিব বলে একজন কেউ আছেন, মানুষের মতই কেউ হবেন, তাঁরও কেউ বাবা হবেন। তাকে যদি বলা হয় শিব স্বয়ম্ভূ, সে কিছুই বুঝতে পারবে না। কারণ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জন্য নয়। ঠিক তেমনি আদম ঈভের যে আইডিয়া এগুলো সব বাল সুলভ আইডিয়া, উচ্চ যে আইডিয়া গুলো রয়েছে সেগুলো ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্মেই আছে, যেগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভাগবতে একটা জায়গায় নারদকে প্রজাপতি বলছেন, নারদকে প্রজাপতি বলার জন্য তাঁকে ব্রহ্মকুমার বলা হয়। আবার অন্য কোন পুরাণে বলে নারদ পৌত্র, এগুলো কোনটাই কোনটার সাথে মিলবে না। নারদ ভক্তিসূত্রের যিনি নারদ, তিনি নিজেকে ব্রহ্মকুমার বলছেন। ব্রহ্মকুমার মানে, ব্রহ্মার সাথেই তিনি নিজেকে জুড়ে রেখেছেন, ব্রহ্মা ছাড়া আর কারুর সাথে তিনি জুড়বেন না। ভাগবতেই আবার নারদকে দাসী পুত্র রূপে দেখানো হয়েছে, তবে এরও কোন দাম নেই। উনি নিজেকে যাঁর সাথে জুড়ে রেখেছেন, আমাদের সেটাকে মেনেই চলতে হবে। আমাদের যেমন বাবা-মা আছেন, বাবা-মা থাকলে ঠাকুরমা ঠাকুরদা হবে, কিন্তু ওর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের সম্পর্ক হল ঠাকুরের পরম্পরার সাথে। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষা করতে করতে কপিলাবস্তুতে যখন ফিরে গিলেন তখন তাঁর বাবা শুদ্ধধন কায়দা করে ভগবান বুদ্ধের ছেলে রাহুলকে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। রাহুল গিয়ে ভগবান বুদ্ধকে বলছে, বাবা! আমি যে পরম্পরার আমাকে সেই উত্তরাধিকার দিন। শুদ্ধধন বুদ্ধকে কোন দিন সন্ন্যাসী বলে মানলেন না, গৃহস্থ মানুষ সংসারী বুদ্ধিতে নাতিকে এগিয়ে দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে রাহুলকে একটা ভিক্ষা পাত্র হাতে ধরিয়ে দিলেন আর বললেন, এটাই তোমার উত্তরাধিকার, আমি এটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, এটাই তোমাকে দিলাম। পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে গেল সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীদের জন্ম নিতে হয়েছে তাই একজন বাবা-মার ঘরে জন্ম নিয়েছেন, কাকের বাসায় কোকিল তো বড় হয়েই থাকে। সন্ন্যাসীদের পরম্পরা ঠাকুরের সাথে জুড়ে আছে, নারদও ঠিক সেই রকম। নারদের বাবা-মা যিনিই হয়ে থাকুন, তাঁদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই, সম্পর্ক রয়েছে ব্রহ্মার পরম্পরায়। নারদ ব্রহ্মার সন্তান ছাড়া অন্য কারুর সন্তান বলে নিজেকে মানবেন না। উত্তরাখণ্ডে সাধু সন্ন্যাসীদের পরিচয় গুরুর নামেই হয়, তাঁদের আই কার্ডেও গুরুর নাম দেওয়া থাকে।

ব্রহ্মকুমার নারদ কি বলছেন? বলছেন এই মতগুলো নেওয়া যাবে না। কেন নেওয়া যাবে না? কারণ *স্বয়ং ফলরূপতা ইতি*, ভক্তি নিজের মধ্যেই একটা ফল। এর আগেও আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টা এসেছিল, যেখানে আলোচনা করা হয়েছিল যে ভক্তি একটা ফল। জগতে কার্য কারণের সম্পর্ক আছে, আমরাও সব কিছুকে কার্য কারণ রূপে দেখি। আমাদের সব সময় মনে হয়, এটার ফল ওটা, ওটার ফল এটা। ধর্ম পথে আমরা যতই এগিয়ে যাই না কেন, একটা আধ্যাত্মিক বোধ যতক্ষণ না জাগে এই জিনিসটাকে আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো পড়লে আমাদের মনে হবে সব বুঝতে পারছি। কারণ ঠাকুর কোন জটিল বিষয় আনছেন না। এই কারণে স্বামীজীর রচনাবলী আমরা বুঝতে পারি না। কারণ সেখানে দর্শনের যে সূক্ষ্ম জটিল বিষয় গুলো আছে, সেগুলোকে আলোচনা করছেন। স্বামীজীর রচনাবলীতে কার্য কারণকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। প্রথমের দিকে যারাই পড়বেন তারা কিছুই মেলাতে পারবে না। শুনতে

শুনতে আর আধ্যাত্মিকতার একটা পরিপক্কতা এলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। আমরা যত শাস্ত্রই পড়ি, যতই সাধুসঙ্গ করি, যত যাই করি না কেন, কার্য কারণ সম্পর্ক থেকে আমরা কোন দিন বেরিয়ে আসতে পারব না। এখন যাঁরা আচার্য, তাঁরা জ্ঞানমার্গেরই হন আর ভক্তিমার্গেরই হন, এনারা নানান রকমের উপমা নেন, নানান রকমের যুক্তি নিয়ে আসেন, কিন্তু কার্য কারণের বাইরে যে কিছু আছে এটা মাথাতে কিছুতেই আসে না। ভক্তিতে যেটা সব থেকে বড় যুক্তি দেওয়া হয় তাতে বলছেন, পরম্পরাতে ঋষিরা যে কথা বলেছেন সেই কথাটাই ঠিক, অন্য বেশি যুক্তিতে যাওয়া যায় না। একেবারে প্রথমের দিকে আমাদের আলোচনায় এসেছিল, ভক্তির পরম্পরাতে নারদকে একজন শ্রেষ্ঠতম আচার্য বলে মানা হয়, যিনি দেবর্ষি আর সব জায়গায় তিনি বীণা বাজিয়ে গান করছেন। ভক্তির শ্রেষ্ঠতম আচার্য কি বলছেন? জ্ঞান কখনই ভক্তিকে জন্ম দেয় না, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিও কখন ভক্তিকে জন্ম দেয় না। এই কথাকে আমরা কেন মেনে নেব? কারণ এই কথা ব্রহ্মকুমার বলছেন। তবে তিনি যে কোন যুক্তি দিচ্ছেন না তা নয়, একটা ছোট্ট যুক্তিও দিচ্ছেন। প্রধান যুক্তি হল, নারদ বলে দিয়েছেন, এরপর আর কিছু চলবে না। মা বলে দিয়েছেন ও তোর দাদা, ছেলে জানে ওই আমার দাদা। মা বলেছে ঐ ঘরে জুজু আছে, বাচ্চা জানে জুজু আছে। নারদ বলে দিয়েছেন ভক্তি কোন কিছুর ফল নয়, তাই ভক্তি কোন কিছুর ফল নয়।

কিন্তু বাচ্চা ছেলেও পাঁচটা প্রশ্ন করে, আমাদের মনেও এখানে পাঁচটা প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্নের উত্তরে বলছেন *স্বয়ং ফলরূপতা*। ভক্তিশাস্ত্রের এটাই প্রধান যুক্তি। এই একই যুক্তি উপনিষদেও আচার্য শঙ্কর নিচ্ছেন। কিন্তু শাস্ত্র হিসাবে উপনিষদ, গীতার একেই খুব নাম, তার উপর আচার্য শঙ্করের মত ব্যক্তিত্ব তুখোড় যুক্তি দিচ্ছেন বলে ওর দাম বেশি। কিন্তু উপনিষদ গীতার ভাষ্যের খুব গভীরে যদি যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে আচার্য শঙ্করের আসল যুক্তি এটাকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক করছে, সেটা হল *স্বয়ং ফলরূপতা ইতি*। আচার্যও বলছেন, জ্ঞানই ফল, জ্ঞান হয়ে যাওয়া মানেই মুক্তি। একজন লোকের গলাতে নেকলেস আছে, হঠাৎ তার মনে হল নেকলেসটা হারিয়ে গেছে। লোকটি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোন দিনই খুঁজে পাবে না। একজন এসে তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, দেখতো নেকলেসটা এখানে আছে কিনা। আয়নার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে দেখছে, আরে নেকলেসটা তো গলাতেই আছে। তাহলে নেকলেস কোথায় পাওয়া গেল? কোথাও পাওয়া যায়নি, গলাতেই ছিল, গলাতেই আছে। ঠিক তেমনি জ্ঞান সব সময় সাথে সাথেই আছে। সাধনা করা মানে আয়নাটা সামনে নিয়ে আসা। তখন দেখছে আরে! আমিই তো সেই। তখন তার সব দৌড়াদৌড়ি, লম্ফঝম্ফ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যে উন্মত্তের মত চারিদিকে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা বন্ধ হয়ে যায়। কখন বন্ধ হয়? যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায়। তাহলে ঐ জ্ঞান কিভাবে আসে? যেমনি শাস্ত্র পড়তে যাচ্ছে তখন হাজার রকম পথের কথা চলে আসে। স্বামীজী যেমন বলছেন, কর্ম দিয়ে, যোগ দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে যে পথেই যাও ঐ জিনিসটাকে জানো। তাহলে হয় কোনটা দিয়ে? আচার্য শঙ্কর বার বার বলবেন, মুক্তি মানেই জ্ঞান, জ্ঞান মানেই জ্ঞান, তাছাড়া আর কিছু না। জিনিসটাকে জানা মানেই জ্ঞান। যেটাই সাধন সেটাই সিদ্ধি, যেটাই কার্য সেটাই কারণ আর যেটাই বৃক্ষ সেটাই ফল। জ্ঞানই সাধন জ্ঞানই সিদ্ধি, জ্ঞানটাই বৃক্ষ জ্ঞানটাই ফল। *স্বয়ং ফলরূপতা*, ও নিজেই ফল, ওর আর কোন ফল নেই।

এখানে সাধারণ ভক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন না, পরা ভক্তির কথা বলছেন, পরা ভক্তিতে পরা ভক্তিটাই ফল, সাধনা এরই হয় আর ফলটাও এই হয়। সেইজন্য ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? এই জায়গাতে খুব সূক্ষ্ম যুক্তি ঢুকে আছে, যুক্তিটা খুব সূক্ষ্ম কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিটা হল, তুমি যে বলছ কর্ম দিয়ে ভক্তি হয়, তুমি বলছ জ্ঞান দিয়ে ভক্তি হয়, তুমি বলছ এই বিধি নিষেধ পালন করলে ভক্তি হয়, তুমি বলছ জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তিতে ভক্তি হয়, কি করে হবে? যে জিনিসটা *স্বয়ং ফলরূপতা*, যেটা নিজেই ফল। তার মানে যেটাই কার্য সেটাই কারণ, তাহলে তার জন্য আরেকটা কার্য কোথা থেকে নিয়ে আসার দরকার পড়বে? তুমি বলছ কর্ম দিয়ে ভক্তি হয়, আরে বাবা আগের আগের ঋষিরা বলে দিচ্ছেন, পরা ভক্তি নিজের মতই একটা কার্য আর নিজের মতই একটা কারণ। *স্বয়ং ফলরূপতা*, শব্দটা হল স্বয়ং, তিনি নিজেই ফল। যিনি বাবা তিনি ছেলে কোথাও তো এই রকম কথা শোনা যায় না। যেটাই বৃক্ষ সেটাই ফল কি কখন হয়? কখনই হয় না। সেইজন্য স্বয়ং ফল এই জিনিসটা আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। পরা ভক্তি সাধন করলে কি পাওয়া যাবে? পরা ভক্তি। যদি কেউ সবার মধ্যে ঈশ্বর দেখার সাধনা করে, তার ফল রূপে কি হবে? সবার মধ্যে ঈশ্বরকেই

দেখবে, নতুন করে কিছু দেখবে না। আমি যদি রান্নাবান্না করি তার ফল কি হবে? খাওয়া হবে। রান্নাবান্নার ফল রান্নাবান্না হবে না, ফল হবে খাওয়া। ওখানে কার্য কারণ সম্পর্ক লেগে আছে। মানুষ যখনই কোন কাজ করছে তখন সেখানে তার নতুন একটা ফলের আশা থাকে। মানুষ বিবাহ কেন করে? জীবনের একটা নিরাপত্তা হবে, একটা সন্তান হবে। একটা কার্য করলে তার ফল অনেক রকমের বেরোবে। কিন্তু যখন কেউ ভক্তি করছে, মানে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন, তার ফল কি হবে? সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনই করবে, নতুন কোন ফল হবে না। কোন জিনিস যদি *স্বয়ং ফলরূপতা* হয়, সেখানে কক্ষণ কোন কারণ থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে বইতে, ম্যগাজিনে love for love sake, work for work sake এই কথাগুলো আসে। বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করে থাকি। আমার উদ্দেশ্য বিদ্যা অর্জন করা, বিদ্যা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানতে চাই না। যারা ধর্ম জগতে আছেন তাঁদের জন্য এটা আলাদা ইস্যু, তাঁরা বলবেন আমি একটা ভালো জীবন চাইছি, আমি ভালো পুনর্জন্ম চাইছি। আমরা তা বলছি না, আমি বিদ্যা অর্জন করতে চাইছি। বিদ্যা অর্জনের ফল কি হবে? বিদ্যা অর্জন হবে।

কার্য আর কারণ এক না হওয়া পর্যন্ত জীবনে শান্তি আসবে না। তা নাহলে শান্তিকে সব সময় খুঁজে বেড়াতে হবে। কোথায় খুঁজবে? একটা কোন কারণে, আর তার ফল হবে শান্তি। সবাই কাজ করছে, একটা কাজ শেষ হচ্ছে, আরেকটা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কাজের ফলটা হল শান্তি। এভাবে কোন দিন শান্তি হবে না। কার্য কারণ এক না হওয়া পর্যন্ত কোন পরিস্থিতিতে ঐ জিনিসটা শ্রেষ্ঠ হবে না। নারদ এই যুক্তিটাই এখানে নিচ্ছেন। ভক্তি নিজেই ফল, স্বয়ং ফল মানে কোন কার্যের জন্য ফল হয় না। তাহলে কর্মের ফল ভক্তি, জ্ঞানের ফল ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তির ফল ভক্তি এগুলো কোথা থেকে আসবে? খুব সহজ যুক্তি, কিন্তু যতটা সহজ মনে করছি ততটা সহজ নয়। কারণ একটা এই ছোট্ট যুক্তি ভক্তিকে সবার থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। ভক্তির ফল অন্য কোন কিছু হয় না, সেইজন্য ভক্তি কোন কারণ নয়। আর ভক্তি কোন কিছু দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্য ভক্তি কোন কিছুর ফল হতে পারে না। ভক্তি তাই স্বয়ং ফল। জ্ঞানও স্বয়ং ফল, ওনারা যে মুক্তির কথা বলেন তাতে বলেন মুক্তি হল incidental জ্ঞানের সাথে মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। যার নেকলেস হারিয়ে গিয়েছিল সে পেয়ে গেল, পেয়ে গেল মানেটা কি, নেকলেস তো তার গলাতেই ছিল। জ্ঞান আর ভক্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে একটা ফল বেরোয়, কর্মের ক্ষেত্রে একটা ফল হয়, যোগের ক্ষেত্রেও একটা ফল বেরোয়। আবার বৈধী ভক্তিতে একটা ফল আসে, জ্ঞানযোগ পালন করলে একটা ফল হবে, এগুলো তাই সব সময় নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ একমাত্র সেটাই যেটাতে কার্য আর কারণ এক, আলাদা হলে নিকৃষ্ট। জ্ঞান দিয়ে ভক্তি হয়, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি দিয়ে ভক্তি, এত জপতপ করলে ভক্তি হয়, সব ফালতু, পরস্পর বিরোধী কথা।

ঋষিরা, আচার্যরা এই কথা বলে গেছেন। উপনিষদে বলছেন *ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচক্ষিরে*, ধীর পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষদের কাছে আমরা এটাই শুনেছি, বিচক্ষণ পুরুষরা এই কথা বলে গেছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও ঋষিদের কথা এনে বলছেন, ঋষিদের পরম্পরাতে আমরা এই কথা শুনে এসেছি। নারদ এটাই বলছেন, ব্রহ্মকুমার দিয়ে নিজের পরম্পরা জানিয়ে দিয়ে বলছেন, ভক্তি স্বয়ং ফলরূপতা পরম্পরাতে আমি এটাই জেনে এসেছি, যেটা স্বয়ং ফল সেখানে অন্যান্য জিনিস কোথা থেকে আসবে! আসলে যে কোন সাধনে, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সবেতেই আমিত্বের নাশ হয়। কাঁচা আমি, যার কথা ঠাকুর বলছেন, যে আমি জগতের সাথে আমাকে বেঁধে রেখেছে, এই কাঁচা আমির যখন নাশ হয় তখন পাকা আমি নিজে থেকেই ঢুকে পড়ে। এর আগে আমরা হল্যাণ্ডের সমুদ্রের কথা বলছিলাম, হল্যাণ্ডের সমুদ্রে যে বাঁধ দেওয়া আছে এই বাঁধ হল কাঁচা আমি। বাঁধকে যেই ভেঙে দেওয়া হল তখন তৎ *স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ*, নিজে থেকেই সব ভাসিয়ে দেয়। বাকি জিনিসগুলো অহঙ্কারের নাশ করছে কিন্তু পরা ভক্তি কোন অহঙ্কারের নাশ করে না। তখন বলছেন, যখনই অহঙ্কারের অহং নাশ হয়, অর্থাৎ যখন ফল আসে, তাই না, জগতে যত রকম ফল পাওয়া যাত দেখা যায় যে কোন ফলই চিরস্থায়ী হয় না। দ্বিতীয় সময়ের সাথে ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু পরা ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কখন ক্ষীণ হয় না। আর ঈশ্বরের জ্ঞানেরও কখন ক্ষয় হয় না। একবার যাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেছে, কখনই দেখা যাবে না যে তাঁর ঈশ্বরের জ্ঞানটা হারিয়ে গেছে বা ঈশ্বরের জ্ঞানটা কমে গেছে। কেন কমে যাবে না? কারণ ঈশ্বর জ্ঞানে সবাই পূর্ণ, কিন্তু ঐ পূর্ণের উপর একটা আবরণ দেওয়া আছে, যেটাকে আমরা কাঁচা আমি বলছি। কাঁচা আমির আবরণ সরে গেলে পূর্ণের সাথে পূর্ণ এক হয়ে যায়, তখন আলাদা আর কিছু থাকে না।

তাই এনারা বলছেন, ঈশ্বরীয় ব্যাপারে কোন চেষ্টাই কোন কাজে দেয় না, প্রত্যেক চেষ্টার পেছনে থাকে নিজের অহঙ্কারকে মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তাতে আসল জিনিসটা কখন হয় না, আসল জিনিসটা ঈশ্বরীয় কৃপা ছাড়া হয় না। কঠোপনিষদে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে*, ঐ জ্ঞান কাকে বরণ করে, যার ঐ কাঁচা আমিটা নেই। চেষ্টা আর ঈশ্বরীয় কৃপার একটা খুব সুন্দর উপমা দেন, সমুদ্রে হিল্লোল কল্লোল হচ্ছে, একটা মানুষ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন যেমন সমুদ্রের দিকে সে এগোতে থাকে তেমন তেমন সমুদ্রের আওয়াজ আরও জোরে এবং আরও স্পষ্ট শুনতে থাকে। হাটার সাথে সমুদ্রের আওয়াজের কি সম্পর্ক? কোন সম্পর্কই নেই। আমি মনে করছি, আমি হেটেছি বলে সমুদ্রের আওয়াজ হচ্ছে। সমুদ্রের আওয়াজ সব সময়ই আছে, সমুদ্রের দিকে যত আমি হেটে এগিয়ে যাচ্ছি তত আওয়াজ জোরে শুনতে পাচ্ছি। জিনিসটা সব সময় ওখানেই ছিল। আমাদের মধ্যেই জ্ঞান, ভক্তি সব সময়ই আছে। যত আমরা চেষ্টা করছি তত জ্ঞান ভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে, নতুন করে কিছু হচ্ছে না। সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল সব সময়ই আছে, যে ঐদিকে যাবে সে শুনতে পারবে, যে যাবে না সে শুনতে পারবে না। যারা কাঁচা মনের তাদের মনে হয় যেমন যেমন এগোচ্ছি তেমন তেমন আওয়াজ যেন বাড়ছে। আমাদের জন্য সমুদ্রের কিছুই হচ্ছে না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি বলে সমুদ্রের আওয়াজ বাড়ছে না, সমুদ্রের আওয়াজ নিজের মত সমান ভাবে হয়ে যাচ্ছে। আমি যত ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি মনে করছি তিনি এখন বেশি কৃপা করছেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা কখনই বাড়ে বা কমে না, ঈশ্বরের কৃপা তেমনই থাকে, বাধক গুলো সরে যাচ্ছে।

তবে ঈশ্বরের কৃপা আর নিজের চেষ্টা, এই দুটোর একটা সংযোগ রয়েছে, কারণ একটা হলে স্বাভাবিক ভাবে অন্যটাও হয়, অন্য দিকে এই দুটো গুণগত দিক দিয়ে আলাদা। গুণগত ভাবে আলাদা এই জন্য, চেষ্টা যা কিছু হয়ে সব এই জগতের আর তার ফল যা কিছু হয় সব ঈশ্বরীয় কৃপা রূপে আসে, যার সাথে জগতের কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য আমাদের আগের আগের আচার্যরা আর বর্তমান আচার্যরা এগুলোকে বিভিন্ন ভাবে বলেন, চেষ্টা কর, ঈশ্বরের নাম নাও ইত্যাদি। কিন্তু এসব করলেই যে ঈশ্বরের কৃপা হবে তা নয়, ঈশ্বরীয় কৃপা সব সময়ই আছে কিন্তু নিজের মত চলে আর নিজের মতই হয়। একটা শুধু আছে তা হল বাধক, কিন্তু বাধকের সাথে ঈশ্বরীয় কৃপার কোন সম্পর্ক নেই। সমুদ্রে বাঁধ দেওয়া আছে, সমুদ্র আর বাঁধের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, বাঁধটা একটা কৃত্রিম জিনিস। সেইজন্য উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষরা দুটো জিনিসকে কখনই মেলান না, তাঁরা বলেন ঈশ্বরের কৃপা হলেই হবে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান মানুষের মধ্যে সব সময়ই আছে। যে প্রতিবন্ধকতার জন্য জ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে না সেই প্রতিবন্ধকগুলো কৃত্রিম, ওর সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য বলা হয়, চেষ্টা কর প্রতিবন্ধক চলে যাবে। চলে যায় ঠিকই কিন্তু চেষ্টার সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য সমুদ্রের উপমা নেওয়া হয়, সমুদ্রের দিকে যে যেত এগিয়ে যায় সে তত সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল শুনতে পায়। মূল কথা এটাই, ঈশ্বরীয় ভাব কোন জিনিসের ফল নয়, কোন জিনিসের কারণ না, *স্বয়ং ফলরূপতা*।

দুটো নিয়ম যদি মনে রাখা হয় তাহলে এই জগতকে বুঝতে বেশি সমস্যা হবে না। যে কোন সমস্যার সমাধান দু ভাবে হতে পারে। একটা বস্তুর ভেতরেই সমাধান আর দ্বিতীয় বস্তুর বাইরে থেকে সমাধান। এমন কোন সমাধান যদি পাওয়া যায় যে, সমাধান ঐ বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাবে তখন সেই সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। আর তার বিপরীত বস্তুর বাইরে সমাধান থাকতেও পারে কিন্তু কখনই শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে না। এটা কেন হয়, কেন হয় না এই নিয়ে বিরাট আলোচনা চলতে থাকে। আমাদের সবারই জীবনে এত সমস্যা, এত কষ্ট কেন? এর কারণ দু ভাবে দেখা যেতে পারে। একটা ভাবা যে আমিই সেই কষ্টের মূলে, আমারই কিছু দোষ ত্রুটির জন্য আমার এত দুঃখ কষ্ট আসছে। মা সব সময় ভাবে আমি আর আমার সন্তান এক, সন্তানের যদি কিছু খারাপ হয় তখন মা ভাবে আমার দোষেই হয়েছে বা এটাও ভাবে আমি ভালো করলে আমার সন্তানের ভালো হবে। সেইজন্য মায়েরা নানান রকমের ব্রত পালন করছে, উপোস করছে। স্বামীকেও সে নিজের সাথে এক ভাবছে, তার জন্যও অনেক কিছু করে, কারণ সে মনে করছে এখান থেকেই সমাধান আসবে। এখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবছে, আমার যে দুঃখ, কষ্ট, ঝামেলা আমি মনে করছি ভগবান আমাকে দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন, মনে করছি অমুক আমাকে কোন তান্ত্রিককে দিয়ে বাণ মারিয়েছে, ভূত প্রেতের উপদ্রবে হচ্ছে, গ্রহের ফেরে হচ্ছে ইত্যাদি। ভূত প্রেতের উপদ্রবেও হতে পারে, গ্রহের ফেরেও হতে পারে, কেউ বাণ মেরেও থাকতে পারে, কিন্তু আরেকটা কারণে হতে পারে, আমার নিজের কর্মের দোষে আজ আমার

এই দুর্গতি। এর মধ্যে কোনটা ঠিক? এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সমাধান বস্তুর ভেতর থেকে আসছে সেই সমাধান সব সময় শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। যদি ভেতর থেকে কোন সমাধান না আসে তবেই বাইরে থেকে সমাধান খুঁজতে হবে। এটা গেল প্রথম একটা মৌলিক নিয়ম।

দ্বিতীয় আরেকটি মৌলিক নিয়ম হল যদি ক্রিয়া আর ফল এক হয় সেটা সব সময় শ্রেষ্ঠ হবে। যে কোন কাজ মানুষ একটা আশা নিয়েই করে, কাজ করলে কাজের একটা ফল আমি পাব। ক্রিয়া হলে তার একটা ফল হবে, এটাই স্বাভাবিক। ক্রিয়ার ফলকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল যে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাই যখন ফল হয়। এর থেকে এক ধাপ নীচে হল, ক্রিয়া করছি তার একটা ফল হবে, ফল ভালো মন্দ যাই হোক তার দিকে দৃষ্টি নেই, এখানে ক্রিয়া আর ফল আলাদা। তৃতীয় ধাপে, ক্রিয়া করছি সাথে সাথে সেই ক্রিয়ার ফলের আশাও করছি বা কোন ফলের জন্যই ক্রিয়া করা। চতুর্থ ধাপে আসে, কোন ক্রিয়াই করছে না কিন্তু ফলের আশা করে যাচ্ছে। অধম যারা তারা এই চতুর্থ শ্রেনীতে থাকে, কাজ করবে না কিন্তু ফল পেতে চাইছে। এদের থেকে উপরে যারা তারা সকাম কর্ম করে, জীবনে অনেক চাহিদা আছে, কাজ করলে চাহিদার পূরণ করতে পারব। তার উপরে আসে নিষ্কাম কর্ম, আমাকে কাজ করতে হবে করে যাব, ফল ভগবানের ইচ্ছায় হলে হবে, না হলে না হবে ফলের জন্য আমি ভাবছি না। নিষ্কাম কর্ম থেকেও উপরে হল যখন ক্রিয়াই ফল হয়। যে কোন কাজ যদি এমন ভাবে করা হয় যে ক্রিয়াটাই একটা ফল, তাহলে বুঝতে হবে সে ঐ জিনিসটার সিদ্ধির অবস্থায় চলে এসেছে। স্বামীজী বলছেন, আমি হিমালয়কে ভালোবাসি, হিমালয় আমাকে কিছু দেয় না কিন্তু আমি ভালোবাসি। এই যে হিমালয়ের দিকে তাকানো, হিমালয়কে ভালোবাসা এটা ক্রিয়া, এই ক্রিয়ার ফল কি? ভালোবাসাটাই ফল। হিমালয়কে ভালোবাসছি এটা ক্রিয়া আর ভালোবাসা এটাই ফল। অনেকেই প্রচুর বই পড়েন, যদি জিজ্ঞেস করা হয় এত বই পড়ে তোমার কি হবে? কিছুই হবে না, বই পড়তে ভালোবাসি তাই পড়ছি। বই পড়ার ফল কি? বই পড়াটাই আমার ফল। মা তার ছোট্ট সন্তানকে ভালোবাসছে, এই আশায় ভালোবাসছে না যে, ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে, আমার জন্য কান্নাকাটি করবে, বড় হয়ে আমার দেখাশোনা করবে। সন্তানকে মা যে ভালোবাসছে, এই ভালোবাসাটাই ক্রিয়া, এই ক্রিয়ার ফলও ভালোবাসা। এই যে ফলরূপতা, যে ফল পাওয়া যাচ্ছে, সেই ফলটা যখন স্বয়ং হয়ে যায়, ক্রিয়াটাই যখন ফল হয়ে যায়, এটাই সব সময় শ্রেষ্ঠতম। গীতাতেও যেখানে বলছেন *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, সেখানেও এখান থেকে আরেক ধাপ নেমে আসছেন, কিন্তু যখন বলছেন *নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি*, জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমার পাওয়ার আছে, জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমি পেতে চাইছি, তা সত্ত্বেও আমি কাজ করি, ক্রিয়াটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফল।

উপনিষদে যে জ্ঞান সাধনার কথা বলছেন, জ্ঞান সাধনার ক্রিয়াটাই ফল। জ্ঞান সাধনায় দেখছি আত্মাই আছেন, আর যা কিছু দেখছি সব আত্মার উপরে নাম আর রূপের খেলা। সিদ্ধি হয়ে গেলে তখন এই একই জিনিস দেখে, আলাদা কিছু দেখে না। ভক্তিমার্গের সাধক দেখছে আমার ইষ্টই সব কিছু হয়েছেন, সিদ্ধি হয়ে গেলে তখনও একই জিনিস দেখে। জ্ঞান ও ভক্তিতে যেটা সাধনা সেটাই সিদ্ধি। শুধু আধ্যাত্মিক সাধনাতেই নয়, জাগতিক কর্মেও এটাই তখন হয়ে যায় Test of Truth। ভক্তিশাস্ত্র ভক্তি কেন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য এই যুক্তিকেই ব্যবহার করছে। আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন কর্মযোগে মন শুদ্ধ হয়, রাজযোগেও মন শুদ্ধ হয়, কিন্তু কর্মযোগের ফল আলাদা, রাজযোগের ফল আলাদা। ভক্তিসূত্রে নারদ জ্ঞানযোগকেও যে নিম্ন বলছেন এই কারণে তিনি জ্ঞানকে কোথাও বিচারের সাথে তুলনা করছেন। প্রথম কথা হল, উপনিষদে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেই জ্ঞানের সাথে তুলনা করবেন না। দ্বিতীয় হল, এনারা বলেন আমার ব্যক্তি সত্তা যদি ব্রহ্মে হারিয়েই যায় তাহলে আমার আর লাভটা কি হল। ঐ বোধ, আমি ঈশ্বরের ভালোবাসার রস আস্বাদন করতে পারছি, ভক্তিতে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই জিনিসটাকেই আরও বিস্তার করে বলছেন –

রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ।।৩১।।

এখানে প্রথম শব্দ *রাজ*, দ্বিতীয় শব্দ *গৃহ* আর তৃতীয় শব্দ *ভোজন*। রাজার ব্যাপারে পরম্পরাতে একটা কাহিনী আছে। একজন রাজকুমার ছোটবেলায় কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে জঙ্গলে এক মুনি মুনির মতই বড় করেছেন। একদিন সে জানতে পারে সে রাজকুমার। রাজকুমার নিজেকে জানতে পারার পর সে রাজা হয়ে

গেল। আমি রাজকুমার, জানার পর সে হয়ে গেল রাজা। এর মধ্যে পরিবর্তনটা কি হল? কোন পরিবর্তনই হয়নি, সে তো প্রথম থেকেই রাজকুমার ছিল, কোন কারণে ঐ জ্ঞানটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হওয়াতে তার কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি, রাজা সে আগেই ছিল, এখন রাজাই হল। অথচ অন্য দিক থেকে দেখলে তার সব কিছুই পরিবর্তন হয়ে গেল। ভক্তিশাস্ত্রে ঠিক এই উপমাটাই নেওয়া হয়। ফলরূপতা কেন শ্রেষ্ঠ? ক্রিয়া যেটা হয় সেটা আগেই ছিল আর সেটাই আবার হয়েছে। কোন ক্রিয়ার জন্য যদি কেউ রাজা হত, যেমন একজন সাধারণ লোক বনে জঙ্গলে থাকে। একজন এসে তাকে বলল তুমি তো মহাবলশালী, তুমি যাও যুদ্ধ করে রাজাকে পরাজিত করে রাজা হয়ে যাও। তাকে তখন অনেক কিছু করতে হবে, অনেক কিছু করার পর সে রাজা হবে। তখন লোকেরা বলত, কত লড়াই করে, যুদ্ধ করে সে রাজা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, যেখানে রাজা শব্দটা নিয়ে আসছেন, এখানে তাকে কিছু করতে হয়নি। আর বাস্তবে যদি দেখা হয় তাহলেও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, অথচ সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

ঠিক তেমনি দ্বিতীয় শব্দ গৃহ, গৃহ মানে বাড়ি। কেউ যদি বাড়ি থেকে দূরে যায়, সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে তার কি উপলব্ধি হবে? কিছুই হবে না, যা ছিল তাই আছে। কোন কারণে একটা দূরত্ব এসে বাড়ি থেকে তাকে আলাদা করে দূরে করে দিয়েছিল। দূরত্বটা মিটে গেল, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কাজকর্ম করে, অনেক কিছু করে বাড়িতে ফিরে এসেছে। তাতে হলটা কি? কিছুই হয়নি। তুমি যে বাসস্থানে ছিলে, সেই বাসস্থানেই ফিরে এসেছ। পরিবর্তন কিছু হয় না, অথচ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভক্তিশাস্ত্র এটাই বলছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে বাস, ঈশ্বরের সাথে তোমার যে একাত্ম বোধ, এটাই স্বাভাবিক। সেইজন্য নতুন করে কিছু হয় না। যদি জ্ঞান হয়ে যায় আমি ঈশ্বরের সাথে এক, তাতে নতুন কিছু হয় না। চিরদিনই তুমি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে আছ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যদি সে আবার ঈশ্বরের সাথে এক হয় তাতেও নতুন কিছুই হয় না, কারণ সে তো ঈশ্বরের সাথে এক হয়েই আছে। তোমার সাথে ঈশ্বরের যে একটা কৃত্রিম দূরত্ব ছিল, সেটাকে মিটিয়ে দেওয়া হল।

তৃতীয় শব্দ ভোজন। মানুষের যখন ক্ষুধার অনুভব হয় তখন সে খাবার খায়। খেলে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। আমাদের ভাষায় তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হচ্ছে, একটা খেল, খেয়ে পেট ভরল, তার আনন্দ হল। কিন্তু উচ্চ চিন্তন নিয়ে দেখলে দেখবে এসব করে কিছুই হয়নি। ক্ষুধার একটা বোধ এসেছিল, মানুষের যেটা স্বাভাবিক অবস্থা সেটা থেকে তাকে ক্ষুধার বোধ দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যেমনি খেয়েছে, ক্ষুধার জ্বালার যে বোধ হচ্ছিল, ঐ বোধটা মিটে গিয়ে যা ছিল তাই হয়ে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা থাকে ক্ষুধার জ্বালার প্রশমন হয়ে যাওয়ার পর তাই থাকে। ক্ষুধা বোধ হলে তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এসে যায়, ক্ষুধা নিবৃত্তির সাথে তার আমি বোধটা কখনই পাল্টায় না। ক্ষুধা বোধ হলেও পাল্টায় না, ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে যাওয়ার পরেও পাল্টায় না।

তিনটে উপমা, রাজার ব্যাটা জানে না যে সে রাজার ব্যাটা, বাড়ি থেকে দূরে গেছে আবার বাড়ি ফিরে এসেছে আর সাধারণ অবস্থায় ক্ষুধার জন্য ছটফট করছে, ভোজন করতেই ছটফটানি বন্ধ। তিনটে উপমা তিন ধরণের। একটাতে তাকে কিছুই করতে হচ্ছে না, দ্বিতীয়তে কোন কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আর তৃতীয়তে স্বাভাবিক ভাবে একটা অভাব বোধ। কিন্তু তিনটেতেই তার যে বাস্তবিকতা, তার যে স্বাভাবিক অবস্থা, তার কোন পরিবর্তন হয়নি, যা ছিল তাই আছে। কিন্তু যখন জ্ঞান এসে গেছে, ফেরত এসে গেছে, খাওয়া হয়ে গেল, আবার স্বাভাবিক অবস্থা চলে এল। তার মানে, যে কোন ক্রিয়া যখনই করছে তাতে নতুন কিছু হচ্ছে না, যা ছিল তাই থাকছে। খুব হলে ক্রিয়া কখন প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিচ্ছে, তার বেশি কিছু হচ্ছে না। স্বাভাবিক জিনিসটা স্বাভাবিক হয়েই থাকছে। ভক্তিশাস্ত্রেও ঠিক তাই হয়। পরে আমরা দেখব, আমাদের যে নানান রকমের ইমোশানস্ গুলো আসছে, এই ইমোশানস্ গুলো আমার বাস্তবিক কিছু নয়। ঈশ্বরকে ভালোবেসে, সাধনা করে ঐ ইমোশানস্ গুলোকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি, যেটা প্রতিবন্ধক রূপে এসেছিল, সেই প্রতিবন্ধকতাকে যখন কাউন্টার করে দেওয়া হচ্ছে, তখন আমি যা আমি তাই।

প্রথম ক্ষেত্রে রাজকুমারের হারিয়ে যাওয়াটা প্রতিবন্ধক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা প্রতিবন্ধক আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ভেতর থেকে একটা উত্তেজনা প্রতিবন্ধক রূপে এসেছে, ক্ষুধাটা প্রতিবন্ধক রূপে এসে আমি যা ছিলাম সেখান থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে। এবার যে জিনিসটা আসছে সেটা নতুন করে

আমাকে কিছু দিচ্ছে না। এখানে তিনটে উপমা দিলেন, অনেকে আরও অনেক উপমা নিয়ে আসতে পারেন। এমনকি স্বামীজীও শিক্ষার ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, Education is the manifestation of perfection already in man পূর্ণত্ব মানুষের ভেতরেই আছে, কিন্তু প্রতিবন্ধক এসে গেছে। যিনি শিক্ষক, যিনি সত্যিকারের হিতৈষী তিনি শুধু প্রতিবন্ধকটা সরিয়ে দেন। এখানে এটাই বলছেন, যেমন রাজকুমার বা গৃহ থেকে গমন বা ক্ষুধা, এগুলোকে উপমা দিয়ে দেখাচ্ছেন, মানুষ যা থাকে তাই থাকে শুধু প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরের সূত্রেই আবার বলছেন –

ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা।।৩২।।

রাজকুমার যে জানতে পারল আমি রাজা, এই জানার জন্য সে রাজা হয়নি। ঠিক তেমনি যে ক্ষুধার্ত খাওয়ার কথা শুনে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। স্বামীজী দুটো শব্দ অনেকবার ব্যবহার করেছেন, Being and Becoming। Becoming মানে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা, আর Being মানে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় চলে যাওয়া। সাধন পথও দুই রকমের হয় Being and Becoming, Beingকে সাধারণ ভাবে জ্ঞান পথ বলা হয়, মানে যা আছে তাই হওয়া। আচার্য শঙ্কর উপমা দিচ্ছেন, অগরু, চন্দন যদি জলের সংসর্গে থাকে ঐ সুগন্ধী দ্রব্যের মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যায়। কিন্তু একটু ঘষে দিলে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। দুর্গন্ধটা তার প্রতিবন্ধক, দুর্গন্ধকে সরিয়ে দিলে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, এটাই being। হিন্দু ধর্মে being এর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকাকে সব সময় শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, এটাই জ্ঞানমার্গ। দ্বিতীয় সাধন হল becoming, হওয়া। Becomingএ আমাকে একটা ছাঁচ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঐ ছাঁচে এবার আমার নিজেকে ঢালতে হবে। এই যে ছাঁচে ঢালা হচ্ছে এতে আমার ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে তার কিছু কিছু জিনিসকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। যেমন একটা পাথরে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে একটা মূর্তি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। মাইকেল এ্যঞ্জলো একটা খুব সুন্দর মূর্তি বানিয়েছেন। সবাই বলছে, কী সুন্দর মূর্তি বানিয়েছেন। মাইকেল এ্যঞ্জলো বলছেন, আমি তো মূর্তি তৈরী করিনি, মূর্তি চিরদিনই ছিল, মূর্তির উপর অবাঞ্ছিত যে পাথরগুলো ছিল সেগুলোকে আমি সরিয়ে দিয়েছি। এটাই একজন গ্রেট আর্টিস্টের পরিচয়। পেইন্টিং ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিস হবে না, পেইন্টিং করা হয়। হয়ত কোন পেইন্টার বলে থাকবেন ক্যানভাসে ছবিটা আগে থেকেই ছিল, তিনি রঙ তুলি দিয়ে ফুটিয়ে বার করে এনেছেন।

যেমন *ফলরূপতা ইতি* বলা হল, এটাকেই অন্য ভাষায় যখন বলছি তখন Being and Becoming হয়ে যায়। হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি চলে Beingএর উপরে। অন্যান্য ধর্মকে যেভাবে আমরা বুঝি বা জানি সব ধর্ম চলে Becomingএর উপরে। যেমন খ্রীশ্চানরা বলছে, তুমি পাপী, পাপ থেকে যদি মুক্তি চাও তাহলে তোমাকে এই এই করতে হবে। তুমি পাপী এটাই সত্য, তোমাকে শুদ্ধিকরণ করতে হবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে বলে তুমি আগে থেকেই পবিত্র কিন্তু পাপীর পোশাক ধারণ করে আছ, ঐ পোশাকটা খুলে ফেলে দাও, তারপর দেখবে তুমি যা ছিলে তাই হয়ে যাবে। তবে ধর্ম তত্ত্বের আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে সব ধর্মই কিন্তু শেষে Beingএর কথা বলেন। যেমন খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মে বলে মানুষ আগে স্বর্গে ছিল, কিন্তু আদম যখন স্বর্গের ফল খেয়ে নিয়েছে তখন তার স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গেছে। এবার আদমকে ফেরত যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে ফেরত যাবে? এই দৃষ্টিতে যদি ধর্মের দিকে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাবে সব ধর্মই কোন না কোন ভাবে ফলরূপতা নিয়ে নেয়। জগতে জাগতিক যা কিছু সব কিছুই becoming হয়, বাছা তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, আইএএস অফিসার হতে হবে, এই সব আমরা বলছি।

স্বামীজী এই ফলরূপতাকে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে নামিয়ে আনলেন, স্বামীজী বলে দিলেন তোমার ভেতরে পূর্ণত্ব আছে, তোমার ভেতরে সব শক্তি আছে, সেই পূর্ণত্বকে, শক্তিকে তুমি বার করে নিয়ে আস। বার করে আনলে তুমি যা কিছু হতে চাইছ সব হতে পারবে। কারণ তুমি তো সেটা হয়েই আছে, তোমার ভেতরে সব শক্তি আছে। যার ভেতরে সব শক্তি আছে তার কাছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। যখন কোন কিছু ভাবছি, কিছু করছি, কাউকে কিছু সাজেশান দিচ্ছি তখন স্বয়ং ফলরূপতা, ক্রিয়াই ফল এই রূপে যদি নেওয়া হয় তখন সেই সমাধান সব সময়ই শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে, সেই জীবন ধারাটা সব সময় ভালো জীবন ধারা হবে। এগুলো শুনে নিলে কিছু হবে না, এটাই এখানে বলছেন *ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা*,

খেয়ে নিলে ক্ষুধার শান্তি যেটা বলছেন কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের যে স্বাভাবিক অবস্থা ছিল সেটার কোন পরিবর্তন হয় না। তখন পরের সূত্রে বলছেন –

তস্মাৎ সা এব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ।।৩৩।।

নারদ যে সময় মুমুক্ষুদের কথা নিয়ে আসছেন, তখন উপনিষদাদি অনেক আগে থেকেই খুব প্রচলিত হয়ে আছে। সবাই মুক্তি চাইছে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সবাই মুক্তি চাইছে, নানান রকমের যে শোক-মোহ এসব থেকে মুক্তি চাইছে। নারদ বলছেন, যারা মুক্তি চাইছে তাদের জন্য জরুরী হল *তস্মাৎ সা এব*, যার কথা এখানে চলছে, সেই ভক্তিমার্গকেই অবলম্বন করা। কেন ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করা জরুরী? এই যে রাজার ছেলে রাজা হয়ে যাওয়ার যে উপমাগুলো নেওয়া হল, এগুলো কোন ক্রিয়ার জন্য হয় না, কোন কিছু শোনার জন্য হয় না, এগুলো আগে থেকেই ছিল, ভক্তিটাও তাই। এখানে কিন্তু পরা ভক্তির কথা চলছে, জপ, পূজো, তীর্থাদির কথা বলছেন না। *সা তু পরমপ্রেমরূপা*, ঈশ্বরের প্রতি যে পরমপ্রেম, এই প্রেমই মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কারণ এটাই তার স্বাভাবিক আর এটাই *স্বয়ং ফলরূপতা*। এই কথা বলতে গিয়ে যেন জ্ঞানমার্গকে একটু নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ যাঁরা নিজের পথের কথা বলেন তখন নিজের পথকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, আর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গিয়ে এই রকমই করে থাকেন। পরা ভক্তি জিনিসটাই মুক্তির স্বভাব, জ্ঞানমার্গে যে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, যে মুক্তির কথা শাস্ত্রে বলছেন, সেই একই মুক্তি পরা ভক্তিতেও হয়। পরা ভক্তি মানে, ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এটাই মোক্ষরূপা। সেইজন্য ভক্তি বাদে যে কোন পথই ভক্তির থেকে নীচে, নারদ এই পথ গুলোকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার এই পথকেই ধরে রাখতে হবে, এটাই মুক্তির স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলতে চাইছেন, ভক্তি হল শ্রেষ্ঠ পথ। ঠাকুর বলছেন ভক্তি সহজ পথ। প্রথমের দিকে আমরা কয়েকটা পয়েন্টকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কেন ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ পথ বলা হবে। তার মধ্যে একটা হল, ভক্তিতে আমিত্ব রাখতে চায়। ঐ শ্রেষ্ঠ অবস্থায় গিয়ে আমিত্ব থাকছে কি থাকছে না, কেউ আমরা বুঝিও না, জানিও না, তাই এই আলোচনায় যেতে নেই। কিন্তু এখানে খুব সহজ যুক্তি দিচ্ছেন, শ্রেষ্ঠ কেন, কারণ ভক্তি স্বয়ং ফলরূপতা। যেখানে ক্রিয়া আর ফল এক হয় সেটা সব সময় শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের প্রতি যিনি পরমপ্রেম করবেন, পরা ভক্তি যিনি করবেন, তার ফল কি হবে? ঈশ্বরকেই পরমপ্রেম করবেন, নতুন করে কোন ফল হবে না, তখন যা ছিল তাই হয়ে যাবে, ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। পরমপ্রেম মানেই একাত্ম বোধ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা, প্রেম হয় সেখানেও কিছু চাহিদা থাকে, এই ক্ষেত্রে চাহিদা, বাসনা কিছুই থাকে না, শুধু থাকে ভালোবাসা। এরপর নারদ ভক্তির কি কি সাধন হয় বলছেন –

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ।।৩৪।।

পরা ভক্তি মোক্ষ স্বরূপ, পরা ভক্তি মোক্ষের সাথে এক, প্রেমা ভক্তিই আসল। কিন্তু পরা ভক্তি পাওয়া যাবে কি করে? তখন বলছেন, এর যে সাধন, পরা ভক্তি পাওয়ার যে পথ তার কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বলছেন *গায়ন্ত্যাচার্যাঃ*, ভক্তির যাঁরা আচার্য তাঁরা বিভিন্ন ভাবে প্রেমাভক্তি লাভের উপায়সমূহকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে সাধন শব্দের যে ব্যবহার করছেন, এই সাধনের মূল উদ্দেশ্য হল মনকে শুদ্ধ করা। যে কোন সাধনাই, যোগের সাধনাই হোক, জ্ঞানের সাধনাই হোক, কর্মযোগের সাধনাই হোক, সাধনাতে মনের শুদ্ধিকরণ করা হয়। মুণ্ডকোপনিষদে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ আর সব বেদাঙ্গকে বলছেন অপরা বিদ্যা। তখন প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে, জ্ঞান পরা বিদ্যা কি করে হয়? আচার্য তখন বলছেন, পরা বিদ্যাতেও খাটতে হয়, গুরুর কাছে গিয়ে বসতে হয়, ধ্যান ধারণা করতে হয়, প্রস্তুতি তাতেও লাগে। প্রেমা ভক্তিও এমনি এমনি হয়ে যায় না, প্রেমা ভক্তিতেও প্রস্তুতি লাগে। অনেকে বলেন, ঠাকুর কৃপা করলেই হয়ে যাবে, এগুলো সব ফাঁকিবাজী কথা। সাধনা মানেই, নিজেকে চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টার কথা বলতে গিয়ে নারদ প্রথমেই সব উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, অন্যান্য যে পথের কথা বলা হয়েছে সব ভুলে যাও। এবার থাকল ভক্তি, যেটা সবাই বোঝে। ভক্তির সাধনাতে একটাই উদ্দেশ্য থাকবে, মন কি করে শুদ্ধ হয়। মন যদি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় তখন যত রকমের অস্তিত্ব আছে সব অস্তিত্বের পেছনে যে দিব্য সত্তা আছে সেই দিব্য সত্তাকে জানা যাবে। জ্ঞানমার্গে জানাটা অন্য রকম হয়, ভক্তিমার্গের জানাটাও অন্য রকমের হয়। কিন্তু ঐ জানাটা তখনই সম্ভব মন যখন শুদ্ধ

পবিত্র হয়। সেইজন্য সাধকের পথ কি, এই নিয়ে বিভিন্ন আচার্যরা কি কি বলেছেন সেই ব্যাপারে নারদ এখান থেকে পর পর বলে যাচ্ছেন।

আমরা মনে করি সাধনাও মনের একটা খেলা, সেই অর্থে ভক্তিশাস্ত্রে কিন্তু সাধনা হয় না। কঠোপনিষদে একটা মন্ত্রে বলছেন *দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ*, জিনিসটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ওটাকে জানার জন্য আরও সূক্ষ্ম হতে হয়। ছুঁচের ছিদ্রে যে সুতোকে প্রবেশ করানো হবে সেই সুতোকে ঐ ছিদ্রের থেকেও সরু হতে হবে। ব্রহ্ম এতই সূক্ষ্ম যে ঐ অর্থে ব্রহ্মকে তাই জানা যায় না। সেইজন্য ওর মত সূক্ষ্ম হয়ে ওখানে এক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু অন্য জিনিসকে জানার জন্য আমাদের মনকে সেই জিনিসের থেকে সূক্ষ্ম হতে হবে। তার মানে, জ্ঞান সাধনে বুদ্ধিকে খুব তীক্ষ্ণ করতে হবে, ঠাকুর বলছেন, চটপট ধরে নেয়। ভক্তিতে ঐ অর্থে বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করতে হয় না। ভক্তিতে ইমোশানস্ গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনের মধ্যে যে নানান রকমের ইমোশানস্ গুলো আছে, কাম, ক্রোধ, লোভাদি বা অন্যান্য যে নানা ধরণের ইমোশানস্ আছে, এই ইমোশানস্ গুলি যখন খেলতে থাকে মন তখন অনেক রকম রঙ ধারণ করে নেয়। তাহলে একটা উপায় হল, একটা একটা করে ইমোশানস্ গুলির সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যেমন যেমন ইমোশানস্ আসছে তেমন তেমন লড়াই করতে থাক। যোগশাস্ত্রে যেমন বলছেন, মনকে শক্ত করবে যাতে বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ঠাকুর আবার বলছেন, ভবনাথ পান মাছ ত্যাগ করেছে, পান মাছ ত্যাগে কি আর হবে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। একটা একটা করে যে লড়াই করে যাবে, তাতে অনেক বেশি খাটনি এবং অনেক রকম সমস্যা। এনারা বলছেন, ঈশ্বরকে ভালোবাস, সব লড়াই এক লড়াইতেই জয় হয়ে যাবে। মনের যত রকম ভাব আছে, যেমন ঠাকুর বলছেন কাম, ক্রোধ যত আছে ঈশ্বরের দিকে এগুলোর মোর ঘুরিয়ে দাও। ঈশ্বরের প্রতি যে ভালোবাসা, ঐ ভালোবাসা আগেই সব কিছুকে ফেলে দেয়। বেশির ভাগ মেয়েরা বাচ্চা বয়সে পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুলকে বিয়ে দিচ্ছে, পুতুলকে খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে, কত কি করছে। আগেকার দিনে মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত, যেমনি বিয়ে হয়ে গেল, স্বামীকে পেয়ে গেল তখন সব পুতুল গুলোকে পোটলা করে বাক্সে তুলে রাখে, তখন আর পুতুলের কথা মনেও থাকে না। বিয়ের পর মেয়েরা যখন বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর সাথে শ্বশুড় বাড়ির দিকে রওনা হয় তখন কত কান্নাকাটি করতে থাকে, সবাইকে জড়িয়ে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। ঐ কান্নার মধ্যে কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা আনন্দও হতে থাকে, একটু পরেই আমি স্বামীর সাথে ট্রেনে করে শ্বশুড় বাড়ি যাব। অনেক মেয়ের তো কান্নাই বেরোতে চায় না, কিন্তু জানে কাঁদতে হয় তখন কান্নাটা বেরিয়ে আসে। মূল হল, ভেতর থেকে যদি সত্যিকারের কেউ কাউকে ভালোবাসে তখন দেখা যাবে, তার পেছনের যত ভালো যত মন্দ, সব খসে পড়ে যায়।

উপনিষদে, গীতায় ধর্ম অধর্মের পারে যাওয়ার অনেক কথা বল হয়। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, কথামৃতেও ঠাকুর অনেক ভাবে ধর্ম অধর্মের পারে যাওয়ার কথা বলছেন। যদি সত্যিই কাউকে প্রাণ থেকে ভালোবাসে, যে ভালোবাসাতে কোন চাহিদা নেই, এই ভালোবাসা যদি কারুর ভেতর এসে যায় তখন বাকি সব কিছু তার খসে পড়ে যায়। এখানে সেই তত্ত্বটাকে, সেই অনুভূতিটাকে নিচ্ছেন, এই সিদ্ধান্তের উপরেই চলছে। ঈশ্বরকে যখন ভালোবাসবে, ঐ ভালোবাসা এত তীব্র যে তার ভালোমন্দ যা কিছু আছে সব খসে পড়ে যায়। বাচ্চা মেয়ের কাছে পুতুল তার কত ভালো লাগার বস্তু, পুতুল খেলা নিয়ে মায়ের কাছে কত বকুনি খেয়েছে, অনেক কিছুই পুতুলের সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু স্বামী এসে গেলে সব খসে পড়ে থেকে যায়। বন্যার প্লাবন এলে ভালো মন্দ সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার বন্যা এলে জীবনের সব ভালো মন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। একটা মেয়েকে শ্বশুড় বাড়িতে কত কষ্ট সহ্য করে থাকতে হয়, কিন্তু যেমনি একটা সন্তান কোলে এসে যায় তখন বলে, এর মুখের দিকে তাকিয়েই আমার জীবন কাটিয়ে দেব। এগুলো জাগতিক জিনিস, কিন্তু পারমার্থিক ব্যাপারে এগুলো সত্যিকারের হয়। ঈশ্বরের ভালোবাসার দিকে এগিয়ে গেলে বাকি যত ইমোশানস্ আছে, ভালো মন্দ সব ইমোশানসই নষ্ট হয়ে যায়। এই জিনিসটাকেই সাধনা বলে। অন্যান্য পথে সাধনা মানে, একাগ্র করা, মনকে আরও শক্ত করা, মনের শুদ্ধিকরণের জন্য বিচার করা কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে সাধনা মানে মনকে পবিত্র করা। কিভাবে? *ফলরূপত্বাৎ*, এটাই বলছেন, এর কোন সাধনা নেই। ঈশ্বরকে ভালোবাস, স্বাভাবিক ভাবে তোমার পেছনে জাগতিক যা কিছু ভালো মন্দ আছে সব ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাবে।

সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্র পরা ভক্তিতেই বেশি জোর দেয়, অপরা ভক্তিতে একটুও জোর দেয় না। অপরা ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আসে না, অপরা ভক্তি মানে এত জপ, এত পূজা, এত উপাচার। এগুলো করলে লড়াইটা একটা একটা করে করতে হয়। কিন্তু পরা ভক্তির যখন উদয় হয়, উঠিল প্রেম পারাবার, ঐ প্রেম সব কিছুকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে বার করে দেয়। এখানে ভক্তিশাস্ত্রে পুরো জোরটা পরা ভক্তির উপর। বিভিন্ন আচার্যরা ভক্তির উপর যা যা কথা বলেছেন, সেগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তার সারকে নারদ এখানে রেখে দিচ্ছেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে কি করা দরকার। নারদ নিজের কোন কথা বলছেন না, আগের আগের আচার্যরা যা যা বলেছেন, সেগুলোকে তিনি সাজিয়ে রেখে দিচ্ছেন।

সাধনা শব্দকে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তবে ভক্তিশাস্ত্রে সাধনা বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন পরিষ্কার হয় না। পরের শব্দে বলছেন *গায়ন্ত্যাচার্যাঃ*, আচার্য শব্দ চর ধাতু থেকে এসেছে। চর মানে ঘাস চরা, ঘাস চরা যেখান থেকে এসেছে চর ধাতুও ওখান থেকেই এসেছে। চর মানে চলা, গরু যখন মাঠে চরে তখন সে ঘাস খায়, ওর মধ্যেই গরু চলছে। এই যে চলা, নিজের এলাকা মনে করে ঘাস খাচ্ছে, চর ধাতুর একই অর্থ, গরু ঘাস চরে আর আচার্য শব্দও ঐ একই ধাতু থেকে এসেছে। *গায়ন্তি আচার্যাঃ*, আচার্যরা যার মধ্যে চারণ করেন, ওর মধ্যেই আছেন, ওর মধ্যে বাস করছেন, ওর মধ্যেই চলছেন, ফিরছেন। এখানে দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। একটা হল importance of first hand thinkers, যদি কোন বিষয়কে কেউ জানতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ঐ বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে পড়তে হবে। যেমন গীতা, উপনিষদ নিজে থেকে বুঝতে গেলে কেউই বুঝতে পারবে না, গীতা উপনিষদের মাস্টার হলেন আচার্য শঙ্কর। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য পড়লে সব বুঝে যাবে। অন্য কারুর লেখা গীতা উপনিষদের ব্যাখ্যা পড়লে কোন দিন এর অর্থ পরিষ্কার হবে না। আচার্য শঙ্করই ঠিক ঠিক আচার্য, বিচরণ করছেন সেখানে, পুরো এলাকাটা তাঁর। সেইজন্য বলা হয় first hand writer যিনি, মাস্টার যিনি, তিনি যখন কিছু বলেন তখন সেটার দাম থাকে। যেমন হিন্দী শিখতে হলে তাকে প্রেমচাঁদকে পড়তে হবে, প্রেমচাঁদ পড়ুক সে হিন্দী শিখে যাবে। যখনই কিছু পড়তে হবে তখনই যিনি মাস্টার তাঁর লেখা পড়তে হয়। মাস্টারদের বিশেষত্ব হল এনারা সবাই সহজ সরল।

স্বামীজীকে একবার হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিতে ডাকা হয়েছিল। সেখানে উইলিয়ম জেমসের মত তখনকার দিনের নামকরা দার্শনিকরা ছিলেন। উইলিয়ম জেমসের সাথে কিভাবে পরিচয় হওয়াতে তিনিই স্বামীজীকে হার্ভার্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল, উইলিয়ম জেমসের দর্শন পুরো স্বামীজীর বিপরীত, কিন্তু তাও নিয়ে গেছেন, যিনি মহৎ হন এটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। এমনকি স্বামীজী লেকচারে যে বক্তব্য রাখলেন সেটাও পুরো উইলিয়ম জেমসের দর্শনের বিপরীত। উইলিয়ম জেমসকে সবাই অনুরোধ করলেন, আপনি এর উপর কিছু বলুন। উইলিয়ম জেমস সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, not here, not here। আমাদের বোকা ভক্তরা এটাকেই ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন উইলিয়ম জেমসের মত এর বড় দার্শনিকও স্বামীজীর সামনে দাঁড়াতে পারেল না। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, ওখানে প্রথা ছিল, যিনি বক্তা, যাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে তার বক্তব্যের কক্ষণ কোন বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখা যাবে না। ছাত্ররা প্রশ্ন করতে পারবে কিন্তু প্রফেসররা কোন অবস্থায় বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন করতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছি, তাঁকে প্রশ্ন করে বিব্রত করা উচিত হবে না। পরের যে ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেখানে খুব মজার ব্যাপার আছে। লেকচারের পর কয়েকজন ছাত্র হাটতে হাটতে যাচ্ছে, একজন ছাত্র বলছে he was good, অন্য একজন ছাত্র বলছে yes, but I could understand everything he said, উনি যা কিছু বলছিলেন সবটাই বুঝতে পারছিলাম, খুব interesting comment এটা। বক্তা যা বলছে যদি সব বুঝে নেয়, তাহলে সে কখনই ভালো বক্তা হতে পারে না। এই মতটা মুর্খদের। যাদের বুদ্ধি খুলে গেছে তারা বুঝতে পারে, যার কথা সবাই বুঝতে পারছে সে হল মাস্টার। Reader's Digest নিয়ে একজন বলছিলেনে, Reader's Digsest ম্যাগাজিন আমেরিকার একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারও পড়ে আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টও পড়েন। এটাই হল ম্যাগাজিন, ওর লেখার একটা simplicity আছে। যত গভীর তত্ত্বই হোক ঐ গভীর তত্ত্বকেই খুব সহজ ভাবে সামনে রেখে দেওয়াটাই সব থেকে বড় কৃতিত্বের। আচার্যদের এটাই বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় আরেকটা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, ভেতরে ভাব যদি না থাকে, আপনি তার বুদ্ধিকে ছুঁতে পারবেন কিন্তু তার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবেন না। একজন বেদান্তের খুব বিরাট তুখোড় পণ্ডিত, একবার এক মহারাজ ওনার লেকচার শুনতে গিয়েছিলেন। এসে বলছেন, আমি আচার্য শঙ্করের ভাষ্য পড়ি, পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু আমি একেবারেই ওনার মতের সাথে এক নয়। অথচ উনি বেদান্তের বিরাট পণ্ডিত। তার মানে সবই করছেন, কোথাও বিশ্বাস আছে, কিন্তু ওর মধ্যে বিচরণ করছে না। যে বিচরণ করবে সে চুপ মেরে যাবে।

যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইছেন বা পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিয়েছেন, এনারা সবাই শব্দ সাধক। শব্দ দুটো অর্থে বোঝায়, একটা শব্দ মানে যে শব্দরাশি আমরা বলছি আরেকটা শব্দ মানে বিচার, ইংরাজীতে বলে words and ideas। এই জগতে যে কোন সত্যের তিনটে রূপ, একটা তার মূর্ত রূপ, একটা তার শব্দ রূপ আর তৃতীয় তার বিচার রূপ, ইংরাজীতে এভাবে বলা হয়, verbal representation, idea and three dimensional, যেমন সমর নামে কোন ব্যক্তি, সমর বাবু একজন মূর্ত রূপ, সমর একটা শব্দ বা নাম, সমর বলতে একটা আইডিয়া। সমর বাবুর যে আইডিয়া তাতে অনেক রকম বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক রকম দুর্বলতা আছে, অনেক কীর্তি আছে, অনেক ব্যর্থতা আছে, সমর বাবুর সাথে কখন অন্য লোকের মিল হবে না। দুজন ব্যক্তিত্ব কখনই এক হবে না, এক যদি হয় তাহলে কিন্তু নাম, শব্দ কক্ষণ আলাদা হবে না, শরীরও আলাদা হবে না। এই যে বস্তু আলাদা হয়ে গেল, শরীর আলাদা হয়ে গেল তার মানে আইডিয়াতেও অনেক তফাৎ হয়ে যাবে। এমনকি যমজ ভাই বা বোনের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগ মিল থাকতে পারে, নিরানব্বুই পয়েন্ট নিরানব্বুই ভাগ মিল থাকতে পারে কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান তফাৎ থাকবেই। ক্লোন করালেও এক হবে না, কারণ তার পেছনে যে আইডিয়া আছে তাতে তফাৎ আছে। এমনকি একই দোকান থেকে একই রঙের একই সাইজের চারটে মগ নিয়ে আসার পর ব্যবহার করতে করতে কিছু দিন পর ওদের চারটেরই পৃথক সত্তা হয়ে যায়। তখন বাথরুমের মগ, রান্নাঘরের মগ এই ভাবে বলতে শুরু করি।

মানুষ যখন সাধনা করে তখন সেখানেও ব্যক্তির সাধনা হয়, আইডিয়ার সাধনা হয় আর শব্দের সাধনা হয়। এই তিন রকমের সাধনা হয়। আইডিয়ার সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা আর শব্দের সাধনা নিকৃষ্ট সাধনা। বেশির ভাগ মানুষ শব্দ সাধনায় নেমে শেষ হয়ে যায়। আচার্যরা কক্ষণ শব্দ সাধনা করেন না, ওনারা সব সময় সাধনা করেন ভাবের, ভাবের মধ্যেই বিচরণ করেন। ভক্তির যাঁরা আচার্য তাঁরাও ঐ ভাবগুলোকে নিয়ে চলছেন। আচার্যরা কখনই শব্দে নামবেন না, খুব হলে দু চারটে কথা বলে দেবেন, এটাই আচার্যের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য পড়তে যদি হয় আচার্যকেই পড়তে হয়। এখানে বলছেন সাধনা বিধি আচার্যরা গান করেন।

দ্বিতীয় শব্দ *গায়ন্তি*, এই শব্দটা খুবই আশ্চর্যের। আমাদের জানা নেই নারদ ভক্তিসূত্র সঠিক ভাবে কে রচনা করেছিলেন, পরম্পরায় আমরা নারদ বলতে পারি, কিন্তু নারদ নিশ্চয় করেননি কারণ এর রচনাই হয়েছে তৃতীয় শতাব্দীর আগে পরে। কিন্তু যিনি নারদ ভক্তিসূত্র সংকলন করেছেন বা লিখেছেন তিনি যেই হন, এই একটা শব্দ দিয়ে বোঝা যায় তিনি কত উচ্চমানের সাধক ছিলেন। দুটোর মধ্যে যে কোন একটা হবেন, হয় তিনি বিরাট উচ্চমানের সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ আর যদি শব্দেরও সাধক হন, শব্দের যে চয়ন করা হয়েছে অত্যন্ত উচ্চমানের চয়ন। সাধারণ কোন লেখক এই ধরণের শব্দ আনতে পারবেন না। *বদন্তি* বলছেন না, বলছেন *গায়ন্তি*। আচার্যের হৃদয় পূর্ণ, পূর্ণ হৃদয় থেকে কতকগুলো শব্দ স্বতস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসছে, এটাই গান। গান কবিতা এভাবেই সৃষ্টি হয়, হৃদয় যখন পরিপূর্ণ তখন সেই হৃদয় থেকে কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে, সেই শব্দই কবিতা বা গান হয়ে যায়। মৌন থেকে শব্দ বেরোয়, সমাধি থেকে শব্দ বেরোয়, *গায়ন্তি* বলতে এটাই। সেইজন্য আমাদের ঋষিদের কবি বলা হয়। *গায়ন্তি* বলতে গান করছেন তা নয়, উদ্‌গার করছেন, পূর্ণ হৃদয় থেকে দু চারটে কথা বেরিয়ে আসছে। *তস্যা সাধনানি*, ভক্তির যে সাধন হয়, আচার্যরা বিভিন্ন ভাবে তারই উদ্‌গার করছেন।

পরের সূত্রে যে সাধনার কথা আলোচনা করতে যাচ্ছেন তার আগে দুটো কথা বলার আছে। আচার্যরা যে কথাগুলো বলেছেন তাদের দুটো শ্রেনীতে বিভাজন করা যায়। প্রথমটা হল নাকারাত্মক আর দ্বিতীয়টা সাকারাত্মক। নাকারাত্মকে কি হয়, জীবনে যে নানা রকমের বন্ধন গুলো আসছে, যেগুলো আমাদের এগোতে দেয় না, সেই বন্ধনকে কিভাবে ছেদন করা যায়। দ্বিতীয় সাকারাত্মক হল, দিব্য আনন্দের ঈশ্বরীয় যে রস সেই

রসের আস্বাদ বা দিব্য আনন্দের বোধ কিভাবে হতে পারে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে দুটোই এক। বন্ধনকে কাটার যে চেষ্টা করছে আর দিব্যা আনন্দকে সাধনায় পরিভাষিত করার চেষ্টা করছে, দুটো একই। তার কারণ, আনন্দটাই আছে কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধকতা এসে গেছে, বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। আচার্যরাও বলছেন যো সো করে তুমি আনন্দ সাগরে ঝাঁপ দাও। আর দ্বিতীয় বলছেন, প্রতিবন্ধকতাকে কিভাবে ভাঙা যেতে পারে। যেমন গাছের বীজ মাটিতে পোতার পর বীজটা পচতে থাকে, মনে হয় বীজটা বুঝি পচে গেল, কিন্তু ওই পচনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। আগে যে বীজটা ছিল তার পচন হওয়াটা যা আর তার থেকে নতুন সৃষ্টি বেরিয়ে আসাটাও তাই, দুটো একই। দুটো একই সাথে চলে। অনেকে এসে বলে দেশের কি হচ্ছে, সব জায়গায় অরাজকতা, দুর্নীতি। কোথায় কি হচ্ছে, ঠিকই তো আছে, এই যে পচে যাচ্ছে এখান থেকেই ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির বীজ তৈরী হচ্ছে।

এখন বলতে পারেন, তাহলে একটাতে থাকলেই তো হয়। তা হয় না, সমস্যা হল প্রতিবন্ধকতাকে সরাবার জন্য যদি বেশি জোর দেওয়া হয় তখন কৃচ্ছ সাধনের দিকে মন বেশি চলে যাবে, এটাই তখন বিধবাদের ধর্ম হয়ে যাবে। ঠাকুর যে শুষ্ক জ্ঞানীর কথা বলছেন, জ্ঞানীরা নেতি নেতি সাধন করেন। নেতি নেতি সাধনেও ঠিক এই সমস্যা এসে যায়, নেতি নেতি বিচার করতে করতে শুষ্ক হয়ে যায়। আর শুধু যদি দিব্য আনন্দের কথাই বলেন তখন অন্য দিকে সমস্যা হবে। পরা ভক্তির উপমা দিতে গিয়ে ভাগবতে পরকিয়া প্রেমের কথা বলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতেও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, পরা ভক্তি কি রকম হতে পারে বোঝাবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছেন। ওনারা সেখানে পরকিয়া প্রেমের উপমা দিচ্ছেন। নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রেমের গভীরতা থাকে না যতটা অপরের স্ত্রীর প্রতি থাকে। এখন পরকিয়া সাধন করার জন্য সবাই অপরের স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে নেমে পড়ছে। এগুলোই বিপজ্জনক। সেইজন্য সাধন পথে, বিশেষ করে ভক্তিমার্গে দুটো সাধন এক সঙ্গে চলে। একদিকে সব কিছুকে সংযম করা হচ্ছে অন্য দিকে দিব্য আনন্দের অভীপ্সা করছেন। ঠাকুর যে বলছেন ধোকার টাটি মজার কুটি, দুটোই ঠিক। জগতের দিক থেকে এটা ধোকা, ঈশ্বরের দিক থেকে এটা মজা। ভক্তিশাস্ত্র দুটোকে এক সঙ্গে নিয়েই চলে। আমরা যদি *ফলরূপত্বাৎ* ছেড়েও দিই, তাহলেও কিন্তু তফাৎ হয়, কারণ এক সঙ্গে দুটোই চলে। একদিকে যেমন ত্যাগ করছেন অন্য দিকে প্রেমের ব্যাপারটাও থাকে।

আধ্যাত্মিক জীবনে সংসারের প্রতি বিরাগ, আর ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দুটোকে একসাথে চালাতে হয়। আমরা যে যে শাস্ত্রকে আধার করে নিজেদের তৈরী করছি সবটাই ব্যাসদেব, পতঞ্জলি, আচার্য শঙ্করের মত শ্রেষ্ঠ আচার্যদের দেওয়া। যদি খুব গভীরে গিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, যাঁরা শ্রেষ্ঠ আচার্য তাঁরাও এই দুটোকে কেন্দ্র করেই চলেন। একদিকে তাঁরা যেমন সংসারের প্রতি বিরাগ তেমনি তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ। গৃহী ভক্তদের মধ্যেও অনেকেই আছেন যাঁরা বিয়ে থা করে সংসার করেননি, একটা বয়সের পরে যে কোন কারণেই হোক সন্ন্যাসী হতে পারলেন না, তাঁদের অনেকে হিমালয়ে গিয়ে কারুর কাছ থেকে সন্ন্যাস নেন। তাতে আবার একটা নতুন সমস্যা হয়। বাইরের সন্ন্যাসীরা প্রথমেই বলবেন, তোমার ইষ্টমন্ত্র আর ইষ্টকে বাদ দিতে হবে, তোমাকে এখন যে মন্ত্র দেওয়া হল এবার থেকে তুমি এই মন্ত্রের ধ্যান কর, এই মন্ত্রের মূল হল সব কিছু ত্যাগ করা। এনারা তখন সমস্যায় পড়ে যান, একদিকে তাঁরা ঠাকুরকে ছাড়তে পারেন না অন্য দিকে সন্ন্যাসও ছাড়তে চান না। অনেকে এসে চোখের জল ফেলে মহারাজদের বলেন, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, আমরা তো ভক্তদের থেকেও অধম হয়ে যাচ্ছি, ভক্তরা তাও ঠাকুরকে নিয়ে থাকতে পারছে, আমরা সন্ন্যাস নিতে গিয়ে তাদের থেকেও অধম হয়ে গেলাম। পরের দিকে একজন দুজনকে গুরু অনুমতি দিয়ে বলতেন, ঠিক আছে আপনি ইষ্টমন্ত্র রাখতে পারেন। এখানে কিন্তু ইষ্টমন্ত্র ছেড়ে দেওয়া, ইষ্টকে ত্যাগ করে দেওয়া এগুলো গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল বেদান্ত সাধনা মানেই শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ। কিন্তু মাঝখান থেকে ঠাকুরের ধ্যান করে আনন্দ যে আসবে, এই দিকটা তাদের মাথা থেকে উড়ে যায়। এটাও ঠিক যে এনাদের মধ্য থেকে অনেকেই বড় বড় সাধু হয়েছেন। শোনা যায় যে, একবার স্বামী ভূতেশানন্দজী উত্তরকাশীতে গিয়ে ওখানকার বড় বড় আচার্যদের সাথে এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাঁদের তিনি বোঝালেন, এরা কত অসহায় হয়ে আপনাদের কাছে আসছে, আপনারা এই রকম করবেন না। ত্যাগের ব্যাপারে বেদান্তের যেমন তার নিজস্ব যুক্তির একটা দিক আছে, তেমনি ইমোশানের দিকটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন সব কিছু

থেকে সরে এসে আত্মসংযমের জোর দেওয়া অন্য দিকে দিব্য আনন্দের অনুভূতির দিকটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি না হয় আধ্যাত্মিক উন্নতিও ভালো ভাবে হবে না। নারদ এখন যে সূত্রগুলো আনছেন তাতে তিনি দুটোকে মিলিয়েই বলবেন। তাহলে যাদের মনে আনন্দের ভাব নেই তাদের কি উন্নতি হবে না? বলা খুব মুশকিল, যেমন তোতাপুরী, তিনি ঠাকুরকে সিদ্ধ মানতেন, ঠাকুর আবার হাজরার নাম ব্যঙ্গ করে বলছেন, হাজরা বলে ইনি তেমন কিছু না। হাজরার কথা যদি আমরা উড়িয়েও দিই, কিন্তু তোতাপুরী নিজেকে নিয়ে একটা যে কথা বলছেন, চল্লিশ বছরের সাধনায় আমি যা করেছি, এ তিন দিনে সেটা করে দিল। তাহলে তোতাপুরীর সিদ্ধি আছে। তবে এটা আমরা জানি, তোতাপুরী একটু কোথাও শুষ্ক ছিলেন।

সাধনা বিধি যদি আচার্য ছাড়া অন্য কেউ বলে দেন তাহলে সবটাই এলেমেলো হয়ে যাবে, কথাগুলো ঠাকুরের আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে কথার মত হয়ে যাবে। জীবনমুক্তি বিবেকে একটা সুন্দর আলোচনা আছে, অনেকে বলেন শ্রীরাম এত মহৎ কেন, সেখানে বলছেন একপত্নী ব্রত, ওনার মন একমাত্র সীতার উপরেই ছিল, তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম, উনি মর্যাদা কখনই লঙ্ঘন করতেন না। তখন বলছেন, জগতে তো কত লোকই আছে যারা এক পত্নীতেই আছে, তাতে আহামরিটা কি হল! সেইজন্য অবতার তত্ত্ব বোঝা খুব কঠিন। কপিল মুনি কোন রাক্ষস, দৈত্য বধ করেননি, তিনি আবার হিন্দু দর্শনের জনক, ব্যাসদেবও তাই, দত্তাত্রেয়ও তাই, শঙ্করাচার্যও তাই। এনাদের সবাইকে আমরা অবতার বলেই জানি। শিব কাকে বধ করেছেন যার জন্য তাঁর মাহাত্ম্য হয়েছে? শিবের মাহাত্ম্য শিবের জন্য, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য মধুকৈটভ বধের জন্য নয়, বিষ্ণুর জন্য। সেইজন্য আচার্যরা যদি না বলে থাকেন তাহলে পথগুলো এলোমেলো হয়ে যায়, ধর্মের মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র জিনিস সব ঢুকে যায়। হিন্দু ধর্মে এত শাস্ত্র আছে অন্য দিকে গ্রামের যিনি স্থানীয় পণ্ডিত বা পুরোহিত থাকতেন, তিনি যা যা বিধান দিতেন সেটাই সেখানকার ধর্ম হয়ে যেত। এই করে আমাদের ধর্মে অনেক রকম গোলমাল হয়ে গেছে। এত বিরাট প্রাচীন ধর্ম তার উপর এত কিছু মিশেছে যে, একটু তো গোলমাল হয়ে যাবেই। সেইজন্য আচার্যদের কথা বলছেন, আচার্যরা সাধনার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তার সব কটি সংগ্রহ করে নারদ ভক্তিসূত্রে এক জায়গায় করে বলছেন ভক্তির সাধন কিভাবে হবে। প্রথমেই বলছেন –

তৎ তু বিষয়াত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ।।৩৫।।

আগের সূত্রের আলোচনায় বলা হয়েছিল, ভক্তি সাধনায় দুটো জিনিসকে আনা হয়েছে, নিষেধ আর বিধি। বিধি মানে যেটা করতে হবে, যেটাতে আনন্দ আসে। নিষেধ না করলে মন হাল্কা জিনিসের দিকে চলে যাবে অন্য দিকে আনন্দ না থাকলে মন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার দিকে চলে যাবে। এই দুটো প্রত্যেক সাধনাতেই হয়, প্রথমে নিষেধ দিয়ে শুরু করছেন – বিষয় ত্যাগ আর সঙ্গ ত্যাগ। বিষয় ত্যাগ মানে, স্থূল ভোগ্য বিষয় গুলোকে আগে ছাড়তে হবে, তার সাথে সাথে বিষয়ের প্রতি মনের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে সেটাও ছাড়তে হয়। যে কোন জিনিস যখন ভোগ করা হয় তখন সেই ভোগ মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে। ভোগে কিছু সুখের অনুভূতি থাকবে, অনেক সময় কিছু কষ্টের অনুভূতিও থাকে। যেমন বাচ্চারা প্রথম নাগরদোলায় চাপতে গেলে ভয় পায়, চাপিয়ে দিলে একদিকে মজাও পায় আবার ভয়ও পায়। পরে আবার চাপতে চায়, কিন্তু ভয়টাও থাকে। ভোগের যে ছাপ মনের মধ্যে পড়ছে আর সেই ছাপের মধ্যে যদি সুখের অনুভূতিটা বেশি থাকে তখন বার বার মন ঐ ভোগের দিকে চলে যায়। ভোগে সুখের মাত্রাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে ভোগে বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের যোগ থাকে সেই ভোগে সুখের মাত্রা বেশি থাকে। নারী পুরুষের যে সঙ্গ তাতে সব থেকে বেশি ইন্দ্রিয় যুক্ত থাকে আর খাওয়া-দাওয়াতে। সেইজন্য মানুষ ঘুরে ফিরে এই দুটো ভোগেই বেশি যেতে চায়। বঙ্কিম বাবু ঠাকুরকে আহার, নিদ্রা, মৈথুনের কথা বলছেন। নিদ্রাটা ছেড়ে দিলে আহার আর মৈথুন এই দুটোতে মানুষ বেশি আকর্ষিত হয়। বেদে একটা মন্ত্রে আছে, সোমরস পিষে রস তৈরী করে কাপড় দিয়ে যখন ছাঁকছে তখন নীচের পাত্রে পড়ার যে আওয়াজ হচ্ছে, বা গ্লাশে মদ ঢালার সময় যে আওয়াজটা হয়, সেটা কান দিয়ে শুনছে, চোখ দিয়ে দেখছে, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে, জিভ দিয়ে আস্বাদ করছে, সব ইন্দ্রিয় ওতে জড়িয়ে পড়ছে। যে ভোগে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই পুরোদমে জড়িয়ে থাকে সেই ভোগ মানুষের মনকে গভীর সুখ দেয়। মন যদি দেখে পাঁচটা ইন্দ্রিয় একটা জায়গাতে গিয়ে পড়ছে তখন মন সেটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, আর সেটাই বিশেষ ভাবে স্মৃতিতে ছাপ রেখে দেয়। মৈথুনেও ঠিক একই জিনিস হয়, ওতে কর্মেন্দ্রিয় গুলিও নেমে যায়। আর যে ভোগে নিজেকে বিশিষ্ট মনে হয়, এই জিনিসটা আমার কাছেই আছে আর কারুর কাছে নেই,

সেই ভোগ মনকে খুব জোর টানে। মনে যে স্মৃতিগুলো থেকে যায়, যেগুলোকে সে নিজের জন্য খুব শুভ বা ভালো মনে করে, সে বার বার ঐদিকেই বিষয় সঙ্গ করতে যেতে চাইবে।

এই জিনিসটাকে অনেকেই লক্ষ্য করবেন, সময় কখন ধীরে যায় কখন তাড়াতাড়ি চলে। মনের মত কিছু হতে থাকলে সময় তাড়াতাড়ি চলে যায়, অপছন্দের বা একঘেঁয়েমির ব্যাপার থাকলে সময় ধীরে ধীরে যায়। কেন এটা হয়? মানুষ যেভাবেই থাকুক সব সময় সে কাজ করে যাচ্ছে, চুপচাপ বসে আছে তখনও সে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মনের একটা অংশ সময়ের প্রতি সচেতন থাকে, সময় যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই ব্যাপারে সে সজাগ। মনের মত যখন সে কাজ করতে থাকে তখন মনের বেশির ভাগ অংশকে ঐ কাজের আনন্দটা টেনে নেয়, সেইজন্য কিছুক্ষণের জন্য মন সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকে না। সময়ের প্রতি সজাগ না থাকাতে ওখানে একটা গ্যাপ এসে যায়, কিছুক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখে, আরে এতক্ষণ সময় চলে গেল! মন সব সময় নিজে কোথাও একটা হিসাব রাখছে টিক টক টিক টক, মাঝখানে টিক টকটা বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাল, আরে এক ঘন্টা হয়ে গেল, আমি তো মনে করছিলাম পাঁচ মিনিট। কারণ তার সময়ের সচেতনতা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেমনি সে বাইরে ঘড়ি দেখে নিল তখন তার মনের ঘড়ির কাঁটাও ঠিক করে দেওয়া হয়ে গেল। মাঝখানে কয়েকজন স্লিপ সাইকোলজিস্ট রিসার্চ করছিলেন, একজনকে তিন দিনের জন্য ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তার থেকেও আরও মজার পরীক্ষা করেছিলেন, একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে মাটিতে এমন ভাবে পুঁতে রাখা হয়েছিল যাতে সে মরে না যায়। পরে ওদের বার করে নিয়ে আসার পর দেখা গেল ওদের সময়ের বোধটাই হারিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সব সময় যে সময় এগিয়ে যাবে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও যায়। মূল কথা সময়ের চেতনাটা পুরো ওলোটপালট হয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে যখন উঠছে তখন সময়ের সচেতনতাটা বন্ধ থাকে, ঘড়ির কাঁটা দেখে মন নিজের টাইমটা আবার ঠিক করে নেয়।

এই ব্যাপারটা জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের ভেতরে হচ্ছে। আমার টাইম, এনার টাইম, আপনার টাইম সবারই টাইম যেন এক থাকে। সেইজন্য মানুষ হাতে ঘড়ি লাগিয়ে চলে। মানুষ সূর্য দিয়ে, ঘড়ি দেখে সময় ঠিক করে নেয়, নাহলে সব এলেমেলো হয়ে যাবে। অন্যান্য যে ইমোশানস্ আমাদের মধ্যে রয়েছে সেখানে আমি আপনি কেউই এক নয়। একজনের মধ্যে হয়ত প্রচুর ভালোবাসা আছে, তার মন ঐ ভালোবাসার প্রতি সজাগ। অপরকে ভালোবেসে ঐ ভালোবাসাকে সে ভেরিফাই করে নেয়। আমরা মনে করছি সে ওকে ভালোবাসছে, কিন্তু না, ভেতরে যে ভালোবাসাটা আছে সেটাকে বাইরে ভেরিফাই করে, ওখান থেকে দুটো টিউনিং হয়ে যায়। কিছু কিছু ছেলে আছে তারা যে কোন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করে নেয়। আমরা মনে করি ছেলেটা খুব বাজে, কিন্তু তা নয়, ভেতরে তার প্রচণ্ড ভালোবাসা। বৃদ্ধা মহিলা, তার ভেতরে প্রচুর ভালোবাসা, ভেরিফিকেশান করার সুযোগ পাচ্ছে না, তখন সে পাড়ার বাচ্চাদের ভালোবাসে, কুকুর বেড়ালকে ভালোবাসছে। বিধবা হয়ে গেছে, বিয়ে ভেঙে গেছে, কিছু দিন পর সে একটা বেড়াল বা কুকুর পুষে নেয়, ভেতরে ভালোবাসা ভরপুর, তার মন তাতে খুব সজাগ, সেটাকে সে বাইরে ভেরিফাই করছে। ভেতরে বিরাট পাণ্ডিত্য, বাইরে বই পড়ে মন ভেরিফাই করছে। ভোগের ব্যাপারে ঠিক তাই হয়, মনে ভোগের সাংঘাতিক ইচ্ছা, ওটাকে বাইরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ভেরিফাই করে। আসল জিনিসটা যা কিছু আছে ভেতরেই আছে বাইরে কিছু নেই। বাইরের যেটা প্রকাশ সেটা শুধু ভেরিফাই করে। ভেরিফিকেশানের জিনিস বাইরে যদি না পায়, সময়ের সচেতনতা নিয়ে যেমন হয়, ও নিজের মত একটা সময় ভেবে নিয়ে ওর মধ্যেই চলতে থাকে। ঠিক তেমনি বাইরের জগৎ যদি না পায়, ও নিজের মত ভেতরে একটা জগৎ তৈরী করে নেয়। সেই জগতে তার সব কিছুই আছে, সেখানে দৈত্য আছে, দেবতা আছে, সেখানেই ভালোবাসার জিনিস আছে। স্ত্রীজোফেনিয়া যাদের হয় তাদের এই একই জিনিস হয়, ওদের ভেতরে কিছু ইমোশানস্ আছে, সেই ইমোশানসের ভেরিফিকেশান হয় না। তার মধ্যেও ভালোবাসা আছে, সেই ভালোবাসার মধ্যে একটা ইমেজ আছে, আমি যাকে ভালোবাসব সে কেমন হবে। তাকে সে পেল না, বা যাকে ভালোবাসত, যেখানে মনটা স্থির ছিল সে ছিটকে গেল। তাকে পাচ্ছে না, বুঝে গেল আমি আর তাকে পাব না। তখন সে নিজের একটা জগৎ তৈরী করে নেয়, ঐ জগতে বাইরের বাস্তব জগতের জিনিসগুলো খাপ খাবে না। যার জন্য অনেক সময় দেখা যায়, যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সে যাকে ভালোবাসত, তার স্মৃতির সাথে লিঙ্ক করে তাকে ধীরে ধীরে ওখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসে।

বিষয় আর সঙ্গ দুটো একই জিনিস, সঙ্গ মানে বিষয় ভোগের সূক্ষ্ম ইচ্ছা, সূক্ষ্ম বাসনা। ভেতরে যেটা আছে বাইরেও ওটাই থাকতে হবে। সেইজন্য মানুষের ভোগের প্রবৃত্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তার বাইরে কি আছে তার ভেতরে কি আছে। বিষয় আর সঙ্গ সব সময় এক অপরকে সুদৃঢ় করতে থাকে। যত ভোগ করা হবে তার সঙ্গটাও তত বাড়বে। সূক্ষ্ম বাসনা যদি থেকে যায়, আজ হোক কাল হোক, ওর মনের মত হচ্ছে না, একটু ফাইন টিউনিং করে হয়ত বার করে সেখানে গিয়ে ধপাস করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে একজনকে খুব ভালোবাসে, সে বুঝতে পারছে না কেন সে ভালোবাসে। তারপর রিসার্চ করে দেখা গেল, সে যখন ছোট ছিল তখন তার বাবা মারা গিয়েছিল, এই ভদ্রলোকের চুল আচড়ানো, জামা-কাপড় পড়া কোথাও যেন বাবার সাথে মিল আছে। মিল দেখার পর পুরো ভালোবাসাটা গিয়ে তার মধ্যে ঢেলে দেয়। আসলে ঢালে না, ওর মনে যে বাবার প্রতি ভাব, ঐ ভাবটা ওখানে গিয়ে ভেরিফাই হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে বাচ্চারা যেমন এক অপরের হাত ধরাধরি করে যায়, মাঝে মাঝে হয়ত হাত ছাড়া হয়ে গেল, আবার ধরে নেয়। সঙ্গ আর বিষয় ঠিক এভাবে চলে, এক অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলে। হিন্দু ধর্মে সেইজন্য মৈথুন জিনিসটাকে গুরুত্ব দিত না। গুরুত্ব হল সন্তান, সন্তানের জন্য একজন স্ত্রী দরকার। তুমি একেই বিয়ে কর আর তাকেই বিয়ে কর একই জিনিস। সেইজন্য ছেলে মেয়েদের নিজেদের পছন্দ করতে দিতেন না। এখন সন্তান গৌণ হয়ে গেছে, স্ত্রীকে দিয়ে ধর্ম সাধন গৌণ হয়ে গেছে। এখন ভালোবাসাটা নিজের উপর চলে আসাতে ঐ জিনিসটার গুরুত্ব হয়ে গেছে। ভালো মন্দ যাই হোক সেটা আলাদা, কিন্তু মূল হল ভেতরে যা বাইরে ঠিক সেই জিনিসটাকেই ভেরিফাই করে। তার মনের মত জগৎ না হলে নিজের একটা জগৎ বানিয়ে নেবে আর তা নাহলে একটু সামান্য টিউনিং করে অন্য কারুর দিকে লাগিয়ে দেবে।

এখানে ভক্তিশাস্ত্রে বলছেন বিষয় ত্যাগ করতে হবে, আর তার সাথে সঙ্গ ত্যাগ যেন অবশ্যই হয়। কারণ বিষয় বাইরের বস্তু, কিন্তু একই জিনিস ভেতরেও আছে। আর যেটাই ভেতরে আছে বাইরে সেটার প্রতিই যায় আর এক অপরকে জড়িয়ে ধরে রাখে। গীতাতে ভগবান বলছেন, *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*, যখন একটা জিনিসকে চিন্তন করছে, চিন্তন করছে মানে বিষয়টা আছে বলেই চিন্তন করছে, এই চিন্তন করছে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন একটার পর একটা কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ বিষয় চিন্তন ছাড়া থাকতে পারে না। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, তোমরা যারা সংসারে আছ তোমরা মনে ত্যাগ করবে। কারণ মানুষ সংসার ত্যাগ করতে পারবে না, তার স্ত্রী পুত্র আছে, কী করে সংসার ত্যাগ করবে! বাড়িতে আজ বিয়ে, কাল অন্নপ্রাশন, পরশু শ্রাদ্ধকর্ম এগুলো লেগেই থাকে, সেখানে তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, তাকে ভোগ করতে হবে। আবার লোকেদের দেখানোর জন্য কিছু জিনিসকে তার রাখতে হবে। ঠাকুর সেইজন্য সংসারীদের মন থেকে ত্যাগের কথা বলছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের জন্য দুটোই ত্যাগ, মনেও ত্যাগ বাইরেও ত্যাগ। মনের ত্যাগ মানে সঙ্গ ত্যাগ। আমাদের সমস্যা হল, এইসব কথা শুনে শুনে আমাদের মনে হয় আমার মনে ত্যাগ আছে বাইরে কিছু না। একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বলছেন, আমাদের রাজা জনকের মত। ঠাকুর তাকে বলছেন, রাজা জনকের মত হওয়া কি মুখের কথা! রাজা জনক তার আগে হেঁটমুণ্ডু হয়ে কত তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা যদি না থাকে, নির্জন বাস যদি না হয়ে থাকে, দীর্ঘ দিন গভীর ভাবে জপ-ধ্যান যদি না করা হয়ে থাকে, কখনই সম্ভব হবে না যে বিষয় ত্যাগ না করে সঙ্গ ত্যাগ করে দেবে। খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসীরাই পারেন।

সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে লোকসংগ্রহ আর লোকদৃষ্টি এই দুটো কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। লোকসংগ্রহ আর লোকদৃষ্টি মানে, সন্ন্যাসী মনে করছেন আমি অধ্যাত্মের ব্যাপারে কিছু জানি, আমি চাইছি লোকেরাও জানুক। খুব ভালো, এবার উনি ধর্মের উপর ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। ক্লাশে শুধু মহিলারাই আসছেন। ক্লাশ পর্যন্ত ঠিক আছে। ক্লাশের বাইরেও যদি শুধু মহিলারও থাকে, সন্ন্যাসী মনে করতে পারেন তাদের তো আমি দুটো ধর্মের কথাই বলছি। না, চলবে না। লোকদৃষ্টি বলে একটা জিনিস আছে, এটাই বাকি লোকেদের উপর কুপ্রভাব পড়ে। সন্ন্যাসী বলতে পারেন আমার তো মনে ত্যাগ আছে। মনে ত্যাগ হয়ে গেলেও সন্ন্যাসী অপরের মধ্যে কুপ্রভাব ফেলার জন্য এই কাজ করতে পারেন না। স্বামীজী অমরনাথ যাচ্ছিলেন, সাথে নিবেদিতা এবং আরও অনেকে ছিলেন। রাস্তায় দুজনের তাঁবু পাশাপাশ ফেলা হয়েছে। একজন সাধু এসে স্বামীজীকে বলছেন, আমরা জানি আপনি পরমহংস, কিন্তু আপনার তাঁবুর পাশেই মহিলার তাঁবু এটা ঠিক না, অন্যদের উপর এর খারাপ প্রভাব পড়বে, এটা সরিয়ে নিন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দিলেন। এটাই লোকদৃষ্টি। সন্ন্যাসীর জন্য

এই যে বিষয় ত্যাগ, সঙ্গ ত্যাগ, তার থেকে আরও বেশি, লোকদৃষ্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। যদি মনের মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকে, তাও আপনাকে ত্যাগ করতে হবে, দুর্বলতা যদি নাও থাকে তাহলেও ত্যাগ করে রাখতে হবে।

একজন খ্রীশ্চান ফাদার ছিলেন, অনেক বয়স হয়ে গেছে। একজন বৃদ্ধা নিয়মিত তাঁর লেকচার শুনতে আসত। একদিন সেই বৃদ্ধা ফাদারকে বলছে, আমি আপনার সাথে আলাদা একটু কথা বলতে চাই। বৃদ্ধা বলছে, ফাদার! আপনি এত ফেমাস, এত লোক আপনার লেকচার শুনতে আসে কিন্তু আমার মনে হয় আপনার ভগবানের উপর একটুও বিশ্বাস নেই। ফাদার বলছেন, হ্যাঁ, এটা সত্যিই আমার ভগবানের উপর বিশ্বাস নেই। বৃদ্ধা তখন বলছে, তাহলে এত কষ্টকর জীবন কেন পালন করে যাচ্ছেন? চলে যান, বিয়ে থা করে সংসার করুন, শান্তিতে থাকবেন। ফাদার বলছেন, হ্যাঁ, আমি অনেকবার এটা ভেবেছি, কিন্তু আমি যদি তাই করি তখন এত লোকের আস্থা চূর্ণ হয়ে যাবে, এই জিনিসটাকে আমি হতে দিতে চাই না, আমার জীবন যাই হয়ে যাক, এত মানুষের গভীর আস্থাকে চূর্ণ হয়ে যেতে দেব না। এখানে অনেক রকম তর্কবিতর্ক আসবে, অপরের ভালো করে কি হবে আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও। এই জায়গাতে এসেই দুটো ধর্মের দ্বন্দ্ব লেগে যায়, একটা নিজেকে নিয়ে বাঁচানো আরেকটা অপরকে বাঁচানো। সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে পাঠালেন, তিনি জনগণের স্বার্থে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। অনেকে আবার নিজেরটুকু রেখে দেয়। জীবন সব সময় আমাদের সুযোগ দেয়, ঐ সুযোগের ক্ষেত্রে যেটাই আমরা পছন্দ করি না কেন, সেটাতেই নিন্দা হবে। কিন্তু দেখার এটাই, যে পথকে বেছে নিয়েছে সেই পথে থেকে সে কত বড় হয়েছে। সেইজন্য না জেনে কক্ষণ কারুর নিন্দা করতে নেই। বেলুড় মঠে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, বছর পাঁচেক ছিলেন। কাজে কর্মে খুব ভালো ছিল, ভালোমন্দ মিলিয়ে ছিল। তারপর কি তাঁর ধারণা হল যে আমার দ্বারা সন্ন্যাস জীবন হবে না। মঠে ছেড়ে চলে গেলেন। দু তিন বছর একবার মঠে এসেছিলেন, যাঁদের সাথে পরিচিতি ছিল সবার সাথে দেখা করলেন। যাবার সময় তিনি খুব দুঃখ করে বলছেন, আমি পাঁচ বছর কাদের সাথে ছিলাম! যাঁকেই প্রণাম করছি সবাই একই প্রশ্ন করছেন, বিয়ে থা করেছ? শুধু একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, যাঁর কাছে এই ব্রহ্মচারী খুব যেতেন, ব্রহ্মচারীকে দেখেই মহারাজ কী খুশী। মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন, তুমি পাঁচ বছর এখানে ছিলে, গীতা উপনিষদ পড়েছিলে, জপ-ধ্যান শিখেছিলে, তোমার বর্তমান জীবনে ওগুলোকে পালন করছ তো? এটাই হল দৃষ্টিভঙ্গী। কে সন্ন্যাসী, কে গৃহী হয়ে আছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়, ব্যাপার হল, জীবনের যে উচ্চ আদর্শের শিক্ষা পেয়েছেন কোন এক সময়, সেই আদর্শকে কাজে লাগাচ্ছেন কিনা।

এখানে মূল হল বিষয় ত্যাগ আর সঙ্গ ত্যাগ, সঙ্গ ত্যাগ মানে মনে যে আসক্তি রয়েছে। যদি দুটো ত্যাগই হয়ে থাকে তবুও লোকদৃষ্টি জন্য বিষয়ের ধারে কাছে সে আর যাবে না। ঠাকুর গল্প বলছেন, একজন রোগী কবিরাজের কাছে যাওয়ার পর কবিরাজ তাকে ওষুধ দিয়ে তিন দিন পরে আসতে বলে দিলেন। তিন দিন পর এসেছে। কবিরাজ বলছেন, তুম গুড় খেও না। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর, একজন কবিরাজকে বলছে, আপনি তো সেদিনই বলে দিতে পারতেন। কবিরাজ বলছেন, বলিনি তার কারণ আছে, সেদিন আমার ঘরে অনেক গুড়ের নাগরি রাখা ছিল। সেদিন যদি বলে দিতাম ও মনে করত, উনি যে কালে গুড় রেখেছেন সেকালে গুড় এমন কিছু খারাপ জিনিস হতে পারে না। আজকে আসার আগেই আমি ওগুলো সরিয়ে রেখেছি। সেইজন্য ভোগবস্তু প্রথমে বাইরে উৎখাত করতে হয়, পরে ভেতরের আসক্তিটাও ধীরে ধীরে ছাড়তে হয়।

অব্যাবৃত-ভজনাৎ।।৩৬।।

আগের সূত্রে যেমন নাকারাত্মক দিক থেকে বললেন, এবার সাকারাত্মক দিক থেকে বলছেন। *অব্যাবৃত-ভজনাৎ*, এক মুহূর্তের জন্যও কোন পরিস্থিতিতে যেন আধ্যাত্মিক সাধনায় কোন ফাঁক না আসে। একটা জিনিস দেখা যায় যে, অনেক দিন সাধন ভজন করতে করতে মানুষ থোকে যায়। কখন আবার হঠাৎ তার মনে হয়, একটু দেখি জগতটা কেমন, ঐ দেখতে গিয়ে অনেকেই ফেঁসে যায়। একজন শেখ উট নিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রিবেলা মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে শেখ শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখে তাঁবুর ভেতরে উটের নাকটা ঢুকে আছে। শেখ উটের মুখেই ডাণ্ডা মারতে শুরু করেছে। উট বলছে, আমি সারাদিন পিঠে করে আপনাকে বয়ে নিয়ে যাই, বাইরে খুব ঠাণ্ডা, নাকটা আমার খুব স্পর্শকাতর, নাকটা তাই ভেতরে ঢুকিয়েছি। আর ছোট্ট নাকটাই ঢুকিয়েছি, বাকি শরীরটা বাইরেই ঠাণ্ডায় পড়ে আছে, আপনি এই টুকু দয়া করুন। শেখ বললেন ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর দেখছেন উটের বিরাট হাড়ি মুখটা তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেছে। শেখ এবার খুব রেগে গেছে। উট তখন বলছে, আপনার এত বড় তাঁবু আর এই আমার এতটুকু ছোট্ট মাথা, তাঁবুর কতটুকু জায়গা আর নিয়েছে, আর কাল সকালেই তো আবার আমি আপনাকে পিঠে বইব। শেখ বলল আচ্ছা, ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখে উট নিজেই ভেতরে ঢুকে বসে আছে, তাঁবুটা নড়ছে। শেখ এবার মোটা ডাণ্ডা তুলে বলছে, এগুলো কি হচ্ছে? উট বলছে, আমি তো ঢুকে পড়েছি, আমার সঙ্গে যদি থাকতে পার থাক তা নাহলে বেরিয়ে যাও। আমাদের সবারই জীবনে তাই হয়। ঐ উটের নাকের রূপ ধারণ করে প্রথমে ঢোকে, তারপর ধীরে ধীরে পুরোটাই ভেতরে ঢুকে আসে। যে কোন দুর্নীতিপরায়ণ লোকের জীবনের ইতিহাস দেখলে সবারই একই ইতিহাস পাওয়া যাবে, কোথাও এক সময় ছোট্ট একটা compromise করেছিল, তারপর ধীরে ধীরে কোথায় যে চলে যাবে, এখন সে চাইলেও আর নিজেকে বাঁচতে পারবে না। বিভিন্ন দেশে যে গুপ্তচর বৃত্তি হয়, সেখানেও ঠিক এই কৌশলটাই চলে, ছোটখাটো জিনিস করে দেওয়ার অনুরোধ করবে, তারপর কায়দা করে এতটুকু করে দেবে। তারপর সেখান থেকে এমন জায়গায় নিয়ে চলে যাবে, যেখান থেকে সে চাইলেও আর ফেরত আসতে পারবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক তাই হয়, সাধনা একটু কমিয়েছে কি কমায়নি, চিন্তা করেছে একটু কমালে হয়, সে এবার ফেঁসে গেল। এটা কিন্তু প্রেমা ভক্তির সাধনার কথা বলছেন, প্রেমা ভক্তির সাধনা সবাই তাই করতে পারে না। আমরা সবাই ধর্মীয় জীবন পালন করছি, কিছু এটাও করছি, কিছু ওটাও করছি, পরা ভক্তির সাধনা পুরো আলাদা। সন্ন্যাসীদেরও অনেক কিছু হয়, একবার এক মহারাজ বলছিলেন, হঠাৎ একদিন দেখি আমার মনটা খুব চঞ্চল হয়ে গেছে, তখন বুঝলাম আমার ভেতরের ইমোশানস্ গুলো চাড়া মারছে। অনেক সময় শোনা যায়, অমুক সাধু অমুক নারীর পাল্লায় পড়ে গেছে। কোন সাধুই কিন্তু কোন মেয়ের পাল্লায় পড়বেন না। ঐ সাধুর মধ্যে ইমোশানস্ আছে, ঐ ইমোশানের কাউন্টার চেকিং হচ্ছিল বা সাধারণ ভাষায় কারুর উপর গিয়ে ওটা বেরোবে। আমরা অনেক সময় মনে করি অমুককে দেখে ওনার মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে। বিশ্বামিত্র মেনকাকে দেখে দুর্বল হয়ে গেলেন। কখনই তা হয়নি। বিশ্বামিত্রের মনে বালতি বালতি কামনা-বাসনা জমে ছিল, মেনকাকে দেখে ওটা উপচে পড়েছে বা ওটারই ভেরিফিকেশান মেনকার উপরে গিয়ে হচ্ছে। সেই মহারাজ বলছিলেন, দেখছি ভেতরে খুব তোলপাড় হচ্ছে। তখন উনি সকাল থেকে রাত জাগ্রত অবস্থায় একেবারে সচেতন ভাবে হৃদয়ের মধ্যে সব সময় ঠাকুর আর মায়ের ধ্যান করতে শুরু করে দিলেন, এক সেকেণ্ডের জন্যও ছাড়ছেন না, কারণ প্রাণের উপর সংশয় এসে গেছে কিনা। একটু ডানদিক বামদিক হয়ে গেলে হয় কোন নারীর পাল্লায় পড়ে যাবেন আর তা নাহলে পাগল হয়ে যাবেন। এইসব বলে মহারাজ বলছেন, এক মাস ধরে লড়াই চালিয়ে গেছি, কারুর সাথে কোন কথা বলিনি শুধু চিন্তন করে গেছি। এক মাস পরেই ধীরে ধীরে ওটা কেটে গেল। উনি বলছেন, তারপর থেকে স্বপ্নেও আমার নারী দর্শন হয় না।

আধ্যাত্মিক জীবনে যদি সামান্য একটুও ব্রেক হয়, এটাই পরে খুব ঝামেলা করবে। সেইজন্য বলছেন *অব্যাবৃত-ভজনাৎ*, শ্রীশ্রীমা বলছেন জপাৎ সিদ্ধি, অনবরত শুধু জপ করে যাচ্ছেন তাতেও সিদ্ধি হয়। আচার্য শঙ্কর এই ধরণের যাঁরা সাধক তাঁদেরকেও সিদ্ধ পুরুষ বলছেন। নিরন্তর সাধনা করে যাচ্ছেন তাঁরাও সিদ্ধ পুরুষ। তবে দুজন লোকের কখনই একই পথ হয় না। নিজের মত ঠিক করতে নিতে হয়। আমি যে চব্বিশ ঘন্টা সাধন ভজন করব, সেই সাধন ভজন আমি কিভাবে করব নিজেকেই ঠিক করে নেওয়া দরকার। যারা অফিসে কাজকর্ম করছে তারা কিভাবে করবে? তারাও ঐভাবেই করবে, আজকাল তো সবারই মোবাইল ফোন হয়ে গেছে, ফোনে সেট করে রাখবে, প্রত্যেক দু ঘন্টা পরে এ্যলার্ম বেজে উঠবে, পাঁচ মিনিটের জন্য একটা গ্যাপ, ঐ পাঁচ মিনিট ঠাকুরকে মনে মনে স্মরণ করবে। অফিসের কাজের পর বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য একটু খেয়ে যদি ঠাকুর ঘর থাকে তাহলে ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে গভীর ভাবে মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর! সারাদিন যা কর্ম করলাম সব তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম, এর ফলের দিকে যেন আমার মন না যায়। তারপর যতটা পারল জপধ্যান করল, গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, কথামৃত একটা কোন গ্রন্থ পাঠ করল, গান করল, আলাদা ঠাকুর ঘর না থাকলে ঘরের একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে এগুলো করবে। এসব না করলে সাধন জীবন হয় না। পার্ট টাইম কোন কিছুই ভালো না, সাধন ভজনে তো একেবারেই চলে না, সারাদিন উল্টোপাল্টা কাজ করে বেড়াচ্ছে আবার উৎসাবাদির দিনে একটু ঠাকুরের নামও করছে, কিছু না

করার থেকে এটুকু করা অবশ্যই অনেক ভালো। ভাগবতে তাই নবধা ভক্তির কথা বলছেন। নবধা ভক্তিতে নটি ভাবের কথা বলছেন, এই নটি ভাবের মধ্যে কোন না কোন একটা ভাবকে সব সময় পালন করতে হয়। ভাগবতে নবধা ভক্তির শ্লোকে বলছেন *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*। নবধা ভক্তির উপর প্রথমের দিকে আমরা একটা বড় আলোচনা করেছি। আমাদের জীবন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা কিছু করছি, সব সময় এই নটি ভাবের মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকে। কখন শ্রবণ করছি, কখন কীর্তন করছি, কখন জপ করছি বা কখন তাঁর সেবাদি করছি। এই নবধা ভক্তি করতে থাকলে ঘরদোরের কাজ, অফিসের কাজ এগুলো সবই করা হচ্ছে কিন্তু এই নটি ভাবের মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে থাকে। এটাই ধীরে ধীরে *অব্যাবৃত-ভজন* নিরন্তর পূজা হয়ে যায়, জীবনটাই একটা উপাসনা হয়ে যায়। এটাও একটা ঈশ্বরে অনুরাগ নিয়ে আসার উপায়। এটাকেই পরের সূত্রে আরেক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছেন।

লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ।।৩৭।।

ভক্তি লাভের আরেকটা উপায় বলছেন। *লোকেঽপি*, দৈনন্দিন জাগতিক যে কর্মগুলো আমরা করছি তখনও যেন ভগবানের নামগুণগান, কীর্তন, শ্রবণ চলতে থাকে। আজকাল অনেকে গাড়ি চালাচ্ছে টেপে গায়ত্রী মন্ত্র বা ওঁ নমঃ শিবায় গান বাজতে থাকে। যুক্তি দিয়ে যদি দেখলে *অব্যাবৃত-ভজন* বা নিরন্তর ভজন সম্ভব না। তার কারণ সংসারে নানা রকমের জঞ্জাল আছে, ঝঞ্ঝাট আছে, তার উপর আবার নানা রকমের কর্তব্য আছে, প্রথম হল নিজের প্রতি কর্তব্য, দ্বিতীয় পারিবারিক কর্তব্য, তৃতীয় সামাজিক কর্তব্য আর চতুর্থ হল এমন কিছু জিনিস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে যা কিনা আমাদের মনকে আকর্ষিত করবেই করবে। পাড়ার কারুর মারাত্মক বিপদ হয়েছে, পরিচিত কেউ মারা গেছে, আমাকে দৌড়ে যেতেই হবে। তার উপর আবার অশৌচের সমস্যা আছে। অশৌচ অনেক ধরণের হয়, কিন্তু অশৌচ মূলত জাতকর্ম সংক্রান্ত হয়, যেমন বাড়িতে কারুর জন্ম হয়েছে বা বাড়ির কেউ মারা গেলেন, তখন অশৌচ হয়ে যায়। অশৌচের সময় কি করে ভগবত ভজন হবে! তার কারণ, এই শাস্ত্রগুলো যখন রচিত হয়েছে তখনও বেদের প্রথা প্রচলিত ছিল। পূজাদিতেও বেদের প্রাধান্য ছিল। নারদ বলছেন, যদি এই রকম পরিস্থিতি থাকেও, পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য তখনও ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ, কীর্তন, অর্থাৎ মানসিক পূজা চালিয়ে নেওয়া যায়। মানসিক জপ, মানসিক পূজা এর সাথে শৌচ অশৌচ, আমাদের যে দৈনন্দিন কর্তব্য এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। অশৌচ হলে পূজা করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু মনে মনে তো জপ করা যেতে পারে। অফিসে কাজ করছে, ক্লাশে শিক্ষক পড়াচ্ছেন, সেখানেও ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ কীর্তন চালিয়ে যাওয়া যায়। শিক্ষক একটা ক্লাশ শেষ হয়ে আরেকটা ক্লাশে যাওয়ার আগে যে দশ পনের মিনিট সময়ের গ্যাপ, তখনও দু তিন মিনিট মনে মনে ভগবানের নাম জপ করা যেতে পারে। মানসিক পূজা, মানসিক জপধ্যান এগুলো সবারই জন্য খুব দরকার। ভক্তির কাজই হল মনকে শুদ্ধ করা, সেইজন্য নিরন্তর জপধ্যান যদি হয়, নিরন্তর নামকীর্তন হয়, মনকে শুদ্ধ করার এর থেকে ভালো উপায় অন্য কিছু হতে পারে না। দ্বিতীয় হল মন কখনই ফাঁকা থাকবে না, মনকে যেমনি ফাঁকা ছেড়ে দেওয়া হবে, ওখানে বিষয় ভাব ঢুকবেই, এর চিন্তা, তার চিন্তা ঢুকবেই। এর থেকে বাঁচার জন্য নিরন্তর ভজন করতে হয়, সব অবস্থাতেই বিষ্ণুর স্মরণ করে যেতে হবে, কোন পরিস্থিতিতেই যেন তাঁর বিস্মরণ না হয়ে যায়। শ্রীমা অজপা জপের কথা বলছেন, এত জপ করতে থাকবে, জপ করতে করতে এমন হয়ে যাবে যে ভেতর থেকে আপনা আপনি জপ হতে শুরু হয়ে যায়। ভেতর থেকে যদি জপ শুরু হয়ে যায় তখন আর খেটেখুটে জপ করতে হয় না। সিদ্ধির একটাই পথ, নিরন্তর ঈশ্বরকে মনে রাখা। জাগ্রত অবস্থায় যতক্ষণ সজাগ থাকছে ততক্ষণ নিরন্তর জপ করে যাচ্ছে, এভাবে টানা এক মাস দু মাস করতে করতে হঠাৎ একদিন হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলটা খুলে যায়, হৃদয়ের কেন্দ্রটা খুলে গেলে নিজে থেকে চেষ্টা করে আর জপ করতে হয় না, তখন ট্যাপের মুখ খুলে দিলে যেমন জল পড়তে থাকে ঠিক তেমনি নিজে থেকেই জপ হতেই থাকে। অজপা জপ এসে গেলে তখন আর শৌচ অশৌচ বলে কিছু থাকে না। *অব্যাবৃত-ভজন* যেটা বলছেন এতে অনেক খাটতে হয়। ঐ খাটা খাটনির পরে এটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়, স্মরণ মনন নিজে থেকেই নিরন্তর হতে থাকে। এই ভাবে ঈশ্বরের নিরন্তর সাধনার কথা প্রত্যেকটি ধর্মে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ঋষিরা বলেছেন, প্রত্যেক মহাত্মারা বলেছেন।

জপধ্যান হল একটা লাগাতার অনুশীলনের ব্যাপার। ছ মাসও যদি খুব নিষ্ঠার সাথে শান্ত মনে দু তিন ঘন্টা জপধ্যান করা হয় তখন ভেতরে একটা কিছু খুলে যায়। সে যদি চুপ করেও কোথাও বসে থাকে তখনও

ভেতর থেকে নিজেই জপ হতে থাকে। যতক্ষণ মন লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করবে ভেতরে কি হচ্ছে, দেখবে আরও জোরে ঐ জপ হতে শুরু করে দিয়েছে। আশেপাশে লোকেরা কথা বলছে সেটাও কানে যাবে, তাদের কথারও উত্তর দেবে। এই জিনিস সবারই হয়, আর যতক্ষণ এটা না হয় ততক্ষণ বুঝতে হবে জপ এখনও ঠিক ঠিক হচ্ছে না। মন যত শান্ত হবে তত জপের গতি বাড়বে, তখন মনে হবে যখন আসনে বাসে জপ করি তখন তো এত গতিতে হয় না, এখন কি করে হচ্ছে! ওটাই হতে হতে মন যখন আরও গভীরে যায় তখন দুম্ করে অনাহত ধ্বণি শুনতে পায়, শুধু ওঁম শুনছে। এবার তার আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা শুরু হল। তার আগে যা কিছু হচ্ছিল সব প্রস্তুতি চলছিল। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি আধ্যাত্মিক জীবন চাইছি কি চাইছি না, যদি চাই তাহলে এভাবেই শুয়ে হোক, বসে হোক, দাঁড়িয়ে হোক করতে হবে, *অব্যাবৃত-ভজনাৎ* যেটা বলছেন। এটাই করে যেতে হয়, করতে করতে একটা জায়গায় এসে কেউ ধরে নেয়। যেমন জিটি রোড দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাচ্ছে, আর একজন সাইকেল নিয়ে তার পেছনে খুব স্পীডে চালাচ্ছে, চালিয়ে চালিয়ে ট্রাকের চেনটাকে ধরার চেষ্টা করছে, শেষে একটা সময় সে ধরে ফেলল। এবার ঐ ট্রাকটাই তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে। মাঝে মাঝে যদি ছেড়েও দেয়, ঐ যে স্পীডটা পেয়ে গেছে, ঐ স্পীডেই সে আবার ধরে নেবে। নিজের যে জপ করা, এই জপ দিয়ে কখন সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের তরফ থেকে যে স্বাভাবিক জপ হয়, ঐ দিয়ে সিদ্ধি হয়। কয়েকটা সূত্রের পরেই আসবে যেখানে সিদ্ধ পুরুষদের কথা বলবেন, সেখানে বলছেন *স তরতি স তরিত স লোকাংস্তারয়তি*। আর সিদ্ধি যদি না হয় তাহলে কি হয়?

সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ কি? *স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি*। এটা যদি না হয় তাহলে বাকি আমি আপনি সবাই নিজে পুড়ে মরব আর সবাইকে পোড়াতে থাকব। এটাকেই মজা করে বলা হয় *স জরতি স জরতি স লোকাংসজারয়তি*। জীবনে দুটোই হয়, হয় সিদ্ধি আছে আর তা নাহলে সিদ্ধি নেই। গীতায় তাই ভগবান বলছেন *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, তিনি নিজেও কখন উদ্বিগ্ন হন না, অপরকেও উদ্বিগ্ন করেন না। ওই রকম সিদ্ধ না হলে এই রকম, তরতি থেকে জরতি হয়ে যায়। ছত্রিশ আর সাইত্রিশ এই দুটো সূত্র হল বিধির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হল নিরন্তর ভজন আর দ্বিতীয় যখন সাধারণ কাজ করছে তখনও যেন ভগবদ্‌গুণের শ্রবণ কীর্তন হয়।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব (ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা)।।৩৮।।

নারদ বলছেন, মহাপুরুষের অনুগ্রহ হলে বা ঈশ্বরের সামান্যতম কৃপা হলেই ঈশ্বরের দিকে মন যায়। Law of periodicity এমন একটা সিদ্ধান্ত যেটার উপর সমস্ত জগৎ ঘুরছে, periodicity মানে Newton's first lawতে বলছেন যেটা চলছে চলবে, যেটা থেমে আছে থেমে থাকবে। Periodicityকে যদি বৃত্তাকারে নেওয়া হয়, যেমন পৃথিবী গোল। আমরা straight line বলে যেভাবে ভাবি সেভাবে সরল রেখা বলে কিছু হয় না, যেটাই আছে সেটাই curved, আলো যখন চলে সেটাও curved হয়ে যায়, আইনস্টাইন এটাই দেখালেন। সরল রেখা বলে কিছু হয় না, পৃথিবীর সারফেস যেমন গোল, তেমনি spaceটাও curved। তাই নিউটনের নিয়ম, যেটা চলছে চলবে, যেটা থেমে আছে থেমে থাকবে, এই নিয়ম খাটবে না। খাটবে না মানে এই জন্য যে, straight লাইন বলে কিছু নেই, সবটাই curved। থিয়োরি হল যেটা ঘুরছে ঘুরতেই থাকবে যতক্ষণ তাকে ঐ orbit থেকে সরিয়ে আনা হয়। নিউটনও বলছেন বাইরের একটা শক্তি লাগে। আমাদের যে কর্মের বিধান, যা কিনা আমাদের সবার জীবনকে চালাচ্ছে, আমরা সবাই ঐ orbitএ ঘুরতে থাকব। আমাদের দরকার একটা ধাক্কা। যতক্ষণ বাইরে থেকে একটা ধাক্কা না লাগে, ততক্ষণ নিজের অরবিটকে ছেড়ে অন্য অরবিটে যেতে পারব না। এই যে কক্ষ পথের পরিবর্তন, একটাকে ছেড়ে অন্য দিকে যাচ্ছে, এটা ভগবদ্ বা গুরুর কৃপাতে হয়, গুরু মানে মহাপুরুষ, ঈশ্বরের অল্প একটু কৃপা হতে হবে। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখি যাঁরা বিরাট কিছু হয়ে গেছেন ভাবি কি করে এরকম হলেন। আমরা দুটো জিনিস তখন বলি, হয় বলি প্রথম থেকে এই রকমই ছিলেন, তা নাহলে বলি, কেমন একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। আচ্ছা কেউ কি পেরেছে এই রকম করতে? তখন বলি কি করে হল এটা, এর জন্য যে প্রেরাণাটুকু পেয়েছে সেটা কি করে পেল? তখন মনে হবে, ঈশ্বরের কৃপা না হলে এমন হবে না। কোথাও একটা ঈশ্বরীয় কৃপা আছে, বা অনেক সময় বলে, অমুক বাবার সঙ্গ করে, তিনিই কিছু করে দিয়েছেন। এটা একটা রহস্য, কেউ জানে না।

এটাই এখানে বলছেন, *মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব (ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা)*। এই যে law of periodicityর কথা বলা হল, কি করে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু এনারা তো আর law of periodicityকে নিচ্ছেন না। কিন্তু এনারা যেটা নিচ্ছেন সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, জগতে দেখা যায় মানুষ যেমন কর্ম করে তেমন আশানুরূপ ফল পায় না। যদি এমন হত যেমনটি কর্ম করা হল ফল তেমনটি পাওয়া গেল, তাহলেও মানুষ বলত, কর্ম করলে ফল পায় চেষ্টা করে তাই ভক্তি পেয়েছে। জগতে যেটার জন্য মানুষ কর্ম করে সেখানে আশানুরূপ ফল দেয় না, সেখানে ভক্তির ব্যাপারে এটাকে কি করে লাগাবে? Uncertainity বলাটাও এই জন্যই ঠিক নয়, আমরা অনেক সময় বলি লাগালে বেশি হয়, একটা আধটা ব্যতিক্রম হতে পারে, যেমন যতটা চেষ্টা করল ফল তার থেকে বেশি পেল, খুব কচিৎ হতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যতটা চেষ্টা করে তার থেকে কমই হয়, Uncertainity কোথাও একটা আছে। একই জমিকে দু ভাগে সমান ভাগ করে দুই ভাইকে চাষ করতে দেওয়া হল, আর একই পরিমাণ বীজ, সার দেওয়া হল। ফসল কাটার সময় দেখা যাবে দুই ভাইয়ের ফসল কখনই সমান হয়নি। এনারা তখন এটাই বলেন, বাবার কৃপা আছে বলে এই রকম হয়েছে। কিন্তু মূল হল, কর্ম আর কর্ম ফলের মধ্যে লিঙ্ক নেই। সেখানে কর্ম কি করে ভক্তির দিকে নিয়ে যাবে, যেটা কর্মের এলাকার পুরো বাইরে। নারদের জীবনের দিকে, ধ্রুবের জীবনের দিকে বা যে কোন মহাত্মার জীবনের দিকে তাকালে এটাই দেখা যায় যে কোথাও একটা এমন external influence ছিল, কোন ভাবে তাঁকে ছুঁয়ে নিয়েছে। ঠাকুর নিজেই কমলাকান্তের গান, রামপ্রসাদের গান শুনছেন, শুনতে শুনতে তাঁর মন ঐদিকে চলে গেল। Divine spark বলতে আমরা যেটা বুঝি, কোন একটা কৃপা, ঐ কৃপা যে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, এই রহস্যটা থেকেই যায়, কিন্তু কোন না কোন ভাবে এটা আসে। গীতাতেও ভগবান বলছেন *দদামি বুদ্ধিযোগং তং*, তোমার এই বুদ্ধি দিয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না, তাই আমি তোমাকে বুদ্ধিযোগ দিচ্ছি। স্বামীজী যখন নরেন, তখন তিনি কত লোকের কাছে যাচ্ছেন, কোথাও তিনি শান্ত হতে পারছেন না। শেষে ঠাকুরের কাছে যেতেই ঠাকুর নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, নরেনের সব পরিবর্তন হয়ে গেল। সব ধর্মেই এই জিনিস আছে। বাইবেলে আছে ভগবান যীশু তাঁর শিষ্যদের বলছেন, তোমরা যাও লোকেদের শিক্ষা দাও। শিষ্যরা বলছেন, আমাদের কথা কে শুনবে? যীশু বলছেন, যে প্রভু আমাকে তাঁর কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন, তাঁর হয়ে আমি তোমাদের অধিকার দিচ্ছি তোমরা যাও, শিক্ষা দাও। সূত্রে এই কথাই বলছেন, বাইরে থেকে কিছু একটা না হলে হয় না।

এর আগে একটা সূত্রে বলেছিলেন *গায়ন্তি আচার্যাঃ*, আচার্যদের কথা, ঋষিদের কথা শ্রুতি প্রমাণ। সেইজন্য আচার্যের কথাকে প্রশ্ন করা যায় না, যেমনটি আছে তেমনটিই নিতে হয়। আচার্যরা বলছেন, আমরা জানি না কেন একজন ভক্ত হয়, কেন একজন হয় না, কেন একজন ঈশ্বরের দিকে যায়, কেন একজন ঈশ্বরের দিকে যায় না। নরেনের যে কথা, যীশুর যে কথা আমরা বললাম, এভাবেই আমাদের গুরু পরম্পরা এসেছে। গুরু হলেন সিদ্ধ পুরুষ, মহাপুরুষ, তিনি কৃপা করলেই হয়ে যাবে। সূর্য যেমন অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি মহাত্মা হৃদয়ের অন্ধকারকে সরিয়ে দেন। সেইজন্য ঠাকুর বার বার সাধু সঙ্গের কথা বলছেন। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন, *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। মহান্তস্তে সমচিত্তঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।।* এখানে দুটো জিনিসকে, বলছেন *দ্বারমাহুর্বিমুক্তে*, মুক্তির দুয়ার খোলা পড়ে আছে। কাদের জন্য? যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের যে সেবা করবে তার জন্য মুক্তির দুয়ার খুলে যায়। আর বলছেন *তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্*, মহাপুরুষদের সেবা বা সাধু পুরুষের সঙ্গ না করে যে কেবল আহার নিদ্রা মৈথুনের মধ্যে পড়ে আছে, এমন লোকের সঙ্গ যে করে তার জন্য তমোর দ্বার একেবারে খুলে যায়। দুটি দুয়ার খোলা, একটা মুক্তির দুয়ার আরেকটি তমো অর্থাৎ নরকের দুয়ার। মুক্তির দ্বার তাদের জন্যই খোলা যারা সাধু সেবা করে, সাধু সঙ্গ করে আর যারা সাধুসঙ্গ না করে শুধু বিষয়ী লোকেদের সঙ্গ করে তাদের জন্য অন্ধকারের দ্বার খুলে যায়।

এই সাবধান বাণী বলে দেওয়ার পর বলছেন, মহাপুরুষ কে। সাধু কে? যিনি সমচিত্ত, প্রশান্ত, বিমন্যু আর সুহৃদ। *সমচিত্তঃ*, যিনি জগতের সব কিছুকে, সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। *প্রশান্তা*, মনের মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য হয় না, সব সময় শান্ত। *বিমন্যু*, ভেতরে কারুর প্রতি কোন রাগ নেই, অপরের কিভাবে ক্ষতি

করা যেতে পারে, এই ধরণের কোন ভাব বা চিন্তা তাঁদের মনে উঠবেই না। *সুহৃদ*, সবারই মঙ্গলের জন্য তাঁরা কাজ করেন। ঠাকুর বলছেন, যাঁর মন প্রাণ ঈশ্বরে আছে, সেই সাধু, সেই মহাপুরুষ। কিন্তু যে কেউ এসে তো বলতে পারে আমার মন প্রাণ সব সময় ঈশ্বরে আছে। আমি কি তাকে মহাপুরুষ মানব? মানতে পার, যদি এই চারটে লক্ষণ তাঁর মধ্যে থাকে। কোন মহাপুরুষের সেবা করলে আমার মুক্তির দ্বার খুলবে? যিনি সমচিত্ত, সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখান, প্রশান্ত, তাঁর মনে কোন উদ্বিগ্নতা বা চাঞ্চল্যতা নেই, বিমন্যু, কারুর প্রতি তাঁর কোন নেতিমূলক ভাব আসে না আর সুহৃদ, সবারই তিনি মঙ্গল করেন। এনারাই মহাত্মা, এনাদের সঙ্গ করলে, এনাদের সেবা করলে মুক্তির দ্বার খোলা। এর বিপরীত, যারা নারীসঙ্গ করছে, বিষয়ের সঙ্গে করছে, এদের সঙ্গ করলে তাদের জন্য তমোদ্বার খোলা।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।।৩৯।।

মহাপুরুষের সঙ্গ বা সাধু সঙ্গ না হলে ভক্তি লাভ খুব কঠিন, এই নিয়ে বিস্তারিত বলার পর এবার বলছেন, সাধু সঙ্গ অব্যর্থ, সাধুসঙ্গের ফল কখন ব্যর্থ হয় না। কিন্তু প্রথমে বলছেন *মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভঃ*, মহাপুরুষের, বা মহাত্মা বা সাধুর সঙ্গ পাওয়াটা খুব দুর্লভ। বিবেকচূড়ামনীতেও বলছেন তিনটে জিনিস পাওয়া খুব কঠিন, মনুষ্যত্ব, অনেকে এর অনুবাদ করেন মানব জন্ম, কিন্তু তা না, ঠাকুর বলছেন, মানে যার হুঁশ আছে, কোথাও যেন চেতনাটা জেগেছে। মানুষ জন্ম হলেই যে তার মনুষ্যত্ব হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বঙ্কিম বাবু যে ঠাকুরকে বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য কিনা আহার, নিদ্রা ও মৈথুন। বঙ্কিম বাবু তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন, নিজের চিন্তার জগতে বিচরণ করতে করতে অনেক কিছু সেখান থেকে সৃষ্টি করছেন। শুধু যে বঙ্কিম বাবুই এভাবে বলছেন তা নয়, আমরা যেখানেই যাই না কেন, গ্রাম হোক, শহর হোক বা আমাদের পাড়াই হোক, মানুষের সাথে মেলামেশা করতে গেলে দেখা যাবে, সবাই নিজের অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় যা কিছু দরকার তার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। এর বাইরে গিয়ে যে কিছু করবে যাতে সে বলতে পারে আমার অস্তিত্বের বাইরে আমি একটু যাচ্ছি। খুব কদাচিৎ কখন কাউকে পাওয়া যাবে। সমাজ তাদের জোরেই চলে। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার বেঁচে থাকার বাইরে তুমি কি করছে? কেউই কিছু বলতে পারবে না। এখানে যে আমরা শাস্ত্র আলোচনা করছি ও শুনছি এর সাথে আমাদের বেঁচে থাকার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যদি শাস্ত্র আলোচনা করতে নাও আসি তাতে আমাদের জীবন চলার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। তার মানে আমরা বেঁচে থাকার যে নুন্যতম কাজ দরকার, তার থেকে বেরিয়ে আসছি। অস্তিত্ব মাত্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও খুব কম লোক করে। বাইরে যে ধর্মসভা গুলো হয় সেগুলোও যেন ইদনিং মনোরঞ্জনের মত হয়ে গেছে, ওটাও ঘুরে ঘুরে জীবন ধারণের উপায়ের মধ্যেই পড়ে যায়। যেমন মানুষ সিনেমা দেখে, সিরিয়াল দেখে, এটাও ওর মধ্যে একটা। মনুষ্যত্ব মানে যেখানে আমি জীবন ধারণের থেকে একটু উপরে উঠে এলাম।

এর মধ্যে একটা মজার জিনিসও হয়, যদি কাউকে মাপতে চাই, জীবন ধারণের বাইরেও কিছু করছে কিনা বা তার মনুষ্যত্ব আছে কিনা, তাকে শুধু জিজ্ঞেস করতে হয় আপনি এমন কোন কাজ জীবনে করেছেন যে কাজটা আপনার মনে হয় আপনি এটা করতে পারতেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছেন। তখন দেখা যাবে ঐ জায়গাতেই তার মনুষ্যত্ব আসাটা শুরু হয়ে যায়। কেউ হয়ত বলবে, আমি ক্লাশ টেন পাশ করতে পারব এটা ভাবিনি। সেখানে একটা জিনিস পরিষ্কার, একটা তো জীবন ধারণের লড়াই, কিন্তু তার সাথে বিদ্যার একটা ব্যাপার কোথাও থাকে কোন সন্দেহ নেই। এটাই মনুষ্যত্ব, আমি এমন একটা কাজ করেছি যেটা আমি কখনই ভাবিনি যে আমি এটা পেরে উঠব। কিন্তু ওটা আহার, নিদ্রা, মৈথুনের বাইরে। আহার নিদ্রার মধ্যেও যদি পড়ে ঠিক আছে, কোথাও একটা লড়াই চলছে, যেমন কেউ বলল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাটা আমি পার করতে পারব ভাবতে পারিনি, কোথাও তার একটা লড়াই ছিল, পড়াশোনা করেছে, যদিও সেখানে তার চাকরি পাওয়ার একটা আশা জড়িয়ে আছে। কিন্তু ঠিক ঠিক হল, যারা এখানে ছয় বছর, সাত বছর ধরে শাস্ত্র কথা শুনে যাচ্ছে, এখানে তাদের কোন আশা নেই যে আমার প্রমোশন হবে, ভালো একটা চাকরি পাবে। কত দূর থেকে বাড়ি ছেড়ে, বাসে ট্রেনে পয়সা খরচ করে দিনের পর দিন এখানে নিষ্ঠার সাথে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছে, এটাই ঠিক ঠিক মনুষ্যত্ব আসার লক্ষণ।

*মুমুক্ষুত্ব*ও ঠিক সেই রকম। কিন্তু *মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ*, এটা অসম্ভব। মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়া যায় না, তাঁরা আশ্রয় দেবেন না। তার পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে। অনেক আগেকার এক মঠের কাহিনী আছে। অনেক ভক্তই মহারাজদের কাছে মঠে আসেন। হঠাৎ একদিন এক ভক্তের কি খেয়াল হল, তিনি মহারাজকে বলতে শুরু করলেন, শুনেছি আগেকার দিনে মহারাজরা অনেক ধর্মীয় কথা বলতেন, ঠাকুরও তাই বলছেন, সাধুদের সামনে ধর্মীয় কথা বলতে হয়। কিন্তু আমি আপনার কাছে এত দিন ধরে আসছি আপনি তো কোন দিন ধর্মীয় কথা বলেন না। মহারাজ তখন বলছেন, ঠিক আছে ধর্মের কথাই আমি আজ আপনার কাছে বলব। মহারাজ ধর্মের কথা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ভক্ত বলছেন, থাক, আমরা যে গল্পগুলো করতাম সেটাই করি। সাধুদের কাছে মানুষ যখন যায় তিনি তার মনের অবস্থা বুঝে নেন, বুঝি নিয়ে আর নিজের মুখ খোলেন না। দক্ষিণেশ্বরে একটি বাচ্চা ছেলে সেই সময় তার দাদুর সাথে গঙ্গায় স্নান করতে যেত। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়ে ছেলেটি তার দাদুকে জিজ্ঞেস করছে, উনি কে? দাদু বললেন, উনি অনেক উপদেশ দেন। একদিন দাদুর চোখের আড়ালে কি করে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে পৌঁছে গেছে, গিয়ে বলছে, তুমি নাকি সবাইকে উপদেশ দাও, আমাকেও উপদেশ দাও। ঠাকুর তখন রামলালকে ডেকে বললেন, ওকে দুটো সন্দেশ দেতো। তাকের উপর সন্দেশ রাখা ছিল, রামলাল এসে সন্দেশ দিয়েছে। সন্দেশ খেয়েছে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, উপদেশ গুলো কেমন? খুব ভালো। ঠিক আছে, এবার এসো। পরবর্তি কালে তিনি স্মৃতিচারণ করে খুব দুঃখ করে বলতেন, ঠাকুরের কাছে গেলাম, ঠাকুর কেমন আমাকে সন্দেশ দিয়ে ভুলিয়ে দিলেন। বেশির ভাগ লোকেদের মহাত্মারা ওনার কাছে যাওয়ার আগে গেট থেকেই বিদায় দিয়ে দেবেন। যদি ভাগ্যক্রমে কেউ গেট পেরিয়ে মহাত্মার কাছে পৌঁছে যায়, তিনি তাকে দুটো সন্দেশ দিয়ে বিদায় করে দেবেন। কেনোপনিষদে খুব সুন্দর আছে, আচার্য শিষ্যকে উপনিষদ বলে যাচ্ছেন। সব শেষে শিষ্য বলছে, আপনার কাছে উপনিষদ অধ্যয়ন করতে এসেছিলাম, এবার উপনিষদ বলুন। গুরু খুব দুঃখ করে বলছেন, তখন থেকে তো আমি তোমাকে উপনিষদই বলে যাচ্ছি। মহাত্মার যদিও কদাচিৎ ভক্তদের কিছু বলে দেন তারা বুঝতেও পারবে না।

মহাপুরুষদের সংশ্রয় কেন দুর্লভ? এর অনেকগুলো কারণ থাকে। প্রথম কারণটাই হল মহাত্মা মাত্রই দুর্লভ। যিনি নিজেই দুর্লভ তাঁর সঙ্গ লাভ তো আরও দুর্লভ। গীতায় ভগবানই বলছেন *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।* হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কয়েকজন এই পথে আসে, তাদের মধ্যেই দু একজন কেউ কদাচিৎ সিদ্ধ হন। তার মানে, মহাপুরুষের সংখ্যাই কম। প্রথমে আসল জায়গার গোড়াতেই মেরে দিয়েছে। যদি আমাকে বলা হয়, কোটিপতিরা কিন্তু তোমাকে বেশি সাহায্য করবে না, প্রথম সমস্যা হল কোটিপতির সংখ্যাই খুব কম। যদি কখন কোন কোটিপতির খবর পেয়েও যাই, চিঠি পাঠালে তারা উত্তর দেবে না, দেখা করতে চাইলে দারোয়ানরা ঢুকতে দেবে না। দ্বিতীয় সমস্যা, সিদ্ধ পুরুষরা যে ভালো আচার্য হবেন তা নয়। তার সাথে আবার দেখা যায় যাঁরা আচার্য হন তাঁদের বেশির ভাগের মধ্যে আচার্যের কোন গুণই নেই। আচার্যের মধ্যে কিছু গুণ থাকতে হবে, মুণ্ডকোপনিষদে আচার্যের কয়েকটা গুণের কথা বলছেন, তিনি শ্রোত্রিয় হবেন, তিনি বেদের বক্তব্য জানেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হবেন, তিনি শাস্ত্রের বক্তব্য শুধু জানেনই না, ধ্যান ধারণা করে শাস্ত্র জ্ঞানে অর্থাৎ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দৃষ্টিতে এই জিনিসটাকেই যদি আরেকটু টানা হয়, তখন এসে যাবে, কামিনী-কাঞ্চনের সাথে তাঁর যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। টাকা-পয়সার বিনিময়ে উপদেশ দেন না।

কিছু দিন আগে ইন্টারনেটে একজন প্রশ্ন করল, গুরুর সন্ধান করছি, ভালো গুরু কোথায় পাব? তাকে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হল, আগে দেখ গুরুর যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকে আর তাকে যদি অনেক মেয়ে শিষ্য সব সময় ঘিরে থাকে, ওদের থেকে দূরে থাকবে। শাস্ত্রটাও ভালো করে এনারা পড়েননি, যদিও পড়ে থাকেন পরম্পরা গত ভাবে বিদ্যা নেননি। নিজের উপলব্ধি চাই, যেমন ঠাকুরের ছিল। কিন্তু অনুভূতির পরেও ঠাকুর আচার্যদের সঙ্গ করেছিলেন, সেখানে তিনি তাঁর অনুভূতি গুলিকে মিলিয়ে নিচ্ছেন, শাস্ত্রের কথার সাথে তাঁর অনুভূতিগুলি মিলছে কিনা। অন্যান্য আচার্যদের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু ঘুরে যায়, যতক্ষণ তিনি জ্ঞান না পেয়ে থাকেন ততক্ষণ তাঁকে সম্প্রদায় বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আচার্য যদি এইসব গুণে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তিনি আবার তখন কথা বলতে চান না। ঠাকুর তো কুঠিবাড়ির ছাদের উপর

থেকে চিৎকার করে বলছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস। অথচ সাধুরা কথা বলতে চান না। ঠাকুরও কথা বলতেন না, ঠাকুরও বলছেন, বিষয়ীদের সাথে কথা বলে আমার মুখ জ্বলে যাচ্ছে। বঙ্কিম বাবু, এত বড় সাহিত্যিক আবার তখনকার দিনের ডাকসাইটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি ঠাকুরের সাথে কথা বলছেন। কথা শুনে ঠাকুর তাঁকে বলছেন, তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। মাইকেল মধুসূদন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাথে কথা বলতে গেছেন, ঠাকুর বলছেন, কে যেন আমার মুখ চেপে দিচ্ছে। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁরা জানেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বঙ্কিম বাবু, মাইকেল মধুসূদন এনাদের কোন স্থান নেই।

স্বামীজী যে বলছেন each soul is potentially divine, প্রত্যেকের মধ্যেই সেই দিব্যত্ব বর্তমান, মানুষ মাত্রই ভগবান। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভবনা লুকিয়ে আছে, সে যে কোথায় চলে যেতে পারে, সেটা অসীম। মানুষের মধ্যে যে শক্তি তার এই শরীরকে চালনা করছেন তিনি এই দেহ মন নন। ভেতরে যে চেতনা শক্তি মানুষকে চালাচ্ছে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবান মানেই অসীম সম্ভবনা, যে কোন লোক আইনস্টাইন হয়ে যেতে পারে, যে কোন লোক পেইন্টিংএ ভ্যান গগ্ হয়ে যেতে পারে, সঙ্গীতে তানসেন হয়ে যেতে পারে। সেখানে ঠাকুর যখন বঙ্কিম বাবুকে ছ্যাঁচড়া বলছেন, মধুসূদন দত্তকে যখন বলছেন, কে আমার মুখ চাপা দিচ্ছে, তখন তিনি খ্রীশ্চান ভাবধারার মত তাঁদেরকে গোল্লায় পাঠাচ্ছেন না, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর যে অবস্থা, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরের অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসছে। নরেনকেও ঠাকুর বলছেন, তোর মুখ আর দেখব না, কিন্তু আবার তো মুখ দেখছেন। আবার একদিন বলছেন, আমার কথা যদি নাই নিস তাহলে এখানে আসিস কেন। আবার তো নরেন না এলে ছটফট করছেন। হাজরাকে গালাগাল দিচ্ছেন আবার মিশছেনও। কারণ, তোমার মধ্যে যে চৈতন্য ঐ মুহূর্তে তোমার বুদ্ধি দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ জিনিসটাকেই তিনি তাঁদের সজাগ করে দিচ্ছেন। বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর বলছেন, ভেতরে সোনা চাপা আছে। শুধু বিদ্যাসাগরের ভেতরেই সোনা চাপা নেই, আমাদের সবার মধ্যেই সোনা চাপা আছে। ওটা একটা বিশেষ মন্তব্য, বিদ্যাসাগরের অনেক দান, ধ্যান আছে তাই তিনি অনেকের থেকে এগিয়ে আছেন। ঠাকুর এও বলছেন, একটু কথা বলতেই ভেতর থেকে চুনোপুটি বেরোতে শুরু হয়ে গেল। এগুলোকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে নেই। ঠাকুরের কাছে উদ্দেশ্য একটাই, তিনি দেখছেন শুদ্ধ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আধারের মানুষ কোথায়। সেটা দিয়েও সমাজ কিন্তু চলে না, সমাজে যেমন ওটা দরকার ঠিক তেমনি অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁদেরও সমান ভাবে দরকার। যাদের সাথে ঠাকুর কোন দিন কথা বলতেন না, সেই ধরণের লোকেদের কাছে গিয়ে গিয়ে স্বামীজী দেখা করছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য আরও অনেক কিছু ছিল। এখানে আমরা বলছিলাম, সিদ্ধ আচার্যরা শিক্ষা দিতে চান না। তার কারণ তিনি যাকে শিক্ষা দেবেন, মহাপুরুষরা কাউকে যে কিছু বলবেন তখন তিনি দেখেন এর মনের গঠন কি রকম। মনের যদি সেই গ্রহণ করার ক্ষমতা না থাকে, ওনারা সেখানে কিছু বলতে যাবেন না। স্বামীজী ছিলেন যুগাচার্য, কেউ শুনতে চাক আর নাইই চাক তিনি বলবেন। তিনিও অনেক জায়গায় রেগে যাচ্ছেন, ক্লাশে যারা শুনতে আসত তাদের ধমক দিচ্ছেন। মহাপুরুষরা যদি দেখেন এর মধ্যে পাত্রতা নেই, ওনারা আর মুখ খুলবেন না। এটা একটা সাধারণ সমস্যা।

মহাত্মাকে যদি কেউ জানতেও চায় কিন্তু তাঁকে চেনা যায় না। মহাত্মা কিনা আমি চিনব কি করে! তিনি কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকেন কিনা আমরা বুঝব কি করে! আমি কি করে একজন সাধু মহাত্মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব আপনি শ্রোত্রিয় কিনা। ঠাকুর বলছেন যাঁকে পাঁচ জন গণে মানে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। ভারতে এখন কত বড় বড় বাবাজী আর তাঁদের যা বিপুল ভক্ত সংখ্যা সেই তুলনায় বেলুড় মঠের ভক্তের সংখ্যা কিছুই না। এইসব কারণে ঠিক ঠিক মহাত্মার সঙ্গ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। হয়ত আমি জেনেও গেলাম বা খবর পেলাম ওখানে একজন সত্যিকারের বিরাট মহাত্মা আছেন, তখন আবার দূরত্বের সমস্যা এসে যাবে। এত দূরে থাকেন যে যাতায়াত করা সম্ভব না। সেই সিন্ধুদেশ থেকে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন হীরানন্দ, তাঁকে আবার সেখানে ফিরে যেতে হল। তিনি চাইলেও আর মহাত্মার সঙ্গ করতে পারবেন না। স্বামীজীর যে শিষ্য-শিষ্যা সবাই স্বামীজীকে চিনে ফেললেন, মহৎ আচার্যের মধ্যে যা যা গুণ থাকা দরকার সব গুণ স্বামীজীর মধ্যে আছে, তাঁরা মেনেও নিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর আর তাঁরা মহাত্মার সঙ্গ পেলেন না, কোথায় আমেরিকা, কোথায় ইংল্যাণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ। যাঁরা একটু সঙ্গ পেতে চাইছেন, তাঁরা পাচ্ছেন না। এখানকার জলবায়ু, ভাষা, খাওয়া, কোনটাই তাঁদের জন্য উপযুক্ত নয়, তারপর এই বিরাটা দূরত্ব।

এরপর হয়ত মহাত্মাকে জানা হয়ে গেল, তাঁর সঙ্গ লাভের সুযোগ হয়ে গেল, কিন্তু গুরু শেষে বলে দিলেন, এখন হবে না। গুরু ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মহাত্মার সঙ্গ পাওয়ার এগুলোই প্রকৃত সমস্যা। প্রথমেই হল মহাত্মা হয় না, খুব দুর্লভ। মহাত্মা হয়ত পাওয়া গেল, কিন্তু মহাত্মার যে গুণ থাকার কথা বলছেন, দেখা যায় কিছু গুণের ঘাটতি আছে। তার উপর তিনি শিক্ষা দিতে চান না, শিক্ষা দিতে চান না বলে প্রকাশ্যে আসেন না, প্রকাশ্যে আসেন না বলে আমরা জানতেও পারি না। যদি কোন মহাত্মাকে জেনে যাই তখন দেখা যাবে তিনি এত দূরে থাকেন যে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে না। তাও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন, তিনি বলে দিলেন, আমি তো তোমার সাথে কথা বলব না। সেইজন্য বলছেন *মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভঃ*। আর বলছেন, *অগম্য*, অর্থাৎ তাঁর সাথে যে যোগাযোগ হবে, তাঁর কাছে পৌঁছানাও দুঃসাধ্য।

কিন্তু কোন ভাবে একবার যদি যোগাযোগ হয়ে যায়, তারপর তিনি যদি গ্রহণ করে নেন এরপর ভক্তি লাভ বা জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর তাকে ছাড়বেন না। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে নাম লেখালে রোগ না সারা পর্যন্ত ছাড়া পাওয়া যাবে না। ঠাকুর যাকে যাকে ধরেছেন, কেউ ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে, তাকে ঠাকুর বাড়িতে গিয়েই বা অন্য রকম কায়দা করেই হোক ঠিক আবার পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আনছেন। মহাত্মা যদি কাউকে একবার ধরে নেন এবার তাঁর প্রভাব সেই ভাগ্যবান পুরুষের আধ্যাত্মিক আর ভৌতিক জীবনে অত্যন্ত ধীরে হলেও কাজ করতে শুরু করে দেবে, সে নিজেও বুঝতে পারবে না। যেমন গোলাপ ফুলের কুঁড়ির উপর সারা রাত ধরে হিম পড়ছে, বুঝতেও পারা যায় না যে হিম পড়ছে, রাতভর হিম পড়ে পড়ে গোলাপের কুঁড়িকে প্রস্ফুটিতে করে দিচ্ছে, প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপাড়ির উপর বিন্দু বিন্দু হিম লেগে আছে। অথচ বৃষ্টি যেমন বোঝা যায় হিমপাত বোঝাও যায় না। গুরু বা মহাত্মার প্রভাব ঠিক এই ভাবে নীরবে নিঃশব্দে ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাবে। আমাদের ব্যক্তিত্ব যেন একটা কাঁসার পাত্র, একটু টোকা লাগলেই ঢং করে আওয়াজ করে, বাতাসে ভাসে, কোন ওজন নেই কিনা। কিন্তু মহাত্মার সংস্পর্শে গেলেই ব্যক্তিত্বের ঐ ফাঁকা কাঁসার পাত্রটা ভর্তি হতে শুরু করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওজন আসার একটা পূর্বাভাস হল তার কথা বলা অনেক কমে যায়। হা হা করে হাসাহাসি করা, গেঁয়োপনা, ইয়ার্কি করা এগুলো বন্ধ হয়ে যায়, ভেতরে ও বাইরে একটা গাম্ভীর্যের ভাব এসে যায়। ব্যক্তিত্বের ওজন আসা মানে এবার সে গম্ভীর হয়ে যাবে। মহাত্মার যে এই প্রভাব এ হল অমোঘ, তাঁর প্রভাব কাজ করবেই করবে। শ্রীমার কাছ থেকে একজন দীক্ষা নিয়েছে। কিছু দিন পর এসে বলছেন, মা! মন্ত্র নিয়ে আমার কোন লাভ হল না, আমি মন্ত্র ফিরিয়ে দিচ্ছি। মা বলছেন, এ কি সাধারণ মন্ত্র, একবার যখন পড়ে গেছে এ কাজ করবেই করবে।

মহাপুরুষের সঙ্গ যে অমোঘই তাই নয়, অত্যন্ত শক্তিশালীও। যারা অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবের, মহাপুরুষের সঙ্গ লাভে তাদেরও স্বভাব পাল্টে যায়। কেউ বলতে পারেন রাবণ পাল্টায়নি, কংস পাল্টায়নি। ওখানে আলাদা ব্যাপার ছিল আর তারা কেউ সঙ্গ করছে না। শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণও সেভাবে তাঁদের প্রভাবিত করতে চাইছেন না বা করছেন না, অনেকগুলো কারণেই প্রভাবিত করেন না। কিন্তু একবার যদি কাউকে তিনি প্রভাবিত করতে চান তখন তাঁর প্রভাবে সেই ব্যক্তির কি হবে এর অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে পাই, গিরিশ ঘোষ, কালিপদ ঘোষ, এই রকম কয়েকজন যাঁরা প্রথম জীবনে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ছিলেন। এই ধরণের মানুষ ভগবান বুদ্ধ, যীশু সবার জীবনেই এসেছিল, কিন্তু তাঁদের প্রভাবে সবারই ব্যক্তিত্ব পুরো পাল্টে যেতে দেখা গেছে। বাল্মীকির জীবনে রত্নাকর যদিও কাহিনী, কিন্তু কাহিনী তখনই লেখা হয় যখন তার ভেতরে কোন কিছুর সার থাকে। রত্নাকর একজন ডাকাত কিন্তু সে সাধু সঙ্গ করেছে, নারদ দু চারটে এমন কয়েকটি কথা রত্নাকরকে বলে দিলেন, যে অহঙ্কার তার বিবেক বুদ্ধিকে ঢেকে রেখেছিল, যে অহঙ্কার বস্তুকে জানতে দিচ্ছিল না, সেই অহঙ্কারটাই রত্নাকরের সরে গেল। সরে যেতেই রত্নাকরের ভেতরে পরিবর্তন শুরু হয় গেল, আমি একি করছি, কেন করছি, কার জন্য করছি। এই যে পরিবর্তন এটাকেই বলছেন অমোঘ।

এটাও খুব অবাক হয়ে যাওয়ার মত বিষয়, অনেক দিন পর, যদিও তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শুনছি না, অন্য ভাবে শুনলেও তার একটা প্রভাব পড়বে। হিমালয়ে অনেক সাধুই তপস্যা করতে যান। একজন সাধু হিমালয়ে তপস্যা করতে গেছেন। সেখানে কাজকর্ম তো কিছু নেই, শুধু ধ্যান, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর চিন্তন। কিন্তু এই সাধুর সাথে একটা রেডিও ছিল, সেটা মাঝে মাঝে শুনতেন, বিশেষ করে নিউজটা শুনতেন। নিউজের আগে কিছু ভালো ভালো কোটেশান দেওয়া হয়। একদিন একটা কোটেশান শুনে তিনি উঠে পড়েছেন, এই

কোটেশান তো কোন মহাপুরুষ ছাড়া হতে পারে না। এই কথা কে বলেছেন, চিন্তা করতে থাকেন। হঠাৎ একদিন রেডিওতেই বলছে, স্বামীজী বলেছেন, বলেই এই কোটেশানটা দিচ্ছে। আরে এটা স্বামীজীর কথা! ঐ কোটেশান সাধুর ভেতর প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। উনি ওখান থেকে একজন সন্ন্যাসী বন্ধুকে ফোন করলেন, ফোনে বলছেন, রেডিওতে হিন্দীতে একটা কোটেশান শুনলাম, এরা বলছে স্বামীজীনে কঁহা থা, তোমার কি এই ধরণের স্বামীজীর কোন কোটেশানের কথা মনে পড়ছে, ইংরাজীত কি বলছে বল তো? হ্যাঁ আছে, ইংরাজীতে এভাবে বলেছেন road to the good is difficult and tortourous। এই হল মহাপুরুষের প্রভাব। একশ বছর আগে স্বামীজী বলেছিলেন, সেটা কোথাও রেকর্ডেড হয়েছে। সাধুদেরও সব কথা মনে থাকে না, কিন্তু রেডিওতে একটা কথা শুনে তাঁর ভেতরে আলোড়ন তৈরী হয়ে গেল। সরাসরি আমাকে যদি নাও বলেন, কিন্তু একশ বছর, পাঁচশ বছর পরেও যদি শুনি, হঠাৎ মনে হবে, কি সাংঘাতিক কথা, কি করে বললেন! তাঁদের প্রভাব অমোঘ, আমাকে একটা কথা নাড়া দেবে আপনাকে অন্য একটা নাড়া দেবে, কাকে কোন কথা নাড়া দেবে আমাদের জানা নেই। যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, কি কি কথাতে তুমি জীবনে প্রভাবিত হয়েছে, তখন আমরা যে দু চারটে কথা বলব সেগুলো আমরা আমাদের মা-বাবার কাছে শুনেছি। সেটাকেও যদি যাচাই করা হয় তখন দেখা যাবে শাস্ত্র থেকে সেই কথাগুলো আসছে। ঠাকুরের কথা, স্বামীজীর কথা অমোঘ। আর সারাদিন যে খবরের কাগজ পড়ছি এর কোনটারই কোন দাম নেই। অমোঘ হল একমাত্র এই ধরণের মহাপুরুষদের কথা।

শুধু তাঁদের কথাই যে অমোঘ রূপে কাজ করছে তা নয়, তিনি কারুর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বলছেন তাতেও হয়, একটু শুধু ছুঁয়ে দিলেন তাতেও হয়, বা তাকে দিয়ে তিনি একটা ছোট্ট কাজ করিয়ে নিলেন, তাতেও অমোঘ কাজ হবে, সত্যি সত্যিই হয়। বেশির ভাগ যে পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তন এক দিনেই হয় না। কি করে হয়, কেন হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু হয়। সারা রাত নিঃশব্দে হিমকণা পড়ে গেল, হিম পড়ে পড়ে কখন যে গোলাপের পাপড়ি গুলো খুলে গেল কেউ টেরই পেল না। বলছেন এনাদের কথাগুলো বটবৃক্ষের বীজের মত। কোন বটবৃক্ষের বীজ একটা পোড়ো বাড়িতে পড়ে আছে, কুড়ি বছর, পঞ্চাশ বছর, একশ বছর ধরে পড়েই আছে। কবে একদিন বাড়ির অবশিষ্ট টুকুও মাটিতে পড়ে গেল, তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে এক বিশাল বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে গেল। এই হল আশ্চর্যের। সেই কথাই বলছেন *মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ*। তার সাথে আবার বলছেন –

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।।৪০।।

ভগবানের যদি কৃপা হয় তবেই তাঁর সঙ্গ পাওয়া যায়, মহাপুরুষের সঙ্গ ঈশ্বরের কৃপা বিনা হয় না। লোকেরা বলে ভগবান ডাকছেন না তাই যাই না, কিন্তু আপনিই বুঝবেন ভগবান কখন ডাকবেন, কখন ডাকবেন না। যদি আপনি অনেক ভগবানের কাছে যান, তাঁর কাছে মাথা ঠুকেন, তাহলে তিনি হয়ত আপনাকে কৃপা করতে পারেন। তিনি তখন একজনের সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। ইদানিং কালে অনেককে বলতে শোনা যায়, বিশেষ করে যারা একটা হায়ার সোসাইটির, তারা খুব করে বলে যে আমি গুরুকে ধরিনি, গুরুই আমাকে চিনেছিলেন বা বলবে গুরু তোমাকে খুঁজছেন, গুরু ঠিক তোমার কাছে পৌঁছে যাবেন। ঠিকই বলছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হল এদের এই কথা আন্তরিকতার সাথে নেওয়া যায় না, কারণ সব ফাঁকিবাজীর কথা। কিন্তু এটাও ঠিক, আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে গুরু শিষ্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর নরেনকে আগেই দিব্য দর্শনে দেখে রেখেছিলেন, শরৎ, শশীর মত অনেককেই ঠাকুর দেখেছিলেন। শ্রীমাকেও ঠাকুর দেখা দিয়ে বলে দিয়েছিলেন, তোমার এই এই শিষ্যরা আসবে। গুরু আগে থেকেই দেখে নেন, তারপর তিনি খোঁজেন। তবে এই ধরণের দৃষ্টান্ত কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই জিনিস হয় না।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, অনেক জন্মজন্মান্তর ধরে পূণ্য কর্ম সঞ্চিত হতে থাকে, সেই সঞ্চিত পূণ্য কর্মের ফলে কোন এক জন্মে গিয়ে তার সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে গেল। তুলসীদাস আবার অন্য ভাবে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্রের দিকে যদি মন দিতে চায় তাহলে সাধুসঙ্গের দরকার, শ্রীরামচন্দ্র যদি কৃপা না করেন তাহলে সাধুসঙ্গ হবে না। এখানে তাঁর কৃপাটা আবার এমন একটা ভেক টার্ম হয়ে যায়। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, যখনই

কোন সমস্যা আসে যার একটা সমাধান দরকার তখন প্রথমেই দেখতে হয় ওর ভেতর থেকেই কোন ভালো সমাধান আসছে কিনা। ওর ভেতর থেকে যদি কোন সমাধান আসে তখন ওটাই সব থেকে ভালো সমাধান হবে। আর ওর বাইরে থেকে যদি সমাধান আসে, ওটাও সমাধান, কিন্তু ভালো সমাধান হবে না। গুরুর কৃপা হচ্ছে না, সাধুসঙ্গ হচ্ছে না, বুঝতে হবে ভেতরে তার সঞ্চিত পূণ্য কর্ম নেই, তার জন্য তাকে খাটতে হবে, শুভ কর্ম নেই, তাকে খাটতে হবে। এটাই হবে ভালো সমাধান, আর নিকৃষ্ট সমাধান হল শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা। দুটোর মধ্যে কি তফাৎ? কোন তফাৎ নেই, কারণ যিনি রাম তিনিই অন্তর্যামী হয়ে আমাদের সবার ভেতরে আছেন। যতক্ষণ অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা না করছি, হে অন্তর্যামী! আমার মন বিষয় বাসনার মধ্যে ডুবে আছে, কুঁড়েমিতে ডুবে আছে। কুঁড়েমি মানুষের সব থেকে বড় দুশমন, কুঁড়েমিতে ডুবে থাকা থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারি তুমি কৃপা কর, হাজার রকম বিষয়ের মধ্যে আমার মন যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এগুলো থেকে আমার মনকে সরিয়ে নাও। তখন, বেদান্তে যাকে বলছেন আত্মকৃপা মানে আত্মার কৃপা, অন্তর্যামীর কৃপা, সেই অন্তর্যামী হলেন শ্রীরামচন্দ্র, তিনি কৃপা করেন। দ্বৈতবাদীরা যাকে মনে করছে শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করছেন, তাকেই যোগ ও বেদান্তের পরম্পরাতে বলেন অন্তর থেকে তাঁর কৃপা এসেছে। যাঁরা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁরা বলবেন ভেতরে ছিল বেরিয়ে এসেছে, যাঁরা বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁরা বলবেন ঠাকুরের কৃপা। যারা একেবারে বিষয়াসক্ত সম্পন্ন তারা বলবে নিজের বুদ্ধির জোরে করেছে। বুদ্ধির জোরে কখনই কিছু হয় না। যেটা হয় তা আত্মার জোরে হয় বা ঈশ্বরের কৃপাতে। বেদান্তে এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেটাই বাইরে থেকে হয় সেটাই ভেতর থেকে হয়। তফাৎ হল আমরা কিভাবে নিচ্ছি। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য নিয়ে পরেও আসবে। সাধুসঙ্গে দৃষ্টিটা খুলে যায়, মন উদাত্ত হয়ে যায়।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী একবার গুজরাতের এক গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা মহারাজকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সবাই ক্ষেতে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। গ্রামের প্রধানকে মহারাজ বলছেন, আপনারা পুরো গ্রাম আমার উপর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন? আমি যদি সব চুরি করে নিয়ে চলে যাই? প্রধান বলছে, চুরি করার ইচ্ছে হলে করবেন, বদনাম হবে। মহারাজের সন্দেহ হয়েছে, জিজ্ঞেস করাতে জানা গেল, কদিন আগেই সাধু বেশে একজন এসেছিল, ওরা গ্রাম ছেড়ে গেছে সাধুটিও সব জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সাধুর প্রতি তাদের এমনই ভক্তি যে তাতে এদের কোন বিকার নেই। তার মানে এমন কোন সাধুকে তারা দেখেছে, পরম্পরায় এমন কোন সাধুর কথা শুনেছে যার থেকে তাদের মধ্যে সাধুর ব্যাপারে একটা বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গিয়ে ওদের মনকে এত বিস্তার করে দিয়েছে যে সাধু এসে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও তাদের সাধুর উপর কোন বিরূপ ভাব আসছে না, সাধুর উপর বিশ্বাসটা চলে যাচ্ছে না। পরের সূত্রে বলছেন –

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।।৪১।।

এটাও একটা খুব আকর্ষণীয় সূত্র। আগের সূত্রে আমরা আলোচনা করলাম আত্মকৃপা আর ঈশ্বরের কৃপাতে কোন তফাৎ নেই। এখানে আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন, *তস্মিন্*, ঈশ্বর আর *তজ্জনে*, ঈশ্বরের ভক্ত এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সেইজন্য ঈশ্বরের কৃপাও যা সাধুর কৃপাও তাই। ৩৯, ৪০ আর ৪১ এই তিনটে সূত্র একত্রিত হয়ে একটাই ভাব সামনে নিয়ে আসে। ঈশ্বর আর ঈশ্বরের ভক্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, এটা কোন ভাবের বা ভক্তির উচ্ছাসের অভিব্যক্তি নয়, এটাই বাস্তব, একেবারে সত্য। আমরা একই জিনিস নিয়ে এর আগেও আলোচনা করেছি, আবারও হয়ত আলোচনা করতে হবে, একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে, একদিকে ভালো এই কারণে যে শুনতে শুনতে ধারণাটা দৃঢ় হয়ে ভেতরে বসে যায়। দেওঘর বিদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের খুব বড় আর নামকরা একটা সেন্টার। ওখানে অনেক ধরণের মানুষ আছেন, ছাত্র আছে, ছাত্রদের অভিবাবকরা আছে, শিক্ষকরা আছেন, ভলেন্টিয়ার্স আছেন, কর্মচারীরা আছেন, ব্রহ্মচারী, মহারাজরা আছেন। যেখানে বেশি কাজকর্ম আর অনেক লোকের সমাগম, স্বাভাবিক ভাবে সেখানে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। বিদ্যাপীঠের কয়েকজন কর্মচারী ও ভলেন্টিয়ার্স খুবই নিষ্ঠাবান কর্মী। একজন ভক্ত কোন সিনিয়র মহারাজকে বলছিলেন, সাধু আবার কি, এই দেখুন অমুক কত নিষ্ঠার সাথে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে যাচ্ছেন, এরাই তো সত্যিকারের সাধু, রামকৃষ্ণ মিশনের কত সাধুদের থেকে এরা কত ভালো। ব্রহ্মচারীদের বয়স কম, তাঁদের অনেকের মনে হত ভদ্রলোক ঠিকই বলছেন। পরে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বুঝতে পারেন যে এর সাথে সাধুর কোন সম্পর্কই নেই। একজন ভদ্রলোক আর একজন সাধুর মধ্যে তফাৎ কোথায়? স্বামী

যতিশ্বরানন্দজী বলতেন, সাধু হওয়ার আগে ভদ্রলোক হও। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীও বলতেন, আগে তোমার ব্যবহারটা ভালো কর, ভদ্র ব্যবহার কর। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন সেন্টারে যেসব অকৃতদার গৃহী ভক্ত বা ভলেন্টিয়ার্সরা সব কিছু ত্যাগ করে ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে অর্পণ করে দিয়েছেন, সেখানে একজন নবাগত ব্রহ্মচারী বা একটু ডানদিক বামদিক করা সাধুর সাথে এদের তুলনা করলে কোথাও দাঁড়াবে? আসলে কোন তুলনাই হয় না। তার কারণ একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক তিনি সেবাপরায়ণ হতে পারেন, ঠাকুরের কাজে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত হতে পারেন, তিনি অকৃতদার, ব্রহ্মচর্য সব থাকতে পারে কিন্তু *তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ*, ঈশ্বরের সাথে ওনার ভেদ থেকে যাবে। কারণ ঈশ্বরের জন্য সে এখনও সব কিছু ত্যাগ করেনি। একজন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী তাঁর মধ্যে অনেক রকম গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু তিনি ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। এখানেই দুজনের মধ্যে গুণগত মানের তফাৎ হয়ে যায়। কেন তফাৎ হয়ে যায়?

একজন ভালো মানুষ, একজন সৎ ব্যক্তি এরা সত্ত্বগুণে বাঁধা, আর একজন নতুন সন্ন্যাসী যিনি ঈশ্বরের পথে বেরিয়ে এসেছেন, একজন ব্রহ্মচারী ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, তিনি সঙ্কল্প নিয়ে নিয়েছেন আমি ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলাম। এই সর্বস্ব ত্যাগ একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, ঈশ্বর ছাড়া আর কারুরই সর্বস্ব ত্যাগ নেই, ঈশ্বরের সাথে প্রকৃতি বা মায়ার কোন সম্পর্ক নেই। সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন, বেরিয়ে আসার পর তিনি দেখছেন সবাই তাঁর দিকে একটা প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। একমাত্র বিষ্ণু লক্ষ্মীকে পাত্তাই দিচ্ছেন না, লক্ষ্মী তাঁর কাছেই চলে গেলন। সর্বত্যাগী একমাত্র ঈশ্বর আর এক সাধু। সাধু হয়ত পুরোটা পারছেন না, তিনি চার পাঁচবার পিছলে যাচ্ছেন, তিনি হয়তো সে রকম নিষ্ঠাবান নাও হতে পারেন, সময়মত জপধ্যানও হয়ত করছেন না, কিন্তু তিনি ব্রত নিয়ে বলে দিচ্ছেন আমিও সর্বত্যাগী। একমাত্র ঈশ্বর যেমন সর্বত্যাগী, তেমনি সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। সেইজন্য বলছেন *ভেদাভাবাৎ*, ঈশ্বর আর সাধু পুরুষে কোন ভেদ নেই। এখানে সাধু পুরুষ বলতে সমাজের সাধু পুরুষ নয়। এখানে সাধু পুরুষ বলতে ঠাকুর যখন বলছেন সাধু কে, ঈশ্বরে যাঁর মনপ্রাণ গত। এখানে শুধু সন্ন্যাসীও নয়, যে কোন মানুষ যে বলছে ঈশ্বরের জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করলাম, আমরা এখানে তাঁদের কথা বলছি। এখন কেউ যদি বলে বাড়িতে থেকে কি হবে না? না হবে না, কারণ বাড়িটা সে নিজের জন্য রেখে দিয়েছে। বাড়িটা রেখে দেওয়া মানে ততটুকু তার থেকে গেল। বাড়িতে থাকলেই চারজন লোক থাকবে, তারা তার সেবা করবে। তা কেন হবে, আশ্রমেও তো চারটে চাকর রেখে তাদের থেকে সেবা নিচ্ছে? না, সেখানেও একটা বড় তফাৎ হয়ে যায়। কারণ গৃহস্থ জানে এই বাড়ি আমার বাড়ি আর এই চারটে লোক আমার লোক। কিন্তু যে সাধুবাবা আশ্রমে চারটে লোক রেখেছেন, তিনি জানেন এরা আমার লোক নয়। ঢপ সাধু কখনই হয় না, ঢপ সাধু সাজে, যেমন রাবণ সাধুর ভেক ধারণ করেছিল, সাধু সেজে সীতাকে অপহরণ করেছিল। কোন সাধুই কখন ঢপবাজ হয় না, নিষ্ঠাতে তাঁর অভাব থাকতে পারে। যারা সিনেমা বা নাটকে সাধু সাজে তারা আসল জীবনে কেউ সাধু সাজে না। কোন ছেলে ক্লাশ ফাইভে ভর্তি হয়েছে, তাকে সবাই এখন ছাত্র হিসাবে সম্মান করবে। ইউনিভারসিটিতে যারা ঢুকছে তাদের সবাই তো আর আইনস্টাইন হবে না, কিন্তু সে সম্মান এই জন্যই পায় কারণ এই প্রথাতে পড়াশোনা করেই আইনস্টাইন আইনস্টাইন হয়েছিলেন। সন্ন্যাস নিয়ে নিল মানে সে এখন ব্রত নিয়ে নিল আমি আজ থেকে সর্বত্যাগী হলাম। এবার তার যত গোলমালই থাকুক, ওগুলো কিছু না, একবার একটু চেতনা জাগলে সব ঝেড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু যারা সংসারে আছে তারা চাইলেও সব কিছু ছাড়তে পারবে না। মুখে কোন ভক্ত বলতে পারে, আমি শুধু অমুক মহারাজ কেন অনেক মহারাজের থেকে ভালো লোক। নিশ্চয় সে ভালো লোক হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীরা হলেন জ্বলন্ত আগুন, কারণ ঈশ্বরের জন্য এনারা সব ছেড়ে দিয়েছেন।

অদ্বৈত আশ্রমের রাঁধুনি একদিন কথায় কথায় একজন মহারাজকে বলছে, আপনাদের থেকে আমাদের কি তফাৎ, আমি বিয়ে করেছি আপনি বিয়ে করেননি, বাকি সব কিছুই আছে। খাওয়া-দাওয়া করছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাবুদের মত অফিসে বসছেন। সে কোন অপমান করার জন্য বলছে না, আর বার বার একটাই কথা, আমরা বিয়েথা করেছি আপনারা বিয়ে করেননি। মহারাজ দেখছেন একে বোঝানো যাবে না, তিনি তাই চুপ থেকে গেলেন। ওকে বোঝান যাবে না যে, সন্ন্যাসী আর অন্যদের মধ্যে একটা গুণগত মানের তফাৎ আছে। একটা পাখির বাচ্চা হাটছে আর একটা হরিণের বাচ্চাও হাটছে। হরিণের বাচ্চা অনেক দ্রুত যাবে, পাখির শাবক কোন দিন তার সাথে পারবে না। পাখির শাবক কিন্তু গুণগত মানে হরিণের শাবক থেকে

আলাদা, একদিন সে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। হরিণের সাথে তার কোন দিন কোন সম্পর্কই হতে পারে না। এই যে পাখি মাটিকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাটি ছাড়া থেকেই এ্যরোপ্লেন আসছে, ঐ মাটি ছাড়া থেকে রকেট টেকনোলজি এসেছে, ঐ মাটি ছাড়া থেকেই মঙ্গলযান তৈরী হয়েছে। অন্য দিকে হরিণ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে না দৌড়ে খুব জোর পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারবে, কিন্তু সে ওর মধ্যেই বাঁধা। একটা হরিণ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে আর একটা চড়ুই পাখির বাচ্চা কোন রকমে এখনও মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ওর সাথে তুলনা করলে সব সময় মনে হবে হরিণ অনেক শ্রেষ্ঠ। হরিণ কখনই শ্রেষ্ঠ না, চড়ুই পাখির জাতটাই আলাদা। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, মানুষ কি কম গা, হাতি এত বড় জীব ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে না, মানুষই পারে, গুণগত তফাৎ হয়ে যায়। সিংহ, বাঘ, হাতি যত শক্তিশালী পশু হোক, মানুষের সাথে তাদের গুণগত বিরাট তফাৎ। তেমনি যত বড় মানুষই হোক, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লোক আর অন্য দিকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ গান্ধীজীর মত, নেতাজীর মত, একজন সন্ন্যাসীকে যদি বলা হয়, নেতাজী দেশের জন্য যা করেছিলেন, সেখানে আপনি কি করেছেন? কচু করেছেন। ঠিকই বলছেন। গান্ধীজীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আপনার কি মনে হয় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর থেকে আপনি শ্রেষ্ঠ? কখনই তিনি তা ভাববেন না। কারণ সন্ন্যাসী ভগবানের জন্য সব ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি না হতে পারে, গান্ধীজীর মত ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম না আসতে পারে, কিন্তু সন্ন্যাস হয়ে যাওয়া মানেই তাঁর জাতই আলাদা হয়ে গেছে।

ঠাকুর বলছেন, গ্রামের একজনের বাড়িতে ভোজ হয়েছে, গ্রামের জমিদার তার নাতিকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ ছোট্ট বাচ্চাকে সেখানে একই সম্মান দেওয়া হবে যে সম্মান জমিদারকে দেওয়া হত। সন্ন্যাসী যেমনই হয়ে থাকুন, ছোট হোক বড় হোক, তিনি ঐ জাতকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, যে জাতটা ঈশ্বরের জাত। প্রকৃতি আর পুরুষের যে বিভাজন, প্রকৃতির সব আছে বিদ্যা আছে, ঐশ্বর্য আছে, ক্ষমতা আছে আর ঈশ্বর বা পুরুষের কোনটাই নেই, অথচ তিনিই মালিক, তিনিই সবার রাজা। পার্বতীর সব কিছু আছে, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সব কিছু আছে, শিব তাই রাজা। এই যে শিব, বিষ্ণু যাঁরা রাজারও রাজা, এই জাতের হলেন সন্ন্যাসীরা, এই জাতের হলেন যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, যাঁদের কথা এখানে আলোচনা করছেন। *তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ*, ঈশ্বরের সাথে ভক্ত বা সন্ন্যাসীর ভেদের অভাব। ভেদ কেন নেই? তার কারণ, এই যে মহাত্মা, এনারা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। তিনি ব্রত নিয়ে নিয়েছেন, আমি ত্যাগী হব। তিনি পেরে উঠছেন কিনা সেটা গুরুত্ব নয়, আইনস্টাইনতো পরীক্ষায় পাশ করতে পারতেন না, তাতে হয়েছেটা কি! তিনি ঐ হাইওয়েটা ধরে নিয়েছেন। হাইওয়ে দুটো বাম্পার থাকতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, হাইওয়ে হাইওয়ে। হাইওয়ের সাথে গ্রামের রাস্থার কোন তুলনাই হবে না। ভেদের অভাব কোন জায়গাতে? শুধু ত্যাগে। ঈশ্বর পূর্ণত্যাগী, পুরুষ পূর্ণত্যাগী, ঠিক তেমনি যিনি মহাত্মা, যাঁর মন প্রাণ সম্পূর্ণ ঈশ্বরে সমর্পিত, এই জায়গাতেই সমানতা, এছাড়া অন্য কোন জায়গায় সমানতা নেই। ঠিক এই কারণেই সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মান দেওয়া হয়। ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য, শুদ্ধ চৈতন্য যিনি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের উপর আর কোন আবরণ নেই। এই জগৎ, এই যে সমাজ এর উপর আবরণ আছে কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের উপর, ভগবানের উপর কোন আবরণ থাকে না। সন্ন্যাসীর উপরেও কোন আবরণ থাকে না, কারণ তিনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। কাগজে কলমে করে দিয়েছেন কিন্তু এখনও পেরে ওঠেননি। কিন্তু শপথ নিয়ে নিয়েছেন মানেই তো হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন, আমাকে কুড়ি জন মানুষ দাও যে বলবে আমার ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই, আমি সমাজকে পাল্টে দেব।

সেইজন্য বলছেন, ঈশ্বর কৃপা করলে পুরো জগতের যেমন কল্যাণ হয়, তেমনি এই যে সাধু, সন্ন্যাসীরা, যাঁরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরের সাথে যাঁদের ভেদের অভাব, এই ধরণের মহাত্মারা যখন কৃপা করেন, আশীর্বাদ দেন, এটা অমোঘ, যে কথা ৩৯ নম্বর সূত্রে বলছেন। কারণ ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা হয়, ঠাকুরও বলছেন, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানে কোন তফাৎ নেই। ঈশ্বরও যা, তাঁর কথাও তাই, তাঁর ভক্তও তাই। তিনটে মিলে একটা জিনিসেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, তা হল পূর্ণত্যাগ।

হিন্দু পরম্পরায় গুরুর মাহাত্ম্য অনেক বেশি পাওয়া যায়, অন্যান্য পরম্পরাতেও আছে কিন্তু অন্য ভাবে আছে। খ্রীশ্চান পরম্পরায় বলা হয় ভগবান সরাসরি কৃপা করেন না। হোলি স্পিরিট যেন ভগবানের দূত, তিনিই এসে মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যান। যেখানে হোলি স্পিরিট নেই সেখানে ডেভিল ঢুকে যায়। খ্রীশ্চানদের

কাছে ভগবানের তিনটে রূপ, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ঈশ্বর, হোলি স্পিরিট আর যীশু। এই তিনটে এক অথচ তিনটে রূপে দেখায়। হোলি স্পিরিট মানুষকে সৎ পথে নিয়ে যান। তিনি যদি না নিয়ে যান মানুষ অরণ্যের পথে যায়। কেন তিনি কাউকে সৎ পথে নিয়ে যান আর কাউকে নিয়ে যান না, এর ব্যাখ্যা ওনারা করেন না। হিন্দু ধর্মেও এই সমস্যা আছে। ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় প্রায়ই আমরা বলছি, তুলসীদাস বলছেন, সাধুসঙ্গ না হলে হয় না, ঈশ্বরের কৃপা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। তার মানে এখানেও ঈশ্বরের কৃপা কারুর উপর হয় কারুর উপর হয় না। হিন্দু ধর্মে অনেক কিছু জিনিস আছে যেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনা বা যাঁরা বলছেন তাঁদের নিজেদের কাছেও জিনিসটা পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয়, কারণ ঐ কথাগুলো শাস্ত্র থেকেই আসে, ঋষিরা যেটা বলেছেন ওটাই আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল যেটা, যেটা থেকে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য সব ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়, তা হল হিন্দু ধর্ম মানব জীবনকে বেশি মাহাত্ম্য দেয়। আমাদের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, অধ্যাত্ম সব কিছু মানুষ কেন্দ্রিক। যেমন কখন বলছেন চেষ্টা করতে হয়, পুরুষাকার লাগাতে হয় আবার কখন বলছেন তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না।

সমস্যা হল, কিছু কিছু ঘটনার দিকে যখন আমরা তাকাই, কিছু কিছু মানুষের যে সাফল্য আসে, আমরা তার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই তাকাই। কারণ আমাদের আশেপাশে বা আমাদের বংশে যাঁরা ছিলেন বেশির ভাগেরই জীবন আমাদের মত একটা গতানুগতি জীবন। তার মধ্য থেকে কেউ মাস্টার হচ্ছে, কেউ কেরানী হচ্ছে, কেউ হয়ত ছোট অফিসার হচ্ছে আর যারা বড় তাদের সবটাই বড়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ মানুষের জীবন ঐ আবর্তের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। ঘুরপাক খেতে খেতে কদাচিৎ কেউ একটা খুব উচ্চ অবস্থায় চলে গেল। আজকে যিনি বিরাট ক্ষমতার শিখরে চলে গেছেন, প্রথম জীবনে তিনি হয়ত হকারি করতেন, সেখান থেকে তিনি বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেছেন। হঠাৎ এই লোকটি বিশাল এক ক্ষমতাবান লোক হয়ে গেছে, প্রচুর ঐশ্বর্য এসে গেছে। এটা কি করে হল? এই জিনিসটাকে দেখার দুটো পথ আছে। একটা হল তিনি এমন কিছু কিছু কাজ করলেন আর এমন এমন কিছু সুযোগ এসে গেল, তিনি সেই সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও মনে হয় পুরো জিনিসটা ব্যাখ্যা করা হয় না। এত লোক থাকতে হঠাৎ সে কেন হয়ে গেল? তখনই মানুষ বলে, ঈশ্বরীয় কৃপা ছিল। ঈশ্বরের কৃপা নিয়ে এলে দ্বিতীয় সমস্যা এসে যায়, ঈশ্বর তাকেই কেন কৃপা করলেন? ঠাকুর বলছেন, তাঁর বালক স্বভাব। মানুষকে বোঝানর জন্য এই কথাগুলো বলা হয়। কিন্তু এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আমাদের কাছে ব্যাখ্যা হল, কত কত জন্ম ধরে কত কিছু করেছে। তখন জিনিসটা বুঝতে সহজ হয়ে যায়। সেখান থেকে আমি যখন আমার উপর নিয়ে আসছি তখন সমস্যা হল, আমার কি হবে? আমার উপর ঈশ্বরীয় কৃপা হবে কিনা? আমি কৃতকার্য হতে পারব কিনা? এই জায়গাতে এসে এই শাস্ত্রগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেখানে দেখাচ্ছেন, চেষ্টা করলে যে একটা জিনিস হয় এই ব্যাপারে তুমি পরিষ্কার কিনা? রান্না করলে খাওয়া পাবে। লোকে যখন রান্না করে, তখন একশোর মধ্যে নিরানব্বুইটা দেখা যায় যে রান্নাটা সফল হয়েছে। কদাচিৎ কোন কারণে রান্নাটা পুড়ে গেল বা খাবারে টিকটিকি পড়ে গেল, রান্নাটা বেকার হয়ে গেল। কিন্তু এই ঘটনা কদাচিৎ হবে, আমরা জানি একশতে একটাও হয় না। আমরা সাধারণ ভাবে জানি কাজ করলে কাজটা সফল হয়। এনারাও ঠিক তাই বলছেন, ঐ যে অল্প একটু ডান দিক বাম দিক যায়, সমাজের সবাই গতনুগতিক বিধির মধ্যে বাঁধা হয়ে আছে, কদাচিৎ একজন বড়লোক গোত্তা খেয়ে গোল্লায় চলে যায়। কদাচিৎ কখন কেউ সাধারণ থেকে দুম্ করে উপরে উঠে যায়। এই ব্যতিক্রমগুলিকে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেখা যাবে পুরো জিনিসটাই পুরুষাকারে বাঁধা।

Law of averageএ averageএর আবার একটা খুব সুন্দর নিয়ম আছে। গড় বার করতে হলে আগে যেটা একেবারে উপরে আছে আর যেটা একেবারে নীচের দিকে আছে এই দুটোকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এরপর বাকি যা কিছু থাকে সব ওর মধ্যেই ঘুরঘুর করছে, ওর বাইরে যাবে না। অনেক সময় বলে, একজন লোকের একশ টাকা মাইনে, আরেকজনের হাজার টাকা মাইনে, তাহলে গড় কত? বলবে, এভাব গড় হিসাব হয় না। পঁচিশ জন লোকের মাইনের এভারেজ যদি বার করতে হয় তাহলে সব থেকে বেশি যার মাইনে আর সব থেকে কম মাইনে যার, এই দুটোকে বাদ দিতে হবে। এরপর যা আছে ওটাকে গড় করলে দেখা যাবে হিসাবটা ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনি একজন খসে পড়ে গেছে, আরেকজন দুম করে উপরে উঠে গেছে, এই দুজনকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। তখন দেখা যাবে বাকিদের জীবন যেমন

চলছিল তেমনই চলছে। তার বাপ ঠাকুরদা যা করত সেও তাই করছে। আজকে যা করছে কালও তাই করবে, কদাচিৎ যে একটু এদিক সেদিক হচ্ছে সেটার কোন দাম নেই। Law of averageএ যে নিয়ম কাজ করে এখানেও একই নিয়ম কাজ করে। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে বা জ্ঞানমার্গে সমস্যা হল আমাদের লক্ষ্য এতো উঁচুতে করে রেখেছে যে দেখেই বোঝা যায় যে এ মানুষের পক্ষে সম্ভবই না। একজন মানুষ ঈশ্বরকে চিন্তা করবে, ঈশ্বরের ভক্তি লাভ করবে, এ কি সম্ভব! কখনই সম্ভব নয়, মানে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এটা কখনই সম্ভব না। কিন্তু শুরু তো কোথাও করতে হবে, কারণ এই যে বলা হল, মানুষের জীবন পুরোপুরি চেষ্টার উপর চলে। একটা অবস্থার পর কি হবে সেটা তো পরে দেখব, তার আগে আমার যে এলাকা এর মধ্যে যেটা করার সেটা করতে হবে। তখন বলছেন, ভক্তি যদি লাভ করতে চাও সাধুসঙ্গ কর। কোথাও তো শুরু করতে হবে। আমি বলছি, আমি শুরু করব না, তিনি কৃপা করবেন। তিনি কৃপা করবেন, নিজের স্থবির রূপে তখন কৃপা করবেন। পাথরের রূপটাও ভগবানের রূপ, গাছপালা সেটাও ভগবানের রূপ, মানুষও তাঁর রূপ, দেবতাও তাঁর রূপ, জ্ঞানীও তাঁর রূপ। ঈশ্বর অবশ্যই কৃপা করবেন, তাঁর যে মৎস্যাবতার, কূর্মাবতার, ঐ সব অবতারে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। এরপর মানুষ করে কুকুর বেড়াল করবে, ঐ ভাবেই তিনি আমাদের কৃপা করবেন। ঐ উচ্চ অবস্থা, যে অবস্থা ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হবে না, সেটা কি করে হবে? সাধুসঙ্গটা কর, ঐটা তোমার এলাকায়, সাধুসঙ্গ থেকে শুরু কর। কেন করবে? আমরা আগে এর বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়েছি।

মূল কথা, ঈশ্বর কৃপা করেন, সাধুরা, মহাপুরুষরা কৃপা করেন। সাধুর কৃপা অমোঘ কেন? অমোঘ এইজন্যই, ঈশ্বরের সাথে তাঁর সমানতা রয়েছে, ঈশ্বর আর তাঁর ভক্ত দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুজন এক। সমানতাটা হয় ত্যাগে, ভগবান হলেন সর্বত্যাগী আর তাঁর যিনি ভক্ত তিনি যে পথ দিয়েই যান, যে ধর্ম দিয়েই যান তিনি সর্বত্যাগী। মুসলমান, খ্রীশ্চান যে ধর্মেই যান তাঁরা সর্বত্যাগী, কর্মযোগী তিনি অহঙ্কার ত্যাগ করছেন, জ্ঞানমার্গী সংসারকে ত্যাগ করছেন, ভক্ত সংসারকে ত্যাগ করছেন, রাজযোগে তিনি মনের বৃত্তিকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন, মনের মধ্যে যে এই বিশ্বসংসারের যা কিছু আছে সব ত্যাগ করে দিচ্ছেন। কোন সূক্ষ্ম বাসনাও নেই, স্থূল বাসনার তো কোন কথাই নেই। যাদের মধ্যে ত্যাগের ক্ষমতা নেই তারা কোন দিনই ধর্ম জগতে প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে আমার আপনার কথা বলছেন না, মহাপুরুষদের কথা বলছেন, মহাপুরুষরা এত উঁচুতে চলে গেছেন যে তাঁরা এখন ভগবানের সমপর্যায়ে চলে গেছেন, ত্যাগের সমানতার জন্য ঐ পর্যায়ে চলে যেতে পেরেছেন। সেইজন্য বলছেন –

তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্।।৪২।।

তাই বলছি, তোমরা ঐ জিনিসটারই সাধনা কর, *তদেব সাধ্যতাম্*। দুবার করে বলছেন জোর দেওয়ার জন্য। কিসের সাধনা করবে? দুটো জিনিসের সাধনা করতে বলছেন। প্রথম হল জাগতিক যা কিছু আছে তার সব ত্যাগ করার সাধনা, দ্বিতীয় যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁদের সঙ্গ করার চেষ্টা কর, তাঁদের সেবা করার চেষ্টা কর। ঈশ্বরের ভক্ত বলতে যে কোন ভক্তের কথা বলছেন না, মহাত্মাদের কথা বলছেন। মহাত্মার গুণের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর আমরাও এর আগে আলোচনা করলাম, যাঁর মন প্রাণ ঈশ্বরেই আছে, যিনি মনে করেন ঈশ্বরই আমার সব, ঈশ্বরের বাইরে আমার কিছু নেই। এই ধরণের মহাত্মাদের আগে খুঁজে বার করতে হয়। যখন একবার খুঁজে পাওয়া গেল তখন তাঁকে ধরে রাখতে হয়। এরপর তাঁরই সেবা, তাঁরই পূজা, তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে হয়। খুব কঠিন কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রথমত, মহাত্মাদের সংখ্যা খুবই কম, দ্বিতীয়ত মহাত্মাদের চেনা আরও কঠিন, তৃতীয়ত চেনা গেল কিন্তু দূরত্বের বাধা এসে যায় আর দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে পৌঁছেও যদি যাওয়া যায় তিনি তাকে গ্রহণ নাও করতে পারেন। এত কিছু সমস্যার পরে যদি ঢুকে যাওয়া যায় তাহলে *অমোঘশ্চ*, কাজ হবেই হবে।

যদি কেউ ভুলভাল গুরুর কাছে পৌঁছে যায় তখন কি হয়? দক্ষিণ ভারতের একজন নামকরা মহারাজ ছিলেন, কিছু দিন আগে তিনি গত হয়েছেন। তাঁর জীবনের একটা মজার ঘটনা আছে। উনি দক্ষিণ ভারতের খুব বড় বংশের, তাঁর বংশে একজন খুব নামকরা সাধু হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে স্বামীজীর বই পড়ে তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে জেগেছে। বিরাট বড়লোক বাড়ির ছেলে, আজকে তাঁরা কোটিপতি। কোথা থেকে গেরুয়া কাপড় জোগাড় করে তিনি নিজে থেকেই সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। এবার তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে পায়ে হেঁটে

মুম্বাই পৌঁছে গেছেন। খুঁজে বার করলেন মুম্বাইয়ে কোথায় রামকৃষ্ণ আশ্রম। মুম্বাইয়ের আশ্রমে গেলেন, সেখানকার মহন্ত মহারাজ দেখছেন একজন সাধুবাবা এসেছেন। হিন্দীতে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, কেয়া সাধুবাবা কেয়া চাহিয়ে। তিনি বললেন কুছ নহি মাঙতা। সে বেচারী অভুক্ত, পকেটে পয়সাও নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে এবার হাঁটতে শুরু করলেন হরিদ্বার যাওয়ার জন্য। রাস্থায় ভিক্ষা করতে করতে হরিদ্বার পৌঁছে গেছেন। তখন কঙ্খল রামকৃষ্ণ মিশনে অনুমতি ছিল বাইরের সন্ন্যাসীরাও ওখানে কাজটাজ করে থাকতে পারতেন। তিনি ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন, আমি এখানেই থাকব। ওনারাও থাকতে দিয়েছেন, কেউ আর জিজ্ঞেসও করেননি। উনিও থেকে গেলেন। এক বছর গেল, দু বছর গেল, এই করে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। অনেক আগেকার কথা, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর তত দিনে খুব নামডাক হয়ে গেছে। তিনি ওখানে গেছেন, সেখানে সাধুদের সাথে কথাবার্তা বলছেন, এই সন্ন্যাসীও বসে ছিলেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ওনার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, উনিও নিজের পরিচয় দিলেন। মহারাজ ওনাকে বলছেন 'তুমি অমুক নামকরা মহারাজের বংশের হয় হঠাৎ বাইরে থেকে সন্ন্যাস নিলে কেন'? খুব গর্ব করে বলছেন 'এমনিই নিয়ে নিলাম'। 'কার কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছ'? 'নিজেই সন্ন্যাস নিয়েছি'। 'নিজেই নিয়েছ মানে'? উনি জানেনও না মন্ত্রদীক্ষা কাকে বলে, কারুর কাছে দীক্ষাও হয়নি, একটা গেরুয়া কাপড় পড়ে এতদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। 'তোমার দীক্ষা কোথায় হয়েছিল'? 'আমি তো জানি না দীক্ষা জিনিসটা কি'। ওখানকার সব সন্ন্যাসীদের তো মাথায় বাজ পড়ার মত অবস্থা। শুধু গেরুয়া কাপড় পড়ে নিজেকে সন্ন্যাসী ভাবছে, আর এদিকে না আছে দীক্ষা, না আছে অন্য কোন কিছু। বয়স খুব কম ছিল। তৎকালীন কঙ্খল আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ তখন ওখানেই ছিলেন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাড়াতাড়ি করে এনার দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভক্তরা ওনাকে এতদিন সন্ন্যাসী রূপে দেখে এসেছেন, এখন সাদা কাপড়ে দেখে মনে করছে দীক্ষার লীডার হয়ে সব কাজকর্ম করছেন। উনিও যে একজন দীক্ষার্থী কেউ বুঝতে পারছেন না। এইবার তাঁর জীবন শুরু হল। তিনিই পরে রামকৃষ্ণ মঠের বিরাট সাধু হয়েছিলেন। কাহিনীটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, পুরোটাই ভুল পথে চলে আসছিলেন।

এই যে কাহিনী বলা হল এটা যে খুব মজার কাহিনী তা না, যাঁর কাছেই সন্ন্যাস নিক, যাঁকেই গুরু করুক, সেই মানুষটি যেমনই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সে নিজে মহৎ, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা জেগেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা জেগেছে মানে, সে যাঁর কাছেই যাবে তার কাছে ঈশ্বরের দুটি কথাই বলবে। যেমনি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করবে, যিনি শুনছেন তাঁর ভেতরে যদি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা জেগে যায় তিনিও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দেবেন। কথা বলতে বলতে তিনি ধরে ফেলবেন যে তার মধ্যে গোলমাল আছে। তিনি তখন তাকে বলে দেবেন, আপনি এই রকম করুন। একজন এসে বলল আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি, তারপর সে মন্ত্রজপ করে করে নিজেকে মহা সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপর একজন খুব সিনিয়র মহারাজের কাছে তাকে পাঠানো হল, মহারাজ সব কিছু শোনার পর বলে দিলেন এটা কোন মন্ত্রই না। পরে তাকে নতুন করে আবার দীক্ষা দেওয়া হল। আরেকজন ভক্তের ঘটনাও খুব উল্লেখযোগ্য। উনি পুলিশের একজন বড় অফিসার। ভদ্রলোক প্রচুর বই পড়েছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভাবধারার বাইরে যাঁর কাছে তাঁর দীক্ষা হয়েছে তিনি সেই রকম বড় কিছু নন। তিনিও সেটা স্বীকার করতেন। মঠের মহারাজরাও জানতেন, তাঁরাও এটাকেই ধরে রাখতে বলতেন। ঠাকুরও তো বলছেন, গুরু যেমন তেমন হলেই হল। বছর পনের কেটে যাওয়ার পর একদিন উনি এক মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন, এবার আমি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই দীক্ষা নিতে চাইছি। খুবই মজার ঘটনা। ওনার মধ্যে প্রথম থেকেই একটা ধর্ম ভাব ছিল। কিন্তু তখনও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে কিছু জানতেন না। এরপর উনি যত বইটই পড়ছেন, চিন্তার জগতে যত গভীরে যাচ্ছেন, মহারাজদের সাথে যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তত তাঁর মনে হচ্ছে এই অবস্থা আমাকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। এখন ওনার নিজের ভেতর থেকেই মনে হচ্ছে আমার দীক্ষা দরকার। ভদ্রলোকের বাড়ির সবাই একই জায়গা থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের কিন্তু একবারও মনে আসছে না যে আমাকে নতুন করে দীক্ষা নেওয়া দরকার, কিন্তু ওনার আসছে। কারণ ওনার প্রস্তুতিটা হয়ে গেছে। এটাই খুব উল্লেখযোগ্য, ঠাকুর যে বলছেন, কেউ যদি পুরী যাবার উদ্দেশ্য বেরিয়ে ভুল দিকে চলে যায়, তাকে কেউ না কেউ পথ দেখিয়ে বলে দেবে তুমি ঐদিকে না গিয়ে এদিকে যাও। সাধক যত ভুলই করুক, কিছু এমন একটা হয়ে যায় যেটা তাকে আবার ঠিক রাস্থায় এনে

দেবে। কেন হয়, এর খুব সহজ ব্যাখ্যা আছে, জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলেও এটাই হবে, আমার ভেতরে সেই প্রবৃত্তি আছে বলে আমি দুজন চারজন লোকের সাথে কথা বলব, আর আজ হোক কাল হোক ঠিক লোকের সাথে দেখা হয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হল, যে ভদ্রলোকের কথা বলা হল, ওনাকে আরেকজন পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, আপনি অমুক মহারাজের সাথে আলাপ করুন আপনার খুব ভালো লাগবে, উনি অনেক কিছু জানেন। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কিছুই জানতেন না, কিন্তু শুনেছেন অমুক মহারাজ তাঁর সহকর্মীর বন্ধু, তখন তিনি দৌড়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। একজন মানুষে মধ্যে যে ভাব থাকে, সেই ভাব ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। আর ঠিক সেই ভাবের লোক তাকে ধরে নেবে। এটা যেমন একটা দিক আছে, অন্য দিকে ঠাকুর বলছেন যার মনে আগ্রহ এসেছে তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে একটা প্রথা ছিল, দূর্গাপূজার অষ্টমীর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা ছাত্রদের নিয়ে শহরে প্রতিমা দর্শন করতে বেরোতেন। একজন ব্রহ্মচারীকে মঠের কাজের জন্য দেওঘর শহরে এত ঘোরাঘুরি করতে হত যে তিনি মনে করতেন দেওঘর শহরের প্রতিটি রাস্থা গলির প্রত্যেকটি ইঞ্চি পর্যন্ত আমি জেনে গেছি। তিনিই সেদিন সবাইকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছেন। রাত্রে প্রতিমা দর্শন করতে করতে সেই ব্রহ্মচারী সবাইকে নিয়ে শহরের একদিক চলে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার আরেক দিকে যাবেন। ধীরে ধীরে দেখছেন শহরের বাড়ি সংখ্যা কমে যাচ্ছে। রাত তখন প্রায় এগারোটার উপর বেজে গেছে, এদিকে পাকা রাস্থা শেষ হয়ে মাটির রাস্থা শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে অন্য যে মহারাজরা ছিলেন তাঁরা দেওঘরে নতুন এসেছেন, স্বাভাবিক ভাবে চিন্তায় পড়ে গেছেন। ব্রহ্মচারী বলে যাচ্ছেন, চিন্তার কিছু নেই, দেওঘরের রাস্থাঘাট আমার সব মুখস্থ। কিন্তু একটু এগিয়ে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ব্রহ্মচারী দেখছেন ঐ মধ্যরাত্রিতে উল্টো দিক থেকে এক বৃদ্ধা আসছেন। বৃদ্ধা তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করছেন, বাবা! তোমরা কোথায় যাবে? ব্রহ্মচারী বললেন আমরা অমুক জায়গায় যাচ্ছি। বৃদ্ধা হেসে বলছেন, তোমরা তো উল্টো পথে চলে এসেছ, এদিকে জঙ্গলে কোথায় যাচ্ছ? আবার সবাই যে রাস্থা ধরে এসেছিলেন সেই রাস্থা ধরেই যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে ফেরত আসতে থাকলেন। মাঝরাতে ঐ বৃদ্ধা যদি না আসতেন সবাইকে জঙ্গলেই রাত কাটাতে হত। কি করে, কিভাবে মাঝ রাতে ঐ বৃদ্ধা এসেছিলেন কারুরই জানা নেই, কিন্তু একটা কিছু হয়ে গেল। অন্য রকমও হতে পারত আর হয়ও, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে এর অন্য রকম কখনই হয় না।

এখানে বলছেন *তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্,* জোর দেওয়ার জন্য দুবার করে বলছেন, সেটারই সাধনা কর। দুটো জিনিসরই সাধনা করতে হবে, প্রথম তোমার মধ্যে যে যে দুর্গুণ রয়েছে সেগুলোকে ছাড়ার চেষ্টা কর। সেগুলোকে ছাড়ার চেষ্টা না করলে কি হবে? আমি সবার সাথে মেলামেশা করছি, তাতে মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাবের ছাপ পড়বে, ভালো মন্দ দুটোরই ছাপ পড়ে। আর আমি এত ভালো লোকের সাথে মিশব না যে বই পড়িনি বলে ঐ খবরটা পেয়ে যাব। প্রথমটা হল বাজে জিনিস আর বাজে সঙ্গ ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা করতে হবে। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা কেন? যদি আমাকে কেউ অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে তখন তাকে বশে আনার একটাই পথ সেবা। আগেকার দিনের নারীরা সেবার দ্বারা স্বামীর হৃদয়ে বা শ্বশুড় বাড়িতে ঢুকত, শাশুড়ি, শ্বশুড়, দেওর, ননদের সেবা করে। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে সেটা আলাদা। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টালেও সেবা আর সেবার কার্যকারিতা তো পাল্টায়নি। যদি এক অপরকে চায়, যদি মিলে যায় তো ভালো, কিন্তু যদি না মিলে যায় তখন কিন্তু অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, তাকে উপহার দেওয়া, তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, তার সেবা করা। করতে করতে একদিন ওর মন নরম হয়ে যাবে। কারণ কখনই কোন মানুষ এমন লোকের সেবা করবে না যে তাকে চায় না। আর অন্য দিকে সেবা করতে করতে একটা প্রস্তুতি হয়ে যায়। কেউ যদি কোন সাধু বা কারুর বন্ধুত্ব পেতে চাইল, সে তাকে না করে দিল। এবার সে তাঁর সেবা করতে শুরু করে দিল। কেউ যে না করছে সেখানে দুটো জিনিস আসে, একটা হল সে তাকে যোগ্য মনে করছে না। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য তার কাছাকাছি যদি সে না হয় তাহলে তার অন্তরঙ্গ সে কোন দিন হতে পারবে না। সেবা করতে করতে তার মন জয় করে নেয়, এটাই সাধারণ ভাবে আমরা মনে করি। কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা হয়, তা হল যার সেবা করছে তার সব খবর রাখা, সে কি খেতে ভালোবাসে, কি ধরণের বই পড়তে ভালোবাসে। সে নিজে হয়ত কিছু পছন্দ করছে না, কিন্তু ওর পছন্দের মত করে যাচ্ছে। তার মানে সে ওর মত নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে। ছেলে হয়ত ভেণ্ডি পছন্দ করে না, অনেক দিন পর

ছেলে বাড়িতে এসেছে, বাড়িতে ভেণ্ডি আসা বন্ধ হয়ে যায়, ছেলে হস্টেলে ফিরে যাবে তারপর আবার ভেণ্ডি ঢুকবে। তার মানে বাড়ির সবাই তার মত হয়ে যাচ্ছে। তার মত যখন হয়ে গেল, তার মানেই তো তার এবার একাত্ম বোধ হয়ে গেল। যাদের সাথে আমাদের মেলে না আমরা তাদের থেকে সরে যাই। যে আমাকে গ্রহণ করতে পারছে না, তার মানে তার সাথে আমার মিলছে না, কোন একটা কারণে মিলছে না। সেবা করা মানেই, সে ধীরে ধীরে যার সেবা করছে তার মত নিজেকে পাল্টে নিচ্ছে আর তার মত করে দিচ্ছে। সাধুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটাই হয়, তাঁরা কাউকে কাছে আসতে দেন না, তার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণই হল, আমার সময় নষ্ট হবে, দ্বিতীয়, এর পাত্রতাই নেই। এখন যদি সে সাধুর সেবা করতে শুরু করে, সেবা করতে করতে তার মধ্যে পাত্রতা আসবে, পাত্রতা যদি নাও আসে, তখন যাঁর সেবা করছে তাঁর ভেতরে একটা করুণার ভাব জাগবে। যদি হঠাৎ কখন মনে হয়, এত সেবা করলাম তাও কিছু হল না, চলেই যাই এখান থেকে। তাহলেও কিন্তু তার পাত্রতা হয়ে গেছে।

তিব্বতী বৌদ্ধদের একটা কাহিনী আছে। এক শিষ্য গুরুর কাছে গেছে। শিষ্য হয়ত কোন গুরুতর দোষ করেছিল। গুরু শিষ্যকে বলছেন, আমি তো তোমাকে গ্রহণ করত পারব না। শিষ্য বলছে, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। গুরু তখন বললেন, তুমি এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ইট দিয়ে লম্বা একটা দেওয়াল তৈরী কর। সে বেচারী একা একা পরিশ্রম করে দেওয়াল তৈরী করেছে। গুরুকে গিয়ে বলেছে, দেওয়াল হয়ে গেছে। গুরু এসে দেওয়াল দেখেই খুব রেগে গেছেন, এটা কি একটা দেওয়াল হয়েছে, এক্ষুণি এটাকে ভেঙে দাও, ভেঙে আবার তৈরী করে। শিষ্য খুব হতাশ হয়ে দেওয়াল ভেঙে আবার তৈরী করেছে। গুরু আবার এসে আবার ওটাকে ভাঙিয়েছেন। এই ভাবে দশ বার শিষ্যকে দিয়ে দেওয়াল বানিয়েছেন আর ভাঙিয়েছেন। তখন শিষ্য ভাবছে আমি আর কোন দিন গুরুর মন জয় করতে পারব না, আমি যত যাই করি এনার শিষ্য হওয়ার যোগ্য কোন দিন হতে পারব না। ঠিক করে নিল, কাল গুরুকে প্রণাম করে এখান থেকে চলে যাব। গুরুর কাছে যেতেই শিষ্যকে গুরু বলছেন, এবার তোমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। গুরু জানেন শিষ্যের এই এই গোলমাল ছিল, এর জন্য তার এই এই প্রায়শ্চিত্ত দরকার, তখন তিনি সেটা শিষ্যকে দিয়ে করিয়ে নিলেন। সেবা মানে তাই। আমরা অনেক সময় গুরুর কথাকে মনে করি তিনি উল্টোপাল্টা কিছু বলছেন, কিছু কথা আমাদের পছন্দ হয় না। আগেকার দিনে কোন আচার্যের কাছে কেউ শিক্ষা নিতে এসেছে, তিনি তাকে বেদ মুখস্ত করতে আর সেবা কার্যে লাগিয়ে দিতেন। গরু চড়ানো, কাঠ নিয়ে আসা, ভিক্ষা করা এগুলো করতে করতে ওর মধ্যেই মাঝখানে আচার্য একটা দুটো কথা বলে দিতেন, ঐ একটা কথা থেকেই তার মধ্যে একটা জ্ঞানের আলো এসে প্রস্ফুটিত হয়ে যেত।

বছরের পর বছর ভাগবত কথা শুনে যাচ্ছে কিন্তু কারুরই কিছু হয় না। হবে কি করে, *তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্,* তোমার না আছে সেবা, না আছে সঙ্গ। পাত্রতা তৈরী হবে কোথা থেকে, পাত্রতা তৈরী হয় না সেইজন্য ভাগবত কথার কোন দাম থাকে না। আধ্যাত্মিক পথে যা হওয়ার এভাবেই হয়। ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এক। শ্রেষ্ঠ ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ভেদ তো আমাদের সাথেও নেই, তফাৎ হল আমাদের মধ্যে আবরণটা মোটা আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে আবরণটা খুব পাতলা। কিন্তু তাই বলে বাস্তবটা তো না করা যাবে না, সেই ভগবান আমার আপনার ভেতরেও আছেন, তিনিও বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছেন। চেষ্টা করলেই আবরণ গুলো সরে যেতে থাকে। ঈশ্বরীয় কৃপা সব সময়ই আছে, এই যে বলা হয়, তুমি এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন। আমরা সব সময় ভাবি তিনি বাইরে কোথাও বসে আছেন, আমি এগোচ্ছি তিনি সেখান থেকে উঠে এগিয়ে আসবেন, এভাবে হয় না। ভেতরে যিনি আছেন, যেটা আমার বাস্তবিক স্বরূপ, তিনি তেড়েফুড়ে তাঁর মহিমায় প্রকাশিত হতে চাইছেন। আমরা সেই মহিমাকে নিতে চাইছি না। কার মহিমা? নিজের মহিমাকে নিতে চাইছি না। ফিজিক্সের নিয়মেও বলে আলোর উৎসের দিকে কেউ যদি এগোতে শুরু করে তখন স্কয়ার রুটে আলোর intensity বাড়তে শুরু হয়ে যায়। প্রকাশের কেন্দ্রের দিকে যদি দু পা এগোয় সেখানে দু পায়ের মত আলোর চমকটা বাড়ে না, ওটা চার পায়ের মত বাড়ে। তিন পা এগোলে নয় পায়ের মত এগোবে। যে চার পা এগিয়েছে তার আলোর প্রকাশ ষোল গুণ হয়ে যায়। কেন এটা হয় কেউ জানে না, কিন্তু এটাই হয়। নিউটন প্রথম এই নিয়মটা বার করলেন। মাধ্যাকর্ষণেও তাই হয়, যেটা দূরে আছে তাকে কম টানবে, যত কাছে যায় তত টানার শক্তিটা স্কয়ার রুটে বাড়তে থাকে। ভগবানের

ক্ষেত্রেও তাই হয়, আধ্যাত্মিক স্রোতের উৎসের দিকে এগোতে শুরু করলে একই জিনিস হয়। দু পা এগোলে ওটা চার পায়ের মত এগিয়ে যাওয়া হয়ে যাবে। বিষয়ের দিকে আবার ঠিক এর উল্টো হয়, বিষয়ের দিকে যত যাবে তত আধ্যাত্মিক আলো ক্ষীণ হয়ে যাবে।

কিন্তু মূল জিনিসটা কি হয়? আমরা বলছি, বন্ধন আছে, মায়াশক্তি আছে, বিষয়াসক্তি আছে, কি কি জিনিস আমাদের ছাড়তে হবে? বলছেন, কোন জিনিসই ছাড়তে হবে না। একটা জিনিসকেই ছাড়তে হয়, নিজের কাঁচা আমি। এই বন্ধন বলছি, মায়া বলছি, বিষয়ের প্রতি আসক্তি বলছি, কোনটার জন্যই কিছু করতে হয় না। ঠাকুর তখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ, সেখানে একদিন এক ভক্ত ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথায় বারে বারে বলছে, আমি জানি। ঠাকুর তখন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, কক্ষণ এ রকম কথা বলবে না যে, আমি জানি, বলো যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। ঠাকুরের তখন গলায় ক্যানসার, বলতে গিয়ে ঠাকুর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু হয়ে গেল। আমি জানি এটা অহঙ্কারের লক্ষণ। যার অজ্ঞান যত বেশি তার অহঙ্কার তত বেশি। বড় বড় বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক কী তীক্ষ্ণ কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি শূন্য, নিজের দিকে যে তাকাবে আর ভাববে, আমার নিজের এতে কি হল, একটা নোবেল প্রাইজ না হয় পেলাম, কটা টাকা পেলাম আর সম্মান পেলাম, কিন্তু আমার ক্ষমতা, আমার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেটা কি শুধুমাত্র এতটুকুর জন্য, না তা নয়। কিন্তু এভাবে কোন বিজ্ঞানীই ভাববে না, কারণ এনারা অন্তর্দৃষ্টি বিহীন হন। এটাই অহঙ্কার, এটাই আমিত্ব। ঠাকুর বার বার বলছেন কাঁচা আমি ছেড়ে পাকা আমির দিকে যেতে। পাকা আমি হল, যে আমি ঈশ্বরের সাথে জুড়ে রয়েছে, সেখানে কোন চালবাজি নেই, ফাঁকিবাজি নেই। সমস্যা হল, আমরা যার সাথেই কথা বলি না কেন, man of integrity পাওয়া যে কি কঠিন ধারণা করা যায় না। আমরা মুখে বলছি, আমি যা করছি ঠাকুরের সেবা করছি, তাঁর কাজ করছি, কিন্তু মনে মনে একবারও কি তাই ভাবছি। বক্তব্যটা হল কাঁচা আমিটা ত্যাগ করতে হয়। যখন বলছে আমি ঠাকুরের ভক্ত, আমি ঠাকুরের উপর নির্ভর, সে মুখে হয়ত বলছে, অপরকে বোঝানর চেষ্টা করছে, কিন্তু ভেতর থেকে নেই। *তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্* যখন বলছেন তখন পুরো জোরটা দেওয়া হচ্ছে, তোমার কাঁচা আমিটাকে, যেখান থেকে তোমার সব দুর্বুদ্ধি গুলোর জন্ম হয় সেই কাঁচা আমিকে ত্যাগ কর আর ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের ভাবে জোর দাও আর সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা। সবার ভেতরে ভক্তিরাশি, জ্ঞানরাশি পরিপূর্ণ হয়ে আছে কিন্তু চাপা আছে। কাঁচা আমি ত্যাগ মানে, ঐ যে চাপা যেটা দেওয়া আছে সেই চাপাগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরিয়ে দেওয়ার ফলে ভেতরে যে ভাব রয়েছে সেই ভাব তেড়েফুড়ে নিজেই বেরিয়ে আসে।

বন্ধন ত্যাগ করুন, মায়া ত্যাগ করুন, লোভ, মোহ ত্যাগ করুন, এই যে এত রকম কথা বলা হচ্ছে সবটাই কিন্তু একটি কথারই বিস্তার, কাঁচা আমি ত্যাগ। বলবে, আমি তো কাঁচা আমি বুঝতে পারছি না। বুঝতে না পারারই কথা, কারণ সবটাই তোমার কাঁচা আমি। কাঁচা আমি ত্যাগ হয়ে যাওয়ার পর এবার তার যে দিকে দৃষ্টি যাবে সেখান থেকেই জ্ঞান আসতে শুরু হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত অবধূত, ভাগবতে অবধূতের কাহিনী আছে, তাঁর চব্বিশ জন গুরু ছিল। চব্বিশ কেন তখন যত খুশী গুরু হয়ে যেতে পারে। যে কারুরই হতে পারে, আমার আপনারও হতে পারে, আমিও একজন বিরাট লেখক হয়ে যেতে পারি, কবি হয়ত হতে পারব না, কারণ কবি হওয়া খুব কঠিন। একটা কবিতা লেখার পর সাত দিন সে যদি উল্টে পরে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ওটা কবিতাই হয়নি। কবিতা লিখতে গেলে সব প্রাণশক্তি নিংড়ে নেয়। কবিতা ছাড়া আমি আপনি সবাই লিখতে পারব, তাতে একটাই শর্ত, শুধু এই আমিত্বকে ছেড়ে দিতে হবে। আমিত্ব ছাড়ার পর চারিদিক থেকে এত জ্ঞানরাশি আসতে শুরু হয়ে যাবে যে সামলাতে পারব না। এটা যে শুধু চিন্তা ভাবনাতেই প্লাবন আসবে তা নয়, ভক্তি ভাবে, ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণে, জগতের প্রতি বৈরাগ্যে সবেতেই একই জিনিস হবে। স্বামীজী যে শক্তির জাগরণের কথা বার বার বলছেন, all strength is within you, all knowledge is within you একই কথা এখানেও বলছেন, যা আসার তোমার ভেতর থেকেই আসবে।

শুরু কর তুমি সাধুসঙ্গ দিয়ে, সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা এই দুটো যখন হয় তখন তুমিও অজান্তে তাঁর মত হতে শুরু করে দাও। আর তার সাথে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হল সাধুসেবা সাধুর পছন্দের মত করতে হবে। যেমন আমাদের ঐতিহ্যে বলে দেওয়া হয়েছে অমুক দেবতার ভোগে এই এই ভোগ দিতে হবে, গণেশের ভোগে লাড্ডু, হনুমানের ভোগে কলা দিতে হবে। আমরাও যখন গণেশের পূজা দিতে যাই তখন তাঁকে লাড্ডুই নিবেদন করি, হনুমানের পূজাতে কলা দিই। আমাদের পছন্দের মত জিনিস দিলে চলবে না।

তাই বলে হনুমানজী, গণেশজী, শিবজী এনাদের কি আমাদের মত আলাদা আলাদা খাবারের রুচি, না তা নয়, আমরা আমাদের ইচ্ছে মত, নিজেরা যেটা পছন্দ করি সেই পছন্দের জিনিস দিয়ে নিজের মত ভোগ করব, এটাকে আটকাচ্ছেন। ঠাকুর গল্প বলছেন, আগে খুব ধুমধাম করে দূর্গাপূজা হত এখন কেন হয় না, কারণ সব দাঁত পড়ে গেছে, মাংস চিবোতে পারে না। কেন দূর্গাপূজা করছে? পাঠাবলি দিয়ে মাংস খাবে বলে। এই সমস্যা গুলো আছে। ঠাকুর কথামৃতের পাতায় পাতায় শুধু সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। ঠাকুর নতুন কিছু বলছেন না, এটাই পরম্পরাতে বলা হয়ে আসছে। গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রত্যেকটি শাস্ত্রে বলছেন। আর হিন্দু ধর্মে এর উপর যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই তুলনায় অন্যান্য ধর্মে সেই রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সাধুসঙ্গে ধীরে ধীরে বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমতে শুরু করে। অন্য দিকে দুর্বুদ্ধি ত্যাগ না করলে সাধুরাই বেশি দিন তাঁদের কাছে থাকতে দেবেন না। ভগবানও তাকে টিকতে দেবেন না, ছিটকে আলাদা হয়ে যাবেন। ঠাকুর গোপালের মার সাথে দেখা করতে গেছেন, সেখানে দুটো ভূত ঠাকুরকে বলছে, তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার গায়ের বাতাস আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের মধ্যে যে দুর্বুদ্ধি আছে এই নিয়ে সাধুদের কাছে গেলে, আমরাই নিতে পারব না, ছিটকে বেরিয়ে আসব। সেইজন্য খুব সচেতন ভাবে বলতে হয়, আমি আজ থেকে এটা ত্যাগ করলাম। ত্যাগ সচেতন ভাবেও করতে হয় না, ও নিজে থেকেই খসে পড়ে যায়। সেইজন্য এখন বলছেন সাধুসঙ্গের সাথে সাথে দুঃসঙ্গ, দুর্জয় সঙ্গ, যেখানেই কোন নোংরামি আছে সেখান থেকেও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে হয়।

দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ।।৪৩।।

দুঃসঙ্গ, খুব স্থূল ভাবে দেখলে হবে দুষ্টের সঙ্গ আর সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে হবে শুধু দুঃসঙ্গ, অর্থাৎ যা সঙ্গের যোগ্য নয়। দুঃসঙ্গ সর্বথা ত্যাগ করতে হয়। উপনিষদ থেকে শুরু করে আমাদের যত শাস্ত্র আছে সবার মূল ভাব হল ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। তাহলে এই দুঃসঙ্গ জিনিসটা কি? ঠাকুরও দুঃসঙ্গ নিয়ে অনেকগুলো কথা বলছেন, সব জলে সব কাজ হয়, কোন জলে শৌচ হয়, কোন জলে স্নান হয়, কোন জল পান করা হয়, কিছু জল আচমন করার জন্য। তার মানে জলের তারতম্য আছে, সেই রকম মানুষেরও তারতম্য আছে। ঠাকুর আবার বলছেন দুষ্ট লোককে দূর থেকে প্রণাম করতে হয় সেই রকম হাতি, বাঘ এদেরও দূর থেকে প্রণাম জানাতে হয়। অন্য দিকে আবার বলছেন, হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, হাতি নারায়ণ বলছ কিন্তু মাহুত নারায়ণ যে নিষেধ করছে তাঁর কথা তুমি কেন শুনছ না। তার মানে পরিষ্কার ভাবে একেবার স্পষ্ট দুটো ডিভিশন এসে যাচ্ছে, শুভ আর অশুভ, ভালো আর মন্দ। এই দুঃসঙ্গ, দুষ্ট লোকের সঙ্গ এই জিনিসটা তাহলে কোথা থেকে এল, কেন এল?

বিশ্বের দুটো মূল ধর্ম। একটা ভারত থেকে এসেছে আরেকটা পশ্চিম এশিয়া থেকে এসেছে। বিশ্বে যত ধর্ম আছে সব এশিয়া থেকেই এসেছে, এশিয়ার বাইরে ধর্মের জন্ম হয়নি। ইরান, ইজ্রায়েল, আরব এসব জায়গা থেকে এসেছে চারটে ধর্ম আর ভারত থেকে এসেছে চারটে ধর্ম। এই আটটি ধর্মই সারা বিশ্বে ছেয়ে আছে। মধ্য প্রাচ্য এশিয়া থেকে যে চারটে ধর্ম, এই চারটে ধর্মে বলছে, মানুষ ভালো হতে চায়, কিন্তু ভালো হতে পারে না, ভালো করতে চায় কিন্তু করতে পারে না। তাহলে গোলমালটা কোথায়? কেন গোলমাল হয়? এর কোন উত্তর নেই। প্রথমে পার্সিরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন, দুটো শক্তি আছে আহুর মাজদা আর আহিরমান। আহুর মাজদা হলেন আলোর দেবতা আর আহিরমান হল অন্ধকারের দেবতা। ঈশোপনিষদেও বলছেন *অসূর্যানাম তে লোকা*, তারা অন্ধকার লোকে যায়, অন্ধকার লোক মানে যেখানে জ্ঞানের আলো নেই। পার্সি ধর্ম যে ইরান থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই ইরানেই মুসলমানদের খুব জোর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল। যে ধর্ম একটু কাঁচা ধর্ম, যেখানে চিন্তা ভাবনা করে সব কিছু দাঁড় করানো হয় সেখানে দুটো শক্তির কথা এমনিতেই এসে যায়। গ্রীকরা ধর্মের জন্য খুব বিখ্যাত না হলেও তাদের কিছু কিছু ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা ছিল, ঈজিপ্টেও ধর্মের ভাব ছিল, এই দুটো দেশে গ্রীক আর ঈজিপ্ট দুটি শক্তির চিন্তা ভাবনাকে নিয়েই এগিয়েছে। ইরান, যারা ধর্মের ব্যাপারে অনেক এগিয়ে ছিল তারাও পুরো দমে দুটো শক্তির ভাবকে তাদের ধর্মে ঢুকিয়েছে। ফলে জহুদি আর ইসলাম ধর্মেও ডেভিল ঢুকে গেছে, একটা শক্তি আছে যে মানুষকে ধর্মের পথ থেকে বিচলিত করে দেয়। খ্রীশ্চানরা আবার Holy Spiritএর কথা বলে, যে মানুষকে ধর্মের পথে নিয়ে যায়, যার কথা আমরা শুরুতে বললাম। তার মানে Holy Spirit যদি মানুষকে না ধরে তাহলে মানুষ নষ্ট হয়ে খারাপ পথের দিকে

চলে যায়। Holy spirit যদি না থাকে তাহলে কাউকে তো ওখানে থাকতে হবে। সেখানে তারা Saturnকে ঢুকিয়ে দিল। এইভাবে দুটো সত্তাকে পরিষ্কার আলাদা করে দেওয়া হল, একটা শুভ শক্তি আরেকটা অশুভ শক্তি। সেই তুলনায় ইসলাম ধর্মে চিন্তা ভাবনা আরও বেশি উন্নত ছিল। যেহেতু তারা ইরানিয়ানদের সাথে ছিল, ইরানিয়ানরা খুব উন্নত সংস্কৃতির ধারক ছিল বলে তাদের মধ্যে কিছুটা অন্য রকম চিন্তা ভাবনা দেখা যায়। পার্সিরা একটা খুব সুন্দর ধারণা নিয়ে এল, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি প্রথমে দেবদূতদের সৃষ্টি করলেন, তার মধ্যে একজনের নাম ইবলিশ। এরপর ভগবান মানুষের সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করার পর ভগবান সবাইকে বললেন তোমরা মানুষকে প্রণাম কর, কারণ এরা আমার শ্রেষ্ঠতম জীব। ভগবানের কথা মত সবাই মানুষের সামনে মাথা নত করল। ইবলিশ বলল, আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে মানি না, আমি তাই কারুর সামনে মাথা নোয়াব না। তাতে ভগবান ইবলিশের উপর এত রেগে গেলেন যে স্বর্গ থেকেই ওকে বহিষ্কার করে দিলেন। এই কাহিনীটি খুব তাৎপর্য পূর্ণ, ইবলিশের এই কাজকে গোঁড়ামি বলতে পারি। ঈশ্বর যেখানে নিজে আদেশ করছেন, সেখানে ইবলিশ বলে দিচ্ছে আপনাকে ছাড়া আমি আর কাউকে মানি না। একজনকে সে এত ভালোবাসে, সে তাকে আদেশ করছে করতে, কিন্তু বলছে আমি করব না। এই যে দ্বন্দ্বমূলক আবেগ, ইবিলিশের চরিত্র খুবই চিত্তাকর্ষক। তার দোষের মধ্যে একটাই দোষ, সে ঈশ্বরকে খুব ভালোবাসে। তাহলে ইবলিশের দোষটা কোথায়? বৈষ্ণবদেরও এই সমস্যা হয়, দোষ হল বিনয়ের অহঙ্কার। বৈষ্ণবদের মধ্যে রেষারেশি, আমি তোমার থেকে বেশি বিনয়ী। ইবলিশেরও তাই, আমার থেকে ঈশ্বরের বড় ভক্ত আর কেউ নেই, এই অহঙ্কার। একটু আগে যে কাঁচা আমির কথা হচ্ছিল, ইবলিশের আমিটা কাঁচা আমি। ভক্তের এমন অহঙ্কার হয়েছে যে সে বাস্তবটাও দেখতে পাচ্ছে না। এই দোষ এমন কিছু দোষের মধ্যে নয় ঠিকই, সবাই এত দোষের মধ্যে নেন না। ইবলিশের চরিত্রকে পরে এরা ধীরে ধীরে নেতিমূলক চরিত্রের দিকে নিয়ে গেছে, Holy spirit এর অভাব, শয়তানের প্রভাব সব কটাকে মিলিয়ে এক বানিয়ে দিয়েছে। গভীর ভাবে বিচার করলে ইবলিশের চরিত্র সে রকম কিছু নয়, কিন্তু প্রচলিত যে বিশ্বাসগুলো রয়েছে, যেন সে একটা অশুভ শক্তির প্রতিমূর্তি আর অন্য দিকে ইরানিয়ানদের পরম্পরা থেকে এই বিশ্বাসটা জোর পাচ্ছে যেখানে পরিষ্কার দুটো শক্তি আহুর মাজদা আর অহিরবান, এই করে করে ইবলিশের চরিত্র একটা নেতিমূলক চরিত্রে দাঁড়িয়ে গেল। এই যে দুটো শক্তি, একটা শুভর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটা অশুভের দিকে প্ররোচিত করছে, এভাবে চললে তো মানুষকে নিয়ে যে টানাটানি চলবে তাতে তো মানুষের দুরবস্থার অন্ত থাকবে না। হিন্দু পরম্পরাতে জিনিসটাকে এইভাবে আমরা নিই না। ঠাকুরও কথামৃতে পাপ শব্দটা আনছেন, কিন্তু তিনি যখন পাপ জিনিসটাকে বলছেন, তখন তিনি পাপকে একটা প্রচলিত শব্দ মাত্র নিচ্ছেন। খ্রীশ্চানরা যে পাপের কথা বলছে, এই পাপের পারে কখনই যাওয়া যায় না। আদম আর ঈভের মধ্যে যে পাপ ঢুকেছিল, তার মানে ডেভিল, snake of knowledge ঢুকেছিল, যে পাপের জন্য তাদের স্বর্গ থেকে পতন হল সেই পাপের বোঝা প্রত্যেকটি মানুষের উপর চেপে আছে। তাহলে বলবেন, কেন স্বামীজীও তো বলছেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা ব্যতিরেকে যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তান এক পাপী সন্তান। সাবধানের জন্য আমাদের শাস্ত্রে পূজা করাটা ছিল বাধ্যতামূলকপ। স্বামীজী ঠিকই বলছেন, প্রার্থনা করে যে সন্তান হবে সে পাপী না, কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মে প্রার্থনা করুক আর নাই করুক সবাই পাপী হয়েই জন্ম নেবে। যারা অন্য ধর্মে বড় হয়েছে তাদেরকে এগুলো বোঝান খুব কঠিন, বুঝতেও চায় না। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনই সর্বধর্ম সমন্বয় করে যাচ্ছে। আবার বলে হিন্দু ধর্মে কি অসহিষ্ণুতা নেই, বৈষ্ণবরা শাক্তদের মানে না, শাক্তরা বৈষ্ণবদের মানে না। কিন্তু এটা বলছেন না যে, বৈষ্ণবরা কোন দিন শাক্তদের গলা কাটতে যাবে না, শাক্তরাও বৈষ্ণবদের গলা কাটবে না। এবার নিজের মত বুঝে নিতে হবে অসহিষ্ণুতা কাকে বলে।

অন্যান্য ধর্মের যে ডেভিলের ধারণা, দুর্জনের ধারণা, এটা হিন্দুদের ধারণা নয়। হিন্দুরাও দুর্জন, দুষ্ট লোকের কথা বলছে কিন্তু সেভাবেই বলছে যেভাবে একই জলের বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। ঠাকুর যেমন হাতি নারায়ণ, বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে বলছেন। হিন্দু দর্শনে কোথাও কোন দোষ বা পাপ বলে কিছু নেই, পথ আছে, আপনার জীবনের পথ কি। সেই পথ থেকে যে আমাকে ভ্রষ্টচ্যুত করবে, সেটাই আমার জন্য পাপ। ওটাকে পাপ বলুন, দোষ বলুন, অন্যায় বলুন, যাই বলুন, শব্দ যাই নেওয়া হোক না কেন, শব্দের পেছনে ঐ ভাব এক। যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে, যে ঐ পথ থেকে ভ্রষ্টচ্যুত করবে সে পাপী

আর যে ঐ পথ থেকে সরে আসবে এটা তার দুষ্কর্ম, এটাই মূল ধারণা। অন্যান্য ধর্মে যে পাপ বলে ওর পেছনে যে শক্তি সেই শক্তিটাই আলাদা, হিন্দুদের সেটা নয়। এই ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে ওদের কোন সম্পর্কই নেই। ভক্তিতে যখনই এই শব্দগুলি আসে তখন এই শব্দগুলো আরও জোরাল হয়ে যায়। বলছেন, পরমার্থ থেকে যিনি আমাকে সরাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন, কোন মেয়ে যদি এগিয়ে আসে তখন বলবে, কেটে ফেলব খেপী, তুই আমার পরমার্থের হানি করতে এসেছিস! এই যে পরমার্থ, এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। মানুষ জীবনে যা খুশী করুক, সে সবটা থেকেই বেরিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু কেউ যদি নারীসঙ্গের পাল্লায় পড়ে, আর ওদিকে টাকা-পয়সার পাল্লায়, অর্থের পাল্লা থেকেও বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু নারীর পাল্লা থেকে বেরিয়ে আসা একেবারে দুঃসাধ্য, ঠাকুর বলছেন বিশালক্ষীর দ, ওখানে হাতি পড়লেও আর বাঁচতে পারে না। নারীদের ক্ষেত্রেও একই হবে, যদি সে পুরুষের পাল্লায় পড়ে। সেইজন্য যারা সামাজিক ভাবে অপবিত্র, সংস্কৃতিতে অপবিত্র, মানসিক ভাবে অপবিত্র, এদের থেকে সব সময় দূরে থাকতে হয়। এই কথা বলা হচ্ছে যারা ভক্ত হতে চাইছে, এতে ভক্তির হানি হয়। কথামৃতে, লীলাপ্রসঙ্গে এবং ঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থে ঠাকুর কত ভাবে বলছেন, কি কি করলে ভক্তির হানি হয় আর কি কি করলে ভক্তি হয়, এটা করবে না এতে ভক্তির হানি হয়, ওটা করবে না ভক্তির হানি হয় আবার তার সাথে বলছেন, রোজ জগন্নাথের আটকে প্রসাদ খাবে তাতে ভক্তি হবে, রোজ গঙ্গাজল খাবে তাতে ভক্তি হবে, রোজ তুলসী পাতা খাবে ভক্তি হবে। আর কিছু কিছু জিনিসের থেকে দূরে থাকতে হয়, তার মধ্যে প্রধান হল সামাজিক ভাবে, মানসিক ভাবে যেগুলো অপবিত্র। ভক্ত প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবে না, প্রসাদ ছাড়া যদি কিছু খায় তাহলে জানবেন তার শরীর মন অশুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রসাদ খাওয়া মানে, যে রান্না সত্যিকারের ঠাকুরের জন্য করা হয়েছে। যা কিছু রান্না হচ্ছে সবই ঠাকুরের জন্য। বাড়িতে অনেক দিন পর ছেলে এসেছে সেও প্রসাদই খাবে, আগে সব কিছু ঠাকুরকে নিবেদন করা হবে। তার অগ্র ভাগ প্রসাদ হিসাবে অপরকে খাইয়ে বাকিটা তারপর নিজেরা খেলেন। এসব করলে শরীর মন শুদ্ধ হয়। অনেক দিন ধরে এই জ্ঞানে যদি খাওয়া হয় আমি ঠাকুরের প্রসাদ খাচ্ছি তখন ধীরে ধীরে শরীর মন শুদ্ধ হয়।

আজেবাজে লোকেদের সাথে যদি মেলামেশা করতে থাকে তখন দুটোর মধ্যে একটা হবে, হয় তাকেও দুষিত করে দেবে আর তা নাহলে ওদেরকে দেখলে ভেতরে একটা বিতৃষ্ণা জাগবে, ওদের সঙ্গ আপনি পরিহার করতে চাইছেন, তখন এটাও নিজেকে ক্ষতি করে। সেইজন্য বলছেন *দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ*, সর্বথা, একেবারে সব দিক দিয়ে ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এদের কাছেই যেতে না, কাছে গেলে হয় ওদের ভাব ভেতরে সংক্রামিত হবে আর যদি সংক্রামিত না হয়, ওদেরকে দেখলে গাত্রদাহ হবে। দুঃসঙ্গ থেকে দূরে থাকলে কিভাবে তারা ক্ষতি করে বলতে গিয়ে আরও বিস্তারিত করে বলছেন –

কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণত্বাৎ।।৪৪।।

ভক্তিসূত্রের এই সূত্র পুরোটাই গীতার এই দুটি শ্লোক থেকে নেওয়া হয়েছে, *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।। ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রশাংদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।* গীতায় বলছেন *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ*, যখন একটা বিষয় বা বস্তুর চিন্তা করছে বা দৃষ্টি দিচ্ছে, এটাই দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গ মানেই যে জিনিস মানুষকে তার পরমার্থের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। *ধ্যায়তো* মানেই সঙ্গ, যেটা তার পরমার্থের পক্ষে হানিকর সেই জিনিসের কথা ভাবা। আমাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে হয় আমাদের পরমার্থ বলে আদৌ কিছু ছিল না, নয়ত কিছু একটা হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কারুর ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল, সে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছে, সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু তাদেরও যদি জিজ্ঞেস করা হয় তারা বলবে জীবনে আমাদের অনেক সময় এসেছিল যখন লক্ষ্য থেকে চিত্তের বিক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল। বিক্ষেপ কেন হয়েছিল? দুঃসঙ্গ, দুঃসঙ্গ হয় কোন নারী থেকে এসেছিল, নয়তো কোন সিনেমা দেখে, বিজ্ঞাপন দেখে হয়েছে কিংবা কোন বস্তুকে দেখে। দুঃসঙ্গ চিত্তকে বিক্ষেপ করবেই করবে। সাংসারিক জীবনে একটু বিক্ষেপ হয়ত হল, তাতে কিছু ক্ষতি হল, আবার ক্ষতিটাকে মিটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল, এই রকম একটু হয়ে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে যদি বিক্ষেপ হয়ে যায়, পরমার্থের হানি যদি হয়ে যায়, তখন অনেক লম্বা একটা ফাটল ধরে যায়। কারণ ভেতরেই তার প্রচুর গোলমাল থেকে গেছে। বিশ্বামিত্র এত বড় ঋষি, কিন্তু ভেতরে কাম-বাসনাদি ছিল, মেনকাকে দেখে ভেতরে তাঁর গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। ঐ গোলমালে সব তপস্যার ফল বেরিয়ে চলে গেল, আবার নতুন করে শুরু

করতে হচ্ছে। বুদ্ধিকে এখানে দুটো অর্থে নেওয়া হয়েছে। একটা হল শাস্ত্রের যে কথাগুলো গুরুজন অর্থাৎ মা বাবা, গুরু, শিক্ষক এনাদের মুখ দিয়ে আসছে, এটা করণীয় আর এটা সর্বথা অকরণীয়, সেখান থেকে বুদ্ধি তৈরী হয়। বাবা বলে দিলেন, মিথ্যা কথা বলতে নেই। তারপর ছেলে দেখছে বাবা মিথ্যা কথা বলছে। তখন ছেলে ভাবছে, বাবা যদি মিথ্যা কথা বলে আমিও তাহলে মিথ্যা কথা বলতে পারি। তার মানে তার বুদ্ধি বিভ্রম হয়ে গেছে। কোন মানুষই জগতে নেই যে শিক্ষাকে নেয় না, গুরুজনরা যেটা বলেছেন, মা-বাবা, শিক্ষকরা যা বলে দেন সবাই তা পালন করে। কিন্তু সবাই conditioned teaching নেয়, তার মানে নিজের যা বুদ্ধি, নিজে যা দেখেছে, সেটাকে ঐ জায়গায় ব্যাতিক্রম (exception) বলে লাগিয়ে দেয়, প্রাণ বাঁচাতে এই রকম করা যেতে পারে, এই পরিস্থিতিতে এই রকম করতে হয়, conditioning করে দিচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষের conditioningটা আলাদা। এখানে বলছেন, একবার যে ধর্ম পথ নিয়ে নিয়েছে, ঐ জায়গাতে আর কোন conditioning চলবে না। মহাভারতে পদে পদে অনেক রকমের conditioning নিয়ে আসা হয়েছে, হিংসা কখন করা যাবে, কোন কোন পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলতে হবে। কিন্তু যাঁরা ধর্ম পথ নিয়ে নিয়েছেন তাঁদের কোন পরিস্থিতিতেই শর্তকরণ করার কোন অনুমতি নেই। যেমনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটাকে in letter and spirit দুটোতেই পালন করতে হবে।

এনারা বলেন *স্মৃতিভ্রশাংদ* মানে একেবারে শেষ, কিন্তু conditioned স্মৃতি যেটা, গুরুজনের কাছে যে আদেশ গুলো শোনা হয়েছে সেটাকে যে সে নিজের মত করে নিয়ে পালন করবে, এর অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি অনুমতি দেওয়া হয় ধীরে ধীরে তাকে নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তাই বলছেন এই যে বুদ্ধিনাশ, এর পরিণতি হল *সর্বনাশকারণত্বাৎ*, একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ করে দেবে। কেন হয়?

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তে।।৪৫।।

এই জিনিস গুলো ছোট্ট ঢেউয়ের মত ওঠে, আর কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় *সমুদ্রায়ন্তে*, সমুদ্রের মত বিশাল আকার ধারণ করে নেয়। একটু যদি তার সাথে খেলা করে বা প্রশ্রয় দিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলো বিরাটাকার রূপ ধারণ করে নেয়। ৪৩, ৪৪ আর ৪৫ এই তিনটে সূত্র একত্রে সংযুক্ত। প্রথমে বলছেন দুঃসঙ্গ থেকে দূরে থাকবে। কারণ একটু যদি দুঃসঙ্গ করা হয় তখন তোমার মনে অনেক রকম ভাব আসবে। শ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বর আছেন, দক্ষিণেশ্বরের গ্রাম থেকে অনেক ধরণের মেয়েরা এসে শ্রীমার সাথে নহবতে গল্প করত। ঠাকুর শ্রীমাকে নিষেধ করছেন। আজেবাজে লোকেদের সাথে মেলামেশা করলে তাদের অনেক কিছু ভেতরে একটা ছাপ ফেলে। ঐ যে একটু ছাপ ফেলেছে, তারপর ধীরে ধীরে যেটা ছোট্ট একটা ঢেউয়ের মত ছিল সেটাই এক সময় একটা বড় ঢেউয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তারপর সমুদ্রের মত বৃহৎ হয়ে যায়। এর আগে গল্প বলা হয়েছিল, এক শেখ উটে করে যাচ্ছে, রাত্রিবেলা তাঁবু খাটিয়ে শেখ শুয়ে আছে, উট প্রথমে তাঁবুর ভেতরে নাক ঢোকাল, শেখ রাগারাগি করল, যাই হোক রাখতে দিল, তারপর হাঁড়ির মত মাথাটা ঢুকিয়েছে, আবার মালিক রাগারাগি করেছে, উট বলছে সারাদিন তোমাকে বয়ে নিয়ে যাই আর রাতে আমার ঠাণ্ডা লাগছে একটু তাঁবুর ভেতরে গরমে থাকতে দিন। কিছুক্ষণ পরে শেখ দেখ পুরো ঐ বিশাল উট তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেছে। শেখ রেগে যেতে উট বলছে, আমি তো এখন ঢুকে গেছি এখন আর আমি কোথাও যাচ্ছি না, তোমাকে যদি থাকতে হয় আমার সাথেই থাকতে হবে, অসুবিধা হলে তুমিই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমাদের জীবনে যদি কোন অঘটন ঘটে থাকে দেখা যাবে সব অঘটনই খুব ছোট্ট একটা জিনিসকে দিয়েই শুরু হয়। ঠাকুর ফোর্ট উইলিয়মে গেছেন, ঠাকুর বলছেন, কলমনামা সিঁড়ি দিয়ে নামছে তো নামছেই, পরে বুঝতেই পারলাম না কত নীচে নেমে এসেছি। আচার্য শঙ্করও বলছেন, সিঁড়ি দিয়ে একটা বল যখন পড়তে থাকে তখন নিজে থেকেই গতি বাড়তে বাড়তে কত নীচে চলে যায় বোঝা যায় না। এটাই এখানে বলছেন, একটা ছোট্ট ঢেউ সেখান থেকে এক মহা সমুদ্রের রূপ নিয়ে নেয়।

অন্য দিকে আবার কি হয়, কিছু কিছু আগাছা আছে ওই অগাছাকে তোলা যাবে না যতক্ষণ না একটু বড় হয়। কিছু কিছু জিনিস আছে ওটা একটু বড় না হলে সারানো যায় না। কিছু কিছু জিনিস আছে বড় হতে দিতে নেই, বড় হয়ে গেলে গোলমাল গুলো উপড়ে ফেলা মুশকিল হয়। কিন্তু মুশকিল হল, ঐ বড় হবে, তারপর ওটাকে তোলা হবে, তার আবার ঘা থেকে যাবে, সেইজন্য বলা হয় প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে যাও।

তবে অনেক সাধুদের জীবনে দেখা যায়, তাঁদের যে গোলমাল হয়, সেই গোলমালগুলো আগে থেকেই বোঝা যায়। উনিও একটা সময় বুঝে যান আমার এই গোলমালটা আছে। তখন আবার অন্য দিকে থেকে ওটাকে সারাবার চেষ্টা করেন। অনেক পারেন না, সাধু জীবন ছেড়েই হয়ত চলে গেলেন। অন্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা গোলমালের জন্য মার খেয়ে যান। মূল কথা হল, শাস্ত্র অধ্যয়ন, গুরুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ এগুলো করতে হয়। এগুলো না করলে সমাজের যে আবর্জনা রয়েছে সেখানেই মেলামেশা করতে হবে, ওদের সাথে মেলামেশা করলে ওদের ভাব ছাপ ফেলবে। ঐ ছাপ প্রথমে একটা ছোট্ট তরঙ্গের মত আসে, তারপরেই সমুদ্রের আকার নিয়ে নেয়। সমুদ্রের আকার নিয়ে নেওয়ার পর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো স্বমহিমায় বেরিয়ে এসে বুদ্ধিকে নাশ করে দেয়। বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ।

কোথায় একটা ছোট্ট জিনিসকে দিয়ে শুরু হয়, ছোট্ট একটা হয়ত ইচ্ছে হল। বন্ধু গাড়ি করে তার বাড়িতে আসে, তার মনেও সাধারণ ভাবে একটা ইচ্ছে হল, আমারও যদি একটা গাড়ি হয়, ব্যস্, ওখান থেকে শুরু হয়ে গেল। সবারই মধ্যে কাম আসে। বলে ভগবান সৃষ্টিই করেছেন কাম-বাসনা দিয়ে। যখন আমরা সংসার চালাচ্ছি তখন জিনিসগুলো এক রকম চলে। আর যেটা বললেন, ঈশ্বর আর তাঁর ভক্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সমানতা কোথায়? ত্যাগে। যিনি ত্যাগের পথ নিয়েছেন তিনি কামনা কখনই করতে পারেন না। কারণ ত্যাগ আর কামনা দুটো বিপরীত। সেইজন্য বলছেন, সাধুসঙ্গ করলে যেমন এগিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি দুঃসঙ্গ থেকেও দূরে থাকতে হয়। দূরে না থাকলে, দুঃসঙ্গের যে প্রভাব ফেলে সেটা খুব মারাত্মক বিপজ্জনক, সেখান থেকে এটাই সর্বনাশের কারণ হতে পারে। সেইজন্য বিভিন্ন শাস্ত্র বার বার জগতের সব রকম ভোগ-বাসনার বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলছেন।

জগতে যা কিছু আছে, তা ফিজিক্সের দৃষ্টিতে বা কেমেস্ট্রির দিকে থেকে যেভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকুক, সবটাই আসলে মনের খেলা। বিজ্ঞান একটা অবস্থার পর যা বলে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। বড় বড় গণিতজ্ঞরা, যাঁরা বিভিন্ন পুরস্কার পাচ্ছেন, তাঁরাও গণিত নিয়ে যেসব কথা বলেন, সাধারণ মানুষ তার কোনটাই বুঝতে পারে না। আমেরিকার একটা সভায় চার্লি চ্যাপলিন আর আইনস্টাইন দুজনেই উপস্থিত ছিলেন, চার্লি চ্যাপলিনই আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। দুজনে রাস্থা দিয়ে যখন যাচ্ছেন তখন চারিদিকে প্রচণ্ড ভিড়, সবাই চার্লি চ্যাপলিনকে দেখে হাত নাড়ছে, চিৎকার করছে। আইনস্টাইন দেখে অবাক। হলের ভেতরে যখন ঢুকলেন তখন সবাই দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে আইনস্টাইনকে অভিবাদন করছে। আইনস্টাইনের খুব অবাক লাগল, বাইরে সবাই চার্লি চ্যাপলিনকে ভেতরে সবাই আইনস্টাইনকে অভিবাদন জানাচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিন আইনস্টাইনকে বলছেন, লোকেরা আমাকে দেখে হাততালি দেয় কারণ আমাকে সবাই বুঝতে পারে, তোমাকে হাততালি দেয় কারণ তোমাকে কেউ বুঝতে পারে না। আইনস্টাইনের নামে তখন খুব প্রচলিত ধারণাই হয়ে গিয়েছিল, তিনি অক্সফোর্ডে লেকচার দিতে গেছেন, আইনস্টাইনের নাম শুনে পুরো হল ভর্তি। আইনস্টাইন ইংরাজীতে বলতে পারতেন না, জার্মান ভাষায় ধীরে ধীরে বলছেন, ইক্যুয়শানস্ গুলো লিখে যাচ্ছেন। যেমন যেমন তিনি লিখে যাচ্ছেন তেমন তেমন হল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। উনি দু আড়াই ঘন্টা বলেছেন, শেষ পর্যন্ত হলে চারজন না পাঁচজন শ্রোতা ছিল। তিনটে বোর্ড ধরে তিনি ইক্যুয়েশানস্ লিখেছেন। যে লোকটি হলের দেখাশোনা করে সে দুটো বোর্ডের লেখা মুছে দিল, একটা বোর্ডকে বাঁচিয়ে এখনও মিউজিয়ামে রাখা আছে। বিজ্ঞানের এটাই বৈশিষ্ট্য, কি বলছেন, বিজ্ঞানের যাঁরা বেস্ট তাঁরাও বুঝতে পারেন না। বড় বড় বিজ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি বিশ্বাস করেন? বলবেন, না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরাই মানেন না। এখন কিছু কিছু মানতে শুরু করেছেন। যার জন্য ভদ্রলোক থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির জন্য নোবেল প্রাইজও পেলেন না। খুবই বিতর্কিত থিয়োরী, ওটা সত্যি না মিথ্যা, ঠিক না বেঠিক, কেউ জানে না, আমরা মুখেই রিলেটিভিটি রিলেটিভিটি বলে যাচ্ছি। বিজ্ঞান আজ যা বলবে, কাল আরেকটা জিনিসকে বলবে আমাদের সেটাকেও হ্যাঁ বলতে হবে।

কিন্তু তার থেকেও বিজ্ঞানের যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তা হল, জগৎ যেটা বাইরে আছে, সেটাকে একটা উপমার পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে যাচ্ছে। যেমন দুটো আম আছে তার সাথে আরও দুটো আম যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে চারটে আম হয়ে যাবে। সেখান থেকে ওনাদের সিদ্ধান্ত হল যদি দুটো কমলালেবু হয়,

সেখানে যদি আরও দুটো কমলালেবু দেওয়া হয় সেখানেও চারটে কমলালেবু হবে। এটাই উপমা, একটা জিনিস এখানে যেমন আছে ওখানেও তেমন ভাবেই চলবে। কিন্তু সেটা যে সব সময় একই রকম চলবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। এটাই objective world, objective worldএর যেমন দরকার আছে ঠিক আছে, কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনকে বেছে নিয়েছেন, যাঁদের কাছে জীবন গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের কাছে objective worldএর কোন দাম নেই, তাঁদের কাছে দাম হয় subjective worldএর, আমাকে নিয়ে। জগতে যত রকম বস্তু থাকুক, যেভাবেই তৈরী হয়ে থাকুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ শেষমেশ আমি জগতকে গ্রহণ করব আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে। যে জিনিসটাকে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে আমার কাছে সেটার কোন দাম নেই। এ্যটমের মধ্যে কটা পার্টিকেলস জেনে আমার কি হবে? আমার অতটুকুই দরকার যতটুকু আমাকে করতে হবে। যেমনি আমি গ্রহণ করতে যাব তখন আমার আসবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর একটি মন, এই ছয়টি জিনিসই আমার লাগবে, সপ্তম বলে কিছু নেই।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন, বেদান্ত এখান থেকেই দাঁড়ায় এখান থেকেই চলে। জগতে যা কিছু আছে সবটাই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ হবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে। বস্তুতে যদি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ থাকে তবেই আমরা ঐ বস্তুকে গ্রহণ করব আর ঐ পাঁচটি রূপেই গ্রহণ করব, ষষ্ঠ রূপ বলে আর কিছু হবে না। তার মানে যে কোন জিনিসে সেই উপাদান আছে যে উপাদানে কোন না কোন ভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ এই পাঁচটি জিনিস প্রস্ফুটিত, যাতে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ঐ পাঁচটি জিনিসকে গ্রহণ করতে পারে। আমরা যে তন্মাত্রার কথা শুনে আসছি, এটাই সেই তন্মাত্রা। সত্যিকারের ঐ ভাবে তৈরী হয় কিনা আমরা জানি না, এটা আমরা জানি যে জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যেমন এই পাখা ঘুরছে, এই পাখাকে আমরা কিভাবে নিচ্ছি? পাখার বাতাস আমার গায়ে এসে লাগছে, ওর আওয়াজ আমার কানে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে দেখছি, আর পাখায় যদি নতুন রঙ করা হয়ে থাকে তাহলে রঙের গন্ধও পাচ্ছি। পাখা মানে ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। যখন আমি রূপ দেখছি তখন পুরোটাই দেখছি, কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। এরপর বিজ্ঞান আরও অন্য দিকে যাবে, কিন্তু আমার কাছে সেগুলোর কোন দাম নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিচ্ছে এটা অন্য কোন জিনিসের সাথে মেলে, সেভাবে বিচার করছি জিনিসটা কি। তার মানে বস্তুর মলিক্যুল, এ্যটমিক স্ট্রাকচার যাই থাকুক শেষ পর্যন্ত আমার কাছে ঐ পাঁচটা ছাড়া আর কিছু লাগছে না। এর মানে ঐ বস্তুর মধ্যে ঐ পাঁচটা জিনিস আছে যেটাকে ধরার পাঁচটা যন্ত্র আমার কাছে আছে।

বেদান্ত আবার এখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। যেভাবে ঐ পাঁচটি গুণ নির্মিত, সেই ভাবেই আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় নির্মিত। যার জন্য ইন্দ্রিয় আর গুণ এক অপরকে ছুঁয়ে ওটাকে জানতে পারে। যেখানেই রূপ তন্মাত্রা থাকে সেখানেই চক্ষু ইন্দ্রিয় গিয়ে মিশে যায়, শব্দ বা স্পর্শ তন্মাত্রার ক্ষেত্রেও তাই হয়। মন আবার সরাসরি এই পাঁচটি তন্মাত্রাকে গ্রহণ করে নিতে পারে। সেইজন্য আমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারি, পুরনো স্মৃতিকে নিয়ে আসতে পারি, কল্পনা করতে পারি, স্বপ্নে দেখতে পারি। কারণ মনের ভেতর এই পাঁচটি শক্তি থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরেই সেই আত্মার অস্তিত্ব। মানুষ এই সব কিছুতেই চলাফেরা করতে পারে। কখন ইন্দ্রিয় হয়ে নিজেকে দেখছে, কখন মন হয়ে দেখছে, কখন বুদ্ধি হয়ে দেখছে আবার কখন নিজেকে আত্মা হয়ে দেখে। এনারা এই ভক্তিশাস্ত্রে নিজেকে আত্মার রূপে দেখতে চায়, তাঁর যে শুদ্ধ স্বরূপ সেভাবে দেখতে চায়। তাহলে তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা কি? বিষয়। কেন? মন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, মন কখন ইন্দ্রিয়ের জন্য কাজ করে আবার কখন আত্মার জন্য কাজ করে। যে বেশি শক্তিশালী হয় মন তার দিকে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলো বেশি শক্তিশালী, কারণ আত্মা সুপ্ত, ঘুমিয়ে আছেন, আত্মার কোন কিছুর দরকার নেই, ঠিক আছে যা চলছে চলুক। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো খুব সক্রিয় আর প্রচণ্ড শক্তিশালী, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলি মনকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হল নিজের বস্তুর দিকে ছুটে যাওয়া, কারণ ইন্দ্রিয় আর বস্তু ওরা এক। যেখানেই ইন্দ্রিয় জগৎ সেখানেই ইন্দ্রিয়গুলো পুরো এক হয়ে যায়। আমরা যত সাধনাই করি আর সাধনাতে যত রত হয়েই থাকি, যাই থাকি না কেন, একবার যদি মনে একটা ছোট্ট কিছু চিন্তা বা কামনা ওঠে, যেটা ইন্দ্রিয় জগতের, সেটা ওঠে একটা সাধারণ তরঙ্গের মত, কিন্তু সেকেণ্ডের মধ্যে কখন যে ওটা সুনামি হয়ে যাবে আমরা টেরও পাব না। সেইজন্য বাইরের লোকেরা কোন দিন বুঝতেও পারবে না, একজন সন্ন্যাসীর ভেতরে কত রকমের লড়াই চলে। যে কোন thought যদি মাথায় একবার এসে গেল,

শুভ অশুভ যাই হোক, সন্ন্যাসীকে আর সামলান যাবে না। ঠাকুরের সত্যের আঁট ছিল, তার সাথে ঠাকুরের এটাও ছিল, মনে একটা জিনিস যখন আসত, এটা করতে হবে, ঠাকুর আর ওটা না করা পর্যন্ত থামতেন না, তক্ষুণি করা চাই। বাচ্চা ছেলের মত, বাচ্চা ছেলে যদি বলে আমার হাতি চাই, রাত বারোটাই হোক আর যাই হোক, তক্ষুণি তাকে হাতি এনে দিতে হবে। সত্যের আঁট, বিদ্যার প্রতি আগ্রহ এগুলো তো শুভ, কিন্তু বিষয়ের প্রতি যদি এই জিনিস হয় তখন সেই একই সমস্যা হয়। যে কোন ভোগ, যে কোন বিষয়ের দিকে যদি মন যায় আর তাকে সামলানো যাবে না। একেবারে পাগলের মত হয়ে যায়, যতক্ষণ ওটা না হবে ততক্ষণ শান্তি হবে না। একবার এক সন্ন্যাসীর সাথে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর তর্ক হয়েছে। রাত বারোটায় গিয়ে বৃদ্ধ মহারাজের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন, উনি দরজা খুললেন না। তারপর জানলায় এসে ধাক্কা দিতে লাগলেন। মহারাজ উঠে বসে জিজ্ঞেস করছেন, রাত দুপুরে আবার কি হল? বলছেন, আপনি যে তখন তর্ক করেছিলেন আমার এখন একটা পয়েন্ট মনে পড়েছে সেটা আপনাকে আমি এখন শোনাব। বৃদ্ধ মহারাজ খুব রেগে গেছেন, তুমি সকালেও তো বলতে পারতে। না, সকালের মধ্যে আমি ভুলেও যেতে পারি, সেইজন্য এখনই এসে আপনাকে শুনিয়ে দিলাম। বাইরের লোকেরা এগুলো কল্পনাও করতে পারবে না। যাঁরা জপ-ধ্যান নিয়ে থাকেন তাঁদের মন প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে যায়। এতই শক্তিশালী মন হয় যে, একটা ছোট্ট জিনিস যদি মনের মধ্যে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বটবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গুরুকৃপা যদি না থাকে, শুভশক্তি যদি পাশে না থাকে তাহলে তরঙ্গ থেকে কখন সমুদ্র হয়ে যাবে আর সেই সমুদ্র আপ্লাবিত করে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তিনি নিজেও বুঝতে পারবেন না, অপর কেউও বুঝতে পারবে না। এরপর বলছেন –

কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্? যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি,
যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্মমো ভবতি।।৪৬।।

এই সূত্রটি এবং এর পরের চারটি সূত্র অর্থাৎ ৪৬ থেকে ৪৯, এই চারটি সূত্রে বলছেন মানুষ কিভাবে মুক্তি বা ভক্তির দিকে এগোবে। মূল হল, সাধনার বাস্তবিক দিকটা, সাধনা বলতে কি বোঝায় এই নিয়ে আলোচনা করছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু কথা পুনরাবৃত্তি মনে হবে। পুনরাবৃত্তির দুটো কারণ, একটা থেকে আরেকটাতে খুব ছোট তফাৎ থাকে আর দ্বিতীয় কারণ বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য। যে জিনিসটা খুব জরুরী সেটাকে বার বার করে বলা হয়। এই সূত্রে বলছেন, এই যে অনতিক্রম্য মায়ার বিশাল সমুদ্র, এই মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারেন? এখানে তিনজনের কথা বলছেন, পরে আরও বলবেন। প্রথমটা বলছেন, *যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি*, যিনি অসৎ সঙ্গ পরিহার করেছেন আর আসক্তি ত্যাগ করেছেন, দ্বিতীয় *যো মহানুভবং সেবতে*, যিনি মহাপুরুষদের সেবা করেন আর তৃতীয় *যো নির্মমো ভবতি*, যাঁর অহঙ্কারের নাশ হয়ে গেছে।

প্রথমে মায়ার কথা বলছেন। মায়া জিনিসটা কি জানতে হবে। ধর্ম মানে, ইদানিং কালে কেউ বিজ্ঞানকেই ধর্ম বলে, কেউ কেউ মানবিকতাকেই ধর্ম বলে, আরও কিছু কিছু জিনিসকে ধর্ম বলছে। কিন্তু ধর্ম বলত ওটাই বোঝায়, যারা কোন না কোন ভাবে মৃত্যুর পরেও আমাদের অস্তিত্ব চলছে, এটাকে মানে। তার মানে মৃত্যুই শেষ কথা নয়, মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। পাশ্চাত্য ধর্ম ও মধ্য প্রাচ্যের ধর্মের মতে, মানুষ অনেক কিছু প্রায়শ্চিত্ত করে মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গে যায়। তার মানে তাদের কাছে মায়া মানে নরকে না যাওয়া, কিন্তু ওরা মায়া শব্দ ব্যবহার করে না। আমাদের কাছে মায়া মান, ঐ যে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাচ্ছে, সেটা না হয়ে মৃত্যুর পর বিভিন্ন লোকে যায়, স্বর্গলোক হোক, পাতাল লোক হোক, পিতৃলোক হোক, যাই হোক, সেখানে বাস করে যতটা কর্ম ক্ষয় হতে পারে, ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর আবার একটা শরীর ধারণ করে পৃথিবী লোকে জন্ম নেয়। শরীর সে সব সময় ধারণ করে আছে। যখন দেবলোকে যাচ্ছে সেখানে দেবতাদের শরীর ধারণ করছে, যখন তির্যক যোনিতে যাচ্ছে তখন পশুপাখিদের শরীর ধারণ করছে, কারুর গাছপালার শরীর হল, পাতালে গেল সেখানে অসুরের শরীর ধারণ করল। শরীর তার সব সময় থাকবে, শুধু এক শরীর থেকে আরেক শরীরে যাচ্ছে। শরীর থেকে শরীরে আসা যাওয়াটা যেন থামছে না। দেখা যায় জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, যখন দেখছে আর পারছে না, তখন হঠাৎ কিছু টোপ খাইয়ে দেয়, দেখা গেল কিছু দিন পর থেকে সব ভালো হয়ে গেল। কারণ সবই যদি তার খারাপ চলতে থাকে বা এমন বিরাট কিছু খারাপ হয়ে যায় তখন সে গিয়ে আত্মহত্যা করে নেবে বা বলবে আমার আর কিছু লাগবে না। প্রকৃতি বা মায়া মানুষকে

এভাবে চলতে দেয় না, সেইজন্য তাকে একটা টোপ খাইয়ে দেয়। ঐ যে ভালো কিছু একটা হয়ে গেল, কিছুক্ষণের জন্য মনটা আবার শান্ত হয়ে যায়। যখন শান্ত হয়ে গেল তখন প্রকৃতি আবার নতুন করে দিতে শুরু করে। একবার যদি আমরা শান্ত হয়ে ভাবি আমাদের জীবনের সাথে কি কি হয়েছে, কি হারে আমাদের উপর দুঃখ এসেছে, কিন্তু মানুষকে বসে ভাবতে দেবে না, কারণ একা চুপচাপ বসে যদি কেউ ভাবতে শুরু করে পাগল হয়ে যাবে। জীবনের ব্যালেন্স সীটের দিকে যদি তাকাই, ভালো কি কি হয়েছে, মন্দ কি কি হয়েছে, দেখা যাবে কারুরই জীবনে ভালো কিছু হয়নি। যেগুলো ভালো হয়েছে মনে করছি সেগুলো আসলে ভালোর মধ্যে নয়। ভালো খাওয়া-দাওয়া করে যে তৃপ্তি পাওয়ার আনন্দ, দেখা যাবে জীবনে মাত্র কয়েক বারই হয়েছে। এবার যদি কোন কারণে কারুর একটু সাধুসঙ্গ হয়, শাস্ত্রসঙ্গ হয়, একটু জ্ঞান হয়, হঠাৎ সে দেখতে পাবে কোন জন্মে বেড়াল, কোন জন্মে কুকুর, কোন জন্মে দেবতা হয়ে জীবন কাটিয়েছে। এই যে চলছে, চলছে তো চলছেই, একটা জায়গায় গিয়ে সে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে, এসব কি হচ্ছে? একজন ঠাকুরকে বলছে, কই আমি তো পুনর্জন্মকে ভয় পাই না। ঠাকুর বলছেন, তুমি বল না কেন তোমার এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে। বাসনা এমন একটা জিনিস, কিছু একটা এসে আমাদের বেঁধে নেবে। তিন কুলে কিছু নেই কিন্তু একটা বেড়াল পুষছে, তার ইচ্ছা হল বেড়ালের দুটো বাচ্চা হলে ওদের বড় করে দিয়ে তারপর যাব। বৃদ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত, বিছানায় সেঁটে আছে তাও বলে যাচ্ছে নাতির মুখ দেখে যাব। আবার বলে নাতজামাইয়ের মুখ দেখব। বাসনা যেতে চায় না, নানান রূপ নিয়ে বাসনা এসেই যাচ্ছে। কিন্তু যার একটু বিবেক জেগেছে, সে বলবে আমার আর কিছু লাগবে না। যাদের কপাল ভালো, সাধুসঙ্গ যদি হয়ে থাকে, ভালো আচার্য যদি পেয়ে থাকে, তিনি তার মনে গেঁথে বসিয়ে দেন কিভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলছে। এটাকেই বলে ভবসাগর, এটাকেই ঠিক ঠিক বলে মায়া। মায়া বলতে এটাই, জন্ম-মৃত্যুর চক্র যার শেষ নেই। সেই একই জীব জন্মাচ্ছে মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। যে জঠরেই যাক না কেন, মশা হয়ে জন্ম নিক কি মাছি হয়েই জন্ম নিক, মানুষ হয়েই জন্মাক সেই কোন মাতৃযোনির মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে, কোন পথ নেই। ভুতপ্রেতদের মনে হয় জন্মাতে হয় না। তবে দেবতাদেরও জন্ম হয় না। আগে দেবতাদের সন্তান হত, পরে পার্বতী দেবতাদের অভিশাপ দেওয়ার পর থেকে দেবতাদের সন্তান হয় না। দেবতাদের স্ত্রী আছে কিন্তু ওদের সন্তান হয় না। জয়ন্ত ইন্দ্রের সন্তান, জয়ন্তের পর আর সন্তান নেই। এগুলো কাহিনী, তার মানে দেবতা যারা হয় মরার পরই দেব শরীর পেয়ে যায়। একবার যখন এই দিকে দৃষ্টি পড়ে, আমাদের এই জঘন্য অবস্থা, তখন বলে আমার আর লাগবে না।

এর জন্য একটা শুরু লাগে। কেউ যদি বুঝে নেয় আমাকে জন্ম-মৃত্যুর নাগরদোলায় ঘোরান হচ্ছে, সে বলবে আমাকে নামিয়ে দাও, আমি আর ঘুরতে চাই না। কিছু লোক বলবে নাগরদোলায় বেশ মজা পাওয়া যায়, তারা জীবনকে খুব ভালোবাসে। নাগরদোলায় যখন উপরের দিকে যায় তখন কষ্টটা কম মনে হয়, কিন্তু নীচের দিকে যখন গোত্তা মারে তখন গা শির শির করতে থাকে। জীবনেও একই জিনিস হয়, মানুষ যখন উপরের দিকে যায় তখন তার ভালোই লাগে, নীচের দিকে যখন যায় তখন বলে আমার একি হয়ে গেল। আর আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে স্ক্রু দিয়ে টাইট করে বাঁধা, ওর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে। ওর মধ্যেই চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে। যতক্ষণে মনে হবে কান্নাটা আর থামবে না, ততক্ষণে দেখবে ওটা উপরের দিকে ওঠা শুরু হয়েছে, একটু হাফ ছেড়ে বাঁচল। কত দূর আর যাবে, একটা সীমা পর্যন্ত যাবে, সেখান থেকে আবার নীচের দিকে গোত্তা মারবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এটাই হয়, সবাই যে এখানে কষ্ট পাচ্ছে তা না। সেইজন্য আচার্যের সঙ্গ যখন হয় তখন তিনি এদিকে আমাদের দৃষ্টিটা নিয়ে যান। যে সুস্থ মানুষ, আনন্দে আছে, যে বলছে আমি বেশ আছি, সে কেন ধর্ম কথা শুনতে আচার্যের কাছে যাবে! কোথাও না কোথাও তার পূণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে আর তা নাহলে জীবনে কিছু একটা হয়ে গেছে যেটা তার কাছে শুভ বলে মনে হচ্ছে না। এই যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, হিন্দু শাস্ত্রে এটাকেই বলছেন মায়া। শুধু হিন্দু শাস্ত্রেই নয়, বৌদ্ধ ধর্মে, জৈন ধর্মেও মায়া বলতে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। বেদান্তে মায়ার অনেক পরিভাষা দেওয়া হয়, অনেক ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু মায়া বলতে ঠিক ঠিক, বিশেষ করে যখন *তরতি* অর্থে আসে, ভবসাগরের অর্থে আসে তখন এর একটাই অর্থ জন্ম-মৃত্যুর চক্র। যিনি অবিনাশী, অজর, অমর, অনন্ত তিনিই নিজেকে বহুরূপে দেখাচ্ছেন, দ্বিতীয়ত দেখাচ্ছেন তিনি জন্মাচ্ছেন মরছেন, এটাই

মায়া। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, আমাদের দিক থেকে যদি দেখা হয় তখন মায়া বলতে বোঝায় এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রের পেছনে রয়েছে বাসনা, বাসনা বলতে সেই কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো।

বলছেন এই মায়ার পারে কি করে যাবে? *যঃ সঙ্গাংস্ত্যেজতি, যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্মমো ভবতি। মহানুভবং সেবতে,* এর উপর আমরা আগে অনেক আলোচনা করেছি। মূল কথা হল, ঈশ্বর আর তাঁর ভক্ত, দুজনে কোন ভেদ নেই। মহাপুরুষের সেবা করলে তাঁর কৃপা হয় আর এই কৃপা বিভিন্ন ভাবে আসে। এগুলোকে যুক্তির দিয়ে দেখলে খুব সহজে বোঝা যায়, যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, চলিত কথা নিয়ে চলে সেটাও ভালো কিন্তু জিনিসটা তত জমে না। বেদান্তে মুক্তিই শেষ কথা। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, সবই ঘুরে ফিরে ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। অলৌকিক তত্ত্ব যেগুলো আমরা শুনে থাকি সেগুলোও আছে, শক্তির খেলা হতেই পারে, কিন্তু আমাদের জানা নেই আর ওদিকে বেশি মনও দিতে নেই।

মহানুভবের যে সেবার কথা বলা হয়, তাতে মহাভারতে আছে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের উপর একবার খুব রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে তলোয়ার বার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত, তিনি জিজ্ঞেস করছেন, অর্জুন! কী ব্যাপার, তলোয়ার কেন? অর্জুন বলছেন, আমার গাণ্ডীবের যে অপমান করবে আমি তার মুণ্ডু খসিয়ে দেব, যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবের অপমান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন, অর্জুন! তুমি বৃদ্ধজনের সেবা কোন দিন করনি, সেইজন্য তোমার ভেতরে এত ক্রোধ। আমাদের জানা নেই, সত্যিই এই রকম কিছু হয়েছিল কিনা, শ্রীকৃষ্ণও এই রকম কথা বলেছিলেন কিনা। কিন্তু সিদ্ধান্ত হিসাবে যদি দেখা হয় তাহলে পুরোপুরি ঠিক। স্বামীজী বার বার বলছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন নাকি অন্য কেউ বলেছিলেন সেটার কোন গুরুত্ব নেই কিন্তু যে সিদ্ধান্ত গুলো আছে সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। একটা কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি, একজন যুবতী সেই সম্মান পায় না, কিন্তু মা হয়ে গেলে সম্মান পায়, ঠাকুরমা হয়ে গেলে আরও বেশি সম্মান পায়, কারণ সে সেবা করছে। শুধু তো সেবা নয়, ভালোবাসাটা থাকে, কোথাও তার আমিত্বটা লেগে আছে। কিন্তু বৃদ্ধজন, আচার্যের যে সেবা করে, সেই সেবার বদলে সে শুধু বকুনি খাবে। শিষ্যরা যে আচার্যের সেবা করছে তারা খালি বকুনিই খায়। বকুনি খেয়ে, ধমক খেয়ে খেয়ে ওদের অহঙ্কারটা নাশ হয়ে যায়। সেবা করতে করতে ভেতরটা নরম হয়ে যায়। একজন বৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর কথা মত, তাঁর ইচ্ছা মত সেবককে চলতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে তার নিজের যে কাম, ক্রোধ, লোভ আছে এগুলো কমে যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ কমে যাওয়া মানেই এবার তার মনটা সূক্ষ্ম হয়ে গেল, এবার ঈশ্বরের পথে চলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। আমরা বলি তাঁর কৃপা, অমুক মহারাজের সেবা করেছে বলে আজ এত বড় সাধু হয়েছেন। অনেকে হয়ত বলবেন, অমুক মহারাজের সেবা করে আজ তিনি সেক্রেটারি হয়ে গেছেন, অমুক মহন্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু আরও যে দশজন আছে তাঁরাও তো অনেক বড় বড় মহারাজের সেবা করেছেন, কই তাঁদের তো কিছু হয়নি।

কিন্তু একটা জিনিস সবারই হয়, যেটা আমাদের মুর্খ মন মেনে নিতে চায় না, সেটা হল এই সূত্র, *কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্,* মায়ার পারে যাওয়ার প্রস্তুতি তাঁদের হয়ে যায়। কারণ ঐ যে সেবা করছিল, ঐ সেবা করতে করতে কাম, ক্রোধ, লোভ কমে গিয়ে মনটা সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়ার ফলে জিনিসটা যেমন তেমনটিই দেখতে পান। যার জন্য শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলোকে তাঁরা ধরতে পারেন আর তাঁরা যদি লেখালেখি করেন সেই লেখার মধ্যেও একটা গভীরত্ব থাকবে। গভীর জিনিসগুলো একমাত্র তাঁরাই লিখতে পারেন যাঁরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই হয় সহজ হওয়া, সহজ হওয়া মানেই সূক্ষ্ম হওয়া, সূক্ষ্ম হওয়াও যা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও তাই। ঠাকুর বলছেন সহজ না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না, আবার বলছেন সত্যই কলিযুগের তপস্যা। দুটো এক, সত্য বলাও যা সহজ বলাও তাই। সত্য বলা আর সহজ হওয়া মানেই হয় সে সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। অস্ত্র পরীক্ষায় অর্জুন শুধু পাখির চোখ দেখছে আর কিছুই দেখছে না। তখন কুন্তি যদি বলতেন, তুমি আমাকেও দেখতে পাচ্ছ না? অর্জুন বলবে, চেষ্টা করছি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। তখন যদি দ্রৌপদীর সাথে বিয়ে হয়ে থাকত, দ্রৌপদী যদি জিজ্ঞেস করত, তুমি আমাকেও দেখতে পাচ্ছ না? না, তোমাকেও দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে অর্জুন ক্যাট্ ক্যাট্ করে কথা বলছে? একেবারেই না, অর্জুন যে মাকে ভালোবাসে না তা না, যখন মায়ের কাছে আছে তখন মা ছাড়া আর কিছু জানে না। দ্রৌপদীকে যখন ভালোবাসছে, যখন দ্রৌপদীর সাথে আছে তখন দ্রৌপদী ছাড়া আর কাউকে সে জানে না।

নতুন ব্লেডের ধার কত তীক্ষ্ণ, একটু ছোঁয়া লাগলেই কেটে যাবে। লেজার বিমকে যদি বলা হয় ব্লেডের ধারের উপর দিয়ে হাটতে আর লেজার বিমের যদি চেতনা থাকে, তাকে যদি বর্ণনা দিতে বলা হয় তখন লেজার বিম কি বলবে? সে বলবে, আমি তো রাজপথে হাটছি। কারণ ব্লেডের ধারের থেকেও লেজার অনেক সূক্ষ্ম। সেইজন্য লেজার দিয়ে অপারেশন করা হয়। কঠোপনিষদে বলছেন, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*, সেখানে যমরাজ এটাই বলতে চাইছেন। তোমার মন বুদ্ধি যদি সূক্ষ্ম হয় তবেই তুমি ক্ষুরের ধারের উপর ঘোড়া গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে লেজার থেকেও সূক্ষ্ম। আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক তাই হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্থূল থেকে স্থূল করে দেয়, এগুলো যত কমতে থাকে মন তত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে। যখন একেবারে সূক্ষ্ম হয়ে যাবে তখন লেজারের উপর দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক সত্য এভাবেই পায়, এর বাইরে অন্য কোন পথ নেই। জগতের পেছনে যে সত্যগুলো রয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সেই সূক্ষ্মকে যদি ধরতে যাওয়া হয় তাহলে মন যদি সূক্ষ্ম না হয় কোন দিন ঐ সত্যকে ধরতে পারবে না।

অহংতা আর মমতা এই দুটো আমাদের ব্যাক্তিত্বের দুদিক থেকে জুড়ে আছে। অহংতায় আমিত্বের ভাব বিরাট বড় হয়ে যায়। আমি আত্মা, এটা হল সূক্ষ্মতম, সেখান থেকে আমি মন সূক্ষ্মত্বটা একটু স্থূল হয়ে গেল, আমি ইন্দ্রিয় আরও স্থূলে নেমে এল, আমি শরীর আরও ভোঁতা হয়ে গেল। মমতা হল, এই বাড়ি আমার, এই গাড়ি আমার, আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমি এই হয়েছি, এটা আমি করেছি, এটাই মমতা। যাদের মধ্যে অহংতা আর মমতা থাকে তারা সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না। শুধু বিষয় সঙ্গই নয়, কোন সঙ্গই এরা ত্যাগ করতে পারে না। সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না মানে, খড় বোঝাই বড় বড় ট্রাকগুলো যখন যায় তখন তার উপরেও খড় বেরিয়ে থাকে, সাইডেও বেরিয়ে থাকে, পেছনেও বেরিয়ে থাকে। আমরাও ঠিক তাই, এত বেশি ওভারলোড হয়ে আছি যে ওদিকে পাঁচজনকে মারছি, এদিকেও পাঁচজনকে মেরে বেরিয়ে যাচ্ছি। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে সহজ ভাবে জগতেও চলাফেরা করা যাবে না আর আধ্যাত্মিক পথে তো যাওয়াই যাবে না। অহংতা আর মমতা থেকে কেউই সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না, না সন্ন্যাসী না গৃহী। যে সাধু বা ভক্তের মন একটু ভগবানের দিকে গিয়ে থাকে, তার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে যাবে। ঠাকুর আর জগৎ এই দুটো জিনিস কখনই কোন অবস্থাতেই একসাথে চলতে পারে না। আমি সকাল সন্ধ্যা দু ঘন্টা করে জপধ্যান করতে পারি, সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরের আরতিতে যেতে পারি, দিনরাত শাস্ত্র নিয়ে পড়ে থাকতি পারি অথচ জগতে ততটাই আমার মন আছে যতটা এদিকে আছে। সব করার পর সেই স্বামী, সেই স্ত্রী, সেই পুত্র, সেই টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে পড়ে আছি। কিছু না করার থেকে এগুলো করা নিশ্চয়ই অনেক ভালো, এতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু আসল যে আধ্যাত্মিক জীবন, সেই জীবনে একেবারেই নামছে না।

কাউকে ঠিক করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য হল আমি কত সূক্ষ্ম হব, আমাকে ঐ ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলতে হবে। তার মানে, মন এত সূক্ষ্ম হবে যে, আশেপাশে যে আবর্জনা গুলো রয়েছে, সেই পরম সত্যকে যা আবৃত করে রেখেছে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে ওর মধ্যে আমি সাঁ করে ঢুকে যাব। যোগ বিঘ্নের কথা যে বলা হয়, এটা তা নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে সত্য সেই সত্যের সাথে আমি এক। হাতড়ে হাতড়ে সত্যকে ধরা নয়, সত্য হল, আমি যা সেই সত্যও তাই, সেই সত্যের সাথে বোধে বোধ হয়ে যাওয়া। বোধে বোধ হয়ে যাওয়া মানেই আমাকেও অতটাই সূক্ষ্ম হতে হবে। সাধুসঙ্গ যখন করছে, সাধুসেবা যখন করছে, সেবা করে যখন তাঁদের প্রসন্ন করছে, তখন আমিত্বটা হারিয়ে যায়। সন্তানের সেবা করার সময় মায়েরও আমিত্বটা হারিয়ে যায়, কিন্তু কোথাও একটা আমিত্ব থাকে, আমি একে জন্ম দিয়েছে, এর প্রতি আমার কর্তব্য আছে। কিন্তু সাধুর যখন সেবা করছে তখন সেটাও চলে যায়। সাধুসেবাকে সে নিজে বেছে নিয়েছে, সন্তানের সেবার ক্ষেত্রে তা হয় না। সেইজন্য যে সাধুসেবা করছে, সাধুকে যে প্রসন্ন করছে এতে যে তার অহংতা মমতা কমে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, শুধু তার সামনেই নয়, চিরদিনের জন্য কমে যাবে। আর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি তার হবেই। তাই না, বাড়িতে ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, বৃদ্ধ বাবা-মার সেবা করলে একই জিনিস ঘটবে। কারণ তাদের যে খামখেয়ালিপনা, তাদের যে মেজাজ সব কিছু সহ্য করে সেবা করে যাচ্ছে, আর তার থেকে যে কিছু পেয়ে যাবে তাও না, কিন্তু সেবা করে যাচ্ছে। এই সেবা করলে অহংতা মমতা, নিজের কাম, ক্রোধ এগুলো দমে যায়। দমে যখন একবার গেল এবার মন সূক্ষ্ম হয়ে গেল। যেমন যেমন মন সূক্ষ্ম হবে

তেমন তেমন যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির সামর্থ অর্জন করবে। মন যেমনি একেবারে সূক্ষ্ম হয়ে যাবে তখন সত্যের সাথে এক হয়ে যাবে। এমনিতে সত্য সব সময় আমাদের কাছে একটা জড়ানো সত্য আসে। ভোঁতা মন ভোঁতা জিনিসকেই ধরে। আসল সত্যকে ধরার জন্য মনক সূক্ষ্ম হতেই হবে।

সেইজন্য বলছেন *কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্*, দুবার করে বলছেন জোর দেওয়ার জন্য। মায়ার পারে কে যেতে পারেন? প্রথম শর্ত *যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি*, যে কোন ধরণের সঙ্গ, যে কোন আসক্তি যেখানে আমিত্বের ভাব লেগে আছে, এই সঙ্গ ও আসক্তির ত্যাগ যিনি করেছে, দ্বিতীয় শর্ত মহানুভবের সেবা যিনি করেন আর তৃতীয় শর্ত *নির্মমঃ*, মমতা, আমি ও আমার এই বোধটা যাঁর চলে গেছে তিনিই এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। এরপর আরও কয়েকটি শর্ত বলছেন –

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি,
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি।।৪৭।।

প্রথমে একটু স্থূল থেকে শুরু করেছেন, তুমি আসক্তি ত্যাগ করবে, সাধু সেবা করবে আর মমতা ত্যাগ করবে। সেখান থেকে আরেকটু সূক্ষ্মে যাচ্ছেন। কিভাবে সূক্ষ্মে নিয়ে যাচ্ছেন? *বিবিক্তস্থানং সেবতে* মানে একান্ত বাস, নির্জন স্থানে একা একা বাস করা, ঠাকুর যাকে বলছেন নির্জন বাস। *লোকবন্ধমুন্মূলয়তি*, সংসারের যত রকম বন্ধন আছে সব বন্ধনকে নির্মূল ভাবে ছিন্ন করা। *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি*, তিনটে গুণের পারে যাওয়ার চেষ্টা করা। তার সাথে যোগ আর ক্ষেম এই দুটোকে যিনি ত্যাগ করেন। যোগ অর্থ অর্জন করা আর ক্ষেম মানে অর্জিত জিনিসের রক্ষণ করা। অহংতা আর মমতা থেকে আরেকটু সূক্ষ্ম ভাব এনে বলছেন, একান্ত বাস আর নিজের জনদের থেকে দূরে থাকা। কথামৃতে ঠাকুরকে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে থাকলে কি হবে না? গৃহস্থদের কি হবে না? ঠাকুর বলছেন, কেন হবে না, হবে কিন্তু মাঝে মাঝে নির্জন বাস করতে হয়, আরও অনেক কিছু বলছেন। তবে গৃহস্থদের পক্ষে মোক্ষ সাধন সম্ভব না, গৃহস্থদের জন্য ধর্ম সাধন। ধর্ম সাধন মানে পূণ্যের কাজ, জপধ্যান করা, পূজা অর্চনা করা, শুভ জিনিসকে ধরে রাখা, ধর্মকে ধরে রাখা। গৃহস্থদের পক্ষে এগুলো করা সম্ভব কিন্তু মোক্ষ সাধন একেবারেই সম্ভব নয়। মুণ্ডকোপনিষদে যখন পরম্পরার কথা বলছেন, শৌনক ঋষি থেকে শুরু করা হচ্ছে, আচার্য শঙ্কর তখন সেখানে বলছেন, এই তালিকায় কয়েকজন গৃহস্থের নাম আছে, কিন্তু তা হওয়ার নয়, কারণ এটা সন্ন্যাসীদেরই পরম্পরা। মহারাজদেরও কম বয়সে মনে হত, আচার্য শঙ্কর ঠিক কথা বলেননি। কখনই এমন কথা বলতে নেই যে কথাতে মানুষকে নিরুৎসাহ করে দেয়, তোমার দ্বারা এই কাজ হবে না, এই ধরণের কথা কখন বলতে নেই। কিন্তু এই জিনিসগুলো কত গভীর, কত সূক্ষ্ম, এর আগে যে সত্য আর সূক্ষ্মের আমরা আলোচনা করছিলাম, ষড়্‌বিকারের বাইরে আর সেখান থেকে পরমার্থ প্রাপ্তি, সংসারে যাঁরা আছেন তাঁরা যতই মুখে বলুক, তাঁদের পক্ষে সম্ভব না। সেইজন্য ঠাকুর, এক মাস হোক, তিন দিন হোক, একদিন হোক একান্ত বাসের কথা বলছেন।

বিবিক্ত মানেই একান্ত, একান্ত মানে যত ধরণের support systems আছে সেটাকে ত্যাগ করা। আমরা বলতে পারি, ঘরে থেকে কি একান্ত বাস হয় না? হতে পারে কিন্তু তাকে ঐ support systems গুলো ছেড়ে দিতে হবে। তার মানে, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, মোবাইল ফোন, লোকেদের সাথে মেলামেশা এগুলো থেকে নিজেক সম্পূর্ণ আলাদা করে নেওয়া। একজন গৃহস্থ বাড়িতে কতক্ষণ এগুলোকে ছেড়ে থাকতে পারবে? প্রথম কথা আজকাল বাড়ির যে আয়তন সেখানে এটা সম্ভব নয়। হলেও খুব জোর পনের মিনিট থেকে আধ ঘন্টা, কিন্তু এভাবে কিছু হয় না। এই যে সাধনার কথা বলছেন, এই সাধনা সারা জীবন ব্যাপী চলবে যতক্ষণ না সিদ্ধি হয়। সারা জীবন ধরে বলতে দশ বছর লাগবে, না কুড়ি বছর লাগবে আমরা জানি না। এর আগে একটা সূত্র ছিল যেখানে বলছেন এর মধ্যে এতটুকু আপোষ করা যাবে না, আধ্যাত্মিক সাধনায় ছুটি বলে কোন কিছু নেই। একটু ব্রেক হলেই আবার পুরোটাই জগতের মাঝখানে টেনে নামিয়ে আনে, এরজন্য যে এত দিনের সাধনার পুরোটাই বৃথা হয়ে যাবে তা না, কিন্তু নামিয়ে আনে, মনকে আবার সংসারের দিকে নিয়ে চলে যায়। সংসারে থেকে, সংসার বলতে আমরা যা বুঝি, সাধন ভজন করা খুব কঠিন, ধর্ম সাধন হয় এতে কোন সন্দেহই নেই। ভক্তদের সন্ন্যাসীরা বেশির ভাগ সময় যা কিছু উপদেশ দেন সেটাও ধর্ম সাধনের

জন্যই দেন, মন্দিরে আসবে, বিগ্রহ দর্শন করবে, পূজা অর্চনা করবে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে, নিজের জপধ্যান করবে। এখানে এনারা মোক্ষ সাধনের কথাই বলছেন।

বিবিক্তস্থানং, সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে একা করে নিতে হবে, কেউ থাকবে না। পুরো support systemকে ছেড়ে দিতে হবে। Support systemএর সমস্যা হল, যে তাকে support দেবে সে তার থেকে ট্যাক্স নেবে। ট্যাক্স মানেই হয় part of his mind, বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হয়েই থাকে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর যে ঝগড়া হয় বেশির ভাগ ঝগড়া একটা জিনিসকে নিয়েই হয়। স্ত্রী বলবে তুমি আজকাল আমার দিকে কোন attentionই দাও না, স্বামীও স্ত্রীকে তাই বলে। আসলে একজন আরেকজনের part of the mind চায়। তোমার মনের একটা অংশ আমি চাই, পারলে পুরো অংশটাই চায়। পুরো অংশটা যদি দিয়ে দেয়, বলবে স্বামীটা ভেড়া হয়ে গেছে। সে বেচারী কোন দিকেই যেতে পারে না, ভেড়া হয়ে গেছে তার জন্য গালাগাল দেবে, তাচ্ছিল্য করবে সেটা আলাদা, কিন্তু তার থেকেও বেশি হল part of the mind। কিন্তু যে স্ত্রী প্রচুর কাজে কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, পঞ্চাশটা জিনিসে এত engagement যে ওর স্বামীর attention দরকার লাগে না। বরঞ্চ স্বামীই স্ত্রীর কাছে মাথা ব্যাথা। স্ত্রী এখানে স্বামীর কাছ থেকে কোন support নিচ্ছে না। এই যে বলছেন *বিবিক্তস্থানং সেবতে*, এর সাথে এটা সরাসরি যুক্ত। যার কাছ থেকেই আমরা support নিচ্ছি সে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবে। ট্যাক্স নির্দ্বিধায় একটাই হয়, তা হল part of your mind। ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ি গেছেন, বলরাম বাবু খুব খাতির যত্ন করেছেন, ঠাকুর বলছেন বলরাম এবার নাচাবে। বলরাম সবাইকে খাইয়েছেন, ঠাকুরকে এবার ট্যাক্স দিতে হবে, তাঁকে কীর্তন করতে হবে, নৃত্য করতে হবে, ভগবৎ প্রসঙ্গ করতে হবে। স্বামী তুরিয়ানন্দজী ভারত ভ্রমণ করার সময় বোম্বেতে এক শেঠের বাড়িতে গেছেন। শেঠ মহারাজকে খুব ভালো করে খাইয়েছে। সব হয়ে যাওয়ার পর শেঠজী বলছেন, মহাত্মাজী, ত্যাগ পর কুছ বলিয়ে। হরি মহারাজ খুব দুঃখ করে বলছেন, যে লোকটার এখন খাওয়া গ্রহণ করলাম তাকে আমি ত্যাগের উপরে কি বলব!

সম্পর্ক মানেই হয় part of your mind, এছাড়া আর কিছু না। আর টাকা-পয়সা এগুলো কোন ব্যাপারই না। বেশির ভাগ বাড়িতে যে ঝগড়া বিবাদ হয়, বিশ্লেষণ করে দেখলে কদাচিৎ কোন বাড়ি পাওয়া যাবে, যেখানে টাকা-পয়সা নিয়ে অশান্তি হয়, খুবই কম। দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চ স্বামীকে নিয়ে এত বছর জঙ্গলে কাটাচ্ছেন, তাঁরা সেখানে খুব অভাবেই কাটাচ্ছেন, দ্রৌপদী সবই সহ্য করছেন। কুন্তিও যখন বনে ছিলেন তিনিও সেখানে অভাবেই ছিলেন। মানুষ অভাব সহ্য করে নেয় কিন্তু অবহেলা, কেউ তাকে উপেক্ষা করবে, বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু তাকে যদি কাজের মধ্যে সারাদিন ব্যস্ত করে দেওয়া যায় তখন সে নিজের দিকে তাকাবার সুযোগ পায় না। *বিবিক্তস্থান* বলে এখানে সেই ধরণের মানুষের জন্যই বলছেন, যারা বলতে পারে তোমার ভালোটাও আমার লাগবে না, মন্দটাও লাগবে না। সংসারীদের মা আছে, বাবা আছে, স্বামী আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, এদেরকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, কারণ এরা সবাই তার support system, তার উপর বন্ধুরা আছে। একটা বন্ধুকে উপেক্ষা করে দেখুক, ফোনের একটা কল ব্যাক যদি না করে তাকে বলবে 'তুমি এখন বিরাট কিছু হয়ে গেছে, ফোন করলে ধরছ না, একটা কল ব্যাক করছ না, বেলুড় মঠে ক্লাশ করে করে তোমার ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে'? কারণ সে তার মনের একটা অংশ চাইছে। সংসারী মানুষ বন্ধুদেরও উপেক্ষা করতে পারবে না, কারণ কাল তার ছেলের অন্নপ্রাশন আছে, বোনের বিয়ে আছে, বাবা মারা যাবে, পাঁচজন লোক দরকার, তাকেও সেখানে যেতে হবে। কোন উপায় নেই। সেইজন্য এনারা বলে দেন চারটে আশ্রমের মধ্যে তিনটে আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ আর বাণপ্রস্থ হল ধর্ম সাধনের জন্য কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম হল মোক্ষ সাধনের জন্য। মোক্ষ সাধনে কোন ধরণের কোন আসক্তির অনুমতি নেই। যে মানুষ নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিকেই ত্যাগ করে দিয়েছে, নিজের আমিত্বকে ছেড়ে দিচ্ছে সে কোথা থেকে কিভাবে পাঁচজন লোককে নিয়ে চলবে। ঠাকুর যখন সাধনা করছেন তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ত তাঁর স্ত্রী আছেন। ঠাকুর তখন শ্রীমার কথা ভাবছেন, কি হবে ওর! ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, তখন ভাবতুম আমার মতই থাকবে, ঈশ্বরের নাম করবে। আমরা যাঁকে অবতার বলে মানছি, যাঁর ঐ উচ্চ সিদ্ধির অবস্থা, তাঁরও মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছে আমি তো বিয়েথা করেছি, বিয়ে করেছি মানে আমি তাঁর দায়ীত্ব নিয়েছি, তাঁর কি হবে! কারণ তিনি

নিজের শরীরই সামলাতে পারছেন না, তখন বলছেন আমার মতই থাকবে। কারণ যখন কারুর দায়ীত্ব নিয়েছে বা বলেছে, সে সমস্যাকে ডেকে নিল। তাদের নিজেদের সব আবর্জনা তার দোড় গোড়ায় ফেলবেই।

বিবিক্তস্থানং, সংসারের সমস্ত রকম জঞ্জাল থেকে পুরোপুরি সরে আসা। সরে আসা মানেই *লোকবন্ধমুন্মূলয়তি*, লোকের সাথে যে সম্পর্ক, বন্ধু হোক, সংসারী হোক, সব লোককে ত্যাগ করতে হবে। খুবই মুশকিল। গান্ধীজী ঠিক করলেন যে তিনি বিদেশে যাবেন, বাড়ির লোকেরাও রাজি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জাতের লোকেরা জাতিচ্যুত করে দিল। গান্ধীজী যেদিন মারা গেলেন তখনও তিনি জাতি থেকে বহিস্কৃত ছিলেন। ওনার বংশের কারুর সাথে বিয়ে দেওয়া হবে না, ওনার বাড়িতে কেউ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে না, খাওয়া-দাওয়া করবে না, ওনার বাড়ির লোকেরাও কারুর বাড়ি যেতে পারবে না। গান্ধীজী বললেন, আমি বিদেশে চললাম। স্বামীজী বিদেশে গিয়েছিলেন বলে কত নিন্দাবাদ হয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরাও পরে গান্ধীজীর সভায় আসছেন, গান্ধীজী নিজের লোক মনে করছেন। কিন্তু সমস্যা হল কে উদযোগী হয়ে বলবেন, আমরা তাঁকে আবার আমাদের জাতিতে ফেরত নিচ্ছি। ফেরত নেওয়া আর হয়নি, গান্ধীজী জাতিচ্যুত হয়েই মারা গেলেন। এটা সবারই হয়, আমি যদি আজকে সাধনা করতে যাই, আমাকেও আমার লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে দেবে।

কিন্তু নিজেকে খুব সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম করে করে ঐ সরু পথ দিয়ে যখন নিজেকে ওপারে নিয়ে চলে গেল, ওপারে চলে যাওয়ার পর তার এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবে যে, সেই ব্যক্তিত্ব সব জায়গায় ছেয়ে যাবে। খুব স্থূল উপমা নিয়ে বলা যেতে পারে, একটা কয়লার টুকরো, ছোট্ট কয়লার আকারের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এবার ঐ কয়লার টুকরোটা যদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাতে ওর যে ধুয়ো উদগীরন হবে সেই ধুয়ো সবাইকে ঢেকে দেবে। কিছুটা এই ধরণের হয়। একটা স্থূল ব্যক্তিত্ব যখন সাধনার আগুনে জ্বালান হয় তখন সিদ্ধি রূপ ধুয়ো বেরোয়, সিদ্ধি রূপ ধুয়ো সবাইকে ছেয়ে ফেলে। যারা তাকে এতদিন গালাগাল দিয়েছে, নিন্দা করেছে তারাই এখন নিজেদের ধন্য মনে করবে তাকে জানে বলে। কোন সন্ন্যাসী যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাঁকে কত গালাগাল শুনতে হয়, কত দায়ীত্বহীনতার অপবাদ শুনতে হয়। যারা দায়ীত্বের বোধ করিয়েছিল, যাদের ব্যাপারে দায়ীত্বের বোধ করিয়েছিল, তারাই সেই সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য হাতজোড় করে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে স্তুতির জন্য বলা হচ্ছে না, *লোকবন্ধমুন্মূলয়তি* এই ব্যাপারে বলা। যেমনি কেউ লোকবন্ধন কাটতে যাবে, এক এক করে সবাই তাকে লাথি মারতে শুরু করবে, কটূ কথা বলবে। তখন ঐ মানসিক ব্যাথা ও যন্ত্রণাকে গ্রহণ করাটাও যেমন খুব কষ্টের, সহ্য করাটাও সেই রকম কঠিন। কারণ এক দিনেই তো কেউ গভীর সমাধিতে চলে যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে যাচ্ছে। লোকেরা বুঝতে পারে না বলে পাঁচটা কথা তাকে বলবে। কিন্তু মহৎ হয়ে যখন ফিরে আসবে, তখন এরাই তাকে মহাপুরুষ বলে জানবে। কিন্তু ঐ সাধনার সময়টা খুবই কষ্টের সময়, এত রকম কথা শুনতে হয় যে বেশির ভাগ মানুষ শেষ পর্যন্ত এই পথে টিকে থাকতে পারে না। তবে যাঁরাই মহাপুরুষ হন, তাঁদের এই অস্বস্থিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই যেতে হয়, আর সাধনাও সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হয়। স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে কলেজে গিয়ে পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে একটা নতুন সার্কেলে পড়ে। আধ্যাত্মিক জীবনেও পুরনো সব কিছুকে ছেড়ে চলে আসতে হয়। এখানে নতুন সার্কেল তো হবে না, সেখানে শুধু নিজেকে নিজের মধ্যে অবস্থান করানোটাই হয়। ওই অবস্থানেই সবার মঙ্গল হয়ে যায়।

যোগক্ষেমং ত্যজতি, লোকবন্ধন যেমনি ছেড়ে দিল তখন তাকে যোগক্ষেমকেও ত্যাগ করে দিতে হয়। যোগ মানে অর্জন করা, ক্ষেম মানে সঞ্চয় করা। সবাই যে অর্থ উপার্জন করছে এটাকে বলা হয় যোগ, আর সেই টাকাকে কত ভাবে সামলে রাখছে, ব্যাঙ্কে রাখছে, আরও যাতে আয় করতে পারে সেইজন্য এখানে সেখানে ইনভেস্ট করে সুদ নিচ্ছে, এগুলোকে বলে ক্ষেম, দুটোকে মিলিয়ে বলে যোগক্ষেম। সংসারে চালানোর জন্য অর্থ উপার্জন যেমন করতে হয় তেমনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করতে হয়, অর্জন আর সঞ্চয় দুটো মিলিয়ে যোগক্ষেম বলছেন। এবার তাকে যোগক্ষেমটাও ছেড়ে দিতে বলছেন। সে নিজের স্থান ছেড়ে দিয়েছে, *বিবিক্তস্থানং* হয়ে গেছে, তার *লোকবন্ধন*, সংসারের মানুষের সাথে যোগাযোগ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে তার নির্ভরতা ঈশ্বরের দিকে ক্রমশ বাড়ছে। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা যতটা বাড়ে বুঝতে হবে তার মন তত সূক্ষ্ম হচ্ছে। একটু আগে যে support systemএর কথা বলা হল, টাকা পয়সাটাও support system। টাকা-পয়সাও আমাদের মনের একটা অংশকে টেনে নেবে, হিসাব রাখতে হবে, ইনকাম ট্যাক্স

কিভাবে বাঁচানো যেতে পারে, ব্যাঙ্কে কত সুদ বাড়ল, কত কমল, মনের একটা বড় অংশকে টানবেই, কিছু করার নেই। মন সূক্ষ্ম হওয়া মানেই হয়, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া মন আর কোন দিকে দিতে পারবে না। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার বর্ণনার কথা পড়লে আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, ঠাকুর তাই বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি তোরা এক আনা কর। ঠাকুর বলছেন, নিজের দেহ যে এত প্রিয় সেই দেহই ভুল হয়ে যায়।

লোকবন্ধন আর *যোগক্ষেমং* এই দুটোর মাঝখানে বলছেন *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি*। *নিস্ত্রৈগুণ্যো* মানে তিনটে গুণের পার। তিনটে গুণের পারের উপমা দিতে গিয়ে ঠাকুর চার পাঁচ বছরের বাচ্চাদের কথা বলছেন, কোন কিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারে না, শুচি অশুচির পারে তারা, এই বন্ধুত্ব করল একটু পরেই ঝগড়া করে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, পরক্ষণেই আবার বন্ধুত্ব, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গেল, আগের জায়গার সব কিছু ছেড়ে দিল। ত্রিগুণাতীত বলতে আমরা পরমহংসদের মত মনে করি, কিন্তু ত্রিগুণাতীত ঠিক ঠিক বলতে বাচ্চাদের মত। যে কোন সন্ন্যাসীর যদি দেখা যায় তাঁর খুব মার্জিত আভিজাত্য পূর্ণ ব্যবহার, বুঝতে হবে তাঁর কিছু গোলমাল আছে, polished behavior মানেই প্রচণ্ড গোলমাল আছে। সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহারও শিশু সুলভ, বাচ্চাদের কোন artificiality থাকে না। যে কথাগুলো বলতে বারণ করা হবে, সেই কথাগুলোই বার বার বলবে, যে আচরণ করতে নিষেধ করা হবে সেই আচরণগুলোই করবে, সে তার নিজের মত চলে, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ তাকে বাঁধে না। যিনি এই পথে চলে যান তিনি অনেকটা ঐ রকম হয়ে যান।

বিবিক্তস্থানম্ মানে যতটা পারবে কথা কম বলবে, যদি কথা বলতেই হয় তাহলে নিজের ভাবের বা এই পথের পথিক যারা, তাদের সাথে কথা বলবে তাও ভগবৎ প্রসঙ্গ নিয়ে। যাদের মধ্যে জাগতিক ভাব আছে, সে নিজের বাড়ির লোকই হোক আর বাইরের লোকই হোক, তাদের সাথে একেবারেই মাখামাখি করতে নেই। ঠাকুর বলছেন বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়, এদেরও দূর থেকেই প্রণাম করে নিতে হয়। *যোগক্ষেম* আমাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়, কিন্তু যতটুকু না হলেই নয় ততটুকুর জন্যই যোগক্ষেম করা যেতে পারে। সংসারে থাকতে গেলে পাঁচটা জিনিস এমনিই এসে জুটবে, নিজেও পাঁচটা জিনিস জুটিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের পথে আছেন তাঁদের সাবধান হয়ে যেতে হয়, আমি আমার জন্য এতটুকু জিনিস ছাড়া অন্য আর কিছু রাখব না, আমার দুটো ধুতি দুটো জামাতে হয়ে যায়, তিনটি কখনই রাখব না, কেউ যদি দিয়েও দেয় সেটা কাউকে দান করে দিতে হবে। জিনিস মানেই তার যত্ন করতে হবে, যত্ন করা মানেই সময় খরচ, সময় আমার মনের একটা অংশকে খাবেই।

কোন মুল্যবোধকে যখন বিচার করা হয় তখন একটাই ঘটনা সব সময় মনে রাখতে হয়, মহাবীর হনুমান সীতার খোঁজে গভীর রাতে রাবণের স্ত্রীরা যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেই রানীমহলে ঢুকেছেন। বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী রাবণের কত বিবাহিতা রানী ছিল কেউ জানে না। সব রানীরা রাত্রিবেলা ঐভাবে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের বসন ভূষণ সব শিথিল হয়ে আছে। তার মধ্যে হনুমান অনুসন্ধান করছেন এখানে সীতা আছেন কিনা। কিছুক্ষণ পরে হনুমানের হুঁশ হয়েছে, ছিঃ আমি একি করছি, আমি ব্রহ্মচারী, রানীদের অন্দরমহলে এসে সীতাকে খোঁজার জন্য মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করছি তাও আবার এদের কারুরই বসন ঠিক নেই। হনুমানের মনে দুশ্চিন্তা হল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কিন্তু আমার মনে তো কোন বিকারের ভাব আসেনি, তাহলে দোষের কিছু হয়নি। হনুমান খুব দামী কথা বলছেন। একটা জিনিস আমার কাছে আছে সেটা কোন বড় কথা নয়, সেই জিনিসটা আমার মনে কোন ক্ষোভ উৎপন্ন করছে কিনা সেটারই দাম। ক্ষোভের মধ্যে part of my mindও যুক্ত। কোন মেয়ে পঞ্চাশটা, পাঁচশটা, হাজারটা শাড়ি রাখতে পারে, কিন্তু দেখার হল ঐ শাড়ি তার মনের মধ্যে বোঝা হয় কিনা। বোঝা হবেই, আজ হোক কাল হোক শাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাকে করতে হবে। তার মানে তার মনে ক্ষোভ এসে গেল, হনুমানের test of clarity থাকল না। এখানে যে কটি বিষয় বলছেন, পরেও যেগুলো বলবেন সব জায়গায় সিদ্ধান্ত একটাই। সংসারে থাকতে গেলে কিছু জিনিস লাগবেই, তা নাহলে কোথা থেকে খাওয়া পাব!

উত্তরকাশীতে তপস্যা করতে গেলে সাধুদের ভিক্ষা করে খেতে হয়। ভিক্ষার জায়গাগুলো আবার নির্দিষ্ট করা আছে। সব রুটিনের মধ্যে বাঁধা, সকাল আটটায় গেলেন, শিবমন্দিরে প্রণাম করলেন, সেখান থেকে তিনটে জায়গায় গেলেন, চারটে করে রুটি আর ডাল দিয়ে দিল, ওটা খেয়ে বাঁচতে পারবেন না, রাস্তা থেকে

একটু সজ্জী কিনলেন। সবটাই রুটিনের মধ্যে, সেখানে কোন ক্ষোভ সৃষ্টি করে না। বদলে তাঁকে কোন কাজ করতে হচ্ছে না। মঠ সন্ন্যাসীদের বসিয়ে খাওয়া-দাওয়া দিচ্ছে, তার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে মঠের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে সন্ন্যাসীদের কোন কাজ করতে হয় না, ভিক্ষা থেকে খাওয়া সংগ্রহ করতেই তাঁদের ঐ সময়টা চলে যায়। স্বামীজী সেইজন্য সঙ্ঘ করলেন, যে সময়টা তোমার এদিকে নষ্ট হয়, সেই সময়টা সমাজকে দিয়ে দাও, সমাজ তোমাকে বসিয়ে খাইয়ে দেবে। কিন্তু দেখতে হবে মনে যেন ক্ষোভণ, কোন রকম চাঞ্চল্য না হয়। *সঙ্গাংস্ত্যজতি, মহনুভবং সেবতে, নির্মমো ভবতি, বিবিক্তস্থানং সেবতে, লোকবন্ধমুন্মূলয়তি, যোগক্ষেমং ত্যজতি*, যা যা বলছেন সব কিছুর পেছনে একটাই বক্তব্য মনে যেন চাঞ্চল্য না আসে। তোমার মনকে হরণ করছে, তোমার সত্তাকে হরণ করছে, এটা যেন না হয়, এটাই মূল বক্তব্য। যদি তোমার সত্তা হরণ হয় তাহলে তুমি মায়ার পারে যেতে পারবে না। এটাকেই পরের সূত্রে টেনে নিয়ে বলছেন –

যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি,
ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি।।৪৮।।

ধর্ম পথে যদি কেউ এগোতে থাকে তার ব্যক্তিত্বও বিরাট হতে থাকে। গীতায় ভগবান বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু, অভিষঙ্গ* মানে ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। অভিষঙ্গ আর আসক্তি, আমি ও আমার এই দুটো এমন জড়িয়ে থাকে যে, যেখানেই যাবে পুরো জিনিসটাকে নিয়েই চলতে হবে। সেখান থেকে এবার আমাকে একা হয়ে যেতে হবে, একা হয়ে যাওয়া মানে ফালতু জিনিসগুলিকে আগে কমানো, সেখান থেকে আসে আমি যেটাকে আমি মনে করি সেটাকে কমানো। করে করে শেষে নিজের দেহের প্রতি আসক্তিটাও কম করা, আর সেখান থেকে মনের প্রতি আসক্তিটাও কম করা, পরে সেই মনকেও পেরিয়ে যায়। কিন্তু এর কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। একটা বড় গাছ কাটার আগে তার যত বড় বড় ডালপালা আছে সেগুলোকে কেটে ফেলতে হয়। সেইজন্য প্রথমে *কর্মফলং ত্যজতি*, শুরু হয় কর্মফল ত্যাগ দিয়ে। যদি মায়ার পারে যেতে চাও, জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যদি যেতে হয় তাহলে শুরু করতে হবে এখান থেকে, কর্মফল ত্যাগ দিয়ে। সব শোনার পর আমি যদি বলি, খুব সুন্দর কথা, আমিও তো ঈশ্বরের দিকে যেতে চাই, আমি সব ত্যাগ করে দেব, নিজের শরীরের প্রতি কোন বন্ধন রাখব না, মনের প্রতি কোন বন্ধন রাখব না। কোন সন্ন্যাসী বা সাধুকে গিয়ে এই কথা আমি যদি বলি, সবাই বলবে তোমার মাথাটা গেছে, তুমি একজন বিশেষজ্ঞের পরমার্শ নাও আর ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করে শরীরটাকে সুস্থ কর। ঠাকুর বলছেন প্রথমেই কি উড়ন্ত পাখিকে তীরবিদ্ধ করা যায়, প্রথমে কলাগাছ বিঁধতে শিখতে হয়। এখানেও বলছেন, প্রথমে *কর্মফলং ত্যজতি*। যদি কেউ ঈশ্বরের পথে এগোতে চায়, প্রথমে কর্মফল ত্যাগ দিয়েই তাকে শুরু করতে হবে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যাবে, যে কর্মফল ত্যাগ করতে পারেনি সেই কিছুতেই এগোতে পারবে না। তুমি এসে বলছ আমি কর্মফল ত্যাগ করেছি। খুব ভালো কথা, কাল ছেলের যদি কিছু হয়ে যায় তারপর তুমি দেখ তো তোমার কি অবস্থা হয়! আর ঠাকুরকে কিভাবে গালাগাল দাও! কর্মফল মানে তোমার সন্তান হয়েছে, তুমি নিজের তরফ থেকে সব রকম চেষ্টা করেছ, চেষ্টা করে বলছ ঠাকুর তোমার সন্তান। ছেলের যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে ঠাকুরেরই তো হয়েছে, তোমার কিসের সমস্যা। কর্মটা তুমি ঠিক ভাবে করেছ। কর্ম যদি ঠিক ভাবে না করে থাক, তখন বলতে পার কত বড় অন্যায় করেছি, আমি দায়ীত্বটা ঠিক মত পালন করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, দোষ করে ফেলেছ, এবার তুমি সেটার ঘাটতি মেটাও। যখনই কেউ ভাববে আমি আধ্যাত্মিক হব কিনা, তাকে প্রথমেই ভাবতে হবে, আচ্ছা আমার ছেলের যদি কিছু হয়ে যায়, সে যদি মরেও যাও তাহলে কি আমি এই ভেবে শান্ত থাকতে পারব, ঠাকুরের সম্পত্তি ঠাকুর নিয়ে গেছেন? পারবে না। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কি পারেন? এক মিনিটের জন্য তাঁদেরও দুঃখ হবে, তার কারণ সে এতদিন তাঁর সাথে ছিল, তার সাথে কথা বলতেন, তার সাথে আহার বিহার করতেন। কিন্তু ওখানেই শেষ, তারপর আর শোক হয় না। যাদের ঠিক ঠিক এই ভাব, আমার কাছে যা কিছু আছে সব ঠাকুরই দিয়েছেন।

একজন মহারাজ খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন 'আমি জানি যে আমার কাছে আসছে তাকে ঠাকুরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন'। যিনি সন্ন্যাসী তাঁর জ্ঞান বিবেক আছে, আত্মার যে শক্তি বাইরে কাজ করছে আর সন্ন্যাসীর ভেতরে যে আত্মার শক্তি দুটো এক কিনা, তাই তাকে টেনে নিয়ে আসছে। যেমন যে বাচ্চার বাবা-

মায়ের দুটো পয়সা আছে তাদের স্বপ্ন থাকে যে আমার সন্তানকে একটা নামী দামী স্কুলে পড়াব, কারণ ঐ স্কুলের একটা বিশেষত্ব আছে যা বাচ্চার বাবা-মাকে আকর্ষিত করছে। ঠিক তেমনি চৈতন্য চৈতন্যের জন্য চৈতন্যের দিকে পাঠায়, কারণ মানুষের মধ্যে চৈতন্যের বোধ স্বাভাবিক, মানুষ মাত্রই সচ্চিদানন্দেরই অংশ কিনা। মানুষ মাত্রই সব সময় চৈতন্যের দিকেই এগোতে চায়, কোন মানুষই জড়ের দিকে এগোতে চায় না। তার ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, সে মনে করতে পারে টিভি সিরিয়াল দেখে আমার চৈতন্য হবে, অতটা অবশ্য ভাবে না, কিন্তু মনে করে। যদিও ধারণাটা ভুল কিন্তু যে কোন বিনোদন মানেই বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও চৈতন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করছে। সবাই ভালো স্কুলে, ভালো কলেজে ভর্তি হতে চাইছে, আমরা বলতে পারি ভালো কলেজ বলে সবাই সেই কলেজে ভর্তি হতে চাইছে। ঠিকই বলছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে তাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, যাঁরা ঐ কলেজ বা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা অনেক বছর সাধনা করেছেন বলে ওখানে চৈতন্য সত্তার প্রকাশ অনেক বেশি হয়ে গেছে। ফলে আশেপাশে যে চৈতন্য চাপা রয়েছে তারা ওর কাছে যেতে চাইছে যাতে তার চৈতন্যের বাধাটা খুলে গিয়ে সেই চৈতন্যের সাথে এক হয়ে যেতে পারে। এই জিনিসটা সব ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এই ভাবেই কাজ করে। যেখানেই শিক্ষার ব্যাপারটা থাকে, একজনের ভেতরকার যে আবৃত্ত চৈতন্য, সেই চৈতন্যকে ঠেলে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে যে জায়গাতে চৈতন্যের প্রকাশ বেশি। যেমন দীপ জ্বালাবার জন্য আমরা যে জায়গাতে দীপ জ্বলছে সেই জায়গায় দীপকে নিয়ে যাই। চৈতন্যের জন্যই এই খেলাগুলো হয়, যেটাকে আমরা বলছি ঈশ্বর করছেন। একজন সন্ন্যাসীর কাছে যখনই কেউ আসছে, সে যেই হোক সাধারণ হোক আর অসাধারণই হোক, এই আসার মধ্যেও কোথাও না কোথাও এই চৈতন্যের খেলা আছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখলেই মনে হয় এনার মধ্যে চৈতন্য যেন জেগে আছে, সেইজন্য মানুষ তাঁর কাছে নিজের দুটো কথা বলতে আসে, তার দুঃখ কষ্ট ঈশ্বর কিভাবে হরণ করবেন জানতে আসে। সেইজন্য তিনি বলছেন, যে কেউই, বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী যে কেউই যখন সন্ন্যাসীর কাছে আসছে, বুঝতে হবে ঈশ্বর তাকে পাঠাচ্ছেন বলেই আমার কাছে আসছে, ঐ জায়গাতে নিজের ভাব লাগাতে যাওয়াটা একেবারেই ঠিক হবে না। এ আমার লোক, এ আমার বিশেষ লোক, এর কাছ থেকে এটা নেব এই ভাব যেন কখনই না আসে। কর্মফল ত্যাগ মানে এটাই। আসলে আমরা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করি না, তাই ধরে রাখতে পারি না ঠিকই, কিন্তু এটাই বাস্তব। আমার যা কিছু আছে, তার সবটাই আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তার যে প্রকাশ, তাঁর জন্যই এই জিনিসগুলো এসেছে। কিছুটা তাঁর ফলস্বরূপ, কিছুটা তাঁর প্রয়োজনস্বরূপ। আমার কিছু কিছু জিনিসের প্রয়োজন আছে, সেগুলো চৈতন্যই ব্যবস্থা করে দেন, আর আমি যা কিছু করেছি তার ফলস্বরূপ অনেক কিছু এসে যায়। প্রয়োজনস্বরূপ যে জিনিসগুলো আসছে এগুলোকেই বলে যোগক্ষেম। আর আমি যা কিছু করেছি, আমার যে চৈতন্য সত্তার প্রকাশ, সেটাকেই বলে কর্মফল। দুটো শব্দ বলছেন, কর্মফল আর যোগক্ষেম। এটা একমাত্র হয় যেখানে চৈতন্য সত্তার প্রকাশ।

চৈতন্য সত্তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান, জ্ঞানরূপেও প্রকাশ পান, ক্ষমতা রূপেও প্রকাশ পান আবার আসুরিক শক্তি রূপেও প্রকাশ পান। যখন চৈতন্যের প্রকাশ পেতে শুরু হয়ে যায়, দৈবীশক্তি রূপেই হোক বা আসুরিক শক্তি রূপেই হোক তখন তার যোগক্ষেম রূপে কিছু জিনিস আসে আর কর্মফল রূপে কিছু জিনিস আসে। কিন্তু দুটোই আসে ঈশ্বর থেকে, যোগক্ষেমও ঈশ্বর থেকে আসে আর কর্মফলও ঈশ্বর থেকে আসে। গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, যাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে আমাতে সমর্পিত তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন আমি নিজে বহন করে আনি। তখন প্রশ্ন করা হচ্ছে, যাঁরা আপনার প্রতি সমর্পিত তাঁদের জন্য আপনি না হয় বয়ে নিয়ে আসছেন, যারা আপনার প্রতি সমর্পিত নয় তাদেরটা কে নিয়ে আসেন? তখন ভাষ্যকার বলছেন, যাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় চেতনার বিকাশ নেই তাদেরও ভগবানই দেন। কিভাবে দেন? তাকে দিয়ে কর্ম করিয়ে কর্মফল রূপে দেন। আমেরিকা, ইউরোপে বড় বড় বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, নেতা, বিজনেসম্যনরা কত কাজ করছে, তাদের কত টাকা, কত ঐশ্বর্য। কিন্তু ভক্ত হল রাজার ব্যাটা। ঠাকুর বলছেন যে রাজার ব্যাটা মাসে মাসে তার মাসোয়ারা এসে যায়। রাজার ব্যাটা কোন কাজ করবে না, কিন্তু তার যেটা দরকার সেটা ঠিক এসে যাবে। কারণ মালিক একমাত্র হলেন ভগবান, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই মালিক। আমরা একবার অন্তত তাঁর নামে ছেড়ে দেখি না, কিন্তু ছাড়তে পারব না। যদি না ছাড়তে পারি তখন তিনি আমাকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নিয়ে ফল দেবেন। তার মানে একটাতে চৈতন্য রূপে প্রকাশ, আরেকটাতে চৈতন্যের শক্তি রূপে প্রকাশ। যিনি যত বড়

ক্ষমতাবান সেখানে চৈতন্যের শক্তি রূপে প্রকাশ হচ্ছে। সাধুর মধ্যে চৈতন্য সরাসরি প্রকাশ পায়। এইটুকুই তফাৎ, শক্তি রূপে যেখানে প্রকাশ সেখানে তিনি কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর দেন, আরেকটাতে চৈতন্যর সরাসরি প্রকাশ। দুটোতে তিনিই দেন, একটাতে সরাসরি দিচ্ছেন আরেকটাতে তিনি কাজ করিয়ে দেন। দেওয়ার সময় এই দুটো জিনিস থাকছে, একটা যোগক্ষেম, যোগক্ষেম মানে ঐ অবস্থাতে অবস্থিত থাকার জন্য কিছু জিনিস তার দরকার, আর কিছু জিনিস আসে কর্মফল রূপে। মেয়েকে যখন বিয়ে দেওয়া হয় তখনও ঠিক তাই হয়, বিয়ে করছে মানে নতুন সংসার, যোগক্ষেম রূপে তাকে বলা হয় তোমার একটা নতুন সংসার হচ্ছে তোমাকে নতুন হাড়ি, কড়াই, বিছানা সব দেওয়া হল। বিয়েতেই আবার কিছু জিনিস আসছে কর্মফল রূপে। বিয়েতে দুটোই আসে, যোগক্ষেম রূপে আর কর্মফল রূপে। অনেকে এসে বলছে, এদের দুজনের বিয়ে হয়েছে, বরকনেকে আশীর্বাদ রূপে এই উপহারটা দাও। বিয়ে কর্মটা যে হয়েছে তার ফল রূপে অনেক উপহার দেয়। আর তুমি বিয়ে করেছ তোমার এই এই জিনিস সংসারে লাগবে, তাই দিয়ে দেওয়া হল, এটা হল যোগক্ষেম। চেষ্টা সে কোনটাই করছে না, শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সত্তা রূপে একটা যে কর্ম করল তার স্বরূপ তারা এই জিনিসগুলো পাচ্ছে। সমস্যা হল দুটোর কোনটাই আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ভক্তিসূত্রে বলছেন, তুমি যদি ভক্তির দিকে যেতে চাও তাহলে তোমাকে যোগক্ষেমটাও ত্যাগ করতে হবে আর কর্মফলটাও ত্যাগ করতে হবে। তবে শুরুটা করতে হয় কর্মফল ত্যাগ দিয়ে। গৃহস্থদের পক্ষে কর্মফল ত্যাগ খুব কঠিন, কিন্তু সন্ন্যাসীরা বলে দেন আমার আর কিছু লাগবে না। কিন্তু বলছেন আরও পেছনে যাও, এর আগে আমরা *শরীরধারণাবধি* নিয়ে বললাম, শরীর যতটুকুতে চলে যাচ্ছে ততটুকুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখ, তার বেশি এগিও না।

স্ত্রী যে স্বামীকে পাচ্ছে, ঠাকুরই দিয়েছেন, স্বামী যে স্ত্রী পেয়েছে তাও ঠাকুরই দিয়েছেন, তাদের যে সন্তান ঠাকুরই দিয়েছেন, তাদের যে নাতিপোতা হবে তাও ঠাকুরই দেবেন। এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই আলোচনা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়, যারা সাধনা করে একটু উন্নত হয়েছে তাদের জন্য। সবাই সংসারে আছে, সংসারে থাকতে গেলে সবাইকে কর্ম করতেই হবে, সেইজন্য প্রথমে কর্মফল ত্যাগ। দ্বিতীয় বলছেন *কর্মাণি সংন্যস্যতি*, কর্মের ফল ত্যাগ করে করে কর্মের স্পৃহাটাও চলে যায়। প্রথম হয় কর্মফল ত্যাগ, দ্বিতীয় সকাম কর্ম ত্যাগ, তৃতীয় হয় নিত্যকর্ম ত্যাগ আর চতুর্থ পূর্ণ কর্ম ত্যাগ, পূর্ণ কর্ম ত্যাগ মানে নৈষ্কর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। কর্মের দিক দিয়ে যদি সাধনাকে দেখা হয় তাহলে সাধনা এই চারটে স্তরে চলে। যারা অলস, ফাঁকিবাজ তারা সব কিছু ছেড়ে সরাসরি নৈষ্কর্মে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, কোন কাজকর্ম করতে চায় না। পুরো দেশ নৈষ্কর্মে চলে গেছে, সরকার আছে, এই এই স্কিম ছাড়বে, ভরতুকি দেবে, যাতে বসে বসে ঘরে টাকা চলে আসে। এখন না হয় অনেক সম্পদ তৈরী হয়ে গেছে, আগেকার দিনে এটাকেই আধ্যাত্মিকতা বলে চালিয়ে দেওয়া হত।

কর্মফলং ত্যজতি আর *কর্মাণি সংন্যস্যতি*, ভক্তির পথে যেতে হলে এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ। *কর্মাণি সংন্যস্যতি*, একটা বয়সের পর সন্ন্যাসীকেও সব কর্ম থেকে সরে এসে নৈষ্কর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সন্ন্যাসী চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যদি পা এগিয়ে এগিয়ে কাজ করতে যায়, বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে, গুড়ের নাগরি কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। তার আগে ঠিক আছে, রজোগুণের খেলা আছে, নিজেকে তৈরী করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু একটা অবস্থার পর নিজেকে আস্তে আস্তে সব কিছু থেকে গুটিয়ে আনতে হয়। সকাম কর্ম তখন করবে না, নিষ্কাম ভাবে যতটুকু করার করে দিলেন, তারপরে আর না। সংসারী প্রথমেই কর্মফল ত্যাগ করতে পারবে না, সেইজন্য তাদের আগে মেকানিক্যাল ভাবে দিনে অন্তত দুবার ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, হে ঠাকুর! এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু কর্ম করলাম তার সব ফল তোমার চরণে সমর্পণ করলাম। প্রথমে মুখে বলতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে ঐ ভাবটা নিয়ে আসতে হয়, আমি যেটাই করছি ঠাকুরের জন্য করছি। সাধনা রূপে বলা হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক এটাই হয়।

বাইবেলে যীশু এক জায়গায় বলছেন, কোন চাষী হয়ত নিজের মেষদের দেখাশোনার জন্য একজন মজুর রেখেছে। কোন নেকড়ে যখন মেষ পালের উপর আক্রমণ করে তখন মজুরটা পালিয়ে যায়। কিন্তু চাষীর নিজের ছেলে সে রুখে দাঁড়ায়, বাপের সম্পত্তিকে একটুও সে নষ্ট হতে দেবে না। যীশু বলছেন, I am good shepherd। ঠাকুরেরও অনেক ধরণের সম্পত্তি আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, সেন্টারগুলো

আছে, সেখানে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পত্তি আছে, আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে। যিনি নিজেকে ঠাকুরের ঠিক ঠিক ভক্ত মনে করেন তাঁর কাজ হল ঠাকুরের এই সম্পত্তি রক্ষা করা। ঠাকুরের সম্পত্তি রক্ষা করা মানে হয়, তাঁর যে স্থূল সম্পত্তি, তাঁর যে বৌদ্ধিক দিকের সম্পত্তি, তাঁর যে আধ্যাত্মিক দিকের সম্পদ, এগুলোকে রক্ষা করে বড় করা। তখন তিনি হলেন good shepherd, তাঁর বাবার সম্পত্তি রক্ষা করা। আগে আমাকে ঠিক করতে হবে আমার বাবা কে? যেমনি আমার বাবা বলতে যাব আমার নিজের বাবার কথাই মনে পড়বে। কিন্তু যেমনি মনে করব ঠাকুর আমার বাবা, তাহলে ঠাকুরের সম্পত্তি বাপের সম্পত্তি এটাকে আমায় রক্ষা করতে হবে। ঠাকুরের সম্পত্তি কি? ঠাকুরের সম্পত্তি তিনটে জিনিস। অবতারবাদের উপর বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন, অবতারের একটাই কাজ, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করেন। ঠাকুরের সম্পদ হল এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যা রক্ষা করাই একমাত্র ঠাকুরের সম্পত্তি রক্ষা করা, ঠাকুরের অন্য আর কোন সম্পত্তি নেই। ব্রহ্মবিদ্যা, জীবনমুক্তির যে বিদ্যা, যে বিদ্যা একমাত্র কাছে হিন্দুদের আছে, বিশ্বের অন্য কারুর কাছে নেই। স্বামীজীও এই কথা বার বার বলছেন আর ঠাকুরও বলছেন, ঋষিদের সনাতন ধর্মই থাকবে। আর হিন্দুরা মূলতঃ থাকে ভারতবর্ষে। তাহলে আমার বাবার সম্পত্তি যদি রক্ষা করতে হয় তখন তিনটে জিনিস এসে যায় – ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষা, হিন্দু ধর্মের রক্ষা আর ভারতবর্ষের রক্ষা। স্বামীজী চতুর্থ আরেকটা যোগ করলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে বললেন, মৃত্যুর আগে আমি এমন একটা মেশিন তৈরী করে যেতে চাই যেটাকে অন্তত ভারতবর্ষে কেউ দাবাতে পারবে না, যেটা এই আদর্শের উপর চলবে। তার মানে ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করা আর এই বিদ্যাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ীত্বটা তিনি দিয়ে গিলেন রামকৃষ্ণ মিশনকে। যাঁরা নিজেকে ঠিক ঠিক ঠাকুরের ভক্ত বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে ঠাকুরের সম্পত্তি, ঠিক ঠিক তাঁদের বাবার সম্পত্তি এই চারটেতে গিয়ে দাঁড়ায় – ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দুধর্ম, ভারতবর্ষ আর রামকৃষ্ণ মিশন, পঞ্চম বলে আর কিছু নেই। আমাদের জীবন, প্রাণ, আবেগ আমাদের যাবতীয় যা কিছু আছে তার সব কার্য এই চারটের মধ্যেই ঘুরপাক করবে। এবার নিজেকে ভেবে দেখতে হবে, আমি যে কাজ করছি এতে কি ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষাতে সাহায্য করবে? করবে, যদি তিনি জ্ঞানী হয়ে থাকেন, ঠিক ঠিক ভক্ত যদি হয়ে থাকেন তাহলে হবে। আমি যখন আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা অনুভূতি পাঁচজনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি, তখন ব্রহ্মবিদ্যারই প্রচার প্রসার করা হচ্ছে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। যখন আমি ভারতবর্ষ, হিন্দুধর্মের উপর কাজ করছি, কারণ হিন্দুদের রক্ষা করতে হবে, হিন্দুদের কাছেই ব্রহ্মবিদ্যা আছে। অন্যান্য ধর্মে ব্রহ্মবিদ্যা নেই, জিনিসটা যেটা রয়েছে সেটা অন্য, ওটাকে রক্ষা করার জন্য ওদের লোক আছে। কিন্তু এই যে ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দুদের যেটা মূল ধর্ম, এর রক্ষা করার জন্যই অবতার আসেন। আচার্য শঙ্কর, যিনি এত ঘোর বেদান্তী, তিনিও এই কথা বলছেন। আধ্যাত্মিক ভাবগুলি যখন বৌদ্ধিক ভাবে হিন্দু ধর্ম ও ভারতবর্ষের ব্যাপারে আসে তখন ওটা হল বৌদ্ধিক সম্পদ। আর রামকৃষ্ণ মিশন নিজেই যেন একটা কায়িক সম্পদ। রামকৃষ্ণ মিশনে এসে তিনটে জিনিসই এসে যায়, কায়িক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক, কিন্তু কোথাও আমি নেই। আমি এই জন্যই নেই, এটা আমার বাবার সম্পত্তি, বাবা আমাকে দায়ীত্ব দিয়েছেন তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। ভগবান যীশু প্যালেস্তাইনে থাকতেন, ওখানকার মানুষদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন, চাষবাশ। পশুপালনে মেষ ভেড়া এদের রক্ষা করা, এদের যেন কোন সংক্রামক ব্যাধি না হয়, সম্পত্তি যেন কমে না যায়, এটাই আমার দায়ীত্ব, এছাড়া আর কোন দায়ীত্ব নেই।

যদিও নিন্দা করে বলা হয় কিন্তু জিনিসটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বলা হয় মাত্র দুটি ধর্ম হল land-centric একটা হল জহুদি ধর্ম আরেকটা হিন্দু ধর্ম। জহুদিরা বলে ইজ্রায়েল হল ভগবানের promised land, ভগবান জহুদিদের বলেছিলেন আমি তোমাদের promised landএর মালিক বানাব। আর হিন্দুরা বলে ভগবান ভারতবর্ষকে নিজে সৃষ্টি করেছেন। স্বামীজীর মত মানুষ, যিনি এত বেদান্ত প্রচার করেছেন, এত কিছু করেছেন কিন্তু কোন দিন ভারতবর্ষকে তিনি ছাড়তে পারলেন না। স্বামীজী বলছেন, যে আত্মা মুক্তির দিকে এগোচ্ছে তাকে ভারতবর্ষে জন্মাতেই হবে। এই কথাতেই হিন্দু ধর্ম খুব জোরালো ভাবে land-centric হয়ে যায়। আর আমরা আজ দেখছিও, যদিও দুর্ভাগ্যের কথা, সারা বিশ্বেই আজ হিন্দুরা ছড়িয়ে আছে কিন্তু হিন্দু ধর্মে যে অবদান আসছে, যেখান থেকে হিন্দু ধর্মে শক্তির যোগানটা আসছে, সেটা কিন্তু বিদেশ থেকে আসছে না। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, আমরা জানি গত দুশ আড়াইশ বছর ধরে ওখানে হিন্দুরা আছে, কিন্তু এমন কোন

মহাত্মা আসেননি যিনি হিন্দু ধর্মকে শক্ত করবেন। হিন্দু ধর্মকে শক্ত করার জন্য ভারতবর্ষ থেকেই যায়। সেইজন্য হিন্দু আর হিন্দুস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই হল ঠিক ঠিক *কর্মফলং ত্যজতি*। *কর্মাণি সংন্যস্যতি* মানে সব কর্মের ত্যাগ হয়ে যায়। যীশুর জীবনে মার্থা আর মেরীর কাহিনী আছে, যেখানে মার্থা কাজ করে যাচ্ছে আর মেরী চুপচাপ বসে যীশুর কথা শুনে যাচ্ছে। একটা অবস্থা আসে যখন ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কিছু প্রসঙ্গ ভালো লাগবে না। কিন্তু তখনও সে একই জিনিস করছে। যখন শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই আছে তখনও কিন্তু সে তার বাবার সম্পত্তিই রক্ষা করছে। কিন্তু এবার শুধু ব্রহ্মবিদ্যা, যেটার জন্য ভগবান নিজে নেমে এসেছেন, এবার যোগানটা সে সরাসরি সেটাতে দিচ্ছে। মার্থা এসে যীশুর কাছে অনুযোগ করছে, মেরীকে বলুন কাজে একটু হাত লাগাতে। যীশু বলছেন, মেরী যা করছে ওটাই ও ঠিক করছে। কারণ মেরী এখন ঈশ্বরের প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসার দিকে পুরোপুরি চলে গেছে। মেরীর তাই আর কাজ করার কোন দরকার নেই। এখন আমি যে পুরো প্রাণ লাগিয়ে দিচ্ছি আমার বাবার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য এতে যে আমি ঠাকুরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছি তা নয়। যীশু যে বলছেন I am a good shepherd, তিনি এটা বলছেন না যে বাবা আমাকে সেইজন্য আদর করবেন, এই দেবেন, সেই দেবেন। এটা আমার দায়ীত্ব, আমার বাপের সম্পত্তি রক্ষা করা আমার কাজ। তখন আর কর্মফল থাকে না, আমাকে এটা করতে হবে, আমাকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে।

কর্মফলং ত্যজতি আর *কর্মাণি সংন্যস্যতি* এই দুটো যখন করে তখন কি হয়? বলছেন *ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি*। *নির্দ্বন্দ্বো* মানে, সমস্ত রকম দ্বন্দ্বের বাইর। দ্বন্দ্বের বাইরে বলতে আমরা গীতাতে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এগুলো জানি কিন্তু আসলে এর অর্থটা হয় emotional extreme। ভালো কিছু হয়ে গেল আনন্দে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে যাই, খারাপ কিছু হয়ে গেলে একেবারে বিমর্ষ হয়ে পড়ে গেল, এটাকে বলা হয় emotional extreme। এবার আমরা যদি good shepherdএর কথা ভাবি, সে যখন বাবার সম্পত্তির দেখাশোনা করছে, ওর কখনই কোন extreme হবে না। Extreme সেখানেই হয় যেখানে নিজের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, ভালো হলে খুশীতে উপরে উঠে গেল, খারাপ হলে দুঃখে একবারে নীচে পড়ে গেল। নিজের স্বার্থ যেখানে জড়িয়ে থাকে না, সেখানে কখনই এই জিনিস হবে না। আমরা পর পর *বিবিক্তস্থান*, *লোকবন্ধমুন্মূলয়তি*, *নিস্ত্রৈগুণ্যো* হওয়া, যোগক্ষেম ত্যাগ করা, কর্মফল ত্যাগ করা, কর্ম ত্যাগ করা এই যে বিরাট লম্বা বর্ণনা করলাম, এর মূল হল *নির্দ্বন্দ্বো*। কারণ মনের আবেগ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। যার জন্য আবেগের প্রাবল্যে সাধনার জিনিসগুলোকে কখনই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। একটা কোন খাওয়া নিয়ে, একটা কোথাও বেড়াতে যাওয়া নিয়ে, অমুকের সাথে গল্প করা নিয়ে এই থার্ড গ্রেড জিনিসের উপরে আমাদের ইমোশান গুলো নষ্ট করা যায় না। ইমোশান রাখা থাকে একমাত্র ঈশ্বরের জন্য, অন্য কোন কিছুর উপর আমাদের ইমোশান গুলোকে দেওয়া যায় না।

যো বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।।৪৯।।

এবার বলছেন, বেদে যে বিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, বেদের যেটা ধর্ম, সেটাকেও ত্যাগ করে। বেদের ধর্মকেও ত্যাগ করে দিলে কি থাকে? *কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং*, ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগই শুধু থাকে। *বেদানপি সংন্যস্যতি*, বেদের ধর্ম ত্যাগ মানে বেদের কর্মকেও ত্যাগ করা, এর গুরুত্ব আজকের দিনে আমরা বুঝতে পারব না, কারণ আমরা আজকাল ধর্মকর্ম কিছুই করি না। বেদের কর্ম ত্যাগ করাটা আমাদের কাছে এমন বিরাট কিছু মনে হবে না। আজকের দিনে কজন আর বেদের ব্যাপারে কিছু জানে! তাহলে কি *যো বেদানপি সংন্যস্যতি*, এর উপর আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ এর প্রাসঙ্গিকিতাটাই তো হারিয়ে গেছে? কিন্তু না, এর পুরো প্রাসঙ্গিকতা আছে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলে আগে শূদ্রত্ব ত্যাগ কর, শূদ্রত্ব ত্যাগ করা মানে সব রকম ভোগ বিলাস ত্যাগ করা। তারপরে বলছেন, সব কিছুতে যে হিসেব করা, কতটা ছাড়লে কতটা পাবো, এই হিসাব করাটা ছাড়, তার মানে বৈশ্যত্ব ত্যাগ করা। আধ্যাত্মিক জীবনে এরপর আসে ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ কর, অর্থাৎ কর্ম প্রবণতা ত্যাগ করা। আর ব্রাহ্মণত্ব কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না, অসম্ভব। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্যই ভগবান আসেন। ব্রাহ্মণত্ব যদি ত্যাগ না করে তার ঈশ্বর দর্শন কোন দিন হবে না, সাত্ত্বিক হয়েই শেষ হয়ে যাবে। বেদ ত্যাগ করা মানেই হয়

ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করা। বেদ ত্যাগ করা মানে, যে শাস্ত্রকে আধার করে আমার জীবন চলছে সেটাকে ত্যাগ করা। শাস্ত্রকে যদি ধরে রাখা হয় তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, অনুভূতি হবে, সবই হবে, কিন্তু একটা জিনিস হবে না, ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ হবে না, প্রেমের পরাকাষ্ঠা হবে না।

অদ্বৈত সাধনার সময় মা কালী বার বার ঠাকুরের সামনে চলে আসছেন। তোতাপুরী ঠাকুরকে বলছেন, এখানে ধ্যান কর। এরপর মা কালী যখন আবার আসছেন তখন তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছেন। এই দৃশ্য পুরোপুরি বেদের সাথে মেলে না, কিন্তু জিনিসটা ওটাই। ঠাকুরের যাবতীয় যা কিছু সবটাই সাকার সাধনাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওই জায়গায় তাঁকে শেষ জিনিসটাকেও ছাড়তে হচ্ছে। অথচ তার আগে ঠাকুর বাহ্যিক আচার সব ত্যাগ করে দিয়েছেন, পৈতে, বস্ত্র ত্যাগ করে সব গাছে ঝুলিয়ে গাছের তলায় ধ্যান করছেন। হৃদয়রাম ঠাকুরকে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখছেন মামা পৈতে কাপড় সব ছেড়ে ধ্যান করছেন। হৃদয়রাম বলছেন 'মামা তুমি একি করছ'? 'না, এসব কিছু ত্যাগ করতে হয়'। 'তাই বলে কাপড়টা কেন ছাড়লে'? 'না, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব ছাড়তে হয়'। 'তাহলে পৈতেটা কেন ছাড়লে'? 'না, জাতি, কুল, শীল এগুলোও ত্যাগ করতে হয়'। ঠাকুর সব কিছু আক্ষরিক ভাবে করছেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা বেদ মানি না ঠিকই। আজ থেকে দু তিন হাজার বছর আগে বেদে যে আচরণগুলো নিয়মিত পালন করতে বলা হত, যেগুলো লোকেরা পালনও করতেন, তার কোনটাই আমরা এখন করি না। কিন্তু বেদ না মানলেও আমরা অন্য অনেক কিছুকে মানছি। অনেক কিছুকে মানলেও বাস্তবে আমরা কোন জিনিসকেই মানি না। কারণ আমাদের জীবনটা লোকাচারের উপর চলছে। লোকাচার যারা মানে তারা আদপে কোন জিনিসকেই মানে না। লোকাচার মানেই ধর্ম জীবন নয়। ধর্ম জীবন চলা মানেই একটা শাস্ত্রকে অবলম্বন করে চলা। ধর্ম বা অধ্যাত্ম কখনই লোকাচারের উপর চলে না। ওনারা এটা মেনেই চলেন যাঁরা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তন করেন, তাঁরা অনেক গভীরে গিয়ে চিন্তন করেন আর কোথাও তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তাঁকে ব্রাহ্মণত্বটাও ছাড়তে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের যাঁরা সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনে যে নিয়ম, আচার পালিত হয় বা আরও যা কিছু আছে সেটাই তাঁদের কাছে বেদ, সন্ন্যাসীকে শেষে সেটাও ছাড়তে হয়। সেইজন্য আগেকার মহারাজরা বলতেন, রামকৃষ্ণই সত্য রামকৃষ্ণ মিশন সত্য নয়।

দ্বিতীয় আরেকটা যেটা হয় তা হল, এর আগে কর্মফল ত্যাগ নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের কথা বলা হয়েছিল। মোটামুটি পাঁচ ধরণের কর্ম হয়, নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, কাম্য কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্ম। যে কাজ রোজ করতে হয়, জপধ্যান, তপস্যা এগুলো নিত্যকর্ম, রোজ করতে হবে। নৈমিত্তিক, একটা বিশেষ দিনে যে ধর্ম কাজ করতে হয়, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি। অনেক রকম অশুভ কাজ করেছে সেই কাজগুলোকে ঠিক করার জন্য কিছু কাজ করতে হয়, এই কাজকে বলছেন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। কাম্য কর্ম হল কোন কিছু পাওয়ার জন্য যখন যজ্ঞাদি করা হয় আর শাস্ত্র যে কাজ করতে নিষেধ করে সেগুলোকে বলে নিষিদ্ধ কর্ম। প্রথমেই বলে দেন, শূদ্র মানেই হয় তার কাছে নিষিদ্ধ বলে কিছু থাকে না। আগে তুমি নিষিদ্ধ কর্ম করা বন্ধ কর, ওখান থেকে এবার সে ধীরে ধীরে এগোতে থাকবে। সাধন জীবনে যে সাধক বড় হবেন কিছু জিনিসকে অবলম্বন করেই বড় হবেন। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের কারুরই শুরু হয়নি। ঠাকুরের কাছে আসাটা আমাদের জন্য হল জীবন যেন সুখী হয়, জীবনটা যেন মসৃন ভাবে চলে যেতে পারে, ঝামেলা যেন না আসে। আধ্যাত্মিক জীবনে যে চলছে সে আর এসব কিছু দেখে না, কিসে সুবিধা হবে, কিসে অসুবিধা হবে, ওদিকে সে তাকাতে যাবে না। ওগুলো করতে গেলে তাকে একটা অবলম্বন নিতে হয়। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে ঐ অবলম্বনটাও ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বকে ধরে রাখা মানে তাঁকে বেদকে অবলম্বন করে চলতে হবে, বেদকে অবলম্বন করা মানেই সে এখনও কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঘুরপাক করছে। আচার্য শঙ্কর গীতা উপনিষদের ভাষ্যে কত ভাবে কর্মকাণ্ডীদের তুলোধুনো করছেন, ভাষ্য না পড়লে বোঝা যাবে না। মনকে কোন পরিস্থিতিতে কোন দিকে যেতে দেওয়া যাবে না। যাকে স্নেহ করছে তার দিকেও যাওয়া যাবে না, যার প্রতি বিরক্তির ভাব আছে তার দিকেও যাবে না, এমন কি যে জিনিসটা তার ধর্ম সঞ্চালন করছে তার প্রতিও মন যাবে না। সেইজন্য কর্মফল ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ আর বেদ ত্যাগ।

কর্মফল ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ ত্যাগ করাতে সে নির্দ্বন্দ্বো হয়ে যায়। যখন বেদের কর্মও চলে গেল তখন শুধু মাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাটাই থাকে, *কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং*। তখন যত রকমের কর্ম, নিত্য, নৈমিত্তিক,

কাম্য সবটাই খসে পড়ে যায়। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা এই পাঁচটা কর্মের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতেন। যাঁরা খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ তাঁরা বাকি সব কর্ম ছেড়ে দেবেন কিন্তু নিত্যকর্মটা ছাড়তে পারবেন না। যে শাস্ত্রগুলি ঘোর অদ্বৈতী, যেমন অষ্টাবক্রসংহিতা, তাতে বলছেন, যদি তোমার কর্তব্য বোধ থাকে তাহলে কোন দিনই তোমার জ্ঞান হবে না। এমনকি আমাকে এত জপ করতে হবে এই বোধও যদি থাকে তাহলেও জানবে তোমার এখনও দেরী আছে। কোন কিছুর প্রতি তার বোধ থাকবে না, আমাকে খেতে হবে, বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে এসেছে, স্ত্রীর প্রতিও কোন দায়ীত্বের বোধ নেই, নিজের শরীর বোধটুকুও নেই, এর কথাই বলছেন। তখন কি থাকছে? *কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং*, ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ। যাঁরা জ্ঞানপথের পথিক তাঁদের তখন শুধু ব্রহ্ম চিন্তন। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁরা শুধু ঈশ্বরের চিন্তন নিয়েই থাকবেন। ঠাকুর যেদিন মা কালীর দর্শন পেলেন, তারপর থেকে তিনি মা কালী ছাড়া আর কিছু জানেন না, এটাই অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ। এটাকেই অন্য দিক থেকে বলে, ইষ্টের প্রতি বা কোন একটা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা এসে গেলে নিজে থেকেই সব কিছু উড়ে যায়। তখন *অন্যোহন্যায়াশ্রয়ঃ* হয়ে যায়, যেমন যেমন এই জিনিসগুলোকে ছাড়বে তেমন তেমন তার মন ঐদিকে যদি না যায়, ঈশ্বরে যদি ঠিক ঠিক ভক্তি না হয় তাহলে কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। অন্য দিকে কি হয়, ঈশ্বরের প্রতি যদি ভালোবাসা এসে যায় আর তারপরেও যদি তাকে দিয়ে কিছু করান হয়, সে করতে পারবে না, ওগুলো নিজে থেকেই উড়ে যায়। ভালোবাসার এই গভীরতা একমাত্র রাসলীলাতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ওখানেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়। জীবনে কাউকে আমরা সত্যিকারের ভালোবাসতে পারিনি, আমাদের মত অতি সাধারণ জীবের পক্ষে এগুলো ধারণা করা অসম্ভব। কচিৎ কদাচিৎ কখন মেয়ে বা ছেলেকে পাওয়া যাবে সব ছেড়ে কাউকে ভালোবাসছে। ভেতরে গভীর ভালোবাসা না থাকলে রাসলীলা, *কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং* ধারণা করা কখনই সম্ভব না। এই অবিচ্ছিন্ন অনুরাগকে বোঝার জন্য কিছু অনুভব থাকা দরকার। সমস্যা হল আমাদের কোন কিছুর অভিজ্ঞতাও নেই।

ধর্ম জীবনের জন্য মোটামুটি তিনটে মূল অভিজ্ঞতা লাগে, প্রথম হল পূজা উপাচারাদি কর্ম যেন করা থাকে, খুব গভীর ভাবে করা থাকা চাই, এমন গভীর যে মনে হবে একদিন পূজাদি না করতে পারলে আমি মরে যাব। দিনের পর দিন করে যাচ্ছে। আমাদের জীবনে কি এভাবে কোন পূজা উপাচারাদি করা আছে, একটা কোন কি উপাচার আছে যেটাকে আমরা ধরে আছি? দ্বিতীয় হয় ত্যাগ, নিয়মিত ত্যাগের ভাব থাকতে হবে, যেমন আমি পাঁচজন কাঙালীকে যতক্ষণ সম্মান সহকারে না খাওয়াচ্ছি ততক্ষণ আমি খাবো না। আচ্ছা রোজ না হয় হবে না, বছরে অন্তত একদিন কি দুদিন করতে পারি। আমাকে ঠিক করে নিতে হবে, এই কটি জামা, প্যান্ট বা শাড়ি আমার জন্য থাকবে, এর বেশি এলে আমি দান করে দেব। আর তৃতীয় হল ভালোবাসা। মায়েরা বলবেন, আমি তো সন্তানকে ভালোবেসেছি। ঠিকই, একটু তো সেখানে অবশ্যই আসবে। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার কথা ঠাকুরও বলছেন, কিন্তু সন্তানের প্রতি ভালোবাসাটাও বৈধি ভালোবাসা। অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের কথা যেটা বলছেন এই অনুরাগ পরকীয়া ভালোবাসা না থাকলে বোঝা যাবে না। পরকীয়া প্রেম মানে illicit love, বেআইনী ভালোবাসা, যে ভালোবাসা ধর্মের বাইরে, এই ভালোবাসার অনুভব বা অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন দিন বোঝা যাবে না অবিচ্ছিন্ন অনুরাগে কি বলতে চাইছেন। সন্তানের কিছু হয়ে গেলে মায়ের মন পাগলের মত হয়ে যায় কোন সন্দেহ নেই, এটাও ধারণা করতে সাহায্য করবে, কিন্তু যেখানে পরকীয়া প্রেম, একজন মান, মর্যাদার বাইরে গিয়ে ভালোবাসছে, সেখানে যদি কোন গোলমাল ঘটে তখন যে আগুনটা লাগে তাকে আর সামলানো যাবে না। ঠাকুর বলছেন, একজন উপপতি করেছিল, সে যদি তাকে না দেখে তখন রাস্থায় তার কলার ধরে বলবে, তবে রে! তোর জন্য আমি সব ছাড়লাম, তুই দেখবি না মানে!

নারদ ভক্তিসূত্রে প্রথমের দিকে বলছেন *সা তু পরমপ্রেমরূপাঃ* বা আরও কয়েকটা জায়গায় বলছেন যথা *ব্রজগোপীকানাম্*, নাহলে কি হত, *জারানামিব*। তা নয়, এই প্রেম অন্য ধরণের প্রেম, *ন তু কাময়েমানা*, কোন কাম নেই সেখানে। পরকীয়া প্রেমে নিজের মর্যাদার বাইরে গিয়ে ভালোবাসছে। ঠাকুর ওখানে বলছেন, দেখবে তোমার সোনার চেন, ঘড়ি সব উপপতিকে দিয়ে আসবে। বদলে সেই মেয়েটি কি কিছু চাইছে? একেবারেই না। বিধি উপাচার, ত্যাগ আর ভালোবাসা এই তিনটের অনুভব যদি না থাকে, এইসব সূত্রের গভীর মর্মার্থ কোন দিন বুঝতে পারা যাবে না। এই তিনটের অনুভব যদি না হয়ে থাকে তাহলে যত জপধ্যান,

তপস্যা, কাজকর্ম সবই ভস্মে ঘি ঢালার মত হয়ে যাবে। এগুলো করে যে ঈশ্বর লাভ হয়ে যাবে তা না, কিন্তু শাস্ত্র কি বলতে চাইছে একটু একটু বুঝতে শুরু করবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ ঠাকুরের মহাসমাধির পর হিমালয়ে চলে যান। ওনার কাছে সব সময় ঠাকুরের একটা ছবি থাকত। একবার তিব্বতের ফুংলিংএ ওখানকার এক বৌদ্ধদের আশ্রমে গেছেন। সেখানে একজন লামা ঠাকুরের ছবিটা দেখলেন, দেখে বলছেন, এই ছবিটা আমাকে দিয়ে দিন। কেন বলছেন? এই যে চোখ, মুখের উপর এই যে হাসি এই জিনিস কখন মানুষের হতে পারে না। সে জানেও না কে ঠাকুর। হাসি দেখে বলছেন, এই হাসি মানুষের হতে পারে না, ইনিই ভগবান বুদ্ধ। কোথায় কোন তিব্বতী সন্ন্যাসীদের আশ্রমে একজন লামা ঠাকুরকে ভগবান বুদ্ধ রূপে দেখছেন। কাউকে যদি দেখে মনে হয় সত্যিই সে কাউকে ভালোবেসে থাকতে পারে কিন্তু কোথাও অধিকার বোধ থাকবে না। বলা হয় যে, গোপীদেরও শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিকার বোধ ছিল, রাধারও নাকি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা বিস্তার হয়ে যায় যে, আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। যদি এই জোয়ার আসে তখন আর কোন বিধি নিষেধ তাঁর থাকে না। একজন শেখ পথের ধারে নমাজ পড়ছিল, একজন প্রেমিকা দৌড়ে তার প্রেমিকের কাছে যাচ্ছে। অন্ধকারে যেতে গিয়ে শেখের গায়ে পা লেগে গেছে। শেখ তো রেগে আগুন, তুমি একটা নষ্টা মেয়ে, আমার গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছ কোন হুঁশ নেই। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বলছে, দোহাই শেখজী আমায় ক্ষমা করে দিন। শেখ তাতে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। মেয়েটি চলে যাওয়ার সময় বলছে, শেখজী কিছু মনে করবেন না, জাগতিক প্রেমে বিহ্বল হয়ে আমি আমার প্রেমিককে দেখতে যাচ্ছি, তাতেই আমার জগৎ ভুল হয়ে যাচ্ছে আর আল্লার প্রেমে পড়েও আপনার পুরো জগৎ বোধ আছে! সত্যিকারের এই রকমই হয়, জগৎ ভুল এই বোধ কখন কখন এসেছে দেখতে হয়। সন্তানকে নিয়ে মায়েদের জগৎ ভুল হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য। তাতেও পরে দেখা যায় সন্তানের উপর একটা খবরদারির ভাব এসে যায়। যে জায়গাতে প্রেম জিনিসটা আসে, পরকীয়া প্রেম জিনিসটা যেখানে আসছে, বলছেন খাঁচার পাখি মুক্ত হয়ে গেল, খোলা আকাশ পেয়ে গেল। আগেকার দিনে স্ত্রীরা স্বামীকে ভালোবাসত। সারাদিন রান্নাঘরে কাজ করছে, শাশুড়ির সেবা করছে। আর আগেকার দিনে রাতেও স্বামী দেখা পাওয়া যেত না, কারণ পুরুষরা সব দালানে গিয়ে ঘুমতো, পুরুষরা আলাদা স্ত্রীরা আলাদা থাকত। কিছুক্ষণ হয়ত স্বামীর সাথে থাকত। ঐ অতটুকুর জন্য সে সারাদিন ধরে সব অত্যাচার সহ্য করে যেত। আর এখন সারাদিন স্বামী স্ত্রী এক অপরের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে। সব কিছুই আছে শুধু প্রেমটা নেই। ভালোবাসায় যে গভীরতা আসে এই গভীরতা মানুষকে মুক্ত করে দেয়। এই অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ যখন হয়ে যায় তখন কি হয়? বলছেন –

স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি।।৫০।।

তখন সে মায়াকে অতিক্রম করে যায়। *কন্তরতি কন্তরতি মায়াম্* থেকে শুরু হয়ে এবার *স তরতি স তরতি*তে এনে ফেলছেন। যখন অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ এসে যায়, অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ হওয়া মানে মুক্ত আকাশ, একটা পাখি পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল, তাকে পিঞ্জর থেকে খুলে একটা ঘরে রেখে দিয়েছে, সেখান থেকে বার করে একটা বিল্ডিংএর মধ্যে রেখে দিয়েছে, সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে দেখছে তার সামনে উন্মুক্ত আকাশ। যাঁরা এই প্রেম আস্বাদ করে নেন তাঁদের আর কোন বন্ধন থাকে না। শুধু নিজের বন্ধনই যে থাকছে না তা নয়, অপরকেও তাঁরা পারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা পেয়ে যান। অনেক রকম ভাবে হয়, তাঁদের জীবন দেখে যেমন আমরা ঠাকুরের জীবন দেখে প্রেরণা পাচ্ছি। আসলে যেটা হয়, আমরা কৃপা শব্দটা বলি ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও যেটা বেশি হয়, তা হল, আমরা ভাবি তিনি তো এক সময় আমাদের মতই ছিলেন, তিনি যদি ত্যাগ করতে পারেন, তাঁর যদি এমন প্রেম হতে পারে তাহলে আমার কেন হবে না। ওখান থেকে একটা প্রেরণা আসে, যে প্রেরণা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। পরম্পরাতে কিছু প্রচলিত কথা এসে গেছে সেগুলোকে আমরা ঠাকুরের উপর চালিয়ে দিচ্ছি। জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছে সেটাকে আমরা গিরিশ ঘোষ আর কালিপদ ঘোষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। চৈতন্যচরিতামৃতে যদি আরও তিনজনের নাম থাকত, আমরাও পাঁচটা নাম বার করে এনে বলতাম, ঠাকুর এদের সবাইকে উদ্ধার করেছেন। আর সেটা আনবে কোথা থেকে? রাবণ আর কুম্ভকর্ণের উদ্ধার বা পুরাণে জয় বিজয়ের কথা আছে, সেই উদ্ধার এসে গেল জগাই মাধাই উদ্ধারে, জগাই মাধাই উদ্ধার থেকে ঠাকুরের সময়ে এসে গেল গিরিশ ঘোষ আর কালিপদ ঘোষ। এভাবে হয় না,

এগুলো সব বালসুলভ কথা। নরেন, রাখাল এনারা ঠাকুরকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, আমাকেও হতে হবে। যাঁরাই ঠাকুরকে আসছেন এমনকি নরেনকেও পঞ্চবটীতে, বেলতলায় গিয়ে ধ্যান করতে বলছেন। নিজের সন্তানদের ঠাকুর কিছু করছেন না, সেখানে আমাকে আপনাকে করবেন কি করে আশা করতে পারি। তাঁরা ঐ আদর্শের ছাঁচে নিজেকে ফেলে দেন। নিজের তো সত্ত্ব, রজো, তমো পার হয়ে গেছে, এবার তিনি অপরকেও এই পদ্ধতিতে পার করে দেন। সেটাই এখানে বলছেন *স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি*। এরপর দুটো সূত্রে বলছেন –

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।।৫১।।

অনির্বচনীয়, ভাষায় যার বর্ণনা করা যায় না। ঐ প্রেমের অবস্থাকে, প্রেমের ঐ স্বরূপকে কখনই ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। কেন বলা যায় না? কারণ এর মধ্যে কোন ধরণের objectivity নেই, objectivity মানে, যে কোন বস্তুকে জানার জন্য মনের দরকার। কিন্তু প্রথমে বস্তু থেকে যে উত্তেজনা গুলো আসছে, তা যেভাবেই এসে থাকুক, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় সেই উত্তেজনাকে ধরে মনের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়, মন তখন ওটাকে গ্রহণ করে বিচার করতে থাকে। কোন কিছুকে জানতে হলে সবার আগে ইন্দ্রিয় দিয়েই জানতে হয়, তাই আগে দেখতে হবে জানার বস্তুকে যেন ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায়, অর্থাৎ বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। আগেকার দিনে এগুলো ভালো করে বোঝা যেত না, এখন ভালো বোঝা যায়। ইলেক্ট্রিসিটি জিনিসটা কি? বিজ্ঞানীরা এর ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। পরিভাষা একটা দিয়ে দেন ঠিকই কিন্তু ঠিক ভাবে পরিভাষিত করতে পারেন না। কোয়ান্টাম ফিজিক্সেও কোয়ার্ক আদির মত যে মূল ভৌতিক উপাদানের কথা বলা হয়, তাদের পরিভাষিত করতে পারেন না। কারণ আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় এগুলোকে ধরতে পারে না। ইন্দ্রিয় ধরতে পারছে না বলে এগুলোকে আর ব্যাখ্যাও করতে পারেন না। তাহলে জানছেন কি করে? তার কার্য দিয়ে জানা যায়। এর আগে আমরা যে ব্ল্যাকহোলের কথা বলছিলাম, ব্ল্যাকহোলকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, কারণ সেখানে না আছে কোন শব্দ, না সেটাকে দেখতে পাওয়া যায়, কিছুই নেই। তাহলে জানছেন কি করে? কার্য দিয়ে জানছেন। ব্ল্যাকহোলের কাছে যে প্ল্যানেট গুলো আছে, যে অবজেক্ট গুলো আছে তারা এমন ভাবে আচরণ করে মনে হবে ওর পাশে যেন কিছু একটা আছে। ঠিক তেমনি, ভক্তি, ঈশ্বর, আত্মা এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, আমাদের ঋষিরা কত সুন্দর যুক্তি দিয়ে জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। আমরা জগতের ততটুকু জিনিসকেই জানতে পারি, যেটাকে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় ধরতে পারে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় যেটা ধরতে পারে না, আমাদের কাছে সেই জিনিসটা নেই। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলি, আমি এই জগতকে যেমন দেখছি আপনিও তেমন দেখছেন, এই গ্লাশকে আমিও গ্লাশ দেখছি আপনিও গ্লাশ দেখছেন। যদি একটা ক্লাশে ব্ল্যাকবোর্ডে ১/২ লেখা হয়, ক্লাশের সবাই দেখবে কালো বোর্ডের উপর সাদা ১/২ লেখা। অনেক লোক আছে যারা একভাবে দেখবে না। নামকরা বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান, যিনি ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তিনি কক্ষণ এই রকম দেখতেন না। তিনি উপরটাকে এক রঙের দেখেন, নীচেরটা আরেক রঙের দেখেন, ডিনোমিটারটা সব সময় আলাদা রঙের দেখতেন, সংখ্যাগুলোকে একভাবে দেখতেন, অক্ষর গুলোকে আরেক ভাবে দেখতেন। চিরদিনই দেখে এসেছেন, যদিও তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন শুনলেন অন্যরা এইভাবে দেখছে না। ঠিক তেমনি যারা রঙের কাজ করে তারাও জিনিস গুলোকে অন্য ভাবে দেখে। এই রকম যে শুধু ফাইনম্যানেরই ছিল তা না, অনেক বিজ্ঞানীরও ছিল। তার মানে, তাদের মস্তিষ্ক যখন কোন জিনিসকে নিচ্ছে তখন অন্য ভাবে নিচ্ছে। আবার আছে, আমরা infra red দেখতে পাই না, infra red মানে আলো দুভাবে আসে ultra violet and infra red, এর মাঝখানে যতটুকু ততটুকুই আমরা দেখতে পারি। যেমন রেডিওর ওয়েভ, ফোনের ওয়েভ গুলো চলছে, এই ওয়েভ গুলোকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ওয়েভ গুলো আছে। কিছু দিন আগে একটা খুব সুন্দর লেখা বেরিয়েছিল, যদি মাইক্রোয়েভ আমরা দেখতে পারতাম তাহলে জগতকে কি রকম দেখতাম? ওয়েভকে না হয় ছেড়ে দেওয়া হল, আমরা চোখ দিয়ে যে আলো দেখছি, অল্প যদি spectrumকে extend করে দেওয়া হত, তাহলে বেড়ালের মত আমরাও রাত্রে দেখতে পারতাম। কিন্তু আরও মজার জিনিস হত, মানুষ যখন প্রচুর পরিশ্রম করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে তখন তার শরীর থেকে তাপ নির্গত হয়, আমরা ঐ তাপ দেখতে পাই না। যদি infra red একটু আমরা দেখতে পারতাম, হঠাৎ দেখতাম পরিশ্রান্ত মানুষটিকে মোটা দেখাচ্ছে, infra red শরীরকে ধরে

নেয়। সৈন্য বাহিনীতে সেনারা যে নাইট ভিশন চশমা পড়ে তাতে infra red দেখার ক্ষমতা বেড়ে যায়। যে কোন বস্তু থেকে যে তাপ নির্গত হয়, ঐ তাপ দেখে ওরা ধরতে পারে বস্তুটা কি। স্বামী অফিস থেকে বাড়ি এসেছে স্ত্রী দেখে ভাবত আমার স্বামী এত মোটা হয়ে গেল কি করে, ফ্যানের তলায় একটু বসার পর দেখছে আবার রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু কোন মানুষই এভাবে দেখতে পায় না, কারণ আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এভাবে নিতে পারে না। আমাদের কাছে জগৎ ততটুকুই যতটুকু পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিতে পারছে। ঋষির বললেন জগতটা তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, কিন্তু তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী নয়। জগত যেমন আছে তেমনই আছে, কিন্তু ঐ তন্মাত্রাটাই ধরতে পারি, সেইজন্য বলছেন ওর বাইরে কি আছে তোমাকে ভাবতে হবে না। জগৎ যেভাবেই তৈরী হয়ে থাকুক, ইলেক্ট্রনই থাকুক, কোয়ার্কই থাকুক, তুমি তো ওটা দেখতে পাচ্ছ না, তুমি তো ওকে আস্বাদ করতে পারছ না, ওকে শুনতে পাচ্ছ না, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি নিতে পারছ না, তাই তোমাকে এগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে না। উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান হয় তাহলে এগুলোর কোন দরকার নেই। যেটাই ঈশ্বরীয়, যেটাই দিব্য সেটাই অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় যে মুখে বলা যায় না বলে বলছেন তা নয়, কারণ মন ওটাকে নিরুপণ করতে পারে না। মন কেন নিরুপণ করতে পারে না? কারণ ইন্দ্রিয় মনের কাছে খবর পাঠাতে পারছে না। ইন্দ্রিয় কেন পাঠাতে পারে না? কারণ ইন্দ্রিয় যেভাবে গঠিত হয়েছে তাতে ইন্দ্রিয় সব সময় সীমিত। যেমন চোখের spectrum বাঁধা, কান যেটা শোনে তার spectrum বাঁধা, আমাদের সব ইন্দ্রিয়ই বাঁধা। কিন্তু কুকুর আমাদের থেকে আরও সূক্ষ্ম আওয়াজ গুলো শুনতে পায়। আমাদের যদি একটু অন্য ধরণের অনুভূতি নেওয়ার ক্ষমতা থাকত তাহলে জগতটাই তখন আমাদের কাছে অন্য রকম হয়ে যেত। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, আত্মাকে বোধে বোধ করা হয়, অর্থাৎ আত্মা দিয়েই আত্মার বোধ হয়, সেইজন্য বলছেন অনির্বচনীয়। কি রকম অনির্বচনীয়? বলছেন জানেন না যে তা নয়, যিনি জানেন তিনি জানেন কিন্তু objectivity তাঁর মধ্যে নেই। বাচ্চা ছেলে মাকে বলছে, মা আমার খিদে পেলে আমাকে তুলে দিও। মা বলছে, বাবা, তোমার খিদেই তোমাকে তুলে দেবে। তুমি জানবে, তার মানে objectivity কিছু নেই, পুরোটাই subjectivity।

এবার কেউ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে পারে, আপনি বলছেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষমতা নেই বলে জানতে পারছি না, যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে জানতাম পারতাম তো? যেমন ইলেক্ট্রিকের কথা বলছেন, ইলেক্ট্রোনের কথা বলছেন, যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে কি এটাও ঐ ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনের মত, এই ধরণের কি কিছু? বলছেন, না, শুধু প্রেমস্বরূপা, ওর স্বরূপ শুধু প্রেম, সেইজন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে কক্ষণ জানা যাবে না। প্রেম জিনিসটা মানুষ বোধ করে। কিন্তু এখানে বলছেন *অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্*, এই প্রেম জাগতিক প্রেমও নয়। *অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপম্* মানে এই নয় যে, জিনিসটা নেই বা এই ধরণের কিছু। যিনি ভক্ত এবং যিনি সিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছেন তাঁরা জানেন ভক্তি জিনিসটা কি, প্রেম জিনিসটা কি। এই জায়গাতে এসে সমস্যা হয়। তাঁরাও যখন বলেন আমাদের মত যাদের স্থূল মন, ক্ষুদ্র মন, বুঝতে পারে না, আমরা এগুলোকে নিয়ে হাসাহাসি করি, ব্যঙ্গ করি। সাধারণ লোকের কাছে গেলে তারা এগুলোকে খেলো করে দেয়, কারণ তাদের কাছে ঈশ্বরীয় প্রেমের কোন ধারণাই নেই। তখন যাঁরা এগুলোকে একটু বুঝেছেন, ধারণা করতে পারছেন তাঁরা এসব লোকেদের কথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ এখানে যে প্রেমের কথা বলছেন, এবং এখান থেকে পর পর যে আলোচনা করবেন সেখানেও কিন্তু পরমপ্রেমকে নিয়ে বলছেন না, পরমপ্রেমের থেকে আরেকটু নীচের কথা বলছেন। এর আগে যেখানে *সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপাঃ* বলেছিলেন সেখানে পরা ভক্তির কথা বলেছিলেন, এখানে পরা ভক্তির কথা বলছেন না, অপরা ভক্তির কথাই বলছেন। কিন্তু অপরা ভক্তি হলেও খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। প্রেমা ভক্তিতে পৌঁছাবার ঠিক আগে যেটা হয় সেই অপরা ভক্তি বা গৌণা ভক্তির কথা বলছেন। ঐ অবস্থাতেও প্রেমের যে স্বরূপ, সেটাকেও শব্দে দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। জৈন ধর্মে একটা দর্শন আছে হিন্দীতে বলে সায়দবাদ, এনারা কোন জিনিসকে যখন ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করতে যান তখন ওনারা সায়দ্ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, জিনিসটা আছে, জিনিসটা হয়ত নেই, হয়ত আছে, হয়ত নেই, এই রকম ওদের সাতখানা শর্ত আছে। একটা জিনিসকে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের অনেক ধরণের সীমা এসে যায়, আমরা সচরাচর জীবন চালাতে গিয়ে এত কিছু ভাবি না যে, জগৎ চালানোর জন্য, জীবন চালানোর জন্য এত রকম শর্ত লাগে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি শর্ত লাগে। এই যে দৃশ্যমান জগৎ, এর একটা স্থূল ভাব আছে,

যে স্থূলকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে ধরে নিতে পারি, সেইজন্য ওকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি, সেখানে আমরা শব্দের উপমা ব্যবহার করি, গুণ, জাতি, ক্রিয়া এগুলোকে বিচার করে আমরা ওটাকে বেঁধে সামনে রেখে দিই।

আধ্যাত্মিক জগতে এভাবে কখনই কোন কিছু হয় না। শুধু তাই না, যে কোন মৌলিক জিনিস খুব সহজ হয় আর যে কোন মৌলিক জিনিসকে দিয়ে আরও যে যৌগিক জিনিস হয় সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন এক আর এক দুই, এই সহজ সত্যকে ধরে আমরা পুরো গণিত শাস্ত্রকে দাঁড় করাচ্ছি। জীবন মানেই যৌগিক, ঈশ্বর মানেই সহজ। যেখানে যে কোন ধরণের জটিলতা দেখা যাবে, বুঝতে হবে এখানে জীবনের খেলা রয়েছে। সহজের সাহায্যে যৌগিকের ব্যাখ্যা করা হয়। যৌগিক দিয়ে সহজের ব্যাখ্যা কক্ষণ হবে না। জগতটা যৌগিক আর ঈশ্বর সহজ, তাই ঈশ্বরের ব্যাখ্যা কি করে করবে! সেইজন্য *অনির্বচনীয়ম্*, আর *প্রেমস্বরূপম্* এর কথা আগেও এসেছে, পরেও আসবে, ঐ প্রেমকে যে বোঝা যায় না, তার কারণ এমন ভালোবাসা যে ওটাকে টেনে রাখে, অন্য কোন দিকে তাকে যেতে দেয় না। আসলে মানুষ ভালোবাসা নিয়েই থাকে, নিজেকে নিয়েই থাকতে চায় অন্য কাউকে নিয়ে থাকে না। এটাকেই বলে space, space মানে আমার চারিদিকের যে সীমা, space মানে ওই সীমাটাই আমার আপনার সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব, space মানে ওটা আমি, আমার আমিত্বটা যত দূর পর্যন্ত প্রকাশ পাচ্ছে ততটুকু আমি। যার space যত বড় সে তত নিজেকে স্বাধীন মনে করে, নিজের spaceএ স্বাধীন বোধ করে আর যত স্বাধীন হয় তত তার space হয়। Space আর freedom দুটো একই জিনিস কিন্তু দুটো আলাদা ভাব নিয়ে আসে। আমিত্বের উপর যদি কেউ খোঁচা দেয় মানুষ তা নিতে পারে না, কারণ ওটাই তার আমিত্ব, মানুষ ভালোবাসে নিজের আমিত্বকে।

ভগবান গীতায় বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী আমার আত্মা, সেইজন্য সে আমার সব থেকে প্রিয়। চীনে একটি লোককে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে তিরিশ বছর বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের রদবদল হওয়ার পর তাকে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছে। জেলের ঐ ছোট্ট খুপড়ি থেকে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে আবার ঐ খুপড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। আমরা শুনে প্রথমে ভাবতাম, কেন সে আবার ঢুকে গেল, তিরিশ বছর এক ভাবে থেকে থেকে তার মনটাও ঐ ভাবে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জিনিসটা তা নয়, সন্ন্যাসী হয়ে যারা প্রথম ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই সময় তার বাড়ির লোকেরা কত কায়দা করে ধরে বেঁধে আবার নিজের ডেরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু সুযোগ পেলে আবার পালিয়ে যায়। তার তো মন সন্ন্যাসের দিকেই তৈরী ছিল, মন তো সংসারে থাকার জন্য তৈরী নয়, অথচ ছোটবেলা থেকে এদেরই সাথে কাটিয়েছে। তাহলে যুক্তিতে কোথাও গোলমাল আছে। যদি মন তৈরীর ব্যাপারটা থাকত তাহলে তো কেউ কোন দিন সন্ন্যাসী হবে না। কারণ মানুষ ছোটবেলা থেকে তার মা-বাবা, ভাইবোনদের সাথে বড় হয়, মনটাও তাদের মতই তৈরী হওয়ার কথা, মন যদি তাদের মতই তৈরী হত তাহলে তো সে কোন দিন তাদের ছাড়তেই পারবে না। আসলে তা নয়, মানুষ তার আমিত্বকে খুঁজে বেড়ায়। মা-বাবার সাথে আছে বলেই আমিত্ব সেখানে থাকবে তা নয়। আমিত্ব সেই জায়গাতে সে পায় যেখানে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করছে, যেখানে তার space আছে। বন্দী জেলের ঐ কুঠুরির মধ্যে মনে করছে এই জায়গাটা আমার জায়গা, এটা আমার space, ঐ জায়গাতে সে নিজেকে মুক্ত মনে করছে। যেমনি ওকে বাইরে নিয়ে এসেছে, দেখছে ঐ জায়গাতে ওর কোন space নেই, ঐ বৃহৎ spaceকে ও নিজের মনে করতে পারছে না। ফলে ওর মনে হচ্ছে ওকে যেন কেউ চেপে ধরেছে।

একবার একজন অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি করে কোন এক সেন্টারে সাধু হতে এসেছেন। এসে দেখে শুনে গেলেন, খুব ভালো লেগেছে। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, কিছু দিন পরেই আসছি। কিছু দিন পর বোচকাবুচকি নিয়ে চলেও এলেন। তিন দিন পর বলছেন, আমি থাকতে পারছি না, আমার মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে চেপে ধরছে। সেন্টারের অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, কবে যেতে চাইছ? বললেন, এক্ষুণি যদি চলে যাই আপত্তি আছে? না, কোন আপত্তি নেই। এবার দেখুন, লোকটি কত দিন ধরে চিঠি লেখালেখি করে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছে, এসে দেখে গেল, তারপর চলে এল এই ভেবে যে তার spaceটা এখানে। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত থাকতে এল তখন যে কোন কারণেই হোক ঐ spaceটা সে নিতে পারল না। এখান থেকে চলে

যাওয়ার পর আবার সে আরেকটা জায়গায় গেছে, কারণ বাড়িতেও সে শান্তিতে থাকতে পারছে না, space নিয়ে ওর লেগে গেল ঝামেলা। এই space মানেই ভালোবাসা।

ঐ যে ঈশ্বরীয় প্রেম, ঐ প্রেমের অবস্থায় তিনি এমন ভাবে নিজেকে উন্মুক্ত দেখছেন, ঐ জিনিসটাকে তিনি অপর কাউকে বোঝাতেও পারবেন না। আমরা অনেক সময় ছেলে বা মেয়েকে বলি, ওর মধ্যে তুমি কি এমন দেখছ যে তার ঘোরে তুমি এমন ডুবে আছ। আমি আপনি কোন দিন বুঝতে পারব না, ওই একমাত্র বুঝতে পারবে। কারণ সেই জায়গাটায় গিয়ে ও নিজের space পাচ্ছে। ওর কাছে গিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত মনে করার একটাই কারণ হতে পারে, তার ভেতরে এমন কিছু ভাব আছে, যে ভাবটা ঐ জায়গাতে যাওয়ার পর খুলে যাচ্ছে। এটাকে কোন দিনই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মায়ের space যেমন সন্তানের মধ্যে, তেমনি সন্তানের space মায়ের মধ্যে। সন্তান যেমন যেমন বড় হয় তেমন তেমন সে মায়ের spaceকে ছেড়ে বন্ধুবান্ধবে গিয়ে space পেতে শুরু করে, spaceটা পাল্টাতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমের দিকে যখন যায়, তখন ঈশ্বরের যে প্রেম পায় সেই প্রেম একেবারে অন্য ধরণের। ঐ জায়গাতে গিয়ে তিনি এমন শান্তি, এমন আনন্দ পাচ্ছেন সেখানে তিনি একেবারে নিজেকে উন্মুক্ত মনে করছেন। ঐ মুক্ততে পুরোটাই আমিত্ব বোধ, মানুষ তো নিজেকেই ভালোবাসে। আমরা বলি, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখ, ঈশ্বরকে কি ভালোবাসবে! ভালো তো বাসে আসলে নিজেকে। তিনি ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বর আমার অন্তর্যামী, ঈশ্বরই আমার স্বরূপ, ঐ অর্থেই ভালোবাসেন, অন্য কোন অর্থেই ভালোবাসছেন না। *অনির্বচনীয়ম্* কেন? ঈশ্বরের এই প্রেমের স্বরূপকে শব্দ দিয়ে কখনই প্রকাশ করা যাবে না, কারণ এটা খুব সূক্ষ্ম রূপ, একেবারে মৌলিক, আর ওটাই তাঁর space। কিছু জিনিস করে কেন আমি আনন্দ পাই, এর ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বামীজী খুব সুন্দর একটা উপমা দিচ্ছেন, একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টেলিস্কোপ নিয়ে আকাশের তারা দেখছেন। একটা বাচ্চা মেয়ে জিজ্ঞেস করছে can it give me ginger bread? বাচ্চারা এই ধরণের জিনিস খুব পছন্দ করে। বিজ্ঞানী বলছেন, না, দেবে না। তাহলে এটা কোন কাজের না। আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না, একজন বিজ্ঞানী রাতের পর রাত অন্ধকারে আকাশের তারাদের পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। ঐভাবে তিনি কী আনন্দ পান! কেন পান! এটা কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না। ঈশ্বরীয় ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস হয়। আর ঈশ্বরের এই প্রেমকে জাগতিকে অর্থে যাতে না মিশিয়ে ফেলে তাই বলছেন *অনির্বচনীয়ম্* আর আনন্দ স্বরূপ।

মূকাস্বাদনবৎ।।৫২।।

মূক যদি কিছু বর্ণনা করতে যায়, যত বড় জিনিসই হোক, সে তার বর্ণনা করতে পারে না। তার দুটি কারণ, ঠাকুর বলছেন, আমি যখন ওঁ বলি তখন আমি একশ হাত নীচে নেমে এসে বলি। তার মানে যতক্ষণ ঠাকুর ঐ ভাবে আছেন, যে ভাবের কথা এখানে বর্ণনা চলছে, তখন এক রকম, কিন্তু মন বলতে যেটা বোঝায়, সেই মনের রাজ্যে যখন আসছেন, আর সেই মন যখন বাণী রূপে আসে তখন যেন অনেকটা নীচে নেমে আসছেন। এগুলোকে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। শাস্ত্রে বলছেন মন বাণীর পারে। মন বাণীর পারে বললে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, তখন প্রশ্ন আসে মন বাণীর পারে কে যাচ্ছে? যিনি যাচ্ছেন তিনি কিভাবে ঐ জিনিসটাকে অনুভব করছেন? উপনিষদে বলছেন, আসল বোধ আত্মাই করেন। জগতে যাঁরা আছেন তাঁদের সেই আত্মা মনের মাধ্যমে জগতকে নেয়। যারা এদের থেকেও স্থূল তাদের ক্ষেত্রে মনও কাজ করে না, শুধু ইন্দ্রিয় কাজ করে। পশুরা তারা সব কিছুই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে করছে। মন বলতে আমরা যেটা বুঝি, যেখানে সঙ্কল্প-বিকল্প, করব কি করব না, এটাও করছি সেটাও করছি, এই জিনিসটা পশুদের থাকে না। ওরা জানে এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না, মূলতঃ তারা ইন্দ্রিয়ের উপরেই চলে। বায়োলজিতে একটা শব্দ আছে এ্যামিগডালা, পশুদের মস্তিষ্কে একটা বড় অংশ এ্যামিগডালা অধিকার করে রেখেছে। যার জন্য পশুরা পরিষ্কার জানে, এর থেকে পালাতে হবে, এর সাথে লড়তে হবে, এটা খেতে হবে আর এ আমার পার্টনার, এই চারটে ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। ওদেরও মস্তিষ্ক থাকে কিন্তু স্পাইনাল কলম, যেটা দিয়ে অনুভূতির সমন্বয় করে সেটা ওদের ওখানেই শেষ, এরপর আর কিছু নেই। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে এটা খুব উন্নত। যার জন্য মানুষ অনেক ধরণের জটিল জিনিসকে ধরতে পারে, যাকে ভালোবাসি না তার সামনেও হেসে কথা বলতে পারি, কুকুর বেড়াল তা পারবে না। কুকুর যাকে পছন্দ করে না তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করবেই। মানুষই পারে, যাকে পছন্দ করে না তার সাথে কৃত্রিম হাসি দিয়ে কথা বলতে। সেই আত্মা যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে নেন তখন

তিনি পশুদের মধ্যে বিদ্যমান, যখন মন দিয়ে জগতকে নেন তখন তিনি মানুষ। আর শুদ্ধ আত্মা দিয়ে যখন জগতকে নিচ্ছেন তখন হয় তিনি সিদ্ধ পুরুষ, না হলে ভগবান নিজে। সেইজন্য বলছেন *তস্মিংস্তেজ্জনে ভেদাভাবৎ*, তিনি আর তাঁর ভক্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ দুজনেই সরাসরি ঐ বোধটা নেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শরীর, মনের বোধে যখন নামছেন তখন অনেকটা নীচে নামতে হচ্ছে। যারা মরে যাওয়ার পর বেঁচে ওঠে তারা বর্ণনা করে, অপারেশন থিয়েটারে মারা গেছে, শরীর থেকে সে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে ওখান থেকে নিজের শরীরকে দেখছে, শরীরের অপারেশন করা হচ্ছে। তখন সে ভাবতে থাকে এই শরীরের মধ্যে আর ঢুকব? শ্রীমাও এই ধরণের একটা ঘটনার বর্ণনা করছেন, তিনিও দেখছেন যে শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ভাবছেন এই জরাজীর্ণ শরীরটার মধ্যে কি আবার ঢুকব? যখন ঢুকছেন তখন বাকি জিনিস গুলো ভুলে যাচ্ছেন, হাল্কা একটা স্মৃতি থেকে যাচ্ছে। এখানেও ঠিক তাই হয়, যাঁরা চৈতন্যের বোধ করেন তাঁদের ঐ অবস্থার অল্প একটা আস্বাদ মাত্র থেকে যায়। এই হল একশ হাত নেমে যাওয়া, যেটা ঠাকুর বলছেন। সেই অনন্তের আনন্দের শুধু একটা বোধ থেকে যায়।

দ্বিতীয় আরেকটা হয়, এটা সব থেকে ভালো বোঝা যায় বাড়িতে বাচ্চারা কোন কিছু কথা হয়ত বড়দের বলতে গেল, একটা দুটো কথা বলার পরেই রেগেমেগে বলবে, তুমি কিছু বুঝতে পারবে না। তার কারণ, তারা যে জগতটা তৈরী করেছে, সেই জগৎ থেকে তারা মনে করছে বড়দের যে জগত সেখানে সম্পর্ক করার মত কিছু নেই। এটা শুধু বর্তমান প্রজন্মেই বলে না, প্রত্যেক প্রজন্মেই এভাবে বলে। আগেকার প্রজন্মে কি ছিল সে বুঝতে পারবে না, এখন না হয় অনেক টেকনলজি এসে গেছে। আসলে ওদের যে ইমোশান থেকে মনের যে ভাব আসছে সেখানে মনে করছে, ওর যা বুদ্ধি, ওর যা বোঝার ক্ষমতা বড়রা সেটা ধরতে পারবে না। আমরাও যখন কথা বলি প্রথমে আমাকে ধরতে হবে লোকটা কি বোঝে। যে কোন ভালো শিক্ষকের কাছে যদি বাচ্চাকে পড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, উনি আগে পরীক্ষা করে দেখেন বাচ্চাটা কতটুকু জানে। কতটুকু জানে সেখান থেকে তখন কায়দা করে, যেটা জানে সেটাকে আশ্রয় করে জিনিস গুলো ঢোকাতে শুরু করেন। যেমন যেমন ঢোকায়, একটু করে বাড়ল, এবার যেটা বাড়ল সেটাকে ধরে আরেকটু ঢোকায়। একটা গল্প আছে, দুই ভাই কিছুতেই অঙ্ক শিখবে না। একজন মাস্টার ঠিক করা হয়েছে। মাস্টার ওদের আম বাগানে নিয়ে গেছেন। গিয়ে দেখাচ্ছেন জান এটা আম? হ্যাঁ জানি। আচ্ছা তুমি একটা আম খেলে আর দাদা একটা খেল, কটা আম হল? সঙ্গে সঙ্গে দাদা বলছে, ওরে বলিস না, আমাদের অঙ্ক শেখাচ্ছে। অঙ্ক শিখবে না, আমটা বোঝে, আম দিয়ে শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চতন্ত্রে যে কাহিনী আছে সেখানেও ঠিক এই ভাবে শেখানো হচ্ছে। ঘোড়া, গাধা এগুলো বাচ্চারা বোঝে, তার মাধ্যমে গল্পগুলোকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু যখন প্রেমা ভক্তির অবস্থায় আসছেন, ঐ প্রেমা ভক্তির অবস্থাকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। এই দুটোর জন্য বলছেন *মুকাস্বাদনবৎ*।

প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে।।৫৩।।

কচিৎ কদাচিৎ কোন কোন আধারে, অর্থাৎ কোন কোন সার্থক সাধকের হৃদয়ে এই জ্ঞান আবির্ভূত হয়, আবির্ভূত হওয়া মানে পুরোদমে প্রকাশিত হয়। ৫৩ নম্বর সূত্রের ভাব খুব রহস্যময় মনে হয়। এক সাধকের সাথে আরেক সাধকের কি তফাৎ হতে পারে যে কোন কোন সাধকের হৃদয়েই প্রকাশিত হবে? এই জিনিসটা খুবই জটিল, কিছুতেই পরিষ্কার হতে চায় না। যেমন আমরা একদিকে বলি অবতার, সেখানে থেকে বলছি প্রফেট মহম্মদ, তাঁকে বলছে পয়গম্বর, তারাই বলছে অবতার নন। আমরা যদি হিন্দু দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে দেখি, ইসলামে কিন্তু পয়গম্বর মহম্মদকে সেভাবে দেখা হয় না। তার মানে কোথাও একটা তফাৎ হয়ে গেল। আর যত উচ্চ অবস্থার সন্ত মহাত্মা হোন না কেন ইসলামে তিনি মহম্মদের কাছাকাছি যেতে পারবেন না। খ্রীশ্চানিটিতে যত বড় সিদ্ধ পুরুষই হোন, তিনি যীশুর সমান হতে পারবে না। রামকৃষ্ণ পরম্পরায় যে যত বড় মহাত্মাই হোন তাঁকে আমরা ঠাকুর, স্বামীজীর সমকক্ষ কখনই মানব না। কিন্তু কেন? এটা একটা বিরাট বড় রহস্য। প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থ যে গ্রন্থের উপর তার ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে, সেই গ্রন্থ প্রথমেই বলে দেয় তুমি এটা কোন দিন হতে পারবে না। এটা কতটা যুক্তি নির্ভর বলা মুশকিল। স্বামীজী আমেরিকাতে বলছেন, there can be hundred Sri Ramkrishna অর্থাৎ তোমরাও শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পার, অন্য দিকে গুরুভাইদের চিঠিতে লিখেছেন, তোমার কি ভাবছ চাইলেই পরমহংস হয়ে যাবে! দ্বন্দ্ব হওয়ার একটা কারণ হল, আমেরিকানরা এভাবে নেবে না। তাদের কাছে যেটা আমি হতে পারি সেটাই নেব, আমি

যদি ওটা নাই হতে পারি তাহলে আমি ওটা করে কি করব! ওদের কাছে সবেতেই যুক্তিতর্ক, সবাই সমান, এই ব্যাপারগুলো থাকে। অন্য দিকে যেটা ঘটনা সেটা অন্য রকম। সাধনার পথে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া পর দেখবে যে ওটা হয় না। যখন বোঝার তখন বুঝবে তার আগে লাঠালাঠি করে কি লাভ। স্বামীজী সেইজন্য ঐ কথা বলছেন। কিন্তু এই তফাতটা কেন হয় জানা নেই। এমনকি নামকরা শাস্ত্র বেদান্তাসার, যে শাস্ত্র বেদান্তের কথাই বলছেন, আর যে বেদান্ত এই ধরণের তারতম্য করে না, তাঁরাও কিন্তু ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ, ব্রহ্মবিদ বরিয়ান এই সব বলে তফাৎ করে দিচ্ছেন, সাতখানা বিভিন্ন ধাপের কথা বলছেন। এই জিনিসটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর তো সব হয়েই গেল তাহলে তফাৎ কোথায় থাকল? তাও আমরা জানি তফাৎ আছে। শুধু তফাৎই আছে তা নয়, ওনারাও বলছেন তফাৎ থাকে।

একটা হতে পারে, যার কথা ঠাকুরও বলছেন, অবতারও শক্তি আণ্ডারে। শক্তির আণ্ডারে এসে গেলে শক্তির প্রকাশে তারতম্য থাকতে পারে। জ্ঞান হয়ে গেলেও শক্তির এলাকায় শক্তির তারতম্যটা থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের শক্তি, স্বামী তুরিয়ানন্দের শক্তি, সবার শক্তিই আলাদা আলাদা মাপের। সেইজন্য জ্ঞান এক রকম হলেও শক্তির তারতম্যের জন্য তফাৎ হয়ে যাবে। স্বামীজী লাটু মহারাজের ব্যাপারে বলছেন, ঠাকুরের আশীর্বাদে লাটুর মত নিরক্ষরও অনুভূতির সেই অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে আমরা পৌঁছেছি। একটা জায়গায় তফাৎ নেই অথচ আরেকটা জায়গায় তফাৎ থাকছে। কিন্তু এখানে যেটা বলতে চাইছেন, সেটা ঐ লেভেলেও যাচ্ছেন না, এখানে আরও নীচের থেকে বলছেন। অনেকেই ধর্ম পথে আসছে, অনেকেই ভক্তি পথে আসছে কিন্তু এই প্রেমা ভক্তি, এই জ্ঞান কাদের হয়? ভক্তিশাস্ত্রে গীতার অনেক প্রভাব আছে, গীতাতেও ভগবান বলছেন *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।* হাজার হাজার লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধনায় প্রযত্ন হয়, তাদের মধ্যেও কচিৎ কেউ আমাকে তত্ত্বত জানতে পারে। গীতার এই ভাবকেই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে, তুমি যে ভক্তি পথে এসেছ তাই বলে তুমি মনে করো না যে তোমার মধ্যে প্রেমা ভক্তির উদয় হয়ে যাবে। তাহলে কাদের হয়? বিচার করে দেখলে সব থেকে প্রথম হল যাঁদের মন একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব। পবিত্র মনের কথা যখন বলছি, তখন আসছে তাহলে আগে যে সিদ্ধদের কথা বলা হয়েছিল, তাদের কোথায় অসুবিধা থেকে যায়? আমাদের পক্ষে এটা বলা খুব মুশকিল। গীতায় যেখানে সত্ত্বগুণের ব্যাখ্যা করছেন, সেখানে দুটো জিনিসকে নিয়ে আসছেন, *জ্ঞানসঙ্গেন* আর *সুখসঙ্গেন* এই দুটো সত্ত্বগুণে চরিত্র, সুখ আর জ্ঞান দিয়ে সত্ত্বগুণ বাঁধে, জ্ঞান মানে জাগতিক জ্ঞান। জাগতিক জ্ঞানে আমিত্ব বোধ থেকেই যাবে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের জন্য যে সুখ বোধ হচ্ছে, তাতে বাঁধা হয়ে আছে। সত্ত্বগুণও অশুদ্ধ, তাই সত্ত্বগুণ থাকলেও কোথাও একটা অশুদ্ধি যেন থেকে যায়। সেইজন্য ত্রিগুণাতীত না হলে, বা সত্ত্বগুণের একটুও যদি থেকে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ভক্তি বা জ্ঞান আসবে না। রজোগুণ আর তমোগুণের কথা এখানে আসবেই না, কিন্তু সত্ত্বগুণও যদি একটু থাকে, শেষ মুহূর্তেও সত্ত্বগুণকে যদি ধরে থাকে ঈশ্বরের প্রকাশ কোথাও যেন সীমিত হয়ে যায়। ঠাকুর যে বলছেন, এই নাও তোমার জ্ঞান এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার সুখ এই নাও তোমার দুঃখ, এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম। ঠাকুরের ক্ষেত্রে যে এই বোধ, এই বোধ বাকিদের কতটা হয় বোঝা খুব মুশকিল। কারণ সবাই তো পরিষ্কার করে সব কথা বলেন না। তবে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। আমরা যে ভাবে অপবিত্র মনে করছি, যে ভাবে বন্ধন মনে করি, সেইভাবে তো হয় না। কিন্তু যেখানে সত্ত্বগুণ অর্থাৎ, সুখ, জ্ঞান আর আমিত্ব এই বোধটা থেকে যায়, এই বোধটা কোথাও ওনাদের আটকে দেয়।

প্রথম হল, প্রকাশ হবে কি হবে না এটা মনের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। *প্রকাশতে* শব্দটা যখন নিয়ে আসছেন তখন এর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হয়ে যায়, তা হল এই প্রকাশ কাল্পনিক বা মনের কোন ভুল নয়। আমরা যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন, যতই উপনিষদের কথা, অদ্বৈতের কথা, মুক্তির কথা শুনি না কেন, আমরা যদি নিজেদের খুব ভালো করে বিচার করে দেখি, কোথাও না কোথাও আমাদের সবারই মনে হয় ঈশ্বর দর্শন, আত্মজ্ঞান এগুলো সব মনের রাজ্যের ব্যাপার। যখনই মনের রাজ্য বলে বোধ হয় তখন আমরা অজান্তায় মেনেই নিচ্ছি এগুলো সব কাল্পনিক বা মনের ভুল। দ্বিতীয় হল, আমরা যেভাবে ঈশ্বর দর্শন মনে করি বা লীলাপ্রসঙ্গেও ঠাকুরের যে বিভিন্ন দর্শনের কথা পড়ছি, তখন মনে হয় কোন জ্যোতির্ময় পুরুষ তিনি যেন সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। যেমনি এই রকম ভাবা হচ্ছে তখনই ওটা কাল্পনিক বা মনের ভুল হয়ে

যায়। এদিক থেকে সেদিক থেকে যত বিচার করি দেখা যাবে একটা মনের ভুল, মনের সাম্রাজ্য, মনের খেলা বা মনের জগৎ এই ভাবটা যায় না। এখানে এটাকে আটকাচ্ছেন, এই ভুল করো না যে এটা কোন মনের খেলা বা মনের রাজ্য বা মনের ভুল, এটা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ। আমাদের কাছে জগৎ যেমন বাস্তবিক জ্ঞান, ঠিক তেমনি তাঁদের কাছে এই প্রকাশ, ঈশ্বরই সত্য, এটাই বাস্তবিক জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন, বই পড়ে এক রকম, চিন্তা করে এক রকম আর তিনি নিজে দেখা দিলে আরেক রকম। *প্রকাশতে*, এখানে কোন কাল্পনিক, কোন মনের খেলা নেই, চিন্তা দিয়ে কিছু তৈরী করা হয়নি আর মনের ভুলও নয়।

ক্বাপি পাত্রে, কচিৎ কখন কারুর মনে যখন প্রকাশিত হন তখন সেটাই আরও অন্যান্য অনেক গুণ দিয়ে পরীক্ষা হয়ে যায়। তাঁর জীবনের আরও পাঁচটা জিনিস দিয়ে ধরা যাবে এটা তাঁর ঠিক ঠিক ঈশ্বর জ্ঞান নাকি শুধুমাত্র কল্পনা বা মনের ভুল। যে জিনিসগুলো দিয়ে ধরা যাবে সেগুলোকেই পরের সূত্রে বলে দিয়ে প্রকাশকে আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন –

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিপক্ষণবর্ধমানম্
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরম্ অনুভবরূপম্।।৫৪।।

বাহান্ন আর তিপান্ন দুটো সূত্রকে মিলিয়ে বলছেন। বাহান্ন নম্বর সূত্রে বললেন, বোবা মিষ্টি খেয়ে যেমন মিষ্টির বর্ণনা দিতে পারে না, যদিও কিছু বলতে পারে না, তা সত্ত্বেও কিছু আছে। ফিজিক্সে একটা শব্দ আছে ব্ল্যাকহোল। বলা হয় ব্ল্যাকহোল থেকে আলো বেরোতে পারে না। কিছু দিন পর বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলেন ব্ল্যাকহোল অতটা ব্ল্যাক নয়, ওখান থেকেও আলো বেরোয়, কিন্তু অন্য অর্থে আলো বেরোয়। এখন সবাই এটাকে নিয়েই নাচানাচি করছে। এরা বলে, ব্ল্যাকহোলের একদিকে যদি আলো ফেলা হয় সেই আলো আর ফেরত আসবে না, অর্থাৎ জিনিসটাকে আর জানা যাবে না, আলোটা ওখানেই চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে। ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব এত বেশি যে যার ফলে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিটাও মারাত্মক ধরণের বেশি, যে কারণে আলোকেও সে নিজের ভেতরে টেনে নেয়, আলো তাই আর ফেরত আসতে পারে না। আলো যদি ফিরে না আসে তাহলে তাকে জানার কোন পথ নেই। ফিজিক্সে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা দিয়ে এই ব্যাপারগুলো জানা যেতে পারে। এখন বিজ্ঞানীরা বলছে, ওটা জানা যায়। কারণ একটা জিনিস কাছে যখন যাচ্ছে তখন ওটাকে ছিঁড়ে এক রকম ভাবে নেয় আর বাকিটা ছিটকে বেরিয়ে যায়, তাতে আলোর একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানীদের উপর কোন বিশ্বাস করা যায় না, আজকে এক রকম থিয়োরী বলছেন, কাল অন্য রকম থিয়োরী বলবেন। অনেক কষ্ট করে যতক্ষণে একটা থিয়োরীকে ছাত্ররা রপ্ত করছে ততক্ষণে ঐ থিয়োরীটা ভুল প্রমাণিত হয়ে তার জায়গায় অন্য থিয়োরী এসে গেছে। কিন্তু এটা খুব মজার, *মূকাস্বাদনবৎ* হল ঠিক ব্ল্যাকহোলের মত, এখানে কিছু জানা যাবে না। তারপরেই বলছেন, জানা যাবে না, বলা যাবে না ঠিকই, কিন্তু কিছু লক্ষণ আছে যেটা দিয়ে জানা যায়। যেমন ব্ল্যাকহোলও যদি থাকে কিন্তু অন্যান্য কিছু লক্ষণ দিয়ে বোঝা যাবে যে এখানে একটা ভারী বস্তু কিছু আছে। কি সেই লক্ষণ? সেটাই এই সূত্রে বলছেন।

কারুর মধ্যে যদি ভক্তি হয়ে থাকে তখন সে বলতে পারবে না ঠিকই কিন্তু নিজেও সে জানবে আর যারা তাকে দেখছে তারাও বুঝতে পারবে তার মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের কোন আঁট নেই, *গুণরহিতং*। *কামনারহিতং*, কোন ধরণের কামনা থাকে না। ঠাকুর বলছেন, আমাকে দুজন লোক মানবে জানবে এই ভাবটাও থাকে না। *প্রতিক্ষণবর্ধমানম্*, ভক্তি দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। *অবিচ্ছিন্নং*, ভক্তি আজকে এক রকম, কাল আরেক রকম, ভক্তি বাড়ছে বা কমছে, এই ধরণের কিছু হবে না। *সূক্ষ্মতরম্*, এতই সূক্ষ্ম যে জগতের কোন কিছুর সাথেই তুলনা করা যাবে না। জগতে কোন কিছু জানতে গেলে স্থূলকে ধরে সূক্ষ্ম দিয়েই জানতে হয়। ভক্তি হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তার মানে তাঁর বুদ্ধি এত সহজ সরল হয়ে যায়, এত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় যে ভক্তি লেসার বিমের মত সূক্ষ্ম হয়ে যায়। এর আগে আমরা লেসার বিমের কথা বলেছিলাম, লেসার বিম যদি একটা ব্লেডের উপর দিয়ে দৌড়ে যায় তার মনে হবে বিশাল চওড়া রাস্তা দিয়ে আমি দৌড়াচ্ছি। স্থূল বুদ্ধি যাদের তারা সব সময় মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে, তার কারণ স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ লোকেদের কাছে মানুষ হল স্থূল, অমুক লোক অমুক করেছে, এই কথা বললে সবাই সহজে বুঝে যাবে। বাড়িতে, অফিসে কাজকর্মের ফাঁকে যখনই কোন কথা বলবে তখন সবাই মানুষকে নিয়েই কথা বলে। যাদের বুদ্ধি স্থূল থেকে

একটু সূক্ষ্ম, তারা কোন ঘটনাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করে, তার মধ্যে ব্যক্তি জড়িত থাকে না। ঘটনাকে ধরে রাখা একটু কঠিন কিন্তু মানুষের সাথে আমরা আরও বেশি জড়িয়ে থাকি। কিন্তু যাঁরা খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছেন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্নরা সব সময় ভাব নিয়ে, তা সে যে ভাবই হোক, রাজনীতির ভাব হোক, অর্থনীতির ভাব হোক, শিল্পকলার ভাব হোক, তারা সব সময় এই ভাবকে নিয়ে আলোচনা করেন।

শব্দের জগৎ মনের জগৎ এই জায়গাতে এসে শেষ হয়ে যায়। ধর্মের জগৎ আরও সূক্ষ্মের দিকে যেতে শুরু করে, তখন এই ভাবগুলোও আর তাকে টানবে না। মাস্টারমশাই ঠাকুরকে মাটিতে এঁকে এঁকে বোঝাছেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয়, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলছেন, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। ঠাকুর আর আইডিয়াকেও নিতে পারছেন না, ওনার মন আরও সূক্ষ্মে চলে গেছে। ভক্তির স্তরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কাছে জগৎ যে সিদ্ধান্ত গুলির উপর চলছে, সেই আইডিয়াস গুলোকে তিনি নিতে পারেন না, তিনি আরও সূক্ষ্ম স্তরে চলে গেছেন। ভক্তি খুব সূক্ষ্ম স্তরে কাজ করে সেইজন্য বলছেন, *সূক্ষ্মতরম্*। কথামৃতে প্রথমের দিকে আছে, নরেন দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাই আরও কয়েকজনের সাথে আজকালকার ছেলেদের চরিত্র সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, বর্তমান ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা কি নিয়ে কথা বলছ। যখন শুনলেন বর্তমান সমাজের ছেলেদের চরিত্র নিয়ে কথা বলছে, ঠাকুর খুব তিরস্কার করছেন। পরে ভক্তিসূত্রেই বলবেন, এই রকম আলোচনা করতে নেই। যখনই আমরা ফাঁকা থাকি তখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা এই তিনটের মধ্যেই ঘুরবে, ব্যক্তিকেন্দ্রি, ঘটনা কেন্দ্রিক বা কোন বিচারকে নিয়ে। কিন্তু যাঁরা ভক্তি পথে আছেন তাঁরা এই তিনটেকেই বাদ দিয়ে দেন, ঈশ্বরের শুদ্ধ রূপে তাঁদের কথাবার্তা, চিন্তন স্থির থাকে। আর বলছেন *অনুভবরূপম্, মূকাস্বাদনবৎ* যেটা বললেন এখানেও তাই বলছেন, এই ভক্তির আস্বাদ যিনি অনুভব করছেন একমাত্র তিনি জানেন, অন্যদের পক্ষে জানা খুব মুশকিল।

কোন জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা কয়েকটা খুব সাধারণ জিনিসকে নিয়ে থাকি। যেমন আমরা বলি দুধের মত সাদা বা কোন জাতি নিয়ে বলি। এই যে নানা রকম গুণগুলো রয়েছে, বলছেন এগুলোর কোনটার সাথে কোনটার কোন মিল নেই। এই গুণগুলো না বোঝার কিছু নেই। কিন্তু যখন বলছেন ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি বাড়তেই থাকে। কি রকম বাড়ে? ঠাকুর বলছেন তিনি কাজ কমিয়ে দেন, বৌমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি তার কাজ কমিয়ে দেয়, সন্তান হয়ে গেলে শুধু তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আর কোন কামনা তার থাকে না। আমরা মন্দিরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে কত কি চাইছি, ঠাকুর এটা দাও, সেটা দাও, কিন্তু তার কোন কামনা-বাসনা থাকে না। এই সূক্ষ্মের কথাই আবার পরের সূত্রে বলছেন –

তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি
তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি।।৫৫।।

যখন ঐ প্রেমের অবস্থায় চলে আসেন তখন তিনি প্রেমের বস্তুকে মানস নয়নে অবলোকন করেন, কর্ণে তাঁরই কথা শ্রবণ করতে চান, তাঁর কথাই বলেন আর তাঁর কথাই চিন্তন করেন। যে কোন মানুষ যখন কোন উচ্চ জিনিসকে নিয়ে থাকেন, যেমন যাঁরা বিজ্ঞানী, বড় লেখক, তাঁরা কোন একটা বিচারকে ধরে নেন, এরপর ওই আইডিয়ার উপরেই তাঁরা বিচরণ করেন। একজন বড় বিজ্ঞানীর কাছে গেলে দেখা যাবে তিনি যেটা নিয়ে কাজ করছেন, সেটার উপরেই কথা বলবেন, সেটাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন, ওটার ব্যাপারে পাঁচজন কি বলছে শুনতে চান, এর বাইরে তিনি যাবেনই না। জাগতিক স্তর থেকে তিনি যখন ঈশ্বরীয় প্রেমের জগতে চলে যান তখন ওর বাইরে আর কিছু তিনি জানেন না। ঠাকুর বলছেন কুণ্ডলীনি যখন কণ্ঠে এসে যায়, মানে পঞ্চম ভূমি, তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছু বলবেন না। সত্যটা তাঁর কাছে এমন ভাবে আসতে থাকে তখন তিনি অন্য দিকে মন দিতেই পারেন না। এখানে এতগুলো কথা বলছেন, অবলোকন করা, শোনা, কথা বলা, চিন্তন করা, এগুলো মন আর ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন রকম ক্রিয়া, কিন্তু মূল কথা একটাই তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর যে সত্তা সেই সত্তাকে কেন্দ্র করে হয়। যেমন যারা কামী পুরুষ, তারা কামের যে বস্তু, ঐ বস্তুকে নিয়েই এগুলো করে। যাঁরা বড় চিন্তক তাঁরা নিজের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে এই রকম করেন। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের পথে আছেন, শুধু আছেনই না, এখানে শব্দটা হল *তৎপ্রাপ্য*, তাঁকে পেয়ে এগুলোই তিনি করেন। আমাদের এটাই সমস্যা, আমরা হলাম কালকের যোগী ভাতকে বলি অন্ন, দীক্ষা নিয়েই সবাই ভাবছি ঠাকুর এবার একেবারে সাক্ষাৎ এসে আমাদের

সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন। আর তা নাহলে এমন ভাব দেখাই যেন ভক্তিতে একেবারে গদগদ হয়ে আছি, কোন মহারাজের সাথে দেখা করতে গেলে বলবে, আমাকে একটু ঠাকুরের কথা বলুন। এরা যা যা করছে খারাপ কিছু করছে না, ধাপ্পাও মারছে না। কিন্তু এখানে ভক্তির পথে থাকার সময় কি করছেন সেটা বলছেন না, বলছেন *তৎপ্রাপ্য*, তাঁকে পেলে কি কি করেন সেই কথা বলছেন।

ঠাকুরের কাছে একজন এসেছে, ঠাকুর তখন ভাবে থাকতেন, সেও এসে যেন ভাবের চরম অবস্থা থেকে বলছে, ওরে তোর পায়ে পড়ি একবার হরি নাম নে। ঠাকুর কিন্তু বলছেন, এ আবার আমড়া খাবে। কদিন পর ঠিক দেখা গেলে এক মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেছে। ও কি কিছু ভুল করছিল? হ্যাঁ, ভুল করছিল, যদি সে কোন সিদ্ধ গুরুর কাছে থাকত সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটকে দিত। ভাগবতে এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। যশোদা একদিন মন্থন করে মাখন তুলছেন। উনি জানেন আমি কৃষ্ণের জন্য মাখন তুলছি, মনে মনে কৃষ্ণের কথা ভাবছেন, তাঁর দুষ্টুমির কথা আর মুখের কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক মিষ্টি গান। এই বর্ণনাটা এত উচ্চমানের যে কল্পনাই করা যায় না, এর দুটি শ্লোক পড়লেই বোঝা যায় একজন উচ্চমানের ঋষি ছাড়া এই জিনিস কেউ রচনা করতে পারবেন না। কোন সাধারণ ঋষি বা কোন সাধক কবিও এই জিনিস রচনা করতে পারবেন না। যশোদ কৃষ্ণকে নিয়ে কিভাবে একেবারে সম্পূর্ণ ডুবে আছেন, এই বর্ণনা যিনি রচনা করেছেন তাঁর মধ্যে সৃজনী শক্তি আর ঈশ্বরের প্রতি সেই প্রেম যেন টগবগ করছে। যশোদার বাণী, যশোদার হাত আর যশোদার মন – কায়, মন আর বাণী সম্পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণের মধ্যে ডুবে আছে, কৃষ্ণের বাইরে আর কিছু নেই। এখানেও ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন, যখন তিনি কথা বলবেন তখন কৃষ্ণেরই কথা বলবেন, শুনবেন কৃষ্ণরই কথা। ঠাকুর সতীর পতির উপর টানের, মায়ের সন্তানের উপর টান আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টানের যে কথা বলছেন, সেখানে এরা ঐ একটা জিনিসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। এখান মূল হল, মনের সামান্য কোন অংশও ডানদিক বামদিক করছে না, মন পুরোপুরি একটি জিনিসের মধ্যে একেবারে ডুবে আছে। টিভিতে খুব উত্তেজনাময় ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময়েও এই রকম হয় ঠিকই, কিন্তু যোগশাস্ত্রে এটাকে অন্য ধরণের মনের একাগ্রত বলছেন। কিন্তু তার থেকে আরেকটু উচ্চ ধরণের একাগ্রতা যেখানে আনন্দ একেবারে ফেটে পড়ছে, এমন একটা অনুভব তার হয়েছে, সেই অনুভবের আস্বাদ তার এখনও লেগে আছে, ঐ আস্বাদের আনন্দ এত গভীর যে সে ওর বাইরে যেতে পারে না। ছেলে খুব ভালো রেজাল্ট করে বাড়ি এসেছে, মা ফোনে সবাইকে খবর দিচ্ছে, পাড়াপ্রতিবেশীদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, আসলে মা চাইছে তার ছেলের যে এত ভালো রেজাল্ট হয়েছে, এটাকে নিয়েই সবাই আলোচনা করুক।

তবে যারা নতুন এই পথে এসেছে তাদের অন্যান্য জায়গায় ধরা পড়ে যায়। সেখানেও যে সে খুব বাড়াবাড়ি করে ভুল করছে তা না, কারণ একটা অন্য জগৎ থেকে আরেকটা জগতে এসে তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস উৎসরণ হতে থাকে, সেটার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত হয়ে যায়। যাই হোক এখানে ঈশ্বরীয় প্রেমের আলোচনা করছেন, ঈশ্বরীয় প্রেমকে বিভিন্ন ভাবে বলছেন, পরের সূত্রে আরেকটু specific করে বলছেন –

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদি ভেদাদ্ বা।।৫৬।।

ভক্তির আলোচনার শুরুতে ভক্তির কতকগুলি শ্রেনীর কথা বলা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হল মানুষ যখন ভক্তি শুরু করছে। ভক্তি শুরু করে তার নিষ্ঠা একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে আর সেখান থেকে সে পুরোপুরি ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। যদিও এই প্রজন্মে সেভাবে দেখা যায় না, কিন্তু আগের প্রজন্মে সবাই কোন না কোন ভাবে ভক্ত হত। ভক্তি সবারই মধ্যে কম বেশি আছে। মন্দিরে যাচ্ছে, একটু জপধ্যানও করছে, বিভিন্ন যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়েছে যেখানে ওঁএর উপর নানা রকম উচ্চারণাদি শেখান হচ্ছে, সবারই কোন না কোন সাধু মহাত্মাদের সাথে যোগাযোগ আছে, এটাকে বলে শুরু করা, প্রবর্তক। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ভক্তি পাকতে শুরু করে। যখন পাকতে শুরু করে তখন একটা ভালো অবস্থায় পৌঁছে যায়, সেখানে যে তার পুরোপুরি ভক্তির উপলব্ধি হয়ে যাচ্ছে তা নয়। অন্য দিকে সে একেবারে নভিস্ তাও নয়। এই অবস্থাকে এনারা বলছেন গৌণী ভক্তি, গৌণা ভক্তিও বলা হয়। এর আরেকটা নাম অপরা ভক্তি, অপরা মানে lower। গৌণী ভক্তির যদি অনুশীলন করা হয়, অনুশীলন করতে করতে যদি গভীরে চলে যায়, তখন সেই ভক্তিকে বলে মুখ্যা

ভক্তি নয়তো একান্তা ভক্তি, ঠাকুর রাগানুরাগ ভক্তি বলছেন। আলোচনার সময় আমরা স্ফটিকের উপমা নিয়ে বলেছিলাম মুখ্যা ভক্তি হল super saturated solutionএর অবস্থা। সাধনায় যে পরিশ্রম হচ্ছে, পরিশ্রমের ঐ তাপে ওর ধারণ শক্তিটা বেড়ে যাচ্ছে। ঐ ধারণ করার শক্তির মধ্যে আরও অপরিচ্ছন্ন ক্রিস্টাল যাচ্ছে, উত্তাপে টগবগ করে ফুটছে, এবার তার যতটা নেওয়ার ক্ষমতা তার বেশি নিয়ে নিয়েছে। এবার যেমনি পিওর ক্রিস্টালটা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ওটা ক্রিস্টালের আকার নিয়ে নেবে। এই যে মুখ্যা ভক্তি বা একান্তা ভক্তি বা রাগানুরাগ ভক্তি, এই ভক্তি হল ঠিক সেই অবস্থা, যে অবস্থায় এখনও ক্রিস্টালাইজেশান হয়নি, কিন্তু ওটা এখন আর solutionও না। একদিকে রয়েছে ইমপিওর ক্রিস্টাল, আমাদের জীবন যেমন, মনে নানান রকম অঙ্কট-বঙ্কট আছে। এবার যখন ওটাকে solutionএ দিয়ে দেওয়া হল, যে জিনিসটা ওটাকে solution করবে, সাধারণ ভাবে জলই solution করে। এবার যেমনি তাকে গরম করতে দেওয়া হল, গরম হচ্ছে আর ক্রিস্টাল দিয়ে যাচ্ছে। এবার যে স্তরে চলে গেল, বিশেষ করে saturationএর পরে যে super saturation হচ্ছে, এবার যে আরও ক্রিস্টাল নেবে সেই ক্ষমতাটাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন যদি ওখানেই ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, আর যদি তাপ না দেওয়া হয়, সে দুটোর মধ্যে কোন দিকেই থাকবে না, না হতে পারবে ক্রিস্টাল আর না আর কোন দিন পারবে solution হতে। ওর মধ্যে সাংসারিকতাও নেই আর আধ্যাত্মিকতাও এখন হয়নি। বেশির ভাগ ভক্তেরই এই দুরবস্থা। এটা দরকাচার অবস্থা নয়, দরকাচা মানে ঠিক ভাবে পাকেওনি আবার কাঁচাও নয়। ওনার আশেপাশে যারা আছে তারাই ওনার সম্বন্ধে এই শব্দটা ব্যবহার করবে। দরকাচা মানে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না, নিন্দাসূচক। যাঁরা এই পথে আছেন তাঁরা কিন্তু এই শব্দ ব্যবহার করবেন না। বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখে ঠাকুর বলছেন, ভেতরে সোনা চাপা আছে কিন্তু খপর নেই। এটাই ঠিক ঠিক super saturated solutionএর লক্ষণ, হয়ত এখনও super saturated হয়নি। সে এখন কোনটাই করতে পারবে না।

কথামৃতের পাতায় পাতায় এদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্বামীর মন এখন ভগবানের দিকে, সংসারের দিকে মন যায় না, স্ত্রী দিনরাত তাকে গালাগাল দিচ্ছে, নিজে ঠিক মত খেতে পারলুম না, পড়তে পারলুম না, নিজের বাচ্চাদের খাওয়াতে পারলুম না, বাবা-মা এ কার সাথে আমাকে বিয়ে দিল! আবার বলে, তোমার ঠাকুর-ঠুকুর ছাড়ো তো, সারাদিন চোখ বুঝে কিসব করছ এগুলো ছাড়। বাস্তবিক ঠিক এই জিনিসটাই হয়, অনেকের স্ত্রী তাঁদের ছেড়ে চলেও যায়। বিরাট বড়লোকের ঘরের কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনতে চান, সাধুসঙ্গ করেন, অন্য দিকে স্ত্রীরা ঘোর বিষয়ী। এদের যে কি জ্বালা কল্পনা করা যায় না। এনারা দরকাচা নন, এনাদের super saturated solution অবস্থা। একটু যদি কোন ভাবে ঈশ্বরের কৃপা হয়ে যায়, একটা জোর ধাক্কা লাগবে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টালের আকারে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাবে। এই অবস্থার পর যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু ঈশ্বরীয় কৃপা ছাড়া আর হবে না। ভক্তির এই অবস্থাই মুখ্যা ভক্তি, একান্তা ভক্তি বা রাগানুরাগ ভক্তির সাথে এখনই ঠিক তুলনা করা যাবে না। কিন্তু বোঝানর জন্য আলোচনা করা হল, সংসারের রস থেকে এদের মন উঠে গেছে। ঠাকুর ভাগবত থেকেই বলছেন, যখন ঈশ্বরের দিকে মন যায় তখন সংসারকে পাতকুয়া মনে হয়, সম্বন্ধীদের কালসাপ দেখে। ঠাকুর যদিও এখানে খুব কড়া শব্দ ব্যবহার করছেন, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তাই হয়। ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীকে এত ভালোবাসতেন, কিন্তু সন্তানের জন্ম হওয়ার আগে কিছু কিছু দৃশ্য দেখেছেন যা দেখে তাঁর মনে পরিবর্তন এসে গেছে। সন্তান হওয়ার খবর শুনে ভগবান বুদ্ধ বলছেন, এক রাহু জন্ম নিল, মানে একটা বন্ধন তৈরী হল। সেই থেকে ভগবান বুদ্ধের সন্তানের নাম হল রাহুল। ঠাকুর আবার এও বলছেন, যাদের ঈশ্বরের দিকে মন যায় তাদের তিনি কৃপা করতে শুরু করেন। দেখা গেল কোন ভাই এসে বাড়ির দায়ীত্ব নিয়ে নিল। সমস্যা হল, একবার একটা বোধ হয়ে গেছে যে অন্য ধরণের একটা জীবন হয়, কিন্তু ঐ জীবনে পুরোপুরি ঢুকতে পারেনি অন্য দিকে এই দিকটাকেও আর নিতে পারছে না। কিন্তু সেটাকেও অনেক সাধনা করে যখন অনেকটা এগিয়ে যায়, তখন না আছে এদিকে না আছে ওদিকে, তখন ছটফটানি শুরু হয়, এই ছটফটানিটাই প্রাণান্তক। এই মুখ্যা ভক্তি বা একান্তা ভক্তি যখন পরিপক্ক হয় তখন সেই ভক্তিকে পরা ভক্তি বলে, ঠাকুর এটাকেই বলছেন প্রেমা ভক্তি। ভক্তি এই তিনটে ধাপ, অপরা ভক্তি বা গৌণা ভক্তি, অপরা ভক্তি থেকে মুখ্যা ভক্তি বা ঠাকুরের ভাষায় রাগানুরাগ ভক্তি, সেখান থেকে প্রেমা ভক্তি বা পরা ভক্তি। গৌণা ভক্তি হল যেখানে শুরু করছেন।

এই সূত্রে বলছেন *গৌণী ত্রিধা*, গৌণা ভক্তি আবার তিন প্রকার, *গুণভেদাৎ*, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের তফাৎ আর *আর্তাদি ভেদাৎ*, আর্ত, অর্থার্তি আর জিজ্ঞাসু এই তিনটে ভেদ। এই কটি জিনিসকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলা দরকার যে এর মধ্যে কিছু কিছু technical জিনিস আছে। আমাদের হয়ত মনে হতে পারে অত শত জেনে কি হবে, কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে এসেছি, এই ঐতিহ্যের মধ্যে ভক্তি বা ঈশ্বরীয় প্রেমকে কি দৃষ্টিতে ঋষিরা দেখতেন, কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জানা খুব দরকার। তার সাথে ভক্তিও একটা বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানকে জানতে হলে এর খুঁটিনাটি সব কিছুকেই জানা দরকার। অনেক আগে একজন মহারাজ ছিলেন, সন্ন্যাসী কিন্তু তিনি ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব। সারাটা দিন শালগ্রাম পূজা, এটা সেটা করতেন। সেই সময় মঠে পণ্ডিত রেখে বেদান্ত অধ্যয়ন করান হত। উনিও খুব নিষ্ঠার সাথে বেদান্ত শুনতে যেতেন। একবার ওনাকে এক জুনিয়র মহারাজ বলছেন, মহারাজ! আপনি তো ঘোর বৈষ্ণব, আপনিও বেদান্ত শুনতে যাচ্ছেন? উনি বলছেন, বেদান্ত শুনছি বলেই যে আমি বেদান্তী হয়ে গেলাম তা তো নয়। একটা জিনিসকে জানতে হয়, এটাও একটা বিদ্যা, বিদ্যাকে জানতে কোন দোষ নেই। যদিও আমার ভাবে খাপ খায় না কিন্তু তাও শুনতে হয়, শুনলে জানা হয়ে থাকে। অন্যরা কিভাবে পূজাদি করছে, এই এই ব্যাপারে অন্যরা কি বলছে জানা দরকার। যত জানা হবে তত নিজের নিষ্ঠা দৃঢ় হয়।

এখানে প্রথমেই বলে দেওয়ার দরকার যে এই সূত্রটা খুব বিপজ্জনক সূত্র। এই সূত্রে এবং পরের দুটো সূত্রে ভক্তির শ্রেনীবিন্যাস করছেন। পরা ভক্তিতে শ্রেনীবিন্যাস হয় না, গৌণা ভক্তিতেই হয়। ভালো মন্দ, উচ্চ নীচ এই ধরণের ভক্তির কথা বলছেন। কিন্তু গীতাতে বলছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন*। গীতাতে প্রত্যেকটি শব্দ মেপে মেপে, বেছে বেছে দেওয়া হয়েছে, এই শ্লোকে যেমন একটা শব্দকে ভগবান নিয়ে এসেছেন তা হল *সুকৃতি*। সুকৃতির অর্থ হয়, যাঁরা বিশেষ, সাধারণ নয় বিশেষ লোক। ঠাকুরের ভাষায় থাক আলাদা, অন্তরঙ্গ এনারা খুব বিশেষ, সেখানে ঐ ধরণের শ্রেনীবিন্যাস হয় না। যাঁরাই ভক্তি পথে এসে গেছেন তাঁদের আর শ্রেনীবিন্যাস করা যায় না। তবে বোঝার জন্য এনারা এভাবে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় হল, এখানে যে গৌণী ভক্তির কথা বলছেন, যাকে গৌণা ভক্তিও বলা হয়, এই ভক্তি দুটো স্তরে কাজ করে। একটা হল সাধারণ লোকেদের স্তরে, আমার আপনার মত যারা সাধন পথে সবে ঢুকছি। আর হল যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক তাঁরাও যখন ভক্তিতে ঢুকছেন, যেমন ঠাকুর যখন ঢুকছেন, উপনিষদের ঋষিরা যখন ঢুকছেন, ভগবান যীশুও যখন ঢুকছেন, এনাদেরও কিন্তু শুরু হয় গৌণা ভক্তি দিয়ে। একেবারে দুম করে সরাসরি মুখ্যা ভক্তিতে ঢুকে যাচ্ছেন, তা না, গৌণা ভক্তিতে সবাইকেই ঢুকতে হবে। যাঁরাই ঈশ্বরের পথে আসছেন শুরু সবাইকে গৌণা ভক্তি দিয়েই করতে হয়। সেখান থেকে সবাই মুখ্যা ভক্তিতে পৌঁছাবেন, এনারা পরা ভক্তিতে পৌঁছে যান বাকিরা পারেন না বা এভাবেও বলা যেতে পারে, অনেকেই আছেন যাঁরা গৌণা ভক্তিতেই ঘুরঘুর করতে থেকে যান আর মুখ্যা ভক্তিতে পৌঁছাতে পারেন না। এখানে দুই ধরণের লোকেদের কথা বলা হল, একজন যাঁরা সাধারণ সাধক আরেকজন খুব বিশেষ সাধক, দুটোকে নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। তবে সাবধান করে দেওয়া উচিৎ যে সবাই সমান, এর বেশি এটাকে এখানে সেখানে লাগানো ঠিক নয়। আমরা অনেক সময় একটা technical আলোচনা করার সময় বেশ কিছু কথা বলি, কিন্তু ওগুলোকে বেশি খেলো করতে নেই। অনেক বড় বড় বক্তারাও ভাষণে দেখাতে চেষ্টা করেন মা ঠাকুর থেকে কত বড়, তার জন্য এখান ওখান থেকে কত কোটেশান নিয়ে আসছেন। আবার মায়ের ছবির সংখ্যাও ঠাকুরের ছবি থেকে বেশি। এগুলো মজা করে বলাটা এক জিনিস কিন্তু সাধারণ মানুষের সামনে বলাটা অন্য রকম হয়ে যায়, সেইজন্য যেখানে সেখানে এগুলোকে নিয়ে বেশি বলতে নেই। এনাদের জীবন, সাধনা, বাণী এত উচ্চমানের যে এনাদের নিয়ে এই ধরণের আলোচনা করে খেলো করে দিতে নেই।

এই সূত্রে কোথাও একটা বিচারের ভাব এসে যায়। যাই হোক বলছেন, গৌণা ভক্তি সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণে বাঁধা। মুখ্যা ভক্তিতে কোন conditioning থাকে না, কি conditioning থাকে না? ইংলিশে এটাকে বলছেন, attitude, outlook and expectation। তিনটের অর্থ হল শ্রদ্ধা, ভাব আর লাভ বা অপেক্ষা। এই তিনটেতে পার্থক্য এসে যায়, এই তিনটের যে পার্থক্য হয়, এটা conditioned হয় সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে। ফলে গৌণা ভক্তি রীতিমত conditioned হয়ে যায়। গীতায় এক

জায়গায় বলছেন *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ*, সেখানে তামসিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা আর সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার কথা বলছেন। যার যেমন শ্রদ্ধা তার ভাব তেমন, যেমনটি ভাব তার তেমনটি লাভ। শ্রদ্ধা হল outlook, ভাব হল তার attitude, আর লাভ হল expectation। শ্রদ্ধা, ভাব আর লাভ এই তিনটে যাঁরা সত্যিকারের সাধনা করছেন তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে, সাধারণ সাধকদের কথা এখানে বলছেন না। গৌণা ভক্তিতে শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক, ফলে ভাব সেটাও তিন প্রকার হয়ে যায় আর তার সাথে লাভও তিন প্রকার হয়ে যাবে, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক লাভ। মুখ্যা ভক্তিতে এই জিনিসগুলো থাকে না। আর পরা ভক্তিতে তো কিছুই থাকার কথা নয়, কারণে তিনি তো ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছেন।

আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, যে কোন দুজন সাধক কখনই সমান হবে না। আমরা তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক বলে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু সবারই মধ্যে কিছু তমস আছে, কিছু রজস আছে আর কিছুটা সত্ত্ব আছে। যদি আমরা ঐ percentage করতে যাই তাহলে তো অনন্ত শ্রদ্ধা, অনন্ত ভাব, অনন্ত লাভ হয়ে যাবে। ইতিহাসে যত মানুষ হয়েছে, ভবিষ্যতে যত মানুষ হবে সবাই ওর মধ্যে covered হয়ে যাবে। যখন percentageএ আসবে ওয়ান পারসেন্ট, পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট, পয়েন্ট জিরো ওয়ান পারসেন্ট, এটা তো গেল একটার, বাকি গুলোর মধ্যেও এইভাবে আসবে, তাহলে তো অনন্ত হয়ে যাবে। আর যেমন তার শ্রদ্ধার combination হবে তেমন তার ভাবটাও পাল্টাবে, লাভটাও পাল্টাবে। কেন পাল্টাবে? কারণ তিনি অনন্ত, তিনি অনন্ত বলে যেটা লাভ, বস্তু লাভটাও আলাদা হবে। এই যে হিন্দু মত, খ্রীশ্চান মত, মুসলমান মত এদের মধ্যে যে তফাৎ হয়ে যায় তার কারণটা হল ঠিক এই জায়গাতে। কোন একটা জায়গায় যিনি এগুলোকে নিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন বা বলেছেন অন্যথা কোথাও একটা গোলমাল ছিল। গোলমালটা এই জন্যই যে, গৌণী ভক্তি কিনা, ওনারা একটা attitude নিয়ে এগিয়েছিলেন। ঠাকুরের কথামৃত আমি পড়লে এক রকম, আপনি পড়লে আরেক রকম মনে হবে। কারণ আমাদের দুজনের মনের শ্রদ্ধাটা আলাদা, এই শ্রদ্ধা বাংলার শ্রদ্ধা নয়, এই শ্রদ্ধা হল যে জিনিসটাকে দিয়ে আমার আপনার জীবন চলে। শ্রদ্ধা আলাদা বলে ভাব আলাদা, ভাব আলাদা বলে লাভও আলাদা। সেইজন্য ওনারা তিনটে শ্রেনী করে দিচ্ছেন, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক।

মুখ্যা ভক্তিতে কোন conditioning থাকে না। না থাকার জন্য মুখ্যা ভক্তিকে শ্রেয় বলে। কিন্তু কোথাও অল্প একটু লেগে থাকে, যেটা আমরা পরে দেখব, কিন্তু ঐ ধরণের division আর থাকে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে সাধারণ সাধকের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, সাত্ত্বিক ভক্তের কোন কিছুর আড়ম্বর থাকে না। বাড়ির এখানে সেখানে ভেঙে গেছে, শ্যাওলা পড়ে গেছে, সেইভাবে দেখাশোনা করতে পারছে না। সাত্ত্বিক ভক্ত হয়ত মশারির ভেতরে ধ্যান করছে, বাড়ির লোকে ভাবছে বাবুর রাত্রে ঘুম হয়নি এখন ঘুমোচ্ছেন। রাজসিক ভক্তের খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন ঠাকুর। গরদের কাপড় পরে পূজা করবে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা থাকবে, মাঝে মাঝে তাতে সোনার রুদ্রাক্ষ। একজন মহারাজ বলতেন, মন্দিরে মঙ্গলারতির পর জপে বসেছে, জপ করতে করতে হঠাৎ একবার ফিরে দেখবেন জপের সময় কে কে ঢুলছে। আর জপ হয়ে যাওয়ার পর জপের মালাকে কৌটার মধ্যে জোরে ফেলে কৌটার মুখটাও জোর একটা আওয়াজ করে বন্ধ করবেন, একটা বিরাট সংখ্যার জপ পুরো করলাম। রাজসিক ভক্তের লক্ষণ, খারাপ কিছু না, এ রকমেরই হয়। আর তাঁদের হাটা চলা, কথা বলা, তাঁর বেশভূষা সব কিছুতেই বোঝা যায় যে কোথাও একটা দম্ভের ভাব আছে। তামসিক যারা তারা সাধ্য সাধনের ব্যাপারে পরিষ্কার নয়, তার মানে কোনটা সাধ্য কোনটা তার সাধনা সেই ব্যাপারে তার কোন ধারণা থাকে না, আর অলস প্রকৃতির হয়। পরম্পরাদি অনুসারেই তামসিকরা পূজা অর্চনা করে। ফলে আচার, অর্চনা, ডাইনি, পিশাচাদি নিয়ে জাদু, গোঁড়ামি, পশুবলি এগুলোর দিকে তামসিকদের বেশি দৃষ্টি থাকে। এরা শাস্ত্র জানেও না আর তাই শাস্ত্রবিধির দিকে দৃষ্টিও থাকে না। এরাও ভক্ত কিন্তু তামসিক ভক্ত। রাজসিক ভক্তের নিজের স্বার্থ আর দম্ভ বেশি থাকে। পুরাণের যত চরিত্র তার বেশির ভাগই রাজসিক চরিত্রের। যত অসুর আছে সব রাজসিক চরিত্রের, অসুরদের মধ্যে দম্ভ অহঙ্কার প্রচণ্ড মাত্রায় থাকে। সাত্ত্বিক ভক্ত শাস্ত্রের বিধি অনুসারে আচরণ করে আর তার সাধ্য আর সাধন খুব পরিষ্কার থাকে। সাত্ত্বিক ভক্ত জানে আমাকে কার সাধনা করতে হবে আর কেন করতে হবে, আমি এটা চাই, এটারই সাধনা আমাকে এভাবে করতে হবে। চাওয়াটা কি? ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সাত্ত্বিক ভক্তের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ছাড়া অন্য কোন চাহিদা থাকে না। সাধ্য হল ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর সাধন হল শাস্ত্রবিধি, এর বাইরে সাত্ত্বিক ভক্ত কখনই যাবে না। সেইজন্য সাত্ত্বিক

ভক্ত জিনিসটাকে বুঝে চেষ্টা করে আর দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টাতে লেগে থাকে, কারণ সে জানে আমাকে ঈশ্বরের প্রেম পেতে হবে, একদিনে আমি ঈশ্বরের প্রেম পেয়ে যাব না, অনেক দিন আমাকে চেষ্টাতে লেগে থাকতে হবে। সাত্ত্বিক ভক্ত খুব ভালো করে জানে আমার যা কিছু সব ভেতরের ব্যাপার, সেইজন্য তার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর থাকে না। ঠাকুর তাই ঐ জায়গায় বলছেন, লোকেরা জানতেও পারে না যে তিনি ধ্যানজপ, পূজা অর্চনা করছেন, কারণ কোন আড়ম্বর থাকে না বলে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কিছু উপায় নেই। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে এগুলোকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে, ভাঙাচোরা বাড়ি থাকলেই যে সে সাত্ত্বিক হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। সাত্ত্বিক লোক হওয়া, যে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে পারে, খুব কঠিন। বেশির ভাগ লোকই হয় রাজসিক নয়তো তামসিক, সাত্ত্বিক লোক পাওয়াই যাবে না। ঠাকুর সেই দুখিনী ব্রাহ্মণীর বাড়িতে গেছেন, ব্রাহ্মণী আনন্দে পাগল হয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না যে কি করবেন। সাত্ত্বিক মানুষের ভালোবাসাটাই অন্য রকম, শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে ফল খাওয়াবেন, আগে নিজে খেয়ে দেখে নিচ্ছেন ফলটা মিষ্টি না টক, শ্রীরামচন্দ্রকে দেওয়া যাবে কিনা, এই হল সাত্ত্বিক ভালোবাসা। সাত্ত্বিক মানুষের মনের ভাবটাই অন্য রকম, আমি আপনার সেবা করছি, সেবাটা আপনার মত হচ্ছে কি হচ্ছে না। সত্যিকারের তাঁরা উদ্বিগ্ন থাকেন যাঁকে সেবা করছি তাঁর মনের মত হচ্ছে কিনা। সাত্ত্বিক সেবাই তাই, আপনি যেমনটি চান সেই রকমটি হল কিনা। রাজসিক সেবা মানে, আমার মত হল কি হল না, আমার অহঙ্কারের তুষ্টি হবে কিনা, মহারাজ আপনার জন্য কলকাতার সেরা মিষ্টির দোকান থেকে এই মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি। সেও সেবা করতে চাইছে, সেও ভালোবাসে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটাই আলাদা। সাত্ত্বিক ভাবে সেবা করা মানুষ খুব বিরল। এখানে কাউকে ছোট করা হচ্ছে না, এটা একটা টাইপ। কিছু লোক উন্নতি করতে করতে সাত্ত্বিক ভাবে সেবা করার ভাবটা তার মধ্যে এসে গেছে, বাকিরা এখনও হতে পারেনি। এগুলো দোষের কিছু নয়। একজন বড়লোক কিন্তু সাত্ত্বিক, ওনার বাড়িতে পরিচিত অপরিচিত কেউ যদি আসে সেখানে তাঁর একটা আপন ভাব থাকবে। কিন্তু হয়ত বেশি কিছু করবেন না, মনে হবে লোকটা কৃপণ। একেবারেই কৃপণ নন, ওনার হৃদয় ভালোবাসায় উপচে পড়ছে, কিন্তু হয় তিনি সেটাকে প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না বা হচ্ছে না। এই যে আমরা সাত্ত্বিক মানুষের কথা বলছি, প্রথমে বলা হল, ঠাকুরও বলছেন, বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, এখানে সেখানে পায়রার পায়খানা, মেরামতের দিকে নজর নেই। তাই বলে সবাই কি সাত্ত্বিক হবে? কখনই নয়, বরঞ্চ বেশির ভাগই তামসিক। একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে যাওয়া হল, বাড়ির মালিক খুব বিনয়ের সাথে আপ্যায়ন করে আন্তরিকতার সাথে খাতির যত্ন করল। বাড়ির মালিক সাত্ত্বিক না তামসিক একটা জায়গায় গিয়ে ধরা পড়ে যাবে, যখন কথাবার্তা বলবে। সাত্ত্বিক যদি হন তাহলে তিনি খুব উচ্চমানের কথা বলবেন, তামসিক লোক হলে খুব সাধারণ স্তরের কথাবার্তা করবে।

গৌণী ভক্তি *ত্রিধা গুণভেদাৎ* আলোচনা আমরা করলাম। এরপর বলছেন *আর্তাদি ভেদাৎ*। গীতাতেও ভগবান তিন রকমের ভক্তের কথা বলছেন, আর্ত, অর্থার্তি ও জিজ্ঞাসু। মানুষ যখন খুব কষ্টে পড়ে, এমন কোন একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে যে ওখান থেকে আর বেরোতে পারছে না, এর খুব ভালো উদাহরণ হল অর্জুন, যদিও বিষাদযোগ বলা হয় কিন্তু ঠিক ঠিক বললে ওটা আর্তযোগ হয়। *শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নাম্*, আমি আপনার পায়ে পড়লাম আপনি আমাকে রক্ষা করুন, অর্জুন এখানে আর্ত হয়ে গেছে, আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার পায়ে পড়লাম। আর হল *অর্থার্তি*, তার মধ্যে কোন কিছুর চাহিদা আছে, যেমন ধ্রুব সে রাজ্য চাইছে। জিজ্ঞাসু, তার মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। এখানে একটা সংজ্ঞা আছে, এনারা বলেন গৌণা ভক্তির মধ্যে তিনটে impelling force চলে, যেটা গৌণা ভক্তিকে চালাচ্ছে। প্রথমটা হল sense of sin, পাপবোধ বা কোন ধরণের দোষ বোধ, দ্বিতীয় sense of misery, দুঃখ বোধ বা শোক আর তৃতীয় sense of error অজ্ঞান বোধ। মনে রাখতে হবে এগুলো ব্যক্তি স্তরে যারা সাধারণ সাধক তাদেরও হয় আর যারা উচ্চমানের সাধক তাঁদেরও হয়। সেইজন্য এই তিনটে কোথাও যেন মিলেমিশে যায়।

আর্তের ক্ষেত্রে বলছেন, শোক দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসার যে ইচ্ছা এটাকেই বলছেন আর্ত। কোন ভাবে তার মধ্যে মারাত্মক শোক এসে গেছে বা আছে, অথবা পাপবোধও থাকতে পারে, সে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অর্থার্তির ক্ষেত্রে একটা অপূর্ণতার বোধ থাকে, এরা এই পৃথিবীতেই একটা উচ্চতর

কোন ক্ষমতা চাইছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সূরথ ঠিক ঠিক অর্থার্তি, সে সাম্রাজ্য চাইছে। অন্য দিকে জহুদিদের যত প্রফেটরা আছেন তাঁরাও এই দিকেই আছেন। জহুদিরা আজ থেকে চার হাজার বছর আগে ছোট ছোট আদিবাসীদের গোষ্টিতে বিভক্ত হয়ে থাকত। প্রফেটদের নাকি ভগবান বললেন, তোমরা আমার সাথে চুক্তি কর, আমাকে ছাড়া তোমরা অন্য কোন ভগবানের উপাসনা করবে না, বদলে আমি তোমাদের promised land দেব। সেখান থেকে পর পর যত প্রফেট হয়েছন, প্রফেট বলতে আমরা যে অর্থে অবতার বলি সেই অর্থে ওদের অবতার নেই, কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চমানের ধর্মীয় নেতা তাঁদের সবারই ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা ভগবানের সঙ্গে চুক্তি করছেন, হে প্রভু! আমি তোমাকে এটা দিলাম বদলে আমি যেন এটা পাই। জহুদি আর আমাদের মধ্যে তফাৎ হল, ওদের ক্ষেত্রে ভগবান সেই চুক্তিটা করেন, সেইজন্য প্রফেট শব্দটা বলা হচ্ছে। ভগবান প্রফেট বা দেবদূতের মাধ্যমে বললেন, তুমি যদি আমার জন্য এই রকমটি কর, বদলে আমি তোমার জন্য এই রকমটি করে দেব। যেমন মোজেসের সময় জহুদিরা সবাই ক্রীতদাস ছিল, মোজেস যখন প্রফেট ছিলেন তখন ভগবান এসে মোজেসকে বললেন, তুমি যদি এই রকমটি কর তাহলে আমি ওদের সবাইকে ক্রীতাদাস থেকে বার করে নিয়ে আসব। মোজেস গিয়ে নিজের লোকেদের বললেন, ভগবানও ওদের দাসত্ব থেকে বার করে এনেছেন। এই নিয়ে আবার ইতিহাসে অনেক রকম মত এসে গেছে, কেন দাসত্ব প্রথা শেষ হয়ে গেল, সত্যিই কি মোজেসের ক্ষমতা ছিল নাকি ভগবান করিয়েছেন, বা কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, রাজা ফারাও কেন ওদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন, এটাই ইতিহাসের বিরাট একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে গেছে।

মূল কথা হল, জহুদিদের বিশ্বাস ভগবান মোজেসের সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন, সেই চুক্তি অনুযায়ী যদি এরা Ten Commandments পালন করে, Ten Commandments মানে মূলতঃ দশটা নীতি, তার মধ্যে যেমন তুমি মিথ্যা কথা বলবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, অপরের স্ত্রীকে অধিকার করবে না, এই ধরণের কতকগুলো মূল্যবোধ, এই কথাগুলো যদি তোমরা পালন কর তাহলে তোমাদের আমি দাসত্ব থেকে বার করে আনব। আমাদের ক্ষেত্রে এসে ব্যাপারটা পুরো উল্টো হয়ে যায়। আমরাই ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করি, আমি তোমাকে এই পাঁচ টাকার সন্দেশ দিলাম আর এর বদলে আমার ছেলের যেন চাকরি হয়ে যায়। পাঁচ টাকার সন্দেশের বিনিময়ে ভগবানের কাছে ছেলের চাকরি চাওয়াটা যেন কেমন খেলো হয়ে যায়। কিন্তু মূল ব্যাপারটা ওটাই, আমাদের স্তরে আমরা যে ফুল, ধূপ, মিষ্টি নিয়ে ঠাকুরের পূজা করছি আর বলছি, হে ঠাকুর, আমার যেন এই এই হয়ে যায়, সেটাও একই জিনিস। ঠাকুর বলছেন, মথুরবাবু এখানে সেখানে গোলমাল করে আসত কিন্তু কি বিশ্বাস আমাকে দিয়ে মায়ের কাছে অর্ঘ্য দেওয়াবে। মথুরবাবুর বিশ্বাস, ঠাকুর যদি আমার হয়ে অর্ঘ্য দেন তাহলে মা কথা শুনবেন। এই যে অর্থার্তির কথা বলছেন, একটা নিম্ন স্তরের অর্থার্তি যারা মানত করছে, আমার এই রকম হোক, আরেকটা উচ্চস্তরের অর্থার্তি যেখানে আমরা সূরথ রাজার কাহিনী পাই বা অসুররা, এর সাথে জহুদিদের প্রফেটরাও, এটাকে আমরা ধর্মের দিক থেকে দেখছি, কারণ সূরথ রাজার কাহিনী আমরা চণ্ডীতে নিয়মিত পাঠ করছি, পুরো জহুদিদের ধর্ম এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয় হল জিজ্ঞাসু, যাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে এই জগতের পেছনে সত্যটা কি। উপনিষদে যেমন বলছেন *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনাশ্চেতনানাম্*, নিত্য অনিত্য ও চেতন অচেতনের পেছনে সত্যটা কি, জিজ্ঞাসু মানে তার মনে এটাকে জানার ইচ্ছে জেগেছে। এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত উপনিষদের ঋষিরা। আর্তের খুব ভালো উদাহরণ অর্জুন বা ভগবান বুদ্ধ, ভগবান বুদ্ধ নিজেও আর্ত, তাঁর নিজের শোক নেই কিন্তু চারিদিকে যখন অপরের শোক দেখছেন সেই শোক যেন তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করছে, ওখান থেকে তিনি বেরোতে চাইছেন, একটা পথ বার করতে হবে। যদি গৌণা ভক্তিকে বিভেদ করতে হয় তাহলে এই তিনটে ভেদ হয়ে যায়, একটা গুণের দিক থেকে তিনটে ভেদ আরেকটা আর্ত, অর্থার্তি আর জিজ্ঞাসু এই তিনটেতে। খুব সাধারণ স্তরেও তাই আর উচ্চমানের স্তরেও তাই। যেখানেই আমরা ভক্ত দেখছি, পরে যিনি সিদ্ধি পেয়ে গেছেন, ওনারা যখন শুরু করেন, কোথাও না কোথাও এই তিনটে শ্রেনীর মধ্যে তাঁদের ফেলে দেওয়া যায় – সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অন্য দিকে আর্ত, অর্থার্তি আর জিজ্ঞাসু। মুশকিল হল ঐ একটা শ্রেনীতেই যে থাকছেন তা না, যেমন ঠাকুর শুরু করেছিলেন জিজ্ঞাসু রূপে, কিন্তু কিছু দিন পর একেবারে পাগলের মত বলছেন মা দেখা দে, আর্ত হয়ে গেছেন। শ্রেনীটা পাল্টাতেও পারে, যদিও খুব বিরল। পরের সূত্রে গিয়ে বলছেন –

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি।।৫৭।।

পরে পরে যত ভক্তি আছে তার থেকে আগের আগের ভক্তি তত শ্রেষ্ঠ। আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, যাঁরা সূত্রকার তাঁরা বিভিন্ন ভাবে ভক্তিকে দেখছেন, বিভিন্ন ভাবে দেখার পর ভক্তিকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেনীবিন্যাস করছেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে এগুলো দেখা উচিত নয় যে কোন ভক্তি নিম্ন আর কোন ভক্তি উচ্চ। যার জন্য আমরা প্রথমেই গীতার *সুকৃতিম্* শব্দটা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। যাঁরাই এই পথে এসেছেন তাঁরাই *সুকৃতিম্*। এখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ নাকি মহম্মদ শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে আমরা কোন কথা বলতে পারি না। এনাদের নিয়ে একবার যদি প্রশ্ন করা শুরু হয় এরপর আমাদের পায়ের তলায় আর জমি থাকবে না, কারণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই ধরণের উচ্চ মহাত্মাদের অবলম্বন করে। আমরা এখানে science of devotion or science of love, এই বিজ্ঞানকে নিয়ে আলোচনা করছি। প্রেমের বিজ্ঞানকে নিয়ে যখন আলোচনা করতে হয় তখন তার বিভিন্ন দিক গুলোকে নিয়েই আলোচনা করা হয়। কিন্তু ঐ বিজ্ঞানকে আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে এর সব কিছুতে নেমে গেলে, এটা শ্রেষ্ঠ নাকি ওটা শ্রেষ্ঠ, তখনই সমস্যা এসে যায়। ঠাকুরের কথা মত তখন বেণে বুদ্ধি এসে যায়, বেণেদের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে হিসাব করার মত হয়ে যায়। এই সূত্রটা এমনই একটা সূত্র যে দেখে মনে হয় এর আলোচনা করা আমাদের পক্ষে ঠিক নয়। কিন্তু যেহেতু এনারা বলছেন সেইহেতু কিছু তো বলতে হয়। এই সূত্রের আক্ষরিক অর্থ হল, আগের আগের ভক্তি শ্রেয়, সেখান থেকে ধীরে ধীরে পরের দিকে ভক্তিটা নামতে থাকে। ভাষ্যকাররা শ্রেয় বলতে বলছেন, মুখ্যা ভক্তি শ্রেষ্ঠতম কারণ এই মুখ্যা ভক্তি পরা ভক্তির দিকে নিয়ে যায়। যেহেতু এখানে গৌণা ভক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন সেইহেতু এনারা পরা ভক্তিকে ঠিক ভক্তির মধ্যে আনছেন না, পরা ভক্তি একটা অবস্থা। বলছেন সাত্ত্বিক ভক্তি মুখ্যা ভক্তির কাছে, অর্থাৎ মুখ্যা ভক্তির নীচে সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক ভক্তির নীচে রাজসিক ভক্তি আর তার নীচে তামসিক ভক্তি। আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, এনারা আর্ত ভক্তিকে মুখ্যা ভক্তির কাছে বলছেন, আর্ত ভক্তির পরেই আসে জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসুর পরে আসছে অর্থার্তি। একদিকে মুখ্যা ভক্তি শ্রেয়, গুণের দিক দিয়ে মুখ্যা ভক্তির নীচে সাত্ত্বিক, তার নীচে রাজসিক আর সবার নীচে তামসিক, অন্য দিকে মুখ্যা ভক্তির নীচেই আসে আর্তি, আর্তির নীচে জিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসুর নীচে অর্থার্তি। ভাষ্যকাররা এইভাবে বলার পর বলছেন, এরা সবাই মুখ্যা ভক্তিতে নিয়ে যায় আর মুখ্যা ভক্তি শেষে প্রেমা ভক্তিতে নিয়ে যায়।

আমাদের মত মানুষরা যখন সাধনা করতে শুরু করে, সাধনা করতে করতে মন তমোগুণ থেকে রজোগুণে যায় আর রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে যায়। প্রথমের দিকে আমাদের কারুরই জপধ্যান, তপস্যায় মন কিছুতেই যেতে চায় না। কারণ প্রথমে সবারই মন তামসিকে থাকে। কিছু দিন ধরে করতে করতে মনের মধ্যে একটা দেখানোর ভাব এসে যায়, তখন ওটা রাজসিক। আর রাজসিক থেকে যখন সাত্ত্বিকে যায় তখন পুরোটাই ভেতরের ব্যাপার হয়ে গেল। এবার আর্তকে নিয়ে যে আলোচনা চলছে খুবই উচ্চস্তরের আলোচনা চলছে। বলছেন ভক্তিতে যে আর্ত হয়ে গেল এবার কিন্তু তার ছুঁই ছুঁই অবস্থা। কি রকম আর্ত, যেমন ভগবান বুদ্ধ, সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। অর্জুন ভগবানকে বলছেন, আমি আপনার পায়ে পড়ে গেলাম, আমি আর পারছি না। ঠাকুরের আর্তনাদ, মা এবার তুই যদি দেখা না দিস আমার গলাটাই এই খড়্গ দিয়ে কেটে দেব। এটাকে যদি আমরা সাত্ত্বিকের সাথে মেলাতে যায় তাহলে মিলবে না। আর্তকে বলছেন শ্রেয় কারণ সে পাগলের মত হয়ে গেছে, আমার না পেলে চলবে না। জিজ্ঞাসুতে যাঁরা আছেন, উপনিষদের ঋষিরা বা ঠাকুর যখন প্রথমের দিকে শুরু করছেন, এনাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় খুব খাটেন আবার অনেক সময় খাটেন না। ঠাকুর বলছেন ঋষিরা কত খাটতেন, কিন্তু ওনারাও জিজ্ঞাসু জানতে চাইছেন। জগতের দিকে অতটা মন নেই। অর্থার্তি সব থেকে নীচে।

এবার এই আলোচনাকে আমরা মনে রাখছি না। কিন্তু আমরা যে আলোচনা করেছি সেদিক থেকে যদি শ্রেনীবিন্যাস করা হয়, তাহলে ভগবান বুদ্ধের মত যাঁরা তাঁর হলেন শ্রেষ্ঠতম, উপনিষদের ঋষিরা সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরে আসছেন আর জিউস প্রফেট, মহম্মদ এনারা আরও নীচে। কিন্তু জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তখন আর এভাবে তফাৎ করা যায় না। তবে হ্যাঁ এক একজন এক একটা পথ নিয়েছিলেন, ঠাকুরও বলছেন মত পথ। আবার বলছেন এই পথও আছে সেই পথও আছে। তবে আমরা জহুদিদের প্রফেটদের সাধনার ইতিহাস জানি না, ভগবান যীশুর সাধনার কথাও বিস্তারিত ভাবে জানা নেই। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সাধনার কথা আমরা জানি,

শেষ অবস্থাই উনি একেবারে স্থির সঙ্কল্প হয়ে বোধিবৃক্ষের তলায় উপবেশন করছেন আর বলছেন, এবার হয় আমি মরব নয় ধর্ম সাধন করে সিদ্ধি লাভ করব। এটাই আর্তের পরাকাষ্ঠা। আর্তের ঐ পরাকাষ্ঠায় যদি না যায় জ্ঞান কিন্তু হয় না। যার জন্য দেখা যায় যারা অর্থার্তি, জিজ্ঞাসু তাদের একটা শান্ত ভাব থাকে। আসলে সূত্রটাই একটু জটিল। তামসিক ভক্তিকে ঠাকুর বলছেন ডাকাত পড়ার মত, মারো কাটো। তাই বলে কি তামসিক ভক্তিতে জ্ঞান হবে না? যদি এই সূত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় এনারা বলবেন, তামসিক ভক্তি কোন না কোন দিন রাজসিক ভক্তিতে পাকবে। কিন্তু সেটা হওয়ার কথা নয়, এই কারণেই, তামসিক মনটা রাজসিক মন হবে, রাজসিক মনটা সাত্ত্বিক মন হবে। কিন্তু তামসিক ভক্তি যদি হয়ে থাকে সে সেখান থেকেই পেতে পারে, বিভিন্ন সাধকদের জীবনে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই যেখানে তাঁরা পেয়েছেন।

এরপর বলছেন, মুখ্যা ভক্তিতে যখন যায় তখন আমি আর আমার ইষ্টের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে, এই ব্যবধানটা তখন একটা sense of misery রূপে আসে। Sense of error দিয়ে শুরু করছেন, জিনিসটার কিছু গোলমাল আছে, জিনিসটা পরিষ্কার হচ্ছে না, সেখান থেকেই কিন্তু sense of miseryর দিকে, আর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে, আমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে। এই সূত্র বা ভক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে বিচার করলে এই জিনিস গুলো আসে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য পথে যাঁরা আছেন, জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে যাঁরা আছেন তাঁরা এগুলোকে কোন দিনই মানবেন না। অন্যান্য ধর্মেও যাঁরা আছেন তাঁরাও এগুলো মানবেন না। গীতাতে তাই খুব পরিষ্কার করে ভগবান একটা শব্দে বলে দিচ্ছেন, যার কথা এর আগেও আমরা অনেকবার উল্লেখ করেছি, তা হল সুকৃতি। ভক্তিতে যাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন এনারা সবাই ধন্য, কৃতকৃত্যবান, এদের সবারই সুকৃতি আছে। তাই এভাবে শ্রেনীবিন্যাস করে এনাদের নিয়ে আলোচনা হয় না। যেহেতু এটাও একটা শাস্ত্র, একটা system দাঁড়িয়ে আছে, তাই এনারা এখানে বলছেন। একটা জিনিস যেটা হয়, অল্প একটু আমরা যা বুঝি, মোজেস আদি প্রফেটদের জীবন বা ঠাকুরের বা ভগবান বুদ্ধের যে জীবন, সেখানে কোথাও একটা আর্তের ভেদ আছে। খ্রীশ্চানদের মরমীয়া সাধকরাও বলেন ইষ্টের সাথে ব্যবধানের ফলে একটা যে ছটফটানির ভাব, এই ভাবটাই তাঁকে আর্ত করে দেয়।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।।৫৮।।

বলছেন, অপরা ভক্তি অন্যান্য সাধন পথের তুলনায় সহজে পাওয়া যায়, উপলব্ধি করা যায় আর চেনাও যায় সহজে। সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির যে আলোচনা করে আসছি সেগুলো খুবই উচ্চ অবস্থার। উচ্চ অবস্থার তত্ত্ব আমরা যতই বলি না কেন, সবাইকে ধরাতলে একটু নামতেই হয়। এতক্ষণ পরা ভক্তির আলোচনা করতে করতে অপরা ভক্তিতে এসেছেন, যে ভক্তি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব। এর আগে যে দুটো সূত্র পার করা হল, বা ঠিক এর আগে যে বিষয়কে নিয়ে আলোচনা চলছিল, সবটাই ছিল অপরা ভক্তিকে নিয়ে, গৌণা ভক্তির কথা বলা হল, যেখানে চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা কিন্তু পূজা উপাচারের চেষ্টা না, পরিবারের পরম্পরাতে যে ভক্তির অনুশীলন করছে ওটাও এর কাছে কিছুই না। বলছেন, এই ভক্তি সহজে অনুশীলন করা যায়। এর কারণ হল, প্রেম জিনিসটা কি, প্রেমের ধারণা সবারই আছে। একেবারে ছোট যে বাচ্চা সে মাকে তখনও ভালোবাসে না, কিন্তু মাকে তার দরকার, ধীরে ধীরে ভালোবাসাটা বাড়তে থাকে। একটু যেই বড় হয়ে নিজের খেলনা পায় তখন সে খেলনাকেই বেশি ভালোবাসে, কিন্তু তখনও মায়ের উপর তার নির্ভরতা থাকে। বাল্যাবস্থা থেকে ধীরে ধীরে যখন বৃদ্ধাবস্থায় চলে যাচ্ছে তখন তার নাতি-নাতনীদের উপর কত ভালোবাসা, আর যৌবনেও নানা রকম ভাবে ভালোবাসাটা পাল্টাতে থাকে, একটা বয়সে চাকরিকে ভালোবাসে, কাজ ভালোবাসে, কোন মেয়েকে ভালোবাসে। যারা কামী পুরুষ তারা বিভিন্ন রকমের কাম্য বস্তুকে ভালোবাসে। যারই ভালোবাসার একটা ধারণা আছে, সে বিষয়ী পুরুষই হোক, নীচ লোকই হোক, কামী পুরুষই হোক সে যদি এই ভালোবাসাকে একটু মোড় ঘুরিয়ে দেয় সেও কিন্তু ভক্তির দিকে যেতে পারবে। এটাই এই সূত্রের মূল বক্তব্য। পরা ভক্তি সবার দ্বারা সম্ভব নয়, প্রচুর খাটতে হয়। কিন্তু অপরা ভক্তি *সৌলভ্যং*, সুলভ, সহজেই লাভ করা যায়। কারণ একটাই, সবারই ভেতরে ভালোবাসা জিনিসটা আছে, সেইজন্য যে কোন লোক যদি ভক্তির দিকে যেতে চায় সে এই ভালোবাসাকে মোড় ঘুরিয়ে এদিকে চলে আসতে পারে। কেউ যদি টাকা-পয়সাকে খুব ভালোবাসে তাকে আমরা বলছি কৃপণ, একটা ছেলে যখন একটা মেয়ের পেছনে দৌড়ায় তখন তাকে বলছি কামী, আবার সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসাকে বলছি আসক্তি,

এই ভালোবাসাই যখন সে চেষ্টা করে ভগবানের দিকে দিয়ে দেয়, তখন এটাই হয়ে যায় ভক্তি, এছাড়া আর কিছুই না।

সৌলভ্যং এখানে দুটো অর্থে বলছেন, একটা অর্থ এই ভক্তি সহজে অনুশীলন করা যায়, কিন্তু তার থেকেও যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ, তা হল এই ভক্তিকে বুঝতে পারা যায়। ভক্তি যে বাড়ছে এটা বোঝা যায়। পরা ভক্তিতে বোঝা যায় না, পরা ভক্তির নাম করে লোককে বোকা বানানো যায়, জ্ঞানী পুরুষরাও বোকা বানিয়ে দিতে পারে। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক একটা বই লিখেছেন, সেখানে তিনি বলছেন, তিনি সত্য কথায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঈশ্বর জ্ঞান পেয়েছেন। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তিনি কি পাব্লিশারদের কাছে গিয়ে বই ছাপাতে যাবেন? আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে এই কথা বলা খুব সহজ। এই যে ভদ্রলোক বলছেন, সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে ওনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, এটা কি তিনি সত্যি বলছেন না মিথ্যা বলছেন? উনি নিজের তরফ থেকে সত্যি বলছেন, ওনার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। কিন্তু এখানে counter checkingএর কোন উপায় নেই। Counter checking আছে, ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীর আরেকটা লক্ষণ হল, কাছে কোন বই থাকে না। জ্ঞানীর অনেকগুলো লক্ষণ বলছেন, তার মধ্যে একটা লক্ষণ তাঁর কাছে কোন বই থাকে না। আবার বলছেন, জ্ঞানীর লক্ষণ হল কুণ্ডলীনি জাগরণ। সে তো সবাই বলে দিতে পারে আমার কুণ্ডলীনি জাগরণ হয়ে গেছে। একজন বাবাজী আছেন তিনি সবাইকে বলেন যে আমি তিন দিনে কুণ্ডলীনি জাগিয়ে দেব। পরে সেই বাবাজী ধরা পড়লেন, তিনি একটা চেয়ারে ব্যাটারি দিয়ে তারের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক কানেকশান করে রাখতেন। কেউ বসার কিছুক্ষণ পর ওটা অন্ করে দিতেন, তার ভেতরে যে ইলেক্ট্রিক চার্জ ফ্লো করত তাতে সে মনে করত কুণ্ডলীনি জাগরণ হচ্ছে। মানুষকে বোকা বানাবার অনেক উপায় আছে। কিন্তু counter checking করা একটু কঠিন, কারণ ঠাকুরের কথাগুলোকে টেনে ওখানে লাগাতে গিয়ে একটাতে ফেললে দেখা যাবে কিছু বাহ্যিক, কিছু ভেতরের জিনিস ছিটকে যাচ্ছে। কিন্তু অপরা ভক্তি, যার আলোচনা চলছে, এটাতে ধরা পড়ে যায়। কেন *সৌলভ্যং* হয় এটাকে নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার। জিনিসটা এমন কিছু জটিল নয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটা প্রশ্ন আমাদের সবারই মনে জাগে। মানুষ পাপ কেন করে? বা প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও কেন পাপ করে? এমন অনেক কিছুই আমরা করি, যা করার পর দুঃখ হয়, অনুতাপ হয়, আমরা বলি আর কোন দিন করব না। কিন্তু আবার করি। এই টপিকটা সরাসরি এই সূত্রের সাথে সম্পর্ক আছে। মানুষের জগৎ পুরোপুরি দুটো আলাদা জগৎ - একটা মনের জগৎ আরেকটা বহির্জগৎ। আমরা বহির্জগতকে প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে থাকি, আমাদের ট্রেনিংও সেইভাবে হয়। সত্যিই তো বাইরের জগৎ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্ব পাওয়ার কথা, যেখানে চাকরি, টাকা-পয়সা, ভোগ সব কিছু ছড়িয়ে আছে। ট্রেনিংএ আমাদের এভাবেই বলা হয়, মা-বাবা বড়রাও ছোটবেলা থেকে তাই শেখান, স্কুল কলেজেও তাই শেখান হয়, সমাজ তাই শেখায় এবং সবাই তাই প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাস্তবে যে কোন মানুষের জন্য তার মনের জগতটা হাজার হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এটাকে কেউ অনুভব করে না, বোঝে না, জানে না। এই পয়েন্টটাকে যদি কেউ বুঝে নিতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতার অনেক কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মূল হল, জগৎ দুটি, মনের জগৎ আর বহির্জগৎ, আর মনের জগৎ এবং বহির্জগতের সিংহদ্বার হল আমাদের এই স্থূল শরীর, শরীরের পেছনে অন্তর্জগৎ, শরীরের বাইরে বহির্জগৎ। আমাদের সবারই ছোটবেলা থেকে পুরো ট্রেনিংটা হল, বাইরের জগৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ, ব্যবহার তার মত করবে, কাউকে কষ্ট দেবে না, দুঃখ দেবে না, ভদ্র ব্যবহার করবে ইত্যাদি। আশ্চর্যের এটাই যে, মনের জগতকে নিয়ে কোন আলোচনাই কখন হয় না। আর আজ পর্যন্ত কেউ শেখায়ওনি। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ব্যতিক্রমহীন ভাবে, ভগবান যীশুরও তাই, ঠাকুরেরও তাই, আমার আপনারও তাই, ক্রিমিনালেরও তাই, একজন ভিখারীরও তাই, তার মনের জগতটা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ওটাই আসল, ওটাই সব কিছু। তার বাইরে কারুর কাছে কিছু থাকে না। ফলে একটা conflict situation দাঁড়ায়, মনের জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে যে একটা synchronization থাকবে, সেটা থাকে না। কারুর কারুর থাকে, যাদের থাকে তারা ভদ্রলোক। আমরা যাদের একেবারে নিখাদ ভদ্রলোক বলে জানি, যেমন বৃটিশরা ছিল, কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক ভদ্রলোক বলা খুব মুশকিল, আলোচনা করতে করতে বোঝা যাবে।

মনের জগতেই সব কিছু আছে। আমি এই ঘরের সবাইকে দেখছি, সবাই আমার মনের জগতেও আছে। আমার বাবা-মা, আমার গুরু আর বেদের সময়কার ঋষিদের থেকে শুরু করে শঙ্করাচার্য, শঙ্করাচার্য থেকে শুরু করে ঠাকুর, স্বামীজী, মা সবাই আমার মনের জগতে আছেন। তার সাথে সন্ত্রাসবাদীরা যারা শত শত লোককে মেরে যাচ্ছে, তারাও আছে, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এনারাও সবাই আছেন। এখানে আমাদের মাঝে মাঝে একটু কল্পনা করতে হবে, নিজেকে ভাবতে হবে, তবে গিয়ে ভালো বোঝা যাবে। এবার আমরা কল্পনা করছি, এই পুরো জগৎ, শুধু এখনকার এই জগৎ নয়, ভগবান থেকে শুরু করে যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই পুরো জগতটা মিনিয়েচার ফর্মে আছে। মনের জগতে থাকার জন্য আমরা যে কোন জায়গায় তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারি, আমাদের ট্রাভেলিংটাই ইনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এটা কোন আইডিয়া বা থিয়োরী কিছু না, এটাই বাস্তবিক, এই রকমই হয়। অন্তর্জগতের নিয়ম-কানুন পুরো আলাদা, বহির্জগতের সাথে কোন মিল নেই। সেখানে আমি একজনকে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটা হল all important, আমি একজনকে পছন্দ করি না, তাকে পছন্দ করছি না। বহির্জগতে কিন্তু এটা নাও হতে পারে। যেমন একটা বাচ্চা ছেলে মনের জগতে একজন শিক্ষককে অপছন্দ করে কিন্তু বহির্জগতে শিক্ষককে গুডমর্নিং স্যার, নমস্কার স্যার করতে হচ্ছে। ফলে মনের জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে একটা বিবাদ লেগে থাকে। একটা তিন বছরের বাচ্চা ছেলের এখনও ট্রেনিং হয়নি, যেটা ওর পছন্দের নয়, মনের জগতের উপরে গিয়ে ও বলে দেবে আমি এটা করব না বা কাউকে দেখে বাবা-মাকে বলবে, ওই তো সেই লোকটা যার নামে তোমরা গালাগাল দাও, মা-বাবাকে বেইজ্জত করে ছেড়ে দেবে। কারণ মনের জগৎ আর বহির্জগৎ আলাদা, দুটোর যে গতিবিধি, দুটোর যে নিয়ম পুরো আলাদা এই ব্যাপারে এখনও সে ট্রেনিং পায়নি। আমরা এখন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি যার জন্য যেখানে যাকে পছন্দ করি সেখানে এক রকম চলি, যেখানে যাকে অপছন্দ করি সেখানে অন্য রকম চলি। মনের জগতে যে জিনিসের প্রতি আমরা যত বেশি সজাগ, যত বেশি সচেতন, সেই জিনিসটা আমাদের কাছে তত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের মনের জগতে সেই জিনিসরই গুরুত্ব আছে যেটার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে। আর বহির্জগতে ঠিক উল্টোটা হয়।

একটা জিনিস দিয়েই আমরা বুঝতে পারব বহির্জগৎ আর মনের জগতে কত তফাৎ। যেমন একজন স্বামী-স্ত্রী, এক অপরকে দেখছে। দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। দিনরাত দেখছে, তাও বলছে, মাঝে মাঝে মনে হয় কেন যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হল। আমার বাড়ির সামনের দরজার একটা হাতল ভেঙে গেছে, রোজ দেখছি, দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যদি ওটাকে সারিয়ে দেওয়া হয়, বলবে এটা ভাঙা ছিল, সারানো হল কবে? কয়েকজন আছে খুব ডিস্টার্ব মাইণ্ডের, টিভি চালিয়ে ঘুমোয়, টিভিটা বন্ধ করে দিলে ঘুম ভেঙে যাবে। জিনিসটা আছে, কিন্তু ওর যে চেতনা সেটা তার কাছে জিরো হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি কত গাড়ি যাচ্ছে, হর্ণ বাজাচ্ছে, কত রকমের আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কোন আওয়াজই আমাদের স্পর্শ করে না, কারণ আমাদের মন ওখানে ঐ সময় ওটার ব্যাপারে ভোঁতা হয়ে যায়। তার মানে, বহির্জগতে যে জিনিসটাকে আমরা যত বেশি দেখব সেই জিনিসটা তত মনে থেকে হারিয়ে যায়। অন্তর্জগতে এর ঠিক বিপরীত হয়, যে জিনিসটাকে নিয়ে আমরা যত বেশি সচেতন, যেটাকে নিয়ে যত ভাবব, সেই জিনিসটা তত গুরুত্ব পেয়ে যায়। অন্তর্জগতে মনে মনে যার প্রতি যত রেগে থাকব তার প্রতি তত রাগটা বাড়বে। যদি কাউকে ভালোবাসি, যত তাকে অন্তর্জগতে ভালোবাসব তত তার প্রতি ভালোবাসাটা বাড়তে থাকবে। যে কোন জিনিস, ঈশ্বরকে নিয়ে যদি অন্তর্জগতে বেশি সচেতন হয়ে যাই ঈশ্বরের গুরুত্ব তত বেড়ে যায়। ভোগ্য বস্তুকে নিয়ে যদি বেশি চিন্তা ভাবনা করা হয়, গীতায় বলছেন *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*, ওই বস্তুর প্রতি আসক্তি এসে যাবে। অন্তর্জগতের কর্মবিধি পুরো আলাদা, বহির্জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অন্তর্জগতে আমার নিজস্ব একটা নৈতিকতা আছে, অন্তর্জগতে আমি হলাম রাজাধিরাজ, যেখানে বাকি সবাই আমার কাছে খড়কুটো, সবার সবার অন্তর্জগতে বাস্তবিক তাই হয়। কিন্তু বহির্জগতে তা হয় না।

আমরা যাকে মূল্যবোধ বলছি, ঐ মূল্যবোধ কাজ করে মনের জগতে, ওটাই যখন বহির্জগতে এসে প্রকাশ পায় তখন সেটাই হয়ে যায় নীতিশাস্ত্র, যদিও মূল্যবোধ আর নীতিশাস্ত্রকে একসঙ্গে মিলিয়ে বলা হয় কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। মূল্যবোধ হল যার যার ব্যক্তিগত, তার নিজস্ব। কেউ কেউ আছে যারা কারুর সাথে দুটো কথা বলার পরেই তাকে সে তার অন্তর্জগতের বাসিন্দা করে নেয়, সে হয়ে যাচ্ছে একেবারে তার

আপন, সেও যা তিনিও তাই এই বোধ হয়ে যায়। বহির্জগতে সে কিন্তু তার আপন নয়। আরও গুরুত্ব হল তার নিজস্ব অন্তর্জগত আছে, সেই অন্তর্জগতে তাঁকে একজন সন্ন্যাসী রূপে বা একজন আচার্য রূপে দেখছে। এখন সে তার অন্তর্জগতে তাঁকে এক করে নিয়েছেন, সুতরাং সেখানে তার সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়ে গেল মা ছেলের সম্পর্ক বা বন্ধুর সম্পর্ক। যার ফলে সে এবার তাঁর সাথে হাসি, মজা, ঠাট্টা করতে শুরু করে দিল, আপন বোধ হয়ে গেলে যা হয়। কিন্তু তাঁর সামনের লোকটির অন্তর্জগত তাকে আপন করে নেয়নি, সেইজন্য ওর সম্বন্ধে তাঁর একটা বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়, বিরক্ত বা রেগেও যেতে পারেন। এটাই সমস্যা হয়ে যায়।

আমার অন্তর্জগত এক রকম চলে, আপনার অন্তর্জগৎ আরেক রকম চলবে, অন্য দিকে বহির্জগৎ সবারই ক্ষেত্রে এক রকম চলে। হাওড়া থেকে যে ট্রেন বর্ধমান যাবে, সেই ট্রেন সবারই জন্য একই টাইমে ছাড়বে, কিন্তু অন্তর্জগতের টাইম সমান চলে না। একটা ছেলে আর মেয়ে লুকিয়ে প্রেম করার জন্য হাওড়া স্টেশনে বর্ধমান লোকালে উঠেছে, ছেলেটি বুঝতেই পারবে না কখন বর্ধমান এসে গেছে, মেয়েটি বলছে, হ্যাঁগো! বর্ধমান তো এসে গেছে! অন্তর্জগতের সময় পুরো আলাদা গতিতে চলছে। বহির্জগতের টাইম ঘড়ির কাঁটার মত চলে। এখন যখন পাপের বা দোষের ব্যাপার আসে তখন ঠিক তাই হয়। অন্তর্জগতে সে ঠিক করে নিয়েছে আমার কাছে এটাই ঠিক, এটাই আমার মূল্যবোধ। যেমন, একজন লোক খুব কষ্টে আছে, সে দেখছে আমার কাছে আমার সন্তানরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ওদের জন্য আমাকে খাওয়া ব্যবস্থা করতে হবে। সে এখন বাইরের জগতে চুরি চামারি করে, লোককে বোকা বানিয়ে যে করেই হোক খাবার নিয়ে আসবে, তাতে তার কোন পাপ বোধ হবে না। সে বলবে আমি আপৎ ধর্ম পালন করছি। একজনের খুব বিরাট বড় সঙ্কট হয়ে গেছে, তারা খুব উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের, ছেলেকে খুব শখ করে বড় করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করছে। ছেলেটি একটা মেয়েকে ক্লাশ সেভেন থেকে ভালোবেসে আসছে, মেয়েটি আবার নীচু জাতের। ছেলেটির বাড়ির লোকেরা এই ব্যাপারটা তাদের পরিচিত এক সন্ন্যাসীকে বললেন। সন্ন্যাসী শুনে বলছেন ‘আজকালকার দিনে তিনবার করে যেখানে সম্পর্ক ভেঙে যায় সেখানে এত বছর ধরে সম্পর্ককে ধরে রেখেছে, ঠিকই তো আছে। বিয়ের জন্য আপনারা এগিয়ে যান’। পরের দিন আবার ফোন করে বাবা-মা খুব দুঃখ করে বলছে ‘ছেলে বলছে কোর্ট ম্যারেজ করবে’। ‘খুব ভালো কথা, হয়ে গেছে যখন তখন কি আর করার আছে’। কিন্তু আসলে তা নয়, কোর্ট ম্যারেজ করবে, বিয়ের কোন অনুষ্ঠান হবে না, কোন বরযাত্রী হবে না, ওখানেই টাউন হলে একটা রিসেপশান হবে, মা-বাবাকে নিয়ে মোট পঞ্চাশ জন আসতে পারে। শুনে সবাই থ হয়ে গেছে এটা কি করে করছে! তখন বলছেন, মেয়েটি বলছে আমি রিচুয়ালসে বিশ্বাস করি না। সন্ন্যাসী শুনে খেপে আগুন হয়ে গেছেন, বাবা-মাকে বলে দিলেন ‘আপনারা দুজনকে ফোন করে বলে দিন, তোমাদের সাথে এখানেই সম্পর্ক শেষ’। কারণ বিয়ে মানেই হয় একটা সামাজিক স্বীকৃতি, বিয়ে মানেই সামাজিকতা। এরা যেভাবে কষ্ট করে ছেলেকে বড় করেছে, এদেরও কিছু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আছে যারা এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যাদের আমন্ত্রণ করা হবে, যারা আশা করছে আমাকে সম্মানিত করা হবে, আমরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার সুযোগ পাব। ছেলেটি মেয়ের পাল্লায় পরে গেছে মেয়েটি এখন তাকে নাচাচ্ছে। এখানে এক রকম হল, এরা না হয় ভালো মানুষ বলে মেনে নেবে, একটা দুঃখ পাবে কান্নাকাটি করবে।

এবার একটা খুব গোঁড়া পরিবারের কথা ভাবুন। ভুবনেশ্বরে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, আন্তর্জাগতিক ক্ষেত্রেও তাঁর নাম আছে। তাঁর একটিই মেয়ে, একাধারে বিদুষী আবার খুব রূপসী। হঠাৎ একদিন বাবাকে এসে বলছে, বাবা আমি একজন মুসলমানকে বিয়ে করছি। ভদ্রলোক থ হয়ে গেলেন, মা কাঁদতে শুরু করেছে। বাবা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন কিনা, তিনি ধৈর্য ধরে বলছেন, ঠিক আছে তুমি বিয়ে করতে চাইছ কর, কিন্তু আর এই বাড়িতে কোন দিন তুমি আসবে না। বলেই মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মেয়েকে কোন দিনই আর ঢুকতে দিলেন না। মেয়েটি পরে একজনকে খুব দুঃখ করে বলছিল, আমি বিয়ে করে নিলাম, স্বামী আমাকে খুবই ভালোবাসে, দুটি সন্তান হয়েছে, গাড়ি বাড়ি সবই আছে কিন্তু বাবা মার আর মুখ দেখতে পারলাম না, বুঝতে পারছি না, ঠিক করলাম নাকি ভুল করলাম। ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মেয়েটির অন্তর্জগতে তার বাবা আছে, মা আছে, বাবা-মার সাথে তার সম্পর্ক আছে। সে তার অন্তর্জগতে আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলেছে, বহির্জগৎ সেটাকে অনুমোদন করছে না। ওদিকে যিনি পণ্ডিত, তাঁরও অন্তর্জগৎ আছে। তিনি খুব রক্ষণশীল পরিবারের, মেয়েকে বলছে, তুমি যে এক বিধর্মীর সাথে অসবর্ণ বিয়ে

করছ, তাতে আমার যে আন্তরিক জগৎ সেখানে তো আমরা মরে গেলাম। তোমার জন্য যে পাঁচজন লোক মারা যাবে, যেখানে আমি মরব, আমার ভাইরা মরবে, তার থেকে বহির্জগতে যদি তুমি মরে যাও তাহলে পাঁচজন বেঁচে যাবে। এই জায়গাতে এসে আমাদের বিচার ব্যবস্থা এগুলোকে বোঝেও না, মানেও না। এই ব্যাপারে আমরা কোন মন্তব্য করতে যাচ্ছি না, শুধু জিনিসটা বাস্তবিক কি হয় সেটাকে বলছি। যারাই এই ধরণের অসবর্ণ বিয়ে করে, বিধর্মীকে বিয়ে করে পালিয়ে যাচ্ছে সব জায়গাতে কিন্তু একই জিনিস ঘটছে। এর যে অন্তর্জগতের কার্যধারা আর তার সঙ্গে যারা আছে তাদের যে অন্তর্জগতের কার্যধারা এই দুটো মেলে না।

কিছু লোকের কাছে তার অন্তর্জগতের কার্যধারা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। অন্তর্জগতের কার্যাবলী যদি গুরুত্ব পেয়ে যায়, বিভিন্ন কারণে ভেতরে প্রচুর ভালোবাসা জমে যাচ্ছে, প্রচুর ভালোবাসা জমে গেলে সে তখন ঐ ভালোবাসা কোন একটা জায়গায় গিয়ে ঢালবে বা কাম, ক্রোধ প্রচুর জমে যাচ্ছে, মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে লোকটা রেগে আছে। কেউ যদি জানতে চায় কি হয়েছে, সে বলবে না। একজন লোক খুব রেগেমেগে বাড়ি ফিরেছে, আসলে অফিসে বসের কাছে খুব গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। বহির্জগতের কার্যাবলী ওকে একটা ধাক্কা মারল তাতে অন্তর্জগতের যে কার্যাবলী, তার ক্রোধ, কল্পনা করুন ওর যে অন্তর্জগৎ সেটা একটা মরুভূমি, সেখানে কিছু ছিল না দুম করে হঠাৎ একটা বিষবৃক্ষ দাঁড়িয়ে গেল। একজন লোক হঠাৎ করে রেগে গেছে, তার রাগকে যদি বুঝতে হয় তখন এভাবেই বুঝতে হয়, কিছু ছিল না দুম করে একটা গাছ বেরিয়ে গেল বা শান্ত সমুদ্র ছিল দুম করে একটা ঢেউ উঠে গেল। এখন ঐ গাছকে উপড়ে ফেলতে হবে। উপড়ে ফেলার দুটি পথ – একটা হল ভেতরেই একটা কিছু করতে হবে যাতে গাছটা উপড়ে যায়। আর তা নাহলে বহির্জগতের কার্যাবলীর সাহায্য নিয়ে ওটাকে শেষ করে দিতে হবে। কারণ অন্তর আর বহির্জগৎ পুরো আলাদা আলাদা হলেও সংযোগ রয়েছে। তখন কি হয়? যে বস তাকে গালিগালাজ করেছিল তাকে কিছু করতে পারবে না, বাড়িতে আসার পর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছে, তোমার কি হয়েছে, তুমি ওরকম কেন করে আছ? ঐ শুনে স্ত্রীকে এমন এক ধমক দিতে শুরু করবে, পুরো যে বিষ জমেছিল সবটা স্ত্রী উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এবার সে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। যাঁরা খুব উচ্চস্তরের তাঁরা বহির্জগতের ঢেউকে ভেতরে কোন প্রভাব ফেলতে দেন না। পাপের ক্ষেত্রে কি হয়, তার অন্তর্জগতের যে কার্যধারা সেটা সম্পূর্ণ নিজের মত চলে, বহির্জগতের সাথে ওটা একেবারেই মিলবে না।

বহির্জগতে যেগুলো পাপ বলে পরিচিত, সেগুলো যখন অন্তর্জগতকে আক্রমণ করে, সে তখন নিজেকে কখনই দোষী বলে মনে করবে না। মহাবীর হনুমান সীতার খোঁজে রাবণের রাজমহলে গেলেন, সেখানে রাবণের সব স্ত্রীরা ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে আছে, কারুরই কাপড়-চোপড় ঠিক নেই। সীতার খোঁজ করার জন্য মেয়েগুলোকে দেখতে দেখতে হঠাৎ হনুমানের মনে হল, অপরের স্ত্রীদের আমি এই অবস্থায় দেখছি যেখানে ওদের কোন কিছুরই ঠিক নেই, ব্রহ্মচারী রূপে এটা আমার গর্হিত কর্ম হয়ে গেছে। তারপরই তাঁর মনে হল, আমার মনে তো কোন বিকার আসেনি, তাহলে আমি কোন দোষ করিনি। বহির্জগতে এটা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, রাবণ যদি দেখে ফেলত হনুমানকে বলত, তুমি লুকিয়ে আমার স্ত্রীদের এই অবস্থায় দেখলে, এত বড় পাপ তুমি করেছ, আমি তোমাকে আর বেঁচে থাকতে দেব না। হনুমান এবার তাঁর অন্তর্জগতের কার্যনীতি নিয়ে এসে বলছে, আমার মধ্যে তো বিকার আসেনি, আমি কোন দোষই করিনি। বাচ্চারাও ঠিক তাই করে, সে ভাবে খেলাতে দোষের কি আছে, শচীন তেণ্ডুলকারও খেলছে, খেলে তাঁর এত নাম, আমি খেললে দোষের কি আছে। মা তখন বাচ্চাকে এক চড় মারল, বাচ্চা ভয়ে বলছে, আর কোন দিন করব না। কিন্তু ওর অন্তর্জগতে যে কার্যাবলী ওখানে কোন পরিবর্তন নেই, সে জানে আমিই ঠিক, তাই আবার ওটাই করে। ও জানে এখানে আমি কোন দোষ করিনি, আমি দোষ করিনি কিন্তু তোমাকে খুশী রাখার জন্য, তোমাকে যাতে বকাবকি না করতে হয় তাই আমি খেলব না।

এখানে এসে ঠাকুরের অনেক কিছু পরিষ্কার হয়। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে যাচ্ছেন, বার বার দেখছেন জামার বোতাম ঠিক মত লাগানো আছে কিনা। মাস্টারমশাইকেও জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁগো জামাটা ঠিক আছে কিনা। ঠাকুরের যে অন্তর্জগৎ সেখানে জামা, জামার বোতাম কোনটারই দাম নেই। কিন্তু তিনি নিজেই বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, নিজে থেকেই যাচ্ছেন। ঠাকুর এখন জানতে চাইছেন বিদ্যাসাগরের ওখানে সামাজিক কার্যাবলীটা কি রকম। ঠাকুর এগুলোতে অভ্যস্ত নন, সেইজন্য একবার চাদরটা

দেখছেন, বোতাম ঠিকমত লাগানো আছে কিনা দেখছেন। তেমনি ঠাকুর একবার কলকাতায় গেছেন, গাড়ি থেকে নামার সময় ভাবসমাধিতে চলে গেছেন। একজন তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে ধরতে গেছেন, ঠাকুর তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন, আমাকে ধরবে না, লোকে মনে করবে মাতাল। প্রথমবার এই জায়গাটা পড়লে অনেকের মনে হতে পারে, ঠাকুর লোকে কি ভাববে এই নিয়ে এত উদ্বিগ্ন কেন হচ্ছেন! লোকের ভাবাভাবি নিয়ে ঠাকুর একটুও উদ্বিগ্ন হচ্ছেন না। ঠাকুর হলেন অন্তর্জগতের মানুষ, সেই জগতে জামা, কাপড়, সাজগোজ, বাবু সাজার কোন দাম নেই। কিন্তু তিনি যখন বহির্জগতের মানুষের কাছে যাচ্ছেন তখন প্রাণপন চেষ্টা করছেন, আমি তোমার মতই থাকব, তোমার মতই হব। ঠাকুর চাইছেন, আমি যখন কলকাতায় ঘুরছি তখন এদের মতই যেন থাকি, সেইজন্য বলছেন, আমাকে ধরবে না, লোকেরা মনে করবে মাতাল। কিন্তু নিজের লোকের সাথে যখন থাকছেন তখন অন্য রকম। দক্ষিণেশ্বরে তিনি নিজের ঘরে শুয়ে আছেন, কাপড়টা আলগা হয়ে আছে। যেই শুনলেন গঙ্গায় বান এসেছে, তিনি কাপড় ছাড়াই দৌড়। ফিরে এসে বলছেন, তোমার কাপড় পড়ার জন্য বান দাঁড়িয়ে থাকবে! একজন মহিলার বাড়িতে খেতে বসে ঠাকুর বলছেন, আগে আমার কাপড়-চোপড়ের ঠিক থাকত না, এখন আর অতটা হয় না। সেটা শুনে মহিলা হাসছেন, ঐ কথা বলতে বলতেই কখন উনি কাপড় খুলে বগলে নিয়ে নিয়েছেন হুঁশই নেই। মহিলা আবার বলছেন, বাবা! আপনাকে ওসব ভাবতে হবে না। দু-তিন বছরের বাচ্চাকে খুব ভালো জামা-প্যান্ট পড়িয়ে কোন পার্টিতে গেছে বাবা-মা। সেখানে বাচ্চা আনন্দ করছে, বন্ধুদের সাথে হুটোপাটি করছে, করতে করতে কখন যে তার গায়ের জাম খুলে ফেলেছে কারুর খেয়ালই নেই। এটা ওর অন্তর্জগত নয়, অন্তর্জগতে তার এগুলো কিছুই না। বাবা-মা বলেছে সেজে থাকতে হবে, কিছুক্ষণ থাকছে। কিন্তু এরপরে ও পারবে না। পরে আবার যখন বলা হবে সেদিন তুমি ওরকম করেছিলে, ও ক্ষমা চাইবে, সবই করবে তার সাথে পাঁচটা প্রশ্নও করবে, কেন এতে দোষের কি আছে ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও কখনই ওর অন্তর্জগতের ডায়নামিক্সকে বহির্জগতের ডায়নামিক্সের সাথে মেলাতে পারবে না।

বাচ্চাদের যে ছোটবেলা থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, ভদ্র সভ্য হওয়া ইত্যাদি, সেখানে এটাই বলা হয়, অন্তর্জগতে তুমি যাই থাক কিন্তু বহির্জগতে যখন যাবে তখন তোমার ব্যবহারটা যেন এই রকম থাকে। কিন্তু যখনই অন্তর্জগতে ঢুকে আসে তখনই তার ডায়নামিক্স গোলমেলে হতে শুরু হয়ে যায়। যাঁরা বিখ্যাত কবি, চিত্রকর তাঁদের সবারই এই অবস্থা হয়। বিখ্যাত কবি শেলীর বাড়িতে একদিন পার্টি হবে, সব বড় বড় ভিআইপি অতিথিরা আসবেন। শেলী সমুদ্রে স্নান করে ঘরে এসেছেন। সবাই পার্টিতে জড়ো হয়ে আছে, শেলীর স্ত্রীও সেখানে কাজে ব্যস্ত। ওর মধ্যেই শেলী পুরো উলঙ্গ অবস্থায় এসে স্ত্রীকে ডেকে বলছেন, I cannot find my suit, where it is। স্ত্রী বলে দিয়েছিল ঘরে তোমার স্যুট রাখা আছে ঐ স্যুট পরে পার্টিতে আসবে, স্ত্রী তাঁর খুব দেখাশোনা করতেন। ঘর ভর্তি ভিআইপি অতিথি, ওনার হুঁশও নেই যে কিছু পড়া নেই। ওনার কাছে এটাই স্বাভাবিক, আমি আমার স্ত্রীর কাছে কাপড় চাইতে গেছি এতে দোষের কি আছে। লোকগুলো এখন বুঝতে পারছে না কি করবে, হাসবে, না লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। শেলীকে যদি বোঝান হত, আপনি এটা ঠিক করেননি, ওনার বুঝতে কিছুক্ষণ সময় লাগত। ভ্যান গগের কাহিনী সবাই জানেন, তিনি বিয়েথা করেননি, একটা মেয়ের কাছে যেতেন। মেয়েটা একদিন ভ্যাগ গগকে মিষ্টি করে বলছে, তোমার কানটা কি সুন্দর, চিরদিন যদি রাখতে পারতাম। ভ্যান গগ নিজের ঘরে চলে গিয়ে একটা বড় ছুরি নিয়ে একটা কান কেটে আলাদা করে ঐ রক্তারক্তি অবস্থায় মেয়েটির সামনে হাজির, তুমি আমার কান চেয়েছিলে এই নাও। মেয়েটি তো চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, লোকজন ছুটে এসেছে। ভ্যান গগ বাকী জীবন একটা কান নিয়েই কাটিয়েছেন। আমরা ভ্যান গগকে কি বলব? পাগল? একেবারেই না, ওর যে অন্তর্জগৎ, ঐ অন্তর্জগতে মেয়েটির বিরাট দাম। যাঁরা জীবনে খুব বড় হন তাঁদের বেশির ভাগই অন্তর্জগতের লোক, বহির্জগতের লোকেরাও বড় হয় কিন্তু এরা খুবই সাধারণ লোক। আসলে এই জগতটা চলে যাঁরা অন্তর্জগতে বিচরণ করেন তাঁদের দিয়ে। যখনই কেউ পাপ করল, বুঝতে হবে ওর অন্তর্জগতের পরিধি সম্পূর্ণ আলাদা। যাকে পাগল বলছি, কিসের পাগল, তারও পুরো প্যাটার্ন আছে, তার অন্তর্জগতে কেউ ঢুকুক, তাকে জিজ্ঞেস করলে পুরো প্যাটার্ন দেখিয়ে দেবে। কিন্তু বহির্জগতের প্যাটার্নের সাথে খাপ খাচ্ছে না। ছেলে আর মেয়ে হাত ধরে যাচ্ছে, আমরা বলছি অভদ্র, কিন্তু তাদের অন্তর্জগৎ অন্য ভাবে চলছে, যেটা বহির্জগতে এসে আমাদের কাছে ফিট করছে না।

মানুষ যখন ভক্তিশাস্ত্রে এসে ঢোকে, ভক্তি করতে চাইছে তখন এই অন্তর্জগতের গুরুত্ব এত বেড়ে যায় যে বহির্জগতের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়ে যায়। কেউ অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে নাকি এখনও বহির্জগতে ঘুর ঘুর করছে এটা ধরা পড়ে যায়। কিভাবে ধরা পড়ে? *সৌলভ্যং*। ঠাকুর বলছেন, আমি বাবু টাবু সাজতে পারব না। অন্তর্জগতে ঢুকে গেছেন, আর বাবু সাজতে পারা যাবে না। আরেকজনকে বলছেন, আমি তোমাকে রাজাটাজা বলতে পারব না। কারণ ঠাকুরের অন্তর্জগতে রাজার কোন স্থান নেই। তাহলে মানুষের দিক থেকে ঠাকুরের অন্তর্জগতে কে রাজা? সে যেইই হোক যে ঈশ্বরের ভক্তিতে ডুবে আছে। ঠাকুর নিজেই বলছেন, ভক্তের গাজাখোঁড়ের স্বভাব, গাঁজাখোড় গাঁজাখোড়কে দেখলে কোলাকুলি করে, অপরকে দেখলে পালিয়ে যায়। তাই ঈশ্বরের ভক্তিতে যে আছে ঠাকুরের অন্তর্জগতে তার দাম আছে, বাকিদের কোন দাম নেই।

অন্তর্জগৎ সবারই আছে। জীবনে যদি কোথাও কোন কষ্ট থাকে, ব্যাথা বেদনা থাকে, তাহলে দেখা যাবে তার যে অন্তর্জগৎ রয়েছে, যে চিন্তার জগৎ আছে, সে যেভাবে মানুষকে দেখছে, তার মূল্যবোধের কাঠামোটা যেমন, সেটা অন্য ভাবে চলছে। মীরাবাঈ বলছেন কৃষ্ণই আমার স্বামী, মীরাবাঈয়ের সাথে যার বিবাহ হয়েছে মীরাবাঈয়ের অন্তর্জগতে তার কোন স্থানই নেই। মনে করুন একটা ঘর, সেই ঘরে শুধু মীরাবাঈ আছে। ঐ ঘরে মীরাবাঈ কাকে আলিঙ্গন করবে? শ্রীকৃষ্ণকেই করবেন। স্বামীকে কেন করবেন না? কারণ স্বামী তো ঐ ঘরে ঢুকতেই পারছে না। ঢুকলে তবে না আলিঙ্গন করবে, কিন্তু স্বামী ঢুকতেই পারছে না। রাজা এসে জোর করে যদি মীরাবাঈকে আলিঙ্গন করে? করতেই পারে, রাজার তাঁর শরীরকেই আলিঙ্গন করছে, মীরাবাঈকে থোরাই আলিঙ্গন করতে পারছে।

মানুষ আত্মহত্যা কেন করে? যাকে সে ভালোবাসত সেই তার অন্তর্জগতের রাজা বা রানী, তাকে নিয়েই সব কিছু চলছে। সেটাই উপড়ে গেল, ঐ উপড়ানোর সাথে তার অস্তিত্বটাই পুরোপুরি চলে গেল, সেখানেই সে মরে গেছে, এখন দেহের নাশে কোন গুরুত্ব নেই। ডিভোর্সের ক্ষেত্রেও আরও মজার ব্যাপার হয়। আগে মনের জগতেই ডিভোর্স হয়ে যায়। এমনিতে সাধারণ ভাবে একজন স্ত্রীর মনের জগতে তার স্বামী আছে, ঐ দুজন এক অপরকে ধরে আছে, তাদের ঝগড়াঝাটি সবই হচ্ছে মনের জগতে কিন্তু এক অপরকে ধরে আছে। সেইজন্য মজা করে বলা হয়, স্বামী স্ত্রী দিনে যতই ঝগড়া করুক রাত্রে এক। মনের জগতে এদের মারামারি, ঝগড়া নেই। সারাটা দিন ঝগড়া করে যাচ্ছে, এই ঝগড়ার কোন দাম নেই। কথায় বলে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ভোরের মেঘের গর্জন, ছাগলের লড়াইয়ের ভ্যা ভ্যা আওয়াজ আর ব্রাহ্মণ ভোজের হৈচৈ এগুলোর কোন দাম নেই। মনের জগতে যদি মারামারি হয়ে যায় এবার কিন্তু ডিভোর্সের দিকে এগোবে।

আরকে নারায়ণের একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে যার নাম A Tiger for Malgudi, স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা সার্কাস চালায়, সারাটা দিন দুজনে ঝগড়া করতে থাকে। তারপর এমন হয়ে গেল যে, মালিককে কিভাবে সার্কাসের বাঘটা খেয়ে ফেলেছে। সেদিন ওর স্ত্রী সার্কাসে রোপের উপর খেলা দেখাচ্ছে, এমন খেলা দেখাচ্ছে যে কেউ কোন দিন দেখেনি। করতে করতে যখন একেবারে খেলার তুঙ্গে চলে গেছে তখন হঠাৎ সে দড়িটা ছেড়ে দিল, মাটিতে আছড়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। কাহিনীটার যে বাঘ তার স্বামীকে মেরে ফেলেছিল সেই সব ঘটনা বর্ণনা করছে। বাঘটা শেষে বলছে, সার্কাসে আসার পর থেকে সারা জীবন দেখলাম এরা দুজন ঝগড়াই করছে, কিন্তু যেদিন ব্যাটাকে মেরে দিলাম সেই দিনই স্ত্রী খেলা দেখাতে দেখাতে মারা গেল। মানে, ওদের বহির্জগতের ডায়নামিক এক রকম ছিল কিন্তু অন্তর্জগতের যে ডায়নামিক, যেটার আসল গুরুত্ব, সেটা অন্য রকম হয়ে গেল। জীবন কখনই বহির্জগতের কার্যাবলী দিয়ে চলে না, চলে অন্তর্জগতের কার্যাবলী দিয়ে। অন্তর্জগতের কার্যাবলীকে লোকেরা গ্রহণ না করতে পারে, বাইরেরটা দেখে লোকে তাকে পাপী, লোভী অনেক কিছু বলতে পারে, লোকে তাকে বলতে পারে এর দ্বারা কিছু হবে না কারণ সে একই জিনিস করে যাচ্ছে। তা নয়, ওর অন্তর্জগৎ অন্য ভাবে চলছে, সেই অন্তর্জগতের চিন্তাধারা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমরা জানতেও পারব না।

অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করছেন, *অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ*। এই যে অন্তর্জগতের কার্যাবলী এগুলো কোথা থেকে আসছে বা এই বহির্জগতের যে কার্যাবলী এগুলো কোথা থেকে আসছে? মজার ব্যাপার হল দুটোই আসছে ঋতম্ থেকে, ঈশ্বরের বিধান থেকেই দুটো আসছে। মনু বাবা যে আইন দিয়ে

গেছেন, ভারতীয় সংবিধান যে আইন দিয়েছে, আল্লা যেটা বলে দিয়েছেন, পুরোপুরি সেটা থেকে হয় না। তারও যে মৌলিক, একেবারে মূলে যিনি সেই ভগবানের যে কিছু কিছু আইন আছে সেই আইনে মানুষ চলে। মানুষের কিছু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলোর জন্য অন্তর্জগতের আইনগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যায়। মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে যা ঈশ্বরের ঋতমের মত চলে না। বহির্জগতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। আইন সবই আসে ভগবান থেকে, মনু বাবা যা কিছু আইন দিয়ে গেছেন, সেগুলোকেই বর্তমান সংবিধানে এনারা নিয়ে এলেন আর তাঁরাই আজ সংবিধানে একটার পর একটা সংশোধন বিল নিয়ে আসছেন। সেটাকেই বিচারকরা নিজের মত ব্যাখ্যা করে রায় দিচ্ছেন। কাম, ক্রোধ তাকেও বিকৃত করে দিচ্ছে আর এই কাম ক্রোধ মনের জগতকেও তার সাথে বিকৃত করে দেয়। যার ফলে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের এই যে বিভাজন এটা বিরাট হয়ে যায়, প্রত্যেকটি লোকের জন্য বিরাট হয়ে যায়। যাঁরা সাধুপুরুষ, যাঁরা ভক্তিমান লোক তাঁরা বলেন, বহির্জগতে যাই হোক আমাকে আমার অন্তর্জগতকে ঠিক করতে হবে। অন্তর্জগৎ ঠিক করা মানে, কাম, ক্রোধ, লোভের জন্য আমার অন্তর্জগতে কিছু জিনিসের গুরুত্ব বেশি হয়ে গেছে, যে জিনিসগুলোর গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেগুলোর গুরুত্ব নেই, এটাকে এখন মেরামত করতে হবে। কিভাবে সারাই হবে? সে এখন চেষ্টা করতে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে ধরে ধরে ঐ জিনিসগুলোকে ঠিক করে নেয়। এনাদের বহির্জগৎ আর কোন দিনই ঠিক হবে না, যেমন আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রে দেখছি। এদিকে ত্রৈলঙ্গস্বামী কোন কিছুই গ্রাহ্য করছেন না, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর, স্বামীজীরা সমাজ ও দেশের ভালো করতে চাইছেন, মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসতে চাইছেন, সেইজন্য তাদের মত হয়েই এনাদেরও থাকতে হচ্ছে। তাদের মত থাকতে গিয়ে কাপড়, জামা, এটা সেটা সব কিছুই এসে যায়।

ভক্তিশাস্ত্রেও ঠিক তাই হয়। বহির্জগতেরও একটা গুরুত্ব থাকে, কারণ সেখান থেকে আমরা নিজেদের ধারণ করে রাখার শক্তির যোগান পাচ্ছি, বহির্জগতের প্রতিও সবার দায়ীত্ব আছে। কিন্তু ভক্তিতে এসে ঐ গুরুত্বটা আর থাকে না যে গুরুত্বটা আগে ছিল। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, তখন জগতকে পাতকুয়া মনে হয় আর নিজের সম্বন্ধীদের কালসাপ মনে হয়। অন্তর্জগতের আইন, তার যত কার্যাবলী আছে, সব ধীরে ধীরে এমন পরিবর্তিত হতে শুরু হয় যে, জীবন তখন একটা নতুন দিকে মোড় নেয়। এবার ভক্তি ধীরে ধীরে শুরু হবে, ভক্তি যখন আসা আরম্ভ করে তখন এই ভক্তিকে কিন্তু বোঝা যায়। এই লোকটা ভক্ত, ভক্তির দিকে এগোচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে কিনা বোঝা যায়। *সৌলভ্যং*, সহজ ভাবেই বোঝা যায়।

ভক্তিতে যখন মানুষ প্রবেশ করে তখন তার একটা লক্ষণ হল, যেটা ঠাকুরও বলছেন, কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসে তখন একটু হলেও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ যদি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মন ঈশ্বরেতে চলে যাবে। এটা তৎকাল, যে সময়টাতে কথা চলছে ঐ সময়টাতেই যাবে। ঠাকুর বলছেন, তবে কি জান, এই ভাব তখনই হয় যখন জগৎ থেকে তার মন সরে গিয়ে থাকে। ঠাকুর শুকনো দেশলাইয়ের উপমা দিচ্ছেন, যেন শুকনো দেশলাই একটু ঘষলেই আগুন জ্বলে যায়। এটা হল প্রথম লক্ষণ।

আরেকটা যে লক্ষণ এটা সবারই হয় না, সামান্য কয়েকজনরই হয়। ঠাকুর বলছেন তোমার হৃদয় যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে আর মন থেকে জগতের সব কিছুর আকর্ষণ চলে যাবে তখনই তোমার প্রার্থনা গুলো ভগবানের কাছে পৌঁছাবে, তার আগে পর্যন্ত কোন প্রার্থনাই পৌঁছাবে না। খুব তাৎপর্যময়, ঠাকুর বলছেন, মন থেকে যখন সব কামনা-বাসনা গুলো খসে যায়, জগতের প্রতি আকর্ষণ চলে যায় তখন কিন্তু তোমার প্রার্থনা ঈশ্বর পর্যন্ত যায়। তাহলে প্রশ্ন করতে পারি, বাচ্চা ছেলে যখন ঠাকুরের কাছে মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করছে, হে ঠাকুর! পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, হে ঠাকুর! মাস্টারের যেন অসুখ হয়ে যায়, আমরা যখন প্রার্থনা করছি আমার ছেলেমেয়ের ভালো হোক, সব প্রার্থনা কি ঠাকুরের কাছে পৌঁছাবে না? কখনই যাবে না, কারণ এর মধ্যে কামনা-বাসনা জড়িয়ে আছে। হৃদয় মন পবিত্র হয়ে গেলে প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে শুরু হয়। আর তার পরিবর্তে তিনি কি করেন? আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তার মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতার ভাব তৈরী করে দেন, মনের মধ্যে একটা ছটফটানির ভাব এনে দেন। যখন দেখা যাবে কারুর মধ্যে ঈশ্বরের জন্য ছটফটানির ভাব এসেছে, বুঝতে হবে তার উপর ঈশ্বরের কৃপা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়, কারণ অনেক সময় আবেগবশতও এই ধরণের একটা ছটফটানি হয়। সেইজন্য একটা দিয়ে বিচার করলে হবে না, পর পর সবটাকে দিয়ে মিলিয়েই বিচার করতে হয়। সবটা না মেলানো পর্যন্ত বোঝা যাবে না যে, তার

মধ্যে ভক্তি এসেছে কিনা। কিন্তু ভক্তিতে তিনি এগোচ্ছেন কিনা বোঝা যায়, যখন হৃদয় মন পবিত্র হয়ে গেল, হৃদয় পবিত্র হয়ে গেলে মানুষ কি চাইবে, ঠাকুর আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, এবার এই প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে চলে যাবে। ঠাকুর তখন একটা জিনিস করে দেন, তার মনের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য একটা ছটফটানি তৈরী করে দেন।

ঈশ্বরের জন্য মনের মধ্যে ছটফটানি শুরু হলে বুঝতে হবে এবার সে ভক্তির দিকে এগোচ্ছে। এখন সে আবেগের বশে ছটফট করছে নাকি সত্যিকারের ঈশ্বরের জন্য ছটফট করছে, তখন একটি লক্ষণ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে না, বাকি সব লক্ষণ গুলোকে দিয়ে বিচার করতে হবে। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্ব হল যেটা ঠাকুর বলছেন, হৃদয় পবিত্র আর মনের আসক্তির নাশ। ওর জাগতিক কোন চাহিদা আছে কিনা, জাগতিক কোন চাহিদা যদি থাকে তাহলে ওটা আবেগের জন্য হচ্ছে। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হল, এই পথে সে কতদিন অনুশীলন করে যাচ্ছে। ঠাকুর নিজেই বারো বছর ধরে সাধনা করেছেন, অন্যান্য সাধকরা কেউ কেউ সাত আট বছর করেছেন, কিন্তু সবাই ষোল আনা মন দিয়ে সাধনা করেছিলেন। আমার আপনার এক আনা মন, আমাদের সময় আরও অনেক বেশি লাগবে। আজকে দীক্ষা নিয়ে তিন মাস পর থেকেই মন ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে, বুঝবেন ও কিছু না, ওটা কয়েকদিনের ব্যাপার, কিছু দিন পর দমে যাবে। এই কথাগুলো শুনতে খুবই কড়া লাগে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। সত্যিকারের যা দেওয়ার ঠাকুরই দেন। ঠাকুরই মানুষকে অজ্ঞানে রেখে দেন, ঠাকুরই চান এর মুক্তির সময় হয়ে এসেছে একে একটু ছটফটানিটা দিতে হবে। কার মুক্তির সময় হয়েছে? কথামৃতের পাতায় পাতায় এর উত্তর ঠাকুর দিচ্ছেন। জগতের যে নানা রকমের লীলাবিলাস চলছে এর থেকে মন যখন বিরক্ত হয়ে যায় তখন মুখ থেকে চুষনিটা ফেলে দেয়, ফেলে দিয়ে মাকে ডাকে। বাচ্চা তখন সত্যিই মা ছাড়া আর কিছু চাইছে না। ঠিক তেমনি যখন কেউ বলে, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না, তখন তিনি তার ভেতরে ব্যাকুলতাটা ঢেলে দেন।

একজন মহারাজ একবার খুব নামকরা একটা ঘটনার কথা বলছিলেন। রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের একটা বই আছে, বইটি আধ্যাত্মিকতার একটা দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ে লেখা। বইটির যে মত, ঐ মত নিয়ে অনেক অশান্তি আছে। ঠিক মত ট্রেনিং না থাকলে মনের মধ্যে অনেক রকম সংশয় তৈরী হয়ে যাবে। অনেকে বইটিকে নিয়ে অনেক রকম আপত্তি করে। একদিকে কিন্তু বইটা খুব কাজে দেবে যদি পাঠক আধ্যাত্মিকতায় খুব পরিপক্ক হয়ে থাকেন। তবে কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ আর স্বামীজীর রচনাবলী পড়া থাকলে আর কিছু পড়ার দরকার হয় না। কিন্তু ওর বর্ণনা এক কথায় চমকপ্রদ, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও ঐ রকম বর্ণনা নেই। যে মহারাজের কথা বলা হচ্ছে, তিনি ট্রেনিং সেন্টারে ছিলেন, সেই সময় প্রভু মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। ওনার ব্যাচেরই আরেক মহারাজের কাছে এই বইটা ছিল। আমরা যে মহারাজের কথা বলছি, তিনি বিভিন্ন মহারাজের কাছে যেতেন, তাঁদের সাথে কথা বলা, নোটস্ নেওয়া এগুলো করতেন, খুব উৎসাহ ছিল। হঠাৎ একদিন ওনার ব্যাচমেট তাঁকে ধরে খুব ধমক দিতে শুরু করেছেন 'এগুলো করার জন্য তুমি রামকৃষ্ণ মিশনে এলে! তুমি জানো তোমার সময় চলে যাচ্ছে? ঈশ্বরের দিকে একটুও তোমার মন যাচ্ছে না। তুমি জানো আমি রোজ সকালে ফুল তুলি, আমার তখন মনে হয় ঈশ্বর নিজেই যেন আমার হাত ধরে ফুলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, ঐ ফুল তুলে আমি ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তিনিই আমার হাত ধরে ঠাকুরের সামনে ফুল রাখছেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য সব সময় অনুশীলন কর। আমার ঈশ্বর চারিদিকে আছেন, তিনিই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন, তিনিই আমাকে দিয়ে হাত নাড়াচ্ছেন, তিনিই আমার ঘাড় নাড়াচ্ছেন, তিনিই আমার সামনে এই বইটা খুলে দিচ্ছেন। তুমি এগুলো না করে সারাদিন কি করে যাচ্ছ, এই করে তুমি তোমার সন্ন্যাস জীবনটাই নষ্ট করে দিচ্ছ, you are a retched person'।

এসব কথা শুনে তো এই মহারাজের মাথাটা পুরো খারাপ হয়ে গেল। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজদের কাছে যাওয়া, বড় মহারাজদের কাছে যাওয়া, তাঁদের কথা শুনে নোটস্ নেওয়া এগুলো সবটাই তাঁর কাছে কেমন হয়ে গেল আর ঈশ্বরের সান্নিধ্যের ভাবকে নিয়ে আসার জন্য খেতে বসে ভাবছেন ঠাকুরই আমার হাত ধরে ভাত-ডাল মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। মন খারাপ করে একদিন দৌড়ে দৌড়ে মঠের অধ্যক্ষ প্রভু মহারাজের কাছে গেছেন। প্রভু মহারাজ সেই সময় জ্বরে শয্যাশায়ী। উনি গিয়ে সেবককে বলছেন, আমাকে একটু মহারাজের সাথে দেখা করতে দিন। সেবক বললেন, মহারাজের এখন

শরীর অসুস্থ, এখন যাওয়া যাবে না। উনি তখন বলছেন আমি এখন question of my life and deathএর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। উনি খুলে আর কিছু বলছেন না ব্যাপারটা কি। সেবকরা আর কি করবে, সেবক গিয়ে প্রভু মহারাজকে গিয়ে বলেছেন, ট্রেনিং সেন্টারের এক ব্রহ্মচারী এসেছেন আপনার সাথে দেখা করার জন্য। প্রভু মহারাজের তখন ১০২/১০৩ জ্বর। মহারাজ তবুও বললেন, পাঠিয়ে দাও। মহারাজ গিয়ে বলতে শুরু করেছেন আমি এসব করছি এগুলো কি ভুল, উনি যতক্ষণে বলতে শুরু করেছেন ততক্ষণে প্রভু মহারাজ বলছেন, ওর মাথাটা খারাপ, ওর থেকে আগে দূরে সর তারপর আমি বলে দিচ্ছি। প্রভু মহারাজ তখন সেবককে ডেকে বলছেন, ও যে ব্রহ্মচারীর কথা বলছে ওর মাথাটা খারাপ, শিগ্‌গিরি ওকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এই মহারাজ তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তাঁর যেন প্রাণ ফিরে এল। পরবর্তি কালে তিনি ট্রাস্টির সদস্য হলেন, খুব বড় নামকরা মহারাজ। উনি পরে অনেককেই বলতেন, আজ পর্যন্ত আমি জানি না প্রভু মহারাজ কি করে জানলেন আমি তাঁকে কি বলতে এসেছি, কারণ আমি কাউকেই কিছু বলিনি, কেউ কিছু জানত না। এখানে চমৎকারিত্বের কথা আমরা বলতে চাইছি না, এই যে মহারাজের ব্যাচমেট যিনি দেখাতে চাইছেন, কিভাব ঠাকুর তাঁর হাত ধরে সব করাচ্ছেন, আর প্রভু মহারাজ এক কথায় বলে দিলেন, ওর মাথাটা খারাপ। আর পরে সত্যিই দেখা গেলে মাথাটা খারাপ, আর শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে চলে যেতে হল।

কেউ যদি এসে বলে আমার না অমুকের জন্য মনটা আটুপাটু করছে তাহলে বুঝবেন সে স্বাভাবিক, কিন্তু যদি কেউ এসে বলে ঠাকুরের জন্য আমার মনটা আটুপাটু করছে, তাকে বলে দিতে হবে, আপনি পাগলা গারদে যান। ঠাকুরের জীবনেই এই ঘটনা আছে, ঠাকুরের কাছে এক পাগলী দৌড়ে দৌড় আসত, ঠাকুর তো তার থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। এসে বলছে, তুমি আমাকে মন থেকে ঠেলে দিচ্ছ কেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, ওরে রামলাল এ যে দেখছি ঠেলাঠেলির ব্যাপার। প্রভু মহারাজের যে ঘটনা বলা হল, এই ঘটনা ঐ মহারাজের নিজের মুখে অনেকেই শুনেছেন। শুধু যদি কেউ শোনে ওনার মধ্যে ব্যাকুলতা এসেছে, উনি ছটফট করছেন, সেখান থেকে যদি বিচার করতে যাওয়া হয় তাহলে গোলমাল লেগে যাবে। বিচারের জন্য পুরো ছবিকে নিতে হয়, কতদিন ধরে তিনি এই পথে আছেন, কার কাছে ট্রেনিং নিচ্ছেন, কি কি ধরণের বই পড়েছেন, আরও অনেক কিছু দিয়ে বিচার করতে হয়। *সৌলভ্যং* যে বলছেন, বক্তব্য হল এগুলো বোঝা যায়। তাই বলে একটা জিনিস দেখেই রায় দিয়ে দেওয়া যায় না। যেমন যাঁরা নিয়মিত এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন তার মানে এই নয় যে তাঁরা সবাই বিরাট কিছু হয়ে গেছেন, কিন্তু এটা একটা লক্ষণ যে এদিকে আগ্রহ জেগেছে। যদিও দ্বিতীয় ধাপেই ব্যাকুলতার কথা বলা হল, কিন্তু ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা অত্যন্ত উচ্চমানের ভক্তিতে গিয়ে হয়। ঠাকুর বলছে, পবিত্র হৃদয় যাঁর, যিনি বলছেন জগতে ঈশ্বর বৈ আমার আর কিছু লাগবে না। আমাদেরও এই রকম হয়, জগতে খুব মারটার খাওয়ার পর আমরা বলি আমার আর কিছু লাগবে না, অর্জুন যেমন বলছেন, সব ছেড়ে আমি এবার ভিক্ষা করে খাব।

আরেকটা লক্ষণ হল, এটাও ঠাকুর বলছেন, সময়ের হুঁশ থাকে না। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। Time awarenessটা চলে যায়। আবার আমরা অন্তর্জগতের আলোচনায় ফেরত যাচ্ছি। এর আগে আমরা বলেছিলাম, যখন আমরা মনের মত কাজ করি তখন বুঝতেই পারি না সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর যখন কোন বিরক্তিকর বা একঘেঁয়েমির কাজ বা যে কাজটা মনের মত নয় তখন সময়টা আর কিছুতেই কাটতে চায় না। ভক্তের একটা লক্ষণ হল তাঁর সময়ের বোধ থাকে না, জপধ্যান পূজা অর্চনা করার সময় বুঝতেই পারে না তাঁর কতটা সময় চলে গেল। ঠাকুর বলছেন, যখন আমার এই ভাব এল তখন কোথা দিয়ে দিন আসছে রাত চলে যাচ্ছে বুঝতে পারতাম না। তার মানে মনের awareness of time যে awareness দিয়ে timeকে calculate করে, সেই awarenessকে টেনে নিয়েছে তাঁর সাধনা। সাধনাতে মন পুরো চলে গেছে বলে ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি যাকে আমরা পছন্দ করি, যেখানে আনন্দে পাই, তার মধ্যে যখন থাকি তখন ঘড়ির কাঁটাটা যেন ধীরে চলে নয়তো থেমে যায়। এক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর মনে হবে, এরই মধ্যে এক ঘন্টা হয়ে গেল! যেন ঘড়ির কাঁটাটা থেমে ছিল। তখন বহির্জগতে ঘড়ি দিয়ে সময়কে মিলিয়ে নেওয়া হয়। ঠাকুরের এই সমস্যা হচ্ছে, তিনি আরও যখন উচ্চ অবস্থায় যাচ্ছেন তখন তিনি বলছেন পূর্ণিমা অমবস্যার হুঁশ থাকছে না। জিজ্ঞেস করছেন আজকে পূর্ণিমা না অমবস্যা। সেটা অবশ্য অন্য

একটা কারণে, জাগতিক যে তিথি, বার, নক্ষত্র হয় সেগুলোর ব্যাপারে আর কোন হুঁশ থাকে না, এটা অনেক উচ্চ অবস্থার। কিন্তু আগে যেটা বলা সেটার বেশি গুরত্ব, সময়ের হুঁশ না থাকাটা প্রাথমিক স্তরে। এমনকি যারা ভালো গান বাজনা করে তাদেরও সময়ের কোন হুঁশ থাকে না। বড় বড় ডাক্তাররা যখন কোন অপারেশন করেন তখন তাঁদের মন ওতেই আটকে থাকে, তাদেরও সময়ের খেয়াল থাকে না। যে কোন জিনিস সে কত ভালো করছে, সত্যিকারের দক্ষতা কোন জায়গায় এটা বোঝা যায় যে জায়গাতে তার সময়ের হুঁশ থাকে না। যদি দেখা যায় জপধ্যান করতে গিয়ে, পূজা অর্চনা করার সময় হুঁশ থাকছে না, তখন বুঝবেন এবার সে ভক্তির পথে পা ফেলেছ।

আরেকটা লক্ষণ হল, ঈশ্বরীয় চিন্তা ভাবনাতেই তাঁর চেতনা সব সময় পড়ে থাকে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর অনেকের সাথে বসে আছেন, সেখানে একজন বললেন, নিশিদিন ব্রহ্মচিন্তা। শুনে ঠাকুর খুব হাল্কা করে পাশে যিনি বসে আছেন তাঁকে ইশারায় বলছেন, এটা যোগীর লক্ষণ। যোগীর লক্ষণ হল নিশিদিন ব্রহ্মচিন্তা, বা ঈশ্বর চিন্তা। ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে পরে আসবে। ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া কক্ষণ অন্য চিন্তা করতেই পারবেন না। প্রথমে এটা চেষ্টা করে করতে হয়, অনুশীলন করতে করতেই স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে যাবে। ঠাকুর তখন কৃষ্ণকিশোরের নামে বলছেন, কৃষ্ণকিশোরেরও শেষে এই অবস্থা হল, দরজা বন্ধ করে সারাদিন ওঁ ওঁ করত। এটাকেই আরও উচ্চ অবস্থায় টেনে নিয়ে বলছেন, রাধার মনে একটুতেই কৃষ্ণের ভাব জেগে যেত, আকাশে মেঘ দেখলে, কোন নীল রঙের কাপড় দেখল, রাধার মন সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণতে চলে গিয়ে কৃষ্ণময় হয়ে যেত। রাধা তখন ছটফট করতেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু হয়ে যেত। রাধার যে এই ব্যাকুলতা, সাংসারিক লোকেদের বিষয়ের জন্য যে ছটফটানি হয় এটা তা নয়, এটা অন্য ধরণের। এই ধরণের ব্যাকুলতা, ছটফটানি একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা করলেই হয়। ঈশ্বরের প্রতি যে ব্যাকুলতা এর রূপটাই আলাদা, যার এই ব্যাকুলতা হয় তার চেহারাতেই একটা অন্য ধরণের আনন্দের ভাব প্রস্ফুটিত হয়। চিন্তা, ছটফটানি দুটোতেই হয়, সাংসারিক ব্যাপারেও হয়, ঈশ্বরের ব্যাপারেও হয়। সাংসারিক ব্যাপারে হলে তাকে বলে stress, ঈশ্বরের ব্যাপারে হলে বলে ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা আর stressএর তফাৎ হল, stress যখন হয় তখন তার চোখে মুখে একটা বিকৃতির ছাপ ধরা পড়ে। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হলে তার চেহারায়, হাবভাবে একটা অন্য ধরণের আনন্দের ভাব দেখা যায়।

ঠাকুর একবার বলছেন, ওদেশে পাল্কি করে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক লাঠি নিয়ে আসছে, ভাবলাম ডাকাত তখন একবার হরিনাম নিচ্ছি, একবার রামনাম নিচ্ছি, কখন হনুমানের নাম নিচ্ছি, এটা কি হল বলে দেখি, আমার তো ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকল না। এগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া খুব কঠিন। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির যে অবস্থাত্রয়ের কথা আছে বা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের যে কথা আমরা শাস্ত্রে পাই, সেই অনুসারে বিচার করলে ঠাকুরের এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ঠাকুর কারণ অবস্থায় যখন থাকছেন তখন ঈশ্বরই সত্য এই ভাবটা সব থেকে জোরালো থাকছে। যেমন আমার সাথে কারুর যখন পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে তখন তার সাথে আমার ভালোবাসা থাকতে পারে আবার শত্রুতার সম্পর্কও থাকতে পারে। আমার মূল কথাবার্তা শুরু হবে আমার অন্তর্জগতকে নিয়েই। কথাবার্তা বলতে গেলেই বোঝা যায় যে এই লোকটা আমাকে একেবারেই পছন্দ করছে না। কিন্তু কথা বলতে বলতে ভুলে যায় যে সে আমাকে অপছন্দ করছে, তার ব্যবহারটাও পাল্টাতে থাকে। তার মানে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে এখন সে বাচ খেলছে। ঠাকুর বা যে কোন মহাপুরুষ যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে এনাদের স্থূল আর সূক্ষ্মের মধ্যে বাচ খেলবে না, ওনাদের বাচ খেলে কারণ আর স্থূলে, সূক্ষ্মটা ওনাদের একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে। যখন বেশিক্ষণ স্থূলে থেকে যাচ্ছেন ততক্ষণ কারণটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, এটাই হল ভাবমুখ। ভাবমুখ মানে কারণ শরীর আর স্থূল শরীরের মধ্যে বাচ খেলছেন। যদি পুরোপুরি কারণে থাকেন তখন আর ওটা ভাবরাজ্য থাকবে না, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, সমাধিতে ডুবে আছেন।

ঠাকুর যে বলছেন, আমার একি হল, আমার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস চলে গেল, বা নরেন এসে যা যা কথা বলছে তাতে ঠাকুরের সব বিশ্বাস উড়ে যাচ্ছে, মা কালীর কাছে দৌড়াচ্ছেন। ঠাকুরের বিশ্বাস একটুও যায়নি, একটু বেশিক্ষণ তিনি স্থূল জগতে থেকে গিয়েছিলেন, তাই স্থূল জগতের লোকেরা যেমন ব্যবহার করে উনিও ঠিক সেই রকম ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন। ঠাকুরের বাস্তবিক সত্তার জ্ঞান কখনই চলে যাবে না। যাঁরা কারণ শরীরে আছেন তাঁদের কিন্তু কোন দিন মুক্তি হবে না। কখন কারণ শরীরে আবার কখন সূক্ষ্ম শরীরে থাকবেন, যখন সূক্ষ্ম শরীরে থাকবেন তখন রূপ অন্য ভাবে আসবে। সেখান থেকে স্থূলে চলে এলে আরেক রকম

আসবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, তারপরে মহাকারণ। মহাকারণ মানে যেখানে আর কোন কিছু নেই, ওটাই নির্বিকল্প অবস্থা, ঠাকুর বলছেন সেখানে রূপটুপ সব উড়ে যায়। আমরা মন যে অর্থে বুঝি, সেই অর্থে মন সেখানে আর কাজ করে না, তাঁর মুক্তি হয়ে গেল, আর তাঁকে বাঁধা যাবে না। অবশ্য আমরা মুক্তি যে অর্থে বলি, ওটা একটা অন্য দিক থেকে যায়, কারণ এগুলো অনন্ত, আমরা যে সাধারণ ভাবে মনে করি আমার ঐ সত্তা, তার ঐ সত্তা সেভাবে তো জিনিসটা নয়, জিনিসটা আরও জটিল। যাঁরা পুরোপুরি সূক্ষ্ম জগতে বাস করতে শুরু করেন, তখন তাঁরা একটু একটু করে বুঝতে পারেন জিনিসটা কি।

কারণ শরীরে গিয়ে যাঁরা বাস করতে শুরু করেন তখন তাঁরা দেখেন ঐ স্থূল জগতটা কিছুই না, এই কিছু একটা চলছে, সিনেমাতে যেমন দৃশ্যগুলো পাল্টাতে থাকে স্থূল জগতটাও তাঁদের কাছে ঐভাবে পাল্টাতে থাকে। মহাকারণে যেই চলে গেলেন সব দৃশ্য বন্ধ, সব চলাচলি বন্ধ। ওখান থেকে যদি আবার ফেরত চলেও আসেন তখন কিন্তু তাঁর ঐ জ্ঞানটা থেকে যায়। তখনও সব কিছু, এই চলাচলি সবটাই মিথ্যা বলে মনে হয়। সেইজন্য যাঁরা উচ্চমানের তাঁরা নিজের ভাবের মানুষের সাথেই বেশি থাকতে চান, কারণ অন্য ভাবের লোক এসে তাঁর গোলমাল করে দেবে। কিন্তু তাই বলে চিরদিনের জন্য গোলমাল কখনই করে দিতে পারবে না। যতক্ষণ নিজের অবস্থাকে ছেড়ে আছেন ততক্ষণই গোলমাল হবে, সেখান থেকে হঠাৎ যেই নিজের রূপে চলে যাবেন সেখানে আর কোন গোলমাল থাকবে না। নিজের রূপ মানে, যে অবস্থায় তিনি অবস্থিত, ঐ কারণ শরীরে অবস্থিত। একজনের কাছে আমাকে যেতে হয়েছে, তাকে আমি পছন্দ করি না, দু মিনিট, চার মিনিট আমি ভদ্র ভাবে কথা বললাম। বলতে বলতে হঠাৎ আমার অন্তর্জগতের যে বাস্তবিকতা সেটা চাড়া মেরে উঠল, আপনি নিজেকে কি মনে করেন। সামনের লোকটি ঘাবড়ে যাবে, এতক্ষণ ভদ্র ভাবে কথা বলছিল, হঠাৎ কি হল! কিছুই হয়নি অন্তর্জগতের আসল রূপটা সে এবার নিয়ে নিয়েছে। ডাক্তার সরকার ঠাকুরের কাছে এসে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, ঠাকুরও অনেকক্ষণ হ্যাঁ না করে যাচ্ছন। হঠাৎ ঠাকুর তাঁর আসল যে ব্যক্তিত্ব সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছেন, তোমার কথা আমি কি শুনব, তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। একটা বাক্যেই সব শেষ করে দিলেন। ডাক্তারকে কি ঠাকুর অসম্মান করছেন? একেবারেই না। ঠাকুর তাঁর অন্তর্জগতে জানেন ডাক্তার সরকার এই রকমই, আর কারণ শরীরে যখন বাস করছেন তখন তিনি জানেন ঈশ্বরই সত্য। ঠাকুর আরেকজনকে বলছেন, তোমার কথা আমি কি শুনব, আমি তো এই রকমই দেখেছি। এখন তিনটের মধ্যে কোনটা সত্য? তিনটেই সত্য।

আমাদের কাছে যেমন অন্তর্জগৎ বহির্জগতের থেকে কম সত্য, তেমনি যিনি ঈশ্বরের পথে পা রেখেছেন, সূক্ষ্ম শরীরে যিনি প্রবেশ করছে তাঁর কাছে অন্তর্জগতটাই বেশি সত্য আর বহির্জগতটা কম সত্য মনে হবে। বাস্তবিকই তাই, অন্তর্জগতটাই বেশি সত্য। আর যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, মহাত্মা, তাঁদের কাছে কারণ শরীরটাই বেশি সত্য, ওনার কাছে সূক্ষ্মটাও কম সত্য, স্থূল জগতের যে তাঁর কাছে একেবারে অস্তিত্ব নেই তা না, আছে। বেদান্তী কিছু সাধুরা যেমন ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায় বলে উড়িয়ে দেন, উড়িয়ে দেওয়াটা পুরোপুরি ঠিক না। উপনিষদে বলছেন, *পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে*, পূর্ণ থেকে পূর্ণ বেরিয়েছে, ব্যাখ্যাতে বলছেন কার্যব্রহ্ম আর কারণব্রহ্ম এক, তার মানে স্থূল জগতের যে সত্তা এও সেই কারণ জগৎ থেকেই এসেছে, এও সেই মহাকারণের উপরে অবস্থিত, সেইজন্য স্থূল জগতকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। স্থূল জগতের সত্তা এক রকম চলে, সূক্ষ্ম জগতের সত্তা আরেক রকম চলে। স্থূল জগতে যাঁরা খুব সাফল্যবান, যাঁরা ভালো লোক, তাঁরা কালের যে রেখা সেখানে ব্যর্থ। আমার সবাই বলি আমার বাবা-মা এনারা কত ভালো ছিলেন। তাঁদের অন্তর্জগতেও স্বামী-স্ত্রী রূপে সার্থক, বহির্জগতেও সার্থক, কিন্তু তাঁদের কাহিনী তাঁর সন্তানরা ছাড়া আর কেউ জানে না। অথচ লায়লা মজনু ওরা অন্তর্জগতে এক কিন্তু বহির্জগতে পুরো আলাদা, কোন দিন মিলনই হল না। লায়লা মজনুর কাহিনী আজকেও আমরা জানি, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও জানবে। কারণ ঐ প্রগাঢ়তা কখনই বহির্জগতে আসবে না, আসবে অন্তর্জগতে। কোন মানুষকে যে মনে রাখা হয়, সেটা ঐ প্রগাঢ়তার জন্যই, বহির্জগতে ঐ গভীরতা আসবেই না, ওখানে এসে সব ভোঁতা হয়ে যায়। ভেতরে যত প্রবেশ করে গভীরতা, তীব্রতা তত বাড়ে। গভীরতা যত বাড়ে তার নাম তত দেশ কাল ছাড়িয়ে যেতে থাকে। যত বড় বড় নামকরা লেখক, কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, গায়ক আছেন এনারা সবাই অন্তর্জগতের বাসিন্দা, বহির্জগতের মূল্য তাঁদের কাছে আপেক্ষিক ভাবে কম।

পর পর ইট সাজিয়ে দিলে একটা বাড়ি হয়ে যাবে আর এলোমেলো করে রাখলে ইটের ঢিপি হয়ে যাবে, ঢিপিতে কারুর কোন কাজ হয় না। অন্তর্জগতেও যদি কেউ এলোমেলো করতে থাকে তাহলে তাকে সবাই পাগল বলে জানবে। আর অন্তর্জগতে যদি একটা জিনিসকে নিয়ে এগোতে থাকে সে তখন একজন মহাপুরুষ হয়ে যাবে। পাগলেরও একটা প্যাটার্ন আছে, ওর সাথে যদি কথা বলা হয় ও বলে দেবে কেন সে এই রকম করছে। অন্তর্জগতে গিয়ে যে বাস করবে তাকেও একটা জিনিসকে নিয়েই থাকতে হবে। প্রথমে আমাদের অন্তর্জগতে গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে। বাসা বাঁধার পর একটা জিনিসকে ধরে এগোতে হবে। তখনই সে মহাপুরুষ হওয়ার দিকে এগোতে শুরু করবে, তার আগে কিছুই হবে না। এই কারণেই আমরা সবাই সাধারণ হয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছি, অথচ দেহপাত করে সবাই কত কিছু করে যাচ্ছে। উপদেশ দিচ্ছে, তুমি তার মত হতে পারছ না কেন। আজ পর্যন্ত কোন কীর্তিমান মানুষ অপরের মত হয়েছেন? ভারতের রাজনীতির আকাশে এত এত নক্ষত্র, গান্ধীজী, নেতাজী, জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী কোন একজন কি অন্য কারুর মত হয়েছেন? কেউই নন, এনারা সবাই দেশবরেণ্য নেতা। যখনই বলছে তার মত হও, বুঝে নিন ওর ওখানেই সব শেষ, ওর দ্বারা আর কিছু হবে না। সাফল্য তাদেরই হচ্ছে, যারা একটা জায়গায় গিয়ে নিজের অন্তর্জগতে ঢুকে যায়। অন্তর্জগতে ঢুকে গিয়ে সেখানে এমন শক্তি তৈরী করে, ঐ শক্তি যখন বাইরে আসতে শুরু করে তখন আর তাকে সামলানো যায় না।

আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অন্তর্জগতটা কোন কাল্পনিক জগৎ নয়, এটা একটা সম্পূর্ণ বাস্তব জগৎ। অন্তর্জগৎ ততটাই সত্য যতটা বহির্জগতটা সত্য। আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো বাস্তবিক, এটাকে নিওরোলজিস্টরা ব্রেণ কেমিক্যালস দিয়ে ব্যাখ্যা করছে আর সাইকাট্রিস্টরা নিউরোন দিয়ে ব্যাখ্যা করছে। সূক্ষ্ম জগতে সময় দূরত্ব এগুলোর কোন কাজ নেই। যেমন আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণও আছেন, স্বামী বিবেকানন্দও আছেন, দুজনের তিন হাজার বছরের তফাৎ কিন্তু দুজন একসাথেই আমার অন্তর্জগতে বাস করছেন। সেইজন্য রামায়ণ যদি বলে থাকে শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন, তা করতেই পারেন, মনের জগতে তিনি তো রাজাই। আমরা এই চন্দ্রলোক, এই সূর্যলোক যেখানে ইচ্ছে যখন তখন পৌঁছে যাচ্ছি। সময় আর দূরত্ব ঐ জগতে কাজ করে না। যেমন থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিতে টাইম আর স্পেসের রিলেশানটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়, মনের জগতেও টাইম আর স্পেসের রিলেশানটা সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চলে। ওখানেও আমি এক সেকেণ্ডে একজনকে উড়িয়ে দেব, এক সেকেণ্ডেই একজন উড়ে গেল। আত্মহত্যা কেন করে? তার মনে একটা মানুষকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে আর বাকি সব কিছুকে সে উড়িয়ে দিয়েছে, যাকে ভালোবাসছে তাকে নিয়েই আছে। হঠাৎ দেখল, যাকে ভালোবাসছিল সে তাকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে চলে গেছে। এবার বাইরের জগতের বাস্তবিকতা অন্তর্জগতে গিয়ে দেখছে সব শেষ। তখন দেখছে আর কিছুই নেই, কি নিয়ে থাকবে। একই কারণ সবারই ক্ষেত্রে হবে না, এটাই অন্তর্জগতের মাধুর্য। এই তীব্র ব্যাথাই কারুর ক্ষেত্রে দেখা যাবে তাকে একজন বড় কবি বানিয়ে দিল, বা একজন গায়ক বানিয়ে দিল, কিছু একটা বানিয়ে দেবে। যদি ভালোবাসার তীব্রতা কম থাকে তখন বলবে, তুম্ নহি তো ঔর কৌ সৈ।

অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ এর আলোচনা আমরা বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার জন্যই নিয়েছি আর সূক্ষ্ম, কারণ আর মহাকারণকে নিয়ে আসা হয়েছে এর আলোচনার সাথে আধ্যাত্মিক জগতকে মেলানোর জন্য। তাই বলে এটাই যে সব সত্যকে ব্যাখ্যা করে দেবে তা না, এর বাইরে আরও অন্য অনেক কিছু আছে যেগুলো অন্য ভাবে চলে। তখন আবার পুনর্জন্ম ব্যাপারটা এসে যাবে, সেখানে মনে হবে কিছু একটা আছে যেটা অন্তর্জগতের সাথে যোগ আছে। মনের জগতে কোথাও ওর সত্তা আছে যেটা আগের আগের জন্ম থেকে আসছে, যার ব্যাপারে আমরা সজাগ নই, তাই আমরা কিছুই জানি না। আসলে আমরা জগতকে যত সহজ মনে করি, যত সহজ ভাবে জগতকে নিয়ে থাকি, যেভাবে আমরা মনে করি এখান থেকে হাওড়া স্টেশন যেতে হলে আমাকে বেলুড় মঠ স্টেশন যেতে হবে, সেখানে একটা টিকিট কেটে নিলাম, ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, উঠলাম আর হাওড়ায় স্টেশনে নেমে গেলাম, এভাবে জগতে সব কিছু হয় না, সব কিছুকে মেলানোও যাবে না। এর একটা নামই আছে নিউটোনিয়ান মেকানিক্স, নিউটনিয়ান মেকানিক্সে সবটা পরিষ্কার করে দেয়, এতটা ফোর্স দিলে জিনিসটা এভাবে চলবে। বিজ্ঞানীরা ঐ সময় সবাই মনে করছিলেন সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করে দেবেন, কিন্তু আসলে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা করা যায় না। আর যারা স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্ম জগতে ঢুকে গেল এরপর আর কোন

কিছুরই ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদিও তার যে সূক্ষ্ম জগৎ সেখানে সব কিছু আছে তা সত্ত্বেও সে সব ব্যাপার জানবে না। আমরা তাই জানি না হঠাৎ অপরিচিত কাউকে দেখলে মনে হয় সে আমার খুব আপন লোক, কেন মনে হয় আমাদের জানা নেই। তবে স্বভাব স্বভাবকে চিনতে পারে, আমরা জানি না কেন কাউকে বেশি ভালোবাসছি, আরেকজনকে কম ভালোবাসছি, একজনকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এরও অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, অনেকে আরও নানান ভাবে ব্যাখ্যা দেন। অনেক সময় একটা জায়গায় গিয়ে মনে হয় এই জায়গাটা আমার অনেক দিনের চেনা। আবার অনেক সময় মনের মধ্যে ভবিষ্যতটা ভেসে আসে, এগুলো আশ্চর্যের কিছু না। তবে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতকে দিয়ে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় না।

কারুর মনে যদি প্রশ্ন জাগে, এমন কি হতে পারে কারুর অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এক রকম চলবে? আর দুটোকে একই রকম চালানোই কি জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ? বুঝতে হবে এই আলোচনার কিছুই তার মাথায় ঢোকেনি। অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এক সমান চলবে শুধু তাদের যারা মুর্খ, গেঁয়ো, আদিবাসী। বাচ্চারা মুখে যা আসে সামনে সবাইকে বলে দেবে। আরও ভালো উদাহরণ হল কুকুর, কুকুর যাকে পছন্দ করবে তার সাথে এক রকম আচরণ করবে, যাকে পছন্দ করবে না তার সাথে অন্য রকম আচরণ করবে। অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এক হয় কুকুর বেড়ালের, যেগুলো খুব ট্রেইণ্ড কুকুর অজানা লোকের হাতে খাবেও না। আর যাঁরা খুব উচ্চমার্গের বেদান্তী, মাণ্ডুক্যকারিকাতে যেমন আছে, তাঁদের কাছে ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়। ওনাদের বহির্জগৎ বলে কিছুই নেই, সেইজন্য তাঁদের দুটো জগৎ এক হওয়ার কোন প্রশ্নই হয় না। ভদ্রলোকরা বহির্জগৎ যেমন তেমনটি চলেন, ভেতরে তাঁর যাই থাকুক, তিনি কাউকে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু বাইরে যেমনটি ব্যবহার করার কথা তেমনটিই ব্যবহার করবেন। বাচ্চাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করা হয়, বহির্জগৎ যেমন তেমনটি যেন হয়।

বুদ্ধি, চিন্তা এর সাথেও অন্তর্জগতের কোন সম্পর্কই নেই। কোন মায়ের অন্তর্জগতে তার সন্তানের যে স্থান, অন্যের সন্তানের সেই স্থান থাকবে না এটা সবারই জানার কথা। মায়ের অন্তর্জগতে তার সন্তানের যে এত গুরুত্ব সেটা কি মা চিন্তা ভাবনা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে নিয়ে এসেছে? কখনই তা নয়। ঠাকুর বলছেন, বাড়ির কাজের মেয়ে বাবুর ছেলেকে দেখাশোনা করছে সে বলে আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু সে জানে আমার আসল যে সন্তান সে বাড়িতে আছে। ও চিন্তা করে বলছে না যে আমার রাম আমার হরি, আর চিন্তা করেও বলে না যে আমার ছেলেটাই আসল, ওর অন্তর্জগৎ জানে আসল কোনটা। একটা কাহিনীতে এক জজ সাহেব একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবেন। জজ সাহেবের মনে কি একটা করুণা হল, ঠিক আছে তুমি যাবজ্জীবন জেলে না থেকে আমার বাড়িতে কাজ কর। লোকটি খোঁজটোজ নিয়ে জেনেছে যাবজ্জীবন হলে কত দিন জেলে থাকতে হত, জানল কুড়ি বছর থাকতে হবে। লোকটি এবার জজ সাহেবের বাড়িতে এত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে আর জজ সাহেবও তাকে এত ভালোবাসে, তার বাড়ির লোকেরাও এত ভালোবাসে যে একজন বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছে। কাহিনীটা খুবই জটিল আর লম্বা। কাহিনীটাকে সামনে এনে বলা হচ্ছে, হঠাৎ একদিন জজ সাহেব তাঁর টেবিলের সামনে তিরিশ লেখা একটা কাগজ রাখা আছে দেখছেন। তারপর দিন ঊনত্রিশ লেখা একটা কাগজ। আতঙ্ক লেগে গেছে যে কেউ হয়ত জজ সাহেবকে মারতে যাচ্ছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, জজ সাহেবের বাড়ির চারিদিকে পুলিশের নজরদারি শুরু হয়ে গেছে। লোকটি তখনও সব কাজ নিষ্ঠা নিয়ে করে যাচ্ছে। ওকে দেখে কেউ কিছু বুঝতেও পারছে না। এরপর এক একটা দিন কমতে কমতে চার, তিন, দুই লেখা কাগজ টেবিলে এসে যাচ্ছে। যেদিন এক লেখা কাগজ আসার কথা সেদিন বাড়িটা পুরো পুলিশে পুলিশ ঘিরে রেখেছে, কোন মাছিও যাতে না গলতে পারে। আসলে ঐ লোকটিই কায়দা করে জজ সাহেবের টেবিলে একটা করে কাগজ রেখে যেত। ওকে কেউ সন্দেহ করছে না। যেমনি এক হয়ে গেলে, ও নিজে থেকেই ভ্যানিশ হয়ে গেল। ওর হল, আমার কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি হয়েছে, ঠিক আছে এই কুড়ি বছর আপনার জন্য কাজ করে দিলাম। মন থেকে একটুও সে জজ সাহেবকে গ্রহণ করেনি। ওরা মনে করছে এ আমাদেরই আপন লোক। যেদিন দেখল জেলে থাকলে আজকে আমি ছাড়া পেয়ে যেতাম, সেদিনই সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর কোন চিন্তা-ভাবনা এখানে কাজ করছে না, ওর অন্তর্জগতই এই রকম কাজ করছে। ওর আচরণ দেখে আমরা মনে করতে পারি অন্তর্জগতে এই রকম হয়ে গেছে, কিন্তু কখনই তা হয় না। ও ওর নিজের অন্তর্জগতে চলে আমি আমার অন্তর্জগতে চলছি, যার স্বার্থ বেশি, জজ সাহেবের স্বার্থ বেশি, তিনি ওর

বাইরের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ঐ রকম ভাবছেন। বুদ্ধিমান যদি হতেন তাহলে ভাবতেন কুড়ি বছর হয়ে গেলে ও চলে যাবে। কিন্তু নাও ভাবতে পারতেন, আমরাও অনেক সময় করি। আমরা যাকে ভালোবাসি তার থেকে আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তার আচরণ, তার কথাবার্তা যেন এই রকমের হয়, এইভাবে আমরা তার সম্বন্ধে একটা চিন্তা ভাবনা তৈরী করে থাকি। এই যে চিন্তা-ভাবনা এখন আমার যে মনের জগৎ সেটাকে আধার করে, আমার যে মানসিকতা, সেখান থেকে চিন্তা-ভাবনা করে তার ব্যাপারে একটা চিন্তার জগৎ দাঁড় করাচ্ছি, যেখানে ভাবছি সে এই রকম আচরণ করবে। সেও তার মনের জগতে যেটার ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়াই নেই, সে যদি সেই ব্যাপারে আমাকে কোন আইডিয়া দিতে চায় তাকে আমার সাথে কথা বলতে হবে, আরও কিছু করতে হবে। সেইজন্য কেউ কোন দিন অপরের মনের জগৎ জানতেই পারবে না। আমরা অনেক সময় বলি, আমার সাথে এতদিন ছিল একবারও জানতে পারলাম না ওর ভেতরে এই রকম ছিল। সারা জীবন আমরা একজনের সঙ্গে থাকতে পারি, কিন্তু মনের জগতের ব্যাপার কোন ভাবেই আমরা জানতে পারব না। তবে সে যে কথাগুলো বলে, যে কাজগুলো করে সেগুলোকে চিন্তা করে আমরা তার ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু ওর অন্তর্জগত আর আমার অন্তর্জগত কোন দিনই interact করতে পারবে না। Interaction যখন করে তখন সে অন্তর্জগৎ থেকে দু চারটে কথা ছেড়ে দেয়, সেই কথাগুলো কেমন আসছে, কেন আসছে, কি আসছে বুঝতে পারবে না। ঠিক তেমনি উল্টো দিকেও হয়। ওর অন্তর্জগতকে কোন দিন জানতে পারা যাবে না। যখন আমরা বলছি ওর মনে কি চলছে বুঝতে পারছি, তখন আমরা তার চিন্তা-ভাবনার কথাই বলছি, ওখানে অন্তর্জগৎ নিয়ে কথা বলছি না। চিন্তা-ভাবনা হল হাতির শুঁড়ের মত, দুটো হাতি যখন মেলে তখন দুজনে শুঁড় দিয়ে দেখে এর আমার পালের কিনা। যেমন একটা হাতি আরেকটা হাতির মধ্যে কোন দিন ঢুকতে পারবে না, তেমনি একটা চিন্তার জগৎ আরেকটা চিন্তা জগতে কোন দিন ঢুকবে না। স্বামী স্ত্রী সারা জীবন একসাথে থাকুক, মা ছেলের সাথে সারা জীবন থাকুক কিন্তু ছেলের মনের জগতে মা খুব অল্প একটু প্রবেশ করতে পারবে। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগো আমার ব্যাপারে তুমি কি ভাবো। স্বামী কিছু না কিছু বলবে, কিন্তু ডায়নামিক্স আছে সেখানে। আজকে বলতে পারে তোমার জন্য আমি প্রাণ দিয়ে দেব, আগামীকালই সে পাল্টে যেতে পারে। কারণ তার যে অন্তর্জগতের ভাব, তার যে শক্তি, তার যে নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। অনবরত সেখানে পরিবর্তন হয়ে চলেছে, কারণ সেখান সময় আর দূরত্বের কোন ব্যাপার নেই, সময় আর দূরত্বের কোন ব্যাপার নেই তাই কারণও কোন ব্যাপার নয়। স্ত্রী স্বামীকে বলছে আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসব, পরের দিনই যদি স্ত্রী খবর পায় স্বামী বেশ্যা বাড়ি যায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি গতকালের সেই ভালোবাসা উবে যাবে, স্বামীর প্রতি এতদিনের সব শ্রদ্ধা, ভক্তি উধাও। অথচ স্ত্রী যদি তার ছেলের নামে এই রকম কিছু শোনে, তখন কিন্তু এই রকম হবে না, সে হয়ত কাঁদবে, বাবা তুই এই রকম করলি! আর স্বামী যদি জানতে পারে স্ত্রীর আরেকজনের সাথে মেলামেশা আছে, যত ভালোবেসেই থাকুক, তোমার সাথেই চিতায় উঠব যত যাই কিছু বলে থাকুক, ওখানেই সব শেষ। অথচ সেই স্বামী যদি শোনে তার মেয়ে গোলমাল করছে, সেখানে আবার অন্য রকম। অন্তর্জগতের ডায়নামিক্স অনবরত পাল্টাতে থাকে। সেইজন্য আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্তর্জগৎ কোন ভাবেই কিন্তু চিন্তার জগৎ নয়। যেমন জপধ্যানের জগতটা অন্তর্জগৎ। অন্তর্জগতে যেমন কাম, বাসনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো সবই আছে তেমনি অন্তর্জগতে ঈশ্বরও আছেন। যেমন বাইরের জগতে পূজা অর্চনার মত উপাচারের অনুশীলন করছি, ঠিক তেমনি অন্তর্জগতে ভক্তির জন্ম নেয়। বাইরে সে যেমন জপধ্যান করছে, মালা জপছে ঠিক তেমনি অন্তর্জগতেও একটা জীবন চলে।

অপরের মনকে আমরা নাও জানতে পারি কিন্তু একটা আইডিয়া করা যায়। আমি যদি আপনার সাথে কথা বলি, আপনার কথার পেছনে যে চিন্তা-ভাবনা আছে সেটাকে ধরে আমি আপনার ব্যাপারে একটা আইডিয়া দাঁড় করিয়ে নিতে পারব আপনি কি ধরণের লোক, যদিও আপনার অন্তর্জগতে আমি কোন দিনই প্রবেশ করতে পারব না। তবে এই আইডিয়াটা পাওয়া যাবে যে, এই চিন্তা-ভাবনা যার ভেতর থেকে আসছে তার অন্তর্জগতটা কেমন। তার মানে একটা বাড়িতে দড়ি ঝুলছে, সেই দড়ি ধরে আমি বাড়িতে ঢুকে গেলাম। ঠাকুর কিন্তু বলছেন, তাঁর কাছে কেউ এলে তিনি তার পুরো ভেতরটা দেখতে পান, যেমন কাঁচের আলমিরাতে রাখা জিনিস দেখা যায়। সিদ্ধ পুরুষরা দেখতে পারেন।

এখানে অপরা ভক্তির আলোচনা চলছে। অপরা ভক্তিতে একজন এগোচ্ছে কিনা বোঝা যায় কতকগুলি লক্ষণ দিয়ে, কয়েকটি লক্ষণের আলোচনা এর আগে করা হয়েছে। ভক্তি বা ধর্মজীবন কোন চিন্তার জগৎ নয়। অনেক ভালো ভালো লোক যাঁরা ধর্মজীবনে আছেন তাঁদেরও ধারণা যে ধর্মজীবন, সাধনার জীবন যেন চিন্তারই জগৎ। এটা কিন্তু চিন্তার জগৎ নয়, এটাই বাস্তবিক অন্তর্জগৎ। বড় বড় নামকরা লেখক, কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন লেখকদের কাছে ধর্ম হল আড়ম্বর, ফালতু জিনিস। ঠিক আছে, দোষের কিছু নেই। কিন্তু অন্তর্জগৎ নিয়ে যখন এরা আলোচনা করতে যায় তখন বলবে, অন্তর্জগৎ তো আছে, ওটাই তো চিন্তার জগৎ। বহির্জগতের সাথে তারা অন্তর্জগতকেও মানছে, কিন্তু চিন্তার জগৎ আর অন্তর্জগৎ যে কখনই এক নয়, এটা ওরা মানতে চায় না। এর আগেও আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি। চিন্তার জগতে আমরা চিন্তা ভাবনা করে কিছু করে নিচ্ছি। যেমন আমি যখন আপনার সাথে interact করছি তখন আমার অন্তর্জগৎ আর আপনার অন্তর্জগৎ এই দুটো জগৎ শব্দ দিয়ে আর চিন্তা দিয়ে এক অপরের সাথে interact করে। আমি চিন্তা করছি কি বললে আপনি খুশী হবেন, তখন শব্দগুলিকে আমি সেইভাবে রাখছি। অফিসের কর্মচারীর অন্তর্জগতে যে একজন সাহেব আছে, সেখানে তাকে সে পছন্দ করছে না। কিন্তু সে জানে আমার প্রমোশন সাহেবের হাতে। এবার সেই কর্মচারী চিন্তা করবে, সাহেবকে কি বললে খুশী হবে। কর্মচারীটি অনেক দিন ধর্মজীবন পালন করার পর তার মনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, আমি মিথ্যে কথা বলব না। অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করল কি বললে আমার সত্যটাও রক্ষা হবে আর কাজটাও হাসিল হবে। কর্মচারীর অন্তর্জগতটা আলাদা তার চিন্তার জগতটাও আলাদা। অন্তর্জগতকে আধার করেই চিন্তার জগৎ চলছে। চিন্তার জগতটা হয়ে গেল অন্তর্জগৎ আর শব্দ জগতের মাঝামাঝারি। শব্দ জগৎ আবার সংযোগ করছে চিন্তার জগৎ আর বহির্জগতকে। পুরো পদ্ধতিটা কত জটিল, আমার অন্তর্জগৎ ছাড়ছে চিন্তা, চিন্তা-ভাবনা ছাড়ছে শব্দকে, সেই শব্দ গিয়ে সামনের লোকের কানে প্রবেশ করছে, কানে প্রবেশ করে তার মধ্যেও চিন্তা ভাবনা উঠছে, এই লোকটা কি ঠিক কথা বলছে নাকি আমাকে বোকা বানাতে চাইছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ সংস্কৃতের ক্লাশে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের হিন্দী পড়ানো হয়। ক্লাশের একটি ছেলে একটা হিন্দী কবিতা লিখে হিন্দী টীচারকে বলেছে, স্যার আমি একটা হিন্দী কবিতা লিখেছি। টীচার ভাবছেন, সাকুল্যে হিন্দীর দশটা ক্লাশও হয়নি, আর এরই মধ্যে হিন্দী না শিখতে শিখতেই হিন্দীতে কবিতা লিখছে! টীচার ছেলেটিকে বললেন, হিন্দী না শিখেই কবিতা লিখে ফেললে। ছেলেটি বলছে, আপনার কাছে যেটুকু শিখেছি তাতেই লিখেছি আর আপনার উপরই লিখেছি। ঠিক আছে পড়ে শোনাও। ছেলেটি টীচারের বিরাট প্রশংসা করে ভুলভাল হিন্দীতে এক পাতার একটা কবিতা লিখেছে, যার ছন্দ বলেও কিছু নেই। ওর মধ্যে হিন্দী টীচারের সম্বন্ধে একটা মন্তব্য ছিল, যারাই আপনাকে তেল মারতে যায় তাদেরকেই আপনি উল্টে ফেলে দেন। ক্লাশের সবাই খুব বাহাবা দিল। মজার ব্যাপার হল, টীচারের প্রশংসা করে বলছে যারা তাঁকে তেল মারতে যায় তিনি তাকেই উল্টে দেন। কিন্তু ও যে কবিতা লিখছে এটাও ওর তেল মারাই হচ্ছে, যদিও সচেতন ভাবে মারছে না, কিন্তু টীচার তার প্রতি নরম হয়ে যাচ্ছেন। সাহেবকে যদি একটু কায়দা করে বলা হয়, সাহেবও বুঝতে পারে আমাকে তেল মারছে, কিন্তু ভালো লাগে। এই ভালো লাগা থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসা যায় না। একটা মজার ঘটনা আছে। এক মহারাজ সাধুদের ক্লাশ নিচ্ছেন। একজন ব্রহ্মচারী ছিল সে সবার সাথে মহা দুষ্টুমি করত। ক্লাশের সময় সে মহারাজের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছে। মহারাজ বললেন 'অমন করে কি তাকাচ্ছ'? ব্রহ্মচারীটি মাথাটা নীচু করে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পর আবার তাকাচ্ছে। এইভাবে অনেক বার তাকাতে মহারাজ খুব রেগে গেছেন। সবার সামনেই ব্রহ্মচারী তখন বলছে 'দেখুন মহারাজ, আপনি রাগ করবেন না, আমি তাকাচ্ছিলাম না, আপনার চোখ দুটো দেখছিলাম, থেকে থেকে আমার মনে হচ্ছিল আপনার চোখ দুটো যেন স্বামীজীর চোখের মত'। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে একটু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন 'এসব কি তুমি বলছ, এভাবে বলবে না'। ক্লাশের পরে ব্রহ্মচারীকে ডেকে বলছেন 'জানো তো, আমিও ভেবে দেখলাম কিছুটা মেলে'। মানুষ কিছুতেই নিজের প্রশংসা থেকে বেরোতে পারে না। ঘটনাটা যে শুনবে সেই হেসে কুটিপাটি হয়ে যাবে, কিন্তু এই জিনিস সবারই জন্য প্রযোজ্য। ব্রহ্মচারী স্রেফ দুষ্টুমি করার জন্যই বলছে। মানুষকে বোকা বানানো অত্যন্ত সহজ, যে অত্যন্ত কঠোর নীতিপরায়ণ তাকেও যে কেউ কায়দা করে হাতে করে নিতে পারবে। কিছু না, শুধু যদি বলে দেওয়া যায়, সবাইকে হাতে করে নেওয়া যায়, আপনাকে কেউ হাতে করে নিতে পারবে না, আপনি যা কট্টর। ওখানেই সে কিন্তু তাকে হাতে করে নিল।

এই যে অন্তর্জগৎ, সে এবার চিন্তার সাহায্য নিয়ে, শব্দের সাহায্য নিয়ে, সেই শব্দ তার ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে তার একটা চিন্তার জগতে ঢুকে সেখান থেকে অন্তর্জগতে ঢুকে যাবে। মজার ব্যাপার হল, এর অন্তর্জগৎ সে ঐ চিন্তার জগতকে মানতে চাইছে না, যেটা ওর শব্দের মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু সে যদি রেগে থাকে, তার পরিবর্তন করে দেবে। সেইজন্য চিন্তার জগৎ আর অন্তর্জগৎ দুটো পুরোপুরি আলাদা। অন্তর্জগৎ চিন্তার জগতকে তৈরী করে, আর ঐ অন্তর্জগতেরও একটা অন্তর্জগৎ আছে, যেটাকে আমরা কারণ শরীর বা কারণ বললাম। অন্তর্জগৎ একেবারে বাস্তব জগৎ, ওটা যে কোন কাল্পনিক বা চিন্তার তা নয়। দুটো এক মনে করলে পুরো ধর্মশাস্ত্র বুঝতে ভুল হয়ে যাবে।

অন্তর্জগতে যখন ভক্তি ভাব বাড়ে তখন কি কি হয় আমরা এর আগে কয়েকটি লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছি। ঠাকুর তার মধ্যে আরেকটা বলছেন, দেবী-দেবতার স্বপ্ন আসতে শুরু হয়। দেবী দেবতার স্বপ্ন এমনিও আসে। একজন মহারাজ ছিলেন, উনি এত কম বয়স থেকে আধ্যাত্মিকতায় এমন এক জায়গায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কল্পনাই করা যায় না। ওনাকে অনেক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীরা নানা রকমের প্রশ্ন করতেন। একবার একজন জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ! আপনার কি ঠাকুরের স্বপ্ন আসে। উনি বললেন, সে তো ফালতু স্বপ্নও আসে। আসলে উনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, তুমি যদি স্বপ্নে দেখ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, জানবে সচ্চিদানন্দই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। হিন্দু শাস্ত্রে খুব গভীর ভাবে মনে করা হয়, যদি দেবী দেবতারা স্বপ্নে আসেন তা দেবী দেবতারাই পাঠান। রানী রাসমণীকে স্বপ্নে মা বলছেন, কতদিন আমাকে বন্ধ রাখবি। তিনি এটাকে মেনেছেন। কিন্তু সব সময়ই যে সত্যি হবে তা নয়। একবার এক মহারাজকে দৈব স্বপ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছিলেন, এগুলোকে বেশি সিরিয়াসলি নিতে নেই, তবে দৈব স্বপ্ন ইঙ্গিত করছে সে এই পথে এগোচ্ছে। এখানে মূল ব্যাপারটা হল, যিনি প্রচুর জপ-ধ্যান করছেন এরপর যদি তাঁর ইষ্টের স্বপ্ন বা দেবী দেবতার স্বপ্ন আসে, এটা একটা লক্ষণ যে তিনি এগোচ্ছেন। ঠাকুর আবার একজনকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি স্বপ্নে কিছু দেখ? সে তখন বলছে, একদিন দেখছি জগৎ জলে জলময়, আমরা নৌকা করে যাচ্ছি, জলোচ্ছাসে সেটাও ডুবে গেল, আমরা গিয়ে একটা জাহাজে উঠলাম, তখন দেখছি একজন ব্রাহ্মণ জলের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন এর ঠিক নীচ বরাবর একটা সাঁকো আছে, ঐ সাঁকো ধরে সহজ ভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, তুমি এক্ষুণি মন্ত্র লও। যারা বহির্জগতে বাস করে তাদের অনেক রকম স্বপ্নই আসে। কিন্তু যারা ভক্তি পথে আসছেন, অন্তর্জগতে প্রবেশ করছেন তাদের কাছে এগুলো ইঙ্গিতবাহক, ইঙ্গিত করছে যে আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি। ঠিক তেমনি ঠাকুর আবার স্বপ্ন সিদ্ধের কথা বলছেন, অনেক সময় স্বপ্নে মন্ত্র পায়, স্বপ্নে কোন সিদ্ধি পেয়ে যায় বা স্বপ্নে এমন কিছু ঈশ্বরীয় জিনিস দেখে তাতে তার জগতের প্রতি ব্যবহারটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। এটা বহির্জগৎ থেকেও হয় আবার স্বপ্নের জগৎ থেকেও আসে।

আরেকটা লক্ষণ হল, ঠাকুর বলছেন দেহে মনে ঈশ্বরীয় গুণ বা লক্ষণ দেখা যায়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান কি কি দৈবী সম্পদ আর কি কি আসুরিক সম্পদ বলার পর অর্জুনকে বলছেন, *মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডবঃ*, অর্জুন তুমি দৈবী সম্পদ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছ। ঐ দৈবী সম্পদগুলো দেখা দেয়। আধ্যাত্মিকতা মানেই inclusiveness আর inclusiveness মানেই হয় acceptance, জগতকে আপন করে নেওয়া। Inclusiveness আর acceptance কে নিয়ে যে কোন মূল্যবোধ আসে ওটাই দৈবী সম্পদ। যেখানেই exclusiveness থাকে ওটা হল আসুরিক সম্পদ। যেমন ক্রোধ, ক্রোধ মানে exclusiveness, আমি তাকে শেষ করে দিতে চাইছি। কাম, আমি তাকে পুরোপুরি নিজের জন্য পেতে চাইছি। লোভ, অপরের জিনিসকে কেড়ে নিতে চাইছি, এগুলোই exclusivenessএর লক্ষণ। সেইজন্য আমরা যে লম্বা তালিকা দেব দৈবী সম্পদ কি কি হয়, গীতায় কি কি বলছে, ভক্তিশাস্ত্রে কি বলছে, অত কিছুতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, খুব সহজ নিয়ম, inclusiveness, ঐ লোকটাকে আমি যদি আপন করে নিই বা যদি আপন মনে করি তখন আমার ব্যবহার কি রকম হবে, শুধু ঐ লোকটিকেই নয়, সম্পূর্ণ জগতকেই যদি আপনা করে নিই, যেখানে সাপ, বিছে, বাঘ, সবই আছে, যেখানে কারুর প্রতি কোন আলাদা ভাব নেই। ঠাকুর বলছেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে ফুলের গাছ দেখছি যেন বিরাটের পূজো হচ্ছে, এক একটা ফুল গাছ যেন সেই বিরাটের সামনে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। এই ভাব যদি কারুর ভেতর এসে যায় তখন তার আর ফুল তুলে ঠাকুরের পূজা

করার দরকার হবে না। যিনি দেখছেন এটা ঠাকুরের বিরাট রূপ, সেখানে এই ফুল গাছটা ফুলের তোড়া, সেখান থেকে ফুল তুলে কেন সে ঠাকুরের ছবির সামনে রাখতে যাবে। ঠাকুর বলছেন, আমি লেবু কাটতে পারতাম না, জয় মাকালী বলে ছুরি চালাতাম। Inclusivenessএর level কত উচ্চে থাকলে তবে গিয়ে মানুষ এই রকম আচরণ করতে পারেন যে, নিজের খাওয়ার জন্য লেবুটাও কাটতে পারছেন না। নিন্দুকরা হয়ত বলবে তাহলে কি ঠাকুর খাওয়া-দাওয়া করতেন না?

ঠিক এই জায়গাতে এসে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। অন্তর্জগতে পুরোপুরি থাকলে যে কোন মানুষ না খেয়ে মরে যাবে, সেইজন্য সমাধিবান পুরুষরা বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারেন না। তাঁরা inclusivenessএর একেবারে চরম পর্যায়ে চলে যান। ঠাকুরের ঐ অবস্থায় হৃদয়রাম তাঁর মুখে কোন রকমে খাবার গুঁজে দিতেন, হৃদয়রাম ঐ সময় কাছে না থাকলে ঠাকুরের শরীরই হয়ত থাকত না। তার আগে ঠাকুর যদিও কালীঘরে মা ভবতারিণীর পূজা করেছেন, পরের দিকে সেটাও পারতেন না, বলি দেখতে পারতেন না, বলি দেখা তো দূরের কথা লেবুও কাটতে পারতেন না। আবার একদিন ঠাকুর দেখছেন একজন লোক ঘাসের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে, ঘাসের উপর হাটা দেখে ঠাকুরের বুকে এসে লাগছে। এগুলোকে প্রথম প্রথম ঠাকুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রূপেই মনে হবে, কিন্তু তা না, এটাই হল inclusivenessএর চরম অবস্থা যেখানে লেবুও কাটা যাবে না। এই ধরণের মহাপুরুষদের জীবন চালানোটাই সত্যিকারের সমস্যা হয়ে যায়। পাঁচজন তাঁকে সামলে না রাখলে মানুষটা মরে যাবে। আমাদের দেখতে হবে যে, এই মানুষটাকে সামলে রাখা দরকার আছে কিনা। ঠাকুর যখন মহাসমাধিতে আছেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, ওনার কোন হুঁশ নেই। একজন সাধু সেই সময় ওখানে ছিলেন, তিনি রক্তের রঙ দেখে বলছেন, আরে এতো ব্রহ্মরন্ধ্রের রক্ত, এই লোককে দিয়ে জগতের বিশেষ কাজ হবে। তখন তিনি কিল মেরে মেরে একটু একটু চেতনা আনার চেষ্টা করছেন, চেতনা তো আসছে না কিন্তু একটু করে মুখটা খুলছে আর তার মধ্যে একটু একটু করে দুধ ঢেলে দিচ্ছেন। কোন রকমে শরীরটাকে যদি রক্ষা করা যায়। আমরা ঠাকুরের জীবনীতে, লীলাপ্রসঙ্গে এসব ঘটনা পড়ছি, শুনছি, মনে হবে যেন একটু বাড়াবাড়ি। একটুও বাড়াবাড়ি নয়, এই ধরণের মানুষের এটাই হওয়ার কথা। বড় বড় সিদ্ধ পুরুষদের সব কিছু আমরা জানি না।

আমাদের সবারই একটা ধারণা যে প্রফেট মহম্মদ এত এত লড়াই করেছেন, মারামারি করেছেন, হয়ত ঠিকই, কিন্তু আমরা তো মহম্মদের জীবনী অত বিস্তারিত ভাবে পড়িনি। মহম্মদের জীবনের একটা ঘটনা আছে, মহম্মদের একটা প্রিয় বেড়াল ছিল। একদিন উনি নিজের আলখাল্লাটা রেখেছেন আর বেড়ালটা এসে ওর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সময় মহম্মদের কোথাও যাওয়ার ছিল, আলখাল্লাটা গায়ে চাপাতে হবে, উনি বেড়ালটাকে আর বিরক্ত না করে একটা তরোয়াল এনে আলখাল্লটা কেটে বার করে আনলেন, আলখাল্লার বাকি অংশের মধ্যেই বেড়ালটা আরামসে শুয়ে থাকল। মহম্মদ কাটা আলখাল্লাটা চাপিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মহম্মদের জীবনের এটা একটা নামকরা ঘটনা। মহম্মদ বেড়ালকে ভালোবাসেন, এদিকে বেড়াল আর কুকুরের ঝগড়া, কিন্তু মহম্মদ কোথাও কুকুরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি, কিন্তু মুসলমানরা কেউ কুকুর পুষবে না কারণ মহম্মদ বেড়াল ভালোবাসতেন, বেড়াল আর কুকুরের ঝগড়া। সেখান থেকে সবাই ধরে নিল মহম্মদ কুকুরের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই যে ঘটনা, বেড়ালের ঘুমে ব্যাঘাত হবে, ওর কষ্ট হবে, ঠিক আছে জামাটা কেটে বার করে আনছি। এটাই inclusivenessএর লেভেলের একটা উচ্চ অবস্থা।

যেমনি আমরা অন্তর্জগৎ বহির্জগতের ধারণা নিয়ে এগোব তেমনি mistake বলে কিছু থাকে না, পাপ বলে কোন কিছু থাকবে না। থাকে শুধু তার অন্তর্জগৎ, সেই অন্তর্জগতে ইমোশানস বাস করছে, ভালোবাসার ইমোশানস্ আর লোক বাস করছে। অন্তর্জগতের ঐ ইমোশান সত্যিকারে ইমোশান, চিন্তা ভাবনার ইমোশন নয়, ওটা তার ভেতর থেকে আসছে। চিন্তা ভাবনার ইমোশানকে অনেক ভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, যেমন বাচ্চা ছেলে অনেক সময় রেগে গিয়ে মাকে বলে, তোমার সাথে আর কথা বলব না, কিন্তু দু মিনিটের জন্য, একটা লজেন্স দিলেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু অন্তর্জগৎ থেকে যার ইমোশানস্ আসছে ঐ জিনিসটা তার কখনই পাল্টাবে না। আমরা অনেক কাহিনী আদিতে দেখি ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে, কিন্তু মাকে যতই বোঝান হোক তার মন কিছুতেই মানতে চাইবে না যে তার ছেলে মারা গেছে, তার অন্তর্জগতে ছেলে এখনও পুরো বাস করে যাচ্ছে। যতক্ষণ না ওটার পরিবর্তন না করা হবে ততক্ষণ ঐ ভাবটা তার থাকবে। তেমনি

ভেতর থেকে যার রাগ জমে আছে, যতক্ষণ ওটাকে পুরোদমে বার না করে দিচ্ছে ততক্ষণ সে শুধু জ্বলতেই থাকবে। মহাভারতে এক মুনির কাহিনী আছে, মুনির ভেতরে কোন কিছুর জন্য রাগ জন্ম নিয়েছে, তিনি বলছেন, পুরো সৃষ্টিকেই আমি নাশ করে দেব। তখন তাঁর পূর্বজরা এসে তাঁকে বোঝাচ্ছেন, এ কাজ তুমি করতে যেও না। মুনিও বলছেন, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, এই কাজ আমি করবই, তা নাহলে এই রাগই আমাকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। তখন পূর্বজরা বলছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, জলকেও সৃষ্টি বলা হয়, তোমার এই রাগকে জলে স্থাপন করে দাও। মুনিও তাই করে শান্ত হয়ে গেলেন।

ঠিক তেমনি কারুর ভেতর ভালোবসার বিরাট ইমোশান, রাজা ভরতের যেমন, সেই ইমোশান গিয়ে বেরোল এক হরিণ শাবকের উপর। রাজা ভরতের অন্তর্জগতে ভালোবাসার ইমোশান একেবারে ঠাসা হয়ে জমে ছিল। কোথায় সেই ইমোশানকে বার করবে! সংসার ছেড়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে, সন্তান, নাতি সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন একটা হরিণের শাবককে পেল সব ইমোশন বন্যার জলের মত হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। একজন লোক জীবনে যখন সব থেকে বেশি ধাক্কা খায়, ধাক্কা খাওয়া বলতে মূলতঃ প্রতারিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রতারিত মানুষ টাকা-পয়সা দিয়ে হয় বা কারুর উপর আস্থা করেছিল সেখান থেকে হয়। তা সত্ত্বেও জীবনে একজন দুজনকে পূর্ণ বিশ্বাস করতে হয়, সেখানে গিয়ে মাথা নত করে নিজের মনের সব কিছু উজার করে ঢেলে দিতে হয়। ঠাকুর বলছেন, অছি ভালো হলে সে কখন ক্ষতি হতে দেয় না। একবার যখন জীবনে ঠিক করে নিলাম ইনিই আমার সেই লোক যার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যাবে, সেখানে গিয়ে মনের সব কথাই বলতে হয় আর সে যা বলবে তার সব কথাই শুনতে হয়। তা নাহলে সব এলেমেলো হয়ে যায়। বিশেষ করে সাধু জীবনে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, একজন কেউ থাকবেন যাকে গিয়ে আমি আমার প্রত্যেকটি কথা বলতে পারি, যে কথা হয়ত ভগবানের কাছে বলতেও সঙ্কোচ হয় সেটাও গিয়ে তাকে যেন বলা যেতে পারে। কারুর কাছে প্রতারিত হলে, আঘাত পেলে তার কাছে গিয়ে সব যেন নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

যে ভক্তিশাস্ত্র আমরা অধ্যয়ন করছি, এর উদ্দেশ্যটা কি, কি বলতে চাইছেন? এটাই বলতে চাইছেন, এই যে তোমার অতি সাধারণ একটা নিকৃষ্ট জীবন, এই জীবনের উত্তরণ ঘটিয়ে কিভাবে মহাপুরুষ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। মহাপুরুষ হওয়ার অর্থ কি? মহাপুরুষ হওয়া মানেই inclusivenessএ পুরোপুরি প্রবেশ করে যাওয়া, যেখানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই সে নিজের মনে করছে। অধ্যাত্ম মানেই তাই, অধ্যাত্ম মানেই inclusiveness, এছাড়া আর কিছু নেই। Inclusivenessএ অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ, চিন্তার জগৎ, শব্দ জগৎ সবটাই এক হয়ে যায়, কোথাও কোন তফাৎ থাকে না। ওর চিন্তার জগতে যা হয় শব্দ জগতেও তাই হয়, বহির্জগতেও তাই, অন্তর্জগতেও তাই হয়, পুরোটাই এক হয়ে যায়। যারা বহির্জগতকে নিয়ে পড়ে আছে তাদের চিন্তা এক রকম, কথা অন্য রকম, কাজ আরেক রকম, জগৎ এভাবেই চলে। আধ্যাত্মিক জীবন এভাবে চলে না। আধ্যাত্মিক জীবন হল inclusiveness, বাহ্যিক জীবনটা হল exclusiveness। Exclusiveness মানেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে বাকি সবাই মরুক বাঁচুক তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমরা ঠিক এই ভাবনা নিয়েই চলি। Inclusivenessএ কি হচ্ছে, আমি আপনাকে বাদ দিতে পারব না, আমার জগতে আপনিও আছেন, সেও আছে, বদমাইশরাও আছে, সাপ বিছে সবাই আছে। আমি যদি বলি আমি কারুর উপর ভরসা করব না, আসলে তখন আমি বলতে চাইছি আমার জীবনকে আমি exclusiveএর দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু যাঁর প্রকৃতিতেই এই ভাব নেই, তাঁর অন্তর্জগতেও ঐ ভাব নেই, তখন তাঁর কাছে লোকজন আসবেই, তারাও তাঁর অন্তর্জগতে ঢুকবে, তারাও ধাক্কা দেবে, তিনিও কিছু দিন দমে যাবেন, কারুর সাথে হয়ত মিশবেন না। দুদিন পর আবার ওটাই করবেন, কারণ তাঁর তো ওটা প্রকৃতিতেই নেই। এই কারণে জাগতিক দৃষ্টিতে যাকে আমরা বোকা মুর্খ বলছি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেই কিন্তু অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে একটা তফাৎ আছে, তফাৎ যে নেই তা না। যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা ঈশ্বরীয় চিন্তার বাইরে যান না আর তাঁর নিজস্ব কোন স্বার্থ থাকে না, কোন কিছুর প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু আমাদের মত লোকের জীবনে সবারই কিছু চাওয়া-পাওয়া আছে, একটু কোথাও আশা, অপেক্ষা থাকে, কোথাও একটু লোভ থাকে, অন্য দিকে আবার আধ্যাত্মিক ভাবটাও আছে। এই দুটোকে মিলিয়ে আমাদের জীবনকে একেবারে দুর্বিষহ করে তুলছে।

একবার এক হস্টেলের এক ছাত্রকে নিয়ে কিছু হওয়াতে তার শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি তো এই কথা কাউকে এতদিন বলোনি'। ছেলেটি বলছে 'বলিনি কারণ আমি কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি না'। শিক্ষক বলছেন 'কেন তুমি বিশ্বাস করোনি'? 'না, আজ বন্ধু আছে কাল বন্ধু নাও থাকতে পারে'। ছেলেটি তখন ক্লাশ নাইনে পড়ে, শিক্ষক তার কথা শুনে অবাক হয়ে ভাবছেন, কি সাংঘাতিক ছেলে। সেই ছেলে এখন বিরাট বড় ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকার বড় এক কোম্পানিতে চাকরি করছে। আসলে ছেলেটি একটা অসুর ছাড়া কিছু না। কাল যদি বিয়ে হয়, সে তার স্ত্রীকে মাটিতে ফেলে তার উপর দিয়ে হেটে যাবে।

আমি যদি বলি জীবনে আমি অনেকের কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছি, আমি প্রচুর দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? কারণ তাকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি, তার মানে এটাও inclusive quality, আধ্যাত্মিক গুণ। তাহলে প্রতারিত হতে হল কেন? তার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করছিলাম, এটা কিন্তু exclusiveness হয়ে গেল। দুটো বিপরীত শক্তি এসে যাচ্ছে। যারা জগতে খুব সফল ব্যক্তিত্বের, তারা সম্পূর্ণ exclusive হয়, কাউকে একশ ভাগ বিশ্বাস করবে না, কাউকে একশ ভাগ ভরসা করবে না, কাউকে কিছু দেবে না। আর অন্তর্জগতে পুরো সফল ব্যক্তিত্ব হন ভগবান যীশুর মত ব্যাক্তিত্বের যাঁরা, তাঁরা একশ ভাগ inclusive কিন্তু কারুর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না। যদি আশা প্রত্যাশা থাকে তাহলে সংসারী হয়ে চালাকি করে নিজেকে পুরো আলাদা করে নিতে হবে। ভর্তৃহরির একটা শ্লোক আছে সেখানে বলছেন, হয় সব কিছু ছেড়েছুড়ে হরিদ্বারে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে শ্রীরাম জয়রাম করতে থাক, তা নাহলে নারীর বুকে তাঁবু খাটিয়ে ওখানেই বাস করতে থাক, মাঝামাঝারি করলেই মরবে। যারা ঘোর সংসারী তাদের কখনই কোন কষ্ট হয় না, ওর পুরোপুরি exclusive হয়, ওরা জানে আমি বেঁচে থাকলেই হল, নিজের স্বার্থের জন্য দরকার হলে নিজে স্ত্রী সন্তান সবাইকে ছেড়ে দেবে। অন্য দিকে যারা সম্পূর্ণ রূপে inclusive, ওদের কারুর কাছ থেকে কোন আশা প্রত্যাশা নেই। বাইরের কেউ এসে যদি তাকে মেরেও যায় তাতেও তার কিছু আসে যায় না। মাঝারি যারা তারাই মরে, সমস্যা আসলে এদেরই হয়। তখন এরা একটু চালাকি করতে যায়, কায়দা মারতে যায়, এটাও করতে যায়, সেটাও করতে যায়, এসব করতে গিয়ে শেষ মার খায়। তবে যদি আমার লক্ষ্য ঠিক থাকে, যদি পরিষ্কার থাকে যে আমি কোন দিকে, কোথায় যেতে চাইছি, তখন ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি আমার চারটে দোষ হয়ে যায় তাতে কোন সর্বনাশ হয়ে যাবে না। কিছুক্ষণের জন্য আমার অগ্রগতিটা থমকে যাবে, চিরদিনের জন্য কখনই থেমে যাবে না।

ভক্তির একটা লক্ষণ হল, তার মধ্যে দৈবী গুণের প্রকাশ হয়। ঠাকুর বলছেন, যখন কেউ ইষ্টের ধ্যান করে তখন ইষ্টের গুণগুলো তার মধ্যে আসতে শুরু হয়ে যায়। ঠাকুর একেবারে শিবের নাম করে বলছেন, যে শিবের ধ্যান করে তার মধ্যে শিবের গুণগুলো আসত শুরু হয়। আমরা যদি ঠাকুরের উপর ধ্যান করি তখন ঠাকুরের গুণ আমাদের মধ্যেও আসতে শুরু হবে। ঠাকুরের গুণ হল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, আর ত্যাগ জিনিসটা। ঠাকুর বলছেন, যখন দেখবে এই ধরণের গুণগুলো তার মধ্যে আসতে শুরু হয়েছে তখন বুঝবে ঈশ্বর দর্শনের আর খুব বেশি দেরী নেই। কি হয় তাতে? বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ার ভাব, সত্যের প্রতি আঁট, সাধুসেবার ইচ্ছা, সাধুসঙ্গ করার ইচ্ছা এগুলো অনেক বেড়ে যায়। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, কোন রাজা তার কোন সেবকের উপর খুশী হয়ে যদি তার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন রাজা নিজের সব জিনিস, গালিচা, গড়গড়া, পেয়াদা সব আগেই সেবকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ হবে, আগে তিনি সেখানে তাঁর গুণগুলো পাঠিয়ে দেন। সেইজন্য যাঁর মধ্যে এই সব গুণের সমাবেশ হতে দেখা যাবে তখন বুঝবেন ঈশ্বর এবার তাঁর হৃদয়ে আসছেন।

অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ, আর inclusiveness ও exclusiveness নিয়ে যে লম্বা আলোচনা করা হল, শুধু শুনে গেলে হবে না এগুলোকে নিয়ে চিন্তন করতে হবে, যত চিন্তন করা হবে এই জিনিসটা তত পরিষ্কার হবে আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে তত সুবিধা হবে। মন নিয়ে আলোচনা করার সময় অনেক ধরণের উপমা নেওয়া হয়, যেমন রাজযোগে স্বামীজী মনকে একটা জলাশয়ের মত বলছেন। জলাশয়ে একটা পাথর ফেললে যেমন তার জলে ঢেউ ওঠে, ঠিক তেমনি বহির্জগৎ থেকে কিছু গিয়ে মনের মধ্যে পড়ে তখন মনে ঢেউ ওঠে। এখানে আমরা অন্তর্জগতকে মেঘের সাথে তুলনা করতে পারি। আমাদের চিন্তার জগতটা যেন একটা বিরাট বড় মেঘ, আমাদের ভেতরেই এই মেঘ। সবারই জীবনে যা কিছু চলছে ঐ মেঘ দিয়েই চলছে। মেঘ দু রকমের কাজ

করে, একটা কাজ হল উপর থেকে জল ফেলা, এই মেঘ তো আসল মেঘ নয়, টপ্ টপ্ করে জল পড়ে। টপ্ টপ্ করে এই জলটা পড়ছে ভেতরের দিকে, মেঘের এটা প্রথম কাজ। আর দ্বিতীয় যে কাজটা করে তা হল, এই মেঘ শব্দ হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। এই মেঘ কোন সাধারণ মেঘ নয়, এই মেঘ ভেতরে বৃষ্টি হয় টপ্ টপ্ করে জল পড়ে, বাইরের দিকে যখন যায় তখন সরাসরি যায় না, তখন সে শব্দকে মাধ্যম করে বা ইন্দ্রিয় গুলিকে মাধ্যম করে, মন ভেতরে রয়েছে। আকাশের মেঘ যেমন দু জায়গা থেকে তৈরী হয়, অন্তর্জগতের এই মেঘও দুদিক থেকে তৈরী হয়। আকাশের মেঘ একটা তৈরী হয় সমুদ্র থেকে, আরেকটা তৈরী হয় জমি থেকে। আকাশে যে মেঘ আসে তাতে সমুদ্রও যোগান দিচ্ছে আর মাটিও যোগান দিচ্ছে। মাটিতে তাপ তৈরী হচ্ছে তা উপরে যাচ্ছে, ধুয়ো, ধুলো সব উপরের দিকে যাচ্ছে, পুকুর, নদীর জলকেও টানছে। কিন্তু মূল যেটা আসে সমুদ্র থেকে। এগুলো উপমা, উপমাতে এর বেশি নেওয়া যায় না। সমুদ্র থেকে যে মেঘ আসছে সেটা একেবারে শুদ্ধ পবিত্র জল, অল্প একটু আধটু অন্য কিছুও থাকতে পারে, কিন্তু মূলতঃ শুদ্ধ পবিত্র। কিন্তু জমি থেকে যেটা যায় ওর মধ্যে অনেক ধরণের অশুদ্ধি থাকে। এখন ভালো হোক আর মন্দ হোক ঐ মেঘ আছে। মেঘের মধ্যে অনেক কিছু হয়, মেঘের মধ্যে বাষ্প আছে, পাথর তৈরী হয়, বিদ্যুৎ তৈরী হয়। আমাদের মন হল এই মেঘের মত। এর বড় একটা অংশের যোগান আসে ভেতর থেকে আর বেশ কিছু জিনিস আসে বাইরে থেকে। বাইরে থেকে আসার ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি, একটু পরে একটা সূত্র আসবে যেখানে এই নিয়ে আলোচনা করবেন। আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা নিচ্ছি আর দিচ্ছি, দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে এর একটা অংশ ঐ মেঘে জমছে, ওটা একেবারে স্থায়ী, কোন দিন যায় না, সব সময় থাকে। আর ঐ মেঘ থেকে কখন বৃষ্টি হয়ে অন্তর্জগতে গিয়ে পড়ে।

এখন অন্তর্জগতকে বোঝার জন্য যদি কল্পনা করা যায়, একটা বিশাল সমুদ্র আর তার পাশেই পুরো বরফ জমে আছে। মেঘ সমুদ্র থেকে উঠছে আর বরফ যেখানে জমে আছে সেখান থেকে আসছে। সেই বরফের মধ্যেই বরফের অনেক আকৃতি আছে, তার মধ্য দিয়ে ধুয়ো ধুলো সবই যাচ্ছে। আমি আপনি যা কিছু করছি, সব কিছু হয় ঐ মেঘ দিয়ে। আমার যে চিন্তার মেঘ রয়েছে, চিন্তার যে বাদল, ওখান থেকেই জগতের সব কাজ হয়। রান্নাবান্না করছে ওটা দিয়ে, পড়াশোনা করছে ওটা দিয়ে, কথা বলছে ওটা দিয়ে, আমাদের সদ্ব্যবহার হয় ওটা দিয়ে, দুর্ব্যবহার হয় ওটা দিয়ে। কিন্তু ঐ মেঘ দুটো দিক থেকে আসছে, বহির্জগত থেকে আসছে আর অন্তর্জগৎ থেকেও আসছে। যার মন, যার জীবন, একমাত্র সেই জানে, এই জিনিসটা ওর কোথা থেকে আসছে। আমি আপনার সাথে একটু মজা করলাম, আপন তিড়িং করে লাফিয়ে একটা জবাব দিলেন। আমি মন খারাপ করলাম, আমার সাথে এই রকম ব্যবহার করল! কিন্তু একমাত্র আমিই জানব, ওর ঐ রাগটা অন্য কোথাও থেকে জমেছিল কিনা, যা কিনা আমার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমিই জানব, আমার যে অন্তর মন ওখানে আপনার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা আছে কিনা, যে ঐটাকে চালিত করছে। যিনি এটা করছেন তিনিই একমাত্র এটা জানবেন। কেউ হয়ত সারা জীবন একজনকে ভালোবেসে গেছে, কিন্তু শেষে হয়ত দেখবে সে আদপেই ঐ ভালোবাসাটা নেয়নি। এই ধরণের ঘটনা যে কত আছে কল্পনা করা যায় না। আপনি যাকে ভালোবাসছেন, সে আপনার ভালোবাসা নিয়ে পুরোদমের যদি তার মতই ব্যবহার করে, তাহলে বুঝতে হবে সে একটা কুকুর, একমাত্র কুকুরই এই রকম করে, বেড়ালও করে না। বেড়াল নিজের মত চলবে, দুধ দিলে দুধ খেয়ে চলে যাবে, কুকুরের স্বভাব তা নয়, আমি যেমনটি চাইব তেমনটিই সে করবে। মানুষ কখনই এই রকম হয় না, মানুষ পুরো নিজের মত চলে। নিজের মত চললে সে তো একটা পাগল, আসলে ওকে অন্তর মন পুরো চালনা করছে। অন্তর মনও করে না, করছে thought cloud, আর thought cloudএ দুটোই আছে, বহির্জগৎ থেকেও আসছে অন্তর্জগৎ থেকেও আসছে। বড় বড় সাধকরা, ঋষি, মুনিরা জানেন বহির্জগৎ থেকে প্রচুর জিনিস আসে। তাঁরা জানেন আমাকে যদি ঈশ্বরকে জানতে হয় তাহলে বহির্জগৎ আর চিন্তার জগতকে ছেড়ে অন্তর্জগতে আমাকে প্রবেশ করতে হবে।

যখনই কেউ অন্তর্জগতের বাসিন্দা হতে চান তখন তিনি thought cloudকে ধীরে ধীরে কমাতে শুরু করেন। পুরো যোগশাস্ত্রে যা বলছে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে বলছেন আসলে বলতে চাইছেন এই cloud formation যেটা হচ্ছে এটাকে তুমি কম কর। কিন্তু তাকে তো খাওয়া-দাওয়া করার জন্য বহির্জগতে বেরোতে হবে, যারা তার দেখাশোনা করছে তাদের সাথে তাকে কথাবার্তা করতে হবে। সবই করবে, তার

interaction সব সময় thought cloud দিয়েই হবে। কিন্তু তখন কুকুরের কথা যেমন খুব বাজে অর্থে বলা হল, এটা কিন্তু ভালো অর্থে, তার ভেতরেও যা বাইরেও তার তাই। চিন্তা যতটুকু আছে, যেমন ক্ষুধা পেয়েছে, ঐ অতটুকুর বাইরে তিনি যাবেন না। ঠিক ঐ একটা কথা ওখান থেকে বেরোবে, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল আবার তাঁর অন্তর্জগতে ঢুকে যাবেন। কিন্তু এই অন্তর্জগতটাও শেষ কথা নয়। ঐ অন্তর্জগতের আবার আরেকটা অন্তর্জগৎ আছে, ওখানে যাওয়াটা বড় বড় ঋষি মুনিদের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। আর ঐ অন্তর্জগতের পেছনে যে সব কিছুর জগৎ, সেখানে তো অবতার ছাড়া কেউই যেতে পারেন না। আমরা মনে করি ঐ অন্তর্জগতটা চিন্তা-ভাবনার বা কল্পনার জগৎ। কিন্তু না, ওটাই বাস্তবিক জগৎ। বহির্জগতে যেমন অনবরত পরিবর্তন হয়, শরীরের পরিবর্তন, ব্যবহারের পরিবর্তন, অবস্থার পরিবর্তন, ঠিক তেমনি অন্তর্জগতেও পরিবর্তন হয়, কিন্তু একটু ধীরে হয়। আর চিন্তার জগৎ তো মুহুর্মুহু পাল্টাচ্ছে। ঐ যে মেঘের কথা বলা হল, ওখান থেকে দু চারটে ফোঁটা পড়ে। আর ওটাকে যদি একটা হিমাবর্ত দেশ মনে করা হয়, তখন ওখানে যেন আরেকটা বরফ পড়ল। যেমন এই যে আমি আপনাকে দেখলাম, আপনাকে জানলাম, বহির্জগৎ থেকে কিছু চিন্তার জগতে ঢুকল। আমি ভাবছি যে আপনি আমার উপর একটা ছাপ ছেড়েছেন। ওটা ছাড়ে না, ওটা ছাড়বে যখন একটা সময় আসবে তখন ছাড়বে। তখন ওটা পুরো ঘনীভূত হয়ে পড়ে যাবে। যেমন, আমরা জীবনে অনেকের সাথেই পরিচিত হচ্ছি, অনেককেই জানছি, কিছু দিন পর বেশির ভাগ লোককেই মনে থাকে না, তার মানে কোন দাগ ফেলতে পারেনি। দাগ ছেড়ে যাওয়া মানেই অন্তর্জগতে একটা স্থান করে নেওয়া। এখন ঐ চিন্তার মেঘ থেকে কতটা নীচে যাবে, কতটা যাবে না, বলা খুব মুশকিল। এটা মানুষ থেকে মানুষে তফাৎ হয়ে যায়। ফ্রয়েড এই জিনিসটার অন্যান্য অনেক নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এই জিনিসটাকে পুরো অন্য ভাবে নিচ্ছি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি।

অনেকে বহু দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনেই যাচ্ছেন। এখানে যে এত শাস্ত্রের ক্লাশ হয়, সব থেকে বেশি ছাত্র ভর্তি হয় নতুন কোর্সে, সেখান থেকে বছর বছর এই কোর্স সেই কোর্স করেই যাচ্ছে। তার কারণ, শাস্ত্রের কথা এদের চিন্তার জগতেও ঢুকতে পারছে না, চিন্তার জগতটা যেন একটা দেওয়াল, অন্তর্জগতে যাওয়ার আগেই চিন্তার জগতে ধাক্কা খেয়ে বাউন্স করে ফেরত চলে আসছে। অন্তর্জগতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠছে না, শাস্ত্রের কথাগুলো ওর চিন্তার জগতেও ঢুকতে পারছে না। চিন্তার জগতের বাইরে আরেকটা হল শব্দের জগৎ, এখন এরা এই শব্দ নিয়ে চলছে। ঐ শব্দ জগতের বাইরে ক্রিয়া জগৎ, খুব হলে ক্রিয়া জগৎ ঐ শব্দ জগতে যায়, চিন্তার জগতেও ঢুকতে পারে না, অন্তর্জগতের তো কোন প্রশ্নই নেই। যখন একটা দুটো ফোঁটা অন্তর্জগতে গিয়ে পড়বে তখন জীবন তার পাল্টাতে শুরু করে দেবে। ছেলে মেয়েরা যখন এক অপরকে ভালোবাসার কথা বলে, সারাদিন এসএমএস করে যাচ্ছে আই লাভ ইউ, এর তখন পুরোপুরি verbal worldএ শব্দের জগতে বিচরণ করছে। ঐ শব্দ জগৎ তার চিন্তার জগতে ঢুকছে না, এরও ঢুকছে না, ওরও বেরোচ্ছে না। কদাচিৎ কখন যদি ওটা চিন্তার জগত থেকে বেরিয়ে থাকে তাতেই আগুন লেগে যায়, আমি তোমাকে এত ভালোবেসে বলি আর তুমি এর কোন দামই দাও না। আরে তুমিও ভাবো না, তোমারও তো চিন্তার জগত থেকে বেরোচ্ছে না। ভালোবাসা কিন্তু সেখানেও হয় না। যখন ক্রিয়া জগৎ থেকে হয় তখন তো সেটা বেশ্যাবৃত্তি হয়ে গেল। যখন শব্দের জগৎ থেকে হয় তখন বর্তমান কালের ছেলে মেয়েদের প্রেম হয়ে যাবে। চিন্তার জগৎ থেকে যখন হয় তখন অনেকটা superior। অন্তর্জগতে যদি এক অপরকে স্থান করে থাকে ওটাকেই বলবে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। ঐ সম্পর্ক পাওয়া বা দেখা খুব দুর্লভ। ঠাকুর বলছেন, কলকাতায় দেখলাম সবারই নিম্ন দৃষ্টি, সবারই মন নীচের দিকে। সেইজন্য যখন নরেনকে দেখছেন তখন তিনি চমকে উঠছেন, এই আধার! আর ঠাকুরকে দেখে তোতাপুরী চমকে উঠছেন, এই আধার! আর আজকের দিনে ঠাকুর যদি কলকাতায় ঘুরতেন তাহলে ঠাকুরের কী অবস্থা হত ভাবা যায়!

এই যে চিন্তার জগৎ থেকে শব্দ বেরোবে, সাধারণ মানুষের এটা হয় না। শব্দের জগৎ থেকেই তার শব্দ বেরোতে থাকে। সেইজন্য কারুরই কিছু হয় না। আগেকার দিনে গ্রাম দেশে ভাগবতাদির পাঠ হত, সবাই লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছে, বসছে আর বছরের পর বছর শুনে যাচ্ছে, কিন্তু ভাগবতের কথা তাদের চিন্তার জগতেই ঢুকতে পারছে না, অর্থাৎ শব্দ জগতের পরে যেতেই পারছে না। ঐ চিন্তার জগতে ইমোশানসও আছে আর চিন্তা ভাবনাও আছে। কিন্তু ওর নীচে ওখান থেকে মাঝে মাঝে ঘনীভূত হয়ে অন্তর্জগতে নেমে যায়, যেটাকে আন্তরিক

জগৎ, বেদান্তে যাকে সূক্ষ্ম জগৎ বা সূক্ষ্ম শরীর বলছেন। চিন্তার যে জগৎ ওটাও কিন্তু অন্তর্জগতের একটা অংশ, কিন্তু বহির্জগতের সাথে চিন্তার জগতের যোগাযোগ আছে বলে পুরোপুরি অন্তর্জগৎ বলা যায় না। আর এই যে আমরা অন্তর্জগতকে চিন্তার জগৎ, চিন্তার জগতকে অন্তর্জগৎ বলে ভাবছি, তা কিন্তু নয়, অন্তর্জগৎ পুরোপুরি বাস্তবিক জগৎ। ঐ অন্তর্জগতে যখন কোন চিন্তা বা কোন কিছুর relationship পৌঁছে যাবে, তখন বুঝবেন এবার তার ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে শুরু করেছে। শুধু চিন্তার জগতে থাকলেও ব্যক্তিত্ব পাল্টায় না। কিন্তু তবুও শব্দ জালের মহা অরণ্য থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। যত শাস্ত্র সব শব্দ জাল, টিভিতে কিছু মিনিংলেস কথা শাস্ত্রে তাও একটু মিনিংফুল কথা, এর বেশি কিছু না। কিন্তু যখন চিন্তার জগতে প্রবেশ করছে তখন সে অনেক এগিয়ে গেল, ঐটাই যখন ঘনীভূত হয়ে, ফিল্টার্ড হয়ে মাটিতে পড়ল তখন তার অন্তর্জগতটা পাল্টে গেল। এবার ওখান থেকে যেটা উঠবে ওটাই ঠিক ঠিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা শব্দ জগৎ থেকেও আসছে না, চিন্তার জগৎ থেকেও আসছে না, কোথাও যেন অন্তর্জগতের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে, ভেতর থেকে না একেবারে অন্তর্জগৎ থেকে। ওনার কাছে সত্যটা ঐ রকম।

ঠাকুর বলছেন, তোমাদের ঈশ্বর কি রকম জানো, মন্দিরে এসে বেড়াতে বেড়াতে বলছে ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন, শুধু এই একটা কথা, ঠাকুর যেটাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, যিনি বলছেন ওনার ঈশ্বর কি অন্তর্জগতের ঈশ্বর? মোটেই না। সে তো জীবনে নিজেই অন্তর্জগতে এখনও ঢোকেইনি, অন্তর্জগৎ বলে যে কিছু আছে সেই আইডিয়াটাই নেই। যার অস্তিত্ব নেই এটা নাকি তার কার্য। আমার আপনার সবার কাছে ঈশ্বর একটা শব্দ মাত্র। জেঠি খুড়ীদের কোঁদল শুনে বাচ্চারা যেমন বলে তোর ঈশ্বরের দিব্যি। ঐ শব্দ মাত্রে আরও দু-চারটে শব্দকে মিলিয়ে বাগবিতণ্ডা চলছে, ঈশ্বর আছেন, আমি বলছি ঈশ্বর নেই। আচ্ছা ভাই, তুমি কি অন্তর্জগতে প্রবেশ করে পেয়েছ যে ঈশ্বর নেই? যেমন ভগবান বুদ্ধ, তিনি অন্তর্জগতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর ওনাকে ঈশ্বরের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করছে, উনি তাকে আটকে দিচ্ছেন। ঐ যে তিনি ঈশ্বরের ব্যাপারে কথা বলতে নাকচ করে দিচ্ছেন, ঐ কথাগুলো কোথা থেকে আসছে? তাঁর অন্তর্জগৎ থেকে। ঠাকুর যখন বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর আছেন, কোথা থেকে বলছেন? অন্তর্জগৎ থেকে। আরে ভাই আগে তুমি অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, প্রবেশ করে আছে কি নেই কিছু একটা দেখ। এটা শুধু ঈশ্বরের ব্যাপারেই নয়, যে কোন কাজ করছে, সবটাতে মূল ঐ একটাই, আমাদের বেশির ভাগ কথাগুলো বেরোচ্ছে শব্দ জগৎ থেকে, কখন কখন কিছু কথা চিন্তার জগৎ থেকে। সেই চিন্তা আবার চিন্তা ভাবনা থেকে আসছে না, চিন্তা ভাবনা করে যেটা আসছে সেটা আসছে অন্তর্জগৎ থেকে। আর শব্দ জগৎ থেকে যে চিন্তাগুলো আসে সেগুলো হাওয়া মিঠাই, ওগুলো কিছু না। কারণ চিন্তা ভাবনা যে করবে সেই চেষ্টাই নেই, একটু পরে একটা সূত্র আসবে সেটা নিয়ে তখন আলোচনা হবে, আমাদের কোন আইডিয়াই নেই যে যেটাকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করব, একটু গভীরে যাব। গভীরে গেলে তখন বুঝতে পারা যাবে। এই যে আমরা বলি, একটু ভেবে দেখুন তো কি চান?

কোথা থেকে ভেবে দেখবে! তার কোন আইডিয়াই নেই তার অন্তর্জগৎটা কি। বলে চাওয়া-চাওয়ি কিছু নেই, কিন্তু আমাদের পরিষ্কার চাওয়া-চাওয়ি আছে, একটা বড় বাড়ি হবে, সামনে একট বড় বাগান থাকবে আর হাত-পা যেন নাড়াচাড়া করতে না হয়, চোখের চাহনিতেই দশজন চাকর এসে হাজির হয়ে সেবা করে দেবে, একেবারে সেরা খাবার দাবার আসবে, এত কিছু পাওয়ার জন্য যে পয়সা রোজগার করতে হবে সেটা আমাকে যেন কিছু না করতে হয়, টাকা আয় করার জন্য যে খাটতে হবে সেটাতে আমি নেই, একটা বড় গাড়ি চাই, যেখানে খুশি যেতে পারব, রাস্থাঘাটে যেন কোন জ্যাম না পাই ইত্যাদি, বাচ্চা থাকবে, পাঁচ ছয় বছরের সন্তান থাকবে, দেখতে খুব মিষ্টি হবে, তার যেন জ্বর না হয়, সর্দিকাশি না হয়, তাকে নিয়ে যেন কোন ঝামেলা না হয়, দেখলে ওকে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করবে, আর স্ত্রী ভাববে আমার স্বামী জগতের সেরা হবে আর স্বামী ভাববে আমার স্ত্রী বিশ্বসুন্দরী হবে, সবটাই আমার ইচ্ছা মত হবে। এত ভেবে দেখার কি আছে! যখন কেউ বলে ভেবে দেখ তো কি চাও? কি চাইবে আর, সবাই এসবই চায় এর বাইরে কেউ কিছু চায় না।

নেতারা বলছে আমি অপরের জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছি, যে কেউই তো বলে দিতে পারি আমিও অপরের জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছি, কারণ সব কথা শব্দ জগৎ থেকে বেরোচ্ছে। কিন্তু মহাপুরুষরা যে কথাগুলো বলছেন, ভগবান যীশু বলছেন, প্রভু তুমি এদের ক্ষমা করে দাও, এরা জানে না যে এরা কি করছে।

এনারা অন্তর্জগতের বাসিন্দা, তিনি জানেন কি বলছেন। আমরা হলাম শব্দ জগতের বাসিন্দা, চিন্তা জগতেরও বাসিন্দা নই আর পুরোপুরি ক্রিয়া জগতেরও বাসিন্দা নই, ক্রিয়া জগতের বাসিন্দা হলে তো গরু মোষের মত হয়ে যাব, কারণ পশুরাই ঠিক ঠিক ক্রিয়া জগতের বাসিন্দা। আমরা যে শাস্ত্রের কথা শুনছি তার কিছু কিছু চিন্তার জগতে ঢুকছে। কোন দিন কদাচিৎ দু-চারটে কথা হঠাৎ ঘনীভূত হয়ে অন্তর্জগতে পড়ে গেল, সেখান থেকেই জীবনটা তার পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে।

আমরা প্রায়ই এই স্লোগানটা শুনে থাকি, কথা কম কাজ বেশি। কথা কম কাজ বেশি মানেই এ পুরোপুরি বহির্জগতের লোক। যে কথা বেশি বলে সে শব্দ জগতের, যে চিন্তা-ভাবনা করে সে চিন্তার জগতের লোক। কেউই কিন্তু নিজের জগৎ ছাড়তে চায় না। আমরা বেশির ভাগই হলাম শব্দ জগতের বাসিন্দা। যারা কাজকর্ম করে তারা তাদের নিন্দা করে যারা শুধু বই পড়ে, শাস্ত্র পড়ে। যারা অন্তর্জগতের লোক তারা চিন্তা-ভাবনাটাও কম করে, কথা খুব কম বলেন, কাজও খুব কম করেন। নারদ ভক্তিসূত্রে পর পর এগুলোকে নিয়ে এগোবে। একটা জগৎ থেকে যখন আরেকটা জগতে যাচ্ছে তখন খুব মুশকিল হয়। সেইজন্য বলে আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা এগোবেন তাঁদেরকে আগে বহির্জগতটাকে বন্ধ করে দিতে হয়, কথাবার্তা কম করবে, সেখান থেকে বলবে ধীরে ধীরে চিন্তা-ভাবনা করা, পড়াশোনা করাটা কমিয়ে দিতে হবে, তবে এটা শেষে বলা হয়, প্রথমেই পড়াশোনা কমিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে যারা অনেক কিছু করে বেড়াচ্ছে, এটাও করছে, সেটাও করছে, বুঝতে হবে অন্তর্জগতে ঢোকার এখনও সময় হয়নি, তবে আজেবাজে জিনিস করার থেকে এগুলো করা অনেক ভালো।

মানুষের স্বভাব কখনই পাল্টায় না, কারণ তার যে অন্তর্জগৎ ঐ অন্তর্জগৎ সহজে পাল্টায় না। যোগশাস্ত্রেও বলছেন, স্বামীজীও বলছেন, যে সংস্কারগুলো নিয়ে আমরা জন্ম নিয়েছি ঐ সংস্কার সহজে পাল্টায় না। ওটাকে পাল্টাতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার মানে বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ থেকে যে cloud formation হয়ে রয়েছে, ওখান থেকে যখন কিছু হবে। কিভাবে হবে? যখন চিন্তার জগতে বাস করতে শুরু করে। যাদের এখন বয়স হয়ে গেছে, বাড়িতে যারা সবাইকে বলে দিয়েছে আমার একটু ভাত ঝোল হলেই হয়ে যাবে, তোমাদের বাড়ির জঞ্জালে আমাকে আর জড়িও না, তার মানে এনারা এখন প্রচুর জপধ্যান করছে। দেখা যাবে ঐ বয়সেও তার ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে শুরু হয়ে যায়। অনেকে মনে করবে বয়স হয়ে গেছে বলে এই রকম হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়, তার ব্যক্তিত্ব পাল্টাচ্ছে, তখন ঈশ্বরীয় ভাব তাদের মধ্যে প্রকাশ হতে শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ জপ করলেই কিন্তু এটা পাল্টাবে না, ক্রিয়া কর্ম যাই করুক পাল্টাবে না। চিন্তার জগতে গিয়ে মনটাকে ধরে যখন পাল্টাতে শুরু করবে তখনই পাল্টাতে শুরু করবে। সেইজন্য ঐ জায়গাতে গিয়ে ধরতে হয়।

আটান্ন নম্বর সূত্রের আলোচনা চলছে, *অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ*। যে ভক্তি আমাদের ধীরে ধীরে মুখ্যা ভক্তির দিকে নিয়ে যায়, এই ভক্তিকে সহজে উপলব্ধি করা যায় আর এটাকে চেনা যায়। এই সূত্রে কিন্তু পুরোপুরি অন্তর্জগতে ঢুকছে না। এর পরের সূত্র থেকে অন্তর্জগতে ঢুকে যাবেন। এটাই ঠিক ঠিক চিন্তার জগৎ। চিন্তার জগৎ হলেও এখানে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে ওর এখন চিন্তা-ভাবনা বেশি চলছে। আগে তার পঞ্চাশটা জিনিসকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে জগতটা পাল্টাতে শুরু হয়ে যায়। যেমন একটা কলেজের মেয়ে, কলেজের পঞ্চাশটা মেয়েকে নিয়ে তার জগৎ চলছে। যেই বিয়ে হয়ে গেল তখন তার স্বামী, শ্বশুড়, শাশুড়ি সন্তান এদের নিয়ে তার জগৎ শুরু হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যেমনি ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে নিল এবার তার ঈশ্বর কেন্দ্রিক জীবন শুরু হল। এখনও কিন্তু সে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেনি, চিন্তার জগতেই আছে। ভাক্তিশাস্ত্রের প্রণেতারা বলছেন ঈশ্বরের কথা নিয়ে যে সে এখন চিন্তার জগতে প্রবেশ করে গেল, এটা কিন্তু পরা ভক্তির তুলনায় সহজে করা যায় আর সে ঈশ্বর কেন্দ্রিক জীবনে আছে কিনা এটাকে চেনাও যায়। কারণ তখন তার যে শব্দগুলো আসবে সেই শব্দগুলো পাল্টে যাবে, তার আচার আচরণও পাল্টে যাবে। ফলে তার চরিত্র, তার যে ব্যক্তিত্বও পাল্টে যায়। এর আগে ঠাকুরর কথা নিয়ে আমরা বলছিলাম কিভাবে এগুলো চেনা যায়। এরপর আরও দুটো তিনটে লক্ষণ আছে।

আমরা যে এতক্ষণ মনের জগৎ, শাব্দিক জগৎ, অন্তর্জগৎ নিয়ে আলোচনা করলাম, যখন ধর্ম সাধন হয় সেখানেও তখন ঠিক এভাবেই হয়। প্রচুর পূজা-অর্চনা করছে, তখনও কিন্তু সে পুরো বাহ্যিক জগতে বাস করছে আর খুব স্তোত্র স্তব পাঠ করছে, খুব আবেগ নিয়ে ধর্মীয় কথা বলছে বা শুনে যাচ্ছে তখন সে শব্দের জগতে বিচরণ করছে। এর পেছনে আছে মনের জগৎ যেখানে ওকে ধীরে ধীরে বিদ্ধ করতে শুরু করে, খুব কঠিন। মনের জগতে যে জিনিসগুলো ওকে ঢোকাবে সেগুলোকে আয়ত্ত করা খুব কঠিন। আর এই যে বর্ণনা করছেন এটা মুখ্যা ভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু ঐ জগৎ নিয়েই বলছেন, আর চাইছেন ঐ জগৎ থেকে ঈশ্বরের যে সত্তা, সেই সত্তা যেন আমাদের ভেতরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমাদের সবটাই সত্য, বাহ্যিক জগতটা যেমন সত্য অন্তর্জগতও সত্য আর চিন্তার জগতও ততটাই সত্য। এর মধ্যে কোনটাই কল্পনা নয়। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা মনে রাখতে হবে, চিন্তার জগতে কল্পনা আছে কিন্তু অন্তর্জগতে কোন কল্পনা নেই, ওখানে ঐ যে সত্তা আমাদের জন্য ওটাই বাস্তবিক সত্তা। আর সত্যিকারের কল্পনা যাকে বলছি ঐ লোকের কাছে সত্য। এটা একটা আলাদা বিষয়। পুরো নারদ ভক্তিসূত্রে বাহ্যিক জগত নিয়ে কিছু বলবেন না। এনাদের ব্যাপার হল অন্তর্জগৎ আর খুব হলে হৃদ্য চিন্তার জগৎ। এই সূত্রে যেটা বর্ণনা করছেন, এটাই চিন্তার জগৎ, যেটা বোঝা যায়। যদি সত্যিকারের ভক্ত যদি চিন্তার জগতে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু তার পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে যাবে। এর আগে যে প্রেমা ভক্তির কথা বলা হয়েছে তার তুলনায় মুখ্যা ভক্তিটা ভালো বোঝা যায়। আর এর অনুশীলনও সহজে করা যায়, *সৌলভ্যং*। এর আগে কিছু লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলছেন স্বপ্ন জগৎ সেখানে ঈশ্বরীয় দৃশ্য গুলো আসতে থাকে আর বলছেন ঈশ্বরীয় গুণ গুলো প্রকাশ হতে শুরু করে। সবার প্রতি ভালোবাসা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, অহিংসা এগুলোর প্রকাশ হতে থাকে, এগুলো আমরা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এরপর আরেকটা লক্ষণের কথা আসছে। ঠাকুর বলছেন, মনে হয় যেন জিহ্বার অগ্রে জপ হচ্ছে। প্রথমের দিকে যখন জপ করে তখন ওটা অমনিই করে যাচ্ছে, ওতে কিছু হয় না। কিন্তু যখন অনেক জপধ্যান করতে শুরু করে তখন কিছু দিন পরে জিহ্বার ডগাটা নড়তে শুরু করে। বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু নিজে বুঝতে পারবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে সে অন্তর্মুখী হতে শুরু করে। তারপর মনে হবে জিহ্বার দুই পাশের পেশীটা যেন নড়ছে, সেখান থেকে আরও ভেতরে দিকে যায়। এগুলো এক একটা অবস্থা। জপ আরেকটু এগিয়ে গেল, মন আরেকটু গভীর হয়ে গেল তখন জপ পুরো ভেতরে চলতে থাকে। তখন মনে হবে হৃদয়ে জপ হচ্ছে। এই ভাবে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে। অনেকের আবার মনে হবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে জপ হচ্ছে। প্রথমটা শুরু হয় জিহ্বার অগ্রভাগ থেকে, জপটাও টানা চলতে থাকে। পরে দেখে যে চেষ্টা না করলেও জপটা চলতে থাকে, এটাকেই অজপা বলছেন। ঠাকুর বলছেন, দেখো রাখালের কেমন স্বভাব হয়ে গেছে, ওর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে মাঝে মাঝে ওর ঠোঁটটা নড়ে উঠছে। যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন তাঁদের এটা হয়, মাঝে মাঝে ঠোঁটটা নড়ে ওঠে। একজন মহারাজ আছেন, বয়স হয়েছে, উনি আরতির সময় ঠিক ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসবেন, কেউ থাকলে তাঁকে উঠিয়ে দিয়ে বসবেন, আর আরতি দেখতে দেখতে তিনি মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠেন, ভেতরে শিহরণ হতে থাকে। এই যে ঠাকুর বলছেন, রাখালের কেমন স্বভাব হয়ে গেছে বা এই যে মহারাজের শিহরণ হয়, এই লক্ষণ দেখে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কারণ একটা দিক দেখে এগুলো কখনই বোঝা যায় না। আরও অনেক কিছুকে মিলিয়ে নিয়ে দেখলে তখন বোঝা যায়।

স্বামীজী খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, যদিও উপনিষদেরই কথা, আধ্যাত্মিকতার শেষ মাপকাঠি হল স্বার্থহীনতা, কতটা সে স্বার্থহীন হচ্ছে। অনেক মহিলা ভক্তকে দেখা যায়, সবাইকে ভালোবাসছে, জপধ্যান করছে, মন্দিরে আসছে কিন্তু মাথাটা খারাপ। তার কারণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায়নি, তার আরও কিছু কিছু জিনিস যদি দেখা হয় তখন দেখা যাবে অনেক কিছুই মিল খাচ্ছে না, কোথাও গিয়ে একটা বেখাপ্পা এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমরা জপ নিয়ে বলছি, প্রচুর জপ যদি করা হয়, দিনে চার-পাঁচ ঘন্টা, তখন শরীর মনে নানান রকম লক্ষণ ফুটে ওঠে।

এর আগে বলা হয়েছিল তিন ধরণের মানুষ ঈশ্বরের পথে আসে, আর্ত, অর্থার্থি আর জিজ্ঞাসু, চতুর্থ একটা শ্রেনী আছে মাথা খারাপ, এরাও ঈশ্বরের পথে আসে। মাথা খারাপ আর জিজ্ঞাসু এই দুটোর মধ্যে তফাৎ করা খুব মুশকিল। তবে জাগতিক ব্যবহার দিয়ে ধরা যায়। তবে কি, ঈশ্বরের পথে যাঁরাই আসেন তাঁরা

কিন্তু খুব balanced হন, খামখেয়ালীপনাটা থাকে না। আমরা কাটা কাটা কিছু বলতে পারি না। একটা নামকরা রাশিয়ান অর্থোডক্স বই আছে যার নাম Way of a Pilgrim, একজন খ্রীশ্চান সন্ন্যাসীর অটোবায়োগ্রফির আকারে রচনা। বইটা পড়লে বোঝা যায় খ্রীশ্চান মরমিয়া সাধকরা কিভাবে জিনিসটাকে দেখেন। উনি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন যে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে প্রার্থনাটা কিভাবে করতে হয়, সবাই বলছে প্রার্থনা করতে কিন্তু প্রার্থনাটা কিভাবে করবে, how to pray। পুরো বইটা ওখান থেকেই শুরু। এরপর উনি তৎকালীন বড় বড় সব ফাদারদের কাছে যাচ্ছেন, কেউ তাঁর উপর রেগে যাচ্ছেন, কেউ তাঁকে পাগল ভাবছেন। শেষে তিনি খুব প্রাচীন একজন ফাদারের কাছে গেলেন, তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে দেখালেন প্রার্থনা কিভাবে করতে হয়। এখানে আমরা ঐ বই থেকে কয়েকটা কথা আলোচনা করছি, বোঝানর জন্য যে একই জিনিস অন্যান্যা দেশে, অন্যান্য সংস্কৃতিতেও বলা হয়। এগুলো আবার নিজের উপর লাগাতে যাওয়াটাও উচিৎ নয়, শুধু জেনে রাখা। উনি লিখছেন, ঐ প্রাচীন সন্ন্যাসী তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন, প্রথমে তিনি আমাকে বললেন প্রথমে জোরে জোরে প্রার্থনা করবে। জোরে জোরে প্রার্থনা করলে শব্দগুলো কানে বসে যায়। বৈষ্ণবরাও হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ যখন করছে তখন প্রথমে জোরে জোরেই করে, সেটাই জপ করে। এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল, ভক্তির দিকে যখন এগোয় তখন তার কতকগুলো লক্ষণ দেখে বোঝা যায় ভক্তিতে এগোচ্ছে কিনা। আমরা আলোচ্য বিষয়ের বাইরে গিয়ে দুটো কথা বলছি। কানে যতক্ষণ মন্ত্র না বসে ততক্ষণ কিন্তু ঠিক ভাবে জপ হয় না। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বা বাইরের অন্যান্য জায়গা থেকে দীক্ষা নিলে প্রথমেই নিষেধ করে দেওয়া হয়, মুখে তো বলবেই না, ঠোঁটও যেন না নড়ে। একজন খুব সিনিয়র মহারাজ বলতেন, কাছে যখন কেউ নেই একা আছে তখন গুন্ গুন্ করে করা যায়, তাতেও কানে বসে যায়। এটা তাদের জন্য যারা একেবারে প্রথম অবস্থায় আছে। কিন্তু যাঁরা এগিয়ে গেছেন তাঁদের আর দরকার হয় না। এটা হল একটা পদ্ধতি যাতে মনকে ধীরে ধীরে জপের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। দ্বিতীয় হল, হাতে বা মালায় সংখ্যা রাখা। মজার ব্যাপার হল, হাতে বা মালাতে সংখ্যা রাখলে ধ্যান করাটা প্রথমে কঠিন হয়ে যায়। আর সংখ্যা যদি না রাখা হয় তখন ধ্যান যে কোথায় উড়ে যাবে বুঝতেই পারবে না। অনুশীলন করার পর গুন্ গুন্ করাটাও আর ভালো লাগে না, বিরক্তিকর মনে হয়, মনটা যেন সরে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হয় যে এবার সে এগোচ্ছে। দ্বিতীয়, এরপর করে জপ করা বা মালাতে জপ করা সেটাও তখন বিরক্তিকর মনে হয়। তবে বড় বড় মহারাজদেরও দেখা যায় যে করে বা মালায় নিজের মত জপ করে যাচ্ছেন আর অন্য দিকে ঠাকুরের চেতনাটাও চলতে থাকে। এটাই আরও খুব গভীর অবস্থায় গেলে ওঁ ধ্বণি শুনতে পান। ঠাকুর বলছেন, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। তখন জপ না করলেও ওঁ ধ্বণিটা শুনতে পান। এই ধ্বণি যে শুধু হিন্দু সাধকরাই শুনতে পান তা না, সব ধর্মের উচ্চমার্গের সাধকরাই শুনতে পান। তবে ওঁ না শুনে ঘন্টার ঢং ধ্বণি শুনতে পান। ইনিও এই বইতে বলছেন, তিনি পরিষ্কার তখন শুনতে পাচ্ছেন।

উনি বলছেন, এই প্রার্থনা করতে করতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, প্রার্থনাটা এত প্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে যে আমার ভেতর এখন এটা সব সময় চলতে থাকে। কিছু দিন পরে দেখছি, আমার চেষ্টা করা না সত্ত্বেও প্রার্থনা অনবরত হতেই থাকে। এই যে বলছেন চেষ্টা না করা সত্ত্বেও জপ হতেই থাকে, এটা বাস্তবিকই হয়। আমরা হয়ত পারব না, কিন্তু দশদিন যদি কেউ টানা ছয় ঘন্টা জপ করেন, এগারো দিনে গিয়ে দেখা যাবে তার এটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রথমের দিকে চেষ্টাটা করতে হবে, প্রথমে ঠোঁট নড়বে, তারপর দেখা যাবে জিহ্বাটা নড়ছে, ওটাকে সচেতন ভাবে বন্ধ করতে হবে, আর যতটা সম্ভব ভেতরের দিকে নিয়ে যাওয়া, যতটা ভেতরে দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে ওর টানটা তত বেশি হবে। যেমন কেউ ঠোঁটের উপর যদি টানা দশ দিন ছয় ঘন্টা করে জপ করে তাহলে একাদশ দিনে থাকবে, দ্বাদশ দিনে থাকবে, তারপর ওটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি জিহ্বাতে যদি দশ দিন ছয় ঘন্টা করে করা হয় ওটা তখন আরও দশদিন পনের দিন চলবে, আরেকটু যদি ভেতরের দিকে হতে থাকে তাহলে আরও এক মাস চলতে থাকবে। উনি বলছেন আমি এত জপ করলাম যে এরপর চেষ্টা না করতেই জপ হতে থাকছে। আমাদের পরম্পরাতে এটাকেই অজপা বলছেন। আবার বলছেন, এটা যে আমার জাগ্রত অবস্থাতেই হতে থাকে তা না, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন ঘুমের মধ্যেও আমার জপ চলতে থাকে, শুধু চলছেই না, প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকে। আমি যে কাজই করি না কেন, সব

কাজের সময়েও এই জপ চলতে থাকে। শ্রীমাও অজপা জপের কথা বলছেন বা আমাদের পরম্পরাতে যে অজপা জপের কথা বলা হয়, আর এটাকে যে খুব সম্মান দেওয়া হয় তার কারণ এটাই। এমন অবস্থা আসে যে, যখন আমি থামাতে চাইছি, এবার জপটা থামুক, তাতেও থামে না। আর মনে মনে চলবে না, পরিষ্কার হৃদয়ের ভেতর থেকেই টানা জপ হতে থাকে, মনে হবে কেউ যেন ঠেলে একটা ফোয়ারা তৈরী করে দিয়েছে। এই রকম যখন হয় তখন বুঝতে হবে তার জপধ্যান এবার চিন্তার জগতে ঢুকেছে, এখনও কিন্তু অন্তর্জগতে ঢোকেনি। শাব্দিক জগৎ থেকে এখন চিন্তার জগতে এসেছে। সেখানেই তার এখন স্বপ্ন আসতে শুরু হবে, শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন হতে শুরু হবে আর অজপা হতে শুরু হয়।

উনি এবার একটা খুব মজার জিনিস বলছেন, আমি যখন কাজ করছি তখন দেখছি একদিকে হৃদয়ে জপ চলছে আর কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাজা মহারাজ বলছেন, পনের আনা ঈশ্বরে দিয়ে যদি এক আনা মন কাজে দেয় তাতেই কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। আসলে তাই হয়, আমরা জানিনা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যাঁরাই খুব নিষ্ঠার সাথে জপধ্যান করেন তাঁরা প্রচুর স্পীডে আর দক্ষতার সাথে কাজ করে দেবেন। যে কোন কাজ, হাতের কোন কাজ, লেখার কোন কাজ বা প্রশাসনিক কোন কাজ যদি দেওয়া হয় তাঁর কাজের স্পীড অনেক বেড়ে যায়। উনিও তাই লিখছেন, আমার কাজের স্পীড বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে আরও একাগ্র ভাবে কাজে মন দিতে পারছেন। তার সাথে আবার বলছেন, এবার যদি আমি কোন কিছু পড়ছি বা অন্য কিছু করছি তার মধ্যে একটু সজাগ হলে দেখছি আমার দুটোই চলছে, জপও চলছে আর পড়াটাও চলছে। নিউরো বিজ্ঞানীরা এগুলোকে নিয়ে তাদের মত একটা ব্যাখ্যা করে দেবেন। নিউরো বিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিকরা, মনোবিজ্ঞানারা এরা যখন আধ্যাত্মিক জগতকে ব্যাখ্যা করতে আসে তখন এমন সব ভুলভাল কথা বলতে থাকে যে ওদের সাথে আর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না, এদের কোন লেখাও পড়তে ইচ্ছে হয় না। ওনারা নিজের এলাকায় থাকার সময় ঠিক বলেন, কিন্তু এটা তাঁদের এলাকা নয়, এই এলাকার সম্বন্ধে তাঁদের বলার কোন এক্তিয়ার নেই। এই যে এখানে বলছেন, একদিকে তাঁর পড়ার স্পীড প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে, স্বামীজী বই পড়তেন দেখে মনে হতে যেন পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন, পাতা খুলছেন সঙ্গে সঙ্গে সবটাই ধরে নিচ্ছেন, অন্য দিকে তাঁর ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের নাম ঐ একই স্পীডে চলছে। বাস্তবিক এই রকমই হয়, দুটো জিনিসই তাঁর এক সঙ্গে চলে। তারপর বলছেন, শেষে আমার মনে হতে শুরু হল আমি যেন দুজন আলাদা লোক, একটা লোক যেন জপ করে যাচ্ছে আর আরেকটা লোক যেন অন্য দিকে কাজগুলো করে যাচ্ছে। একই শরীরের মধ্যে যেন দুজন আলাদা লোক, এটা তিনি একটা উপমা দেওয়ার জন্য বলছেন। কিন্তু কিভাবে দুটো পুরো আলাদা সত্তা একই শরীরে চলছে। এর খুব স্থূল একটা উপমা হল, ছেলেগুলো গান চালিয়ে রেখেছে আর অন্য দিকে পড়াশোনা করে যাচ্ছে। আমরা তাদের ধমক দিয়ে ঠিকই করছি, সত্যিই ওদের মস্তিষ্ক দুটো জিনিসকে একসাথে নিতে পারে না।

কিন্তু এখানে একদিকে কাজ করছেন অন্য দিকে তাঁর জপ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে দুটো রিলেট করছে কি করে? তার মানে, গান শুনতে শুনতে পড়াশোনা করলে পড়ার মান নীচে নেমে যাচ্ছে, জপ করতে করতে পড়ছে তখন পড়ার মানটা উন্নত হচ্ছে। অন্যরা বলবে এটা মনের ভুল। ঠিকই মনের ভুল হতে পারে। কিন্তু ছেলেরা যখন গান শুনতে শুনতে পড়াশোনা করছে তখন তারা তাদের বাহ্যিক জগতের ব্যাপারে পুরো সজাগ, কেউ ডাকছে, ফোন বাজছে সবটাই শুনছে। কিন্তু এনারা পুরো বাহ্যিক জগৎ থেকে সরে আসেন। কেউ যদি হাল্কা করেও কাছে এসে ডাকে তাতেই এমন জোর চমকে উঠবেন যে, যে ডাকতে এসেছিল সেই ঘাবড়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। এখানে উনি বলছেন, মনে হয় আমার ভেতরে দুটি আলাদা লোক আলাদা কাজ করছে। নিওরো বিজ্ঞানীর বলবেন, আমাদের ব্রেনে অনেক নিওরোন আছে, তার একটা এক রকমের প্রসেসিং করছে, আরেকটা আরেক রকম প্রসেসিং করছে কিন্তু কখনই দুটো জিনিসকে এক সঙ্গে করতে পারে না। নিওরো বিজ্ঞানীরা ঠিকই বলছে, বহির্জগতে দুটো কাজ এক সঙ্গে সত্যিই করতে পারে না, কিন্তু অন্তর্জগতে দুটো কাজ এক সঙ্গে হয়। দুটো কাজ যদি এক সঙ্গে না করতে পারে, এরা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে, সাধকরা আর এগোতে পারবেন না। তারা আর খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে না, ঘুমোতে পারবে না, কারণ এই যে বলছেন চব্বিশ ঘন্টা জপ হয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টা যদি জপধ্যান হয় তাহলে ভিক্ষা করবে কখন, রান্না করবে কখন, খাবে কখন। ফলে দুটো সত্তা তার এক সঙ্গে চলে, আর দুটোই খুব স্পষ্ট। এই হল মোটামুটি যে জিনিস গুলো দিয়ে বোঝা যায়

একজন জপধ্যান করছে কিনা, ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে কিনা। তবে এখানেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না, কারণ এই ধরণের শত শত আইডিয়া আছে।

এই ধরণের ভক্তির অর্থাৎ গৌণী ভক্তির অনুশীলন করে তিনি মুখ্যা ভক্তির দিকে এগোচ্ছেন। বলছেন এটা কিন্তু বোঝা যায় কিন্তু প্রেমা ভক্তি হল, ঠাকুর বলছেন দীঘি আর ডোবা। ডোবাতে হাতি নামলে জল তোলপাড় করে, দীঘিতে হাতি নামলে বোঝাও যায় না। প্রেমা ভক্তি হল বড় দীঘি। আর সব ডোবা, এখান থেকেই শুরু হয় কিনা, এই ভক্তির অনুশীলন করাও যায় আর পরিষ্কার বোঝাও যায়। পরের সূত্রে বলছেন –

প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ চ।।৫৯।।

এর অর্থ খুব স্পষ্ট, প্রমাণ অর্থাৎ এই জিনিসটা সত্য কিনা, ঠিক কিনা, এর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেন অপেক্ষা রাখে না? *স্বয়ং প্রমাণাত্বাৎ*, এটা নিজেই প্রমাণ। প্রমাণ শব্দ আসে মাপা থাকে, প্রমাণের যে 'ম' আছে, এর অর্থ মাপা, 'প্র' মানে একেবারে প্রকৃষ্ট, কোন ডান দিক বাম দিক যেন না হয়। প্রমাণ মানে হয় Test of Truth, যখন evidence বলছে তখনও Test of Truth হচ্ছে। আমি একটা কথা বলছি জিনিসটা এই রকম হয়েছিল, এটাকে এবার প্রমাণ করতে হবে। কিভাবে প্রমাণ করবে? তখন evidence নিয়ে আসছে। প্রমাণ নিয়ে আসা মানে জিনিসটাকে সত্য রূপে সামনে নিয়ে আসা, তাই প্রমাণ মানে verification of truth। কেউ একটা কথা বলল কিংবা কিছু একটা ঘটনা ঘটল, এটা ঠিক কিনা কিভাবে জানা যাবে? এর জন্য প্রমাণ দরকার। বিজ্ঞানের কোন কিছুকে প্রমাণ করার জন্য, একটা ইক্যুয়েশান আছে, এর প্রমাণের জন্য ওনারা experiment করে নেন, experiment করে করে দেখিয়ে দেন জিনিসটা এই। গণিতের ক্ষেত্রে যে নানা রকম থিয়োরম আসছে তখন নানান steps দিয়ে দিয়ে ওটাকে প্রমাণ করে দেন। আর জীবনে যখন আসে তখন ছয় রকমের প্রমাণ আসে, একসাথে বলা হয় ষট্‌প্রমাণ, যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানছি, যে কোন জিনিস যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, ও সব কটার রাজা। বেদান্ত হোক, ভক্তিশাস্ত্র হোক, যে কোন শাস্ত্র হোক কেউই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কক্ষণ প্রশ্ন করতে পারবে না। যদি বলা হয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে তো অনেক সময় আমর ভুলও দেখি, যেমন একজন ট্রেনে বসে আছে, ট্রেনটা চলতে শুরু করল মনে হবে প্ল্যাটফরমটা পেছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। তখন ওনারা বলবেন, ও যে জ্ঞান তোমাকে দিচ্ছে ওটা ভুল জ্ঞান দিচ্ছে না, তোমার বোঝাটা ভুল। কারুর সাথে শুধু যাচাই করে নিলে ঐ জ্ঞানটা এসে যাবে। আচার্য শঙ্কর তাই খুব জোর দিয়ে বলছেন, শাস্ত্রে যদি হাজারটা অন্য রকম কথা থাকে কিন্তু প্রত্যক্ষ যদি অন্য রকম হয়, সেখানে প্রত্যক্ষটাই ঠিক হবে, ঐ জায়গায় শাস্ত্রের কথা কখনই নেওয়া যাবে না। প্রত্যক্ষের ঠিক পেছনে আসে অনুমান প্রমাণ, অনুমান হল logic, deductions, প্রত্যক্ষ প্রমাণে যা কিছু দেখেছে সেখান থেকে deduction। তৃতীয় প্রমাণ, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল শাস্ত্র প্রমাণ। কিছু কিছু জিনিস আছে যাকে একমাত্র শাস্ত্র থেকেই জানা যায়, প্রত্যক্ষ দিয়ে জানা যায় না, অনুমান দিয়েও জানা যায় না। যেমন ঈশ্বর, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দিয়ে জানা যায় না আর deduction দিয়েও জানা যায় না, একমাত্র শাস্ত্র দিয়েই জানা যায়। স্বর্গ, নরক, কর্ম, পুনর্জন্ম এগুলোকেও প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যাবে না আর যুক্তি দিয়েও দাঁড় করান যাবে না, একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ। এটা পুরো একটা আলাদা বিষয়, এখানে বিস্তারতি ভাবে আলোচনা করার দরকার নেই।

বহির্জগৎ যখন চলে তখন পুরোপুরি এই প্রমাণ গুলোর উপর চলে। এই তিনটে প্রমাণেরই আবার অনেকগুলো ভেদ আছে, বেদান্ত ছয়টি প্রমাণ নেয়। তবে তিনটে প্রমাণকে বুঝলে মোটামুটি বোঝা যায় যে কি বলতে চাইছে। যেমন বিজ্ঞান বেদ মানবে না কিন্তু আইনস্টাইনকে মানবে, সেওতো শাস্ত্র প্রমাণ হয়েই গেল। যে কোন মানুষের জীবন চালাতে গেলে তার এই তিনটে প্রমাণ লাগবে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান বিজ্ঞান মানবে কিন্তু শাস্ত্রকে মানবে না। কিন্তু সে যে লাইনে আছে, সেই লাইনের বড়রা কি বলে গেছেন সেটাকেই সে প্রমাণ মেনে চলে যতক্ষণ না ওটা অন্যথা মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রে অন্য রকম হয়, ওখানে contradiction বলে কিছু হয় না। প্রমাণের ব্যাপারে সংক্ষেপে এখন এটুকু জেনে নিলেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

প্রমাণন্তরস্য, ভক্তিতে যদি প্রমাণের কথা জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বলতে হবে এটা স্বয়ং প্রমাণ, অনপেক্ষ, অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। হিন্দীতে খুব নামকরা একটা প্রবাদ আছে, মানুষ যদি

নিজেকে দেখতে চায়, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে, তার জন্য প্রমাণ লাগে। কি প্রমাণ? কাউকে জিজ্ঞেস করছে, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে। আর যদি কাউকে না পায় তখন সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তাতেই যাচাই হয়ে যাবে, টিপটা ঠিক আছে কিনা, কাজল ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা। এবার কেউ একজন হাতে একটা বালা পড়েছে। সে কি এখন আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে বালাটা হাতে পড়েছি কিনা দেখার জন্য? বালা পড়ে আমাকে কেমন লাগছে তার জন্য আয়নার কাছে যেতে পারে। কিন্তু বালাটা পড়েছি কিনা এটা জানার জন্য তাকে আয়নার কাছে যেতে হবে কি হবে না? কখনই না, হিন্দী প্রবাদে এটাই বলছে, হাতে বালা থাকলে হাতে বালা পড়েছি কিনা জানার জন্য আয়নার কাছে যেতে হয় না। প্রবাদটাকে খুব মজা করে বলা হয়, কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর তাৎপর্য হল, কিছু কিছু জিনিস স্বয়ং প্রমাণ। হাতে যে বালা পড়েছে এটা সে চোখেই দেখছে, এটাই প্রমাণ, প্রমাণ তো হচ্ছেই। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি দেখছে। কিন্তু আমরা ওখানে সরে এসে আয়নাকে নিয়ে এলাম বোঝানোর জন্য, কিছু জিনিস আয়না দিয়ে দেখা হয় আর কিছু সরাসরি দেখা হয়। যে জিনিসকে সরাসরি জানা যাচ্ছে সেটার জন্য আয়নার কাছে যাওয়ার দরকার হয় না।

এবার যদি আমরা পুরো জিনিসটাকে অন্তর্জগৎ আর বহির্জগতে নিয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সূত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, বিশেষ করে এর আগে যে আমরা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ আর মাঝখানে যে একটা চিন্তার জগৎ ও শব্দ জগৎ এই চারটে জগতের কথা আলোচনা করলাম, এই চারটে জগতের সাথে এই সূত্রের একটা যোগ আছে। কাজ করতে করতে অনেক সময় ভাবি কত সময় চলে গেল, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছি, আরে সবে তো পাঁচ মিনিট হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আধ ঘন্টা চলে গেছে। আধ ঘন্টা হয়েছে কি হয়নি এটার জন্য দরকার প্রমাণ, প্রমাণ সব সময় আসে বহির্জগৎ থেকে। এই বহির্জগৎ হল world of objects। এখানে দুটো জিনিস, আকাশ ও প্রাণ, আকাশ হল matter আর প্রাণ হল energy, বহির্জগতে এই দুটো জিনিস সব সময় চলছে। Matter ধীরে ধীরে objectহয়ে যায় আর energy তাকে চালায়। আর চালানো হল event আর measure of event হল সময়। একটা যে object তার যে motion সেটাকে বলছেন event। যে কোন দুটো জিনিস, যেমন ঘড়ির কাঁটা, কাঁটা যখন একভাবে চলছে আর তার যে মাপ এটাকে আমরা বলছি সময়। তার মানে একটা সামান্য জিনিস থেকে energy condesed হয়ে matter হচ্ছে, সে energy আবার matterএর উপর কাজ করছে, সেখানে থেকে একটা objectএ রূপান্তরিত হচ্ছে, যেমন একটা গ্লাশ, গ্লাশ সাধারণ ভাবে সিলিকন, সিলিকন আবার সাধারণ ভাবে এনার্জি, ওটাই হয়ে হয়ে একটা object হয়ে গেছে, এটা এখন পুরোদমে বহির্জগৎ। গ্লাশের উপর যদি এখন আমি হাত চালাই তখন এনার্জি ওর উপর কাজ করছে। আমি যে গ্লাশকে এখান থেকে ওখানে রাখছি, গ্লাশকে যে নাড়াচ্ছি এটা একটা event হয়ে গেল। আর ঐ eventকে যদি মাপা হয় এটাই টাইম। সেইজন্য টাইম, এনার্জি, ম্যাটার সব সম্বন্ধযুক্ত। আইনস্টাইন ঠিক এই জিনিসটাই করলেন, তিনি time, object, event আর distance এর সবটাকে সম্বন্ধযুক্ত করলেন, তার সাথে এনার্জি স্বাভাবিক ভাবেই সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে। পরিবর্তন না হলে event হবে না। জগতে কোন কিছুই নেই যেটা অপরিবর্তনশীল, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। কিন্তু ভেতরে তো কোন event হচ্ছে না, subjectivityতে কোন event নেই। ফলে সেখানকার সময়ের অনুভূতি অন্য রকম, ওটা সচেতনতার উপর চলে, সচেতন হওয়াটা আবার মনের কাজ। মন সব সময় সক্রিয়, সক্রিয় থাকার জন্য মন সময়কে দেখতে পারে। সময়ের সচেতনতা যত বাড়ে, সময়কে তত লম্বা বলে মনে হয়। সময়ের সচেতনতা যত কম হবে সময়কে তত ছোট মনে হবে। যে ছেলে পরীক্ষার হলে লিখছে, সে লেখাতে এত ব্যস্ত যে তার সময়ের কোন হুঁশ থাকে না, ফলে বুঝতেই পারে না যে তিন ঘন্টা হয়ে গেছে। কিন্তু পরীক্ষায় গার্ড দিচ্ছেন তাঁর তো কোন কাজ নেই, সেইজন্য তাঁর মন শুধু সময়ের দিকে পড়ে আছে, কখন তিন ঘন্টা হবে। তাঁর মনে হচ্ছে সময় যেন আর শেষ হতে চাইছে না।

ইমোশানের ক্ষেত্রে একই জিনিস হয়। ভেতরের কাম, ক্রোধ আদি এগুলোকে নিয়ে যত ভাববে, ভেতরে সেই ইমোশান গুলো ততো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কারুর উপরে রেগে আছে, ঐ রাগকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাগটা বিরাট হয়ে যায়। এগুলোর সবটারই verification দরকার পরে বাইরের জগতে। শুধু এই ইমোশান গুলোকে নিয়েই ভাবার কথা বলা হচ্ছে না, যে কোন বস্তুকে যদি সে পেতে চায় আর সেই বস্তুর চিন্তা করে যাচ্ছে, গীতায় যেমন বলছেন *ধ্যায়তো বিষায়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে*। আমি যদি রেগে থাকি, ঐ

রাগকে নিয়ে যত আমি ভাবতে থাকব তত ঐ রাগ বাড়বে। ওর আবার verification দরকার। স্বামীকে স্ত্রী ফোনে বলল একটা শাড়ি নিয়ে আসতে, স্বামী ফোনে আবার কি বলল সেটা স্ত্রী বুঝতে পারল না, ভাবল শাড়ি আনবে না বলতে চাইছে। এবার স্ত্রী গরম হয়ে গেল। এরপর গরম হতে হতে এত গরম হয়ে গেল যে সব কিছুই গোলমাল হতে শুরু হয়ে গেল, রান্নবান্না সব চুলোয় উঠে গেল। ছেলে এসেছে, ছেলেকে কিছু বলল না, স্বামী বাড়ি ফিরল, তখনও ফুঁসে আছে। স্বামী এসে বলল, আমি তো তখন বললাম আনব, আর এই দেখ শাড়ি এনেছি কিনা। এবার স্ত্রী কোথায় যাবে? ঐ গরম হয়ে ফোঁসফাস করছিল, পুরোটা এখন চুপসে গেল। তাই বলে কি স্বামীকে এখন জড়িয়ে ধরবে? না, পরিষ্কার করে বলতে পারো না, এই বলে এক ধমক দিল। ওই রাগকে বেরোতে হবে, এখানে না হয় স্বামীর উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, এমনকি ছেলের উপরেও লাগিয়ে দেবে, শিক্ষকরা ছাত্রদের উপরে, যে কোন জায়গাতে লাগিয়ে দেবে। যদি দেখি আমার এই রাগ আপনার জন্য হয়নি আমারই ভুল বোঝার জন্য হয়েছে, তাহলেও কিন্তু একটু দিতে হবে। কোথাও না কোথাও ইমোশানকে বেরোতে হবে, এই verification ও চায়, এই verificationটাই প্রমাণ।

ভেতরে যেটা আছে সেটাকে বাজিয়ে দেখে নেবে। এখন কি কি জিনিস আছে যাতে প্রমাণ লাগে না? জগতে এমন কিছু নেই যার প্রমাণ লাগে না। একটা দু তিন বছরের শিশুর অস্তিত্ব পুরো মায়ের উপর দাঁড়িয়ে। নিজের মনে খেলে যাচ্ছে কিন্তু থেকে থেকে একটা ডাক মারে, মা তুমি কোথায়। অথবা খেলছে আর মাঝে মাঝে এসে মাকে একটু ছুঁয়ে যাবে। অন্য ঘর থেকে মা সারা দিল, সারা পেয়ে আবার সে খেলতে থাকবে বা মাকে ছুঁয়ে বা একটু আদর করে আবার বন্ধুদের সাথে খেলতে থাকে। বাচ্চা কিনা, মা আছে কি নেই এটা নিজের চোখ দিয়ে যাচাই করে গেল। ওর মন কিন্তু এখন মায়ের উপর নেই, মন খেলার উপরেই আছে। একটু বড় হয়ে গেলে, ক্লাশ ফাইভে পড়ছে এখন আর ওকে যাচাই করতে হয় না, ও জানে আমি বাড়ি যাব, মা খাওয়া নিয়ে রেডি থাকবে। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সময়, ইমোশান যাই হোক না কেন, সব কিছুর জন্য প্রমাণ দরকার। কিন্তু চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যাবে, একটা জিনিস কোথাও আছে যেটা পুরোপুরি subjective element, যেখানে তার প্রমাণ লাগে না। আরেকটা বলা যায়, নিজের অস্তিত্বকে সব সময় বোধ করছি বলে অস্তিত্বের প্রমাণ লাগে না।

ডেখার্ডের একটা খুব নামকরা কথা আছে, কথাটা লাটিন ভাষায় হল Corgito ergo sum যার ইংলিশ অনুবাদ হয় I think, therefore, I am, আমি ভাবছি আমি আছি বলে আমি আছি। কিন্তু ওখানেও একটা subjectivity থাকে, যেখানে subjectivity আছে সেখানে প্রমাণ লাগে না। এটা সব থেকে ভালো দেখা যায় সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাস, মা জানে আমি সন্তানকে ভালোবাসি। সন্তান বাঁদর হোক, ভালো হোক যাই হোক মায়ের ভালোবাসা থাকবে। কিন্তু ছেলে মেয়েদের যে ভালোবাসা ওখানে এক উপরের উপর যাচাই চলতে থাকে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাস তাহলে এক্ষুণি আমার সঙ্গে দেখা কর। ওদের ভেতরটা পুরো ফাঁকা কিনা, যার ভেতরটা ফাঁকা সেও ধরে নেয় যে আমার সামনের লোকটির ভেতরটাও ফাঁকা। যখনই কেউ একজন কারুর কাছে প্রমাণ চাইছে, তুমি কি আমাকে ভালোবাস, বুঝবেন গোলমালটা যে বলছে তার ভেতরেই গোলমাল, সে ফাঁকা। নিজের ভেতরটা ফাঁকা বলে সামনের মানুষটিকে সন্দেহ করছে, তার কাছে প্রমাণ চাইছে। প্রেম জিনিসটা, সে যে কোন প্রেমই হোক, বন্ধুত্বের প্রেম, ছেলে মেয়েদের প্রেম, সন্তানের উপর মায়ের প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, প্রেম সব সময়ই পুরোপুরি subjective, এখানে কক্ষণ কোন objectivity involved থাকে না, সেইজন্য এখানে কোন প্রমাণের দরকার পরে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, হিমালয় আমাকে কিছু দেয় না, কিন্তু হিমালয়কে আমি ভালোবাসি, এটা আমার নিজের ভেতরের জিনিস। আমাদের সবারই একটা অন্তর্জগৎ আছে, ঐ অন্তর্জগতে আমাদের কয়েকজন লোকের সাথে সম্পর্ক। আমি জগতের যে কোন লোকের সাথে যে কোন সম্পর্ক তৈরী করে নিতে পারি। শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী আমরা সবাই মানছি, কিন্তু গর্ভধারিণী গর্ভধারিণী, ওই সম্পর্ক কোন দিন পাল্টানো যাবে না। আমাদের অন্তর্জগতে গর্ভধারিণীর সম্পর্কটা একটা কেল্লা হয়ে বসে আছে। আমার মা কুরূপা হোক, সুরূপা হোক, ভালো হোক, মন্দ হোক, দুশ্চরিত্রা হোক, যাই হোক গর্ভধারিণী গর্ভধারিণী, এটাকে অস্বীকার কখনই করা যাবে না। ঠিক তেমনি যিনি ভক্ত, তাঁর সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক ওটা একটা প্রতিষ্ঠিত জিনিস। তাঁকে যদি কেউ বলে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসছ কিনা প্রমাণ কর। যে ছেলে নিজের মাকে ভালোবাসে সেখানে তাও একটু objective element

আসতে পারে, কারণ মায়ের প্রতি ছেলের যে ভালোবাসা এটাকে কখনই ঠিক ঠিক subjective বলে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা ওটাকে standard subjective মনে হয় বা গুরুর শিষ্যের প্রতি ভালোবাসা খুব উচ্চমানের মনে করা হয়, কারণ সেখানে একটা subjectivity থাকে। Subjectivityতে থাকা মেনে অন্তর্জগতে ঢুকে গেছে।

ভক্তির অনুশীলন শুরু করার সময় হয়ত তাকে বলে দেওয়া হল শিব তোমার ইষ্ট। তার আগে পর্যন্ত শিব তার ইষ্ট ছিল না, সে শিবলিঙ্গ দেখেছে মাত্র, শিবরাত্রিতে উপোস করেছে, অনেক কিছু করেছে। কিন্তু এতদিন শিবলিঙ্গ ছিল তার বাহ্য জগতের, অমুক মন্দিরের শিবলিঙ্গ। আর খুব হলে তার চিন্তার জগতে ঘুরছে শিবরাত্রিতে উপোস করলে মনের মত বর পাওয়া যায়। এবার সে শিব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, ঠিক করে নিয়েছে শিবের সাধনা করবে, শিবকে ভক্তি করবে। সেই শিবই যিনি এতদিন তার চিন্তার জগতে ছিলেন, সেখান থেকে এবার ফোটা ফোটা বৃষ্টি হয়ে তার অন্তর্জগতে জমতে শুরু করল। অন্তর্জগতকে যদি একটা বরফের বিস্তির্ণ এলাকা মনে করা হয়, যেখানে মাইলের পর মাইল শুধু বরফ, আর সেখানে তার ভালোবাসার যা যা বস্তু আছে সেই সেই বস্তু যেন বরফের এক একটা মূর্ত রূপ ধারণ করে বসে আছে। শিবের যে ভাব ওটাও এখন ওখানে মূর্ত রূপে জমাট বাঁধতে শুরু করল। চিন্তা যত সে বেশি করবে চিন্তার জগৎ থেকে ফোটা বরফ তত তত বেশি পড়বে। ফোটা যত বেশি পড়বে শিবের ভাব তত বেশি গাড় হবে। সবটাই তার সচেতনতার উপর চলছে, সচেতনতা যত বেশি হবে মন তার ততটুকুই নামবে, তখন বাকি জিনিসগুলো সে নিতে পারবে না। সেখানে এত দিন ঐ কামিনী, কাঞ্চন, এই সেই আরও পঞ্চাশটা জিনিস ছিল, সেই সচেতনতাটা এখন ধীরে ধীরে শিবের উপরে চলে যাচ্ছে। এখন তার শিবের প্রতি এই ভক্তি সত্যিকারের কিনা কে জানতে পারবে? একমাত্র সেই জানতে পারবে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। আর এটার জন্য কোন প্রমাণেরও দরকার পড়ে না।

বলে চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না। কিন্তু যে বামুনকে নতুন দেশে পুরোহিতের কাজ করতে যেতে হয় তাকে মোটা পৈতা লাগিয়ে যেতে হয়, আর বৈষ্ণবকে খুব করে তিলক কাটতে হবে, নামাবলী চাপাতে হবে, টিকি রাখতে হবে। প্রত্যেক ধাপে তাকেও প্রমাণ দিতে হয় যে আমি ভক্ত। শিবের ভক্তকেও প্রত্যেক ধাপে প্রমাণ দিতে হচ্ছে আমি শিবের ভক্ত। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক ভক্তি করেন তাঁর আর কোন কিছুই করতে হয় না। মাস্টারমশাই প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেছেন তিনি বৃন্দে ঝিকে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি গেরুয়া পড়েন? না। বইটই পড়েন? না। মাষ্টারমশাই কিছু বুঝতে পারছেন না। মাষ্টারমশাইয়ের মনে যে সাধুর সম্বন্ধে একটা ইমেজ হয়ে আছে, ঐ ইমেজের এখন যাচাইয়ের দরকার। কিন্তু কোনটাই ঠাকুরের সাথে মিলছে না, মাষ্টারের ধারণা এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সবারই অন্তর্জগতে এক একটা জিনিসের ব্যাপারে একটা ধারণা তৈরী হয়ে আছে, ওটাকে বাইরে আমরা সব সময় মিলিয়ে দেখতে যাই। যদি না মেলে তখন এলেমেলো লাগে, পরে আবার ঠিক করে নিতে হয়। মাষ্টারমশাই যেমন পরে ঠাকুরের বিরাট ভক্ত হয়ে গেলেন, ঠাকুরকে অবতার বলছেন। কিন্তু আমরা যে ভক্তির কথা বলছি, এই ভক্তি হল স্বয়ং প্রমাণ, যেমনি এই ভক্তিকে যাচাই করার জন্য বহির্প্রমাণে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে তার কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু তার জন্য বিরাট বড় সমস্যাও হয়, যারা শঠ তারা লোকেদের বোকা বানাবার জন্য বলবে, ভক্তি আমার ভেতরে আছে। বলতেই পারে, যে পরকে ঠকায় সে নিজেকেও ঠকায়, এটা অন্য জিনিস। কিন্তু এখানে শঠ, চালাক, ভেক ভক্তদের কথা বলছেন না, এখানে বলছেন ভক্তি আমার হচ্ছে কি হচ্ছে না।

প্রথমে বললেন, ভক্তির লক্ষণ বোঝা যায়, দ্বিতীয় বলছেন, ভক্তি কখন কারুর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বেদান্তে এর পরিভাষাই হল *স্বয়ংসংবেদ্য* বা *স্বসংবেদ্য*। *স্বসংবেদ্য* মানে যাঁর আছে তিনিই জানবেন। এর আগে *মূকাস্বাদনবৎ* সূত্রে ঠিক এরই উপর বলা হয়েছে, এর কথা বাইরে বলা যায় না, যার আছে তার আছে। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, ভক্তিতে যিনি এগিয়েছেন তিনি আর কারুর অপেক্ষা রাখেন না। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসীদেরও এই সমস্যা হয়, বয়স্ক মহারাজদের গিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, মহারাজ আমার কি কিছু হচ্ছে, আমার কি কিছু হবে, ইত্যাদি। পরে গিয়ে বোঝেন যে তখন কিছু হচ্ছিল না বলেই অত প্রশ্ন করতাম। ছেলে আর মেয়ে দুজনে শুধু ম্যাসেজ চালাচালি করে যাচ্ছে, ডু ইউ লাভ মি আর ডু ইউ লাভ মি, তার মানে কিছুই ভালোবাসা নেই সবটাই গোলমেলে, যেটা আছে সেটাও আর বেশি দিন থাকবে না। যে ঠিক ঠিক ভালোবাসে, তা সে যে দিকের ভালোবাসাই হোক, তাকে বার বার করে বলতে হয় না যে আমি তোমাকে

ভালোবাসি। স্বামীজী বলছেন, রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামের সাথে গিয়ে থাকব! ঈশ্বরকে যে ভালোবাসছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য সে ভালোবাসছে না, সে ভালোবাসছে তার কারণ এটাই তাকে করতে হবে। এরপর তিনি তাকে কৃপা করছেন কি করছেন না, তার কিছু হচ্ছে কি হচ্ছে না, এগুলোর কোন অপেক্ষাই সে রাখে না।

আমরা প্রায়ই বলি, ঠাকুরের যদি কৃপা হত তাহলে কি আমার এই দুরবস্থা হত, তার মানে আমি ভক্তির প্রমাণ চাইছি। ভক্তি কিন্তু কোন প্রমাণ দেয় না, কারণ সে স্বয়ং প্রমাণ। আমার টাকা-পয়সা নেই, আমার নামযশ নেই, আমি অভাগা আমার উপর ঠাকুরের কৃপা নেই। ঠাকুরের কৃপার সাথে এর কি সম্পর্ক? সংসার নিজের গতিতে চলে, তুমি নিজের গতিতে চল, দুটোর সাথে সম্পর্কের কি আছে। *প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ*, কোন প্রমাণের দরকার পড়ে না। কারণ, তিনি নিজেই জানেন আমার হয়ে গেছে। ওখানে অনেক সময় হেলুসিলেশান হয়, হেলুসিলেশান যাদের হয় তারাও ঠাকুরকে দেখছে, অনেক কিছু দেখছে, কখনও মায়ের দর্শন হচ্ছে। এই ভক্তিশাস্ত্র পড়া হয়ে গেলে দেখতে পাবে যে সেখানেও কাউন্টার চেকিং আছে, এটা হচ্ছে কিনা, সেটা হচ্ছে কিনা, ওগুলো দিয়ে তখন বোঝা যায় যে সে সত্যিই এগোচ্ছে কিনা। আমাদের অন্তর্জগতে যা কিছু হয় বহির্জগতে আমরা তার যাচাই করি, কিন্তু ভক্তিকে বলছেন স্বয়ংপ্রমাণ, বাইরে গিয়ে যাচাই করার দরকার হয় না। শুরুতেও আমরা বলেছিলাম আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তিনটে জিনিসের কখন প্রমাণ লাগে না, প্রথম হল আমি আছি, অস্তিত্বের কোন প্রমাণ লাগে না, আমি জানি, অর্থাৎ জ্ঞান, এরও কোন প্রমাণ লাগে না আর আমি ভালোবাসি, ভালোবাসারও কোন প্রমাণ লাগে না। এটাই হল সচ্চিদানন্দ, সৎ মানে অস্তিত্ব, জিনিসটা আছে, চিৎ মানে জ্ঞান আর ভালোবাসাই আনন্দ, এই তিনটে সৎ, চিৎ আর আনন্দ, এর কোন প্রমাণ লাগে না। এই তিনটেই মানুষের স্বরূপ, সচ্চিদানন্দই মানুষের স্বরূপ। সচ্চিদানন্দই ভগবান, ভগবানই সচ্চিদানন্দ, ভগবানই মানুষের স্বরূপ। আত্মা মানে নিজের অস্তিত্ব, আত্মজ্ঞান আর আত্মানন্দ, এই তিনটে জিনিসের কক্ষণ কোন প্রমাণ লাগে না। পড়াশোনা করাটা আমাদের স্বরূপ নয়, সেইজন্য সেখানে প্রমাণ দিতে লাগে, পরীক্ষা, ইন্টারভিউ কত ভাবে প্রমাণ দিতে লাগে।

প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ, এটাই অন্তর্জগতের ব্যাপার, এখানে কোন প্রমাণের দরকার হয় না। চিন্তার জগতেও যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু প্রমাণ লাগে। চিন্তার জগৎ থেকে যখন অন্তর্জগতে ঢুকে যায় তখন সেখানে যে আন্তরিক সত্য, পরে পরে যে সূত্র আসবে ঠিক এই জিনিসটার উপর আলোকপাত করবেন। যে জিনিসটাকে নিয়ে শুরু করা হয়েছিল, যেমন বেলুড় মঠের ঠাকুর, দীক্ষা যখন নিল তখন ঐ বহির্জগতের ঠাকুর এবার চিন্তার জগতে ঢুকলেন। ঐ চিন্তার মেঘ থেকে বর্ষণ হয়ে হয়ে যখন অন্তর্জগতে পড়ে তখন অমরনাথের শিবলিঙ্গের মত নতুন একটা শিবলিঙ্গ অন্তর্জগতে তৈরী হয়। ঐ শিবলিঙ্গ তৈরী হয়ে গেলে ওর আর প্রমাণের দরকার পড়ে না। বাইরের লোক তাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না তার ভেতরে কি হচ্ছে। কিছুই যে বোঝা যায় না তা নয়, বাইরের কিছু কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, যে লক্ষণগুলো নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু একটা অবস্থার পর ওটাকে বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যার হয়েছে তার কোন সন্দেহ নেই। এই হল এই সূত্রের মূল বক্তব্য। এর যে একটা ফল হয় সেটাকে পরের সুত্রে গিয়ে বলছেন –

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।।৬০।।

মন শান্ত হয়ে যায় আর মনে পরম আনন্দ আসে। ৬০, ৬১ আর ৬২ এই তিনটে সূত্রের কোথাও একটা যোগ রয়েছে। আমরা যে অন্তর্জগৎ, চিন্তার জগৎ আর বহির্জগতের কথা বললাম, এই জিনিসটাকে যদি ঠিক ভাবে ধারণা করা যায় তাহলে এই কটি সূত্রকে খুব সহজে বোঝা যাবে। অন্তর্জগতে আরও দুটো আস্তরণ আছে, যার কথা এর আগেও বলা হয়েছিল, যেটাকে কারণ জগৎ আর মহাকারণ বলে। যারা স্থূল জগতের বাসিন্দা তারা কদাচিৎ অন্তর্জগতে ঢোকেন। যে জগতকে আমরা দিনরাত দেখছি, পুরো জগৎ সব সময় বহির্জগতে বিচরণ করে যাচ্ছে। জগতের বেশির ভাগ মানুষ কখনই অন্তর্জগতের খবর নেয় না। নিজের ভেতরে একবারও তাকিয়ে দেখার তাগিদ আসে না যে, সত্যিই আমি কি চাইছি। সে জানে না সত্যি কাকে ভালোবাসে বা কাউকে কেন অপছন্দ করছে, এগুলোকে কখন ভেবে দেখে না। কিন্তু অন্তর্জগতের বাসিন্দা বেশির ভাগ সময় তাঁরা অন্তর্জগতেই বাস করেন, কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতে আসে। অনেকে অন্তর্জগতের আরও ভেতরে

কারণে চলে যান। এখানে একটা জিনিস মনের রাখা দরকার, জিনিসটা কত সত্য এটা যত ভেতরে যাবেন সেই সত্য তত বেশি দৃঢ় হবে। ঠাকুর নরেনকে বলছেন, আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাই, তোকে যেমন দেখছি তার থেকেও বেশি স্পষ্ট দেখতে পাই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। যেটা আত্যন্তিক সত্য, ওর যে সত্য যাঁরা অন্তর্জগতে বিচরণ করেন তাঁদের কাছে অনেক বেশি দৃঢ়। ধোঁয়াশে আবছা আলোয় দেখা আর টর্চ ফেলে দেখা, দুটো দেখার মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। আমরা স্থূল জগতের বাসিন্দা, অন্তর্জগতের দিকে মাঝে মাঝে অল্প একটু তাকাই, ফলে আমরা ওগুলো বুঝতে পারি না। খুব হলে আমরা চিন্তার জগতে একটু ঢুকি, তার বেশি না। অথচ অন্তর্জগৎ সবারই আছে, ঐ অন্তর্জগতে কারুর বিশেষ স্থান, কারুর কম স্থান।

অন্তর্জগতে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁরাই ভক্ত, তাঁরাই জ্ঞানী হন। অন্তর্জগতের আরও অন্তরে যখন চলে যান এনারাই অবতারের পর্যায়ে চলে গেলেন আর তারও পরে সব শেষ, ওখানে আর কিছু নেই, সব কিছুর লয় হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা ঐ মহাকারণ বা কারণের অবস্থায় গেছেন, ওটা এত আনন্দময়, এত গভীর যে তাঁরা আর সূক্ষ্ম জগৎ, স্থূল জগতের দিকে তাকান না। তাকানোর কথাও আসে না, ওখানেই অজাতবাদ চলে আসে, সৃষ্টি আদপেই হয়নি বলে উড়িয়ে দেন। তার মানে ওনার কাছে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আসলটা ওটাই। ঠিক সেভাবেই উড়িয়ে দেন স্থূল জগতে যারা বিচরণ করে তারা যেভাবে সূক্ষ্ম জগতকে উড়িয়ে দেয়। একজন মজা করে লিখছে, নিজের হেলুসিলেশানের পেছনে দৌড়ান পাগলামো আর অপরের হেলুসিলেশানের পেছনে দৌড়ান ধর্ম। এবার তাকেও যদি প্রশ্ন করা হয় বিজ্ঞানীদের হেলুসিলেশানের পেছনে দৌড়ানটা কি? এরা জানেই না যে অন্তর্জগৎ বলে কিছু আছে, সে নিজেও কিন্তু ঐ অন্তর্জগৎ দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে। এখানে একটা জিনিস জানার দরকার, যারা স্থূল জগতে বিচরণ করে তারা সূক্ষ্ম জগতের দিকে বেশি যায় না, আর যারা সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে তাদের কাছে স্থূল জগতের কোন দাম নেই। এর আগে আমরা দেখালাম শেলী কিভাবে আচরণ করছেন, ঠাকুর কি রকম আচরণ করছেন, এগুলো দৃষ্টান্ত, যাঁরাই অন্তর্জগতে বিচরণ করেন বহির্জগতে তাঁরা এভাবেই বিচরণ করেন। শেলীর কবিতা অন্তর্জগৎ থেকে বেরিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও চিন্তার জগৎ থেকে নয়, অন্তর্জগৎ থেকে বেরিয়েছে আর এই যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যা কিছু পড়ছি এগুলো সব চিন্তার জগৎ থেকে আসছে। অন্তর্জগতের বিচরণকারী পুরুষ কখনই স্থূল জগতকে বেশি দাম দেন না, তাঁর চিন্তার জগতটা খুব দামী। এগুলো ধারণা করা খুব মুশকিল, কিন্তু একবার যদি বোঝা যায় এখানে কি বলতে চাইছেন তখন সবটাই খাঁচে খাঁচে বসে যাবে। সূক্ষ্ম জগতের যাঁরা বাসিন্দা, অন্তর্জগতে যাঁরা বিচরণ করছেন তিনি কিন্তু যে কোন অন্তর্জগতই হোক, তিনি কাব্যের অন্তর্জগতেও যদি ঘোরেন তখনও তাঁর কাছে স্থূল জগতের কোন দাম থাকে না। যেমন আমরা শেলীর দৃষ্টান্ত এনেছিলাম, তিনি কাব্যের অন্তর্জগতে এমন ভাবে বিচরণ করছেন যে স্নান করে এসে কাপড় ছাড়াই পার্টিতে চলে এসেছেন, স্ত্রীকে বলছেন, আমি আমার স্যুট তো খুঁজে পেলাম না। হাঁ করে সবাই তাকাচ্ছেন। শেলীর কোন হুঁশ নেই। যদি বলেন একি করলেন আপনি। উনি বলবেন, আমি তো স্যুট খুঁজছি, দোষ কি করেছি! আমরা না বুঝে হাসব, আমরা বুঝতেও পারছি না যে কত বড় মাপের মানুষ। ঠাকুর বলছেন, কাপড় পড়ার জন্য বান কি তোর দাঁড়িয়ে থাকবে? অন্তর্জগতে যাঁরা বিচরণ করেন স্থূল জগতে তাঁদের ব্যবহারটা স্থূল জগতের অনুযায়ী হয় না, একটু এলেমেলো হয়ে যায়।

এবার আমরা সত্যিকারের ভক্তের কথা কল্পনা করছি, যে ভক্তের কথা এখানে বলছেন। ভক্তি নিয়ে তিনি এখন অন্তর্জগতে বিচরণ করছেন, এবার তাঁর কি কি হবে? বাচ্চারা যখন তার নিজের খেলার জগতে বিচরণ করে তখন তারা অন্য কিছু ভাবে না। আমেরিকায় একটি অল্প বয়সী মেয়ে কলেজে ইন্টারভিউ দিতে গেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপকরা বসে আছেন, তাঁদের সামনে গিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়েছে। প্রিন্সিপাল দেখছেন মেয়েটির কানে ফুটো, নাকে ফুটো, নাভিতে ফুটো, সতের আঠারো বছর বয়সে সারা গায়ে ফুটো করান। আর যা পোশাক, পোশাক না পড়ার মত। এটা দশ পনের বছর আগেকার ঘটনা, তখনকার দিনে মেয়েটি ঐ ধরণের পোশাকে গেছে। প্রিন্সিপালের তো মাথায় হাত। তখন প্রিন্সিপাল বললেন, তোমার যা নম্বর আছে তাতে তোমার এ্যডমিশান হয়ে যাবে, তোমার সবই ঠিক আছে কিন্তু তোমার একটা ভ্যাক্সিনেশান নেওয়া নেই, ঐ ভ্যাক্সিনেশান সার্টিফিকেট তোমাকে দিতে হবে। তখন মেয়েটি আঁতকে বলছে, কি বলছেন, ঐ ছুঁচ আমাকে ফোটাতে হবে। এটাই জোক, এখানেই শেষ। এত গুলো ফুটো করিয়েছে সেটা নিয়ে মেয়েটির কিছু নেই কিন্তু একটা যে ভ্যাক্সিনেশান কলেজের জন্য বাধ্যাতামূলক, তার জন্য যে একটা নিডল্ ওকে ফোটাবে,

সেটাতে ওর ঘোর আপত্তি। যখন নিজের জগতে স্বেচ্ছায় করছে, ট্যাটু করুক আর যাই করুক, ওটা ওর কাছে কোন ব্যাপারই না, কিন্তু একটা ছুঁচ ফোটাতে হবে তাতেই সে আঁতকে উঠছে। বিয়ে বাড়িতে মেয়েরা কত জোশ নিয়ে কাজ করে কিন্তু বাড়িতে বাবা, দাদা এক গ্লাশ জল চাইলে দেবে না, নানা রকম বাহানা দেখাবে। ওটাই ওর জগৎ, এটাই সব ক্ষেত্রে হয়। তার মানে নিজের জগতে যখন যায় তখন ঐ জগতে ওর সময়ের বোধ থাকে না। কেন থাকে না? আনন্দে ভাসে। ওর জগৎ থেকে কেউ টেনে নিয়ে আসতে গেলে ওর মাথা গরম হয় যাবে। মজার ব্যাপার হল, ঐ জগতে যা যা হয় অন্তর্জগতে ঠিক তাই তাই হয়। অন্তর্জগতে সাহিত্য নিয়ে, ছবি আঁকা নিয়ে বা যে কোন কলা নিয়ে যখন চলে তখন এক রকম চলে, ভক্তি নিয়ে যখন চলে তখন আরেক রকম চলে। একটু তফাৎ থাকে তবে খুব বেশি থাকে না।

যাঁরা একমাত্র অন্তর্জগতে বিচরণ করে একমাত্র তাঁরাই এটা জানেন, বোঝেন আর আমাদের তথ্য দেওয়ার জন্য বলছেন *শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ*। ছেলে যতক্ষণ খেলা নিয় মস্ত থাকে ততক্ষণ সে শান্তিতে থাকে আনন্দে থাকে। গাঁজাখোড় যখন গাঁজা টেনে নেয় তখন বুঁদ হয়ে থাকে। যাঁরাও অন্তর্জগতে বিচরণ করছেন তাঁদেরও ঠিক তাই হয়, এই বহির্জগতে যা কিছু হয় কোনটাই তাঁকে আর ছুঁতে পারে না। এই যে ঠাকুর সাত্ত্বিক ভক্তের কথা বলছেন, তার গিন্নী বলছে, সারাক্ষণ কি ঠাকুর-টুকুর নিয়ে বসে আছ, কোন দিন তার গিন্নী বুঝতে পারবে না। কিন্তু ঠাকুর ওখানে যে ভক্তের কথা বলছেন, মনে হয় সেই ভক্ত এখনও চিন্তার জগতেই বিচরণ করছেন, এখনও অন্তর্জগতে প্রবেশ করেননি। কিন্তু যাঁর অন্তর্জগতে ঈশ্বরই সত্য তাঁর কাছে সব কিছুই তখন তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। তখন তিনি শান্তিতে থাকেন। অন্তর্জগতের শান্তিতে থাকছেন না, এখানে জিনিসটাকে খুব ভালো করে বোঝা দরকার। অন্তর্জগতের যিনি বাসিন্দা তিনি ভেতরে তো শান্তিতে থাকবেনই, এটা সবাই মেনেই চলছে, কিন্তু বহির্জগতের হাজার গোলমালের মধ্যেও তিনি শান্তিতে থাকেন। এর খুব কাছাকাছি দৃষ্টান্ত হল, তিন চার মাসের শিশু ঘুম ভাঙার পর কাঁদছে, এবার মা এসে তাকে দুধ খাওয়ালো। এবার ওর আনন্দ, ঘুম পুরো, পেটও ভরে গেছে। এখন যদি এর কোলে তার কোলে দিয়ে দেওয়া হয় ওটা সে সহ্য করে নেবে কিন্তু তার আগে মা ছাড়া আর কাউকে সহ্য করবে না। ঘুম থেকে উঠেছে, খিদে পেয়েছে ওকে এর ওর কোলে দিলে চিৎকার করতে থাকবে, মায়ের কোলে না যাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না। যেই খিদেটাও মিটে গেল এবার ওর শান্তি আর আনন্দ। তবে কিছুক্ষণ পরে আবার ওর খিদে পাবে ঘুম পাবে। এখানে বলছেন, যে ভক্ত অন্তর্জগতে ঢুকে গেছেন তাঁদের জন্য বহির্জগতটা শান্তির জগৎ হয়ে যায়, কারণ ভেতরে তাঁর পরমানন্দ পূর্ণ হয়ে আছে। বাইরের দিকেও মন যখন নামিয়ে আনছেন তখনও তাঁর পরমানন্দটা চলে যাবে না। ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শেষ অবস্থায় শায়িত, শরীরটা জীর্ণ শীর্ণ, ভেতরে রোগের এত যন্ত্রণা কিন্তু তিনি আনন্দে ভাসছেন। ঐ আনন্দে ভাসছেন বলে শান্তিতে থাকেন। কেন শান্তিতে থাকেন তার প্রথম পয়েন্ট হল, তিনি জানেন আসল সত্যটা ভেতরে আর তিনি সেখানে বসে আছেন, সেইজন্য যা কিছুই হোক, যা কিছুই করুক তিনি শান্তিতে আছেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি বা জ্ঞানের যে লক্ষণের বর্ণনা করছেন সেখানেও যে বলছেন, *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, ঐ একই জিনিস।

আর কদাচিৎ ওখান থেকে তিনি যদি জগতের মঙ্গল করতে নেমে আসেন তখনও তিনি অশান্ত হন না। অশান্ত হওয়া মানেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য আসা, সে শব্দের দিক থেকেই চাঞ্চল্য আসুক, কাজের দিক থেকেই চাঞ্চল্য আসুক, ব্যবহারের দিক থেকে চাঞ্চল্য আসুক তিনি শান্ত। চাঞ্চল্য মানে অশান্ত, অশান্তের বিপরীত শান্ত। যাঁরা ভক্ত, ভক্ত মানে যাঁরা অন্তর্জগতে বাস করছেন, এনারা সব সময়ই শান্ত হন। শান্ত মানে কোন তাড়াহুড়ো নেই। তাড়াহুড়ো দুভাবে হয়, যাঁরা অত্যন্ত ভদ্রলোক তাঁরা শান্ত থাকেন, ইংরাজীতে একটা প্রবাদই আছে যে a man in a hurry is no gentleman যে তাড়াহুড়ো করে সে ভদ্র নয়। স্বামীজীর হাঁটাচলার মধ্যে কোথাও কোন তাড়াহুড়ো নেই। উনি সহস্রদ্বীপে যাবেন, তাঁর সাথে আরও আট দশজন পুরুষ নারী শিষ্যরা আছেন, প্রচুর বড় বড় লাগেজ। ট্রেনে সবাই উঠে গেছে, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ট্রেনটা ছিল আবার টয় ট্রেন থেকেও ছোট। স্বামীজী তো রাজার মত হাটতে হাটতে আসছেন। শিষ্যরা দৌড়ে গিয়ে ট্রেনের ড্রাইভারকে খুব করে বলছে, প্লিজ ট্রেনটা একবার থামান। ড্রাইভার বলে দিল, আমি ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেব কিন্তু উনি যদি একটু পা চালান তবেই আমি দাঁড়াব। শিষ্যরা সবাই স্বামীজীকে বলছেন, স্বামীজী একটু যদি তাড়াতাড়ি করে পা চালান ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দেবে। ট্রেন দিনে একবারই ঐ প্রত্যন্ত স্থানে যায়। স্বামীজী

জিজ্ঞেস করছেন, ট্রেনটা কি আগামীকালও যাবে? বলা হল, হ্যাঁ যাবে। ঠিক আছে কালকেই যাব। উনি ঐভাবেই হাটছেন। ট্রেন থামল না, যত মালপত্র চাপানো হয়েছিল সব চলন্ত ট্রেন থেকে নামাল, সব মালপত্র নিয়ে নিজদের আস্তানায় ফেরত গেল। আবার আগামী দিন এসেছেন। স্বামীজীর কোথাও কোন তাড়াহুড়ো নেই। স্বামীজীর যেটা ছিল ওটা হয়ত একটু বেশিই হয়ে যায়। কিন্তু যিনি অন্তর্জগতের বাসী তাঁর কোথাও কোন তাড়াহুড়ো থাকে না। কেন তাঁর তাড়াহুড়ো থাকে না? উনি জানেন এই সৃষ্টি ঈশ্বরের, আমিও সেই ঈশ্বরেরই দাস, যা করার তিনিই করছেন, আমার কোন কিছুতে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কেউ মরে গেল, খুব ভালো মরে গেল, ঈশ্বর দিয়েছিলেন তিনি নিয়ে নিলেন, আমি তাতে কি করব।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হতে যাচ্ছেন, তিনি দোনমনো করছেন, প্যান্টশার্ট পড়ে যাবেন নাকি ফতুয়া আর ধুতি পড়েই যাবেন। সেই সময় একদিন বিদ্যাসাগর গঙ্গার ঘাটে পায়চারি করছেন, দেখছেন একজন নবাবও তাঁর আগে আগে পায়চারি করছেন। হঠাৎ একটা লোক দৌড়ে এসে নবাবকে বলছে, নবাব সাহেব আপনার বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, তাড়াতাড়ি চলুন। নবাব যেমন ভাবে চলছিলেন ঐভাবেই চলেছেন। আবার একজন দৌড়ে এসে বলছে, নবাব সাহেব সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলুন। তখন বিদ্যাসাগর একটু সজাগ হয়ে দেখতে চাইলেন ব্যাপারটা কি দেখি তো। নবাব ঐ লোকটার কথার কোন উত্তরও দিলেন। আবার আরেকজন এসে বলছে, নবাব সাহেব আপনি বুঝছেন না, চলুন তাড়াতাড়ি করে। তখন নবাব বলছেন, পুরনো পচা দু চারটে কাঠ পুড়ে যাচ্ছে তার জন্য আমার বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া চলন পাল্টে দেব! পুড়ে যাক তোমার সম্পত্তি। বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন, আর বলছেন, এই একটা চাকরির জন্য আমার বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া ফতুয়া আর ধুতি ছেড়ে সাহেবদের প্যান্টশার্ট পড়ব? সারা জীবন তিনি ফতুয়া ধুতি পড়েই কাটিয়ে দিলেন। আমরা নবাবের মাথার গণ্ডগোল বলতে পারি, ঠিকই মাথার গণ্ডগোল, তাঁর অন্তর্জগতে যে একটা সংস্কৃতি সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠিত, সব পুড়ে যাক, ছাই হয়ে যাক, আমি আমার নবাবী চলন ছাড়ব না।

একজন মুসলমান ডাক্তার, তিনি দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন, রোগী থাকলেও তিনি সময় করে নমাজ পড়ে নিতেন। এই নিয়ে একজন নিন্দা করে বলছিল, ইনি আবার কিসের ডাক্তার! কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, ডাক্তারের কাছে তোমাদের এই রোগীর জগৎ থেকে আল্লার জগতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মত লোকেদের পক্ষে এগুলো বোঝা খুব মুশকিল, যে নিজেকে কোন একটা কিছুর জন্য, সাহিত্যের জন্য, শিল্পের জন্য, ধর্মের জন্য পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছে, তাঁর কাছে ঐ জগতটা এত মূল্যবান যে জগতের সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে যায়। তাই বলে কি তিনি কোন ভুল করছেন যার জন্য ঐ লোকটা মরে যাচ্ছে? কিছু ভুল করছেন না, তাঁর কাছে সব আল্লারই সৃষ্টি, যাঁর সৃষ্টি তিনি তাঁকে নিয়েই পড়ে আছেন।

মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকতেন, রুটি ভিক্ষা করে প্রভুকে নিবেদন করতেন আর নিজেও খেতেন। একদিন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বলছেন, নুন ছাড়া রুটি খেতে বড় কষ্ট হয় একটু নুনের যদি ব্যবস্থা করে দাও। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে ব্যবস্থা করছি। এক জায়গা থেকেই তিনি ভিক্ষা নেবেন না, তাই আরও দুটো তিনটে বাড়িতে থেকে নুন ভিক্ষা করে আনতে হচ্ছে। তিনি আবার সঞ্চয় করবেন না। এভাবে বেশ কয়েক দিন চলছে। কিছু দিন পর শ্রীকৃষ্ণ আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছেন, এই শুকনো রুটি চলে না, একটু ঘিয়ের ব্যবস্থা যদি হত। রূপ গোস্বামী বলছেন, এর বেশি আমি পারব না, এর বেশি সেবার যদি আপনার দরকার হয় একজন ধনী ভক্ত জোগাড় করুন। তখন তিনি দক্ষিণ ভারতের এক রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন, তিনি এসে তখন বৃন্দাবনে রঙ্গনাথ মন্দির তৈরী করলেন। সেখানে সারাদিন শুধু এলাহি রকমের ভোগ হয়েই চলেছে। যে ভক্ত নিজের ইষ্টকে বলতে পারছেন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিন, কোন পর্যায়ের ভক্ত হলে এই কথা বলতে পারে ভাবা যায়! স্বামীজীও মঠের যে নিয়ম তৈরী করে গেছে সেখানেও পরিষ্কার করে বলছেন, ঠাকুরের সেবা পূজাতে বেশি কিছু আয়োজন করা যাবে না। মিশনের সাধনাই হল মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করা আর নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য জপধ্যান ও শাস্ত্রাদির চর্চা করা। যিনি তাঁর ইষ্টকে বলে দিচ্ছেন, মশাই নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিন, এখন তাঁর যে সৃষ্টি তাঁকে তিনি কি বলবেন? বলবেন, দেখো ভাই আমার পূজা অর্চনা, ধ্যানজপ করে আমার এতটুকু সময় ফাঁকা থাকে তার মধ্যে যদি তুমি আস হবে, এর বেশি হবে না। এগুলো করার জন্য তো লোক আছে আমাকে কেন টানতে হবে! আসলে পয়েন্টাটা আমরা এই

জায়গাতেই বুঝতে পারি না, একদিকে সমাজ চাইছে তিনি সত্যিকারের ভালো নামকরা একজন সাধু হন, অন্য দিকে আশা করছে তিনি সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করবেন। তা কখন হয় না, সমাজ কিছুতেই এটা বুঝতে চায় না। একজন ডাক্তার সারাটা দিন ডাক্তারি করে যাচ্ছেন, আর চাইছেনও রোগীদের চিকিৎসা করতে, সমাজ তাঁর কাছে যাক। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর কাছে আধ্যাত্মিকতা হয়ে গেছে মুখ্য, তিনি একটু যে অবসর সময় পান সেটুকু সময় তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য করে দিচ্ছেন। এখন মানুষ বলবে, এদিকে সময় দিলে তো অনেকেরই ভালো হয়, দু ঘন্টাকে আপনি চার ঘন্টা করুন, চার ঘন্টাকে দশ ঘন্টা করুন। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যটাই আলাদা। ঠাকুর বলছেন, তীর্থে গিয়ে কাঙালী বিদায় করতেই সব সময় চলে গেল। কাঙালীদের খাওয়াবার জন্য তীর্থে কেউ যায় না। অন্তর্জগতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে অন্তর্জগতটাই একমাত্র মূল্যবান। ফলে কি হয়, জগতে যা কিছু হচ্ছে, যত অশান্তি করছে, তাঁরা দেখেন জগৎ এই রকমই চলে এসেছে আর এই রকমই চলবে, এর দিকে বেশি নজর দিতে নেই। ফলে তিনি শান্তিতে থাকেন আর নিজের কাজটাও শান্তিতে করেন। আর যদি আদপে কখন মানুষের কল্যাণ করতে যান তখনও তিনি শান্তিতে থাকেন আর আনন্দে থাকেন, নিজের সন্তানেরও যদি কিছু হয়ে যায় তাতেও তিনি উদ্বগ্ন হন না। তিনি জানেন সবটাই ঈশ্বরের সৃষ্টি, অন্তর্জগতটাও তাঁর দেওয়া, বহির্জগতটাও তাঁরই দেওয়া।

ভোজবাড়িতে লোকেরা কত সক্রিয় থাকে, ইদানিং অবশ্য ক্যাটারারদের যুগ, কিন্তু আগেকার দিনে বিয়ে বাড়িতে, শ্রাদ্ধ বাড়িতে রাঁধুনিও চেঁচাচ্ছে, পরিবেশনা যারা করবে তাঁরাও চেঁচাচ্ছে, একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড লেগে যেত। সংসারটা ঐ নিমন্ত্রণ বাড়ির মত চলছে। ভক্ত যখন কাজ করে তখন ভোজবাড়ির মত কাজ করেন না, যে কাজটাই করেন শান্ত মনে, শান্ত ভাবে করেন। সেইজন্য গীতায় বলছেন *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোন্নোদ্বিজতে চ যঃ*, কাউকে বিরক্ত করেন না, নিজেও বিরক্ত হন না, জানেন সবটাই তাঁর সৃষ্টি। এই জিনিস যে শুধু ভক্তদেরই হয় তা না, যে কোন প্রতিভামান মানুষ যিনি সৃজনশীল জগতে থাকেন, তাঁদের কাছে বাস্তবিকতার বাস্তবটা যদি পাল্টে গিয়ে থাকে তাঁদেরও ব্যাবহারটা পাল্টে যায়। কিন্তু ভক্তের যে পাল্টায় সেখানে কারণটা অন্য ভাবে চলে। আর ওনারা ব্যক্তিগত ক্ষতিটা সেভাবে নিতে পারেন না। যেমন একজন কবি কোন মেয়েকে খুব ভালোবাসেন, সে তাঁর অন্তর্জগতের সত্তা, মেয়েটি যদি কোন কারণে সরে যায় সেটা তাঁর কাছে বিরাটা আঘাত। ভক্তের এই জিনিস হবে না, কারণ তাঁর অন্তর্জগতের সত্তা ঈশ্বরকেন্দ্রিক সত্তা। এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া উচিৎ যে, এই অন্তর্জগৎ কিন্তু চিন্তা ভাবনার জগৎ নয় একেবারে বাস্তবিক জগৎ। অন্তর্জগতের ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল না থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের সব কিছুই চলছে ঐ জগৎ থেকে। বাইরে যত রকম প্রতিক্রিয়া হয়, স্বামীর প্রতি, স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি, লোকজনের প্রতি, সমাজের প্রতি, সব প্রতিক্রিয়া আসলে আসছে ঐ জায়গা থেকে। চিন্তার জগতটাই প্রকৃতপক্ষে কল্পনার জগৎ, এর বাইরে যে বহির্জগতটাও কাল্পনিক নয় আর অন্তর্জগতটাও কাল্পনিক নয়। অন্তর্জগতে কেউ ভাণ করলে ওটা ধরা পড়ে যায়। কাউকে যদি সে ভালোবাসে, যেমন মা সন্তানের অন্তর্জগতের বাসিন্দা, সেই মা যদি তার ছোট্ট শিশুকে ভয় দেখায় সেও কিন্তু ভয় পায় না, সে জানে ওটা আমার মা। অন্তর্জগৎ জিনিসটাই আলাদা, অন্তর্জগতে যার কথা যত ভাববে তার অস্তিত্ব অন্তর্জগতে তত বেড়ে যায়, তার গুরুত্ব তত বেড়ে যায়। ঈশ্বর যদি কারুর অন্তর্জগতে ঢুকে যান, সে যদি ঈশ্বরকে নিয়ে বেশি ভাবে, চিন্তা ভাবনা করে, তার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তত দৃঢ় হয়ে যাবে। প্রথমে চিন্তনের স্তরে বাড়ে সেখান থেকে অন্তর্জগতে বাস্তবিক অস্তিত্ব এসে যায়। একবার অন্তর্জগতে বসে গেলে ও আর সহজে যাবে না। যদি যায় তাহলে এক ঝঞ্ঝাবর্ত সৃষ্টি করে দেবে। সন্তান মায়ের অন্তর্জগতের বাসিন্দা, সন্তানের কিছু হয়ে গেলে, মরে গেলে মায়ের মধ্যে এমন ঝঞ্ঝা আসবে যে সব কিছু থাকতেও জীবনটা তার শূন্য মনে হবে। জাগতিক প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হবে, কোন ছেলে বা মেয়ের অন্তর্জগতে যদি কেউ বাস করে থাকে আর ও যদি ওকে ছেড়ে চলে যায় সে পাগল হয়ে যাবে, নিতে পারবে না। কিন্তু চিন্তার জগতে যদি থাকে, তখন বলবে তুমি না থাকলে আরেকজন থাকবে।

ভক্তির কয়েকটা অবস্থার কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি। এর মধ্যে মূল হল পরা ভক্তি আর অপরা ভক্তি বা গৌণী ভক্তি। পরা ভক্তি একটা আলাদা জাত, যেমন রাধা, গোপী এনারা একেবারে আলাদা জাতের। ভক্তিসূত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে পরা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তির বর্ণনা করছেন, বর্ণনা করে একটা জায়গায় এসে কিন্তু থেমে যাচ্ছেন। কারণ পরা ভক্তি চেষ্টা দিয়ে হয় না, মানুষ চেষ্টা দিয়ে যে ভক্তি করে সেটা

হল গৌণী ভক্তি, যেটা আমাদের মত মানুষের করার কথা। যাঁরা ভক্তির চর্চা করছেন, প্রচুর জপ করছেন, মন্দিরে যাচ্ছেন, অনেক সাধু বা ভক্ত আছেন যাঁরা সকাল চারটেয় উঠে জপধ্যান করছেন, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা জপ করে যাচ্ছেন, এনাদের ব্যাপারে অনেকের অনেক রকম মত থাকতে পারে, বিশেষ করে যারা তাঁদের কাছাকাছি থাকেন বা যারা তাঁর কাছের লোক, তারা এনাদের ব্যাপারে কি ভাবে? শাস্ত্রে বলছেন, ভক্ত ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। তার মানে ঈশ্বরের যে ভাব, ঈশ্বরের তিনটে ভাব, তিনি আছেন এটাকে না করা যাবে না। তিনি আছেন ঐ ভাবের আবার কিছু কিছু implications আছে, সেটা না হয় আমরা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তারপরের যে দুটি ভাব চিৎ আর আনন্দ, এই দুটোকে কখন প্রশ্ন করা যাবে না। যার ভেতরে জ্ঞানের প্রকাশ নেই আর যার ভেতরে ভালোবাসার প্রকাশ নেই, বুঝবেন ওর আধ্যাত্মিকতায় গোলমাল আছে। এর মধ্যে যে বিরাট কোন বিজ্ঞান, কোন যুক্তি আছে তা নয়, এটা অতীব সহজ জিনিস। বলছেন, যিনি ভক্ত তিনি ঈশ্বরের সাথে এক, ঈশ্বরের কাছের মানুষ। ঈশ্বরের ভাব মানে জ্ঞান আর ভালোবাসা, এই দুটো ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা বললে ঠাকুর কত রেগে যেতেন। ঠাকুর আবার হাজরার নামে বলছেন, হাজরা গত জন্মে কাঙাল ছিল। ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের যত রকমের ধারণা থাকুক, তিনি মনোকামনা পূর্ণ করেন, তিনি ঐশ্বর্যবান, তিনি সবার এই করে দেন, সেই করে দেন, জানবেন এগুলো গৌণ, এগুলোর কোন দাম নেই। দাম একটারই আছে, তাঁর যে ভাব আমরা শাস্ত্রে পাই, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ আর তিনি আছেন। সেইজন্য এমন কিছু করা যাবে না যেটাতে আমার অস্তিত্বের সঙ্কটে হয়ে যেতে পারে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করছি না, খাওয়া-দাওয়া বেশি করছি, শরীরের যত্ন নিচ্ছি না, আত্মহত্যা করার প্রবণতা আছে, হতাশার ভাব, এগুলো ঈশ্বরীয় ভাবের বিপরীত। কিন্তু বাকি যে দুটো ভাব, চিৎ আর আনন্দ, দুটো এক সঙ্গে চলবে। যেমন আইনস্টাইন, আইনস্টাইনের জ্ঞান আছে বলে যে তিনি ঈশ্বরের খুব কাছে থাকবেন তার কোন মানে নেই। তিনি ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন কিনা তার একটাই পরীক্ষা, তাঁর জ্ঞান ঐ পর্যায়ে চলে গেছে যে মা তাঁর রাশ ঠেলে দেন আর ভেতরে সবারই প্রতি সমান ভালোবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যেমন স্বামীজী বলছেন *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ*। এর আগে যাঁদের কথা বলা হল, যদি দেখা যায় মানুষ এদের সাথে কথা বলতেই ভয় পায়, কথা বলতে গেলে কি প্রতিক্রিয়া করবে বলা মুশকিল। শ্রীশ্রীমা বলছেন কারুর দোষ দেখবে না, এর অর্থই হল গ্রহণ করা, সবাইকে স্বীকার করে নেওয়া। এর আগে inclusivenessএর উপর আলোচনা করা হয়েছিল। Inclusiveness মানে, তাঁর হৃদয়ে সবার জন্যই স্থান আছে। তাহলে এনাদের মধ্যে কিছু গোলমাল আছে।

যখন কেউ ভক্তি পথে নামছেন, ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছেন তখন কত রকমের ভাব আসে, তিনি দেখছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এই ধরণের নানান কথা বলি। আমরা বলি ঠাকুর কেন কষ্ট দিলেন? কষ্ট দেওয়া ঠাকুরের কাজ নয়। আহা ঠাকুর আমাকে কত কৃপা করলেন। কৃপা করা ঠাকুরের কাজ নয়। ঠাকুরের মূল ভাবটাই হল চৈতন্য আর আনন্দের স্বভাব। ঠাকুর পাণ্ডবদের সম্পর্কে বলছেন, পাণ্ডবদের মত জ্ঞানী কোথায়, পাণ্ডবদের মত ভক্ত কোথায়! ঠাকুর প্রায়ই জ্ঞান আর ভক্তি এই দুটো শব্দ একসাথে বলতেন। বলছেন, ভগবান সব সময় সাথে আছেন তাও পাণ্ডবদের কত দুঃখ। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্যের কখনই হানি হয়নি। জ্ঞানটাই চিৎ এর aspect আর ভক্তিটাই আনন্দের aspect, দুটো আলাদা কিছু না। সেইজন্য বেশির ভাগই যাঁরা ভক্তি করছেন, প্রচুর জপধ্যান করছেন, এগুলো কিছুই না, শুধু উপাচার মাত্র।

ভক্তিসূত্রে যে কথাগুলো বলছেন তাতে গৌণী ভক্তির যে প্রথম অবস্থা, যেখানে ভক্তিতে সবে ঢুকছেন, যিনি বলছেন আমি ভক্ত হব, ঈশ্বরের পথে যাব, তাঁর এখন কি কি করা দরকার আর তাঁর কি কি পরিবর্তন হবে এটাকে নিয়ে এখন আলোচনা করতে যাচ্ছেন। সেইজন্য এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই গ্রন্থের সার্বিক ভাব সেই দুটো, জ্ঞান বাড়ছে কিনা কিভাবে বোঝা যাবে আর তার থেকে বড় হল ভালোবাসা, আনন্দ এগুলো তার মধ্যে বাড়ছে কি বাড়ছে না। এখন আমাদের পুরনো ধারণাগুলো, তিনি কৃপা করছেন, তিনি কষ্ট দিচ্ছেন এই ধারণাগুলোকে এবার ছাড়তে হবে, এগুলোই কাঁচা বুদ্ধির লক্ষণ। এগুলোকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়ে যেতে হবে আর কোন দিন যুক্তিও আসবে না। কিন্তু জ্ঞান আর ভক্তির যে ঐশ্বর্য ওখানে কোন আপোষ নেই, অথচ লোকেরা এই দুটোতেই আপোষ করে। গীতায় বলছেন *গুণা গুণেষু বর্তন্তে*, জগৎ জগতের মত চলে, ভগবানের তাতে কিছু আসে যায় না। তবে ঐ গুণগুলোও তাঁরই, অপরা

প্রকৃতিও তাঁর, সেটা অন্য জিনিস। যার জন্য ভগবান বলছেন, এবার আমার পরা প্রকৃতির কথা শোন, যেটা আমার উৎকৃষ্ট রূপ। সেই উৎকৃষ্ট রূপে রয়েছে শুধু জ্ঞান আর ভক্তি। জ্ঞান হল চৈতন্যের প্রকাশ, আমাদের কথাবার্তায়, পড়াশোনায় যদি চৈতন্যের প্রকাশ না হয়, যে বিষয়ে বা যে কাজে আমরা আছি সেই বিষয়ের ব্যাপারে কোন কিছুকে চটপট ধরতে পারছি না, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। ভক্তি পথে আসার পর এত দিন পরেও যদি এর ওর উপর রেগে যাওয়া, কাউকে অপছন্দ করা, হিংসা করা এগুলো যদি না কমে তাহলে বুঝতে হবে ভক্তিতে কিছু গোলমাল আছে। কেউ আশা করছে না যে আমি একবারে খাঁটি ভক্ত হয়ে গেছি, একটা উপলব্ধি না হলে সেটা হবে না, কিন্তু এগুলো আমার যেন কমতে শুরু করে। কারণ আমরা এখন ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরীক্ষা একটাই, জ্ঞান আর ভক্তি বাড়ছে কিনা। যে কোন একটা বই যদি ধরিয়ে দেওয়া হয়, যে বইয়ের ভাষাটা সে বুঝতে পারছে না, তাও সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে বইয়ের বক্তব্য কি। তার মানে তার জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে। এই জ্ঞান শুধু ঈশ্বরীয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোন জাগতিক জ্ঞানেও পরিলক্ষিত হয়। ঠাকুর বলছেন, মা আমাকে রাশ ঠেলে দেন। মা যে শুধু ঠাকুরকেই ঠেলে দেন তা না, যিনিই তাঁর দিকে এগোবেন সবাইকে মা রাশ ঠেলে দেন। আর তার সাথে সবারই প্রতি ভালোবাসাও বাড়তে থাকে। ভগবান যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে, তখনও তিনি পিতার কাছে অপরের হয়ে ক্ষমা চাইছেন। ভালোবাসার এটা চরম অবস্থা, কিন্তু তাই বলে আমাদের হবে না তা নয়। এখানে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা চলছে।

আরও যদি বৃহৎ শ্রেনীবিভাগ করা হয়, তাহলে প্রথম হবে যারা ঈশ্বরের কোন কিছুই মানে না, দ্বিতীয় উপাচারাদি করছে কিন্তু ভেতরে ঢুকছে না। যারা পূজা উপাচার নিয়ে থাকছে এদের মধ্যে অনেককে পাওয়া যাবে যারা খুব ভাবের ঘোরে থাকে, ঘন্টার পর ঘন্টা ঈশ্বরের স্তব করে যাচ্ছে, বিগ্রহের নানান রকম শৃঙ্গার করে যাচ্ছে, জপ করছে, কিন্তু সে হয়ত অন্তর্জগতে প্রবেশ নাও করে থাকতে পারে, তার কাছে ঈশ্বর মুখের কথা, সে হয়ত নিজেও জানে না। তার জন্য দেখতে হবে তার জ্ঞান আর ভক্তি কতটা আছে। এদের পরেই আসছে যারা সবে গৌণী ভক্তিতে ঢুকেছে, ঢোকার পর লড়াই করছে, মনে নানান রকমের ভাব আসছে, একটা ছটফটানির ভাব শুরু হবে। ভক্তিশাস্ত্র প্রথম দুজনকে কোন আলোচনাই করবে না। আর গৌণী ভক্তি পাকা হলে তখন তিনি কৃপা করেন, তখন তাঁর মধ্যে প্রেমা ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বরের কৃপায় যাঁদের মধ্যে প্রেমা ভক্তির উদয় হল এনারা হলেন চতুর্থ শ্রেনীর। ঠাকুর বলছেন নিত্যসিদ্ধের থাক। এনারা অন্য ধরণের, যদিও প্রেমা ভক্তি বা পরা ভক্তিই উদ্দেশ্য, কিন্তু ঐ অবস্থায় সাধারণ মানুষ যেতে পারে না, চতুর্থ শ্রেনী হলেন ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ। সবাই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হতে পারবে না। এনাদের জীবনী পড়লে বোঝা যায় কোন স্তরে গেলে ঐ প্রেমা ভক্তি হয়। পরা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তিতে কি কি হয়, তাঁরা কি কি করেন এর আলোচনা আমরা আগের দিকে করে এসেছি। এখন যা কিছুর বর্ণনা চলবে এই বর্ণনা সাধকদের নিয়ে। সাধক বলতে যারা ভক্তির সাধক। ভক্তির সাধক বলতে কিন্তু একবারও ভুল করে ভাবা ঠিক হবে না যে যারা নিয়মমাফিক সাধনা করছে, তাদের কথা বলছেন না। এখানে ভক্তির সাধক হলেন যিনি বলছেন হে প্রভু আমি তোমাকেই চাই। যাঁরা বলছেন আমি তোমাকেই চাই, তাঁদের আচার ব্যবহারের আলোচনা চলছে। কিন্তু যাদের কাছে ঈশ্বর মুখের কথা, এই আলোচনা তাদেরকে নিয়ে নয়। এই আলোচনা তাদের আচার ব্যবহারে কোথাও কিছু মিলবেই না। যাঁরা ভক্তির সাধক তাঁদেরকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন –

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ।।৬১।।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা, জাগতিক লোকসান, জাগতিক হানি, জাগতিক অভাবকে নিয়ে বেশি চিন্তা করতে নেই, বেশি উদ্বিগ্ন হতে নেই আর এসব দিকে বেশি মনও দিতে নেই। *নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ*, ভক্ত নিজেকে, জগতকে এমনকি বেদরাশিকে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে দিয়েছেন। প্রথমেই আমরা যদি এগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে যাই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে ভক্তিসূত্র অত্যন্ত উচ্চমানের শাস্ত্র, চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করতে হবে, মাঝে মাঝে আমাদের একটু ভাবতে হবে। এই ভক্তিসূত্রের কথা শ্রবণ করার পর কেউ যদি প্রথম পাটাও ফেলে থাকেন তবে বুঝবেন তাঁর একটা বিরাট উত্তরণ হতে যাচ্ছে। এখানে যুক্তিটা খুবই সহজ, জাগতিক যে কোন হানি, নিজের হোক, অপরের হোক, জগতের হোক, কোন হানিকে নিয়েই ভাবতে নেই। কেন ভাবতে নেই? কারণ তুমি তো নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পিত করে দিয়েছ,

তোমার জগতকে নিবেদন করে দিয়েছ, এমনকি বেদ সেটাও নিবেদন করে দিয়েছ। সেইজন্য প্রেমের উপমা দিয়ে এগুলোকে ভালো বোঝা যায়। একটা ছেলে একটা মেয়েকে সত্যিকারের ভালোবাসে, তার ভালোবাসায় কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটি যা চায় ছেলেটি তার জন্য সেটাই করে দেবে, ছেলেটির ভালোবাসায় কোথাও কোন দেখনদার নেই। মেয়েটি হল তার স্পেস যেখানে সে মুক্ত আকাশে পাখির মত বিচরণ করতে পারে। পরে হয়ত জানা গেল ছেলেটি একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের আর মেয়েটি গোঁড়া খ্রীশ্চান পরিবার থেকে এসেছে। ছেলেটি মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য নিজের সব কিছুকে ছেড়ে এগিয়ে যায়, ওখানে আর কোন কিছুই আর তার কাছে কোন দাম নেই, একমাত্র দাম মেয়েটির প্রতি ভালোবাসা।

যখন সে বলছে, হে ঠাকুর আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম, তুমি আমার মুক্ত আকাশ যেখানে আমি বিচরণ করব, ঠাকুর তখন বলছেন, তাহলে এবার তোমার আগের স্পেসটা, যে খাঁচায় এতদিন ছিলে ছাড়, খাঁচার মধ্যে তুমি যা যা পেতে সব কিছুকে ছেড়ে এসো। পাখি বলছে, খাঁচার ভেতরে যে দানাপানি পেতাম সেটা না হয় ছেড়ে দেব কিন্তু খাঁচাটা কি করে ছাড়ব! না, ওটাও ছাড়তে হবে। এবার সব ছেড়ে পাখি আকাশে উড়ে গেল। এবার যার খাঁচা সে যদি খাঁচাটাকে ছুড়ে রাস্থায় ফেলে দেয় বা ভেঙে ফেলে, পাখি কি খাঁচার জন্য চোখের জল ফেলবে, নাকি ফেলবে না? ফেলতেও পারে এই ভেবে যে, আহা! এতদিন আমি ওর মধ্যে ছিলাম। কিন্তু এটা তাকে কোন প্রভাবিত করতে পারবে না, কারণ সে নতুন স্পেস পেয়ে গেছে, খাঁচার সাথে তার এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ ছিল, আমি ওর মধ্যে থাকতাম, এর বেশি কিছু মনে হবে না। আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, চিড়িয়াখানার একটা খাঁচা থেকে পাখি মুক্ত হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। অনেকদিন সে ঐ খাঁচাতে বদ্ধ ছিল। তাঁর ভেতরে এই বোধ জেগেছে, আমি এখানকার নই। একবার মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পাখিটা খাঁচার দিকে কতটা আসবে, খাঁচার অন্য পাখিদের জন্য তার কি অনুভব হবে? মানুষকে এই খাঁচাই জিইয়ে রাখে, খাঁচার অন্ন, খাঁচার জল তাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই জগৎ আমাদের জিইয়ে রেখেছে, খাওয়া দিচ্ছে, জল, আলো, বাতাস দিচ্ছে, একটা সম্পর্ক তৈরী করে সেখানে ভালোবাসা দিচ্ছে। এবার সে যখন ঈশ্বরের দিকে যাবে তখন জগতের এই জিনিসগুলোই তাৎপর্যলেশ হয়ে যায়। যত আমরা এগুলোকে ধরে রাখব তত জগতের সব কিছুকেই মূল্যবান মনে হবে। একটা খাঁচার পাখি কখনই বলতে পারে না যে আমি খাঁচাতেও থাকব আর মুক্ত আকাশেও থাকব। এ কখনই হয় না, হয় এটা হবে তা নয়তো ওটা হবে, দুটো একসাথে কখনই হতে পারে না।

খাঁচা, খাঁচার পাখি আর মুক্ত আকাশ এই কটি জিনিসকে একটু ভাবলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। মুক্ত আকাশের দিকে চলে যাওয়ার পর প্রথমের দিকে খাঁচার দিকে একবার দুবার ঘুরে ঘুরে যাবে। কিন্তু একটু পরে নিজেকে যখন সে মুক্ত মনে করবে, তার ডানার বিস্তার হতে থাকবে, আর যদি বিরাট ডানাযুক্ত পাখি হয়, তখন তো সে খাঁচার ভেতরে ঢুকতে ভয় পাবে। কিন্তু যদি দেখে অন্য পাখিরা খাঁচার মধ্যে কত কষ্টে রয়েছে, তখন সে যাবে গিয়ে দুটো ফল বা দানা ফেলে দিল, এর বেশি কিছু করতে যাবে না। নিজের আকাশকে ও আর ছাড়বে না। মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস হয়। নিজের চিন্তা, নিজের সংসার আর তার সাথে বেদ, যাকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম জীবন চলছিল, সেটাকেও সে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। যে সময় নারদ ভক্তিসূত্র রচিত হয়েছিল সেই সময়কার লোকেদের কাছে বেদই সব কিছু ছিল, বেদের কর্ম, বেদের ধর্মই সব কিছু ছিল। এখানে বলছেন, *নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ*, তুমি সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিলে। কারণ আমরা তো খাঁচার পাখি নই, খাঁচার পাখি আমরা বোঝানর জন্য বললাম।

এর ফলস্বরূপ এবার কি হবে? বলছেন *লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা*, এরপর তোমার যদি কোন হানি হয়, যাদেরকে তুমি আপন মনে করতে তাদের যদি কোন হানি হয়, সেটা নিয়ে *চিন্তা ন কার্যা*, ওটাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। কারণ তুমি নিজেকে, নিজের সংসারকে, তোমার বেদের ধর্ম কর্ম সব কিছু ঈশ্বরকে নিবেদন করে দিয়েছ। একজন ভক্ত হয়ত পুরোপুরি নিজেকে ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তখনও জানে এরাও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, তিনি এদের দেখছেন। সেইজন্য খাঁচার পাখির উপমা এখানে পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু ধারণা করতে সাহায্য করবে। তিনি জানছেন সবই তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, সেখানে আমি আর কি করতে পারব! আমি তো অন্তর্জগতে ঢুকে গেছি, তবে যদি দেখি আমার মায়ের খাওয়া-পড়ার কষ্ট হচ্ছে, একটু উপর নীচ তো

সবারই হয়, আচ্ছা আমার পরিচিত কয়েকজনকে বলে দেব। ঠাকুরও মাঝেসাজে কদাচিৎ এখানে একটা কিছু বলতেন। এর বেশি কিছু করতে যাবেন না, কারণ তিনি জানেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই দেখবেন। প্রায়ই শোনা যায় যে লোকেদের খুব অবসাদ হয়, অবসাদে অনেক সময় মনে হয় আমার জীবনটা এখানেই শেষ। ঠিকই মনে হচ্ছে, ভুল কিছু ভাবছে না, কিন্তু একবার যদি পেছনের দিকে তাকায় যখন তার জীবনে কিছু ভালো ছিল, দুদিনের জন্যই ভালো কিছু ছিল, ওর উপর যদি বেশ কিছু দিন চিন্তা করে তখন এই অবসাদটা কেটে যায়। আর সেখান থেকে এই জোরটাও পেয়ে যায়, ভালো ছিল মন্দ হয়েছে আবার ভালো হবে। কিন্তু যদি ঐ অবসাদের উপরেই বসে থাকে তাহলে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ঠিক তেমনি যার একবার বিশ্বাস হয়ে গেল আমি ঈশ্বরের সৃষ্টি, এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তিনিই আমাকে এনেছেন তিনিই আমাকে অন্তর্জগতে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জগতকে তিনিই দেখবেন, তখন নিজের কিছু হলে, জগতের কিছু হলে সে আর ঐ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। সেইজন্য কথামৃতে সামাজিক কাজ, লোকের উপকার করা, এগুলোকে ঠাকুর পদে পদে নিন্দা করছেন। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়লে সবারই গণ্ডগোল হয়ে যাবে। স্বামীজী সেবার কথা বলছেন আর ঠাকুর কথামৃতে ঠিক তার উল্টোটা বলছেন, এগুলোকে বুঝতে অনেক সময় লাগে। যারা একেবারে স্বার্থপর, নিজের স্বার্থে একেবারে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তাদের জন্য স্বামীজী সেবার আদর্শ দিচ্ছেন। সাধুরা যখন সেবার কাজে এগিয়ে যান, ঐ সেবা দেখে আরও দুজন শেখে, অনুপ্রাণিত হয়ে সেবার কাজে এগিয়ে আসে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করছেন বা প্রবেশ করবার চেষ্টা করছেন বা একটু বোধ হয়েছে, তাঁরা ঐটাকে নিজের মনের মধ্যে ঢুকতে দেন না। ঠাকুরের আশেপাশে কত লোকের কত কষ্ট ছিল, ঠাকুর ওদিকে মনও দিতেন না। এই আজ ভালো আছে, কাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আবার ভালো হচ্ছে, এখানে আমার আপনার কিছু করার নেই, জগৎ এভাবেই অনাদিকাল থেকে চলছে, চলতে থাকবে।

যাঁরা ভক্তি পথে চলে এসেছেন তাঁদের মনকে ওখানে নামাতে নেই। মনের একাগ্রতা পুরো ঈশ্বরের দিকে, ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দিকে দিতে নেই। তবে ভক্তও কাজ করেন। ঠাকুরের কাছে একজন এসে জগতের সেবা করা নিয়ে খুব লেকচার দিচ্ছিল। ঠাকুর তাকে বলছেন, বর্ষাকালে গঙ্গায় গুড়ি গুড়ি কাঁকড়া হয় দেখেছ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্তিত্ব তার থেকেও নগণ্য, সেখানে তুমি আর কি জগতের সেবা করবে! কিন্তু যাঁরা ভক্ত তাঁরাও কাজ করেন। কঠোপনিষদে একটা মন্ত্র আছে, *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই সগুণ সাকার, এই দুটোতে, জগৎ আর তাঁর মধ্যে যিনি তফাৎ দেখেন *মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*। ভক্ত যদি কাজ করেন একমাত্র এই ভেবেই কাজ করেন, জগতটা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এরা ঈশ্বরের। আগে আমরা বলছিলাম ভগবান যীশু বলছেন I am a good shepherd, আমি সেই মেষপালক, আমার কাজ আমার পিতার ভেড়াদের রক্ষা করা, নেকড়ের আক্রমণ থেকে ভেড়ার পাল বাঁচানো আর তাদের সামলে বাড়িতে নিয়ে আসা। ভক্তের এই ভাবটা থাকে। বলা হয় অন্নদান সব থেকে সাধারণ, জীবনদান আরেক রকম, শিক্ষা দান আরেক রকম কিন্তু উচ্চতম দান হল আলো দান, যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঐ একটাই কাজ করেন, তিনি আলো দেন। আমি ঈশ্বরের মেষপালক, আমি ঈশ্বরের কাছে এসেছি আমি আরও চারজনকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসব। আমি কোন চেষ্টা করে নিয়ে আসব না, আমার আচার ব্যবহার এমন হবে যে, চারজন লোক এমনিই এগিয়ে আসব।

রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিতে ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ন্যাসীই সব সময় শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ তিনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। ঠাকুরের সাধনা একটাই, oneness with God, ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ, এছাড়া আর অন্য কোন সাধনাই হয় না। পড়াশোনা, ত্যাগ-তপস্যা, জপধ্যান কোনটাই সাধনা হয় না, সাধনা একটাই, আমি তোমার তুমি আমার। এছাড়া অন্য কোন সাধনা হয় না, ভক্তদের জন্যও তাই, সন্ন্যাসীদের জন্যও তাই। বাকি যা কিছু করা হয় সব এরই প্রস্তুতি, কিভাবে একাত্ম বোধটা বাড়বে। আর সব থেকে বড় গর্হিত অপরাধ হল এই একাত্ম বোধকে যে কাটতে চাইছে। যদি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ করা সব থেকে বড় সাধনা হয় তাহলে যিনি এই একাত্ম বোধকে কাটার চেষ্টা করছে, এটা হল সব থেকে বড় অপরাধ। সব অপরাধেরই মার্জনা হয়ে যাবে যদি তার একাত্ম বোধটা থাকে। শহরের যত নর্দমার জল গঙ্গায় গিয়ে মিশে গেলে সেটাও পবিত্র হয়ে যায়। ঠাকুরের সঙ্গে যে একাত্ম হয়ে আছে সে পবিত্রতম। যে ওই একাত্মটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সে সন্ন্যাসীই হোক, কোন মহন্তই হোক,

সেক্রেটারীই হোক আর তার থেকেও বাজে কোন মেয়ে মানুষ যদি হয়, কোন মেয়ে যদি সন্ন্যাসী আর ঠাকুরের মাঝখানে ঢুকে ফাটল ধরিয়ে দেয়, সন্ন্যাসীর মনটা যদি ঠাকুরের থেকে সরে আসে, এটা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত পাপ। ঠাকুর বলছেন, কোন মেয়ে যদি এগিয়ে আসে তখন বলে, ওরে খেপী তোর গলা কেটে দেব আমার পরমার্থ হানি করতে এসেছিস! পরমার্থটা কি? পরমার্থ হল ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ, একাত্ম ভাব। এখন বাকি যে কোন দোষ করুক, বৈষ্ণব অপরাধের কথা আমরা বলি বটে, আসলে যখন অপরাধ করছে তখন ওর যে একাত্ম ভাব আছে ওটাকে নিন্দা করছে যে ওর একাত্ম ভাব নেই। সেটা তো তার বলার কথা নয়, সে সেখানেই আলাদা দেখছে। ঠাকুরের সাথে কে কিভাবে জুড়ে আছে আমরা জানি না। এটা যেমন গর্হিত পাপ, তেমনি পূণ্য হবে সে যত লোককে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এই তিনটে জিনিস, গর্হিত পাপ একটাই যে একজন লোক ঠাকুরের সাথে একাত্ম ভাব নিয়ে আছে তাকে সেখান থেকে কেটে সরিয়ে দেওয়া, পূণ্য একটাই লোকেদের ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা আর সাধনা একটাই ঠাকুরের সাথে নিজেকে একাত্ম করা, পুরো আধ্যাত্মিকতা এখানে গিয়ে শেষ। শুধু ঠাকুরের সাথে না, যে শিবের ভক্ত, সত্যিকারের যে শিবের সাথে এক হয়ে আছে তাকে যদি কেউ শিবের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়, যেভাবেই হোক, সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে, মেয়েমানুষের প্রভাব বিস্তার করে, মিথ্যা মামলা করে, যে করেই হোক তাকে শিব থেকে আলাদা করে দিল, এর থেকে পাপ আর কোন কিছুতে হবে না। আর তিনি আরও চারজনকে শিবের দিকে নিয়ে গেলেন, এর থেকে পূণ্যের আর কিছু হবে না।

একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, বাচ্চা বয়সে মহারাজদের কাছে যেতাম বাতাসা খেতে, বাতাসার লোভে যেতে যেতে বড় হয়েছি, বড় হয়ে খিচুড়ি খাওয়ানোর দায়ীত্ব পড়ল, ভলেন্টিয়ার হলাম, ভলেন্টিয়ারি করতে করতে এখন আমাকে সাধুদের সঙ্গেই থাকতে হচ্ছে। মূল সিদ্ধান্ত হল ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, যখন এই ভাবটা আসে, আমি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম, আমার নিজের জন্য কিছু লাগবে না, কারণ *লোকহানৌ* যখন বলছেন তখন সেখানে অপরের যতটা ব্যাপার আছে তার নিজের ব্যাপারটাও ততটা আছে। তাতে নিজের বাড়িটা নীলামে চলে গেল, তার বাড়ির লোকের কিছু হয়ে গেল, বেশি ভাবতে নেই, তিনিই দেখবেন। তার মনের সহবাস যে যে ব্যক্তির সাথে আছে, যে যে জিনিসের সাথে আছে, সেগুলোর এই ভালো এই মন্দ লেগেই আছে, এই ভালো মন্দের দিকে বেশি মন দিতে নেই, এটাই এখানে বলতে চাইছেন। এখন যাদের সঙ্গে আছে তাদের দিকে একেবারেই মন দিতে হবে না তা তো নয়, মন তো দিতে হবেই। ঠাকুর সংসারীদের শব সাধনার কথা বলছেন, শব সাধনা করতে করতে শব তার মুখটা হাঁ করে ওঠে, তখন মুখের মধ্যে একটা কিছু দিয়ে দিতে হয়, মুখটা বন্ধ হয়ে গেল, আবার সাধনায় ডুবে গেল। এটা হল যাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন তাঁদের জন্য। যাঁরা এগোননি এখনও ভাসা ভাসা আছেন, তাঁদেরও বেশি মাথা ঘামাতে নেই, যতটুকু করার ততটুকু করে দিলেন, এর বেশি না। এই হল এই সূত্রের মূল বক্তব্য। সেইজন্য এই তিনটে জিনিসকে মনে রাখতে হয়, ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ, এটাই সার আর ঈশ্বরের কাছে চারজনকে নিয়ে আসা, এটাই একমাত্র পূণ্য এবং ঈশ্বরের সাথে যাঁর একাত্ম বোধ, তা যতটুকুই হয়ে থাকুক, সেটাতে বাধা দেওয়া এটা হল সব থেকে গর্হিত পাপ। এই যে বেলুড় মঠে হাজার হাজার লোককে খিচুড়ি খাওয়ান হয়, এখানেও ভেতরের ভাবটা ওটাই। হাজার হাজার লোক আসছে, অনেকে হয়তো এমনিই আসছে, তাতে আসুক কোন ক্ষতি নেই। শুধু যে ভক্তরাই খিচুড়ি খাবে তা না, অনেকে আছে যারা খিচুড়ি খেয়ে ভক্ত হয়। কয়েকজন মহারাজ আছেন, প্রথম জীবনে কলেজে পড়তেন, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। তাঁর বন্ধু হয়ত কোন ভক্ত বাড়ির ছেলে, তার সাথে ভলেন্টিয়ার হয়ে এসেছেন, মাঝখান থেকে দেখা গেল ভক্ত বাড়ির ছেলেটির এমন কিছু হল না, তার সাথে যিনি ভলেন্টিয়ার হয়ে এসেছিলেন তিনিই পরে সাধু হয়ে গেলেন। মাস্টারমশাইয়েরও এই কাজ ছিল, কোন ভালো আধারের ছেলে দেখলে তাকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন। পরের সূত্রে বলছেন –

ন তৎ সিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু
ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্যমেব।।৬২।।

এই যে সাধনা গুলো চলছে এতে সিদ্ধি লাভ যতক্ষণ না হয়ে যায়, অর্থাৎ পাকা ভক্তি যতক্ষণ না হয়, প্রেমা ভক্তির কথা বলছেন না, পাকা ভক্তির কথা বলছেন, ততদিন কিন্তু লোকব্যবহার ছাড়তে নেই। যা যা

দায়ীত্ব আছে, কর্তব্য যা আছে, যে যে লোকব্যবহার আছে যেগুলো না করলে লোকনিন্দা হবে, সেগুলোকে কিন্তু করে যেতে হবে। সব কিছুই করে যেতে হবে কিন্তু *ফলত্যাগঃ*, সেখান থেকে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করবে না, আর *তৎ সাধনম্*, তার সাথে সাধনাটাও করে যেতে হবে। ফলত্যাগ মানে, সব কিছুই করে যেতে হবে, কিন্তু তার সাথে নিজের যে স্বার্থ জুড়ে আছে সেই স্বার্থটা ত্যাগ করে দিতে হবে। রাজা মহারাজ একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি বাবার এঁঠো খেতে পারি? ঠাকুরে রেগে বলছেন, তোর হয়েছেটা কি! বলার পর ঠাকুর আবার বলছেন, যে সত্ত্বগুণী সে কিন্তু নিজের এঁঠো কাউকে দেয় না। তার মানে আসলে এগুলো খাওয়া চলবে না, কিন্তু ভক্ত হয়ে তুমি রাতারাতি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে উঠে যাবে তা হয় না। প্রেসিডেন্ট মহারাজরাও কিন্তু নিজের এঁঠো কাউকে দেন না। দেন, কিন্তু কি রকম ভাবে দেন, ওনাকে থালাতে ঠাকুর ভোগ এনে দেওয়া হয়েছে, ওখান থেকে নিজের যতটুকু দরকার তুলে নিয়ে বাকিটা প্রসাদ রূপে দেন, খাওয়াটা তখনও শুরু করেননি। তখন বলা হয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের প্রসাদ, কিন্তু তিনি যে এঁঠো করেছেন তা নয়। যারা নতুন ধর্ম পথে আসে তাদের অনেক রকমের বিচিত্র ধারণা থাকে, এটা করা যাবে না, সেটা খাওয়া যাবে না, ওখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। নরেন ব্রাহ্ম সমাজে নাম লিখিয়ে বাড়িতে এসে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে পুরো নিরামিষাশি হয়ে গেলন। ওনার বাবা এই নিয়ে কি রাগারাগি, তোর বাপ-ঠাকুর্দা কাঁকড়া খেতেন আর তুই কোথা থেকে এক ব্রহ্মদৈত্য এসেছিস। এটাই বলছেন, তুমি লোকব্যবহার একটুও ছাড়বে না। কারণ তোমার লোকব্যবহারের উপর ধর্ম জগৎ চলে না, ধর্ম জগৎ ভেতরে চলে। তুমি ভেতরে পরিবর্তনটা নিয়ে এসো। ভেতরে কিভাবে পরিবর্তন আনবে? তোমার যে ফলের আশা থাকে, অর্থাৎ স্বার্থপরতা যেটা থাকে, নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে এই কাজগুলো করবে, তোমার স্বার্থপরতাটা আগে বন্ধ কর। এরপর ধীরে ধীরে কাজটাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমেই কাজ বন্ধ করবে না, যার সাথে যেমন ব্যবহার করা দরকার তার সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করে যেতে হবে। ধীরে ধীরে তোমার লোকেরা নিজেরাই বুঝে যাবে, ওরাই বলতে শুরু করবে, ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে চাইছে ওকে কেন এর মধ্যে জড়াতে চাইছ, বাড়ির লোকেরাই মেনে নেয়। আবার কিছু পরিবার আছে বুঝতে চায় না, ঠাকুর বলছেন অবিদ্যা শক্তি হলে বলবে, কী সারাদিন চোখ বুজে থাকছে। তবে কি, সেখানেও যদি কেউ নিষ্ঠা নিয়ে লেগে থাকে তখন এদেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে যায়। কোন সাধু পুরুষ নেই, কোন সত্ত্বগুণী ভক্ত নেই যাঁর ভেতরে সত্যিকারের ভক্তির উদয় হয় তাঁর বাড়ির লোকেদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে না, চারজনের হৃদয় পরিবর্তন হবেই, দু একজনের হবে না সে নিয়ে ভাবার কিছু নেই। এখানে এটাই বলছেন, যেখানে তুমি বুঝে গেলে এটা আমার কাজ, আমি আমার দায়ীত্ব পালন করছি, ওখান থেকে কিছু প্রত্যাশা বা হারানোর ভয় আমার নেই। দ্বিতীয় আরেকটা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল, যারা ঈশ্বরের পথে আছে, প্রথমের দিকে কাজকর্ম না করলে ব্যাক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার সুযোগ তো পাবেই না উপরন্তু মনের শুদ্ধিটাও হবে না। যারাই কাজ করতে চায় না, কাজে ফাঁকি দেয় তাদের ব্যক্তিত্বটাই এলেমেলো হয়ে যায়, জগতও তাকে অনেক সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়। পরের সূত্রে এবার সাধকদের জন্য বলছেন –

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-(বৈরী-)চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্।।৬৩।।

সাধক জীবনে কয়েকটা জিনিসকে নিষেধ করা হয়। স্ত্রী চরিত্র, ধনসম্পত্তির কথা, নাস্তিক চরিত্র আর শত্রুর চরিত্র এই চারটে বিষয়ের উপর কোন আলোচনা শুনতে নেই। এই চারটের আলোচনা শুনলে মনের মধ্যে এর ছাপ পড়ে। কথামৃতের প্রথমের দিকে আছে, একদিন নরেন আর মাস্টারমশাই তখনকার ছেলেদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। নরেন বলছেন, আজকালকার ছেলেদের চরিত্র ভালো নেই, এমনকি অনেককে কুস্থানেও যেতে দেখা যায়। ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন, তোমাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছে? যেমনি শুনলেন ছেলেদের চরিত্র ভালো নেই এই নিয়ে আলোচনা করছে, ঠাকুর খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, বলছেন, এসব কথা আলোচনা করা ভালো নয়। আর মাস্টারমশাইকে বললেন, তুমি এদের থেকে বড় তুমি কেন এই আলোচনা উঠতে দিলে। ভক্তিমার্গের সাধকদের পক্ষে এগুলো বিরাট বিঘ্ন। পুরুষ নারীর যে সম্পর্ক, এটা খুব স্বাভাবিক সম্পর্ক, অস্বাভাবিক কিছু না। মনুস্মৃতিতে বলছেন, মৈথুনে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি না করা হয় ওটা অনেক ভালো। যাঁরা ঈশ্বরের পথ নিয়ে নিলেন, তাঁদের এখন কোন ধরণের চিত্ত বিক্ষেপ হতে দেওয়া যাবে না। চিত্তের বিক্ষেপ হয় নারী চরিত্রে পুরুষের জন্য আর পুরুষের চরিত্র নারীদের জন্য। তবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের সমস্যা অনেক বেশি। সাধারণ ভাবে দেখা যায় ষাট বছর, সত্তর বছরের মেয়েদের আর

বিয়েথা করার ইচ্ছে থাকে না। কিন্তু পুরুষদের থাকে, আগেকার দিনের রাজারা সত্তর বছর এমনকি আশি বছরেও বিয়ে করত আর তাদের সন্তানও হত। মেয়েদের এই সমস্যাগুলো থাকে না, সমস্যা হয় পুরুষদের। মেয়েদের একটা স্বল্পকালীন মেয়াদের থাকে, তাও দুটো তিনটে সন্তান হয়ে যাওয়ার পর, তাদের আর বিশেষ কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে উল্টো, কিছু দিন আগেই নিউজে এসেছিল, একজন নব্বুই বছরের বৃদ্ধ কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে, এরা হল ভোগী কামুক। কিন্তু যাঁরা সাধক তাঁদের মনে নারী যে কি জোর ছাপ ফেলতে পারে, যাঁরা এই পথে আছেন একমাত্র তাঁরাই জানেন। সাধকদের জন্য এটা খুবই প্রাসঙ্গিক। বয়স্ক ভক্তদের জন্য কোন সমস্যা নয় কারণ ওনারা ঐ স্টেজটা পেরিয়ে এসেছেন, আর যে অর্থে সাধক বলা হয় সেই অর্থে এনারা এখন আর সাধক নন। কিন্তু যাঁরা সাধক, সাধনার জীবন নিয়ে চলছেন এটা যে তাঁদের জন্য কি বিপজ্জনক কল্পনা করা যায় না। মহাভারতে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী ছড়িয়ে আছে। সাধনার পথে যাঁরা আছেন তাঁরা যদি নাস্তিকদের চরিত্র নিয়ে কোন আলোচনা শোনেন, তাদের চরিত্রকে নিয়ে কোন লেখা পড়েন, রাজনৈতিক নেতাদের কথা, কম্যুনিস্ট লেখকদের কোন লেখা যদি পড়েন সাধককেও নাস্তিক বানিয়ে দেব। ঠাকুর আবার এতটাই ছিলেন যে, যারা ভক্তি ভাবের লোক তাদের অদ্বৈত ভাবের লোকের সাথে কথা বলতে গেলেও আটকে দিতেন, বলছেন ওতে ভক্তির হানি হবে। সেখানে নাস্তিকদের কথা শুনলে পড়লে কি হবে ভাবা যায়! শত্রুর কথা শুনলে শরীরে একটা রাগ উৎপন্ন হয়, ঐ রাগ সাধকের অনেক ক্ষতি করে দেয়, মন অন্য দিকে চলে যায়। ধনসম্পত্তি দিয়ে সব রকম ভোগ্য সামগ্রীকেই বলা হচ্ছে। তবে এই চারটের মধ্যে ধন কম বিপজ্জনক। সাধক জীবনে একটু আধটু মনে সাধ ওঠে এই ভোগটা কি রকম দেখলে হয়, দেখে নেওয়ার পর ওখান থেকে সরে আসেন, বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু স্ত্রী চরিত্র এমন বিপজ্জনক যে বড় বড় সাধকদেরও উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলে দেবে বুঝতেও দেবে না। আসলে ভক্তিসূত্র যখন রচনা হয়েছে তখনকার সমাজে নতুন নতুন ভোগ্য বস্তু ছিল না, কিন্তু এখন এক মোবাইল ফোনেরই হাজার রকমের মডেল, এটা থ্রীজি ফোন, এটা ফোরজি ফোন, এটা কুড়ি হাজার, এটাতে সোনার প্লেট দেওয়া এর আরও বেশি দাম, আগেকার দিনের তুলনায় ইদানিং কালে ভোগের নতুনত্ব ও বৈচিত্র অনেক বেড়ে গেছে, তাও সাধকরা একটু সচেতন থাকলে বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু বৈরী চরিত্র যদি শ্রবণ করে আর যত শুনবে তত ভেতরটা ফোঁস ফোঁস করতে থাকবে। নাস্তিকদের চরিত্র শুনলে তার অল্প যে একটু ভক্তির ভাব এসেছে ওটাও উড়ে যাবে। আর স্ত্রী চরিত্র যদি হয় তাহলে ভগবান তাকে রক্ষা করুন। যে কোন দুটি মেয়ের চরিত্র কখনই এক হবে না, ফলে মেয়ে মানুষের থেকে কক্ষণ মন সরবে না, কারণ প্রত্যেকটি মেয়েই অন্য ধরণের হবে। কোন লোক যদি একশটা মেয়ের সঙ্গ করে থাকে এরপর একশ এক নম্বর যে মেয়েটি আসবে সে তার কাছে একেবারে নতুন হয়ে আসছে।

শুধু যে স্ত্রীর সঙ্গ করতে নিষেধ করছেন তা না, এমনকি স্ত্রী চরিত্রের কোন কথা পর্যন্ত শ্রবণ করবে না। মহাভারতে নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে শুধু দময়ন্তীর বর্ণনা শুনে শুনে নল দময়ন্তীর প্রেমে পড়ে গেছে। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে যেখানে বলছেন *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ। অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি।।* এই জগৎ অহংতা আর মমতাকে নিয়ে, আমি আর আমার এই নিয়ে। আর অহংতা আর মমতার এই ভাব আসে একমাত্র পুরুষ আর নারীর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ সেখান থেকে। এখান থেকেই পুরো সংসার শুরু হয়, আর ওখান থেকেই বাড়ি, সন্তান, বন্ধু, ক্ষেত্র, সম্পদ ইত্যাদিতে আমি ও আমার এই মোহ আসে। পুরুষ আর নারীর ঐ দাম্পত্য ভাব, মিলনের ইচ্ছা যদি না হয় তাহলে কিন্তু পুরুষ সব সময় মুক্ত, কিন্তু যেমনি পুরুষ আর নারী যোগ হল, ওটাই গ্রন্থি, ঐ গ্রন্থি যেই এসে গেল তখন সন্তানাদি হবে, তাদের জন্য বাড়ির দরকার হবে, অর্থের প্রয়োজন হবে, সম্পত্তি হবে, আর ওগুলোর মধ্যে পুরো আমি ও আমার ভাব এসে যাবে। সেইজন্য বলা হয়, সন্ন্যাসী যেই হয়ে গেল সেতো একেবারে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গেল, সেতো বিয়েথা করেনি, তার তাই কিছু নেই, অহংতা মমতা বলে আর কিছু থাকল না। সন্ন্যাসীদের প্রথমে মমতাটা চলে যায়, মমতা মানে আমার, মমতাটা খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, আর সন্ন্যাসীর অহংতা মমতা খুব কাছাকাছি। সংসারীদের আমি বোধ যতটা সন্ন্যাসীদের আমার বোধটা ওখানে গিয়েই শেষ হয়ে যায়, আমার শরীর আমার ঘর ঐ অতটুকু হয়ে গেলেই হয়ে গেল। সংসারীদের ক্ষেত্রে ওটা হল আমিত্ব, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গয়না কত কিছুতে আমিত্বটা ছড়িয়ে গেছে।

সন্ন্যাসীদের এসব কিছু নেই, তাঁকে তাই কিছু ভাবতেও হয় না, যে ঘরে আছেন, সেই ঘরটা যদি ভেঙে যায়, আশ্রম থেকে বলে দেবে তোমার ঘর ভেঙে গেছে তুমি অন্য ঘরে যাও, সন্ন্যাসীকে এর জন্য ভাবতে হচ্ছে না। সংসারীদের ভাবতে হবে, স্ত্রীর অসুখ হলে কত দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, সন্ন্যাসীর কোন রোগ হয়ে গেলে সাধুরাই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আসবেন। আমার বোধটা সাধু সন্ন্যাসীদের একেবারে শূন্যে চলে যায়। সব দিক দিয়ে সে স্বাধীন হয়ে গেল, ফলে সন্ন্যাসী যদি ঈশ্বর চিন্তন না করে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। সেইজন্য এখানে সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমার যদি কিছু করার না থাকে তাহলে তুমি এই বিপদে পড়বে।

ভাগবতেই আরেকটা জায়গায় খুব সুন্দর কথা বলছেন, স্ত্রী, স্ত্রী-সঙ্গী দুটোকেই সাধককে ত্যাগ করতে হয়। তার মানে, নারীকে তো ত্যাগ করবেই, আর যে পুরুষ নারীর সাথে খুব দহরম করে, তার থেকেও দূরে থাকবে, তা নাহলে তোমার মনেও ছাপ পড়ে যাবে। এক আশ্রমের সাথে একজন ডাক্তার কাজকর্মে জড়িত ছিলেন। তিনি নতুন বিয়ে করেছেন। এরপর একজন মহারাজ কিছুতেই চাইতেন না যে উনি ওনার কাছে এসে বসেন। অনেকের মনে হবে মহারাজ কেন এই রকম করছেন। কিন্তু তাঁর কাছে হল, ডাক্তার নতুন বিয়ে করেছে এখন ওর পুরো মন একজন নারীর উপর আসক্ত হয়ে আছে। কাছে এসে বসলে সাধুদের মনেও একটা ছাপ ফেলবে। তিনি হয়ত বুঝতে পারবেন না, কিন্তু অজান্তায় একটা ছাপ ফেলবে। ভাগবতেই আবার বলছেন *স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্নামতন্দ্রিতঃ।।১১/১৪/২৯।* স্ত্রী ও যারা স্ত্রীর সঙ্গ করে এদের থেকে দূরে থাকবে, মনকেও এদের থেকে সরিয়ে শান্ত ভাবে বসে শুধু আত্মচিন্তনে নিজের মনকে ডুবিয়ে রাখবে। স্ত্রী আর বৈরী এই দুটো খুব শক্তিশালী। আমাদের শাস্ত্রে আট রকমের মৈথুনের কথা বলছেন। এই আট প্রকার মৈথুন থেকে বর্জিত থাকতে হবে। (১)দর্শন, (২)স্পর্শন, (৩)কেলি, কেলি মানে মেয়েদের সাথে হাসিঠাট্টা করা, (৪)কীর্তন, অর্থাৎ মেয়েদের সাথে আলাপ আলোচনা করা, (৫)গুহ্যভাষণ, নিরিবিলি বা লুকিয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলা, (৬)সঙ্কল্প, নারীর ব্যাপারে যে কোন সঙ্কল্প, যেমন ওর সাথে দেখা করতে হবে, ওকে একটা উপহার দিতে হবে, (৭)অধ্যাবসায়, নারীকে পাওয়ার চেষ্টা, তাকে খুশি করার চেষ্টা আর (৮)ক্রিয়া, শারীরিক ভাবে নারীর সাথে যে কোন ক্রিয়া, এই আট প্রকারের মৈথুন হয়। অন্যান্য জায়গায় আরও কয়েকটা জিনিসকেও মৈথুন বলছেন, যেমন নারীর কোন ব্যবহৃত জিনিস কাছে রেখে দেওয়া ইত্যাদি। তবে মোটামুটি এই আট প্রকার মৈথুন হয়, বলছেন *এতদ্ মৈথুনং অষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মণীষীণাঃ* আর বলছেন *বিপরীতং ব্রহ্মচর্যম্ অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ*, এর বিপরীত যেটা সেটাকেই ব্রহ্মচর্য বলে এবং মুমুক্ষুরা এর বিপরীত করেন। কিন্তু যারা মুমুক্ষু নয় তারা এই আট প্রকার ভাবে মৈথুন করে। কেউ হয়ত বলছে, আমি কোন মেয়ের সঙ্গ করি না, কথাও বলি না। করে না ঠিকই, কিন্তু তারপর হয়ত দেখা গেল মেয়েদের দিকে তাকায় বা ম্যাগাজিনে মেয়েদের ছবি দেখে। ঠাকুর এটাই বলছেন, সন্ন্যাসী স্ত্রীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে আছেন, গভীরে যাঁরা ঢুকে যান ওনাদের এই জিনিসগুলো স্বাভাবিক ভাবেই খসে পড়ে যায়, চিন্তা ভাবনা করে ছাড়তে হয় না। কিন্তু যখন মৈথুনের ব্যাপার আসে তখন তাকে এই আটটি জিনিস থেকে সরে আসতে হবে। এর কোন একটাও যদি হয়ে থাকে, বুঝতে হবে নারী সম্বন্ধীয় ইচ্ছা জিনিসটা এখনও তার ভেতরে আছে। সব কটাই গোলমাল বলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর আগে ভাগবতে যে বলছেন *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ*, একজন নারীকে দেখে পুরুষের মন ঐদিকে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক, মন চঞ্চল হয়ে যাওয়াটাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের পথে আছেন তাঁদের জন্য এটাই বিরাট বড় বিঘ্ন। সেইজন্য সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি এই আটটি জিনিস করবে না। যাদের সাথে আমাদের ওঠা বসা আমরা তাদের মতই হয়ে যাব, সেইজন্য গোলমাল লেগে যায়। তার সাথে বলছেন –

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্।।৬৪।।

ঈশ্বরের ভক্তকে খুব সচেতন ভাবে অভিমান, দম্ভ ত্যাগ করতে হয়। আর বলছেন –

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং
তস্মিন্নেব করণীয়ম্।।৬৫।।

যত ধরণের কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান আছে এগুলোকে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলোকে মোর ফিরিয়ে দাও। এর আগে আমরা অন্তর্জগৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। এই সূত্রটা অন্তর্জগতকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কেউ কাউকে যখন ভালোবাসছে, সে তখন শুধু তাকেই যে ভালোবাসছে তা না, তার ভেতরে ভালোবাসাটা আছে সেইজন্য ঐ লোকটার দিকে ভালোবাসা যাচ্ছে। আলোচনার সময় বলা হয়েছিল, মানুষের মনে সময়ের বোধ এক রকম চলে আর বহির্জগতের সময়ের সাথে ঐ সময়কে ঠিক করে নেওয়া হয়। জড়ভরত যখন হরিণের শাবককে ভালোবাসছেন তখন হরিণকে ভালোবাসার কিছু নেই, কিন্তু এত কিছু থাকতে শুধু ঐ হরিণটাকেই কেন ভালোবাসছেন? আসলে ভালোবাসা ভেতরেই জমে আছে, একটা পাত্র পেলেন আর ঐ পাত্রে ভেতর থেকে ভালোবাসাটা ঢেলে দিলেন। অনেক সময় অন্য কিছুও থাকতে পারে, একজন লোককে দেখে আমার রাগের কারণ হতে পারে, যখন রাগটা বেরিয়ে এল তখন ঐ রাগটা গিয়ে আরেকজনের উপর বেরোচ্ছে। গুরুত্ব সব সময় হয় ভেতরের আবেগের। আমি যদি সচেতন হয়ে যাই, বুঝতে পারছি আমার ভেতরে এই ধরণের রাগ, অভিমান, ক্রোধ আছে তখন আমাকে এগুলোর মোর ফিরিয়ে দিতে হয়। মোর ফেরানোটা অত্যন্ত কঠিন, কথামৃতে ঠাকুরের এই কথা প্রথম পড়ার পর মনে হবে, এটা কি কখন সম্ভব! হ্যাঁ সম্ভব, কারণ যাঁরা একটু উন্নত সাধক তাঁরা বুঝতে পারেন আমি যে ওর উপর রেগে যাচ্ছি এই রাগটা কিন্তু ওর প্রতি নয়, আমার রাগ অন্য কারুর প্রতি যেটা আমার ভেতরের ইমোশান গুলোকে দাঁড় করাচ্ছে, এখন ওটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। সাধক কিন্তু সজাগ তিনি দেখছেন তাঁর ভেতরে রাগ আছে, তাঁর ভেতরে কাম আছে, তখন তিনি ওটাকে মোর ফিরিয়ে দেন। ক্রোধ নিজের উপর, এখনও আমার ঈশ্বরের দর্শন হচ্ছে না। কাম, আমি তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখতে চাই। ঠাকুর বলছেন, আমার সাধ ছিল ভক্তের রাজা হব, এটাই মোহ, ভেতরে আকাঙ্ক্ষা আছে, আমি ভক্তের রাজা হব। আবার একদিন ঠাকুর বলছেন, আমার ভয় হল, ভাবলুম সে বুঝি আমার থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। অবতারই হন আর যাই হন, তিনি এখন মানুষ রূপে আছেন আর মানুষের যা যা ইমোশান থাকে সব ইমোশানই আছে, সেই ইমোশানসকে কিভাবে মোর ফেরাচ্ছেন সেটাও তিনি দেখাচ্ছেন। মা কালীর কাছে গিয়ে বলছেন, মা তুই দেখা দিবি না, বলেই খড়্গ দিয়ে নিজের গলা কাটতে যাচ্ছেন। দেখাচ্ছেন কিভাবে তিনি লোভ, মোহকে মোর ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। প্রেমে পড়ে মানুষ তো আত্মহত্যা করেই, তোমাকে না পেলে আমি গলায় দড়ি দেব। ঠাকুরেরও রাগ ছিল, বলছেন আমি রাগলে তুই চুপ করবি তুই রাগলে আমি চুপ করব, তা নাহলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। ভাগ্নে হৃদয়ের সাথে যখন ঝগড়া হত তখন মনে হত আর দুজনে এরা কেউ কারুর সাথে কথা বলবে না। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই এক। ঠাকুরেরও সব ইমোশানই ছিল, তবে ওগুলো দিয়ে ওনাকে বাঁধার ক্ষমতা ছিল না। এটাই বলছেন, *তদর্পিতাখিলাচারঃ*, আমার যত রকমের আচার সব ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য আমার যত ইমোশানস্ সব তাঁর প্রতিই চলে যাবে, কারণ তিনিই একমাত্র আছেন, অন্য আর কেউ নেই।

অন্তর্জগতের ইমোশানের বাস্তবিকতা আর গুরুত্ব যিনি সাধনাতে আছেন তাঁকে এটা বাস্তবিক বুঝতে হয়। আমি আপনি বুঝতে পারব না, এটা কি করে সম্ভব যে সব ইমোশানসকে মোর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু কাম ক্রোধ বাইরে কিছু নেই সবই ভেতরে আছে। সাধনার স্তরে সাধক এটাকে বাস্তবিক দেখতে পান বুঝতে পারেন। যখন তিনি মোর ফিরিয়ে দেন তখন তিনি মহাপুরুষ হয়ে যান। আমার ছেলে বদমাইশ, ছেলের উপর তাই বলে কি রাগ করব না! ভক্তিশাস্ত্র বলছেন, না, তুমি রাগ করতে পার না, কারণ তুমি সব কিছু ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে দিয়েছ। ছেলেও তো ঈশ্বরের হয়ে গেল। তাহলে রাগটা কোথায় যাবে, রাগটা তো থাকবে। এবার থেকে গেল ইমোশানস্, বলছেন ইমোশানসকে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করে দাও, হায় পোড়া মন, তুই এখনও ঈশ্বরের দিকে গেলি না। এই দুটো, অপদার্থ ছেলে আর অপদার্থ ছেলের উপর আমার রাগ, তৃতীয় হল ক্ষমতা, যে ক্ষমতায় রাগকে মোর ফিরিয়ে দেবে। এটা practically impossible to practice কিন্তু compulsory, এটাই করতে হয়। ঠাকুরের উপমা দেওয়া হল, ওনারও ঈর্ষা হচ্ছে, বলছেন, ভয় পেলাম, ভাবলুম আমার থেকে বুঝি এগিয়ে গেছে, ওখানে ঠাকুর কোন প্রতিযোগিতা সহ্য করবেন না, I am the best। বাসনা আছে, আমি ভক্তের রাজা হব। যে আসছে তাকেই জিজ্ঞেস করছেন, আমার মত আর কাউকে

দেখেছ। যদি দেখে থাকে ঠাকুর ওটাও করে নেবেন, he has to be the best। এটা ঠিকই যে, অবতারের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলোর কোন অর্থ হয় না, কিন্তু দেখাচ্ছেন ইমোশানস্ যদি থেকে থাকে তাহলে কিভাবে ওটাকে মোর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রয়েডও এই জিনিসটাকে ধরতে পেরেছিলেন, বস্তু আর বস্তুর প্রতি যে ভাব, এই দুটো আলাদা। কাম ভাব তার ভেতরেই আছে, বস্তুর জন্য ওটা হচ্ছে না। পরের সূত্রে বলছেন –

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাভজনাত্মকং বা
প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্ ইতি।।৬৬।।

সূত্রে তিনটে জিনিসকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার আগে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, পুরো ভক্তিসূত্রে কোথাও আমরা যে ধরণের ভক্তি অনুশীলন করি, দু টাকার বাতাসা চড়িয়ে দিলাম, একটু জপধ্যান করলাম, একটু শাস্ত্র পড়লাম, এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন না। ওনাদের কাছে এগুলো কিছুই না, দুধভাত। শুরুই হয় নিজেকে যখন একেবারে উৎসর্গ করে দেওয়া হল, সেখান থেকে। একজন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী যেভাবে নিজেকে সমর্পিত করে দিচ্ছেন আর যে গৃহস্থ বলছেন আমি ভক্তি লাভ করতে চাই, তাঁকেও কিন্তু এভাবেই পুরোপুরি সমর্পিত করতে হবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের সাথে দিল্লীতে এক সুফি মহাত্মার দেখা হয়, সেই সুফীর পুরো কোরাণ মুখস্ত। মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, এতদিন সাধনা করে কি পেলেন? উত্তরে বলছেন, একটা লেবুকে নুনের হাড়িতে অনেক দিন রেখে দিলে যেমন লেবুর টক ভাব চলে গিয়ে পুরোটাই নুন হয়ে যায়, আমিও ঠিক তেমনি আল্লাতে ডুবে গেছি, আমার ভেতর বাহির সবটাই আল্লা, আল্লা ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের সমস্যা হল, আমরা মনে করছি আমরা একটা থাক আর ওনারা আরেকটা থাক, কিন্তু তা নয়, দুটোই সমান। শাস্ত্র কখনই সাধারণদের জন্য রচিত হয় না, শাস্ত্র বর্ণনা করবেন যাঁরা শ্রেষ্ঠতম তাঁরা কেমন হন আর যাদের সত্যিকারের তাঁদের মত হওয়ার ইচ্ছে তাদের কি কি করতে হবে। এখানে বলছেন, *প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্ ইতি*, যদি ভক্তি চাও তাহলে প্রেম কর, প্রেম করাটাই তোমার একমাত্র কাজ। তাই বলে আমরা কি প্রেম করি না? ঠাকুরের প্রতি আমাদের যে প্রেম আর এখানে *প্রেম এব কার্যম্*, এই দুটো প্রেমে তফাৎ কোথায়? ঈশ্বরের প্রতি যে আমাদের প্রেম এই প্রেমে একটা আবেগপ্রবণতা, emotionalism থাকে, একটা emotion ঐ প্রেমটাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, ওটা নিয়েই লাফালাফি করছি, ওর মধ্যে কিছু নেই। এখানে যে *প্রেম এব কার্যম্* বলছেন, তাতে বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ছাড়া তোমার অন্য আর কোন কার্য যেন না থাকে। সংসারে থাকতে গেলে সংসারকেও দেখতে হচ্ছে, কর্মস্থলেও দেখতে হচ্ছে, ওর মধ্যেই কিন্তু তোমার যে প্রধান কাজ, সেটা হবে প্রেম।

প্রেম কিভাবে হবে? *নিত্যদাস-নিত্যকান্তাভজনাত্মকং বা*, ঠিক ঠিক যিনি সেবা করেন, ভালোবেসে যে সেবা হয়, সেটা কি রকম, দাস ভক্তি। হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করছেন, এখানে বাৎসল্য নেই, একেবার দাস, একজন যে খুব দক্ষ দাস হয় সে যেমন মনিবের সেবা করে, খুব নিষ্ঠার সাথে করে, সে জানে মনিবই আমার প্রাণ, আমার মান, আমার সম্মান। বলছেন এই ভাব যেন তোমার ঈশ্বরের প্রতি থাকে। আচার্যও গীতার ভাষ্যে ঠিক এই কথাই বলছেন, *অহম কর্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, আমি কর্তা, ঈশ্বরের জন্য কর্ম করছি। খুব কঠিন ঠিকই, কিন্তু কোন কাজ জীবনে সহজ! বিয়ে করে একজন স্ত্রীকে সামলানো কি সহজ? পুরুষদের দম বেরিয়ে যায়। আর সেখানে ভগবানের সাথে বিবাহ হবে, সেকি সহজ কাজ! আর দ্বিতীয় হল *নিত্যকান্তা*, একজন সতী ঠিক যে রকম তার স্বামীর সেবা করে, ঠিক সেই রকম তুমি ঈশ্বরের সেবা করবে। সতীকে খুব উচ্চমানের সতী হতে হবে, স্বামী ছাড়া জগতের কোন কিছুতেই তার বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই। মুশকিল হল এই উপমা গুলো বর্তমান দিনে বোঝাই যাবে না। তার কারণ আজকাল না ঐ রকম ভৃত্য পাওয়া যায়, আর না এই রকম পরস্পরের প্রতি উৎসর্গকৃত দম্পতি দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রতি তোমার শুধু একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রেম, প্রেম আর প্রেমের কার্য। ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি রকম প্রেম হবে? যেমন দাস তার মালিকের সেবা করে বা সতী যেমন তার স্বামীর সেবা করে। এটা অপরা ভক্তিতে কেমন হয় তার উপমা দিচ্ছেন, এটাই যখন পরা ভক্তিতে যায় তখন সতী থাকে না তখন ওটাই জার প্রেমের সাথে তুলনা হয়ে যায়, বলেন অব্যভিচারিণী কিন্তু আসলে হয় ব্যভিচার। অপরের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় যে তীব্রতা থাকে ঐ তীব্রতার কথা বলছেন, দুটো পুরো আলাদা জিনিস।

এতক্ষণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রস্তুতির তখনকার কথা বললেন, এই প্রেম টানা থাকতে হবে। টানা করলে কি হয়? বলছেন, *ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকম্*। সেবাতে যে প্রগাঢ়তা, সতী যখন স্বামীর সেবা করছে, দাস মনিবের সেবা করছে, তখন তার ত্রিরূপ ভঙ্গ হয়। যে কোন কাজে তিনটি সত্তা থাকে, আমি, তুমি আর সেবা, ঐ প্রেমে এই তিনটে আলাদা সত্তা দ্রবীভূত হয়ে এক হয়ে যায়। আমি বোধটা চলে যায়, তুমি বোধটাও চলে যায়, একমাত্র সেবাটাই থাকে। যে ধাতা সেও চলে যায়, ধেয় যাঁর ধ্যান করছে সেও চলে যায় শুধু ধ্যনটুকুই থেকে যায়। মা যখন তার ছোট্ট দুধের শিশুকে খাওয়ায় তখন আমি মা আর এ আমার সন্তান এই বোধটা চলে গিয়ে শুধু খাওয়ানোটাই চলতে থাকে, সন্তানের প্রতি ঐ সেবার ভাবটুকু থাকে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের যে ধ্যান করা হয় সেখানে আমি ধ্যান করছি এগুলো সব চলে গিয়ে শুধু থেকে যায় একটা সচেতনতার ভাব, ঐ সচেতনতাই হল সৎ। সেখানে তখন আর কোন ধরণের বোধ থাকে না, অভাব বলে যে কিছু নেই এটাই শুধু ওখানে মনে হয়। 'মনে হয়' বললে কিন্তু দুই চলে আসছে, 'মনে হয়' যিনি বলছেন আর যেটা মনে হয় সেটা, এই দুটো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ঐ একটাই সত্তা তিনটেতে ভেঙে আলাদা হয়ে যায়। যেমন বলা হয় অখণ্ড আর খণ্ডিত, এটা তাই হয়, অখণ্ডকে আমরা ব্রহ্ম বলছি, ঈশ্বর বলছি আর খণ্ডিতকে আমরা প্রকৃতি বলি। আশ্চর্যের জিনিস যেটা, আমরা কিন্তু নিয়মিত এই অবস্থার অনুভব করছি। কোথায় করছি? আমাদের খুব তীব্র ভালোবাসা যেখানে থাকে। যাকেই আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসার জন্য একটা বস্তু লাগে, স্বামীকে, স্ত্রীকে, সন্তানকে, সেখানে আমি তুমি বোধ আছে, ভালোবাসা হয়ে হয়ে যেমন যেমন তীব্রতা বাড়ছে, হয়ে হয়ে দুটোই এক হয়ে যায়। তারপর তিনটা এক হয়ে যায়, তিনটে মিলে যে এক হয়েছে, শেষে সেটাও মিলিয়ে যায়। মা, শিশু আর তাকে স্তন্য পান করানো, করতে করতে শুধু স্তন্য পান করানোর ঐ চেতনার বোধ টুকুই থাকে। মা যদি খুব উচ্চমানের হন তখন তিনি ওখানে একটা শুধু ক্রিয়ার বোধে হারিয়ে যান, আর কোন কিছুর হুঁশ নেই, তার জগৎ উড়ে যাবে, তার আমিটা উড়ে যাবে, যাকে মাধ্যম করে করছে ঐ শিশু উড়ে যাবে আর যে জিনিসটা হচ্ছে স্তন্যপান, সেটাও উড়ে যায়। শুধু একটা বোধ থেকে যায়। বোধ শব্দটাও এখানে যেন বেমানান লাগে। বাংলায় বোধ বললেই মনে হবে যেন মনের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে মন তখন ঐ অর্থে থাকে না।

অখণ্ড বোধ প্রত্যেক মানুষেরই কখন না কখন হওয়া উচিত, কোন একটা সময় এই বোধ হবেই। আর এটা সব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ভালোবাসার ক্ষেত্রে, যে কোন ভালোবাসায় যদি তীব্রতা থাকে ওখানে আমি তুমি বোধ চলে যাবেই, সেখানে যে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে, সেটাও ওটাতে লয় হয়ে যায়, তারপর ক্রিয়ার বোধটাও থাকবে না, থাকে শুধু সত্তা মাত্রম্। সবারই জীবনে একবার দুবার এই অখণ্ডের অনুভব হয়ে থাকবে, যারা আরও অনুভূতি সম্পন্ন, মন যাদের শান্ত তাদের আরও বেশি হয়ে থাকবে। সবারই কখন না কখন হওয়ার কথা। ঈশ্বরকে নিয়ে যখন এই একই বোধ হয় তখন ওটাই একটা জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে চলে যায়, ঐ জ্ঞান যদি ফুটে ওঠে তখন ওটাই অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে যায়। ঈশ্বরকে নিয়ে যতক্ষণ ক্রিয়া বোধটুকু গভীর ভাবে থাকছে ততক্ষণ ঈশ্বরের সাকার জ্ঞান হচ্ছে, ওটাও যখন চলে গেল তখন তাঁতেই ডুবে গেল, তখন ক্রিয়া বোধও থাকে না। এগুলো নিজে থেকে যতক্ষণ বোধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলে বোঝান যাবে না। ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধের সহজ পথ হল *নিত্যদাস-নিত্যকান্তাভজনাত্মিকাম্*, তখন আমি, তুমি, আর ক্রিয়া এই তিনটের নাশ হয়ে পুরো জিনিসটা এক হয়ে যায়। শুধু ক্রিয়া বোধ বা শুধু আমি বোধ বা তুমি বোধ, যে কোন একটা বোধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ওটাও লয় হয়ে গিয়ে শুধু মাত্র সত্তা মাত্রম্ এটাই থেকে যায়। কেউ যদি এই জিনিসটাকে অনুভব করতে চায়, আজকেই হয়ে যাবে। যদি মন প্রাণ দিয়ে ক্রিয়া করে, একেবারে মন প্রাণ দিয়ে ক্রিয়া করছে, তখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ হয় না, ক্রিয়াটা তখন সব সময় ভেতর থেকে আসে, ভেতর থেকে মানে আত্মার শক্তি থেকে আসে।

এরপর থেকে মুখ্যা ভক্তির মহিমার বর্ণনা শুরু করছে, এখান থেকে এবার হাল্কা হতে শুরু হয়ে যায়। এখানে প্রথমে বলছেন –

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ।।৬৭।।

যে ভক্তরা *একান্তিনঃ*, অর্থাৎ পুরোপুরি ঈশ্বরকে নিয়েই আছেন, তাঁদেরকে বলা হয় মুখ্যা ভক্ত বা যাঁরা এই ভক্তি করেন সেই ভক্তিকে মুখ্যা ভক্তি বলা হয়। আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছিল আমাদের যে ইমোশানস্

গুলো রয়েছে এগুলোকে কিভাবে পরিশুদ্ধ করা যেতে পারে। পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া যখন খুব নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে, এইভাবে করতে করতে মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় আর যখন তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরের চিন্তন চলে তখন মন শান্ত, স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তখন আত্মার যে জ্ঞান বা ঈশ্বরের যে বোধ সেটা নিজেই ভেসে ওঠে। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, এই দুশো বছর আগেও ভারতবর্ষের মুষ্টিমাত্র কয়েকজন ব্রাহ্মণ যা জানতেন, আজকে তার থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি জানে।

বেশির ভাগ বক্তাই ভাষণ দিতে গিয়ে শুরু করেন, ১৮৩৬ সালে মেকলে শুরু করলেন দেশকে বিধ্বংস করার চেষ্টা। অথচ এনারা একবারও ভেবে দেখেন না যে, মেকলের মত ভালো কাজ গত দেড়শ বছরে খুব কম লোকই করেছেন। ভারতবর্ষে ইতিহাস বলে কোন কিছু ছিল না, ভূগোলের উপর কোন ধারণা ছিল না, গণিত শাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, জীববিদ্যা বলে কোন ধারণা ছিল না আর কদাচিৎ কখন কোন একটা আইডিয়া ছিল সেও আবার কোথায় কোন পাহাড়ের গুহায় বা জঙ্গলের কোন আশ্রমে আবদ্ধ হয়ে ছিল আর আমরা আর্যভট্ট, ভাস্কর এনাদের নাম বলে যাচ্ছি, ভগবান জানেন ওনারা কি বলছেন আজ পর্যন্ত কেউই বোঝে না, কিছু পণ্ডিতরা ছিলেন, তাঁরা নিজের মত কিছু করে দিয়ে গেছেন। আচ্ছা না হয় মেনে নেওয়া গেল অনেক জ্ঞান ছিল, কিন্তু কাদের কাছে ছিল? মুষ্টিমাত্র কয়েকজন ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল। আমরা যদি ধরেই নিই তখন ভারতে দশ কোটি লোক ছিল, তার মধ্যে চার পাঁচ হাজার লোকের কাছে এই জ্ঞান ছিল। এটাকে কি শিক্ষা বলে? আজকে আমরা মেকলের শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করছি অথচ এই শিক্ষা পদ্ধতির জন্য আজকে বাংলায় দরিদ্রতম বাড়িতেও শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। এই মেকলের জন্য সবাইকে টেনে একটা শিক্ষার মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না যে, মেকলের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে গান্ধীজী দাঁড়ালেন, নেতাজী দাঁড়ালেন, নেহেরু দাঁড়ালেন আর স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়ালেন। বর্তমান ভারতবর্ষ আজও মেকলের শিক্ষা পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে ডঃ কালামের মত ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়েছেন। গত হাজার বছরের ভারতের ইতিহাসে ডঃ কালামের মত ব্যক্তিত্ব কজন হয়েছেন? আর ঐ সংস্কৃত কালচারের যুগে স্বামীজীর বুকের রক্ত যখন মুখে বেরোচ্ছে তখন একশ জন সন্ন্যাসীও রামকৃষ্ণ মিশনে ছিল না, আর আজকে মেকলের শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে পনেরশ সন্ন্যাসী হয়েছে। মেকলের নিন্দা তখন এনারা করেছিলেন কারণ নতুন একটা পদ্ধতি আসছে, তাতে কতটা সাফল্য আসবে কি আসবে না সেটা কেউ জানতেন না, কারণ পরীক্ষিত হয়ে যাচাই করার সুযোগ তখনও আসেনি। মেকলের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বিষয় নয়, কিন্তু যেটা খুব আশ্চর্যের যে আজ থেকে দুশ বছর আগেও যাঁরা অত্যন্ত খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের বাইরে সাধারণ ব্রাহ্মণরাও যে জিনিসগুলো জানতেন না, তার থেকে ঢের বেশি আজকের গৃহবধূরাও জানে। এই যে সূত্রগুলো আমরা আলোচনা করছি, তখনকার দিনে খুব উচ্চমানের পণ্ডিত না হলে কেউই ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। আর আজকে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে বছর বছর এখানে কত ভক্ত আসছেন যাঁরা পতঞ্জলি যোগসূত্রও পড়ছেন, ঐ এক নিঃশ্বাসে উপনিষদও পড়ছেন, সেই একই নিঃশ্বাসে গীতা পড়ছেন, একই নিঃশ্বাসে ভক্তিসূত্র পড়ছেন আর মহাভারতও পড়ছেন। একবার যদি কেউ এখানে পাঁচ বছর ধরে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে নিতে পারেন তখন তাঁর একটা আইডিয়া তৈরী হয়ে যাবে আমাদের সমস্ত শাস্ত্র মূলতঃ কি বলতে চাইছেন, আর তার সাথে প্রত্যেকটা শাস্ত্রের পরস্পরের যে বক্তব্য সেটাকে একটার সাথে আরেকটাকে মিলিয়ে একটা সমন্বয় করে খাঁচে খাঁচে বসিয়ে নিতে সক্ষম হয়ে যাবেন।

এই সূত্রে *একান্তিনো* যে বলছেন, এটাকেই যদি যোগের দৃষ্টিতে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে দেখা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যাবে। যাঁরা প্রথম কথামৃত পড়বেন তাঁদের কাছে কথামৃত খুব সহজ মনে হবে, স্বামীজীর রচনাবলী কঠিন হবে, তারপর গীতা উপনিষদ পড়তে গিয়ে আরও কঠিন মনে হবে। গীতা উপনিষদ ঠিক ভাবে পড়ার পর কথামৃত পড়তে গেলে মনে হবে কথামৃত কী কঠিন। কথামৃত যদি অত্যন্ত কঠিন বলে বোধ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে বোঝাতে কোথাও গোলমাল আছে। কারণ কথামৃত হল সমস্ত শাস্ত্রের সার, সব কিছু জানা না থাকলে মেলাতে পারা যাবে না। আসলে প্রত্যেকটি শাস্ত্রই সার, যে প্যাটার্নে গেছে ঐ প্যাটার্নের সার রয়েছে ঐ গ্রন্থে, সেইজন্য মানুষ বুঝতে পারে না, আর এক একটা বাক্যকে যদি কোন আচার্য বোঝাতে যান তাঁর এক

ঘন্টা করে লেগে যাবে। এর দ্বিতীয় একটা বিকল্প হল সব শাস্ত্র যদি পড়া থাকে, তবে ওর অর্থ খাঁচে খাঁচে বসে যেতে পারে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ এর জন্য একজন উপযুক্ত আচার্যের প্রয়োজন হবে।

এখানে বলছেন, যিনি ভক্তি পথে এসেছেন, এবার তিনি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের ভক্তির মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন, তখন তাঁর কাছে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান, যেটাই বলুন, প্রকাশ হতে শুরু হয়। এদেরকে বলা হয় মুখ্যা ভক্ত। এর আগের অধ্যায়ে গৌণী ভক্ত ও ভক্তির কথা বলা হয়েছিল। দুজনই ভক্ত, গৌণী ভক্তিটাও গৌণী আর মুখ্যা ভক্তিটাও গৌণী। গৌণী ভক্তি যাঁর আরেকটু পেকে গেছে তাঁকে বলছেন মুখ্যা ভক্ত, তিনি আরেকটু ভেতরে চলে গেছেন। এর আগে ব্যাখ্যা কর হল নিজে কিভাবে প্রস্তুতি নেবে। চতুর্থ অধ্যায়েই বোঝা যায় ভক্তি ঠিক ঠিক কিভাবে করতে হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে এসে আলোচনাকে আবার আরেকটু উচ্চ স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন, এবার দেখাচ্ছেন পাকা ভক্তি হলে কি রকম হয়।

যিনি মুখ্যা ভক্তির অবস্থায় চলে যান তাঁকেই সন্ত বলা হয়, যাঁকে আমরা সাধু, মহাত্মা বলছি। ভক্তির গভীরতা আরও বেড়ে গেছে, কি রকম বেড়ে গেছে সেই ব্যাপারে পরে পরে আরও বলবেন। মোটামুটি আমাদের জেনে রাখা দরকার, পরা ভক্তি উচ্চতম ভক্তি, যে ভক্তিকে রাগানুরাগ বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলছেন। এর নীচে আসছে অপরা ভক্তি, অপরা ভক্তিকে আবার গৌণী ভক্তিও বলা হয়। গৌণী ভক্তির আবার মোটামুটি দুটি স্তর, একটা হল প্রথম যেটাকে গৌণী ভক্তি বলছেন আর দ্বিতীয় মুখ্যা ভক্তি বলছেন। বেশির ভাগ সাধক মুখ্যা ভক্তিতে গিয়ে থেমে যান। প্রেমা ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি বা রাগানুরাগ ভক্তি সবারই কপালে নাও জুটতে পারে। সত্যিকারের বৈষ্ণব সন্ত যাঁরা আছেন, এনাদের ঈশ্বরের প্রতি যে ভালোবাসা আর রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা সমান না। কোথাও একটা তফাৎ আছে, এই তফাৎকে বোঝানর জন্য পরে পরে অনেক শাস্ত্র রচনা হয়েছে। তফাৎ এটাই, রাধা হলেন স্বাভাবিক প্রেম ভক্তিতে, তাঁকে চেষ্টাও করতে হয় না। আর যাঁরা সন্ত, এনারা আগে আমার আপনার মত ছিলেন, সেখান থেকে চেষ্টা করে ভক্তিকে আয়ত্ত করেছেন, যেটাকে গৌণী ভক্তি বলছেন, সেই ভক্তির অনুশীলন করে করে ভক্তির গভীরতা বেড়ে বেড়ে মুখ্যা ভক্তিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। আগের সূত্রে যেমন বললেন, তাঁর ত্রিরূপ, ঐ যে তিনটে সত্তা আলাদা হয়ে আছে সেই তিনটে সত্তা ভেঙে এক হয়ে যদি থেমে গিয়ে থাকে, ওটাই তখন হয়ে যায় মুখ্যা ভক্তি।

যদিও গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলছেন না, একান্ত ভক্তি যদি হয়ে যায় তখন বলেন, এনারা সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের পারে চলে যান, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ। পরা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তিতেও তিনটে গুণের পারে চলে যান, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের গভীরতাকে কল্পনা করা যাবে না, ওটা হলে যেন দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন আর একান্ত ভক্তি হল যেন একটা দীপের আগুন। প্রেমা ভক্তি আর মুখ্যা ভক্তির দুজন মহাত্মার যদি তুলনা করা হয় সেখানে জ্ঞানের দিকে তাঁরা হয়ত সমান হতে পারেন কিন্তু অপরকে আধ্যাত্মিক ভাব দেওয়ার ক্ষমতাটা দুজনেরই যে সমান হবে তা নয়। যাঁর প্রেমা ভক্তি আছে ক্ষমতাটা তাঁর সব সময় বেশি হবে। সহজ ভাবে এই তিনটে স্তর, যাঁরা ভক্তির জন্য চেষ্টা করছেন, যাঁরা ভক্তির একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, তৃতীয় হল যে ভক্তি দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, ওনারা উচ্চতম, ওনাদের থাকটাই পুরো আলাদা। ঐ থাকে সাধারণ লোক যেতেই পারবে না। পরের সূত্রে তাঁদের বর্ণনা করছেন –

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং
লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ।।৬৮।।

এখন আমরা শ্রেষ্ঠ ভক্তদের কথায় চলে এসেছি, যাঁদের ভক্তি লাভ হয়েছে। আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সুরদাসের যে ভক্তি ঐ ভক্তিকে কখনই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির তুলনা করা যাবে না। সুরদাস মহাত্মা, সন্ত, কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু রাধা হলেন রাধা, জাতটাই আলাদা। সুরদাস রাধাকে নিয়ে লিখছেন, রাধা কোন দিন সুরদাসকে নিয়ে লিখেবন না, কোন তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুজনেরই ভালোবাসা আছে, দুজনই প্রেম করেছেন কিন্তু দুজনের জাত আলাদা। সন্ত, মহাত্মারা স্বাভাবিক ভাবে সব সময় দুই ধরণের লোকের সাথেই কথা বলেন, এক ধরণের হলেন যাঁরা ওনার মতই কৃষ্ণভক্ত আর দ্বিতীয় ধরণের হল যারা অভক্ত, ভক্ত আর অভক্ত এই দুই ধরণের লোকেদের সাথে তাঁরা কথা বলেন। ভক্তদের সাথে কথা বলার সময় তাঁদের *কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ*, কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে

আসে, শরীরে রোমাঞ্চ হয় আর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ঠাকুর বলছেন, গাঁজাখোড় গাঁজাখোড়কে দেখলে কোলাকুলি করে, অন্য লোক দেখলে লুকিয়ে যান বা সরে আসেন। আরেকটা উপমা দিচ্ছেন, এক পালের গরু এক অপরকে পেলে গা চাটতে শুরু করে। গরু যে গা চাটে, গাজাখোঁড় যে কোলাকুলি করে সেটাই এখানে বর্ণনা করছেন। আর অভক্তদের সাথে যখন বাক্যালাপ করেন তখন *পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ*, তাদেরকে তিনি পবিত্র করে বেড়ান।

আমাদের ব্যক্তিত্ব খুবই হাল্কা, সেইজন্য আমরা একটু কিছুতেই এই মুহূর্তে উপরে উঠে যাই আর পর মুহূর্তেই নীচে পড়ে যাই। গ্যাস বেলুনে গ্যাস ভরে দিলে উপরে চলে যাবে, গ্যাস যেই বেরিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে চুপসে মাটিতে পড়ে যাবে। আমাদের মত মানুষরা যখন এই ধরণের সন্ত মহাত্মাদের সংস্পর্শে আসে বা তাঁদের কাছে যাই তখন তাঁরা আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটু ওজন দিয়ে দেন। বাইরে থেকে বেলুড় মঠে ঢুকলেই সবারই মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়, তবে সবারই যে হবে তা না, যাদের মধ্যে একটু ভক্তির ভাব এসেছে তাদের কথা বলা হচ্ছে। মন শান্ত হওয়া মানেই ব্যক্তিত্বের ওজন বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণামের লাইনে দাঁড়ালেই মনটা শান্ত হতে শুরু করে, প্রণাম করার পর মন যেন উদাত্ত হয়ে যায়। মহাত্মাদের কাছে দু তিন মিনিট শান্ত হয়ে বসলেই ভেতরে একটা শান্তি বিরাজ করতে শুরু করে। তাতে বোঝা যায় যে ঐ লোকটির ব্যক্তিত্বে ওজন আছে। কিন্তু সন্ত মহাত্মারা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা করেন তখন ওনারা ভাব বিহ্বল হয়ে যান। এই ধরণের সন্ত মহাত্মারা নিজের বংশকে যেমন পবিত্র করেন তেমনি পৃথিবী এই ধরণের সন্ত মহাত্মাদের বুকে ধারণ করে পবিত্র হয়ে যায়। সন্ত মহাত্মাদের একটাই কাজ, অপরের কিসে মঙ্গল করা যায়। তার সাথে তাঁদের প্রভাব চারিদিকে ছড়াতে থাকে। এই জায়গায় এসে বিভিন্ন সন্ত মহাত্মাদের তফাৎটা বোঝা যায়। যে সন্ত মহাত্মা যত বড় তাঁর প্রভাব তত দূর পর্যন্ত বিস্তার পায় আর তত বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখন যাঁদের আমরা মহাত্মা বলে জানছি, এনার মৃত্যুর একশ বছর পর তাঁর প্রভাব কতটুকু থাকবে সেটা দিয়ে বোঝা যাবে তিনি কত বড় মহাত্মা ছিলেন। যেমন ঠাকুর, ঠাকুরের মহাসমাধির পর প্রায় দেড়শ বছরের কাছাকাছি হত যাচ্ছে, কিন্তু দেশ বিদেশ থেকে আরও মানুষ ঠাকুরের কাছে ছুটে আসছে, তাঁকে আরও অনেক লোক জানার চেষ্টা করছে।

একটা খুব নাম করা শ্লোক আছে *কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপারসংবিৎসুখসাগরেহস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।।* পরমব্রহ্মে যাঁর চেতনা লয় হয়ে গেছে, তখন তিনি অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হয়ে যান, এটা গেল তাঁর নিজের দিকের, আর অপরের জন্য কি করেন, *কুলং পবিত্রং*, যে বংশে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সেই বংশকে পবিত্র করে দেন, ধন্য করে দেন, আজ যেমন আমরা বলছি ধন্য কামারপুকুর। *জননী কৃতার্থা*, চন্দ্রামণিদেবীকে, শ্যামাসুন্দরী কে জানতেন, কিন্তু আজ সবাই তাঁদের জানছেন, তাঁরা কৃতার্থা হয়ে গেলেন। *বসুন্ধরা পূণ্যবতী চ তেন*, পৃথিবী নিজে পূণ্যবতী হয়ে যান, পুরো ভারতবর্ষ আজ পূণ্যভূমি হয়ে গেছে। একজন মহাত্মা যিনি সেই অখণ্ড চৈতন্যে পুরো লয় হয়ে গেছেন, সেই মহাত্মার জন্য তাঁর বংশ পবিত্র হয়ে যায়, তাঁর জননী কৃতার্থা হয়ে যান। আচার্য শঙ্কর বলছেন, অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই আজও ব্রাহ্মণদের পূজা করা হয়।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি
সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি শাস্ত্রাণি।।৬৯।।

এই সূত্রটি খুব সুন্দর একটি সূত্র, নারদ ভক্তিসূত্রে এই সূত্রের একটা বিশেষ দাম আছে। আমরা আজকে যাঁদের সত্যিকারের মহাপুরুষ, মহাত্মা বলে জানছি, তাঁদের সাথে জড়িত যেসব জায়গা আছে, তাঁদের যেসব কীর্তি, তাঁদেরকে নিয়ে যেসব শাস্ত্র জড়িয়ে আছে সবটাই ধন্য হয়ে যায়। শুধু যে অবতারদের নিয়েই এই জিনিস হবে তা না। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল মুখ্যাভক্তির মহিমা, যাঁরা মুখ্যাভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস হয়। তবে আমরা এখানে সবটাকে মিলিয়েই আলোচনা করছি। যাঁদের বর্ণনা আগের সূত্রে করা হল, এই ধরণের মহাপুরুষরা যখন কোন তীর্থে যান সেই তীর্থকে তাঁরা আরও সুতীর্থ বানিয়ে দেন, তীর্থের মহিমাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি যে শুভকর্ম গুলো করেন সেই কর্ম সমূহকেই সমাজ সৎকর্ম রূপে জানে। মহাভারতের খুব নামকরা শ্লোক, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*, মহাপুরুষরা যে পথে গমন

করেন সেটাই পথ, *সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি,* একই জিনিস, মহাপুরুষরা যে কর্ম করেন সেই কর্ম করা যেতে পারে। যেমন ঠাকুর মা কালীর পূজা করলেন, এখন সবাই মা কালীর পূজা করছেন, এটাই এখন সুকর্ম হয়ে গেছে। আর তিনি যে শাস্ত্র অধয়ন করেন, যে শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন সেই শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বেড়ে যায়।

ঠাকুর যা যা লৌকিক কর্ম আর শাস্ত্রীয় কর্ম করেছেন ঠাকুরের ভক্তরা ঐ কর্মগুলোই মানছে। মহম্মদের জীবনেও ঠিক তাই। আমাদের যেমন মনুস্মৃতির মত অনেক শাস্ত্র আছে কিন্তু মুসলমানদের দুটি শাস্ত্র, কোরান আর হাদিস, কোরান মূল শাস্ত্র আর হাদিস আনুষাঙ্গিক শাস্ত্র। মহম্মদ নিজে কি করেছিলেন, কাকে কি বলেছেন, কে কে শুনেছিল সেগুলো সব হাদিসে রেকর্ড করা আছে। ওরা যখন বিচার করে এই কাজ করা যাবে কি যাবে না, তখন প্রথমে দেখবে কোরানে এই ব্যাপারে কিছু বলা আছে কিনা, যদি কোরানে থাকে তাহলে তো খুব ভালো, এই কাজ করা যাবে। কোরানে যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে হাদিসে দেখতে হবে। হাদিসে দেখার সময় তখন যেটা প্রামাণিক হাদিস সেখানে দেখবে, মানে মহম্মদ নিজে ওটা করেছিলেন কিনা। তার মানে মুসলমানদের কাছে মহম্মদ যা যা কর্ম করেছেন সেগুলো কর্ম বাকি সব অকর্ম, ঐ অকর্ম করাটাই পাপ।

ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা এখানে এসেই তফাৎ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা মানে সব কিছুর সার, ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। আমরা জগতে মায়ার রাজ্যে বিচরণ করছি, মায়ার রাজ্যে কিছুই জানা যায় না, কি হয়, কেন হয়, কোথা থেকে হয়, কিভাবে হয়। ঠাকুরও পরিষ্কার করে বলছেন না, কোথাও বলছেন, তোমার কি এগুলো বিশ্বাস হয়? কিন্তু আমরা যদি বিচার করতে যাই, জীবনটা কিভাবে চালাবো, ঈশ্বর কতটুকু আমাদের চালাচ্ছেন, কর্মের বিধান কিভাবে আসে, প্রার্থনা কতটুকু শোনা হয়, তখন দেখতে পাই এটাও আছে আবার ওটাও আছে। কথামৃতে একটা কথা আগাগোড়া এক ভাবে বলে গেছেন আর এর কক্ষণ কোন অন্যথা নেই, ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না, এর কোথাও কোন ধরণের আপোষ নেই। এটাই যখন আমরা আমাদের জীবন নামাতে যাব তখন এটাই হয়ে যাবে, ঈশ্বর আছেন আর আমি আছি, আমার সত্তা আমি জানি আর ঈশ্বরের সত্তা কথামৃত থেকে পাচ্ছি, এই দুটোই সব আর বাকি সব গৌণ। যেমনি এই গৌণ জিনিসগুলির সমাধান খুঁজতে যাওয়া হবে, তা সে যে কোন শাস্ত্রই হোক না কেন, কোথাও পাবে না। আমাদের কোন উপায়ই নেই যে ওখান থেকে একটা pattern life style বার করতে পারব। কিন্তু কিছু একটা আমাদের করতে হবে, তাহলে জীবনটা চালাব কি করে! তখন এই যে মহাপুরুষরা আছেন, যাঁর ভাবে আমি নিজেকে দিয়ে দিয়েছি, তিনি যেসব কর্ম করেছেন ঐটাই তখন মনে হয় এই কর্মগুলোই আমার পক্ষে করণীয়। তিনি যে শাস্ত্রগুলো পড়েছেন, মনে হয় এই শাস্ত্রই আমার জন্য পঠনীয়। ঠাকুর গীতা, ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ এগুলোর কথা বলছেন তাই আমরাও এই শাস্ত্রগুলোই পড়ি। তাই বলে এই নয় যে বাকি শাস্ত্রের দাম নেই, সব শাস্ত্রেরই দাম আছে, কিন্তু উনি যে শাস্ত্রগুলির কথা বলেছেন সেগুলোর একটা বিশেষ গুরুত্ব হয়ে যায়। আর তিনি যে কর্মগুলো করেছেন সেই কর্মগুলিরও একটা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়।

তীর্থ শব্দ যে ধাতু থেকে এসেছে, সন্তরণ শব্দও সেই একই ধাতু থেকে এসেছে। সন্তরণ মানে সাঁতার কাটা। সেইজন্য তীর্থের পরিভাষাও সেইভাবেই করা হয়, যে জিনিসটা আমাদের জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রকে সন্তরণ করে পার করিয়ে নিয়ে চলে যায়। তীর্থ শব্দের অর্থও তাই, যে আমাকে সাঁতরে ওপারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি করিয়ে দেয়, জীবন-মৃত্যুর সমুদ্রের পারে যেতে তীর্থ সাহায্য করে। স্বামীজী এর তুলনা করছেন, কোথাও আগুন জ্বালানো হল, আগুন নিভে গেলেও তাপ থেকে যায়, পরে গেলে বোঝা যায় এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। অবতাররা যেখানে লীলাবাস করেছিলেন, সাধু মহাত্মারা যেখানে তপস্যা করেছেন, বাস করেছেন সেখানে একটা আধ্যাত্মিক ভাব থাকে, ওখানে গেলে ভেতরে একটা আধ্যাত্মিক ভাব আসে।

আমরা শুনেছি বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভুর ভাব হল আর তিনি বলে দিলেন এই স্থানই সেই বৃন্দাবন। ঠাকুর গঙ্গা দিয়ে নবদ্বীপ যাওয়ার সময় এক জায়গায় তাঁর ভাব হল, পরে জানা গেল আসল নবদ্বীপ গঙ্গার প্লাবনে ডুবে গিয়েছিল, এখন যে নবদ্বীপ দেখছি এই শহর অনেক পরে হয়েছে। এখন কোন মুসলমান ফকির যদি বৃন্দাবন যান বা কোন হিন্দু ভক্তকে যদি মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কি দুজনের নিজস্ব ভাব হবে? সাধারণ ভাবে হবে না, যদি তাই হত তাহলে হিন্দুরা যেমন কাশী, বৃন্দাবন, পুরী যায় তেমনি মক্কাতেও যেত। তীর্থের কোথাও একটা বিষয়ী ভাব আছে। অনেকের আবার শ্রীজগন্নাথধাম পুরী গেলে খুব ভালো লাগে, তাদের

আবার কাশীতে অতটা ভালো লাগে না, আবার অনেকে বলে কাশী গেলে তাদের যতটা ভাব খোলে বৃন্দাবন গেলে ততটা হয় না, এই ধরণের কিছু আছে। তীর্থস্থানের যে একটা স্থান মাহাত্ম্য আছে এতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অনুভব করলেন বা ঠাকুর নবদ্বীপে অনুভব করলেন। এই ধরণের ভাব সত্যিকারের হয়। একজন মহারাজ একটা নতুন সেন্টার স্থাপনের জন্য যাচ্ছিলেন, যে জায়গাটা ঠিক করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে বলছেন, এই জায়গাটাতে কেমন অস্বস্থি বোধ হচ্ছে, পরে জানা গেল যে এখানে এক সময় খুব খুনোখুনি হত। জায়গাটা বাতিল করে দেওয়া হল। স্থানের একটা অনুভূতি আসে, এখানে কেউ সাধনা করেছিলেন এই অনুভূতিটা টের পাওয়া যায়। তাই বলে মক্কাতে গেলে কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাব আসবে বলা মুশকিল, কিন্তু গুরু নানক গিয়েছিলেন, কোথাও একটা subjective element থাকে, ভেতরে যদি ঐ ভাব থাকে তাহলে বোধ হয় ধরতে পারেন। যার মধ্যে ইসলামের ভাব নেই মক্কায় গেলে তার ভাব না হওয়ারই কথা, গুরু নানক ইসলামের ভাবেই গিয়েছিলেন। ঠাকুর বলছেন, আমি দেখতে চাই ওরা কিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, ওখানে ঠাকুরের মন খুলে রয়েছে। যদি মন ঐ ভাবের দিকে খোলা থাকে, যে ভাবের উপর ওখানে সাধনা হয়েছে, তবেই তীর্থের ফল দেয়। সেইজন্য এক ধর্মের লোক অন্য ধর্ম স্থানে গিয়ে তীর্থ করলে কোন ফল পাবে না, ফল পাবে যদি সে সেই ভাবের থাকে। কিন্তু তার আবার অন্য বিপদের দিক হল, তীর্থে গিয়ে তীর্থের ভাব যদি খোলা না থাকে তাহলে তীর্থের কোন ফলই হবে না। ঠাকুর বলছেন, তীর্থে গিয়ে তার ছেলে সামলাতে সামলাতেই সময় চলে গেল বা তীর্থে গিয়ে কাঙালী খাওয়াতেই সময় চলে গেল।

মনে করুন একজনের ভেতরে কোন ভাব নেই। তার খুব ইচ্ছে হল আমিও যেন শিবের একটু ভাব পাই। এখন সে যদি কোন শিবক্ষেত্রে গিয়ে বাস করতে থাকে, এবার ঐ তীর্থে পড়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে শিবের ভাব খুলে যাবে। কারণ সে বলছে আমি চাইছি। ফকির যেমন স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বলছিলেন, লেবুকে নুনের পাত্রে রেখে দিলে ধীরে ধীরে লেবুটাও নুন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবের স্থানে থাকলে ধীরে ধীরে ঐ ভাবটা ভেতর থেকে খুলতে শুরু করে। আমাদের সব ভাবই আছে, কাশীও যাচ্ছি, পুরীও যাচ্ছি আবার বৃন্দাবন, হরিদ্বারেও যাচ্ছি, আসলে আমরা বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট, তীর্থ করার ভাব নিয়ে কেউই যাই না। একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে, পুষ্পদন্ত বারাণসীতে থাকতেন, কিন্তু কোন কারণে রাজা পুষ্পদন্তকে বারাণসী থেকে বার করে দিয়েছেন, তুমি আর এখানে ঢুকতে পারবে না। তিনি বারাণসী ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন, খুব বিখ্যাত সেই প্রার্থনা। বলছেন, কবে আবার সেই দিন আসবে আবার আমি বারাণসীর গঙ্গার তটে গিয়ে বসব, শুধু কৌপিন ধারণ করে গঙ্গার তীরে বসব, হে গৌরীনাথ ত্রিপুরহরে! আমার প্রতি যে ক্রোধ এই ক্রোধটা যেন শান্ত হয়, যাতে আমি আবার গঙ্গার তীরে গিয়ে বসে মাথায় হাত লাগিয়ে শিব শিব নাম জপ করতে পারি। এখন আমরা যদি কল্পনা করি পুষ্পদন্ত বৃন্দাবনে গিয়ে শিবের আরাধনা করছেন, তাতে অসুবিধার কি আছে! এটা হবে না, এক একজনের যে ভাব, ঐ ভাব নিয়েই তাকে থাকতে হয়। এখানে তিনি যে ভাবের সেই ভাবকে নিয়ে বলছেন না, যিনি ঐ ভাবের তিনি ঐ তীর্থকে আরও তীর্থী করেন, ওখানে তাঁর নিজের লাভ নেওয়ার কিছু নেই। যেমন মনে করা যাক ঠাকুর এসে বেলুড় মঠে থাকছেন, এবার ঠাকুরের যাঁরা পার্ষদ তাঁরাও এখানে আসছেন, এনারা এসে যখন বেলুড় মঠে থাকছেন তখন এখানকার ভাবকে আরও জোরালো করে দিচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের স্থান কোন সন্দেহই নেই, সব দিক থেকেই, ভাবের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, ঠাকুর ওখানে সাধনা করেছেন, তিনি নিজে মায়ের পূজা করেছেন, সব দিক দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের বিরাটা মাহাত্ম্য কিন্তু বেলুড় মঠ সবার বাবা। বেলুড় মঠে একশ বছর ধরে শত শত সন্ন্যাসী সকাল বিকেল জপধ্যান করে যাচ্ছেন, বেলুড় মঠ তো আধ্যাত্মিক ভাবের পাওয়ার হাউস। বেলুড় মঠের চারদিকে যদি কেউ ঘুরে বেড়ায়, তাতেই তাকে এখানকার আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রভাবিত করে দেবে। একজন মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজজীকে জিজ্ঞেস করছিলেন, শুনেছি কাশীতে সকালে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, বৃন্দাবনে মাঝ রাতে প্রবাহিত হয়, বেলুড় মঠে কখন প্রবাহিত হয়? মহারাজ হেসেই বলছেন, চব্বিশ ঘন্টা। বেলুড় মঠে অনেক সন্ন্যাসীই আছেন আবার তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা খুবই উচ্চমানের সন্ন্যাসী। তাঁদের সাধনা হয়ে গেছে, বেলুড় মঠ থেকে তিনি যে রসদ নিয়ে এতদিন সাধনা করে গেলেন এবার উনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন। ফলে এখানকার ভাব তরঙ্গ প্রচণ্ড শক্তিশালী। সূত্রে তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলছেন না, বলছেন এই ধরণের যাঁরা মুখ্যা ভক্ত তাঁরা তীর্থকে আরও শক্তি প্রদান করেন।

কুয়ো থেকে যেমন সারা বছর জল নেওয়া হয় তেমনি বর্ষার সময় কুয়োকে water charging করা হয়। তীর্থেও দশ রকমের লোক যাচ্ছে তাতে সেখানকার ভাব নীচের দিকে পড়ে যায়, এরপর কোন অবতার বা উচ্চমানের ভক্তরা যদি যান, তখন ওখানকার ভাবটা আবার charged হয়ে যায়। কঠোপনিষদে একটা মন্ত্রে বলছেন *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, তীর্থগুলো হল ভগবানের সাকার রূপ, ঠাকুরের যেমন অখণ্ড রূপ আছে তেমনি তাঁরই সাকার রূপ হল বেলুড় মঠ, ঠাকুরও যা বেলুড় মঠও তাই। এই ধরণের তীর্থকে এই যে মহাত্মা, সন্ত মহাপুরুষদের কথা বলা হল, তাঁরা এসে আবার তীর্থী করেন, তীর্থের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দেন। তবে কাশীর মত কিছু তীর্থ আছে, এসব তীর্থ এতই উচ্চমানের যে দশটা বাজে লোক থাকলে যে এর মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয়ে যাবে তা হবে না। এখানে বলছেন, গৌণী ভক্তির অনুশীলন করে সিদ্ধি লাভ করে মুখ্যা ভক্ত হয়ে গেছে, সমাজের প্রতি তাঁদের যে অবদান তা হল, *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি*। তারপর বলছেন –

তন্ময়াঃ।।৭০।।

এই যে তীর্থ, শাস্ত্র, শুভকর্ম এই ধরণের মহাত্মাদের ভাবে পুরো তন্ময় হয়ে আছে। যেমন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের ভাবে পরিপূর্ণ, বেলুড় মঠ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তেমনি কথামৃত ঠাকুর, মায়ের ভাবে পরিপূর্ণ। এর আগে একটা সূত্রে বলছিলেন যে ভগবান আর তাঁর ভক্ত এক। যে মহাত্মাদের কথা বলা হচ্ছে, যাঁদের ভাব এসবের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাঁর আর ভগবানের ভাবের কোন তফাৎ থাকে না। যে জিনিসগুলো ঈশ্বরীয় সাধনায় মানুষের নিত্য প্রয়োজন, শাস্ত্র দরকার হয়, শুভকর্ম দরকার হয়, এই জিনিসগুলো তাঁরই ভাবে টগবগ করছে। সেইজন্য এই জিনিসগুলোর একটা বিশেষ দাম হয়ে যায়। বর্ষা ঋতুর আগমনে যেমন বৃষ্টি নামে, গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রশমিত হয়ে গেল, তার থেকেও বড় হল যখন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে চারিদিক প্লাবিত হয়ে সব কিছু জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, গোটা ভারতবর্ষের সব জলাশয় কূপ, নদী নালা জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এক বছর আর কোন চিন্তা নেই। পুকুরে জল থাকবে, সব কুয়োতেই জল পাওয়া যাবে। এই আনন্দে কি হয় –

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ
সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।।৭১।।

দেশে ভালো বৃষ্টি হলে যেমন সবাই খুব খুশি হয়, কারণ বৃষ্টি হল ভারতবর্ষের মানুষের প্রাণ, ভালো বৃষ্টি হলে মাটি খুশি হয়ে যায়, আকাশ, বাতাসে খুশির আমেজ ভেসে ওঠে, পশুপাখিরা আনন্দ করতে থাকে, সাধারণ মানুষরা খুশি হয়, দেশের রাজা খুশি হয়, কারণ এবার সমৃদ্ধি আসবে। ঠিক তেমনি এই ধরণের মহাত্মা কেউ যদি হয়ে যান, অবতার পুরুষের আগমন যদি হয় *মোদন্তে পিতরো*, পিতৃগণরা আনন্দে ভরে যান, *নৃত্যন্তি দেবতাঃ*, দেবতারা আনন্দে নৃত্য করেন। পৃথিবীতে যাদেরই জন্ম হয় তাদের সবাইকেই নানান রকমের কর্ম করতে হয়। পৃথিবীতে যারা বিশেষ ভাবে যজ্ঞ করছে আর নিজের জীবনের যা কিছু আছে সবটাই যজ্ঞ রূপে নেয়, যেমন তার জন্মটাও একটা যজ্ঞ, জীবনটাও যজ্ঞ, মৃত্যুটাও যজ্ঞ। হিন্দুদের কাছে মৃত্যুটাও যজ্ঞ, কারণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেটা হয় সেটাও যজ্ঞ, দেহকে এবার আগুনে আহুতি দিয়ে দেওয়া হল। যাঁরা খুব উচ্চমানের যজ্ঞ করেন তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গে দেবতা হয়ে জন্ম নেন, কিন্তু যাঁরা অতটা উচ্চমানের যজ্ঞ করতে পারছেন না, এনারা মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যান। স্বর্গলোক থেকে একটু অন্য ধরণের লোক হল পিতৃলোক। পিতৃলোকেও সবটাই ওনাদের দেবতাদের মত, কিন্তু কিছু তফাৎ থাকে। শরীর চলে গেলে পিতৃরা ভালোবেসে তাকে ডাকেন, তুমি আমার কাছে চলে এসো। কিন্তু যদি স্বার্থ ত্যাগ হয়ে থাকে তাহলে তার শরীর বেলুনের মত হাল্কা হয়ে যায় আর সে আরও উপরে উঠে দেবলোকে চলে যাবে, পিতৃলোকের পিতৃরা তাকে দেখে তখন আনন্দ করেন। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, যদি মুক্তির দিকে চলে যায় পিতৃরা পছন্দ করেন না। সন্ন্যাসী হয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা যেমন গালাগাল দেয়, এখানেও একই জিনিস হয়। কেউ যদি সন্ন্যাসের পথে চলে যায় তখন পিতৃলোকের সবাই মিলে তাকে গালাগাল দিতে থাকবে। কিন্তু শেষে যদি দেখেন সত্যিই কেউ মুক্তির পথে বেরিয়ে গেছে তখন এনারাই আবার আনন্দ করতে থাকেন। বলা হয় যে সন্ন্যাস নিতে গেলে দেবতারা অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, কিন্তু মুক্তি যদি হয়ে যায়, জ্ঞান প্রাপ্তি যদি হয়ে যায় তখন *নৃত্যন্তি দেবতাঃ*, দেবতারা নৃত্য করতে থাকেন, পিতৃরা এই ভেবে আনন্দ করেন যে আমাদেরই একজন মুক্ত হয়ে গেল।

সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি, পৃথিবী সনাথ হয়ে যায়, তা নাহলে সবই আবর্জনার স্তুপ, আবর্জনা ছাড়া কিছু না। পৌষ মাসে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে কত দূর দূর থেকে, সেই সুদূর রাজস্থান থেকে হাজারে হাজারে লোক জড়ো হয়। কেন? সবাই গঙ্গাসাগর যাচ্ছে। ওদের দেখে মনে হয় কী ভক্তি এদের, আমরা এভাবে কোন দিন তীর্থ করতে পারব না। কিন্তু একটু ভালো করে বিচার করে দেখলে এদের মধ্যে কি পাওয়া যাবে? অজান্তায় আহার, নিদ্রা, মৈথুন, শরীরের যে চাহিদা গুলো বাড়িতে মেটায়, বাইরে বেরিয়ে এসে সেটাও এরা সেভাবেই করে। আপনি বলবেন ওরাই তো ভারতের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। কিন্তু ওরা ধরে রাখেনি, ধরে রেখেছে সন্ন্যাসীরা। কারণ কালচার বলে যে জিনিসটা আছে সেটাকে কালচার করতে হয়। যার জন্য দেখবেন কোন শিক্ষিত লোক কক্ষণ মুর্খ হতে চায় না, ধনী কখনই গরীব হতে চায় না, সংস্কৃতবান লোক কখনই অসংস্কৃবান হতে চায় না, যে একটা বিদ্যাকে গ্রহণ করে নিয়েছে সে সেই বিদ্যাকে কক্ষণ ছাড়তে চাইবে না, তার মানেই তো এই জিনিসগুলো শ্রেষ্ঠ। যে কাটা চামচে খায় সে কোন দিন হাত দিয়ে খেতে চাইবে না। একটা কালচার আছে, যে ঐ কালচারে চলে গেছে সে আর ওখান থেকে ফিরে আসতে চাইবে না। যে বড় বাড়িতে থেকেছে যে কক্ষণ ছোট বাড়িতে থাকতে চাইবে না। যে ফাস্ট ক্লাশ এসিতে চেপেছে সে কখনই আর জেনারেল থ্রিটায়ারে চাপবে না। তার মানে কোথাও একটা গোলমাল আছে। কোথায় গোলমাল? কোন সন্ন্যাসী যদি ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যায়, ওরা সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। সন্ন্যাসী বলে লোটাবে না, কারণ সে জানে যে সন্ন্যাসীর সব দিক দিয়ে কালচার আছে করে, সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে কালচারড, শিক্ষার দিক দিয়ে কালচারড, সংযমের দিক দিয়ে কালচারড। সবার মাথা একজন সন্ন্যাসীর প্রতি নত হবে। আমার আপনার মাথা কখনই এদের প্রতি নত হবে না। এরা ধরে রেখেছে ঠিকই, কারণ বাকি কিছু তার নেই বলে। তবে ওদের যদি কেউ সেবা করতে চায় তাহলে তাকে ওদের মত হয়ে থাকতে হবে, যেমন গান্ধীজী করেছিলেন, সেটা অন্য বিষয়। একজন কুলি মাথায় কত বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, সত্যিই কত শক্তি। কিন্তু আমার আপনার যদি ঐ শক্তি হয় আমরা কি কখন ঐভাবে মুটে বইতে চাইব? কখনই চাইব না। যে কুলি সেও কি করতে চাইবে? কখনই চাইবে না। কারণ সে ঐ পরিস্থিতিতে বাঁধা। পৃথিবী এখন এই লোক গুলোকেই বয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে একজন যদি কোন মহাত্মা এসে যান, যিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তখন পৃথিবী ভাবে আহা আমি সনাথ হলাম। এখনও কোন গ্রাম দেশে যদি কোন জ্ঞানী পুরুষ উপস্থিত হয়ে যান, গ্রামের লোকেরা তাঁকে অনেক দিন মনে রাখবে। আমরাও তো এমন অনেককে জানি যাদের গায়ে কাপড় নেই, যার খাবার ভালো ভাবে জোটে না, তাকে দেখে কি আমরা কাউকে বলি যে আমি তাকে জানি? আমরা তাঁর নামেই বলি, আমি ওনাকে জানি যিনি খুব বিখ্যাত লোক। বিখ্যাত কোন দিকে? যিনি সাধ্য সাধনা করে, পরিশ্রম করে সংস্কৃতির দিক দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে গেছেন। যার বিদ্যা আছে, অর্থ আছে, ঐশ্বর্য আছে, সব কিছু আছে অথচ এনারা সবাই একটা সময় আসে যখন সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। আদর্শ হল সন্ন্যাসের, যেখানে সে সেই উচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, সেটাকে নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। আর যখন ঐ অবস্থায় চলে যান তখন কি হয়?

নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি ভেদঃ।।৭২।।

এই ধরণের যাঁরা ভক্ত, যাঁরা মুখ্যা ভক্তিতে চলে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আর কোন ধরণের ভেদ ভাব থাকে না, ভালো, মন্দ, উঁচু, নিচু এই বোধ থাকে না, ভক্ত ভক্তই। শ্রীশ্রীমা বলছেন, এই পোড়া দেশটা শুধু জাত জাত করেই গেল। আমার খুব ইচ্ছে তোমাদের সবাইকে এক পাতে যদি মুরি খাওয়াতাম। বলে যে, মুরি যদি খায় তাহলে নাকি জাত যাবে না। ঠাকুরের মহাসমাধির পর দক্ষিণেশ্বরে একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, তার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হল। তাতে ঠিক হল, ঐদিন ভক্ত সমাবেশ হবে, বিশেষ ভক্তদের জন্য বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে আর সাধারণ ভক্তদের জন্য অন্য ধরণের খাবার থাকবে। এই ধরণের পৃথক ব্যবস্থা সব জায়গাতেই থাকে। সেই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ এই নিয়ে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন, ঠাকুরের ভক্ত সবাই সমান, সবার জন্য এক ব্যবস্থা একই প্রসাদ থাকবে।

এই সূত্রে বলছেন, জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়া ভক্তের মধ্যে এই জিনিসগুলোর কোন ভেদ থাকে না। এটাকেই যদি আমরা বিশেষ রূপে নিয়ে যাই, যদিও আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু একটা খুবই আকর্ষনীয় সিদ্ধান্তকে চলে যেতে হবে। সিদ্ধান্তটি হল, আমাদের কবীর দাস আছেন, কবীর দাসের

জন্ম এক তাঁতীর পরিবারে, আর অন্য দিকে আছেন তুলসীদাস, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, এছাড়া আছেন সুরদাস, গুরু নানক, এনাদের সবারই বিভিন্ন রকমের শ্রেণীবিন্যাস, কিন্তু সবাইকেই আমরা সমান ভাবে সম্মান করি। যেমন স্বামীজী বলছেন, লাটু সে একজন নিরক্ষর আর আমরা পড়াশোনা করা কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় লাটুর যে উপলব্ধি হয়েছে ঐ একই উপলব্ধি আমাদেরও হয়েছে। সেইজন্য বলছেন ঠাকুরের অদ্ভুত কীর্তি অদ্ভুতানন্দ। কিন্তু এই যে কবীর দাস, সুরদাস বলা হল আর এখানে সূত্রে যা বলছেন, দুটোকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সিদ্ধ পুরুষ যে কোন জাতি বা সম্প্রদায় থেকে আসতে পারেন, যেখানে জাতি, বিদ্যা, রূপ, ধন, ক্রিয়া এগুলোর কোন বিভেদ থাকে না। এটাকে খুব বেশি সাধারণের মানুষদের কাছে প্রকাশ করা হয় না, যদি প্রকাশ করা হয় তখন হিন্দু ধর্মের একটা খুব প্রচলিত ধারণার উপর একটা মারাত্মক প্রভাব হতে পারে। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাবনা, সামাজিক ধর্মের উপর একটা বিরাট ধাক্কা মারে বর্ণ ব্যবস্থা, যেটাকে আমরা জাতি বলছি। একটা খুব প্রচলিত ধারণা হিন্দুদের মধ্যে চলে আসছে, মানুষের যে বিকাশ শুরু হয় সেটা হয় এইভাবে, পূণ্য কর্ম করে করে উপরের দিকে যায় আর সেখান থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নেয় আর সেখান থেকে মুক্তি। পাপ কর্ম বেশি করলে পরের জন্মে শূদ্র, চণ্ডাল পরিবারে জন্ম নিয়ে সেখান থেকে আবার শুরু করতে হয়। যদি এই ধারণা ঠিক হয়, তাহলে এই সূত্রে যে বলছেন তাঁর ভেতরে এই ভেদ থাকে না। তার মানে ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ যদি না থাকে, তাহলে একজন ব্রাহ্মণ আর কবির দাস এক জোলার পরিবারে জন্ম নিয়েও ব্রাহ্মণত্বের পর্যায়ে যেতে পারলেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই যদি হয় তাহলে হিন্দুদের যে সামাজিক ব্যবস্থা, যাতে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ব্যাপারের কথা বলছে, তাহলে নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থায় কিছু ভুল আছে। অবশ্যই ভুল আছে, কোন সন্দেহই নেই। জাতিপ্রথা আমাদের দেশে এত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আসলে কেউ জানেই না যে জিনিসটা ঠিক কি বেঠিক। হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার মূল বক্তব্য হল, যারা শুভকর্ম করে তার উচ্চবর্ণে জন্ম নেয়। গীতাতে এভাবে বলছেন না, গীতায় বলছেন, যাঁরা যোগের পথে চলতে চলতে চরম উপলব্ধি না করেই দেহত্যাগ করেন, তিনি যোগীর বাড়িতে জন্ম নেন। খুব ভালো কথা, কিন্তু ওটাকে যখন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বসিয়ে দেওয়া হয় তখন সমস্যা হয়ে যায়, বিচিত্র রকমের সব ধারণা হয়ে যায়।

তানসেন মেঘমল্লার বাজাতেন, মেঘ যখন আসবে তখন উনি মেঘমল্লার বাজাতেন। আর পণ্ডিত ওস্তাদজীদের মুখে আমরা শুনেছি, তানসেন মেঘমল্লার বাজালে মেঘ এসে যেত। তিনি আবার বলেন, আমিও যখন মেঘমল্লার বাজাই তখন কিভাবে কিভাবে মেঘ এসে যায়। দীপক রাগ, যখন দীপ জ্বালানো হয় ঐ সময়টার জন্য যে রাগ বাজান হয় তার নাম দীপক রাগ। এখন যদি বলে তানসেন দীপক রাগ বাজাতেন আর দীপক গুলো জ্বলে যেত। বলা হয়, মোরগ যখন সকালে ডাক দেয় তখন সূর্যোদয় হয়। মোরগের ডাকের সাথে সূর্যোদয়ের কি সম্পর্ক আছে! সূর্য উঠছে বলে মোরগ ডাক ছাড়ে। কিছু কিছু জিনিস আছে একটার সাথে আরেকটার যোগ হয়ে আছে কিন্তু আমরা করি কি নীচেরটাকে উপরটার সাথে মিলিয়ে দিই। সাধক পুরুষ সিদ্ধি যদি না পান তাহলে তিনি ভালো জায়গায় গিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, খুব ভালো কথা। এটাকেই যদি বলে দেওয়া হয় যে, ভালো বাড়ি বলেই সৎ পুরুষ জন্ম নিয়েছেন, তা কখনই নয়। সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি প্রমাণিত হয়, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি কখনই প্রমাণিত হয় না। Inductive logic অর্থাৎ অনুমান যুক্তি লাগালে সেখানে এটাই সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে যায়। ঠাকুর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন বলে ব্রাহ্মণ বংশের সবাই ঠাকুর হয়ে যাবে, তা কি কখন হয়! এটাই সমস্যা। যোগী যখন জন্ম নেন তিনি যেখানে সেখানে জন্ম নেবেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, ঠাকুরের জন্ম দেখুন তাঁদের বাবা-মায়েরা কত মহাপুরুষ। এই ধরণের জীবাত্মা যাঁরা মুক্তির দিকে এগোচ্ছেন তাঁরা এই রকম একটা জায়গা খুঁজতে থাকেন। ঐ জায়গাতে আগে পরে যারাই জন্ম নিয়েছে তারাও যে তাঁর মত মুক্তির দিকে এগোবে তা কখনই হবে না। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সিমলার দত্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর ভাইবোনদের দিকে দেখুন। নরেন জন্ম নিয়েছিলেন বলে তাও এনাদের নামটা থেকে গেছে, তা নাহলে কোথাও খুঁজেই পাওয়া যেত না। যাঁর সিংহ গর্জনে জগৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে তাঁরই বোন আত্মহত্যা করছে। জিনিসটা কখনই তা নয়। সেইজন্য জাতিপ্রথার যে মূল আধার, আধ্যাত্মিক বিবর্তন, এটা একেবারেই ভুল ধারণা, যেটা এই সূত্রেই পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে। এই রকম কেন হয়?

যতস্তদীয়াঃ।।৭৩।।

যত ভক্ত আছেন সবাই তাঁর। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, ভোজবাড়িতে জমিদারের নেমন্তন্ন, জমিদার নিজে না গিয়ে তাঁর ছোট নাতিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখন জমিদার এলে যে সম্মান দেওয়া হত নাতিকেও একই সম্মান দেওয়া হবে। নাতিকে সম্মান দিয়ে ঐ জমিদারকেই সম্মান দেওয়া হয়। ভক্ত হল ভগবানের নাতি, তিনি যেই হয়ে থাকুন, বিদ্বান নাতিই যাক বা লেখাপড়া না জানা নাতিই যাক, একটা পার্থক্য হবে, যে বিদ্বান সে হয়ত একটু কথা বেশি বলবে, কিন্তু সম্মানে দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। ঠিক তেমনি যিনিই ঠাকুরের ভক্ত তাঁর সম্মান ঐ একই ভাবে হবে, তাঁর ব্যক্তিগত যে গুণাবলী রয়েছে সেখানে হয়ত একটু ঊনিশ-বিশ হবে কিন্তু গুণগত তফাৎ কিছু থাকবে না। সে যে জাতিতেই জন্ম নিক, সে যে কুলেই জন্ম নিক, তার বিদ্যা, রূপ যেমনই থাকুক সবাই ঈশ্বরের লোক। এটাই মূল বক্তব্য।

বাদো নাবলম্ব্যঃ।।৭৪।।

ভক্তের ব্যাপারে বলে দেওয়ার পর একটা সাবধাণ বাণী দিচ্ছেন, তোমরা বৃথা, অযথা তর্ক করতে যেও না। যাকেই দেখা যাবে তর্ক করছে, বুঝতে হবে লোকটা হাভাতে। ভক্তের নিজস্ব সময় ও শক্তির খুব দাম, তর্কাতর্কিতে এগুলোর অপচয় হয় আর মন চঞ্চল হয়ে যায়। আরও যেটা মুশকিল, আমাদের সবারই ভেতরে আমি জয়ী হব এই ভাবটা থাকে। তর্কের সময় এই ভাবটা খুব জোরাল হয়ে ওঠে। কিন্তু যিনি ভক্ত তাঁর এসবের দিকে কোন আগ্রহই থাকে না, কে তাকে মানল, কে তাকে মানল না ও নিয়ে মাথা ঘামাতেই যাবে না। কারণ যাঁরা ভক্ত তাঁর ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে নিজের জীবনকে এমন ভাবে তৈরী করে নিয়েছেন যে তাঁর আর তর্কাতর্কির করার কোন স্পৃহাই থাকে না, আর বলছেন –

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ।।৭৫।।

যে কোন যুক্তিতেই প্রচুর সুযোগ আছে তাতে বিরোধী ভাব আসবেই, আমি যেটা বলব সেটাতেও সুযোগ আছে, সে আরেক রকম বলবে তারটাতেও সুযোগ আছে। একজন খুব উচ্চমানের মহারাজ ছিলেন, ওনার কাছে সন্ন্যাসীরা অনেক প্রশ্নটশ্ন নিয়ে যেতেন। উনি কাউকে কিছু বলার পর সে যদি বলে, মহারাজ জিনিসটা তো এই রকম নয়। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, তাই হবে। যদি বই খুলে দেখিয়ে দেওয়া হয় দেখা যাবে, উনি যেটা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। কিন্তু তাও বলবেন না যে, বইতে এই রকমই আছে। উনি জানেন এর সাথে বৃথা তর্ক করে কি হবে, বয়স অল্প, একটু শাস্ত্র পড়ে মনে করছে সব জেনে ফেলেছি। সেইজন্য বলছেন, তাই হবে। তর্কাতর্কি হলেই অনেক রকম মত চলে আসবে, নিজের ভাবের বিপরীত মতে কি হয়, মনে অনেক ধরণের চাঞ্চল্য আসে। যাঁদের বুদ্ধি খুলে গেছে তাঁরা আর তর্ক বিতর্কে জান না। ভগবান যীশুও বাইবেলে তর্কাতর্কিতে যেতে নিষেধ করে দিচ্ছেন, শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ না না করে যাবে। তুলসীদাসেরও দোঁহা আছে, হাঁজি হাঁজি করতে রহিয়ে বৈঠে আপনে ঠান্, তোমার যে ভাব ঐ ভাব নিয়েই বসে থাক আর সবাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাও। এরপর ছিয়াত্তর থেকে যেগুলো বলছেন এগুলো অতিরিক্ত বলছেন। এই জিনিসগুলোকে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, সেইজন্য আমরা সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি।

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্ধক-কর্মাণ্যাপি করণীয়ানি।।৭৬।।

যাঁরা ভক্তিমার্গকে নিয়ে থাকতে চান তাঁরা অবশ্যই ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন আর যে কাজ করলে ভাব পাকা হবে সেই কাজই নিয়মিত করবে। ঠাকুরও বার বার বলছেন ভাব পাকা করতে। ভাব পাকা করা মানে, যে ভাব আমি গ্রহণ করেছি বা আমার যে ভাব এই ভাবকে পাকা করার জন্য আমাকে ঐ ভাব বিষয়ক গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে আর কাজও সেই রকম করতে হবে যে কাজে ভাব পোক্ত হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই যাঁরা বেদান্তমার্গি তাঁদেরও তাই বলা হয়, বেদান্ত শাস্ত্র সব সময় পড়বে আর নেতি নেতি অর্থাৎ সব সময় ত্যাগের অনুশীলন করবে। তবে এটা জেনে রাখা ভালো, নিজের আধ্যাত্মিক পথ নিজেকেই বার করে নিতে হয়। ইতিহাসে যত মহাত্মা আছেন তাঁদের কাউকে পাওয়া যাবে না যে দুজন মহাত্মা একই পথে চলেছেন। স্বামীজী তাই বলছেন, তোমাদের ঠাকুর মৌলিক ছিলেন, তোমরাও সবাই মৌলিক হও। মৌলিক না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধির পথ খুলবে না। কারণ, এই যে এতগুলো যোগ আর এত সব যোগের সংমিশ্রণ

ঠিক করে নেওয়া মুশকিল, তার মধ্যে বেছে নিতে হয় আমি এটা পারব। তারপর ঠিক করে নিতে হয়, আমি এটাই করব। যারা সৈন্যবাহিনীতে আছে তারা সৈন্যদের নিয়ে যেসব বই আছে সেই বইগুলো পড়ে, ব্যবসাতে যারা আছে তারা ব্যবসা সংক্রান্ত বই পড়ে। একটা খুব মূল্যবান কথা হল, আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা অত্যন্ত সহজ। তাহলে সবাই কঠিন বলছে কেন? আমাদের সবারই নিজস্ব একটা পথ আছে, আর ঐটাই তার পথ। যেমনি সে ঐ পথে চলতে শুরু করবে, তাকে আর কেউ আটকে রাখতে পারবে না। সমস্যা হল, একটা মাছ আর একটা পাখির খুব বন্ধুত্ব, পাখি এখন সাঁতার দিতে চাইছে আর মাছ চাইছে উড়তে, বন্ধুত্ব কিনা। দুজনেই ডুববে, ওখানেই দুজনের শেষ। মাছের স্বাভাবিকত্ব হল সাঁতার কাটা আর ওড়াটাই পাখির স্বাভাবিকত্ব। কিন্তু বন্ধুত্ব আমাদের চিরদিন থাকবে, তখন দুজনেরই উন্নতি হবে। যখনই আমি আমার পথ ঠিক করে নিলাম, তখন বলে দিলাম এগুলো হল সমুদ্রের মত, বন্ধুত্ব আমার সাংঘাতিক, আমি তাদের সাথে এক কিন্তু আমার পথ অন্য রকম, এবার আমি সাঁ করে চলতে শুরু করে দিলাম, আর আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। সমস্যা হল মানুষ তার নিজের স্বাভাবিক পথটা জানতে পারে না। কেন জানতে পারে না? কারণ গভীরে গিয়ে একটু চিন্তা করবে সেই ধ্যানটা নেই। আমার স্বাভাবিক পথ কোনটা, এটাকে নিয়ে আমাকে গভীর ভাবে তিন দিন, চার দিন ধ্যানে চিন্তা করতে হবে। বিচার করতে হয় আমার ভেতরে কি কি গুণ আছে, কোন জিনিসটা আমাকে বেশি শক্তি দেয়। আসলে আমরা সবাই অপরের শেখানো জিনিসগুলোকে নিয়ে চলছি বলে আমাদের কিছুই হচ্ছে না। অপরের মত সাধনা করে কেউ আজ পর্যন্ত সিদ্ধ হয়নি, যাঁরাই সিদ্ধ হয়েছেন সবাই নিজের মত সাধনা করেই সিদ্ধ হয়েছেন। তবে হ্যাঁ সাধারণ ভাবে একটা অনুশাসন, সাধারণ ভাবে একটা গাইড লাইন সবারই জন্য এক থাকে। সেটাই বলছেন, *ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি*, যখন বুঝে গেলাম আমার এই ভাব তখন ঐ ভাব বিষয়ক গ্রন্থই পড়তে হবে। কিন্তু প্রথম সমস্যা হল, আমার কি ভাব আমি জানি না, দ্বিতীয় সমস্যা যদি অল্প একটু জানি তখন আবার একবার ওটা করে দেখলে হয়, নয়তো এটা করে দেখলে হয়, এই করতে গিয়ে আমাদের কোন উন্নতি হয় না। আধ্যাত্মিক জীবন কঠিন হয় অপরের ভাবকে নিয়ে চললে, যদি নিজের ভাবকে নিয়ে নেওয়া হয় তখনও বিঘ্ন আসবে, বিঘ্ন যে আসবে না তা নয়। গান্ধীজী যেমন বললেন, যাই হয়ে যাক আমি সত্য আর অহিংসা ছাড়ব না। জিন্নাকে যখন কায়দা করে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে তখনও গান্ধীজী সত্যকে ছাড়ছেন না। কিন্তু এমন প্যাঁচ তৈরী করছেন জিন্না যাতে ফেঁসে যায়। জিন্নাকে বলছেন তোমাকে আমি প্রধানমন্ত্রী করে দিচ্ছি। কিন্তু তারপরে যেসব শর্ত লাগানো আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে জিন্নার কোন ক্ষমতাই থাকবে না, নামেই প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। সেখানেও গান্ধীজী একটাও মিথ্যে কথা বলছেন না। যেদিন থেকে গান্ধীজী ব্রত নিয়ে নিলেন সেদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একটা মিথ্যে কথা বলেননি, তা সত্ত্বেও একটা কাউকে নিজের সামনে থেকে এগোতে দিলেন না। তখন ঐটাই করতে হয় তাতে ভাব আরও পোক্ত হয়।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে
ক্ষণার্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্।।৭৭।।

এখন তাঁর সব ইমোশানস্ গুলো কেটে গেছে, তর্কাতর্কিতে থাকছেন না, নিজের লাভের জন্য কোন কিছুর ইচ্ছা নেই, তাতে কি হয়, তখন প্রচুর সময় বেরিয়ে আসে। বলছেন ঐ পুরো সময়ের ক্ষণার্ধ সময়ও নষ্ট না করে এই ভক্তিতেই লাগিয়ে দিতে হয়। এই সূত্রেরই ধারাবাহিক চলছে পরের সূত্রে –

অহিংস-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিত্র্যাণি
পরিপালনীয়ানি।।৭৮।।

এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা এর আগে অনেক আলোচনা করেছি। কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে, যেমন অহিংসা, সত্য, শৌচ এগুলোর নিয়মিত পালন করতে হয়। আর বলছেন –

সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ।।৭৯।।

একই কথা বলছেন, এখন তোমার সময়ের অভাব নেই, কোন যে ডান দিক বাম দিক যাবে তারও কিছু নেই, এই যে সময়টা পেয়ে গেলে এর পুরোটাই ঈশ্বরের ভজনাতে লাগিয়ে দাও। আমার কি ভাব, এটাকে বার করে বুঝে নেওয়ার পর ওর মধ্যেই যদি ঘুরঘুর করা হয় তখন প্রচুর সময় বেরিয়ে আসবে। কেউ

যদি বাড়ির গেস্টদের মায়ের মত খাতির করতে শুরু করে দেয়, কদিন পরেই লোকগুলো আসা বন্ধ করে দেবে। যেমন মাতাল দুধ খেতে চায় না, আজকালকার বাচ্চারা যারা খুব কোল্ডড্রিঙ্কস খায়, তাকে গিয়ে যদি বলা হয় খুব সুন্দর লস্যি বানিয়েছি, শরীরের জন্য ভালো, ওরা খাবে না, কারণ কোল্ডড্রিঙ্কসে যে একটা ঝাঁজ আসে লস্যিতে ওটা পাওয়া যাবে না। লোকজন যারা বাড়িতে আসছে এরা হল সব মাতাল, কথাবার্তা তাদের এমন হওয়া চাই যাতে ঐ ঝাঁজটা থাকবে, আর তাকে প্রথমে ভালোবেসে দেওয়া হল লস্যি, তারপর দিল দুধ, দুধ খান, আপনার শরীরের জন্য ভালো। দুদিন পর আসা বন্ধ করে দেবে। ওরা চাইছে আমার সাথে সিনেমার গল্প করবে, মোদি-মমতাকে নিয়ে গল্প করবে, লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। আমি কিন্তু তাদের খুব আদর যত্ন করে যাচ্ছি, একেবারে মায়ের মত তার সাথে ঠাকুরের দুটি কথা বলছেন। বাড়িতে আসা ছেড়ে দেবে, আর আসবে না। এটাই হল মূল বক্তব্য, নিজের ভাবকে নিয়ে চলতে হয়। সব ভজনা করলে কি হয়? তখন বলছেন –

স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি
অনুভাবয়তি চ ভক্তান্।।৮০।।

এই সব কিছু ত্যাগ করার পর, সময়ের সদ্ব্যবহার করে সারাক্ষণ যখন খুব ঈশ্বরের নাম করা হয় তখন তিনি অবশ্যই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করেন। এই কথা বলে বলছেন, দেখো বাপু –

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী।।৮১।।

আমি ত্রিসত্য করে বলছি, একবার না, তিন সত্য করে বলছি, ভক্তির মত পথ নেই, *ভক্তিরেব গরীয়সী*, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি কিভাবে করা হবে পরের সূত্রে গিয়ে এগার রকমের ভক্তির কথা বলছেন, এই সূত্রটি খুব মূল্যবান সূত্র, মুখস্ত করে রাখলে তো খুবই ভালো, যদি মুখস্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে কোথাও একটা জায়গায় লিখে রাখলে বাকি জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। ভাগবতে নবধা ভক্তির কথা বলা হয় আর এখানে একাদশধা, এগারো প্রকারের ভক্তির কথা বলছেন –

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-
দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্তি-
আত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়াসক্তি-পরমবিরহাসক্তিরূপা
একধা অপি একাদশধা ভবতি।।৮২।।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, গুণমাহাত্ম্য মানে ঈশ্বরের গুণগান করা; *রূপাসক্তি*, ভগবানের রূপের প্রতি আসক্তি; *পূজাসক্তি*, ভগবানের পূজা করার প্রতি আসক্তি, মানে পূজো করতে ভালোবাসা; *স্মরণাসক্তি*, ভগবানের নাম স্মরণ করার প্রতি আসক্তি, যত ভালোই জপ হোক না কেন, ঠাকুর বলছেন আলুনি লাগে, আমাদেরও মাঝে মাঝে জপ করতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু ছেড়ে দিলে তো মরে যাব তখন ঈশ্বরের লীলা, গুণ, তত্ত্ব এগুলোকে স্মরণ মনন করতে হয়। তিন মাস লম্বা টানা জপ যদি করা হয়, তাহলে নিজে থেকেই একটা আকারের বিন্যাস হয়ে যায়, মস্তিষ্ক এমন তৈরী হয়ে যায় যে জপ না করলেও ভেতরে একটা স্মরণ মনন চলত থাকে। *দাস্যাসক্তি*, দাস্য ভাবে সেবা করা; *সখ্যাসক্তি*, বন্ধুর মত সেবা করা; *কান্তাসক্তি*, মধুর ভাব, ঈশ্বরকে প্রেমিক রূপে দেখছে; *বাৎসল্যাসক্তি*, ভগবানকে নিজের সন্তান রূপে সেবা করা; *আত্মনিবেদনাসক্তি*, আমার জীবন পুরোটাই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করা দিলাম; *তন্ময়াসক্তি*, সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে একেবারে তন্ময় হয়ে আছে, ঈশ্বর ছাড়া সে আর কিছু জানে না আর শেষে *পরমবিরহাসক্তিরূপা*, ভেতরে সব সময় তাঁকে না পাওয়ার জ্বালা, ঠাকুর যে গলা কাটতে গেছেন, ওটাই *পরমবিরহাসক্তিরূপা*। এখানে যে কটি ভাবের কথা বলা হল এর প্রত্যেকটি ভাব ঠাকুরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই হল এগারো রকমের ভক্তি, যে ভক্তিকে পালন করা যায়। এর প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা এর আগে অনেকবার করা হয়েছে, সেইজন্য আর নতুন করে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। এরপর বলছেন –

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একনতাঃ কুমার-ব্যাস-
শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-
হনুমদ্‌বিভীষনাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ।।৮৩।।

নারদ বলছেন, এই যে কথাগুলো বলা হল এগুলো কোন নতুন কোন কথা নয় কারণ কুমার, এখানে কুমার মানে সনকাদি চারজন কুমার, ব্যাসদেব, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষোদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান ও বিভীষণ এনারা সবাই *ভক্ত্যাচার্যাঃ*, ভক্তি পথের আচার্য, এঁরা সকলেই একই মত পোষণ করছেন, এনারা যা বলেছেন সেই কথাগুলোকেই আমি সংক্ষেপে এখানে বললাম। এই কারণেই একাশি নম্বর সূত্রে বলা হয়েছিল, *ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী*, তিন সত্য করে বলছি ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। সব শেষে নারদ গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন –

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধতে
স ভক্তিমান্ ভবতি সঃ প্রেষ্ঠং লভতে
সঃ প্রেষ্ঠং লভত ইতি।।৮৪।।

এই নারদীয় ভক্তির দর্শন ও তার শিক্ষায় যাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সাথে এর মঙ্গলদায়ক উপদেশ সমূহকে যিনি পালন করেন, তিনিই ভগবানের ভক্ত বলে পরিচিত হন এবং তিনি মানব জীবনের লক্ষ্য সেই শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। এই কথা বলে আমরাও নারদীয় ভক্তিসূত্রের আলোচনা শেষ করছি। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা আমাদের সবারই যেন তাঁদের প্রতি ভক্তি লাভ হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	যোগ কি	৩
৩	জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগকেই কেন যোগ বলা হবে	৪
৪	জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা	৫
৫	ভারতে ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাস	৬
৬	দেবর্ষি নারদের কথা	৮
৭	সূত্র কি, সূত্রের প্রচলন কিভাবে এসেছে	১৩
৮	ভক্তির অধিকারী	১৯
৯	রামানুজের মতে ভক্তির শর্ত	২১
১০	নবধা ভক্তি	২৯

সূত্রের সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	সূত্র	পৃষ্ঠা
১	অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।।১।।	১৭
২	সা ত্বস্মিন্ পরম (পরঃ) প্রেমরূপা।।২।।	৩২
৩	অমৃতস্বরূপা চ।।৩।।	৫২
৪	যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি...।।৪।।	৫৮
৫	যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি...।।৫।।	৬৩
৬	যৎ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি...।।৬।।	৭১
৭	সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ।।৭।।	৮০
৮	নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ।।৮।।	৮৩
৯	তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ।।৯।।	৮৫
১০	অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোহনন্যতা।।১০।।	৮৯
১১	লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা।।১১।।	৯০
১২	ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্।।১২।।	৯৩
১৩	অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া।।১৩।।	৯৭
১৪	লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদি...।।১৪।।	৯৮
১৫	তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ।।১৫।।	১০০
১৬	পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ।।১৬।।	১০৭
১৭	কথাদিষু ইতি গর্গঃ।।১৭।।	১১০
১৮	আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাণ্ডিল্যঃ।।১৮।।	১১২
১৯	নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে...।।১৯।।	১১৩
২০	অস্ত্যেবমেবম্।।২০।।	১১৭
২১	যথা ব্রজগোপিকানাম্।।২১।।	১১৮
২২	ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ।।২২।।	১২১
২৩	তদ্বিহীনং জারাণামিব।।২৩।।	১২১
২৪	নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্।।২৪।।	১২১
২৫	সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।।২৫।।	১২৪
২৬	ফলরূপত্বাৎ।।২৬।।	১২৭
২৭	ঈশ্বরস্যাপি অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ।।২৭।।	১২৯

২৮	তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে।।২৮।।	১৩২
২৯	অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে।।২৯।।	১৩৫
৩০	স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ।।৩০।।	১৩৮
৩১	রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ।।৩১।।	১৪৩
৩২	ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা।।৩২।।	১৪৫
৩৩	তস্মাৎ সা এব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ।।৩৩।।	১৪৬
৩৪	তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ।।৩৪।।	১৪৬
৩৫	তৎ তু বিষয়াত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ।।৩৫।।	১৫১
৩৬	অব্যাবৃত-ভজনাৎ।।৩৬।।	১৫৪
৩৭	লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ।।৩৭।।	১৫৬
৩৮	মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব (ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা)।।৩৮।।	১৫৭
৩৯	মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।।৩৯।।	১৫৯
৪০	লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব।।৪০।।	১৬৩
৪১	তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।।৪১।।	১৬৪
৪২	তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্।।৪২।।	১৬৮
৪৩	দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ।।৪৩।।	১৭৩
৪৪	কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ...।।৪৪।।	১৭৫
৪৫	তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তে।।৪৫।।	১৭৬
৪৬	কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্?...।।৪৬।।	১৭৯
৪৭	যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি...।।৪৭।।	১৮৩
৪৮	যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি, ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি।।৪৮।।	১৮৭
৪৯	যো বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।।৪৯।।	১৯১
৫০	স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি।।৫০।।	১৯৪
৫১	অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।।৫১।।	১৯৫
৫২	মূকাস্বাদনবৎ।।৫২।।	১৯৮
৫৩	প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে।।৫৩।।	১৯৯
৫৪	গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিপক্ষণবর্ধমানম্...।।৫৫।।	২০১
৫৫	তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি...।।৫৫।।	২০২
৫৬	গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদি ভেদাদ্ বা।।৫৬।।	২০৩
৫৭	উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি।।৫৭।।	২০৯
৫৮	অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।।৫৮।।	২১০
৫৯	প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ চ।।৫৯।।	২৩৭
৬০	শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।।৬০।।	২৪১
৬১	লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ।।৬১।।	২৪৭
৬২	ন তৎ সিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু...।।৬২।।	২৫০
৬৩	স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-(বৈরী-)চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্।।৬৩।।	২৫১
৬৪	অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্।।৬৪।।	২৫৩
৬৫	তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং...।।৬৫।।	২৫৪
৬৬	ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাভজনাত্মকং ...।।৬৬।।	২৫৫
৬৭	ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ।।৬৭।।	২৫৬
৬৮	কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং...।।৬৮।।	২৫৮
৬৯	তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি...।।৬৯।।	২৫৯
৭০	তন্ময়াঃ।।৭০।।	২৬২

৭১	মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ...।।৭১।।	২৬২
৭২	নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি ভেদঃ।।৭২।।	২৬৩
৭৩	যতস্তদীয়াঃ।।৭৩।।	২৬৫
৭৪	বাদো নাবলম্ব্যঃ।।৭৪।।	২৬৫
৭৫	বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ।।৭৫।।	২৬৫
৭৬	ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্ধক-কর্মাণ্যাপি করণীয়ানি।।৭৬।।	২৬৫
৭৭	সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে...।।৭৭।।	২৬৬
৭৮	অহিংস-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিত্র্যাণি...।।৭৮।।	২৬৬
৭৯	সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ।।৭৯।।	২৬৬
৮০	স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি...।।৮০।।	২৬৭
৮১	ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী।।৮১।।	২৬৭
৮২	গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি...।।৮২।।	২৬৭
৮৩	ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একনতাঃ কুমার-ব্যাস...।।৮৩।।	২৬৮
৮৪	য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং...।।৮৪।।	২৬৮